পারুল চিরায়ত কথাসাহিত্য

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের নির্বাচিত গল্পসংগ্রহ

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

পা রু ল

মুহূর্তকথা

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের নির্বাচিত গল্পসংগ্রহ

মুহূর্তকথা

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের নির্বাচিত গল্পসংগ্রহ

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

পারুল

'রা-স্বা'

বন্দে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রম

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাস
ইষ্টপ্রাণেষু

নি বে দ ন

আমার কিছু গল্পের সংকলন এই গ্রন্থটি ২০১০-এর বইমেলায় প্রকাশিত হল। লেখার দায় আমার, লেখা প্রকাশের দায় প্রকাশকের। অনেক সময় এ-দুইয়ে কিছু অবনিবনা হয়, আবার বনিবনাও হয়ে যায়। এই গ্রন্থ প্রকাশের আগে আমাকে বিশেষ সচেতন থাকতে হয়েছিল যাতে অন্যান্য সংকলনের সঙ্গে এই সংকলনটির খুব বেশি মিল না বেরিয়ে পড়ে। প্রকাশকের ইচ্ছে ছিল আরও কয়েকটি-- তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ--গল্পকে অন্তর্ভুক্ত করার। আমি রাজি হইনি। অবনিবনা এইটুকুই। এতে কিছু পুরোনো গল্প রইল, আর কিছু নতুনও। এ-থেকে হয়তো বা লেখকের মনচারণার গতি-প্রকৃতি খানিকটা বোঝা যাবে। না বুঝলেও অবশ্য খুব একটা ক্ষতি নেই। গল্পগুলোই তাদের কথা বলবে। আমি তো নেপথ্যের মানুষ। উপচার সাজানো রইল। কেউ গ্রহণ করলে খুশি হবো।

সূচি

মুহূর্ত

লক্ষ্মীপেঁচা

ঘরজামাই

ভগবানের লোক

জন্ম

সংসার

বানভাসি

হ্যাঁ

হাতুড়ি

সংলাপ

রাজার বাগানে

নসিরাম

আত্মপ্রতিকৃতি

বুদ্ধিরাম

ট্যাংকি সাফ

নীলুর দুঃখ

পরপুরুষ

সাঁঝের বেলা

ভেলা

পেঁপেসেদ্ধ

কেন মশাই, যারা পেঁপেসেদ্ধ খায় তাদের শ্রদ্ধা করার কী আছে?

যারা এভারেস্টে ওঠে, বানজি জামপ দেয় বা ট্রাপিজের খেলা দেখায় তাদের প্রতি কি আমাদের শ্রদ্ধা হয় না? আমি যা পারি না তা আর একজন যখন অনায়াসে পারে তখন শ্রদ্ধাকে ঠেকানো মুশকিল।

আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনি পেঁপেসেদ্ধ পছন্দ করেন না।

আমি পেঁপেকে শ্রদ্ধা করি, যে খায় তাকেও শ্রদ্ধা করি।

বুঝেছি আপনার কথার মধ্যে একটা প্যাঁচ আছে। বিদ্রুপ এবং চোরা ব্যঙ্গ। আমি পেঁপে সেদ্ধ খাচ্ছি বলে আপনার অসুবিধে হচ্ছে না তো?

না। মানুষকে খেতে দেখলে আমার বড়ো ভালো লাগে। পার্কের ওই দক্ষিণ কোণের ফুটপাতে দেখবেন দুপুরে পশ্চিমিরা পেতলের থালায় ছাতু মেখে খায়। আমি সুযোগ পেলেই দাঁড়িয়ে তাদের খাওয়া দেখি। কিংবা ধরুন অফিস পাড়ায় টিফিনের সময় বাবুরা যে রাস্তায় চাউমিন, রোল বা ঘুঘনি দিয়ে রুটি সাঁটে সেই দৃশ্যটাও কিন্তু ভারি সুন্দর। তারপর ধরুন সুন্দরী মেয়েরা যখন আকাশমুখো হয়ে হাঁয়ের মধ্যে জলভরা ফুচকা ফেলে তখন সেই দৃশ্য দেখে আমার বড়ো আনন্দ হয়। মানুষ খাচ্ছে, তাদের পেট ভরছে, তৃপ্তি হচ্ছে এ তো অতি সুন্দর ঘটনা। আপনি যে এই নিরিবিলিতে দুপুরের পার্কে গাছের ছায়ায় বসে পেঁপেসেদ্ধ খাচ্ছেন এরও সুষমা আছে।

পেঁপে সম্পর্কে আপনার বিরূপ ধারণা থাকতেই পারে, কিন্তু একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, পেঁপের মধ্যে প্রচুর ভিটামিন, খনিজ এবং হজমের সহায়ক উপাদান আছে। তাই নয় কি?

হ্যাঁ, পেঁপে অত্যন্ত উপকারী জিনিস।

তাহলেই বলুন। ভগবান কিন্তু সব খাদ্যের মধ্যে এক একটি স্বাদ দিয়ে রেখেছেন। পেঁপের স্বাদও কিন্তু অতি ভালো। আমার বউ এতে বিটনুন এবং গোলমরিচ মাখিয়ে দেয় বলে স্বাদটা আরও খোলে।

হ্যাঁ, পেঁপের স্বাদগন্ধের গুণগ্রাহী মহান মানুষেরা আমাদের ঈর্ষারই পাত্র।

আপনি বেশ গোলমেলে লোক মশাই। তা সে যাই হোক আমি রোজই কিন্তু এই পেঁপেসেদ্ধ দিয়েই টিফিন করি। ওই যে হলুদ বাড়িটা দেখছেন ওইটেই আমার অফিস স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। আড়াইটের পরে একটু ফাঁকা পেয়ে আমি এই পার্কে চলে আসি। প্রকৃতির মধ্যে বসে, গাছের ছায়ায় নিশ্চিন্তে টিফিন খাই। এটাই আমার বিলাসিতা।

আপনি ঠিক কাজই করেন। যে-কোনো আস্বাদনের জন্য নিরিবিলিতে বসা প্রয়োজন। জীবনানন্দের কবিতা, বিভূতিভূষণের উপন্যাস, রবীন্দ্রনাথের নাটক ওসব ঠিক নিরিবিলি না হলে সুবিধে হয় না।

আপনি ওসব পড়েন বুঝি! সেইজন্যই আপনার কথায় একটু সাহিত্য-সাহিত্য গন্ধ পাচ্ছি। কম বয়সে আমিও পড়তাম। শরৎচন্দ্রে দেবদাস তো এক সময়ে প্রায় মুখস্থ ছিল। তারপর রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতা, নীহার গুপ্তের হাসপাতাল। এখন আর পড়াটড়া হয় না।

ভালোই করেন। সাহিত্য না পড়েও দুনিয়ার বারো আনা লোকের দিব্যি চলে যাচ্ছে। আমারও দৌড় বেশি দূর নয়। বেকারজীবনে সময় কাটত না বলে পড়তাম।

বেকার ছিলেন বুঝি? এখন কি চাকরি পেয়েছেন?

ওই সামান্য একটা! তবে বেকারজীবনটা বড্ড ভালো ছিল।

কেন মশাই, বেকারজীবনে ভালোটা কি? বাড়িতে গঞ্জনা, দোকানে ধারবাকি, পকেটমানির অভাব।

হ্যাঁ হ্যাঁ, তা বটে। তবু কতটা সময় পাওয়া যেত বলুন।

বেশিদিন বেকার থাকাটা মোটেই কাজের কথা নয়। তাতে ভিতরে ভিতরে মরচে পড়ে যায়। আপনার নামটি কী মশাই?

শুভাশিস মিত্র।

আমার নাম পীযূষ গুহ। আপনি চাকরি করেন, কিন্তু এই উইক ডে-তে দুপুরবেলা পার্কে এসে বসে আছেন যে?

আসলে আমার অফিসটাও কাছেই। দুপুরবেলা টিফিনের একটু ছুটি হলে আমি হাঁফ ছাড়তে এখানে চলে আসি কিংবা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরি। অফিসের বন্ধ ঘরে বসে থাকার ধাতটা এখনও তৈরি হয়নি। বেকারজীবনে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়োনোর নেশাটা একটু রয়ে গেছে।

না না, এটা ভালো কথা নয়। নতুন চাকরি, প্রথমেই অত লিবার্টি নেবেন না। বরং ছুটির পরেও কিছুক্ষণ কাজ করবেন, তাতে ইমপ্রেশন ভালো হয়। আমি পঁচিশ বছর চাকরি করছি মশাই, সব জানি। তা সরকারি চাকরি না বেসরকারি?

বেসরকারি।

বড়ো কোম্পানি?

না, মাঝারি।

তা হোক, লেগে থাকাটাই আসল। চাকরির যা বাজার, একটা যেমন তেমন চাকরি পাওয়াও কঠিন।

তা তো ঠিকই।

বাড়িতে কে কে আছে?

মা, আর আমি।

বাবা কি নেই?

আছেন।

কোথায়?

দিল্লিতে।

চাকরি করেন বুঝি?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

দিল্লি বড়ো ভালো জায়গা। নিট অ্যান্ড ক্লিন। তা আপনার বাবা মাঝে মাঝে আসেন তো!

সময় পেলে আসেন।

আপনারা যান না?

তাও যাই।

ভাইবোন নেই?

আজ্ঞে না।

আপনার চাকরিটা কী ধরনের?

সব চাকরিই তো ফাইফরমাশ খাটবার কাজ। তাই না? এটা করো, সেটা করো, ওটা ভুল হল কেন?

না মশাই, আপনার হাবভাব আমার ভালো ঠেকছে না। চাকরিতে মন নেই কেন আপনার?

আমার মাও ওই কথাই বলে। আমার নাকি চাকরিতে মন নেই।

এ বাজারে চাকরি গেলে আবার পাওয়া মুশকিল।

জানি। ওপরওয়ালা আমাকে তেমন পছন্দও করছে না। বলছে তোমার স্বভাবটা বড়ো উড়ু উড়ু।

সর্বনাশ! একে প্রাইভেট অফিসে চাকরি, তার ওপর কর্তৃপক্ষের বিষনজর! আপনি তো বিপদে পড়বেন মশাই।

বিপদ! হ্যাঁ, বিপদই তো! তবে যদি চাকরিটা চলে যায় তাহলে আমার খুব একটা দুঃখ হবে না। বেকারজীবনটার কথা ভেবে আমার খুব কষ্ট হয়।

এই রে! অতিরিক্ত সাহিত্যপাঠের এটাই হল কুফল। এই জন্যই বাড়িতে সাহিত্য-টাহিত্য আমি ঢুকতে দিতে চাইনি।

তবু কি সাহিত্য আপনার বাড়িতে ঢুকে পড়েছে?

আর বলবেন না মশাই। আমার বউটির জন্যই। সে আবার সাহিত্যপাগল লোক। বই না পড়লে ভাত হজম হয় না। ওই বদ অভ্যাস আমার ছেলেমেয়ে দুটিও পেয়েছে। তবে ভাগ্য ভালো যে, তারা উচ্ছন্নে যায়নি। লেখাপড়ায় ভালোই। মেয়ে তো চাকরিও করছে।

বাঃ। দেখবেন মশাই, যা করার চাকরি বাঁচিয়ে করবেন।

চাকরিটা নিয়েই তো সমস্যা। চার দেওয়ালের ভিতরে যতক্ষণ আটকে থাকি ততক্ষণ মনে হয় যেন কবরখানা। বাইরে বেরোলেই মনে হয় মুক্তি।

হ্যাঁ হ্যাঁ, সে তো আমাদের সকলেরই প্রথম প্রথম একটু খারাপ লাগে। কিন্তু পরে অভ্যাস হয়ে যাবে দেখবেন। এখন মাথার ওপর বাবা আছেন বলে হয়তো সংসারের প্রেশার টের পাচ্ছেন না। কিন্তু প্রেশার যখন আসবে তখন বুঝবেন চাকরিটার মূল্য কতখানি।

হ্যাঁ হ্যাঁ, সে তো বটেই।

তারপর ধরুন, বিয়েও তো করতে হবে, তখন দায়িত্ব বাড়বে। চাকরি না হলে কি চলে?

বিয়ে?

নয় কেন? বাপের এক ছেলে, বংশরক্ষা করতে হবে না?

কিন্তু বিয়ে করলে যে আরও মুশকিল হবে।

কীসের মুশকিল?

আরও বন্ধন। ইচ্ছে করলে চাকরি ছেড়ে বেরোতে পারব না।

চাকরি ছাড়ার কথা ভাবছেন কেন?

আমি ভাবছি না, চাকরিটাই ছেড়ে দিতে চাইছে আমাকে।

মাইনে কত দেয়?

দেয় কিছু। আমার চলে যায়।

চার-পাঁচ হাজার?

ওরকমই। কিন্তু কমবেশি।

খুব খারাপ তো নয়। তাহলে চাকরিটা আপনার ভালো লাগছে না কেন?

আমার তো সেটাই প্রবলেম। আমার কলিগরাও আমাকে খুব বোঝানোর চেষ্টা করে।

প্রেমেট্রেমে পড়েছেন কখনও?

কেন বলুন তো !

অনেক সময়ে প্রেমে পড়লে উড়ু উড়ু উড়নচন্ডী ভাবটা কেটে যায়। স্বভাব-বাউন্ডুলেদের দাওয়ায়ই হল প্রেম।

না, মেয়েরা আমাকে পছন্দ করে না।

কেন, আপনি তো বেশ হ্যান্ডসাম, স্মার্ট লুকিং। প্রেমের ব্যাপারেও আমি বোধহয় সিরিয়াস নই। মেয়েরা আমাকে অ্যাট্রাকটিভ মনে করে না।

হাসালেন মশাই, আজকালকার মেয়েরা কত অপদার্থ, ভ্যাগাবন্ড আর কাঁকলাস চেহারার ছেলেদের প্রেমে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে, আর আপনার মতো উজ্জ্বল চেহারার ইয়ংম্যানের লাভার জুটছে না এ কি হয়? আপনি বোধহয় মেয়েদের ভয় পান।

ঠিক উল্টো। আমার মনে হয়, মেয়েরাই আমাকে অ্যাভয়েড করে।

কেন করে ভেবে দেখেছেন?

না।

তাহলে ভাবুন এবং নিজেকে মেরামত করুন। ও কি, মুখটা অমন হয়ে উঠল কেন?

আমি আপনাকে একটা ঘটনার কথা বলতে পারি।

বলুন না।

কিন্তু আপনার হাতে কি সময় আছে? আপনি তো পেঁপেসেদ্ধ শেষ করে টিফিনের বাক্স বন্ধ করে ফেলেছেন। এবার বোধহয় অফিসে ফিরবেন?

আর তাতে কি? পঁচিশ বছর হয়ে গেছে, আর চোদ্দো মাস পরে রিটায়ার করব। এখন একটু-আধটু লিবার্টি নিতেই পারি। দেরি হলেও কেউ কিছু বলবে না।

তাহলে বলব কি?

স্বচ্ছন্দে।

আমি যখন বেকার অবস্থায় ভ্যাগাবন্ডের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছি সেই সময়ে হঠাৎ একদিন সকালে রাস্তায় একটি মেয়েকে দেখে ভারি অবাক হয়ে যাই। মেয়েটি খুব একটা লম্বা নয়, বেঁটেও নয়, খুব ফরসা নয়, কালোও নয়। রোগাটে হলেও রোগাও বলা যায় না। কিন্তু আশ্চর্য এবং অদ্ভুত হল তার মুখখানা। মুখখানা যেন মুখের সীমানা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এত নমনীয়, কোমল লাবণ্য চোখেই পড়ে না। আর ভারি মিষ্টি ছিল তার চোখ দুখানা। মায়ায় ভরা। তাকে দেখেই কেমন যেন আমার অস্তিত্বের মূল টলে গেল। তার আগে বা পরে কোনো মহিলাই আমাকে এত বিচলিত করেনি। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো, হিপনোটিক একটা স্পেলের মধ্যে তাকে পাছে হারিয়ে ফেলি এই ভয়ে ফলো করতে শুরু করি। আজকাল মেয়েদের ফলো করা-টরা উঠেই গেছে। ওসব আপনাদের আমলে ছিল।

তা বটে।

কিন্তু আমি এগিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে আলাপ করার সাহস পেলাম না, যদিও সেটাই স্বাভাবিক হত। ফলো করে আমি শেষ অবধি একটা গলির মুখ অবধি যেতে পেরেছিলাম। মেয়েটা গলির মধ্যে ঢুকে যাওয়ায় আমি আর সাহস করে এগোতে পারলাম না। খুব নার্ভাস লাগছিল।

আচ্ছা, তারপর?

আমি গলিটা চিনে রাখলাম। পরদিন সকালে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম গলির উল্টোদিকে। ঘন্টাখানেক বাদে সে বেরলো এবং আমি তাকে আবার ফলো করতে শুরু করলাম। কলেজ অবধি।

কোন কলেজ?

এসব এখন গোপন থাক।

ঠিক আছে, ঠিক আছে। বলুন।

বাড়ির গলি এবং কলেজ দুটোই আমার চেনা হল। এবং রোজই ফলো করা চলতে লাগল। এবং আমার নার্ভাসনেস, ভয় এবং লজ্জা আরও বাড়ল। বাড়ল তার প্রতি আকর্ষণ। মেয়েটা প্রথম কিছুদিন আমাকে লক্ষ করেনি। তারপর করল।

কি করে বুঝলেন?

ওসব বোঝা যায়।

মেয়েটা আপনাকে প্রশয় দিচ্ছিল কি?

আজ্ঞে না। বরং মুখে বিরক্তি এবং পায়ে সন্ত্রস্ত ভাব দেখতে পেতাম। তেমন জাঁহাবাজ মেয়ে হলে গার্জিয়ান বা পাড়ার দাদাদের দিয়ে হামলা করাতে পারত। সেসব করায়নি। কিন্তু কাঠিন্য দিয়ে বুঝিয়ে দিল যে, ব্যাপারটা সে পছন্দ করছে না।

এমন হতেই পারে। হয়তো তার কোনো বয়ফ্রেন্ড ছিল। আজকাল তো লেজুর জুটতে দেরি হয় না।

হ্যাঁ, সেটা একটা সম্ভাবনা বটে। আমারও তাই মনে হয়েছিল। কিন্তু তার বয়ফ্রেন্ড থাকলে কোনো না কোনো সময়ে দেখা যেত হয়তো। কিন্তু সেরকম কাউকে মঞ্চে অবতীর্ণ হতে দেখেনি। আমার চিন্তারাজ্যের যাবতীয় লজিক উধাও হল, আমি সবসময়ে তাকে নিয়ে নানা সম্ভব-অসম্ভব চিন্তা করতাম এবং সবই পরাবাস্তব চিন্তা। ঠিক এরকম ইনফ্যাচুয়েশন এ যুগের ছেলেদের হওয়ার কথাই নয়।

হুঁ হুঁ, খুব ঠিক।

মেয়েটির ব্যক্তিত্ব ছিল সাংঘাতিক। কখনও উগ্র সাজে সাজত না। খুব সাদামাটা পোশাক পরত, সঙ্গীসাথিরাও বিশেষ দেখিনি। যখন কলেজ থেকে বেরোত তখন দুজন বা তিনজন বান্ধবী কখনও-সখনও সঙ্গে থাকত।

নামটাম বা ঠিকানা জানার চেষ্টা করেন নি?

না। কারণ উপায় ছিল না।

তাহলে তো লস্ট কেস।

ঠিক তাই। মাত্র মাস তিনেক বাদে একদিন মেয়েটি গলি থেকে বেরোলো না। পরদিনও না। তারপর দিনও না। মেয়েটি সম্পূর্ণ মুছে গেল।

অ্যাঁ ! কোথায় গেল?

আমার অনুমান কোনো একটা ছুটির মধ্যে তারা বাড়ি পাল্টে অন্য কোথাও চলে গিয়েছিল।

এঃ হেঃ আপনি তখন কী করলেন?

বুঝতেই পারছেন আমি কয়েকদিন সম্পূর্ণ বেহেড হয়ে গিয়েছিলাম। তারপর এম বি এ পড়তে দিল্লি চলে যাই।

কী বললেন ! এম বি এ?

হ্যাঁ।

বাপ রে ! দিল্লির সেই বিখ্যাত ইনস্টিটিউটে নাকি?

ইয়ে--ওই আর কি !

তাহলে তো আপনি সোজা লোক নন ! এম বি এ পাশ ! আহা, অমন লজ্জা পাওয়ার কি আছে ! শিক্ষা কি লজ্জার ব্যাপার?

ওটা কিছু নয়। গুরুত্ব দেবেন না।

ঠিক আছে, দিচ্ছি না। তারপর?

কলকাতায় এসে আমি এই অফিসটায় চাকরি পেয়ে যাই।

বেতনের কথাটা কি আবার জিজ্ঞেস করব?

আর লজ্জা দেবেন না। এটা অর্থনৈতিক গল্প নয় কিন্তু।

বুঝলাম। বলুন।

চাকরি পেয়ে যাওয়ার পরই অবিশ্বাস্য ঘটনাটা ঘটল। আমি দেখলাম, মেয়েটিও এই অফিসেই চাকরি করছে।

বলেন কি?

হ্যাঁ, সে আমার সহকর্মী।

এ তো দারুণ গল্প! এবার নিশ্চয়ই--

না। আপনি যা ভাবছেন তা নয়। মেয়েটা ঠিক আগের মতোই কঠিন ও অবিচল। লক্ষ করলাম, অফিসের কেউই তাকে ঘাঁটায় না। সবাই প্রবল সমীহ করে এবং দূরত্ব বজায় রাখে।

মেয়েটা কি আপনাকে চিনতে পারল?

না পারার কথা নয়। কিন্তু সেটা একেবারেই প্রকাশ করল না। এমনকী কোনো সূত্রেই আমার সঙ্গে পরিচয় বা বাক্য বিনিময়ও করল না।

এরকমও হয় নাকি?

খুব প্রয়োজন হলে সে বেয়ারা দিয়ে আমার কাছে নোট পাঠায়। কখনও নিজে যেচে কথা বলে না।

আর সকলের সঙ্গে বলে?

হ্যাঁ। প্রয়োজনে সকলের সঙ্গেই কথা বলে। বাদ শুধু আমি।

লক্ষণটা ভালো না খারাপ।

জানি না। এসব ব্যাপারে আমি খুবই অনভিজ্ঞ।

আপনি নিজে কথা বলার চেষ্টা করেননি?

পাগল নাকি? মেয়েটিকে দেখেই আমি এমন নার্ভাস হয়ে পড়ি যে ভালো করে তাকাতেও পারি না। আপনার অফিসে ক'টা মেয়ে কাজ করে?

অনেক। অধিকাংশ স্টাফই তো মহিলা। তাদের মধ্যে কয়েকজন বেশ সুন্দর দেখতে। আমাদের ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজার তো কোন একটি বিউটি কন্টেস্টে মিস কী যেন হয়েছিল।

তাদের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কীরকম?

অত্যন্ত ফ্রেন্ডলি। জড়তাহীন সম্পর্ক।

আপনি কি ওই মেয়েটির কারণেই চাকরি ছাড়ার জন্য ব্যস্ত হয়েছেন?

বোধহয় ওই মেয়েটিই প্রধান কারণ।

সে কি আপনার অধস্তন?

আমাদের অফিসে ঠিক ওরকম কিছু হায়ারর্কি নেই। সবাই নিজের নিজের কাজ করে। প্রত্যেকেই প্রফেশন্যাল। প্রাইভেট অফিসে কেউ কোনো সুবিধে পায় না। সবাইকেই প্রচণ্ড কাজ করতে হয়। বসিং ব্যাপারটা দরকার হয় না। অফিসের মোটো হচ্ছে, ইট ইজ এ ফ্যামিলি।

হ্যাঁ। আজকাল এরকম একটা স্লোগান শোনা যাচ্ছে বটে। তাতে নাকি কাজ ভালো হয়।

হ্যাঁ।

আপনার কোম্পানির অন্য কোনো ব্রাঞ্চ নেই। আছে। বোম্বে, দিল্লি, ব্যাঙ্গালোর. হেড অফিস দিল্লি।

আপনি বদলি হয়ে যেতে পারেন না?

পারি। কিন্তু কলকাতার অফিসটা নতুন। এখানে কনসেনট্রেট করা বেশি প্রয়োজন বলেই আমাকে এখানে কাজ দেওয়া হয়েছে। অবশ্য আমাকে অন্যান্য অফিসেও ট্যুর করতে হয়।

একটা কথা বলব?

বলুন।

মেয়েটির কোনো বয়ফ্রেন্ড আছে কিনা খোঁজ নিন।

দিগন্তে সেরকম কোনো মেঘ এখনও দেখা যায়নি।

যা দেখা যায় না তা কি নেই? হয়তো বয়ফ্রেন্ড এখন বিলেত বা আমেরিকায়। কিংবা অন্য কোথাও চাকরি করছে। মেয়েটি তার জন্যই অপেক্ষায় আছে। সর্বনাশ!

কী হল?

একথাটা ভাবিনি তো!

এটাও তো!

হ্যাঁ। খুবই সম্ভব।

লক্ষণ দেখে আমার সেকথাই মনে হচ্ছে।

হ্যাঁ। আমারও তাই মনে হচ্ছে।

তাহলে?

সেক্ষেত্রে আমার কিছু করার নেই। বয়ফ্রেন্ড না থাকলেও কিছু করার ছিল না অবশ্য।

আমি কি আপনার জন্য কিছু করতে পারি?

কী করবেন?

আমি মেয়েটিকে অ্যাপ্রোচ করতে পারি।

কবে?

আমি একজন বয়স্ক মানুষ, কাজেই সে আমাকে হয়তো অসম্মান করবে না। আমি তার অবস্থানটা জানবার চেষ্টা করতে পারি।

সেটা কি খারাপ দেখাবে না?

হুঁ। আপনি তো বেশ পাকিয়ে তুললেন দেখছি।

সমস্যা আছে বটে। সমাধানও আছে।

কী সেটা?

আমার ফের ভ্যাগাবন্ড হয়ে যাওয়া। মাকে আমি বলেছি যে, চাকরি করতে আমার ভালো লাগছে না।

আমাদের গ্রাসাচ্ছাদন কোনোরকমে চলে যাবে। আমার মা তাতে খুব একটা আপত্তি করেনি। মা বরাবরই আমার সাপোর্টার।

ভ্যাগাবন্ড হলেই কি সমস্যা মিটবে?

হ্যাঁ। ছুটি পেলে আমি ফের আগের মতো রাস্তায় রাস্তায় ঘুরব। গাঁয়ে-গঞ্জে চলে যাব। আপনার জানার কথা নয় যে, আমি গান লিখি, সুর দিই এবং গাই।

তাই নাকি?

আমি ছবি-টবিও আঁকতে পারি। এক সময়ে এসবই আমার প্রিয় বিষয় ছিল। অফিসে বন্দি হওয়ার জন্য আমার জন্ম নয়। মুক্ত, চিন্তাশীল, দায়িত্বহীন জীবনে ফিরে যেতে পারলে আমি এসব ছোটখাটো ব্যাপার ভুলে যেতে পারব।

আপনি যে একজন কালচারগেঁড়ে তা আপনাকে দেখেই আমি বুঝেছি। সত্যি কথা বলতে কি আপনি একজন দায়িত্বজ্ঞানহীন, বাস্তব বোধবিবর্জিত, ইমপ্র্যাকটিক্যাল, ভাবালু এবং উচ্চকাঙক্ষাহীন মানুষ।

হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক তাই। আমি ঠিক ওইরকম।

এইসব ভর্ৎসনা শুনেও আপনি যে বিন্দুমাত্র অপমান বোধ করলেন না এবং আপনার চোখ যে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তাতেই বুঝতে পেরেছি যে, আপনার জীবনে উন্নতির কোনো আশা নেই। এ যুগের মেয়েরা আপনার মতো পুরুষকে পছন্দ করার মতো আহাম্মক নয়। তবে একথাও আমাকে কবুল করতে হবে যে, আপনার মতো দু-একটা পাগল ধারেকাছে না থাকলে পৃথিবীটা সহনীয় হত না। আপনার সম্পূর্ণ অপদার্থতা সত্ত্বেও আপনাকে আমার বেশ ভালোই লাগছে।

ধন্যবাদ, অজস্র ধন্যবাদ।

যদিও আপনার মতো ভাবালু লোক কোনো মহিলাকে বিয়ে করলে তার জীবনটাই বরবাদ হবে, তবু আপনার মতো লোকেরই বিয়ে করাটা জরুরি। তেমন মেয়ে হলে সে আপনার মাথা থেকে ভাবের ভূত ঝেড়ে তাড়াবে। বিয়ের পর পুরুষদের নানারকম পরিবর্তন হয়ে থাকে।

আপনি বেশ বিজ্ঞ মানুষ।

বিজ্ঞ নই, অভিজ্ঞ।

সঞ্চিত অভিজ্ঞতাই তো বিজ্ঞতা।

তাহলে এই বিজ্ঞ লোকটির একটা কথা শুনুন। এইবেলা চোখ বুজে চট করে একটা বিয়ে করে ফেলুন। তাতে প্রেমজ্বর সেরে যাবে। যে-মেয়েটা আপনাকে পাত্তা বা মূল্য দিচ্ছে না, ফিরেও তাকাচ্ছে না, তুচ্ছতাচ্ছিল্য করছে তার জন্য বিবাগী হওয়াটা কি পুরুষ মানুষের কাজ? সুন্দরী, শিক্ষিতা মেয়ের তো অভাব নেই।

সেটা কি নিজের সঙ্গেই বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে না? যে-মেয়েটিকে আমি বিয়ে করব তার প্রতিও হয়তো অবিচারই করা হবে।

আরে মশাই, বিয়ের পরে দেখবেন ওই ধিঙ্গি মেয়েটাকে ভুলে যেতে আপনার সাতদিনও লাগবে না। আমার মেয়েকেও তো আমি ওই কথাই বলি।

কী বলেন?

এমনিতে আমার মেয়ে ভীষণ স্ট্রং মর্যালের মেয়ে, ছেলেদের পাত্তা দেয় না, সিরিয়াস টাইপের। পড়াশুনো আর নিজের কাজ নিয়ে থাকে। কথাও বলে কম। কিছুদিন হল দেখছি খুব অন্যমনস্ক,অস্থির, রাতে ভালো ঘুম হয় না। চাপা স্বভাবের বলে কিছু ভেঙে বলেও না। আমরা বুঝতে পারছি, কারও প্রেমট্রেমে পড়েছে এবং সেটা ঠিক মেনে নিতে পারছে না। ওর মা অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করেও কথা বের করতে পারেনি। তবে আমার ছেলের কাছে নাকি একদিন বলেছে, সে চাকরি ছেড়ে দেবে।

সে কী? চাকরি ছাড়ার মতো কী হল?

আমাদের কাছে তো বলে না। তবে দাদার সঙ্গে খুব ভাব। দাদাকে নাকি কথায় কথায় বলেছে, সে তার টপ বসের প্রতি মনে মনে ভীষণ সফট হয়ে পড়েছে, কিন্তু এক্সপ্রেস করা সম্ভব নয়। তাই চাকরি ছাড়তে চায়। চাপা এবং অহংকারী মেয়েদের তো ওটাই প্রবলেম কি না।

ঠিকই বলেছেন। ভীষণ প্রবলেম।

আমাদের প্রবলেম কী জানেন?

কী বলুন তো!

মেয়েকে কিছুই বলার মতো সাহস আমাদের নেই। আমার মেয়ের ভীষণ স্ট্রং পারসোনালিটি। শি ইজ অ্যান অ্যাভিড অ্যানিম্যাল লাভার, যে কারণে নিরামিষ খায়, তার ওপর স্বাস্থ্যবিধি নিয়ে চিন্তাভাবনা করে বলে জাংক ফুড বা ভাজাভুজি বাড়িতে একরকম বন্ধ করে দিয়েছে। ওর জন্য আমরা তটস্থ। নিজের কোনো প্রবলেম হলে বরাবর নিজেই সলভ করে, কখনও আমাদের সাহায্য নেয় না। এই যে দশ বারো হাজার টাকা বেতনের চাকরিটা পেল এটাও সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায়। কারও সুপারিশে নয়।

হ্যাঁ আমি জানি।

আপনি জানেন! তার মানে?

না, মানে ওরকম মেয়ের পক্ষে ওটাই তো স্বাভাবিক কি না।

একজ্যাক্টলি। মাঝখানে আমরা ওর বিয়ের জন্য একটু সম্বন্ধ-টম্বন্ধ করছিলাম। কিন্তু পাত্রপক্ষ দেখতে আসবে শুনলে এমন খেপে যায় যে, আমরা রণে ভঙ্গ দিয়েছি।

আমি ভদ্রমহিলার পোর্ট্রেটটা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।

ভিসুয়ালাইজ করলেন তো!

হ্যাঁ।

আমার ছেলেও ভালো চাকরি করে। কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। সে একটি মেয়েকে ভালোবাসে। সেই মেয়েটি আমাদের বাড়িতে প্রায়ই আসেটাসে, আমাকে বাবা আর আমার

স্ত্রীকে মা বলে ডাকে। সবর্ণ, পাল্টি ঘর। নো প্রবলেম। আশা করি স্মুথলি বিয়েটাও হয়ে যাবে। কিন্তু মেয়েকে নিয়ে কী করি বলুন তো। যাকে ভালোবাসে তাকে একবার চোখ বুজে বলে ফেললেই তো হয় ব্যাপারটা। তাও বলবে না, দগ্ধে দগ্ধে মরবে। কী যে জ্বালা আমাদের।

বস বলেই বুঝি সংকোচ বোধ করছেন?

আরে না মশাই, তা নয়। দাদাকে তো বলেছে, বস হওয়ার অনেক আগে থেকেই নাকি ও ছেলেটার ইয়েতে পড়েছে। তা মুখে বলতে না পারিস আজকাল তো ই-মেলটেল করা যায়, তাই কর না। ঠিক কি না বলুন?

ঠিকই তো! বিশেষ করে বসটি যখন অবিবাহিত এবং ইকুয়ালি ইল লাক।

কিছু বললেন?

একটা স্বগতোক্তি করছিলাম আর কি। মাঝে মাঝে স্বগতোক্তি করা ছাড়া আমার আর কিছুই করার থাকে না কি না।

আচ্ছা, আপনিও তো সেই মেয়েটিকে একটা ই-মেল করতে পারেন।

পারি। কিন্তু মেয়েটা হয়তো জবাব দেবে না। হ্যাংলা ভাববে।

কী মুশকিল! আপনিও তো দেখছি আমার মেয়ের মতোই সনাতন যুগের লোক। এ যুগের ছেলেমেয়েরা মেন্টালি কত ফ্রি, কত স্মার্ট!

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। আমাদের খুব মিল। সনাতন যুগ থেকে বেরিয়ে আসতে পারছি না।

আপনার কোম্পানির নামটা কী যেন?

টাইট রোপ।

অ্যাঁ। ঠিক শুনলাম কি? টাইট রোপ?

আপনি ওভাবে তাকিয়ে আছেন কেন? ঠিকই শুনেছেন।

টাইট রোপের অফিস তো ক্যামাক স্ট্রিটে?

ক্যামাক স্ট্রিটেই।

তাহলে যে বললেন, আপনার অফিস কাছেই?

ক্যামাক স্ট্রিটটাই বা কী এমন দূর বলুন! আপনি কি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন?

ফেললাম।

কেন?

কারণ পেঁপেসেদ্ধ সম্পর্কে আপনার মতামত এর পর হয়তো পাল্টাতে হবে।

পেঁপেসেদ্ধ খেতে কি খুবই খারাপ? আপনার মুখ দেখে তো মনে হচ্ছিল যেন অমৃত খাচ্ছেন।

পেঁপেসেদ্ধর মতো খারাপ জিনিস দুটো হয় না মশাই। আর শুধু পেঁপেসেদ্ধই বা কেন? পেঁপেসেদ্ধর পরদিন কাঁচকলাসেদ্ধ, তারপর গাজর বিন টমেটোসেদ্ধ, তারপর বরবটি আর ঢ্যাঁড়সসেদ্ধ, পরদিন আলু আর ঝিঙেসেদ্ধ। জিভ অসাড় হয়ে গেছে, বুঝলেন! কিন্তু ওই একরত্তি মেয়ের শাসনে এসব খেয়েই আমাকে বেঁচে থাকতে হচ্ছে। খেতে যখন হবেই তখন সোনাহেন মুখ করেই খাই। তবে হ্যাঁ, একটা কথা কবুল করতেই হবে যে, এসব খাই বলে গ্যাস অম্বল বা পেটের কোনো কমপ্লেন হয় না। ভেবে দেখুন, পারবেন তো?

মানুষ তো এভারেস্টেও ওঠে, তাই না?

তা ওঠে বৈকি। আজকাল তো শুনি এভারেস্টে কুম্ভমেলার ভিড়।

হ্যাঁ, তাই ভেবেচিন্তে আমি খুঁজে খুঁজে আপনার কাছেই এসেছি। পেঁপে এবং অন্যান্য সেদ্ধ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞের মত জানার জন্যই।

ভালো করেছেন মশাই, ভালো করেছেন। আমি বলি পৃথিবীর অপ্রিয়তম কাজটি করার সময়ে হাসিমুখে করবেন, মনটাকে পজিটিভ রাখবেন এবং ভয়কে পরিহার করবেন। বাই দি বাই, মেয়েটা কি কোনো সিগন্যাল দিয়েছে?

গতকাল অনেক সাহস সঞ্চয় করে আমি তাকে একটাই ই-মেল করেছিলাম। তাতে শুধু ছিল, ওয়াই অর এন?

বটে! কী জবাব এসেছে?

ওয়াই।

মশা, ভূত ও সুরবালা

আমার বাথরুমে একটি লোনলি মশা আছে। বুঝলেন মশাই, এরকম বুদ্ধিমান মশক আমি জীবনে আর দেখিনি। ধূর্ত, ফিজিক্যালি ফিট এবং ক্যারাটে বা কুংফুর ওস্তাদের মতো কূটকৌশলী। গত পনেরো দিনের চেষ্টায় আমি তাকে মারতে পারিনি। অথচ মশা মারায় আমার বেশ হাতযশ আছে।

ওই একটা ব্যাপারে অবশ্য আমি খুবই কাঁচা। কত চড়-চাপড় দিয়েও এ যাবৎ যে-কয়টি মশা মারতে পেরেছি তা হাতে গোনা যায়। দুহাতে তালি বাজিয়েই হয়তো মারলুম, মশাটা পড়লও তার মধ্যে, কিন্তু মরল না।

কেন মরল না মশাই? মরারই তো কথা।

কপাল, আমার হাতের তেলো তো ফাঁপা। ওই ফাঁপার মধ্যে পড়ে দিব্যি গা বাঁচিয়ে উড়ে চলে যায়। তবে আমার গিন্নি এ ব্যাপারে খুবই নমস্যা মহিলা। মশার একেবারে যম। যেটাকে টার্গেট করবেন সেটারই কপাল পুড়ল।

আপনার স্ত্রীকে আমার নমস্কার জানাবেন। কৃতী মহিলাদের শ্রদ্ধা জানাতে আমি খুবই ভালোবাসি।

তা না হয় জানালুম। কিন্তু মশাই আপনার বাথরুমে কি ওই একটিই মাত্র মশা? আর মশা নেই?

আজ্ঞে না। আমার সারা বাড়িতে আর একটিও মশা খুঁজে পাবেন না।

সে কী! এ কি ভুতুড়ে কাণ্ড নাকি মশাই? যতদূর শুনেছিলাম, আপনি একটা পুরনো বাড়ি কিনেছেন। পুরনো বাড়ির আনাচে-কানাচে তো প্রচুর মশা থাকার কথা!

বাড়ি নয় মশাই, বাড়ি নয়। আমি একাবোকো মানুষ, বাড়ি দিয়ে কী করব? একটা পুরনো বাড়ির তিনতলায় একটা ফ্ল্যাট কিনেছি। দু'খানা শোওয়ার ঘর, একখানা বেশ বড়োসড়ো খাওয়া আর বসার জায়গা। আমার তো বেশি জায়গা লাগে না। আসবাবপত্রও যৎসামান্য। বুড়ো বয়সে কেউ হুড়ো না দেয় সেইজন্যই কেনা। নইলে সম্পত্তি দিয়ে আমি কী করব বলুন।

আহা, বুড়ো বয়সের চিন্তা এই কাঁচা বয়সেই কেন? এখনও তো ওসব ভাববার বয়স সামনে পড়ে আছে!

একটা আগাম প্ল্যানিং থাকা ভালো, বুঝলেন! ফ্ল্যাটটা কিনতে যে লোনটা নিতে হয়েছে, সেটা শোধ করতে এখন বেশি গায়ে লাগছে না। কিন্তু বেশি বয়সে লোন নিলে চাপে পড়ে যেতে হয়।

তা মশার কথাটা কিন্তু এখনও শেষ হয়নি। তিনতলায় কী মশার উৎপাত কিছু কম?

তা হতে পারে। কিন্তু আমার ফ্ল্যাটে ওই একটিই মশা। তার কোনো সঙ্গীসাথিও নেই। সারাদিন সে আমার জন্যই অপেক্ষা করে। আমি যেই বাথরুমে ঢুকি অমনি শুরু হয় তার খেল। ওপরে উঠে, নিচুতে নেমে, শূন্যে পাকদণ্ডী তৈরি করে কত কায়দায় সে যে আমাকে অ্যাটাক করতে থাকে তা না দেখলে বিশ্বাস হবে না আপনার। তাকে মারবার সব রকম চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। মশা মারবার ওষুধ স্প্রে করলে নিশ্চয়ই মরবে। তবে তার ধূর্তামি দেখে আমারও জেদ চেপেছে তাকে আমি হাত দিয়েই মারব।

আচ্ছা, আপনার মশাটা কি ব্যাচেলার বলে আপনার মনে হয়?

আসলে মশাদের তো বিয়ে হয় না, অনেক গার্লফ্রেণ্ড বা বয়ফ্রেণ্ড থাকতে পারে। সেই অর্থে সব মশাই ব্যাচেলর। যদিও ছেলেপুলে হতে বাধা নেই।

হ্যাঁ, সেটা অবশ্য ঠিক কথা। পশুপাখিরা তো লিভ টুগেদারই করে।

মশা কিন্তু পশুপাখির মধ্যে পড়ে না।

তাহলে?

মশা কীটপতঙ্গের গ্রুপে।

তাই তো! ঠিক কথাই তো! তাহলে মশাটা বেশ প্রবেলেম ক্রিয়েট করছে বলুন!

তা বলতে পারেন। তবে আজকাল মাঝে-মধ্যে মনে হচ্ছে মশার সঙ্গে আমার যে-লড়াইটা চলছে সেটা অনেকটা খেলাধুলোর মতোই ব্যাপার। সময়টাও কাটছে ভালোই। আজকাল বাথরুমে মশাটার সঙ্গে ধবস্তাধবস্তি করতে গিয়ে বেশ অনেকটা সময় কেটে যায়। বাথরুমটা, বলতে নেই, বেশ বড়োই। পালিয়ে যাওয়ার অনেক জায়গা।

আহা, শুনেও ভালো লাগে। আমাদের মোটে একখানা বাথরুম, তা সেটাও এমন ছোট যে, মাজা ঘোরানোর জায়গা নেই। বাথরুম জিনিসটা পুরুষদের কাছে, বিশেষ করে চিন্তাশীল পুরুষদের কাছে অতি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। আর্কিমিডিস তো ওই বাথরুমেই কী যেন একটা আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন! তাছাড়া অনেক দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ তাঁরা সব ওই বাথরুমেই চিন্তাটিন্তা করেন বলে শুনেছি। তাই ভাবি, একখানা ভালো বাথরুম থাকলে হয়তো আমার মাথাটাও ভালো খেলত। কিন্তু সে আর হওয়ার জো নেই। পাঁচটা মিনিট বাথরুম বন্ধ থাকলেই বাড়িতে হইচই পড়ে যায়। আপনার বাথরুম কটা?

দুটো।

আহা, কান জুড়িয়ে গেল। আপনি একা মানুষ, দু'দুটো বাথরুম! আর আমরা পাঁচজন, বাথরুম মোটে একখানা। বড়ো একটেরে একখানা বাথরুম পেলে আমি তো মশাই গলাও সেধে ফেলতুম। আমার বন্ধুবষ্কা তো বাথরুমে গলা সেধেই নামকরা গায়ক হয়ে গেল। বাথরুম জিনিসটার গুরুত্ব যে কী সাংঘাতিক তা বলে বোঝানো যায় না।

তা বটে। বাথরুম সম্পর্কে আমিও কিছু ভালো ভালো কথা শুনেছি বটে। ভালো বাথরুম পেলে নাকি সুপ্ত প্রতিভা জেগে ওঠে।

অতি সত্য কথা। ছেলেবেলায় মশাই, আমার অঙ্কে বেশ মাথা ছিল। গানের গলা ছিল। দু'চার লাইন কবিতাও লিখে ফেলতুম। ওই বাথরুমের জন্যই বেগ চেপে চেপে কোষ্ঠকাঠিন্য হয়ে গেল। আর তাইতেই প্রতিভাটাও গেল ঘোলাটে হয়ে।

খুবই দুঃখের কথা।

তার ওপর আবার মশাহীন বাথরুম! ভাবাই যায় না।

মশাহীন! না মশাহীন হতে যাবে কেন? ওই যে বললুম একটা লোনলি মশা আছে।

আহা, মশাদের আর কতদিন আয়ু বলুন। ঠিক জানা নেই বটে, তবে মাস ছয়েকের বেশি কী আর হবে? না হয় বছরখানেকই ধরে নিচ্ছি। ততদিনে তার ন্যাচারাল ডেথ হয়ে গেলেই তো আপনি নিষ্কন্টক।

মুশকিল কী জানেন। কয়েকদিন আগে অবধি মশাটাকে আমি শত্রু বলে ভাবতাম বটে, কিন্তু হঠাৎ দিন কয়েক হল আমার মনে হচ্ছে, বজ্জাত হোক যাই হোক, মশাটা তো আমাকে সঙ্গও দিচ্ছে। এই যে আমি বাথরুমে গেলেই সে তার খেল শুরু করে, এতে আমার একাকিত্ব ভাবটা কেটেও তো যায় এবং বেশ একটা ফূর্তির ভাব আসে।

কথাটা কিন্তু মন্দ বলেননি। কুকুর, বেড়াল, পাখি পুষলেও কিন্তু ওরকমধারা হয়। মশা অবশ্য পোষ মানার পাত্র নয়।

পোষ মানলে মজাটাও থাকবে না।

আপনি বেশ বিজ্ঞ মানুষ। হবে না? যার দ'দুটো বাথরুম তার বিজ্ঞ না হয়ে উপায় নেই কি না। আচ্ছা মশাই, আপনার দ্বিতীয় বাথরুমটার কথা তো কিছুই বললেন না!

ওঃ, ওটা সম্পর্কে যত কম বলা যায় ততই ভালো।

কেন মশাই, কেন? সেটা কি ব্যবহারযোগ্য নয়?

না, এমনিতে সেটা খুবই ভালো বাথরুম। বিশাল বড়ো। সেটাতে আবার শ্বেতপাথরের একটা পেল্লায় বাথটাব আছে, বিরাট আয়না, রাজকীয় কমোড এবং বেশ দামি দামি সব ফিটিংস।

তা হলে সেটা ব্যবহার করেন না কেন?

একটু অসুবিধে আছে।

কী অসুবিধে মশাই?

আজ্ঞে, বললে হয়তো আপনি বিশ্বাস করবেন না।

কেন মশাই, বিশ্বাস করব না কেন?

ওই বাথরুমটা আর একজন ব্যবহার করেন।

ও, তা বিশ্বাস না করার কী বলুন! আর একজন তো ব্যবহার করতেই পারে।

তা, তো বটেই! কিন্তু আমার ফ্ল্যাটে আমি ছাড়া দৃশ্যত আর কেউ থাকে না।

অ্যাঁ! তা হলে এই আর একজনটা এল কোত্থেকে?

সেটাই তো আমারও প্রশ্ন। ফ্ল্যাটে আর কেউ থাকে না, অথচ ওই বাথরুমটা আর কেউ ব্যবহার করছে এটা কি বিশ্বাসযোগ্য?

বাইরে থেকে কেউ আসে না তো!

আজ্ঞে না।

তবে কি ভূতটুত কিছু?

আমি ভূতে বিশ্বাস করতাম না, এখনও করতে চাইছি না, তবে ব্যাপারটা ওরকমই।

একটু খুলে বলুন না মশাই, শুনে শরীর রোমাঞ্চিত হচ্ছে যে!

বলার তেমন কিছু নেই। আমি ওই বাথরুমে গেলেই বাথরুমটা যেন খুশি হয় না।

আহা, বাথরুমের আবার খুশি-অখুশি কি?

আছে মসাই, আছে। বাথরুমটা আমাকে তার যোগ্য ব্যবহারকারী বলে মনেই করে না। প্রথম দিন গিয়ে কমোডে বসতে না বসতেই ফ্ল্যাশটা আপনা থেকেই অন হয়ে হুড়মুড় করে জল নেমে এল সিস্টার্ন থেকে। শাওয়ার থেকে জল পড়তে লাগল অকারণে। বাথটাবের কলটা কে খুলে দিল। দরজাটা দুম করে খুলে গেল। আমি তো পালিয়ে বাঁচি না।

এ তো পরিষ্কার ভুতুড়ে কাণ্ড মশাই।

তা বলতে পারেন। অন্যের কাছে ব্যাপারটা ভুতুড়ে বলেই মনে হবে হয়তো। আমার ব্যাখ্যাটা অন্যরকম।

কিরকম মশাই?

কোনো নাক-উঁচু লোক ওটা ব্যবহার করত। খুব শৌখিন লোক। আর বাথরুমটাও সেইজন্য একটু উন্নাসিক। এলেবেলে লোক তাকে ব্যবহার করুক এটা সে চায় না। তাই আমি ঢুকলেই বাথরুমটা নানা কায়দায় তার প্রতিবাদ জানায়।

কিন্তু আপনি যে বললেন, ওটা আর কেউ ব্যবহার করে।

হ্যাঁ, তাও করে। নিশুত রাতে বাথরুম থেকে খুব সুরেলা শিস শুনতে পাই, কখনও গুন গুন করে গান। দামি অডিকোলোনের গন্ধ আসে, সাওয়ার খুলে কেউ স্নান করে টের পাই।

আপনার ভয় করে না?

না। ভূতে বিশ্বাস করি না বলেই ভয়ও পাই না।

কিন্তু অকাট্য প্রমাণ পেয়েও ভূতে বিশ্বাস করেন না কেন?

বিশ্বাস জিনিসটাই যে ওরকম। বিরুদ্ধ প্রমাণ পেলেও বিশ্বাস শেকড় গেড়ে বসে থাকে, টলতে চায় না।

আশ্চর্য! ভূত সামনে এসে যদি দাঁড়ায় তখনও বিশ্বাস করবেন না?

আজ্ঞে না। পরিষ্কার বলে দেবো, ফোটো হে বাপু, তোমাকে আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।

না মশাই, এটা কিন্তু আপনার অন্যায়। ভূতকে পাত্তা না দেওয়াটা ঠিক নয়।

পাত্তা না দিলেও ব্যাপারটা আমার খারাপ লাগে না। শিসটা বেশ সুরেলা। গানের গলাও খারাপ নয়। আর সুগন্ধিগুলো খুবই চমৎকার।

আপনি বেশ সাহসী লোক।

না মশাই, আমার ধারণা ঠিক উল্টো। বরং আমি বেশ ভীতু লোক। ও বাড়িতে আর যারা আছে তারাও বলে, আমি নাকি খুব সাহসী লোক। কিন্তু আমি তো আমার মধ্যে সাহসের ছিটেফোটাও খুঁজে পাই না।

ভুতুড়ে ফ্ল্যাটে থাকা কি সাহসের কাজ নয়?

আজ্ঞে, ভুতুড়ে ফ্ল্যাট বলছেন কেন? আপনাদের কথামতো যদি ভূত থেকেই থাকে সে তো ফ্ল্যাটের আর কোথাও কোনো উৎপাত করে না। তার একমাত্র লক্ষ্য হল ফ্ল্যাটের ভালো বাথরুমটা। আমার কী মনে হয় জানেন?

কী মশাই?

মনে হয়, ভূতটুত নয়, বাথরুমটাই একটু অ্যানিমেটেড হয়ে গেছে। বাথরুমটা উন্নাসিক হওয়াতেই এসব হচ্ছে। আমাকে পছন্দ করছে না। তাই আমি ওই বাথরুমটাকে অ্যাভয়েড করে চলি। ফলে কোনো ঝামেলা হয় না।

তা হলে আপনার একটা বাথরুমে একটা লোনলি মশা এবং অন্যটায় একটা শৌখিন ভূত! বেশ আছেন মশাই।

হ্যাঁ। আছি বেশ ভালোই। দিব্যি খোলামেলা ফ্ল্যাট, আলো হাওয়া আছে।

তা কত বড়ো হবে ফ্ল্যাটখানা?

মন্দ নয়। ফ্ল্যাটের মালিক তো বিক্রির সময় বলেছিল ষোলোশো বর্গফুট। দলিলেও তাই লেখা আছে।

ষোলোশো? ও বাবা, সে তো পেল্লায় ব্যাপার! আমার কপালটা দেখুন, ধারেকর্জে তল হয়ে, গিন্নির তাড়নায় অতি কষ্টে মাত্র পাঁচশো পঁয়ত্রিশ বর্গফুটের একখানা ফ্ল্যাট কিনতে পেরেছি। তাইতেই গাদাগাদি করে থাকা। বেশি ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকার ড্রব্যাকটা কি জানেন? পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নষ্ট হয়ে যায়। প্রাইভেসি বলে বস্তুটাই থাকে না কি না। এ ঘর ও ঘর করতে গিয়ে গায়ে গা ঠেকে যায়। গুঁতোগুঁতি করে থাকা আর কি। আর সেইজন্যই তো যতক্ষণ পারি বাড়ির বাইরে কাটিয়ে যাই। আর আপনি! রাজা বাদশার মতো থাকেন! শুনতেও কত ভালো লাগে। কিন্তু একা মানুষ, অত বড়ো ফ্ল্যাটটা কেনার দরকারটা কী ছিল?

আজ্ঞে না, আপনাকে তো বলেইছি, অত জায়গা আমার লাগে না। তবে লোকটা ভারি সস্তায় দিল বলে নেওয়া। ফ্ল্যাটটায় বেশ হাত পা খেলিয়ে থাকা যায় বটে।

তা কত পড়ল?

লাখ বিশেকের মধ্যেই হয়ে গেল।

বিশ লাখ! তা টাকাটা লোন করলেন বুঝি?

না, লোন নিতে হয়নি। কুড়িয়ে বাড়িয়ে হয়ে গেল।

তাহলে তো আপনি শাঁসালো লোক মশাই। গত দু'মাস ধরে আলাপ, কিন্তু আপনি যে একজন পয়সাওলা লোক তা টেরটিও পেতে দেননি তো।

টাকার কীই বা মূল্য আছে বলুন!

তা অবিশ্যি ঠিক। টাকা এখন পয়সার স্তরে নেমে গেছে। দশ পয়সা বিশ পয়সার কয়েনগুলো পর্যন্ত আজকাল কেউ নিতে চায় না। আমার কাছে গাদাগুচ্ছের পড়ে আছে। শুনছি এক টাকা দু'টাকার নোটও আর ছাপা হচ্ছে না। শুধু কয়েনগুলো চলছে। না মশাই, টাকার আর ইজ্জত রইল না। আচ্ছা মশাই, তাহলে এই উঠতি বয়সে সংসারী হচ্ছেন না কেন বলুন তো! একটা বিয়ে করে ফেলুন। মশা আর ভূত নিয়ে তো জীবন কাটানো যাবে না।

নিজের বিয়ের চেয়ে আমি পরের বিয়ে দিতেই বেশি ভালোবাসি।

সেটা কি রকম ব্যাপার মশাই?

খুব সোজা, বাংলার ঘরে ঘরে তো বিবাহযোগ্যা অরক্ষণীয়ার অভাব নেই। টাকা-পয়সার অভাবে সেইসব মেয়ের বাপ বিয়ে দিতেও পারছেন না। আমি সাধ্যমতো দু'চারটে বিয়েতে কিছু সাহায্য করতে পেরেছি। সেটাতেই আমার বেশি আনন্দ।

বাঃ মশাই, শুনে বড্ড খুশি হলাম। আপনার চরিত্রের এই মহৎ দিকটার কথা আমার জানা ছিল না। উঃ, কতদিন কোনো মহৎ মানুষের দেখা পাইনি। মানুষ যে এই কলিযুগেও মহৎ হতে পারে এই ধারণাটাই করা কঠিন হয়ে পড়ছিল ক্রমশ। না মশাই, আজ আপনি আমার চোখ খুলে দিলেন।

আহা, অতটা বাড়িয়ে বলার কিছু নেই। আসলে যখনই কোনো মেয়ে বা মেয়ের বাপ আমাকে এসে বিয়ে করার জন্য ধরে তখনই আমি টাকা-পয়সা দিয়ে বিয়ের বন্দোবস্ত করে নিজের গর্দান বাঁচাই। মহত্ত্ব নয়, ওটা আমার আত্মরক্ষার কৌশল বলতে পারেন।

ও কথায় ভুলছি না মশাই, আপনি নিজের মহত্ত্বকে আড়াল করতে চাইছেন। মহৎ লোকের লক্ষণই তো তাই। নিজের মহত্ত্ব স্বীকার করলে আর তার মূল্য কি থাকে বলুন। আপনার কাছে অনেক কিছু শেখার আছে। বয়সে ছোট না হলে আমি আপনার পায়ের ধুলো নিতুম।

ছিঃ ছিঃ, কী যে বলেন! শুনলেও পাপ হয়।

না, মশাই, না, গুণীর গুণের মর্যাদা দেওয়া তো বাঙালির ধাতে নেই। কিন্তু আমি সেরকম লোক নই। গুণী মানুষ দেখলে মাথা নোয়াতে জানি।

আপনি অতি উদারহৃদয় মানুষ।

না মশাই না। উদার আর হতে পারলাম কই? মাসকাবারে হাতে মোটে দশটি হাজার টাকা পাই। তাই দিয়ে সংসার চালাতে হিমসিম খেতে হয়। ধারকর্জও হয়ে যায়। পাঁচটি হুমদো হুমদো প্রাণী, এসোজন, বোসোজন, অদ্রতা-ভদ্রতা, ব্যাঙ্কের লোন শোধ দেওয়া, এল আই সি-র প্রিমিয়াম, ঠিকে ঝি-র মাইনে সব মিটিয়ে উদার হওয়ার সুযোগ কোথায় বলুন। নইলে আমারও কি ইচ্ছে করে না অরক্ষণীয়াদের বিয়ে দিই, বন্যাত্রাণে সাহায্য করি, গরিবের চিকিৎসার খরচ জোগাই? করে, খুবই ইচ্ছে করে, কিন্তু উপায় কি বলুন!

অতি ঠিক কথা। মানুষের মধ্যে মহত্ত্ব আছেই, তবে সেটা--

হ্যাঁ, হ্যাঁ সেটা ফোড়ার মতো টনটন করে, বদ্ধ জীবের মতো ডানা ঝাপটায়, পাথরচাপা ঘাসের মতো চিঁড়েচ্যাপটা হয়ে থাকে। তাই না?

আপনার উপমা-জ্ঞান অতি চমৎকার। হ্যাঁ, ওরকমই হয় বটে। তবে টাকা থাকলেই যে সবাই দানধ্যান করে তা কিন্তু নয়। এই আমার কথাই ধরুন। ভাবি বটে, অনেক টাকা থাকলে মেলা দানধ্যান করতুম, কিন্তু যদি কোনোদিন সত্যিই ছপ্পড় ফুঁড়ে টাকা আসে তখন

হয়তো মানসিক পরিবর্তন হয়ে যাবে। টাকা হলে নাকি টাকার নেশা বাড়ে। আরও টাকা, আরও টাকা করে মানুষ হেদিয়ে মরে।

আপনি বিজ্ঞ মানুষ। ঠিকই ধরেছেন। দানধ্যান করার জন্য টাকা ছারখারের চেয়েও মানসিকতার প্রয়োজন বেশি। তবে দানধ্যান বা লোকের সেবা সাহায্য করে বেড়ানোর নেশার বাড়াবাড়িও ভালো নয়। ওর মধ্যে আবার অহং প্রবল হয়ে দাঁড়ায়। দানধ্যানের অহংকার অর্জিত পুণ্যের বারোটা বাজিয়ে ছাড়ে। কখনও কখনও সাধ্যমতো লোককে একটু আধটু সাহায্য করলেও হয়। টাকা-পয়সার চেয়ে সহানুভূতি, সাহচর্য, পাশে দাঁড়ানো এসবেরও মূল্য আছে।

আপনার কাছে বসলেই কত কিছু শেখা যায়। আচ্ছা, আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে আপনি একটু অস্বস্তি এবং উদ্বেগের মধ্যে আছেন। কেমন যেন একটু আনমনাও। তাই না? ঠিক যেন প্রফুল্ল দেখছি না আপনাকে!

ঠিকই ধরেছেন। সম্প্রতি আমি একটু অশান্তিতে আছি।

সে কী কথা! আপনার মতো মহৎ মানুষ যদি অশান্তিতে থাকেন তাহলে তো আমাদেরই উদ্বেগের কথা। কী হয়েছে বলুন তো!

ঠিক বলবার মতো নয়।

খুব প্রাইভেট প্রবলেম কি?

হ্যাঁ, তাও বলতে পারেন। তবে আপনি একজন সহানুভূতিশীল মানুষ। আপনাকে বলাই যায়। বিশেষ করে আমার যখন পরামর্শ দেওয়ার মতো বিচক্ষণ মানুষ কেউ তেমন নেই।

আহা, শুনে বড়ো প্রীত হলুম। আমার বউ তো আমাকে দিনরাত, বোকা, হাঁদা, ভ্যাবাগঙ্গারাম, আহাম্মক বলে গঞ্জনা দেয়। শুনতে শুনতে আমিও কেন যে ক্যাবলা হয়ে যাচ্ছি। কিন্তু একসময়ে আমারও কিছু বুদ্ধিশুদ্ধি ছিল মশাই।

আছে। এখনও আছে। নিজেকে বোকা ভাবতে নেই। আমি তো আপনার কথাবার্তায় বিচক্ষণতার লক্ষণই দেখতে পাই।

ধন্যবাদ মশাই, অজস্র ধন্যবাদ। আপনি আমার হারানো আত্মবিশ্বাসটা ফিরিয়ে দিলেন। তা ব্যাপারটা কি?

আমি ব্যাচেলর বলে এবং রোজগারপাতি ভালো করি বলে আমার কাছে কিছু মানুষ সাহায্যের আশায় আসে।

তা তো বটেই, পাকা কাঁঠাল ভাঙলে মাছি তো আসবেই। তা রোজগারপাতি আপনার কেমন হয়?

ভালোই, আমি ইনজিনিয়ার, এম বি এ। কনসালটেন্সি আছে। ফলে--বুঝতেই পারছেন।

খুব পারছি, খুব পারছি, তারপর বলুন।

এই সম্প্রতি আমার গ্রাম সম্পর্কে এক খুড়ো মশাই এসে হাজির হয়েছেন।

গ্রামটা কোথায়?

নৈহাটির কাছে, গ্রাম নামেই। আসলে এখন পুরোদস্তুর শহর হয়ে গেছে। তা এই খুড়োমশাই এসে অবধি আমি কিছু অশান্তিতে আছি।

খুব টেঁটিয়া লোক নাকি?

না, না। অতি সজ্জন মানুষ। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, জীবনে একটাও মিথ্যে কথা বলেছেন কি না সন্দেহ। ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিক, জপতপ করেন। তাছাড়া ভারি অমায়িক ব্যবহার।

বলেন কি? এমন মানুষকে নিয়ে তাহলে আপনার অশান্তি হচ্ছে কেন?

মানুষটা এরকম বলেই অশান্তি। তিনি কলকাতায় এসে আমার বাড়িতেই উঠেছেন। তারপরই আমার আচরণ দেখে অন্নজল ত্যাগ করার উপক্রম।

বলেন কি? কী করেছেন আপনি?

বামুন হয়েও পৈতে রাখি না, আহ্নিক করি না, বাসি কাপড়ে চা খাই, সদাচারের অভাব। তিনি তেজস্বী মানুষ। এসব অনাচার দেখে ভারি রেগে গিয়ে চলেই যাচ্ছিলেন। আমি ক্ষমাটমা চাওয়ায় তিনি আমাকে গোবর জলটল দিয়ে শুদ্ধ করে গঙ্গাস্নান করিয়ে একদিন

হবিষ্যি ভক্ষণ করিয়ে গলায় পৈতে ঝুলিয়ে দিয়েছেন, নিয়মিত আহ্নিক করাচ্ছেন, বাসি কাপড় না ছেড়ে কোথাও কাজ করার উপায় নেই।

আহা, এসব করা তো ভালোই। প্রাচীনকাল থেকে ওসব চলে আসছে, ওর মধ্যে ভালো ব্যাপারও থাকতে পারে তো!

কিন্তু এসব করতে গিয়ে আমার মানসিক শান্তি খুবই বিঘ্নিত। ওঁর ব্রাহ্মণী অবশ্য রান্নাবান্না খুবই ভালো করেন। এতদিন আমিই যা হোক কিছু রান্না করে খাচ্ছিলাম। ওঁরা আসার পর আমার হেঁসেলে ঢোকা বারণ। আরও আশ্চর্যের কথা, খুড়ো আসার পর বাথরুমের বেয়াদবিও বন্ধ হয়েছে।

ওই দেখুন, ওকেই বলে ব্রহ্মতেজ। ভূতপ্রেত পালানোর পথ পায় না। বাঃ, এ তো বেশ ভালোই হয়েছে মশাই। পুজো-আচ্চা চালিয়ে যান, ভূত আর কাছে ঘেঁষবে না।

আহা, ভূতপ্রেত যাই হোক, ব্যাপারটা তো আমি উপভোগই করতাম। কিন্তু আরও একটা মুশকিল হয়েছে।

কী বলুন তো!

খুড়োর সঙ্গে খুড়িমা যেমন এসেছেন তেমনি তাঁদের একমাত্র মেয়ে সুরবালাও এসেছে কিনা।

বাঃ বেশ নামটি তো। সুরবালা, এ ধরনের পুরনো নাম তো আজকাল রাখাই হয় না। তা তাতে মুশকিলটা কিসের?

সুরবালাই মূর্তিমতী মুশকিল।

কেন মশাই, কেন?

সুরবালার বয়স সতেরো আঠেরো। খুবই চালাক চতুর, একটু ফাজিল, আর......আর......

আর?

থাকগে সেসব কথা, আসল ব্যাপারটা হল, খুড়োমশাই এবং তাঁর পরিবার পেঁয়াজ-রসুন, বলির পাঁঠা ছাড়া অন্য মাংস, ডিম ইত্যাদি খান না। আমাকেও সেইসব নিয়ম মেনে চলতে হচ্ছে। আর একটু আধটু যে অনিয়ম করব তারও উপায় নেই। সুরবালা আমার ওপর রীতিমতো গোয়েন্দাগিরি করে যাচ্ছে। সেদিন ভাত খাওয়ার সময় বাঁ হাতে জল খেয়েছি, সঙ্গে সঙ্গে নালিশ। বাইরে থেকে হয়তো ওমলেট খেয়ে এসেছি। ঘরে ঢুকতেই সুরবালা ঘোষণা করল, উনি পেঁয়াজ খেয়ে এসেছেন। বুঝুন কাণ্ড।

হ্যাঁ, তা বটে, একটু-আধটু অসুবিধে তো আপনার হতেই পারে। পুরনো অভ্যাস তো। তা ওরা থাকবেন কদিন?

আসলে ওঁরা এসেছেন সুরবালার জন্য একটি সচ্চরিত্র পাত্রের খোঁজ পেয়ে। পাত্রটি নাকি সংস্কৃতের এম. এ., কোন কলেজের অধ্যাপক, ধুতি-পাঞ্জাবি পরে, ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিক করে, শাস্ত্রজ্ঞ এবং সদবংশজাত। বিয়ে প্রায় ঠিক হয়ে গেছে। দু'পক্ষের কথাবার্তাও মোটামুটি পাকা।

বাঃ, তাহলে তো ল্যাঠা চুকেই যাচ্ছে।

না, যাচ্ছে না।

কেন মশাই? সুরবালার বিয়ে ঠিক হয়ে গেলেই তো ওঁরা ফিরে যাবেন?

হ্যাঁ।

তাহলে?

সুরবালাকে আপনি দেখেননি।

তা তো বটেই।

দেখলেই বুঝতেন সমস্যাটা কোথায়।

দেখতে কদাকার নাকি?

না, বরং উল্টো, সুরবালা ভীষণ সুন্দরী, আর...

আর?

তাকে দেখলেই আমার বুকটা ধক করে ওঠে।

এ তো ভালো লক্ষণ নয় মশাই!

না। আর বিয়ে ঠিক হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও সুরবালার দুটো চোখ সব সময়ে লাল আর ভেজা ভেজা। সেদিন আড়াল থেকে শুনলাম, খুড়িমা ওকে বকছেন, কাঁদছিস কেন মুখপুড়ি? এত ভালো পাত্র আর জুটবে? জবাবে সুরবালা বলছিল, তোমরা কী বুঝবে কেন কাঁদছি। ও বিয়ে ভেঙে দাও। মায়ে-মেয়েতে বেশ লেগে গেল।

তারপর?

ওইখানেই ঝুলে আছে। শুধু গতকাল যখন অফিসে বেরচ্ছি তখন সুরবালা দরজা দিতে এসে চাপা গলায় বলল, অনেক পাষাণ দেখেছি, আপনার মতো দেখিনি।

বলেন কি মশাই? এ তো সাংঘাতিক কথা!

হ্যাঁ। সেই থেকে বড়ো উচাটন হয়ে আছি। মনে শান্তি নেই।

আহা, এতে উচাটন হওয়ার কী আছে? আরে আপনি ভূতকে ভয় পান না, দানশীল লোক, মহৎ প্রাণ, আপনার ভয়টা কিসের?

ভয়ের ব্যাপার তো নয়। এ হল ব্যাখ্যার অতীত একটা সিচুয়েশন। ঠিক বোঝা যাচ্ছে না ব্যাপারটা।

কেন, আমি তো বেশ বুঝতে পারছি।

পারছেন?

বিলক্ষণ।

কী বুঝলেন।

সেটা হাঁটতে হাঁটতেই বলবখন। এখন উঠুন তো, উঠে পড়ুন। খুড়োমশাই বাড়িতে আছেন তো।

আছেন, কিন্তু.....

আর কিন্তু নয়, দেরি করলে কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে যাবে। খুড়োমশাইয়ের সঙ্গে আমার এক্ষুনি কথা বলা দরকার।

ইয়ে, তা নয় হয় যাচ্ছি। কিন্তু....

লোকেন

একটা বাক্স। একটা বই। একটা ডায়েরি। ব্যস। পৃথিবীর সব প্রশ্নের উত্তর, সব রহস্যের সমাধান, সব জটিলতার মীমাংসা ওই তিনটি জিনিসের মধ্যে রয়েছে। সেই জন্যই খুব সাবধানে ঘরের ওই তিনটে জিনিস কখনও, কখনও, কখনওই খোলে না লোকেন্দ্রনাথ। মরে গেলেও খুলবে না সে।

লোকটা আসে খুব ভোরের দিকে। তখন অন্ধকার থাকে। লোকটার পরনে পুলিশের পোশাক। তখন পাখিরা ওড়ে না, কিন্তু খুব ডাকে। পরস্পরকে ডাকে এবং ভোরের আলোকে নমস্কার বা অভিবাদন জানাতে থাকে। হয়তো, ওড়াউড়ি করার মতো যথেষ্ট আলো থাকে না বলেই, ওরা শুধু ডাকে আর ওড়ার প্রস্তুতি হিসেবে ডানা ঝাপটায়। সেই সময়ে খুব শিশির পড়ে ঘাসে। খুব ঠাণ্ডা আর বেশ অন্ধকার, ওই সময়ে পুলিশ আসার কথা নয়, কিন্তু এই লোকটা আসে। অন্ধকার বলেই লোকেন্দ্রনাথ লোকটার মুখ ভালো দেখতে পায় না। লোকটা বাগান ঘুরে বেড়ায়। অন্ধকারেই ঘুরে বেড়ায়। সকালে আলো ফুটলে লোকেন বাগানের মথিত ঘাসে তার বুট পরা পদচিহ্ন দেখতে পায়।

প্রথম দিন লোকেন লোকটাকে বাগানে ঘুরতে দেখে খুব অবাক হয়েছিল। তাদের এই বাগানে ফুলচোর ছাড়া এত ভোরে আর কে আসবে? পুলিশের লোকটা তার জানালার কাছে এসে অন্ধকার ঘরের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে স্থির দাঁড়িয়েছিল প্রথম দিন। সেদিন কথা হয়নি। অন্ধকারে লোকটা কী দেখল কে জানে।

কিন্তু দ্বিতীয় ভোরবেলা লোকটা জানালার কাছে এসে খুব চাপা গলায় জিজ্ঞেস করেছিল, জেগে আছেন?

লোকেন প্রথম ভেবেছিল মটকা মেরে শুয়ে থাকবে, যেন জেগে নেই, কিন্তু পুলিশকে ফাঁকি দেওয়া কি সোজা কথা?

লোকটা বলল, আমি জানি আপনি জেগে আছেন।

লোকেন তখন বাধ্য হলেও বলল, হ্যাঁ, জেগে আছি।

আমি একটা জরুরি তদন্তের কাজে এসেছি। কয়েকটা প্রশ্ন করব, ঠিকঠাক জবাব দেবেন।

কীসের তদন্ত?

আপনার স্ত্রী রিকুর সঙ্গে আপনার ডির্ভোস হল কেন?

রিকুর সঙ্গে আমার ডিভোর্স হয়নি।

আমাদের কাছে আদালতের রায় আছে।

রিকুর সঙ্গে আমার যে বিয়েই হয়নি!

মিথ্যে কথা। রিকুর সঙ্গে আপনার হিন্দু মতে অগ্নিসাক্ষী করে বিয়ে হয় পাঁচ বছর আগে।

আমি রিকু নামে কাউকে চিনি না যে! রিকু কেন, কারও সঙ্গেই আমার বিয়ে হয়নি।

তার মানে, আপনি বলতে চাইছেন না। ঠিক আছে, আমি আবার আসব।

তৃতীয় ভোরে লোকটা শুরু করল এভাবে, আচ্ছা, বলটা আপনি কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন বলুন তো! বাগানে তো কোথাও বলটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

বল! কীরকম বল বলুন তো!

একটা টেনিস বল। রতন খুব জোরে ব্যাট দিয়ে উঁচু করে মারল, বলটা এসে পড়ল এই বাগানে। ওরা আমার ব্যাট বল নিয়ে খেলছিল। কিন্তু আমাকে খেলায় নেয়নি। তাই খেলা ভণ্ডুল করে দেওয়ার জন্য বলটা কোথায় পড়েছে তা আমি ওদের বলিনি।

খেলাটা কি ভণ্ডুল হয়ে গিয়েছিল?

হ্যাঁ, বলটা কোথায় উড়ে গেছে তা ওরা দেখতে পায়নি। শুধু আমি জানতাম, কিন্তু পরে খুঁজতে এসে আর খুঁজে পাইনি। আজ অবধি। আপনি লুকিয়ে রেখেছেন?

না। কিন্তু সামান্য একটা টেনিস বলের জন্য আপনি উতলা হচ্ছেন কেন?

সামান্য! কী যে বলেন! ওই বলের মধ্যে আমার সমস্ত ছেলেবেলা পোরা আছে। নইলে গত পঁচিশ বছর ধরে বলটা খুঁজছি কেন? আপনি জানেন না বলটা কোথায়?

না। আমি বাগানে কখনও কোনো বল কুড়িয়ে পাইনি।

বলটা আছে। এখানেই আছে। কোনো ঘাসপাতার নীচে, ঝোপেঝাড়ে, গর্তে কোথাও পঁচিশ বছর ধরে লুকিয়ে রয়েছে চুপটি করে। ওকে আমার বড় দরকার।

চতুর্থ ভোরে লোকটা এসে বলল, শুনুন মশাই, আমাদের কাছে খবর আছে, আপনি একজন ফেরারি। এটা আপনার বাড়ি নয়, আপনি এ-বাড়িতে গা-ঢাকা দিয়ে আছেন। ঠিক কি না!

এটা আমার জ্যাঠামশাইয়ের বাড়ি। জ্যাঠামশাইয়ের তিন ছেলে বিদেশে থাকে। জ্যাঠামশাইয়ের অনেক বাড়ি। অসুখের পর আমাকে ডাক্তারেরা বলেছিল নির্জনে থাকতে। জ্যাঠামশাই শুনে বললেন, তাহলে তুই আমার যশিডির বাড়িটাতে গিয়ে থাক। লোকজন থাকলে বাড়ি ভালো থাকে।

আপনি চাকরিবাকরি করেন না, তাহলে আপনার চলে কীসে?

গয়না বিক্রি করে।

গয়না বিক্রি! সর্বনাশ! চোরাই গয়না নিশ্চয়ই!

আমার মায়ের গয়না, যখনই টাকার টান পড়ে তখনই একটা করে গয়না বিক্রি করে দিই। কিছুদিন চলে। টাকা ফুরিয়ে গেলে আর একটা বিক্রি করি।

কে কেনে?

শ্যামলাল ঝুনঝুনওয়ালা।

আপনি কি আপনার মায়ের গয়না চুরি করে পালিয়ে এসেছেন?

মা বেঁচে নেই। বাবা বেঁচে নেই। কেউ বেঁচে নেই।

আপনি তাহলে একা? তবে রিকুকে ডিভোর্স করলেন কেন?

রিকু নামটা বেশ সুন্দর।

আপনার সম্পর্কে আমার আরও কিছু জানার আছে।

লোকেনের সঙ্গে এই বাড়ির মালির তেমন ভাব হয়নি আজও। মালি তাকে খুব ভালো চোখে দেখে না। সে আসায় মালি একটু বিরক্ত। বিশেষ কথা বলে না, তবে হাবেভাবে বুঝিয়ে দেয়। রামভুজ নামে একজন লোক বাড়িটা সস্তায় কিনতে চায় বলে শুনেছে লোকেন। মালি নাগেশ তাহলে কিছু দালালি পাবে। কিন্তু লোকেন আসায় ব্যাপারটা থেমে আছে।

লোকেন কোথাও যায় না। বাড়ির মধ্যে অনেক ঘর। সে ঘর থেকে ঘরে ঘুরে ঘুরে সময় কাটিয়ে দেয়। আর বাগানে যায়, রোদ উঠলে।

নাগেশ ছোটখাটো, খেঁকুড়ে চেহারার লোক। বয়স পঁয়তাল্লিশের এপাশ-ওপাশ। ফটকের পাশের আউট হাউসে সে থাকে। তার একটা ঘোমটা-ঢাকা বউ আছে, আর দুটো দশ-বারো বছরের মেয়ে আর একটা হামা-টানা ছেলে। তারা ওই আউট হাউসেই থাকে, ভিতরবাড়ির দিকে বড়ো একটা আসে না। তবে ঘোমটা-টানা বউটা রোজ ঘরদোর ঝাঁট দিয়ে যায়। তার সঙ্গে কখনও কথা হয়নি লোকেনের।

নাগেশ কেমন লোক তা লোকেন জানে না বটে, কিন্তু গাছপালার খুব যত্ন করে। শীতকালে গ্যাঁদা ছাড়াও ক্রিসেনথিমাম বা পপি ফোটে। আর কিছু ফুল আছে যা লোকেন চেনে না। সকালে বিকেলে দুপুরে নাগেশকে সে সর্বদাই বাগানের কোথাও-না-কোথাও কাজ করতে দেখতে পায়।

লোকেন আকস্মিকভাবেই আবিষ্কার করেছিল, এই বাগানের পিছন দিকে দুটো গাছ আছে, যারা পরস্পরের সঙ্গে কথা বলে। আর সব গাছ বোবা হলেও এই দুটি গাছ তা নয়। একটি মাদার, অন্যটি শিমুল। গাছ ছেলে বা মেয়ে হয় না। সব গাছই একই সঙ্গে পুরুষ ও মহিলা গাছ। এইটে খুব অদ্ভুত লাগে লোকেনের। এই একই দেহে নারী ও পুরুষ হওয়াটা।

ফলে শিমুল ও মাদার গাছ দুটো পরস্পরের সঙ্গে প্রেমের কথা বলে না। যেমন, প্রথম দিন খুব অবাক হয়ে লোকেন শুনেছিল, মাদার গাছটা বলছে, বড্ড পোকা লেগেছে গায়ে, বুঝলি? চুলকোয়।

শিমুল বলল, পোকামাকড়ের অভাব কি? সারা দিন গায়ে বাইছে। গেলোবার তো আমার ঘা হয়েছিল। বর্ষাকালে খুব বৃষ্টি হল তো, ঘা ধুয়ে ধুয়ে সেরে গেল। ওই যে, পাগলটা আসছে।

ও কি সত্যি পাগল? না কি ভাবের ক্ষ্যাপা?

কে জানে কী! ওদের আবার দুটো দল আছে তো। মেয়ে আর ছেলে। কোনো মেয়ে দাগা দিয়েছে দেখ গে।

আমাদের বাপু ওসব নেই। বেশ আছি। শুধু দা-কুড়ুলকে যা ভয়।

যা বলেছ। তা তোমার কত বয়স হল বলো তো?

তা পঞ্চাশ পেরোলাম গত জষ্টিতে।

আমি তো অর্ধেক। পঁচিশ চলছে। দেখ, পাগলটা কেমন অবাক চোখে চেয়ে আছে আমার দিকে! ও মা, আমরা যে কথা কইছি তা বুঝতে পেরেছে নাকি?

সর্বনাশ! চুপ করো তাহলে। বুঝতে পেরে যাবে।

তারপর একদিন এরকমই আচমকা শুনতে পেল, শিমুল বলছে, ঝড় হবে গো! পশ্চিমের বাতাস কেমন ঝাপটা মারছে দেখো। আমার পাতা সব উলটো দিকে মুড়িয়ে দিচ্ছে। লক্ষণ ভালো নয়।

হ্যাঁ, ছাবিবশ বছর আগে এরকম ঝড়েই তোমার দুটো ডাল ভাঙল। আমিও উপড়ে পড়তুম। শেকড়ে খুব টানও লেগেছিল। কিন্তু শেষ অবধি টলোমলো হয়েও সামলে যাই। পাতি বকগুলো মরেছিল অনেক। পাগলটা দেখো, আজও আমাদের কথা শুনছে।

শুনুক গে। পাগলদের কী হয় জানো তো, এদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় খুব সজাগ হয়, তাই ওরা এমন অনেক কিছু টের পায়, যা অন্যেরা পায় না।

এর মনে দুঃখটা কীসের?

আমার মনে হয়, এই মানুষটার মধ্যে দুটো মানুষ ঢুকে বসে আছে। তাই ওর যত গণ্ডগোল।

লোকটা কেমন?

সেদিন সন্ধেবেলা ভীষণ ঝড় হল। এত ঝড় এত সাঙঘাতিক ঝড় বহুকাল দেখেনি লোকেন। চারদিক লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গেল। ঝড়ে বহু পাখি মরে পড়েছিল গাছতলায়। ভাঙা ডাল, পাখির বাসা, কুসি কুসি ছানা। ঝড়ের পর শিলাবৃষ্টিতে বাগানের বহু গাছ শুয়ে পড়েছিল মাটিতে। সেগুলো আর বাঁচেনি। সকালে নাগেশকে দেখেছিল ভূপতিত গাছগুলির শবদেহের পাশে পাশে উদাস মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নাগেশকে সে ওইদিন খুব শ্রদ্ধা করেছিল মনে মনে।

মাঝে মাঝে বুকুনবাবু আসেন।

আচ্ছা, আপনার রান্না-বান্না কে করে বলুন তো?

আমিই করে নিই।

আপনি কি রাঁধতে জানেন?

না।

তা হলে?

চাল আর ডাল অনেকটা জল দিয়ে স্টোভে বসিয়ে দিই। যখন একটু পোড়া-পোড়া গন্ধ ছাড়ে তখন নামিয়ে নিই।

রোজ পোড়া খিচুড়ি খান?

খাওয়া যায়।

তার চেয়ে নাগেশকে বলুন না, কিছু পয়সা দিলে ওর বউ রেঁধে দেবে।

হয়তো দেবে না। ওরা আমাকে পছন্দ করে না।

পয়সা দিলে পছন্দ করবে না কেন? আর রোজ পোড়া খিচুরি খেয়ে কি থাকতে পারে কেউ? মাঝেমধ্যে একটু মাছটাছও তো খেতে ইচ্ছে করে, তাই না?

মাছের কথা খুব ভাবল লোকেন। কিন্তু খেতে ইচ্ছে করে কি না তা বুঝতে পারল না। বলল, খিদে পেলে আমি যা পাই খেয়ে নিই। কোনো কষ্ট হয় না।

দাঁড়ান, আমি নাগেশের বউয়ের সঙ্গে আজই কথা বলে যাব।

পরদিনই বুকুনবাবু এসে বললেন, শুনুন, বউটা তো রাজি। নাগেশও কোনো আপত্তি করল না। চাল ডাল সবজির দাম আর মাসে দেড়শো টাকা দিলে দু'বেলা রান্না করে দিয়ে যাবে। সতুবাবুর ভাইপো, আপনি, আপনার প্রতি আমাদেরও তো একটা কর্তব্য আছে। আমার অত টাকা নেই।

তার মানে?

মায়ের গয়না বিক্রি করে আমার চলে। গয়নাও ফুরিয়ে এসেছে। আমার আর চলবে না

সর্বনাশ! তা হলে এরপর কী করবেন?

আর চলবে না।

কিন্তু উপায়?

উপায় নেই।

আপনি তো অদ্ভুত মশাই। মালকড়ি নেই, তবু নিশ্চিন্তে আছেন।

আমি এসব চিন্তা করি না।

আপনি তো ভাবনায় ফেললেন মশাই।

লোকেন চুপ করে রইল।

লোকেন জানে, একটা বাক্স, একটা বই আর একটা ডায়েরির মধ্যে সব প্রশ্নের জবাব আছে। সব সমস্যার সমাধান। কিন্তু প্রশ্নের জবাব, সমস্যার সমাধান কোনোটাই সে চায় না। কিছু অজানা, রহস্যময় ব্যাপার থেকে যায়। ওই তিনটে জিনিস সে সর্বদা নজরে

নজরে রাখে। কারুকাজ করা ছ'ইঞ্চি লম্বা এবং চার ইঞ্চি চওড়া পেতলের ভারী বাক্সটা তাকে দিয়ে মা বলেছিল, যত্ন করে রাখিস। আর কিছু বলেনি। বইটা সে পেয়ে গিয়েছিল একটা পুরনো বইয়ের দোকানে। সেলোটেপ দিয়ে দুটো মলাট আটকানো ছিল বলে বইটা খোলা যায়নি। না দেখে বইটা হাতে নিয়েই তার মন বলে উঠেছিল, এই তো পেয়ে গেলে সাত রাজার ধন এক মাণিক্য। মাত্র তিনটে টাকা নিয়েছিল দোকানদার। মলাটে কোনো নাম ছিল না, শুধু হলুদ রঙের শূন্য প্রচ্ছদ। ওই অবস্থাতেই আজও আছে। ডায়েরিটা সে কুড়িয়ে পায় ট্রেনে, এক রাতে। মেন লাইন বর্ধমান লোকালে, রাত বারোটার কাছাকাছি, এক শীতকালে ফাঁকা কামরায় বেঞ্চের ওপর পড়েছিল। না, পড়েছিল বললে ভুল হবে। আসলে তার জন্যই রাখা হয়েছিল ওখানে, ওরকমভাবে। তার জন্যই অপেক্ষা করছিল। কতদিন খুলে দেখতে গিয়ে বুকটা ধক করে উঠেছে। না দেখাই ভালো, মনে হয়েছে। কালো, মোটা, ভারী ডায়েরিটার মলাটে এমবস করা নাইনটিন সেভেনটি টু।

আপনিই তো লোকেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি?

হ্যাঁ।

রেজিস্ট্রি চিঠি আছে। সই করুন।

সই করে খামটা নিল লোকেন।

পিওন বুড়ো মানুষ। এত বয়সে সরকারি চাকরিতে বহাল থাকার কথা নয়। চিঠি দিয়ে লোকটা তার দিকে চেয়ে দেখল একটু।

এ-বাড়িতে আপনি একাই থাকেন?

হ্যাঁ।

এ-বাড়িতে ভূত আছে, দেখতে পান না?

না। আমি ভূত দেখিনি।

কিন্তু আছে। শিউকুমার মিশ্রজির বড়ো মেয়ে মংলু ফাঁসি দিয়ে মরেছিল এ-বাড়িতে। তার পরেই শিউকুমারজি বাড়ি বিক্রি করে যশিডি ছেড়ে চলে যান। মংলু আছে। আপনি

দেখেননি? আশ্চর্য!

চিঠিটা এসেছে ঘোষ, চ্যাটার্জি অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস-এর পক্ষ থেকে। কমপিউটার প্রিন্টআউট। প্রাতিষ্ঠানিক বয়ানে প্রাণহীন চিঠিটার একটা বক্তব্য আছে। কিন্তু বক্তব্যটা লোকেনের মগজে বা মনে কোথাও ঢুকতে পারল না। চিঠি এবং সে পরস্পরের দিকে কিছুক্ষণ অর্থহীন চেয়ে রইল শুধু। আবছাভাবে মনে পড়ছে, যেন বিগত জন্মে সে একটা কোম্পানিতে কাজ করত। সেটা বোধহয় এই কোম্পানিই। কী কাজ তা স্মৃতির ধূসরতায় হারিয়ে গেছে।

নাগেশের বউ ঘর ঝাঁট দিতে এসেছে। নাগেশ যেমন রোগা, বউটা তেমনই হৃষ্টপুষ্ট। ছাপা লাল রঙের একটা শাড়ি পরা, মুখখানা মস্ত ঘোমটায় ঢাকা। কখনও এর মুখ দেখেনি লোকেন। কথাও কয় না বউটা। লম্বা ফুলঝাড়ু দিয়ে খুব যত্ন করে ঘর ঝাড়ু দেয় সে। তার মাংসল পেটের ভাঁজ দেখে মুখ ফিরিয়ে নেয় লোকেন। চুরি করে দেখতে নেই। দেখার মতো কিছু নয়ও।

নাগেশের বউ উবু হয়ে বসে খাটের তলার ধুলো বের করতে করতে হঠাৎ চাপা তীব্র স্বরে লোকেনকে চমকে দিয়ে বলল, আমি কি তোমার খাবারে বিষ মিশিয়ে দিতাম?

বিষ! বিষের কথা তো আমার মনে হয়নি!

তুমি বাড়িটা ছাড়ছ না কেন? রামডুজ বাড়িটা কিনলে আমরা কিছু টাকা পাব। টাকা পেলে আমাদের আরও তিনটে বাচ্চা হবে।

তোমাদের তো তিনটে বাচ্চা আছে।

জ্যোতিষী বলেছে আমাদের আরও তিনটে হবে। ছয় নম্বরটা হবে কিষেণজির অবতার। সে লাখো লাখো টাকা কামাবে। আমরা তখন নতুন মহল্লায় চলে যাব, তিনটে ভঁইষ পুষব, দোতলা বাড়ি হবে। বিঘে বিঘে ক্ষেত হবে। মকাই হবে, গেঁহু হবে...

ঝক করে একটা দেহাতি বাড়ি চোখে ভেসে উঠল লোকেনের। লাল দেওয়ালে শুকনো ঘুঁটের ছাপ, উঠোনে নিমের ছায়ায় চারপাই, উদুখলের শব্দ আসছে ভিতরবাড়ি থেকে, কালো কালো ধুলোমাখা বাচ্চারা খেলছে উঠোনে।

সে আনমনে বলল, চলে যাব, ভেবো না।

মা নেই, বাবা নেই, কেউ নেই, তাই তার যাওয়া সহজ হয়ে গেছে।

ভিতরের বারান্দায় পড়ন্ত দুপুরে জাফরির ছায়ায় বসে মেয়েটি বই পড়ছিল। বাঁ হাতে একটা ডাঁশা পেয়ারা। ডান হাতে বই। মেঝেতে একটা মাদুরে বসা, দেওয়ালে ঠেস, কোলে একটা ছোট্ট বালিশ, বালিশে রাখা হাত, হাতে খোলা বই। পিঠময় এলো চুল। পরনে ফলসা রঙের শাড়ি, ডানদিকে আঁচল।

একটুও অবাক হল না লোকেন। ডাকপিওন তো বলেই গিয়েছিল, শিউকুমারের বড়ো মেয়ে মংলু এ-বাড়ি ছেড়ে যায়নি।

লোকেন গলা খাঁকারি দিল। মেয়েটা ফিরেও তাকাল না। বই পড়তে লাগল। হঠাৎ বুকটা ধকধক করে উঠল লোকেনের। ওই তো তার হলুদ বইটা। যে বইটার কোনো নাম নেই। ওই বইয়ের মধ্যেই তো রয়ে গেছে।

সে রুদ্ধশ্বাসে বলল, ওটা আপনি কী করছেন? ও বই পড়তে নেই।

মেয়েটা মুখ না তুলেই বলল, বইটা কতকাল ধরে খুঁজছি।

কেন খুঁজছেন?

এই বইতেই তো আমার সব কথা আছে।

লোকেন কী বলবে ভেবে পেল না। চুপচাপ ঘরে ফিরে এল।

ভোরবেলা পুলিশটা এল, বলটা দিয়ে দিন প্লিজ।

বলটা আমি খুঁজে পাইনি।

আপনি লুকিয়ে রেখেছেন।

আপনার ওই বয়সে আমারও কত কী হারিয়ে গেছে। কিন্তু খুঁজে পাই না।

কিন্তু বলটা যে না পেলেই নয়।

আমাকে আর একটু সময় দিন। হয়তো মংলু জানে। কিংবা নাগেশ।

আমি কিন্তু তদন্তে এসেছি। রিকুর সঙ্গে আপনার ডিভোর্সের ব্যাপারটা আমাকে জানতে হবে।

আমাকে এখানে কেউ চাইছে না। আমি তা বুঝতে পেরেছি। তাই আমি চলে যাব।

রিকু নামে কাউকে আপনি চেনেন না?

না চিনলেই বা কি! তাকে আমার ভালোবাসা জানিয়ে দেবেন।

জানিয়ে দেবেন আমি চলে যাচ্ছি।

কোথায় যাচ্ছেন?

ঠিক করিনি।

এক দুপুরে ফের পিওনটা এল।

রেজিস্ট্রি চিঠি। সই করুন।

লোকেন সই করল।

এখনও মংলুকে দেখেননি! আপনি সাহসী লোক।

দেখেছি। কথাও হয়েছে।

বলেন কি! ভয় লাগল না?

ভয়! ভয় পাওয়া উচিত ছিল, না?

আপনার ভূতের ভয় নেই?

ভাবতে হবে। ভেবে বলব।

চিঠিটা খুলল লোকেন। সেই ঘোষ, চ্যাটার্জি অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটসের চিঠি। কী চায় এরা? কিছুই বুঝতে পারে না সে।

চিঠিটা পরদিন সকালেও বারান্দার টেবিলে পড়ে ছিল। বুকুনবাবু এসে গল্প করতে করতে চিঠিটা তুলে নিলেন, অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার নাকি লোকেনবাবু?

না না। আমি ওদের চিনি না।

চেনেন না? সে কী? এ তো দেখছি লিখেছে, লোকেন চ্যাটার্জি, অ্যাসোসিয়েট ডিরেকটর! আপনি নন?

আমি! কি জানি!

লোকেন ফাঁকা বাড়িটায় ঘুরে বেড়ায়, বাগানে ঘুরে বেড়ায়। কী খোঁজে তা বুঝতে পারে না। এ-বাড়ি ছেড়ে তাকে চলে যেতে হবে, এটাও সে টের পাচ্ছে। কোথায় যাবে তা বুঝতে পারছে না।

একদিন সকালে ফটকের বাইরে একটা সাদা গাড়ি এসে থামল। সঙ্গে সঙ্গে বাড়িটার ভিতরে যেন একটা নীরব ঘন্টাধবনি লোকেনকে সতর্ক করতে শুরু করে দিল। পাখিরা ডাকতে লাগল খুব। একটা উদাসী হাওয়া হেঁটে গেল ঘরের ভিতর দিয়ে। লোকেন খোলা দরজা দিয়ে সাদা গাড়িটার দিকে চেয়ে রইল। কেউ নামল না। কেউ ডাকল না।

লোকেন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ বুজল। গাড়ি অপেক্ষা করছে। লোকেন চোখ খুলল না। গাড়ি অপেক্ষা করতে লাগল।

খোলস

স্কচের বোতলটা খুলতেই একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ বেরিয়ে এল। তারপর যেন নিজেকে একটু সামলে নিয়ে একটা ভারী মোটা গলা বলে উঠল, হাই! গুড ইভনিং।

বোতলটার খোলা গোল মুখটার দিকে স্থির চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বিষাণ বলল, ইভনিং! কিন্তু দীর্ঘশ্বাসটা কেন?

দীর্ঘশ্বাস! ওঃ, নো নো! দীর্ঘশ্বাস কেন হবে। জাস্ট ইগনোর ইট।

দীর্ঘশ্বাসটাও কিন্তু একটা এক্সপ্রেশন। আমার জন্য দুঃখ হচ্ছে?

আরে নাঃ! সন্ধের পর দুনিয়ার লক্ষ লক্ষ লোক হুইস্কি নিয়ে বসে, দুঃখ কীসের? আনন্দ করার জন্যই তো হুইস্কি!

কিন্তু আমার তো সবসময়ে হুইস্কি খেলে আনন্দ হয় না। কখনও কখনও ভারি দুঃখও হয়। ভীষণ দুঃখ, আই ফিল লোনলি।

তাহলে মালে গণ্ডগোল আছে। ব্র্যান্ড চেক করে নেবেন।

দোষটা বোধহয় ব্র্যান্ডের নয়। দুঃখও একটা এনজয়মেন্ট।

তাহলে তো ঠিকই আছে। দুঃখেও যদি আনন্দ হয় তো বাক আপ। সঙ্গে একটু শুয়োরের নাড় খেয়ে দেখুন, ব্যাপারটা জমে যাবে।

শুয়োরের নাড়?

সসেজের কথা বলছিলাম স্যার। ফ্রিজে আছে।

ফ্রিজটা নিঃঝুম হয়ে ছিল। ভিতরের ঠাণ্ডা আরামে যেন কুঁকড়ে বসে আছে। চেতনা নেই। বিষাণ উঠে গিয়ে ফ্রিজের পাল্লাটা খুলতেই ভিতর থেকে একটা বিরক্তির শব্দ বেরিয়ে

এল, আঃ, জ্বালালে। মাঝরাতে ঘুমটা ভাঙল...

বিষাণ বলল, সরি। একটু সসেজটা নেব।

সরি স্যার, কাঁচা ঘুমটা ভাঙায় বেফাঁস কমেন্ট করে ফেলেছি। নিন স্যার, আপনারই জিনিস। সসেজের পাত্রটা বের করে বিষাণ বল, গুড নাইট।

থ্যাঙ্ক ইউ স্যার, অলওয়েজ ওয়েল কাম... দরজাটা বন্ধ করে বিষাণ শুধু বলল, শালা।

চলন্ত টিভি থেকে একটা হাই তোলার শব্দ এল। ঘোষককে দেখা যাছে। সাউন্ড লেভেল মিনিমামে রাখা হয়েছে বলে ঘোষকের কথা শোনা যাচ্ছে না। তবে ছবি দেখা যাচ্ছে। হাই-এর শব্দটা কিন্তু বেশ স্পষ্ট কানে এল বিষাণের।

ঠাণ্ডা সসেজটা কামড়ে এক চুমুক হুইস্কি খেল সে। তারপর টিভিটার দিকে চেয়ে নিউজ চ্যানেলের অদ্ভুত সব স্পষ্ট কভারেজ একটুও না বুঝে দেখতে লাগল। কোথাকার ছবি, কীসের ছবি তা সে বুঝতে পারছিল না বটে, তবে এটা বোঝা যাচ্ছে যে, পৃথিবীতে কিছু ঘটনা ঘটছে। ঘটেই চলেছে।

যে-লোকটা অ্যাঙ্করিং করছিল সে হঠাৎ বিষাণের দিকে চেয়ে বলল, আর কতক্ষণ চলবে?

কী?

এই বোকা বাক্সের তামাশা? এই ভারচুয়াল রিয়ালিটি?

চলুক না, ক্ষতি কি?

আপনি তো ইমপ্রেসড হচ্ছেন না মশাই।

আমার হাত থেকে রেহাই চাই?

পেলে মন্দ হয় না। অলস লোকের চিত্তবিনোদনই আমাদের কাজ। কিন্তু আপনার চিত্ত বিনোদিত হচ্ছে না। বন্ধ করে দিলেই তো হয়। আই সে টেক এ বিট অফ রেস্ট।

ওকে। বলে বিষাণ রিমোটটা তুলল।

টিভি-টা অফ হয়ে যাওয়ার পর অ্যাংকারের গলা পাওয়া গেল, গুডনাইট, স্লিপ টাইট। থ্যাঙ্ক ইউ।

হুইস্কিটা জলের মতো লাগছে। সসেজ যেন রবার। তবু চিবোতে চিবোতে দেয়ালে টাঙানো আয়নাটার সামনে গিয়ে দাঁড়ায় বিষাণ। এবং অবাক হয়ে দেখে, আয়নায় তার কোনো প্রতিবিম্ব নেই। শুধু আলোকিত ঘরখানা দেখা যাচ্ছে।

বিষাণ রেগে গিয়ে চিৎকার করে উঠল, আরে! আমার রিফলেকশন কোথায়? অ্যাঁ! কোথায় আমার রিফলেকশন?

আছে বাবা, আছে! বলতে বলতে আয়নার ভিতরে একজন লম্বাপানা লোক খালি গায়ে পায়জামার দড়ি বাঁধতে বাঁধতে এসে দাঁড়ায়।

বিষাণ ধমক দিয়ে বলল, কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

লোকটা একটু অপ্রস্তুত হাসি হেসে বলল, আই ওয়াজ হ্যাভিং সেক্স উইথ ইত্তর ওয়াইফ।

অ্যাঁ! উইথ মাই ওয়াইফ!

থুড়ি থুড়ি। ভুল হয়ে গেছে। তোমার বউয়ের রিফলেকশনের সঙ্গে।

মিথ্যে কথা! আমার বউয়ের সঙ্গেই তুমি...

আহা, তাতেই বা দোষটা কী হল? তুমি কি তোমার বউয়ের কোনো খোঁজ রাখো? জান এখন সে কোথায়? কিংবা তার মুখশ্রী কি তোমার মনে আছে?

সেসব কি তোমার কাছে শিখতে হবে নাকি?

বল তো সে এখন কোথায়?

আছে কোথাও। এটা বিশাল বড় ডুপ্লেক্স ফ্ল্যাট, আটটা বেডরুম, কে কখন কোথায় থাকে তার কি কিছু ঠিক আছে?

কতদিন তোমাদের দেখা হয়নি?

খুব বেশি দিন নিশ্চয়ই নয়। দিন পনেরো আগেই দেখা হয়েছে। আমরা কথাও বলেছি।

কিন্তু খবর হল, গত পরশু দিনও তোমার সঙ্গে তোমার বউয়ের দেখা হয়েছে, কিন্তু তুমি তাকে চিনতে পারোনি।

মিথ্যে কথা! কোথায় দেখা হয়েছিল?

সিঁড়িতে। সেদিন লিফট খারাপ থাকায় তুমি হেঁটে উঠছিলে সন্ধেবেলায়, তোমার বউ নামছিল।

ওঃ! হতে পারে আমি তখন অন্যমনস্ক ছিলাম, লক্ষ করিনি।

বাজে বোকো না। সুন্দরী মেয়েদের লক্ষ করতে তোমার কখনো ভুল হয় না। তুমি হাঁ করেই তোমার বউকে দেখেছিলে। ড্যাব ড্যাব করে।

বাজে বোকো না। তুমি অত্যন্ত টেঁটিয়া লোক।

লোকে তোমাকেও তাই বলে।

অ্যাই! তোমার লজ্জা করে না? দেখছ আমি গায়ে পাঞ্জাবি পরে আছি। তুমি আমার রিকলেকশন হয়েও কি করে খালি গায়ে দাঁড়িয়ে আছ?

সরি, সরি, এক মিনিট। ... এই যে দেখ, পাঞ্জাবি পরে এসেছি।

তোমার হাতে মদের গেলাস কোথায়?

তাড়াহুড়োয় ভুল হয়ে গেছে।... এই যে, এবার দেখ। তোমার ডান হাতে মদের গেলাস, আমার বাঁ হাতে। এবার ঠিক আছে?

গো টু হেল।

থ্যাঙ্ক ইউ। আই লাভ হেল।

বিষাণ আয়নার কাছ থেকে সরে এল। বিশাল লিভিংরুম পেরিয়ে সে তার আলো-আঁধারি শোওয়ার ঘরটায় এসে ঢুকল। বড়ো বড়ো কাচের জানালায় মোটা পর্দা ঝুলছে। ফুটলাইটের আলোতে ঘরখানা খুব সামান্য আলোকিত। মাঝখানে বিশাল খাট। বিছানাকে আজকাল ভয় পায় বিষাণ, ভয় পায় রাত্রিকেও। এক একদিন যথেষ্ট হুইস্কি খেলেও ঘুম আসতে চায় না।

ঘরে ঢুকে পাঞ্জাবি ছেড়ে একধারে ছুঁড়ে ফেলে দিল সে। তারপর স্বগতোক্তি করল, আজ ঘুম আসবে কি?

ভারি মিষ্টি একটি মেয়েলি কণ্ঠস্বর বলে উঠল, আসছি সোনা, একটু বাদেই আসছি। তুমি শুয়ে পড়, আমি লেখাগুলো শেষ করেই আসব তোমার কাছে। সারা রাত তোমাকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকব।

লিখছ! কী লিখছ তুমি?

তোমার জন্য কয়েকটা স্বপ্ন লিখছি আমি।

কীরকম স্বপ্ন, ভয়ের না আনন্দের?

তোমাকে সারপ্রাইজ দেব, তাই বলব না।

আমি স্বপ্ন দেখতে চাই না। নিঃসাড়ে ঘুমোতে চাই শুধু।

তাই কি হয়! কত কষ্ট করে লিখছি।

স্বপ্ন থাক, শুধু তুমিই এসো ঘুম।

স্বপ্ন হল আমার গয়না, আমার রূপটান। তুমি শুয়ে পড়ো লক্ষ্মীটি, শুয়ে শুয়ে হিজিবিজি ভাবো, দেখবে কখন নিঃশব্দে আমি তোমাকে বুকে টেনে নিয়েছি, টেরও পাবে না।

প্রায়ান্ধকার ঘরে একটু দাঁড়িয়ে রইল অনিশ্চিত বিষাণ। বলল, রাত্রিটা নিয়েই আমার যত প্রবলেম।

একটা গমগমে পুরুষ-গলা বলে উঠল, আসলে আমার কালো পোশাকটার জন্যই অনেকে ওরকম ভাবে। পোশাকটা কালো হলেও তার মধ্যে মজা কিছু কম নেই।

বিষাণ বিছানায় নিজেকে পেতে ছিল। যদি অতর্কিতে গোপন প্রেমিকার মতো তার ঘুম আসে।

মোবাইল ফোনটার কথা খেয়ালই ছিল না বিষাণের। ছুঁড়ে দেওয়া পাঞ্জাবির বাঁ পকেটে ছিল। বাচ্চা একটা ছেলের হাসির শব্দ হচ্ছে। ওটা তার মোবাইলের সেট করা রিংটোন।

বিষাণ উঠল। কার্পেটের ওপর পড়ে-থাকা পাঞ্জাবিটা তুলে মোবাইলটা বের করে কানে চেপে ধরে ফের শুয়ে পড়ল।

আমি স্বপ্না!

স্বপ্না! কে স্বপ্না?

তুমি কি খুব বেশি মাতাল হয়ে গেছ? আমি স্বপ্না, তোমার বিয়ে করা বউ।

গড! আসলে আমার একটু তন্দ্রা এসে গিয়েছিল বোধহয়।

তন্দ্রা! তুমি এখন কোথায়?

ফ্ল্যাটে, সাত তলায়।

সরি, ঘুম ভাঙালাম।

তুমি কোথায়?

এই ফ্ল্যাটেই। ছয় তলায়। জয় তোমাকে বার্থ-ডে গ্রিটিংস পাঠিয়েছে, এস এম এস করে পেয়েছো?

না তো!

পাঁচ ছটা মোবাইল থাকলে এরকমই হওয়ার কথা। যাক গে, আমাকে জানিয়েছে, যেন তুমি নাইন ফোর থ্রি থ্রি এইট টু সিক্স টু ফোর ফাইভ নম্বরটা চেক করে দেখ।

বার্থ ডে! বার্থ ডে-টা কবে?

আজ। ইউ আর ফর্টি ফাইভ টুডে।

তাই বুঝি!

কে গ্রিটিংস পাঠিয়েছে বললে?

জয়, তোমার ছেলে। জয় যে দুন মিলিটারি অ্যাকাডেমিতে পড়ছে তা আশা করি ভুলে যাওনি।

আরে না! আই মিসড দি নেম ওভার টেলিফোন। আচ্ছা আমি চেক করে নেবো।

তোমার ইচ্ছে।

ও ঠিক আছে তো!

ঠিক আছে।

গুড নাইট।

নাইট।

ঘুমের গায়ে একটা কোলনের গন্ধ কি? ভারি মোহময়। ভীষণ নরম। ঘুম বিছানার বেড়ালের মতো নরম শরীরে গড়িয়ে যাচ্ছে। দু-হাতে ঘুমকে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করে বিষাণ। ধরা দিয়েও দিচ্ছে না। এই সময়টায়, ঘুম ও জাগরণের চৌকাঠ বড়ো সংকটের সময়। জেগে থাকাটাই ধীরে ধীরে ডাইল্যুট হয়ে যায় স্বপ্নে, ঘুমে। এই সময়টায় দোল খায় শরীর, চমকে ওঠে। তারপর ঘুমের কুয়োর মধ্যে পড়ে-যাওয়া।

সেরকমই হল।

বালিশটা ফিসফিস করে তার কানে কানে বলল,

হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ স্যার।

ধন্যবাদ, নাউ শাট আপ।

বেড-সাইড রিডিং ল্যাম্পটা নেবানো ছিল। হঠাৎ সেটা কয়েকবার জ্বলে উঠে নিবে যেতে লাগল। বলতে লাগল, হ্যাপি বার্থ ডে ... হ্যাপি বার্থ ডে ...

তারপর একটা মৃদু কোলাহল সারা ঘর জুড়ে জেগে উঠতে লাগল। আমলারি, চেয়ার, টেবিল, ওয়ার্ডরোব সব জায়গা থেকেই হ্যাপি বার্থ ডে... শোনা যেতে লাগল।

বিরক্ত বিষাণ পেল্লায় একটা ধমক ছাড়ল, চোপরও বেয়াদব!

ঘরটা চুপ করে গেল।

ঘুমের মিষ্টি মেয়েলি গলাটা ভারি করুণ স্বরে বলল, তুমি কি খুব রেগে গেছ সোনা? অত রেগে গেলে আমি কী করে তোমার কাছে যাবো বলো তো! আমার যে ভয়-ভয় করছে!

প্লিজ কাম মাই লাভ। প্লিজ ...

শুয়ে শুয়ে একটু হিজিবিজি ভাবতে থাকো তো। মাথাটা একটু ঠান্ডা হোক।

মুখোমুখি দেয়ালে মোনালিজার একটা বড়ো প্রিন্ট সুন্দর ফ্রেমে বাঁধিয়ে শখ করে টাঙিয়েছিল স্বপ্না। একদা, যখন এই মাস্টার বেডরুমে তারা একসঙ্গে থাকত। এখন স্বপ্নার আলাদা এস্টাব্লিশমেন্ট ডুপ্লেক্স ফ্ল্যাটটার নীচের তলায়। মোনা লিজার ছবিটা সে কেন নিয়ে যায়নি কে জানে।

মোনা লিজা তাকে দেখছিল। চোখ দুটো ফুটলাইটের আলোয় কেন এত ঝলমল করছে কে জানে। হাসিটাও যেন একটু চওড়া। এতটাই যে, ওর সুন্দর দু'পাটি মিহিন দাঁত দেখা যাচ্ছে।

কোলের ওপর থেকে দুটো হাত তুলে ফ্রেমের ওপর রেখে ঝুঁকে তাকাল মোনা লিজা। ঠিক যেমন কোনো মেয়ে জানালায় হাত রেখে বাইরে নীচের দিকে তাকায়।

কতটা উঁচু বলো তো! নামতে পারব?

বেশি উঁচু নয়। পাঁচ ছয় ফুট হবে।

আমার যা জবরজং পোশাক, নামতে গিয়ে পোশাকে না পা জড়িয়ে যায়।

নামবার দরকারটা কী?

তেষ্টা পেয়েছে যে!

দাঁড়াও, জল দিচ্ছি।

জলের তেষ্টা নয়।

তবে?

বলছি বাপু, আগে নামতে দাও। নামাটা ডিফিকাল্ট হবে মনে হচ্ছে।

ওরকম জবরজং পোশাক পরো কেন?

পোশাকটাকে হ্যাটা করছ নাকি? মনে রেখো, এটা জগদ্বিখ্যাত পোশাক।

হলেই বা। আধুনিক পোশাক অনেক ভালো।

মানছি বাপু, কিন্তু আমার তো উপায় নেই। শো-গার্লরা কি নিজের ইচ্ছেমতো পোশাক পরতে পারে?

তুমি কি শো-গার্ল?

তা নয়তো কি বলো? চৌপর দিন লোকে প্যাট প্যাট করে চেয়ে চেয়ে আমাকে দেখছে, তিনশো পঁয়ষট্টি দিন।

ফ্রেমের চৌকাঠে উঠে পড়ল মোনা লিজা। মুখে একটু দুষ্টুমির হাসি। নীচের দিকে চেয়ে বলল, মুক খেয়ে নামছি কিন্তু। পড়ে গেলে একটু ধোরো আমাকে।

ঠিক আছে। নেমে পড়ো, বেশি উঁচু তো নয়।

মোনা লিজা তার বড়সড় ঘের-ওলা গাউন সমেত নেমে পড়ল।

হুইস্কিটা কোথায় রেখেছ?

তাই বলো। হুইস্কির তেষ্টা পেয়েছে তোমার!

ইস, কতক্ষণ ধরে গন্ধ পাচ্ছি আর প্রাণটা আঁকুপাঁকু করছে।

ফ্রিজে রেখেছি। খাও গিয়ে। কিন্তু বেশি গিলো না, আরও মোটা হয়ে যাবে। এমনিতেই তুমি বাপু বেশ থলথলে।

গুলি মারো। আমি বাপু ফ্যাট নিয়ে মাথা ঘামাই না। ভালো-মন্দ খেতে ভালোবাসি, মদ না খেলে শরীর ম্যাজ ম্যাজ করে।

তা চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। অথচ দুনিয়ার লোক তোমার জন্য কেন পাগল কে জানে। দেখতে তো তেমন কিছু নও।

অ্যাই! ভাল হবে না বলছি!

আমি আর্টিস্ট হলে কখনো তোমার মতো সাদামাটা আর গিন্নিবান্নি চেহারার মহিলার ছবি আঁকতে রাজি হতাম না। দা ভিঞ্চি তোমার প্রেমে পড়েছিল বলে এঁকেছিল।

ভ্যাট। প্রেমে পড়বে কি? লোকটা তো হোমো সেক্সুয়াল।

তাই যদি হবে, তাহলে মেয়েদের এত ছবি এঁকেছে কেন?

ও দিয়ে কিছু প্রমাণ হয় না। তবে বাপু, সত্যি কথা যদি বলতে হয় তো বলি, আমার ভিতরে সত্যিই কিন্তু রহস্য-টহস্য কিছু নেই। কেন যে মাথা-পাগলা লোকগুলো আমার ছবির দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকে আর পাতার পর পাতা মোনা লিজা এই, মোনা লিজা সেই, মোনা লিজার পেটে বাচ্চা আছে, মোনা লিজা আসলে মেয়েবেশী পুরুষ বলে নানা থিওরি আর বকুনি ঝেড়ে সকলের মাথা গরম করে কে জানে বাবা। আমি তো জানি আমি একজন আহ্লাদী, হালকা-পলকা মনের সাদামাটা মেয়ে। কেন যে আমাকে নিয়ে লোকের এত মাথা ব্যথা, আচ্ছা তোমার ফ্রিজে বোধহয় সসেজ আছে, না?

হ্যাঁ। বেশি সাঁটিও না। হাই ক্যালোরি।

হোক বাপু, আমি হুইস্কির সঙ্গে কিছু নোনতা না খেয়ে পারি না।

যাও বাপু, গেলো, কিন্তু আমি বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছি। এবং স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছি।

রিনরিনে মেয়েলি গলাটি বলে উঠল, না সোনা, তুমি এখনও ঘুমোওনি। যা দেখছো তা ভারচুয়াল রিয়ালিটি। তোমার মনের প্রক্ষেপ। ওই হারামজাদি খুব নটখটে মেয়েছেলে। তোমার মাথাটা গরম করে দিয়ে গেল। ওই দেখ, ঢক ঢক করে হুইস্কি গিলছে।

এই ফাঁকে তুমি চলে এসো। আমরা ঘুমিয়ে পড়ি!

রোসো বাপু রোসো। যতক্ষণ ওই মোনা লিজা মাগি জেগে আছে ততক্ষণ বিশ্বাস নেই। আমি পাহারা দিই। তুমি বরং তোমার আরও কিছু হিজিবিজি ভাবনা ভাবতে থাকো।

কীসের একটু সুঁই সুঁই শব্দ হচ্ছিল। ঠিক বুঝতে পারছিল না বিষাণ। শব্দটা খুব কাছেই হচ্ছে। সে গাড়ির ব্যাক সিটে বসে এপাশে ওপাশে তাকিয়ে দেখল। কিছু বুঝতে পারল না।

ড্রাইভার, চাকার হাওয়া বেরিয়ে যাচ্ছে নাকি?

তার ড্রাইভার নরেশ ফিরে তাকিয়ে গম্ভীর মুখে বলল, না স্যার।

তাহলে হাওয়া বেরোবার শব্দ হচ্ছে কেন?

হাওয়া বেরিয়ে যাচ্ছে বলেই শব্দ হচ্ছে।

তবে বলছ কেন যে চাকার হাওয়া বেরোচ্ছে না?

চাকার হাওয়া বেরোচ্ছে না স্যার।

তবে?

আপনার হাওয়া বেরিয়ে যাচ্ছে।

আমার হাওয়া! হাউ স্ট্রেঞ্জ! আমার হাওয়া কী করে বেরোবে?

শরীরে তো অনেক ফুটো স্যার, নাক, কান, গুহ্যদ্বার। কখনো কখনো তার কোনো একটা দিয়ে মানুষের হাওয়া বেরিয়ে যায়।

শাট আপ।

ও কে স্যার।

আরও কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল বিষাণ।

শব্দটা হয়েই যাচ্ছে। মৃদু কিন্তু অবধারিত। খুব ধীরে, অল্প অল্প করে কোথা থেকে একটা হাওয়া বেরোনোর শব্দ আসছেই।

গাড়ি থামাও। আই মাস্ট চেক।

নরেশ গাড়ি থামাতেই নেমে পড়ল বিষাণ। নেমে গাড়ির চারটে চাকাই ঘুরে ঘুরে দেখল সে। না, চাকা লিক করছে না। তাহলে? তাহলে?

ড্রাইভারের সিট থেকে নরেশ সকৌতুকে তাকিয়ে আছে তার দিকে। পিত্তি জ্বলে গেল বিষাণের। সে ধমক দিয়ে বলল, এই স্টুপিড, অমন হাঁ করে কী দেখছিস?

কে জানে কেন, নরেশ ভয় পেয়ে গাড়ি স্টার্ট দিয়ে, বিষাণকে ফেলে রেখেই চলে গেল।

এই! এই! বলে চিৎকার করে ছুটছিল বিষাণ। কিন্তু পেরে উঠল না। তার গা থেকে ধড়াস করে কী যেন একটা খুলে পড়ে গেল, ফুটপাথে। পিছনের লোকজন হইহই করে উঠল।

বিষাণ অবাক হয়ে পিছনে তাকিয়ে দেখল, ফুটপাথে একটা ফাটা প্রমাণ সাইজের মানুষের খোল পড়ে আছে। আর মানুষজন ছুটে আসছে সেটা দেখতে।

বিষাণ এগিয়ে যেতেই একজন মোট মতো লোক পানের পিক ফেলে বলল, এটা কি আপনার খোল নাকি মশাই?

বিষাণ খোলসটার দিকে চিন্তিতভাবে চেয়ে ছিল। হ্যাঁ, এটা তারই খোলস। কী করে যে পড়ে গেল গা থেকে।

একটা সবুজ জামা-পরা ছোকরা বলল, সাইকেলের দোকানে নিয়ে যান মশাই, সলিউশন মেরে সারিয়ে দেবে।

একজন বুড়ো মাথা নেড়ে বলল, আরে না। এটা নিতে হবে মোটর টায়ার সারানোর দোকানে। অনেকটা ফেটে গেছে।

পানখেকো লোকটা বিষাণের দিকে চেয়ে হেসে বলল, ওসব কথায় কান দেবেন না। খোলসটা নিয়ে আমার সঙ্গে আসুন। আমি ঠিক জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি আপনাকে, চলুন।

বিষাণ নিজের খোলসটা তুলে বাঁ কাঁধে চাদরের মতো ঝুলিয়ে নিয়ে বলল, কোথায় যাব?

আরে, এই তো সামনের মোড়টা থেকে বাঁ হাতে ঘুরলেই ভগবানদাস মুচির দোকান। এখন আর কেউ পৌঁছে না বটে, তবে বড়ো ভালো কারিগর। কাটা ছেঁড়া-জোড়ায় ওর কোনো জুড়ি নেই। এমন জুড়ে দেবে যে জোড়ের দাগ অবধি থাকবে না। আসুন আমার সঙ্গে।

মোড় ঘুরে একটা পুরনো বাড়ির সামনে এসে লোকটা যে জায়গাটা দেখিয়ে দিলে সেটা হল, পুরোনো বাড়ির রকের নীচে একটা গুহার মতো গর্ত। সেই গর্তে কতকালের অন্ধকার জমে আছে কে জানে। সামনে চামড়া, রবারের টুকরো, দস্তানা, ভাঙা পুতুল, পুরনো জুতো, কত কী ঝুলছে। আর তারই ভিতরে একটা খুব বুড়ো থুত্থুরে লোক কী যেন একটা সেলাই করে যাচ্ছে তার রোগা হাতে।

যান না, মশাই, সাহস করে চলে যান। পারলে ওই বুড়োই পারবে।

এরকম নোংরা, ঝুলকালো কোনো দোকানে কখনো যায়নি বিষাণ। দোকান নয়, যেন প্রাচীন এক গুহা। বুড়ো মানুষটা কি কানে শোনে? চোখে দেখে? বিশ্বাস তো হয় না।

দোকানের সামনে গিয়ে কাঁধের খোলসটা নামিয়ে নিচু হয়ে বিষাণ বলল, শুনছেন! এই খোলসটা সারিয়ে দিতে পারবেন?

লোকটা মুখ তুলে তাকাতেই কেমন যেন বিহ্বল হয়ে গেল বিষাণ। মুখখানায় যেন কোন সুদূর অতীতের প্রাচীন বলিরেখা। চামড়ার কুঞ্চনের মধ্যে যেন শত সহস্র বছরের ঋতু আবর্তন তার ছাপ রেখে গেছে। মাথায় সাদা চুল কতকাল ছাঁটেনি। গায়ে হাফুচ ময়লা একটা জামা। একবার তাকিয়েই মুখ নামিয়ে তার কাজ করে যেতে লাগল লোকটা।

শুনছেন?

লোকটা আর চোখ না তুলেই বলল, হাঁ হাঁ, শুনিয়েছি মালিক। খোলস সিলাই হবে তো?

পারবেন তো!

লোকটা তেমনি মাথা নিচু রেখেই বলল, হাঁ হাঁ, পারবে, পারবে। বইসুন, হাতের কাজটা করে লেই।

লোকটা তাকে বসতে বলছে? কিন্তু বসবে কোথায় বিষাণ? বসার তো কোনো ব্যবস্থাই রাখেনি লোকটা।

বুড়ো তেড়ছাভাবে তাকে একবার দেখে নিয়ে ফোকলা হেসে বলল, ইটের উপরে বইসুন মালিক। ওই যে, ইট।

লোকটার স্পর্ধা দেখে অবাক মানে বিষাণ। তাকে ইটের ওপর বসতে বলছে! অ্যা!

কতক্ষণ লাগবে?

লোকটা খোলটা তুলে নিয়ে উলটে পালটে একটু দেখে নিয়ে বল, ভিতরে হাওয়া কমজোরি হলে মাঝে মাঝে এইসন হোয়, হয়ে যাবে বাবু, বইসুন।

বিষাণ বসল না। গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

কিছুক্ষণ তার অন্তহীন সেলাই করে যেতে লাগল বুড়ো। তারপর মিহিন গলায় জিজ্ঞেস করল, সিলাই তো হোবে মালিক, কিন্তু ট্যাক্সিডার্মি করতে হবে তো! ভিতরে কী ভরবেন?

তার মানে! ওটা তো আমার খোলস!

হাঁ হাঁ, উ তো জরুর। বাত তো ঠিক আছে। লেকিন খোলের ভিতর কী ভরবেন মালিক? খড়বিচালি ভরতে পারেন, কাঠের গুঁড়া ভি ভরতে পারেন, মিট্টি ভি ভরতে পারেন।

বিষাণ রাগের গলায় বলে, আমার খোলসের মধ্যে ওসব ভুসিমাল ভরবো কেন?

লোকটা একমনে কাজ করতে করতে খুব দূরের গলায় বলে, ভুসিমাল ভরবেন না তো কী করবেন মালিক?

বিষাণ বিরক্ত হয়ে বলে, আহা, আমার খোলসের মধ্যে তো আমিই ঢুকব হে মুচিভাই। ভুসিমাল ভরবো কেন?

লোকটা যেন বহু দূর থেকে ভারি স্তিমিত স্বরে বলে, হাঁ হাঁ, কিউ নেহি? উতো সব বরাবর আছে মালিক। ভুসিমাল ভরলেও যা, আপনি ঘুমে গেলেও তা। সব তো বরাবর আছে মালিক।

বিষাণ রাগে যেন দেশলাই কাঠির মতো দপ করে জ্বলে উঠল। বলে কি বুড়োটা? সে আর ভুসিমাল কি এক হল? লোকটাকে কোটর থেকে টেনে এনে বারকয়েক ঝাঁকুনি দিতে খুব ইচ্ছে হচ্ছিল তার।

তার মনের ইচ্ছেটা টের পেয়েই যেন লোকটা একবার মুখ তুলে তার দিকে তাকাল। দুটো ব্যথাতুর চোখের আর্দ্র দৃষ্টি যেন তার সর্বাঙ্গে পালকের মতো স্পর্শ করে গেল।

কাম হয়ে যাবে মালিক। বইসুন।

বিষাণ খুব ধীরে প্রথমে হাঁটু গেড়ে, তারপর একখানা ইটের ওপর থ্যাবড়া হয়ে বসে পড়ল। নিজের খোলসটার দিকে চেয়ে কেন যে তার চোখে জল আসছিল কে জানে।

কিন্তু এখন তার কোনো তাড়াহুড়ো নেই আর। লোকটার কখন সময় হবে কে জানে। সে চুপ করে বসে অপেক্ষা করতে লাগল।

সুভাষিণী

আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন? না তো! আমি আপনাকে চিনতে পারছি না।

একদম না?

আমার কি আপনাকে চেনার কথা?

হ্যাঁ।

তাহলে চিনতে পারছি না কেন?

মানুষ যদি কিছু ভুলে যেতে চায়, তাহলে সে নিজের মস্তিষ্ক থেকে ওই অনভিপ্রেত স্মৃতি মুছে ফেলতে পারে।

তাই যদি হয় তাহলে কি এটাও সম্ভব যে, মানুষ তার কিছু প্রিয় ভুলে যাওয়া স্মৃতিকে ফের জাগিয়েও তুলতে পারে?

সেটা আমি জানি না। আমি সাইকিয়াট্রিস্ট নই।

নন?

না।

মানুষের মনের অনেক সমস্যা, সবটাই কি সাইকিয়াট্রিস্টরা জানে? মন বা স্মৃতি কোনোটাই মানুষের বশীভূত তো নয়। সাইকিয়াট্রিস্টেরও মানসিক সমস্যা হতে পারে।

সেসব আমার জানা নেই। আমি আপনাকে একটা কথা বলার জন্য এসেছি।

বলুন। কিন্তু তার আগে বলুন, আপনাকে আমি যদি চিনতামই তবে ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করছি কেন? আপনাকে ভুলতে চাইবার কি কোনো বিশেষ কারণ আছে?

হয়তো আছে।

আমি সম্প্রতি একটা লস অফ মেমরি থেকে ভুগছি। ডাক্তার বলেছে ইট ওয়াজ এ মেন্টাল শক। কী জানি, হতেও পারে। কিন্তু ভাইরাল অ্যাটাকে যেমন কমপিউটারের মেমরি উড়ে যায়, আমারও ঠিক সেরকমই কিছু হয়েছে। আপনি যদি একটু খুলে বলেন, তাহলে আমি আমার হারানো স্মৃতি ফিরিয়ে আনার একটা চেষ্টা করতে পারি। ইন ফ্যাক্ট, আমি এখন সারা দিন এই বারান্দায় বসে সেই চেষ্টাই করে যাচ্ছি রোজ।

আপনার চাকরিটা কি গেছে?

চাকরিটা এখনও যায়নি বটে, তবে যাবে। আমি লম্বা ছুটিতে আছি। অসুখের ছুটি। কোম্পানি কতদিন ছুটি বহাল রাখবে বলা মুশকিল। আপনি দাঁড়িয়ে আছেন কেন, চেয়ার তো খালি রয়েছে। বসুন। এবং একটু ডিটেলসে বলুন, আমি আপনাকে কীভাবে চিনতাম।

তখন আমি ফ্রক পরি, স্কুলে যাই, তেরো বছর বয়স। আপনার বয়স হয়তো তখন বাইশ-তেইশ। তেজি, টগবগে, প্রাণবন্ত একজন যুবক। খুব যে হ্যান্ডসাম ছিলেন তা নয়, তবে ফিগারটা দারুণ ছিল। আমাদের শহরের মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ছিলেন আপনার বাবা। আপনাদের ট্রাকের ব্যবসা ছিল। ষাট-সত্তরখানা ট্রাক। এসব নিশ্চয়ই আপনি ভুলে যাননি!

ঠিক ভুলে যাইনি, তবে স্মৃতি একটু আবছা। যেন পূর্বজন্মের কথা।

সেই তখন আপনাকে আমি প্রথম দেখি, দশ বছর আগে।

দশ বছর! দশ বছর তো অনেকটা সময়!

তেরো বছর বয়সে আমার না ছিল রূপ, না কোনো গুণ।

দাঁড়ান, দাঁড়ান! কোথাও একটা গন্ডগোল হয়েছে।

কীসের গন্ডগোল?

আপনি বরং একটু ধীরে ধীরে বলুন। আমি বুঝতে পারছি না।

না বোঝার মতো কিছু বলিনি তো! রূপহীনা, গুণহীনা এক ত্রয়োদশীর কথাই তো বলছি।

আপনার গুণের কথা আমি জানি না। কিন্তু আপনাকে রূপহীনা বলে মনে হচ্ছে না তো! আপনি কি দেখতে খারাপ? আজকাল হয়তো সুন্দর কুচ্ছিতের সংজ্ঞাও আমি গুলিয়ে ফেলেছি।

আমি আমার তেরো বছর বয়সের কথা বলছি। কালো, রোগা, গাল-বসা কোটরগত চোখের একটা মেয়ে, যার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করলেও চলে। আপনি তখন আমাদের সেই শহরের বেশ একজন চোখটানা পুরুষ। ফুটবল খেলেন, পাহাড়ে চড়েন, লোকের উপকার করে বেড়ান, আবার তেমনই লাফাঙ্গা, বদমাশ, মেয়েবাজ ছেলে। মনে পড়ে?

একটু একটু মনে পড়ে। তবে বড্ড কুয়াশায় ঢাকা। আমি খুব খারাপ ছিলাম না?

সেটা বললে অন্যায় হবে। খারাপ ছিলেন, আবার ভালো কাজও তো করেছেন। সেই ভয়ংকর বন্যার বছরে যখন শহর চার-পাঁচ ফুট জলের তলায় ডুবে গিয়েছিল, তখন আপনি নাওয়া-খাওয়া ভুলে কত লোককে এনে স্কুলবাড়ি আর ইনস্টিটিউটে পৌঁছে দিয়েছেন, রিলিফের জোগাড় করেছেন। এমনকী মার্চেন্টদের কাছ থেকে চাল ডাল কেড়ে এনেছেন।

হবে হয়তো।

মফস্বলে আপনার গ্রুপ থিয়েটারের খুব নাম ছিল। আপনি অভিনয়ও বেশ ভালোই করতেন। শুনেছি আপনি সিনেমায় নামবার চেষ্টা করেছেন।

তাই নাকি? কিন্তু আপনার সঙ্গে কি তখনই দেখা হয়েছিল?

আমাকে আপনি রাস্তায়-ঘাটে, ফাংশনে বা আরও অনেক জায়গায় অনেকবার দেখেছেন, কিন্তু কখনও লক্ষ করেননি। করার কথাও নয়। লক্ষ করার মতো তো ছিলাম না।

তা হবে।

আপনি দেবযানীদির সঙ্গে প্রেম করতেন। আবার রুচিরার সঙ্গেও। এবং নন্দিনীও ছিল আপনার প্রেমিকা। এই নন্দিনী ছিল আমার দিদি। আপনার মনে নেই।

বড়ো লজ্জায় ফেললেন। দেবযানীর কথা খুব সামান্য মনে পড়ছে। তার বাঁ গালে জড়ুল বা আঁচিল গোছের কিছু একটা ছিল বোধহয়। তাই না?

ছিলই তো।

ব্যস, ওইটুকু মনে আছে, বাকিটা নয়। আপনার দিদি--কী নাম বললেন যেন!

নন্দিনী।

তার নিশ্চয়ই এখন বিয়ে হয়ে গেছে!

দু'বার। প্রথমবারের বিয়ে ভেঙে যায়। দ্বিতীয়বার বিয়ে করে এখন জার্মানিতে আছে।

না, তাকে আমার একদমই মনে পড়ছে না।

দিদিকে মনে না-পড়াটা আশ্চর্যের কথা। দিদি শুধু সুন্দরীই ছিল না। দারুণ গান গাইত। শহরে এবং অন্যান্য জায়গায় ফাংশনের মধ্যমণি ছিল। পরে রেডিও আর টিভিতে অনেক প্রোগ্রাম করেছিল।

আপনি আর বলবেন না। খুব বেশি রেফারেন্স দিলে আমার মাথার ভিতরে একটা ওলটপালট হতে থাকে। মেমরি আরও গুলিয়ে যায়। খুব হতাশ লাগে তখন।

কিন্তু আপনিই তো বললেন, কথা বললে মেমরি রিচার্জ হতে পারে।

হ্যাঁ, সেও ঠিক। তবে খুব উপর্যুপরি রেফারেন্স দিলে আমি সূত্র হারিয়ে ফেলি।

সরি, আমি বুঝতে পারিনি।

আপনার তো দোষ নেই। আমিই কীরকম যেন হয়ে গেছি।

আমি কিন্তু দিদির কথা বলতে আসিনি।

তাহলে বরং তার কথা থাক। তাকে বোধহয় আমার মনে পড়বে না। সুন্দরী বা গায়িকা যাই হোক। বরং কালো, রোগা, ইনসিগনিফিক্যান্ট যে মেয়েটির কথা বলতে চাইছেন--অর্থাৎ আপনার কথা বলুন।

আমার কথা! না আমাকে আপনার মনে পড়ার কোনো কারণই নেই। রূপবতী, গুণবতীদেরই যখন মনে নেই, তখন আমাকে তো মনে পড়ার কথাই নয়।

কী জানেন, অনেক কথাই মনে পড়ে না বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে খুব তুচ্ছ, সামান্য অর্থহীন ছোটো ছোটো ছবির মতো দৃশ্য মনে পড়ে। কেন মনে পড়ে তা বুঝতে পারি না। যেমন ধরুন, একটা বৃষ্টির দিনের কথা মনে আছে। স্কুলবাড়ির গাছতলায় সবুজ জামা গায়ে একটা ছেলে একটা ছাগলকে কাঁঠালপাতা খাওয়াচ্ছে আর গলা জড়িয়ে ধরে আদর করছে, এই দৃশ্যটা কেন মনে পড়ে বলুন তো। কিংবা ধরুন, সেই যে যেবার আকাশে একটা বিরল ধূমকেতু দেখা গিয়েছিল। আমরা ভোররাতে প্রচণ্ড শীতে ছাদে সেই ধূমকেতু দেখতে উঠতাম। একটা ভোরে কে একজন পাশের ছাদে ভরাট গলায় একটা রবীন্দ্রসংগীত গাইছিল, আর আমার কেন যেন গান শুনে খুব মৃত্যুর কথা মনে হয়েছিল।

আর কিছু মনে পড়ে না?

হ্যাঁ, এইরকমই ছোটো ছোটো চৌখুপির মতো দৃশ্য বা শব্দ। ঠিক যেন একটা অন্ধকার খামের গায়ে এলোমেলো সঙ্গতিহীন কয়েকটা ডাকটিকিট সাঁটা। একটার সঙ্গে আর একটার কোনো পারম্পর্য নেই। তবু যে মনে পড়ে, তার কারণ হয়তো এইসব স্মৃতি বোধহয় উপেক্ষা করার মতো নয়। মনে পড়ার কারণ আছে।

সেটা বোধহয় সব মানুষেরই আছে। আমারও এমন সব কথা মনে পড়ে যার কোনো মানেই হয় না। আমাদের বাড়িতে লাঠিতে ভর দিয়ে একটা বুড়ো ভিখিরি আসত। কেন কে জানে, ওই লাঠিটার কথা মাঝে মাঝে মনে পড়ে। সাধারণ বাঁশেরই লাঠি, তবে গাঁটে গাঁটে আঁকাবাঁকা। তিরিক্ষি ছিরির একটা লাঠি। সব ছেড়ে ওই লাঠিটাকেই কেন মনে পড়বে বলুন। অমন অবাক হয়ে চেয়ে আছেন কেন বলুন তো।

আমি পরের যে-ঘটনাটা আপনাকে বলতে যাচ্ছিলাম তা ওই লাঠিটা নিয়েই।

সে কী?

ওই বুড়ো ভিখিরিটার নাম ছিল দেলু। মা ওকে খুব ভালোবাসত। বহু দিন বসিয়ে ভাত খাইয়েছে। লোকটার ভালো একটা নামও ছিল। বোধহয় দিলদার সিং। সেই বাঁশের বাঁকা লাঠিটার কথা আমার যখনই মনে পড়ে, তখনই দিলদারকেও যেন দেখতে পাই।

কাঁচামিঠে আমগাছটার তলায়, পাশে লাঠিখানা রেখে উবু হয়ে বসে কলাইকরা থালায় ভাত খাচ্ছে।

আশ্চর্য তো! ওই লাঠিটার কথা আপনারও মনে আছে?

হ্যাঁ। খুবই অবাক কাণ্ড! দেলুর লাঠির কথা মনে রেখেছে এমন লোক বোধহয় পৃথিবীতে খুবই বিরল।

আর কী মনে আছে আপনার?

উমমম! দাঁড়ান, ভাবতে দিন। মুশকিল কি জানেন, চেষ্টা করলে তেমন মনে পড়ে না। কিন্তু হঠাৎ হঠাৎ এক একটা ছবি যেন অন্ধকারে ভেসে ওঠে। মস্তিষ্ককে বেশি তাড়না করলে একটা যন্ত্রণা হয়। ভয় হয় গোটা মেমরি ডিস্কটাই না শেলেটের মতো মুছে যায়। কিন্তু আপনি আমার কাছে কেন এসেছেন তা এখনও জানি না।

ধরুন, এমনিই। আমরা এক শহরে বাস করতাম, ছেলেবেলায় আপনি আমার কাছে খানিকটা হিরোও তো ছিলেন। মনে করুন সেই হিরোকেই একটু দেখতে আসা।

ভালো, খুব ভালো। আজকাল কেউ বড়ো একটা আসে না। এখানে খুব হাওয়া বয়, বেশ শীত। সারা দিন এই খোলা বারান্দায় বসে থাকি। শালগাছে বাতাসের যে শব্দটা হয় সেটা অনেকটা হাহাকারের মতো, মন খারাপ লাগে। আর এ বাড়িটায় অনেক গাছ। এত বড়ো বড়ো গাছ থাকায়, আমি বাইরেটা খুব ভালো দেখতে পাই না।

এ বাড়িটা বুঝি আপনারা কিনেছেন?

হ্যাঁ। বাবাকে ডাক্তার বুঝিয়েছে, নির্জন স্বাস্থ্যকর জায়গায় আমাকে রাখতে। তাই এ বাড়িটা কেনা হয়েছে।

আপনি বেড়াতে যান না!

মর্নিং ওয়াক? না। আমার ওসব ভালো লাগে না। সন্ধেবেলা ছাদে অনেকক্ষণ পায়চারি করি। এখানে খুব ঠান্ডা পড়ে। সন্ধের পর আমাদের ছাদটায় খুব হিম বাতাস বয়ে যায়।

আর ভীষণ অন্ধকার। খুব কুয়াশা না হলে আকাশভরা তারা দেখা যায়। বেশ লাগে তখন পায়চারি করতে। হাসছেন কেন?

এমনিই। ভাবছিলাম বড়োলোক হওয়ার কত সুবিধে। আপনার ডিমেনশিয়া হয়েছে বলে আপনার বাবা ঝাড়গ্রামে আস্ত একটা শালবনসুদ্ধু দোতলা বাড়িই কিনে ফেললেন আপনার দেহমন ভালো রাখার জন্য। আমাদের মতো গরিবদের এর চেয়ে অনেক বেশি শক্ত রোগ হলেও কিছু করার থাকে না।

ঝাড়গ্রাম! হ্যাঁ, ঝাড়গ্রামই তো বললেন! এই নামটা দিনের মধ্যে আমি যে কতবার ভুলে যাই! আপনার বাড়ি বুঝি এখানেই?

না। আমি কাছাকাছি একটা কলেজে পড়াই। খুব সম্প্রতি, মাত্র মাস ছয়েক আগে জয়েন করেছি।

গরিব আর বড়লোকের ব্যাপারটা আপনি ঠিকই বলেছেন। বড়োলোক হওয়ার কিছু অন্যায্য সুবিধে আছে। কিন্তু তার জন্য শুধু বড়োলোকদের দোষ দিয়ে বা মুন্ডুপাত করে লাভ নেই। বড়োলোকেরা এই সামাজিক সিস্টেমটা তৈরি করেনি। আমি অনেক ভেবে দেখেছি, এ দেশের সিস্টেমটাই এরকম। তবে আমাদের অবস্থা কিন্তু আগের মতো ভালো নেই।

জানি। আপনার বাবার নামে অনেকগুলো মামলা ঝুলছে। ট্রাকের ব্যবসা মার খেয়েছে। আপনার দাদা দীপঙ্কর জেল খাটছেন।

হ্যাঁ। আপনি তো সবই জানেন। চিরকাল তো কারো সমান যায় না। বেশ একটি দুঃসময় চলছে আমাদের।

এসব কথা তো আপনার বেশ মনে আছে দেখছি।

ইমিডিয়েট পাস্ট, অর্থাৎ অনতি অতীত বেশ মনে করতে পারি, কিন্তু তার বেশি অতীতটাই কুয়াশায় ঢাকা। আবার একটু একটু করে এই অনতি অতীতও যে মুছে যাচ্ছে তাও টের পাই। তখন খুব ভয় করে। এক বছর আগে আমাদের বাড়িতে একটা গ্যাস সিলিন্ডার লিকেজ হয়ে আগুন লেগে যায় এবং তাতে আমার বোন টিকলি ভীষণভাবে পুড়ে

যায়। পরে সে মারাও গেছে। এই ঘটনাটা আমি কী করে যে ভুলে গিয়েছিলাম কে জানে। সেদিন সুবল আমাকে ঘটনাটা মনে করিয়ে দিয়েছিল।

টিকলিদির জন্য আমরা সবাই খুব দুঃখ পেয়েছি। খুব ভালো ছিলেন টিকলিদি। জামাইষষ্ঠীতে বাপের বাড়িতে এসেছিলেন। ভাগ্য খারাপ থাকলে কত কী হয়। সেদিনই নতুন সিলিন্ডার লাগানো হয়েছিল আর টিকলিদি গিয়েছিলেন বিরিয়ানি রাঁধতে।

অত ডিটেলস আমার মনে নেই। টিকলিদির মুখটাও স্পষ্ট মনে পড়ে না।

ওঁর একটা মেয়ে আছে, না?

আছে বোধহয়। হ্যাঁ, আছে।

আপনি সুবলের কথা বললেন, সুবল কে?

আমার দেখাশোনা করে। পুরোনা লোক।

আপনি ভালো ব্যাডমিন্টন খেলতেন, মনে আছে?

ব্যাডমিন্টন! হয়তো খেলতাম।

মনে নেই আপনার?

না। খেলাটা ভালো নয়।

কেন, ব্যাডমিন্টন তো বেশ একটা খেলা।

শাটল কক কী দিয়ে তৈরি হয় জানেন?

পাখির পালক।

হাজার হাজার শাটল কক তৈরি করার জন্য এত পালক ওরা পায় কোথায়? ওরা কি পাখি মেরে পালক উপড়ে নেয়?

আমি তা জানি না।

আমার সন্দেহ, শাটল ককের জন্য পাখি মারা হয়।

হতেও পারে।

পাখির মতো এমন সুন্দর আর আশ্চর্য প্রাণী আর হয় না, না? আমি আজকাল চারদিকে অনেক পাখি দেখতে পাই। তাদের ডাক শুনি। আজকাল আমার কাকের ডাকও ভালো লাগে। হাসছেন যে!

ভাবছি আপনি মুরগি খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন কি না। আপনার মা খুব শুদ্ধাচারী মহিলা ছিলেন বলে হেঁসেলে মুরগি ঢুকতে দিতেন না। আপনি আর আপনার বন্ধুরা বাড়ির পিছনের উঠোনে মুরগি কেটে রান্না করে খেতেন, মনে নেই? ও কী, অমন সাদা হয়ে গেলেন কেন?

না, না, ও কিছু নয়। আমার মনে হয় অস্বচ্ছ অতীতে আমি এমন সব কাজ করেছি যা মনে না পড়াই বোধহয় ভালো। না, এখন আমি মুরগি খাই না। মাছমাংস কিছুই খাই না।

বৈরাগ্য এল বুঝি!

ঠাট্টা করছেন! বৈরাগ্য তো সহজ ব্যাপার নয়! তবে সহনশীলতা বলে একটা কথা আছে না? বোধহয় সেইটে এসেছে। নাকি, কে জানে, আমি হয়তো ধীরে ধীরে কাঠ বা পাথরের মতো হয়ে যাচ্ছি।

ও কথা বলছেন কেন?

কিছুদিন আগে আমাকে একটা কাঁকড়াবিছে হুল দিয়েছিল। ডান পায়ের বুড়ো আঙুলে। সে যে কী অসহ্য যন্ত্রণা, মনে হচ্ছিল হার্ট ফেল হয়ে মরে যাব। সুবল একটা হাতুড়ি নিয়ে বিছেটাকে মারতে এসেছিল। ও নাকি তুক জানে, কাঁকড়াবিছের রস লাগালে ব্যথা কমে যায়। আমি ওকে মারতে দিইনি। মেরে কী হবে বলুন। বেচারা তো নিজেই জানে না যে, ওর বিষ এতটা মারাত্মক। মানুষের কত অস্ত্রশস্ত্র আছে, ওদের তো ওই হুল বা দাঁত বা নখ বা শিং-ই ভরসা।

গাঁধীবাদী হতে বারণ করছি না। তবে পেস্ট কন্ট্রোল এজেন্সিকে খবর দিয়ে বাড়ি থেকে পোকামাকড় তাড়িয়ে দেওয়াই ভালো। দাঁত নখ হুলের সঙ্গে সহাবস্থান মোটেই নিরাপদ নয়। আমি জুলজিস্ট, পোকামাকড় সম্পর্কে আপনার চেয়ে একটু বেশি জানি। কাঁকড়াবিছের বিষে মানুষ মারাও যায়। আপনি ডাক্তার ডাকেননি?

না।

খুব অন্যায় করেছেন। একটা অদ্ভুত ব্যাপার হল যে।

কী হল?

খবর পেয়ে একটা লম্বাপানা লোক এল। এ পাড়াতেই থাকে। সেই লোকটা আমাকে বাথরুমে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে মাথায় মগের পর মগ জল ঢালতে লাগল। বিড়বিড় করে কী একটা মন্ত্রও পড়ছিল। জল ঢালতে আমার সর্বাঙ্গ ঠান্ডা হয়ে কাঁপুনি ধরে গিয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, জল ঢালার পর আমার ব্যথাও একদম কমে গেল।

যাঃ ওই বিষের ব্যথা উইদাউট মেডিকেশন চবিবশ ঘন্টা থাকার কথা। শুধু জল ঢাললে ব্যথা কমার কথাই নয়।

কিন্তু কমল যে!

আপনি এখানে থাকতে থাকতে অন্ধ বিশ্বাস বা বুজরুকিও মানতে শুরু করেছেন।

তাই হয়তো হবে, কিন্তু ব্যথাটা সত্যিই ছিল না। আর।

ঠিক আছে, আপনার কথাই মানছি।

আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে আপনি আমার কথা বিশ্বাস করছেন না। ঠোঁটে একটু চাপা হাসি, চোখে একটু বিদ্রূপের চাউনি। আজকাল আমি অবশ্য কাউকেই কিছু বোঝাতে পারি না। এমনকী, সুবল অবধি আমার অনেক কথা সিরিয়াসলি নেয় না।

আমি ভাবছি মানুষ অনেক সময়ে যা বিশ্বাস করতে চায় সেটাই ঘটে যায়। আপনি হয়তো খুব জোরের সঙ্গে লোকটার অলৌকিক ক্ষমতাকে বিশ্বাস করেছিলেন, আর সেই জোরেই হয়তো ব্যথাও কমেছে। মানুষ মন দিয়ে কত কী করতে পারে। কিংবা লোকটা হয়তো আপনাকে হিপনোটাইজ করেছিল।

আপনি পারেন?

কী?

হিপনোটাইজ করতে?

না। আমার পারার কথাও নয়।

কেউ যদি আমাকে বাকি জীবনটা হিপনোটাইজ করে রেখে দিত তাহলে বড্ড ভালো হত।

বাস্তব থেকে পালাতে চান তো ! আমরা সবাই কমবেশি পালাতেই তো চাই। কিন্তু পালিয়ে লাভ হয় না, ফের বাস্তবের মুখোমুখি হতে হয়। নিস্তার নেই। একটা সময় ছিল যখন আপনি পালানোর মানুষ ছিলেন না। হাসপাতালের মোড়ে সেই যে ভীষণ হাঙ্গামাটা হয়েছিল তার কথা আপনার মনে আছে? বাবুপাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মেছোবাজারের গুন্ডাদের কী ভয়ংকর মারপিট ! কত বোমা পড়েছিল, গুলি চলেছিল, পুলিশ অবধি এগতে সাহস পায়নি। একটা মোটরবাইক নিয়ে আপনি সেই হাঙ্গামার মধ্যে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন। খুব পপুলার ছিলেন বলেই বোধহয় সেই হাঙ্গামা থামাতে পেরেছিলেন আপনি। আমি অবশ্য ডিটেলস জানি না, তবে তখন লোকের মুখে মুখে আপনার নাম ফিরত। মনে আছে?

না। কিছু মনে নেই।

কিংবা রুচিরা আর পল্লুর সেই ভালোবাসার বিয়ে! মনে আছে?

নাম দুটো প্রথম শুনছি।

বদমাশ, জুয়াড়ি, জোচ্চোর, মিথ্যাবাদী বলে পল্লুকে সবাই চিনত। তবু রুচিরা যে কী করে ওর প্রেমে পড়ল কে জানে। শান্ত, শিষ্ট, ভারি ভালো মেয়ে। ক্লাসের ফার্স্ট গার্ল। তবু পল্লুর প্রেমে পাগল হয়ে প্রেগন্যান্ট হয়ে পড়ল। কেলেঙ্কারির একশেষ। পল্লু দায় এড়ানোর চেষ্টা করেছিল। রুচিরার বাবা পল্লুর সঙ্গে বোঝাপড়া করতে গিয়ে গুন্ডাদের মার খেয়ে এলেন। পুলিশ বধি পল্লুকে আড়াল করেছিল, কারণ ওর মামা ছিল ডি এস পি। রুচিরাকে আত্মহত্যা করতে হত আপনি না থাকলে।

পল্লু !

রুচিরা! এসব শব্দ শুনছি আর আমার মাথার ভিতর গভীর কালো জলে টুপটাপ করে পড়ে তলিয়ে যাচ্ছে। কোনো ঝংকারও নেই, টংকারও নেই। পল্লুকে কি আমি মেরেছিলাম?

না। বরং তাকে প্রবল মারের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন। রুচিরা যখন বিষ খেয়ে হাসপাতালে, তখন ওদের পাড়ার লোকজন লাঠিসোঁটা নিয়ে তেড়ে এসে পল্লুকে পাকড়াও করে। সেদিন আপনি গিয়ে আড়াল না করলে ও মরেই যেত। শুনেছিলাম, কিছুদিন আপনি ওকে বন-বাংলোয় নিয়ে লুকিয়ে রেখেছিলেন। আত্মহত্যার প্ররোচনা দেওয়ার জন্য পুলিশ ওকে খুঁজছিল। খুব গন্ডগোল চলেছিল কিছুদিন। আপনাকেও পুলিশ ধরে নিয়ে যায়। কিছুদিন পরে অবশ্য রুচিরা আর পল্লুর বেশ মিলমিশ হয়ে যায়। পল্লু কিন্তু আর আগের মতো ছিল না, পাল্টে গিয়েছিল। কী করে সেটা হয়েছিল তা আজও জানি না।

আচ্ছা এই ঘটনাটা শুনে আমাকে তো বেশ ভালো লোক বলেই মনে হচ্ছে, তাই না?

খারাপ তো বলতে চাইছি না।

কিন্তু একটু আগে আপনিই না বলেছিলেন যে, আমি ছিলাম লাফাঙ্গা, বদমাশ, মেয়েবাজ ! একই সঙ্গে একটা লোক ভালো আর খারাপ কী করে হতে পারে?

সেই জন্যই তো আপনাকে একদম বুঝতে পারতাম না। কখনো মনে হত ভীষণ ভালো, ডাকাবুকো, সাদা মনের মানুষ। আবার কখনো মনে হত ভীষণ পাজি, ভীষণ দুষ্টু, ভীষণ অ্যাগ্রেসিভ।

খুব মুশকিলে ফেলেছেন আমাকে।

মুশকিল শুধু আপনার নয়, আমারও। মনে মনে আপনার যে-পোর্ট্রেটটা আঁকার চেষ্টা করেছি, সেটা বারবার বদলে গেছে। কখনো আপনাকে মনে হয় ইভান দি টেরিবল, কখনো বা সন্ত জন। আপনি এমন অদ্ভুত ছিলেন বলেই আমার কিশোরী বয়সে আপনাকে নিয়ে আমি মনে মনে ভারি জ্বালাতন হতাম।

আমাকে নিয়ে আপনার প্রবলেমটা কী ছিল বলবেন।

অনেক সময়ে কেউ কেউ নিজের অজান্তেই অন্য কারো প্রবলেম হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া আমার একটা ধারণা হয়েছিল যে, আপনি আমার দিদিকে বিয়ে করবেন এবং একদিন আপনাকে জামাইবাবু বলে ডাকতে হবে।

ও হ্যাঁ, এ কথাটা বলেছিলেন বটে। আপনার দিদির সঙ্গে আমার--

ঠিক তাই।

গানের কথায় একটা মেঘলা দিনের কথা মনে পড়ল বলব?

কি জানি কেন, আজ এই শীতের সকালে আপনার কথা শুনতে আমার বেশ ভালো লাগছে। আপনি আমার সেই ছোট্ট শহরের মেয়ে। কত ছোটো ছোটো কথা মনে আছে আপনার। শুনে ফের সেই ছেলেবেলায় ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে?

হ্যাঁ। ভীষণ।

আপনার ইচ্ছের আরও জোর হোক।

সেই যে মেঘলা দিনের কথা বলবেন বলছিলেন। বলুন।

হ্যাঁ, সেটা এক আশ্চর্য দিন। আমাদের শহরের এক পলিটিক্যাল লিডার তার আগের দিন কদমতলার মোড়ে খুন হয়েছিলেন। বিমলাংশু সেন। পরদিন সকাল থেকেই দোকানপাট বাজার সব বন্ধ। গাড়িঘোড়া কিছু চলছে না। অথচ সেদিন জেলা শহরে আমার গানের কমিপিটিশনের ফাইনাল পরীক্ষা। না গেলেই নয়। শহর প্রায় পঁচিশ মাইল দূর। সকালে এসব খবর পেয়ে মন ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। রাগ-অভিমান-হতাশায় খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে বিছানায় পড়ে পড়ে কেবল কাঁদছি, তখন দিদি এসে বলল, কাঁদিস না। ঠিক একটা উপায় হবে, দেখিস। কিন্তু ওসব যে ছেলে ভোলোনো কথা তা জানা ছিল বলে একটুও বিশ্বাস হয়নি। কিন্তু উপায় সত্যিই হয়েছিল। দিদি আপনাকে খবর দিয়েছিল।

আমাকে! কেন?

সেটাই তো গল্প। আপনি আমাকে জেলা শহরে নিয়ে যেতে রাজি হয়েছিলেন। ছ'টায় পরীক্ষা, আপনি ঠিক সাড়ে চারটেয় একটা বিরাট মোটরবাইক নিয়ে এসে হাজির। এক মুখ হাসি নিয়ে বললেন, চলো খুকি, তোমাকে ঘুরিয়ে দিয়ে আসি।

দাঁড়ান, দাঁড়ান! কী নাম যেন বললেন। বিমলাংশু সেন?

হ্যাঁ তো।

লম্বা, ফরসা, কোঁকড়া চুল, চোখে ভারী চশমা?

হ্যাঁ।

বিমলাংশু সেনকে পেটে আর বুকে ছুরি মারা হয়েছিল, তাই না?

হ্যাঁ।

তাকে আমার বেশ মনে পড়ে যাচ্ছে।

সত্যি?

তারপর বলুন।

আমি তৈরি হয়েই ছিলাম। আপনি আমাকে কীভাবে মোটরবাইকের ক্যারিয়ারে বসতে হবে তা শিখিয়েছিলেন। বলেছিলেন আপনার কাঁধ বা কোমর জড়িয়ে ধরে শক্ত হয়ে বসে থাকতে হবে। জীবনে সেই প্রথম মোটরবাইকে চড়া আমার। যা ভয় করছিল! আর সেইসঙ্গে লজ্জায় মরে যাচ্ছিলাম।

লজ্জা কীসের?

ওমা! লজ্জা নয়! তখন যে মনে মনে আপনাকে নিয়ে সারাক্ষণ গবেষণা করি! তখন, বালিকা বয়সে আপনার চেয়ে রহস্যময় পুরুষ আর কেউ ছিল না আমার।

রহস্যময়! রহস্যময় ছিলাম বুঝি আমি?

ভীষণ। আপনার কাঁধে হাত রেখে পিছনের সিটে আমি কাঁটা হয়ে বসেছিলাম। সারা শরীর বারবার শিউরে শিউরে উঠেছিল। আপনি অবশ্য পাত্তা দেননি আমাকে। আর তেরো বছরের কালো, রোগা একটা পেত্নী মেয়েকে কেনই বা পাত্তা দেবেন আপনি!

সেটা ছিল বুলেট।

তার মানে?

মোটরবাইকটার কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল।

আপনার মোটরবইকটা ছিল ভীষণ বিচ্ছিরি। একে তো দৈত্যের মতো চেহারা, তার ওপর যা জোরে ছুটত। শব্দে কানে তালা লেগে যাওয়ার জোগাড়।

আপনার অভিজ্ঞতা নেই বলে বলছেন। নইলে বুলেট একটি চমৎকার বাইক। যে কোনো রাস্তায় চলতে পারে, এমনকী পাহাড়ি রাস্তায়ও।

আপনি এমন উদাসীনভাবে চালাচ্ছিলেন যে, আপনার পিছনে যে একটা তেরো বছরের ভীতু মেয়ে বসে আছে সেটা আপনার খেয়ালই ছিল না।

না, না, ভুল ভেবেছেন। নিশ্চয়ই খেয়াল ছিল, কাউকে ক্যারি করার সময় আমি তো সাবধানেই চালাতাম।

সেটা বুঝি মনে আছে আপনার?

অ্যাঁ! তাই তো, মনে আছে দেখছি! ভারি আশ্চর্যের ব্যাপার!

সেদিন কিন্তু মোটেই সাবধানে চালাননি। ভয়ে আমি বারবার দু'হাতে আপনাকে আঁকড়ে ধরেছি আর লজ্জায় মরে গেছি।

আপনি খুব লাজুক ছিলেন তো?

হ্যাঁ। এখনও তাই। খুব আনস্মার্ট, ঘরকুনো। ভীতুও।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক মেয়েদের যেমন হওয়া উচিত।

তার মানে! মেয়েদের আনস্মার্ট, ঘরকুনো আর ভীতু হওয়া ভালো বুঝি?

ভালো নয়? তাহলে কি অন্য রকম হওয়া উচিত?

যদি তাই হবে তাহলে আপনি আমাকে পাত্তা দেননি কেন?

তেরো বছর বয়সের মেয়েরা তো ইজের পরে!

আমি সেদিন সালোয়ার-কামিজ পরেছিলাম। অ্যান্ড ফর ইওর ইনফরমেশন, যথেষ্ট সেজেওছিলাম।

হাঃ হাঃ! তাই বুঝি! তাহলে তো আপনাকে আমার সমীহ করাই উচিত ছিল! কিন্তু ঠিক কীরকম ব্যবহার করেছিলাম আপনার সঙ্গে, একটু বলবেন?

একটু নাক সিঁটকোনোর ভাব তো ছিলই। আর ছিল অ্যান অ্যাটিটিউড অফ রিজেকশন। ভাবটা যেন, তুমি যতই সাজো, কিচ্ছু যায় আসে না আমার।

আজ আমি সেদিনের ব্যবহারের জন্য যদি ক্ষমা চাই?

যাঃ, ঠাট্টা করছিলাম। আমার ওই বয়সে কি কারও কাছে পাত্তা পাওয়ার কথা!

দাঁড়ান, দাঁড়ান, একটা গন্ধ পাচ্ছেন?

পাচ্ছি তো। পাতাপোড়ার গন্ধ। কেউ কাছেপিঠে শুকনো শালপাতা জড়ো করে আগুন দিয়েছে বোধহয়।

না, না, সে গন্ধ নয়।

তবে?

ক্যা-ক্যালিফোর্নিয়ান পপি!

ক্যালিফোর্নিয়ান পপি!

ক্যালিফোর্নিয়ান পপির গন্ধ!

আমি তো পাচ্ছি না ! তবে আমরা একসময়ে ওই নামের একটা তেল চুলে মাখতাম। কিন্তু সে তো ছেলেবেলায় !

কিন্তু আমি গন্ধটা পাচ্ছি যে ! আর একটা বাসন্তী রঙের ওড়না--হ্যাঁ, বাসন্তী রঙের ওড়না ঝোড়ো বাতাসে খুব উড়ছে, রিয়ার ভিউ মিররে আমি যেন এখনও দেখতে পাই। ভয় করছিল আমার।

উঃ !

কী হল?

সেটা তো বাসন্তী রঙেরই ওড়না ছিল! আমিই ভুলে গিয়েছিলাম! আপনি বাইক থামিয়ে আমাকে বললেন ওড়নাটা কোমরে জড়িয়ে নিতে। নইলে নাকি চাকায় ওড়না জড়িয়ে অ্যাকসিডেন্ট হতে পারে। এটা কী করে মনে পড়ল আপনার?

না, মনে পড়েনি। একটা নিরেট নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে একটা-দুটো বিচ্ছিন্ন তারা ফুটে উঠছে মাত্র। পূর্বাপর সম্পর্ক নেই। ওই বাসন্তী রঙের ওড়না আর ক্যালিফোর্নিয়ান পপির গন্ধ। কিন্তু দুটোকে মেলাতে পারি না যে? কোথা থেকে এক একটা স্মৃতি, পাখি প্রজাপতি বা মৌমাছির মতো উড়ে আসে, তারপর আবার উড়ে কোথায় হারিয়ে যায়। সারা দিন আমার মাথায় এইসব দৃশ্য, গন্ধ, শব্দের পারম্পর্যহীন যাতায়াত। আপনি কী বলছিলেন যেন !

ভাবছি, বলে লাভ আছে কি না। কিন্তু শুনতে আমার ভালোই লাগছে। আপনার কথাগুলো যেন আমার বন্ধ দরজায় মৃদু টোকার শব্দ। দরজাটা আমি খুলে দিতে চাই, কিন্তু ইচ্ছে করলেও যেন পারি না। তবু শব্দটাও তো একটা সঙ্কেত! কে জানে দরজাটা ওই সংকেতে আপনা থেকেই খুলে যাবে কি না। প্লিজ, থামবেন না, বলুন।

শুনতে আপনার ভালো লাগছে কি? বোর হচ্ছেন না তো !

না, বরং আমার ভিতরে যেন শুকনো মাটিতে বৃষ্টির ফোঁটার মতো কিছু পড়ছে। বলুন, প্লিজ !

বলছি। সেই পঁচিশ মাইলের ভয়, লজ্জা, শিহরণ সব এখনও পুরনো বইয়ের মতো সাজিয়ে রেখেছি মনের মধ্যে। কিন্তু পথ তো একসময়ে শেষ হয়। আপনি আমাকে ঠিক জায়গায় নামিয়ে দিয়ে বললেন, তোমার ফাংশন হয়ে গেলে আমি এসে তোমাকে নিয়ে যাব। চিন্তা কোরো না। সেদিন আমি কোকিলকে হার মানিয়ে গান গেয়েছিলাম। ফেরার সময় আমার হাতে একগাদা প্রাইজ দেখে আপনি অবাক হয়ে বলেছিলেন, ও বাবা, তুমি তো সাঙঘাতিক মেয়ে ! সব প্রাইজ লুট করে এনেছ দেখছি ! বাইকে সেইসব প্রাইজ নিয়ে আসা কত শক্ত ছিল বলুন। আপনিই গিয়ে একটা বিগ শপার ব্যাগ কিনে আনলেন, তারপর সেটা যত্ন করে ক্যারিয়ারে বাঁধা হয়েছিল।

কত মনে আছে আপনার! আপনি ভাগ্যবতী। আমার যে কেন কিছুই মনে পড়ে না ! কী জানি কেন, এখন হঠাৎ আমার একটা ভাঙা কাচের বোল-এর কথা মনে পড়ছে। সবুজ রং ছিল বোলটার, ভারি সুন্দর দেখতে।

আপনি একটা বিচ্ছু।

কেন ওকথা বলছেন?

আপনার সব মনে আছে, কিছুই ভোলেননি।

আমার চেয়েও বেশি মনে আছে আপনার। কারণ প্রাইজে আমি এক সেট বোলও পেয়েছিলাম। মোটরবাইকের ঝাঁকুনিতেই বোধহয় একটা বোল ভেঙে গিয়েছিল। বোলগুলো ছিল সবুজ রঙের। আমিই ভুলে গিয়েছিলাম, আপনার কী করে মনে আছে?

না, না, কিছু মনে নেই। কিছুই মনে নেই। কীসের একটা আড়াল বলুন তো ! কে আমার অতীতকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে রয়েছে?

কেউ নয়। ওটা আপনার অটো সাজেশন।

আপনিই না একটু আগে বলেছিলেন, আমি কিছু একটা ভুলতে চাইছি বলে ভুলে যাচ্ছি। কিন্তু কী ভুলতে চাইছি সেটাই তো আর মনে নেই আমার।

মনে পড়লে হয়তো আপনার ভালো লাগবে না।

তা হোক, তবু তো এই আধখানা হয়ে বেঁচে থাকার হাত থেকে রেহাই পাব। আপনি জানেন?

না তো?

কিন্তু আপনার মুখ দেখে আমার কেন মনে হচ্ছে যে, আপনি জানেন !

অনুমানটা ভুল।

তাই হবে হয়তো।

আজ আমি আসি !

যাবেন ! তাই তো, আপনার তো চলে যাওয়ারই কথা! আবার আসবেন।

বলতে পারি না।

দাঁড়ান, দাঁড়ান। না, নড়বেন না, ওই রোদ আর ছায়ার ঠিক মাঝখানে যেমনটি দাঁড়িয়ে আছেন, তেমনই থাকুন তো ! আপনার ডান দিকে রোদ, বাঁ দিকে ছায়া.....

দাঁড়ালাম তো !

সুভাষিণী... সুভাষিণী ...আশ্চর্য! কেন এ নামটা মনে পড়ল।

মনে পড়ল তাহলে !

পড়ল। কিন্তু আপনি কে বলুন তো?

আমাকে ভুলতে গিয়ে কত কী ভুলতে হল আপনাকে !

একটু দাঁড়ান। আশ্চর্য, আমার আদিগন্ত সব মনে পড়ে যাচ্ছে যে ? উঃ, ভীষণ মনে পড়ে যাচ্ছে সব! ...রেপ চার্জ, পাবলিকের মার, মামলা, কয়েদখানা, নাবালিকা ধর্ষণের জন্য... ওঃ !

সব ঠিক। কিন্তু আপনি বোকা, ভীষণ বোকা। যদি সব উপেক্ষা করে জোর করে এসে আমার হাত ধরতেন, তাহলে আমিও ভয় ঝেড়ে ফেলে সবাইকে মুখের ওপর বলতে পারতাম, উনি আমাকে রেপ করেননি, আমিই ওঁকে বাধ্য করেছিলাম।

কিন্তু কেন করেছিলে? কেন বাধ্য করেছিলে আমায়?

তখন আমার পনেরো বছর বয়স। গুটিপোকার খোলস ছেড়ে একটি প্রজাপতি বেরিয়ে এসেছে। কেউ ফিরেও দেখত না যাকে তার দিকে সকলেরই অবাক চোখের চাউনি। অহংকারে মক মক করে বুকের ভিতরটা। তখন আমার ট্রফি চাই, মুগ্ধতা চাই, স্তাবকতা চাই, পুরুষদের হাঁটু গেড়ে বসা দেখতে চাই। কিন্তু একচোখো, অন্ধ আবেগ একটা পুরুষকেই শুধু খুঁজে বেড়ায় তখনও। ওই একটা পুরুষের শিলমোহর না হলে তার জীবন-যৌবন বৃথা। বুঝেছেন? ওই পঁচিশ মাইলের উজান-ভাঁটায় মাথাটা চিবিয়ে খেয়ে রেখেছিলেন আপনি। কিন্তু সবাই যখন আমাকে লক্ষ করে, আপনি ফিরেও তাকান না।

নাবালিকা বলেই হয়তো, সুন্দরী প্রেমিকার এক ফোঁটা একটা রোগা প্যাংলা বোন বলেই হয়তো। কী দিয়ে আপনাকে আমার দিকে ফেরাই? আমার পাগলিনী মন তখন ওই একটা পথই খুঁজে পেয়েছিল। এক নিরালা দুপুরে সেজেগুজে আপনার নির্জন একটেরে ঘরটায় হানা দিয়েছিলাম। মাথার ঠিক ছিল না। বশে ছিলাম না। নিজের শ্বাসেই আগুনের হলকা টের পেয়েছিলাম। আপনি অবাক হয়েছিলেন, ঠেকাতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু মানুষ কি পারে নিজের শরীর মনকে রাশ টেনে রাখতে। ভেসে গিয়েছিলেন, ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম আমি। দুই মাতাল আর পাগলের খেয়ালই ছিল না কিছু। বীরু নামে সেই মিস্তিরি ছেলেটা আপনাদের বাইরের দেওয়ালে রং করছিল, যে লোক ডেকে এনেছিল... উঃ, তারপর পৃথিবীটা উলটে পালটে গেল একেবারে। কোন অন্ধকারে ঠেলে দিলাম আপনাকে, আর এক অন্ধকারে ডুবে গেলাম আমিও। সত্যি কথাটা যতবার বলতে গেছি, আমার মুখ চেপে ধরা হয়েছিল। অঝোরে চোখের জল ঝরে গিয়েছিল শুধু। কত কষ্ট পেতে হল আপনাকে !

কী চাও সুভাষিণী? আজ আমার কাছে আর কী চাও?

আপনি কি ভেবেছিলেন সেই দিনের সেই কিশোরী সুভাষিণী ওই দিনের গন্ডগোলে ভয় পেয়ে বোবা হয়ে থাকবে চিরকাল? দুই বাড়ির মধ্যে সম্পর্ক তেতো হয়ে গেল, যাতায়াত বন্ধ, আপনাকে নিয়ে কী বিচ্ছিরি টানাহ্যাঁচড়া-মামলা মোকাদ্দমা! ভয় হয়েছিল ঠিকই, তবু মনস্থির ছিল। কত কষ্ট করে, কত কাঠখড় পুড়িয়ে এখানে এসে ঘাঁটি গেড়েছি জানেন?

সুভাষিণী, আমাকে বরং আবার সব ভুলিয়ে দাও। বিস্মৃতিই তো ভালো ছিল এর চেয়ে। এত যন্ত্রণা ছিল না! আধখানা হয়েই থেকে যাই না কেন সুভাষিণী!

বাকি আধখানা খুঁজে দিতেই তো এত কষ্ট করে এত দূর আসা।

বাকি আধখানা! ও!

এখন আসুন তো, আমার হাতখানা ধরুন। চলুন, ওই শালবনের ছায়ায় ছায়ায় দু'জন একটু হাঁটি।

চলো সুভাষিণী।

হরণ

হ্যালো! হ্যালো!

হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলুন না।

আচ্ছা, এটা কি টু ফোর সেভেন থ্রি ফোর জিরো ফোর জিরো?

এই মেরেছে, নম্বরটা তো ঠিক জানা নেই।

আচ্ছা, এটা বিজয় ঘোষের বাড়ি কি?

বিপদে ফেললেন মশাই, এই বাড়ির কর্তার নাম কি বিজয় ঘোষ নাকি?

আপনি কে বলছেন বলুন তো!

আমি এ বাড়ির একজন গেস্ট বলতে পারেন।

গেস্ট! গেস্ট, অথচ হোস্টের নামটা বলতে পারছেন না?

আপনি কোথা থেকে কথা বলছেন?

শিকাগো।

শিকাগো? ও বাবা, সে তো অনেক দূরের পাল্লা!

তাহলে আপনাকে সত্যি কথাটা বলাই যায়।

আপনার দিক থেকে কোনো বিপদের ভয় নেই।

কী যা তা বলছেন! পাগল নাকি?

না, ঠিক পাগল নই। আমি আসলে একজন চোর।

চোর! বলেন কী মশাই! আপনি চোর!

হ্যাঁ, অত অবাক হচ্ছেন কেন? চোর কথাটা নিশ্চয়ই আপনি এই প্রথম শুনছেন না!

ইয়ার্কি মারছেন না তো!

না মশাই, না। অনেক মেহনত করে সবে ঘরে ঢুকেছি, এমন সময় হঠাৎ ফোনটা বাজতে লাগল। কাজের সময় ফোনটোন বাজলে বড্ড ফ্যাসাদে পড়তে হয় মশাই, তাই ফোনটা তুলে কথা কইছি।

সর্বনাশ! আমি যে ভীষণ নার্ভাস ফিল করছি!

আমিও। আপনার চেয়ে বরং একটু বেশিই।

দেখুন, আপনার কাছে আর্মস নেই তো! পিস্তল টিস্তল বা ছোরাছুরি?

আরে না। ওসব নিয়ে বেরোলে আরও বিপদ। ওসব কাছে থাকলেই মনে জিঘাংসা আসে, আর তা থেকে খুনোখুনিও হয়ে যেতে পারে। তাই আমি ওসব রাখি না।

দেখুন, আমার টেলিফোনের স্ক্রিনে ডায়াল করা যে নম্বরটা দেখতে পাচ্ছি সেটা আমাদের বাড়ির নম্বরই বটে। আচ্ছা, এটা কত নম্বর বাড়ি বলুন তো! সেভেনটি ফোর ডি বাই ওয়ান...?

বিপদে ফেললেন মশাই, বাড়ির নম্বরটা তো দেখিনি!

বাইরের দরজায় আমার বাবা বিজয় ঘোষের নেমপ্লেট আছে।

সদর দিয়ে তো ঢুকিনি মশাই যে নেমপ্লেট দেখতে পাব। আমি ঢুকেছি পিছনের জানালার গ্রিল কেটে। পরিশ্রম বড়ো কম হয়নি।

দেখুন, আপনাকে একটা অনুরোধ করতে পারি কি?

আহা, অত কিন্তু কিন্তু করার কী আছে? বলে ফেলুন।

আপনি যখন চোর তখন চুরি তো করবেনই, সে তো আর আটকাতে পারব না। কিন্তু প্লিজ, আমার মা বাবার কোনো ক্ষতি করবেন না। আর আমার একটা ছোটো বোনও আছে। প্লিজ, প্লিজ, ওদের ওপর চড়াও হবেন না, আপনার যা খুশি নিয়ে যান।

কিন্তু কেউ যদি জেগেটেগে যায় তাহলে তো আমাকেও মাথা বাঁচাতে হবে মশাই! চোরের প্রাণ বলে কি প্রাণটার দাম নেই?

অবশ্যই আছে, অবশ্যই আছে।

তাহলে কথা দিই কী করে?

আচ্ছা, একটা কাজ করছি। লাইনটা আমি ধরে থাকছি, আপনিও লাইনটা কাটবেন না। কেউ যদি বাইচান্স জেগে যায়, তাহলে তাকে আগে আমার সঙ্গে কথা বলে নিতে বলবেন।

এ প্রস্তাবটা অবশ্য খারাপ নয়। বাড়িতে আর কেউ নেই তো? ধরুন, গুণ্ডা প্রকৃতির কোনো ভাই বা আহাম্মক কোনো চাকর?

না, না আর কেউ নেই। আমরা দুই ভাই বোন আর বাবা-মা।

বাঃ, আপনাদের বেশ ছিমছাম ফ্যামিলি।

হ্যাঁ। আপনার ফ্যামিলি কি বড়ো?

নাঃ। ফ্যামিলিই নেই।

ও। বিয়ে করেননি বুঝি?

নিজেরই পেট চলে না, তার বিয়ে।

সে তো ঠিকই। আমাদের গরিব দেশ, কত লোক খেতে পায় না।

খিদের কষ্টটা কি টের পান। আপনি তো একটা ঝিনচাক দেশে আছেন। শুনেছি সেখানে নাকি মানুষ বেশি খেয়ে মোটা হয়ে যাচ্ছে!

ঠিকই শুনেছেন। আমেরিকার সবয়েয়ে বড়ো প্রবলেম ওবেসিটি। খুব জাঙ্ক ফুড খায় তো!

ওই হট ডগ, পিৎজা, হ্যামবার্গার এইসব তো!

হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি তো বেশ জানেন দেখছি!

ওসব আজকাল সবাই জানে। পড়াশুনো করতে গেছেন, না চাকরি করতে?

দুটোই। আমি আই টি-র ছাত্র। আবার চাকরিও করছি।

বাঃ খুব ভালো। এখন তো আই টি-রই যুগ! আশ্চর্য! আপনি তো সত্যিই বেশ জানেন! চোর বলেই কি আর মুখ্যু? সামান্য হলেও বিদ্যে একটু আছে। রোজ খবরের কাগজ পড়ি।

না, না, আমি আপনাকে মূর্খ বলতে চাইনি। আসলে আপনার সঙ্গে কথা বলে মনে হচ্ছে আপনি অন্য সব চোরদের মতো নন।

কী করে বুঝলেন? কটা চোরের সঙ্গে আপনার আলাপ আছে?

তা নেই ঠিকই । আন্দাজ থেকে বলছি।

দিনকাল পালটে গেছে মশাই। এখন আর আগেকার মতো বোকা বোকা চোরের যুগ নেই। গেরস্তও যেমন চালাক-চতুর হয়েছে, চোরও হয়েছে সেয়ানা। আগে ঘরে ঘরে জানালায় শিক থাকত। সেটা বেঁকিয়ে ঘরে ঢোকা সোজা। আজকাল গ্রিল হয়েছে, সেটা বাঁকানো যায় না বলে আমাদের গ্যাস কাটার ব্যবহার করতে হয়। আর আমেরিকার চোররা তো রীতিমতো ইলেকট্রনিক এক্সপার্ট।

ঠিক কথা। খুব সঙ্কোচের সঙ্গে একটা কথা বলব?

বলুন না। আমি কথাটথা কইতে ভালোই বাসি।

কথা শুনলে জ্ঞানও বাড়ে।

বলছিলাম কী, আমাদের বাড়িতে ক্যাশ টাকা বেশি থাকে না। গয়নাগাঁটিও সব লকারে।

এই তো মাটি করলেন। গয়নাগাঁটি লকারে রাখতে গেলেন কেন? আজকাল তো ব্যাঙ্কের লকার থেকে দেদার জিনিস হাওয়া হয়ে যাচ্ছে। এটা কাঁচা কাজ হয়েছে মশাই।

লকারের জিনিসে ব্যাঙ্ক কোনো গ্যারান্টিও দেয় না। গেলেই গেল।

আপনি হয়তো ঠিক বলছেন। কিন্তু আমার মা-বাবার ব্যাঙ্কের ওপর অগাধ বিশ্বাস। তবে আপনাকে শুধু হাতে ফিরে যেতে হবে না।

ক্যাশ টাকা কোথায় পাওয়া যাবে আমি বলছি। রান্নাঘরে মিটসেফের মধ্যে একটা পুরোনো গ্ল্যাকসোর কৌটো আছে। বড় কৌটো। তাতে মুসুরির ডাল রাখা হয়। ওই ডালের

মধ্যে হাত চালালেই কিছু টাকা পাওয়া যাবে।

কত হবে? বিশ-ত্রিশ নাকি?

কিছু বেশিও হতে পারে। ধরুন শতখানেক।

দূর। ওসব পেটি ক্যাশ ছুঁই না আমি।

আপনার কাছে কি টর্চ আছে?

আছে। তবে চোরেদের আলো জ্বালানো বারণ। টর্চের কথা কেন?

বলছিলাম কি, টর্চ থাকলে আপনার একটু সুবিধে হবে। দক্ষিণ দিকে যে শোওয়ার ঘরটা আছে সেখানে গোদরেজের আলমারির নীচের তাকে চারটে অ্যালবাম পাবেন। সবুজ মলাটওলা অ্যালবামের ভিতরে খুঁজলেই অন্তত হাজারখানেক টাকা পেয়ে যাবেন।

আহা, শুধু ক্যাশ টাকাই তো আমার টার্গেট নয়। দামি জিনিস কিছু নেই? এরকম একটা ঘ্যামা বাড়িতে তো দামি দামি জিনিস থাকার কথা।

হ্যাঁ আছে। গোদরেজ আলমারির পাশেই আরও একটা আলমারি পাবেন। তার মধ্যে একটা ক্যামেরা, একটা হ্যান্ডিক্যাম আর পোর্টেবল ভি সি ডি অডিও ভিডিও প্লেয়ার পেয়ে যাবেন।

ওসব জিনিসের সেকেন্ড হ্যান্ড মার্কেট খুব খারাপ। কারণ হচ্ছে, ওগুলো সারা পৃথিবীতে এত একসেস প্রোডাকশন হয়েছে যে দামও কমে যাচ্ছে হু হু করে।

আপনি সত্যিই খবর রাখেন।

সেকেন্ড হ্যান্ড মার্কেটের খবর না রাখলে কি আমাদের চলে?

আচ্ছা এখন ওখানে ক'টা বাজছে বলুন তো!

দুটো পাঁচ। আপনি তো সাড়ে এগারো ঘন্টা পিছনে আছেন। ওখানে বোধহয় এখন দুপুর তিনটে পঁয়ত্রিশ। শনিবার।

মাই গড। আপনি শিকাগোর সময় জানলেন কী করে?

জানা শক্ত নাকি?

না, শক্ত নয়, তবে--। যাকগে, আপনার টার্গেটটা কি আমাকে একটু বলবেন?

না মশাই, কোনো টার্গেট ঠিক করে তো আর চুরি করতে ঢোকা যায় না। আর যা জোটে তাই নিয়ে পিছটান দেওয়ার মতো ছিঁচকে চোরও আমি নই। মেহনত করে ঢুকেছি, চারদিকে দেখেটেখে যা পছন্দ হবে নিয়ে যাব।

অ্যান্টিক কিছু আছে?

অ্যান্টিক! না, আমাদের বাড়িতে অ্যান্টিক কিছু আছে বলে তো জানি না। তবে ছিল। শুনেছি, আমাদের ঢাকার বাড়িতে ব্রিটিশ আমলের পুতুল, ঘড়ি, খেলনা, অয়েল পেন্টিং, এনগ্রেভিং, ফরাসি দেশের রুপোর চামচের সেট এই সব ছিল।

আপনাদের দেশ কি ঢাকা?

হ্যাঁ।

আমাদেরও ঢাকা। তবে শহরে নয়। গাঁয়ে।

বিক্রমপুর।

বাঃ, শুনে খুশি হলাম।

খুশি হওয়ার কিছু নেই মশাই, ঢাকাতেও শুনেছি, আমাদের তেমন সুখের সংসার ছিল না। কিন্তু আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনারা বেশ বনেদি বড়লোক।

না, না, বড়লোক নই। তবে ঢাকা শহরে আমাদের বেশ বড়ো ব্যবসা ছিল। মিষ্টির দোকান আর মনোহারি স্টোর। দেশত্যাগ হওয়ার পর ব্যবসা লাটে উঠল।

ঢাকায় গেছেন কখনো?

না। দেশ ত্যাগের সময় তো আমার বাবারই জন্ম হয়নি।

আপনার বাবার বয়স কত?

সাতান্ন। একথা কেন জিজ্ঞেস করলেন?

মিলিয়ে দেখলাম। বেঁচে থাকলে আমার বাবার বয়স হত পঞ্চান্ন।

বেঁচে নেই বুঝি?

না, ইস্কুল মাস্টার ছিলেন।

তাই? তাহলে আপনি এই লাইনে এলেন কেন?

কেন, এই লাইন কি খারাপ?

না, মানে চুরটুরি কি আর ভালো জিনিস?

হাসালেন মশাই, যে দেশের মন্ত্রী চোর, পুলিশ চোর, আমলা চোর, আপামর জনসাধারণের তিনজনের দুজন চোর সেই দেশে চুরি ভালো জিনিস না হবে কেন? আমার বাবা মাস্টারি করতেন, চুরির সুযোগ ছিল না, আর তেমনি কষ্ট পেয়ে অভাবে তাড়নায় ধুঁকতে ধুঁকতে অকালে চলে গেলেন।

আপনি কি বলতে চান যে, আপনার অবস্থা আপনার বাবার চেয়ে ভালো?

খারাপ কী বলুন! আমার মোটরবাইক আছে, মোবাইল ফোন আছে, ঘরে কালার টি. ভি, ফ্রিজ আছে। এমনকী রান্নাবান্না করে দেওয়ার জন্য একজন মাইনে করা লোকও আছে। আর হ্যাঁ, আমি সেলিমপুরে যে ফ্ল্যাটে থাকি সেটা আমার ওনারশিপ ফ্ল্যাট।

বলেন কি? তাহলে তো আপনি রীতিমতো এস্টাব্লিশড!

হ্যাঁ, তা বলতে পারেন। তবে নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখম।

আমার কম্বিনেশনে সংস্কৃত ছিল না। ওটার মানে কী?

আমার বাবা সংস্কৃতে মস্ত পণ্ডিত ছিলেন, আমাকে সংস্কৃত শিখতে হয়েছিল। আর যেটা বললাম, সেটার মানে আপনার না জানলেও চলবে।

আচ্ছা, আপনার কথাবার্তার পলিশ দেখে মনে হচ্ছে আপনি লেখাপড়া জানেন।

ওটা বলে লজ্জা দেবেন না। যা জানি তাকে লেখাপড়া জানা বলে না। আমাকে শিক্ষিত ভাবলে ভুল করবেন।

আপনি আমাকে খুব ডাইলেমায় ফেলে দিয়েছেন। আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না যে আপনি আমাদের বাড়িতে চুরি করতে ঢুকেছেন। এ যুগটা তো বোলচালেরই যুগ। যে যত বুকনি আওড়াতে পারে সেই তত খাতির পায়।

আমার কথা শুনে ইমপ্রেসড হবেন না যেন। ভুল করবেন, আমি সত্যিই চোর।

সেটাই তো ধাঁধায় ফেলেছে আমাকে। চোর হলেও আপনার বেশ স্ট্যাটাস আছে মনে হচ্ছে। আমাদের বাড়িতে কি আর তেমন কিছু পাবেন?

ঠিকই ধরেছেন। চোর হলেও আমি একটু উন্নাসিক।

হ্যাঁ, তাই ভাবছি আপনার মতো একজন হাইফাই বার্গলারের সম্মান রক্ষার মতো কিছুই তো আমাদের নেই।

আছে মশাই, আছে। একেবারে বিনা খবরে কি আমি সময় নষ্ট করতে এসেছি?

কী আছে বলুন তো।

উনিশশো আঠারো বা উনিশের একটা রোলেক্স ঘড়ি। বেশ বড়ো সাইজের। পুরোনো আমলের দম দেওয়া ঘড়ি। ঠিক কি না?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আছে। ওটা আমার দাদুর বাবার ঘড়ি বলে শুনেছি। ওটা বাবা খুব যত্ন করে রোজ দম দেন। আশ্চর্যের বিষয়, ঘড়িটা আজও চলে।

কে আপনাকে ঘড়িটার কথা বলল বলুন তো!

আমার একটা নেটওয়ার্ক আছে।

বাববাঃ, আপনি তো বেশ অর্গানাইজড ম্যান।

না হলে এ যুগে ব্যবসা চলবে কেন বলুন। আপনার বাবা এই ঘড়িটা সম্পর্কে সব ইনফর্মেশন ইন্টারনেটের মাধ্যমে জানিয়েও দিয়েছেন। আমি ইন্টারনেটেই সার্চ করে করে খবরটা পাই।

তার মানে আপনি ইন্টারনেটেই আমাদের ঠিকানা পেয়েছেন? তবে যে বললেন আপনি বাড়ির মালিকের নাম জানেন না, বাড়ির নম্বর জানেন না।

সাবধানের মার নেই মশাই, তাই একটু ন্যাকামি করতে হয়েছিল।

ঘড়িটা হলেই কি আপনার চলবে?

আপাতত ঘড়িটাই আমার টার্গেট। ওটার বাজারদর যাচাই করে দেখেছি পাঁচ থেকে সাত লাখ অবধি পাওয়া যেতে পারে।

বলেন কী? ওই ঘড়িটার এত দাম কে দেবে?

কালেকটাররা দেবে, কম্পানি নিজেও দেবে। ইন্টারনেটে রেগুলার ওদের বিজ্ঞাপন থাকে।

কালেকটারদের এজেন্টরা কলকাতাতেও আসে।

তবু আপনি নিজেকে শিক্ষিত বলতে চান না?

কেন বলুন তো! আপনি তো রীতিমতো শিক্ষিত মানুষ। ইন্টারনেট সার্ফ করেন মানে আপনি দুনিয়ার সব খবরই রাখেন।

না মশাই, বেশি খবর রেখে লাভ কী? আমার যেটুকু দরকার সেই খবরটুকু রাখি।

তার মানে আপনার কমপিউটারও আছে।

আছে। চাঁদনি মার্কেট থেকে অ্যাসেম্বল করিয়ে কিনে এনেছি।

ল্যাপটপও আছে নাকি?

না। তবে আপনার বাবার ঘড়িটা গ্যাঁড়াতে পারলে ল্যাপটপও হয়ে যাবে।

ঠিক আছে। বাবা দোতলার দক্ষিণের ঘরে থাকেন। পাশের ঘরে মা আর বোন। বাবার ঘরে একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিল আছে। তার ডানধারে টপ ড্রয়ারে ঘড়িটা পেয়ে যাবেন।

বাঃ, ইউ আর ভেরি কো-অপারেটিভ।

কিন্তু মুশকিল হল, দোতলায় সিঁড়ির মুখে কোলাপসিবল গেটে তালা দেওয়া আছে। আপনি তো আমেরিকায় থাকেন। জানেন কি সেখানকার কৃষ্ণাঙ্গ মাগারদের একটা গাড়ির লাগেজ বুট খুলতে ক'সেকেন্ড সময় লাগে? তিন থেকে পাঁচ সেকেন্ড।

ভগবান! আপনি কি আমেরিকাতেও হানা দিয়েছিলেন নাকি?

এ প্রশ্নের জবাব আপনার না জানলেও চলবে।

আমি কর্ডলেস ফোনটা নিয়েই ওপরে উঠছি। আপনি আমাকে গাইড করতে থাকুন।

আর একটা কথা। আমার বাবার ঘুম খুব সজাগ। সামান্য শব্দ হলেই জেগে যাবেন। যদি জেগে যান তাহলে কী করতে হবে, তা তো আপনাকে বলেই রেখেছি।

হ্যাঁ, মনে আছে। তাঁকে ফোনটা ধরিয়ে দেব এবং আপনি তাঁকে রি-অ্যাক্ট করতে বারণ করবেন।

একজ্যাক্টলি। আর দয়া করে ঘুমের ওষুধ স্প্রে করবেন না। আমার বাবার পেসমেকার আছে। কেমিক্যাল ওষুধে রি-অ্যাকশন হতে পারে।

আপনি আপনার বাবাকে খুব ভালোবাসেন, না?

খুব।

ভালো। এই ভালোবাসাটা বজায় রাখবেন। পিতা ধর্ম, পিতা স্বর্গ, পিতাহি পরম তপঃ, পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্বদেবতা।

আমি এই শ্লোকটার অর্থ জানি।

তা তো জানেন। কিন্তু বিয়ের পর অর্থটা যেন ভুলে যাবেন না। পিতার শ্রদ্ধা, মায়ে টান, সেই ছেলেই হয় সাম্যপ্রাণ।

এটা কার কথা বলুন তো!

একজন মহাপুরুষের। তিনি মানুষের ভালো চেয়েছিলেন।

আপনি কি দোতলা পৌঁছে গেছেন?

না। উঠছি। সিঁড়িটা খুবই অন্ধকার।

সাবধানে উঠবেন।

আচ্ছা, আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন আমার সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র আছে নাকি?

হ্যাঁ। সত্যিই নেই তো?

না, সত্যিই নেই, কিন্তু আপনার বাবার আবার পিস্তল বা রিভলভার আছে নাকি?

আছে।

এই রে! তাহলে তো বিপদের কথা।

না না। উনি খুব সাবধানী মানুষ। পিস্তল থাকলেও সেটা আলমারিতে তোলা থাকে। লোড করা থাকে না।

তাহলে পিস্তল রাখার মানে কী?

আমার মা পিস্তলটিস্তল একদম পছন্দ করেন না। আগে বাবা পিস্তলটা বালিশের তলায় রেখে শুতেন। মা রাগারাগি করে ওটাকে বিছানা থেকে বিদেয় করেছেন।

খুব ভালো কাজ করেছেন। আপনাদের বাড়িতে কুকুরও নেই দেখছি।

ছিল। একটা রাগি ডোবারম্যান। সেটা আমার খুব প্রিয় কুকুর। সেটা বুড়ো হয়ে মারা যাওয়ায় আমি কী কান্নাটাই না কেঁদেছিলাম! এখন কুকুর পোষার প্রশ্নই উঠে না। পেডিগ্রি কুকুর রাখার অনেক ঝামেলা। আমার মা-বাবা এখন আর অত পরিশ্রমের মধ্যে যেতে চান না।

ভালোই করেছেন। কুকুর থাকলে আমাকে অন্যরকম লাইন অফ অ্যাকশনের কথা ভাবতে হত।

না, না, ওসব ভাবতে হবে না আপনাকে। আই উইশ ইউ অল সাকসেস। উঠে পড়েছেন নাকি?

হ্যাঁ। ফোনটা একটু ধরে থাকুন। তালাটা খুলে নিই।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি ধরছি, আপনি খুলুন। ...হয়ে গেছে নাকি?

ইজি। তালা ফালা কোনো ব্যাপারই নয়। কিন্তু অন্য একটা মুশকিল দেখা দিয়েছে।

কী বলুন তো!

বাথরুমে জলের শব্দ হচ্ছে। কেউ বোধহয় বাথরুমে গেছে।

সর্বনাশ!

ভয় পাবেন না। আমার অসীম ধৈর্য, এখন কিছুক্ষণ অ্যাকশন বন্ধ করতে হচ্ছে। বুড়ো মানুষরা ঘুম ভাঙলে ফের সহজে ঘুমোতে পারেন না। আমি বরং এই ফাঁকে আপনাদের ছাদ থেকে একটু ঘুরে আসি।

বেশ তো। উঠে পড়ুন। তবে আমার বাবা রোজই ট্র্যাংকুলাইজার খেয়ে ঘুমোন। তাই বোধহয় ঘুমোতে অসুবিধে হবে না।

এটা তো উনি খুবই খারাপ করেন। ওসব খেয়ে শেষে অভ্যেস হয়ে গেলে স্বাভাবিক নিয়মে আর ঘুমোতেই পারবেন না। না খেলে উইথড্রয়াল সিম্পটম দেখা দেবে।

তাহলে কী করা উচিত?

পরিশ্রম। পরিশ্রমই হচ্ছে ঘুমের সবচেয়ে ভালো ওষুধ।

হার্ট প্রবলেম আছে বলে উনি পরিশ্রম করতে পারেন না।

আজকাল সফিসটিকেটেড পেসমেকার লাগালে কোনো প্রবলেম হওয়ার কথাই নয়।

পেসমেকার নিয়ে টেনিস খেলা, সুইমিং, জিম সব কিছুই করা যায়।

পেসমেকার সম্বন্ধে এত জানলেন কী করে?

জানা শক্ত কী? আপনার বাবাকে বলবেন, সাতান্ন বছর বয়সে আজকাল কেউ বুড়ো নয়, আর পেসমেকার মানেই জবুথবু হয়ে থাকা নয়।

বলব, নিশ্চয়ই বলব।

আপনাদের ছাদটা তো ভারি সুন্দর! টাইলস বসিয়েছেন নাকি?

হ্যাঁ।

আপনারা বেশ শৌখিন। তাই না!

তা বলতে পারেন। বাবা একটু বাবুগোছের মানুষ।

বুঝেছি।..... আপনি বোধহয় কোনো মেমসাহেবের সঙ্গে কথা বলে নিলেন একটু, তাই না?

সরি, আমার রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট একটা ব্যাপার জিজ্ঞেস করছিল।

আপনি তাহলে এখন অফিসে?

হ্যাঁ। পিক আওয়ার। এক হাতে ফোন, অন্য হাতে মাউস।

তাহলে তো মশাই, আপনার কাজের ডিস্টার্ব হচ্ছে!

আরে না না, কাজে ডিস্টার্ব হবে কেন? কাজ তো একটা সিস্টেমে চলে, তার জন্য অখণ্ড মনোযোগের দরকার হয় না।

আচ্ছা মেয়েটা আপনাকে কি হ্যালো সুইট হার্ট বলে ডাকল? ও তো পুরুষরা মেয়েদের বলে! না মশাই, আজকাল সব উলটে পালটে গেছে। যে কেউ যে কাউকে ডাকে।

মেয়েটা সত্যিই আপনার গার্লফ্রেন্ড নয় তো!

পাগল নাকি? মেয়েটা ব্ল্যাক, মোটা আর বোকা।

আমেরিকায় প্রেম ট্রেম হয়নি আপনার?

ক্ষেপেছেন? মেমসাহেবদের খপ্পরে পড়লে উপায় আছে? দুদিন পর যখন ছেড়ে যাবে তখন অ্যালিমনি দিতে দিতে ফতুর হতে হবে।

আজকাল বাঙালি ছেলেরা সেয়ানা হয়েছে। লক্ষ্মী ছেলের মতো একদিন দেশে এসে টোপর পরে বাঙালি মেয়ে বিয়ে করে নিয়ে যাবেন, তাই না?

উপায় কি বলুন? নইলে আলুপোস্ত, বেগুনপোড়া, ইলিশ ভাপে, ধোঁকার ডালনা ভুলতে হবে যে! বউয়ের সঙ্গে বসে রবীন্দ্রসংগীত, কি ভীষ্মদেব বা শচীনকর্তারগান শোনা বা সত্যজিৎ-তপন সিংহের ছবি দেখাও বন্ধ হয়ে যাবে। আপনার গার্ল ফ্রেন্ড নেই?

না। তবে একজনকে টার্গেট করে কিছুদূর এগিয়েছিলাম, হল না।

কেন মশাই? সে কি ডিচ করল নাকি?

ডিচ তো অ্যাকসেপ্ট করার পর করে। সে আমাকে অ্যাকসেপ্টই করল না কখনো।

স্যাড ব্যাপার বোধহয়?

হ্যাঁ, আমার পক্ষে তো স্যাড বটেই।

বলতে আপত্তি আছে?

আরে না। আমার লুকোছাপার কিছু নেই।

দাঁড়ান, বাথরুমের আলো এখনও জ্বলছে কি না দেখে নিই।

জ্বলছে?

হ্যাঁ। বোধহয় বড়ো বাইরে গেলেন। মুশকিল হল।

আপনার তাড়াহুড়ো নেই তো?

না। তবে কাজটা মিটে গেলে স্বস্তি পাওয়া যেত।

বাবা একটু পেটরোগা আছেন। তবে বাথরুমে বেশি সময় নেন না। ততক্ষণে আপনি গার্ল ফ্রেন্ডের কথাটা বলে নিন না। ততক্ষণে বাবার হয়ে যাবে।

কী আর শুনবেন! দুনিয়ার সব প্রেমের গল্পই এক রকম।

না, না তা কেন, প্রেম তো নানারকম আছে। ঝগড়া থেকে প্রেম, আক্রোশ থেকে প্রেম, মুগ্ধতা থেকে প্রেম, অনেক কম্বিনেশন আছে মশাই।

আমাদের ঠিক প্রেম হয়নি। ওয়ান ওয়ে ট্রাফিক। আপনাকে বলে রাখা দরকার, পুরুষ হিসেবে আমি মোটেই অ্যাট্রাকটিভ নই।

কী করে বুঝলেন?

আমার চেহারাটা একটু রুক্ষ টাইপের। রাগেড বলতে পারেন। মুখশ্রী মোটামুটি কুচ্ছিত। তবে আমার হাইটটা বেশ ভালো। ছয় ফুট এক ইঞ্চি।

বাঃ দারুণ হাইট তো!

হ্যাঁ, ওটাই আমার একমাত্র প্লাস পয়েন্ট, এ তো গেল চেহারা। গুণের কথা যদি জিজ্ঞেস করেন তবে বলতে হবে, আমি মোটামুটি খারাপ ছাত্র, কোনো বাড়তি গুণ, যেমন গানের গলা, ছবি আঁকার হাত, একস্ট্রা স্মার্টনেস এসব আমার নেই। মেয়েরা আমাকে অপছন্দ করে বলেই আমি যৌবনের একেবারে শুরু থেকে টের পেয়ে আসছি।

এগুলো কোনো বাধা নয়।

না, বাধা নয়। তবে চেহারা বা ব্যক্তিত্বে রিপালসিভ কিছু থাকলে অনেক সময়ে নিজে টের পাওয়া যায় না। আমাদের এক বন্ধু ছিল অশোক, তার চেহারা খারাপ ছিল না, মানুষও খারাপ নয়। পয়সাকড়িরও অভাব ছিল না, কিন্তু আমরা প্রায় সবাই ইউনিভার্সালি তাকে অপছন্দ করতাম। এই অপছন্দের কোনো লজিক্যাল ব্যাখ্যা কখনো খুঁজে পাইনি।

আচ্ছা, আপনি আত্মগ্লানি বন্ধ করে ঘটনাটা বলুন।

ব্যাকগ্রাউন্ডটা জানিয়ে রাখলাম। তাতে আপনার বুঝতে সুবিধে হবে। কয়েক বছর আগে আমি দিল্লি থেকে পূর্বা এক্সপ্রেসে ফিরছিলাম। সেকেন্ড ক্লাস থ্রি টায়ারে। এই মেয়েটিও তার মা বাবা আর মামা-মামির সঙ্গে বেড়িয়ে ফিরছিল। মিষ্টি চেহারা, ছোটখাটো এবং রোগা। বেশ লাজুক ধরনের সভ্য মেয়ে। ঠিক যে ধরনের মেয়ে আমরা সবাই পছন্দ করি?

হ্যাঁ, অনেকটা তাই। সুন্দরী আর মিষ্টির মধ্যে কিন্তু পার্থক্য আছে। এবং এই পার্থক্যটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট। সব সুন্দরীই কিন্তু মিষ্টি নন।

বটেই তো। আপনার চোখ আছে। আলাপ হল বুঝি?

না। প্রথমেই নয়। বললাম না, সে বেশ লাজুক ধরনের! তবে বাবা, মামা এবং মামি, এরা বেশ আলাপি মানুষ। কিউবিকলে মোট ছটা বার্থের মধ্যে পাঁচটাই ওঁদের। আমি একটা আপার বার্থে। ক্লোজ প্রকসিমিটিতে কিছুক্ষণ থাকলে আলাপ হয়েই যায়। আমি গোমুখ, গঙ্গোত্রী হয়ে একটা অতি দুর্গম পথে কেদার-বদ্রী পর্যন্ত ট্রেক করে ফিরছি শুনে মামাটি খুব ইমপ্রেসড। উনিও পাহাড় ভালোবাসেন। কাজেই আলাপ জমে গিয়েছিল। যতদূর মনে আছে, পাহাড়-পর্বতের কথাই হচ্ছিল। আশ্চর্যের বিষয় মেয়েটি আমাকে

অ্যাভয়েড করার জন্যই বোধহয় প্রায় লাগাতার বাইরের দিকে চেয়ে বসেছিল। সুন্দর হোক, কুচ্ছিত হোক, একটা পুরুষ তো! মেয়েরা এক আধবার তাকাবে না?

সেটাই তো স্বাভাবিক।

সেই স্বাভাবিক ব্যাপারটাই ঘটছিল না। মেয়ের মাও দেখলাম বেশ গম্ভীর প্রকৃতির। তাঁদের কিউবিকলে আমার উপস্থিতিটা তিনি বিশেষ পছন্দ আর করছিলেন বলে মনে হল না। তবে যাই হোক, ট্রেনের কম্পার্টমেন্টে তো আর বাছাবাছি চলে না। মানুষ আপনাকে অপছন্দ করলে বেশ বোঝা যায় তাই না?

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন।

মেয়েটির মামি তাঁদের স্টক থেকে আমাকে লুচি অফার করায় মেয়েটির মা এমনভাবে তাঁর দিকে তাকিয়েছিলেন যে আমি লুচি রিফিউজ করতে বাধ্য হই। হাসছেন? এখন অবশ্য ব্যাপারটা আমারও হাস্যকরই লাগে। তবে তখন ভারি খারাপ লেগেছিল। লুচি আমার অত্যন্ত প্রিয় জিনিস, আমার বেশ ইচ্ছেও হচ্ছিল মশাই, কিন্তু.......

যা বলেছেন। কতকাল যে লুচি খাইনি। টোস্ট আর দুধ সিরিয়াল খেয়ে খেয়ে মুখ পচে গেল। বিদেশে থাকার ওইটেই তো অসুবিধে।

হ্যাঁ, লুচির কথা কী যেন বলছিলেন?

হ্যাঁ, লুচির কথাটাই বলি। পাহাড়ে ট্রেক করতে গিয়ে খাবার দাবার বেশি জোটেনি। পয়সাও ফুরিয়ে এসেছিল। প্রায় পঁচিশ দিনের ট্যুরে ভরপেট খাবার ক'দিন জুটেছে তা হাতে গুনে বলা যায়। কাজেই লুচি দেখে লোভ হওয়ারই কথা।

তা তো বটেই। লুচি শুনে আমার তো এত দূরে বসেও কেমন যেন খিদে-খিদে পাচ্ছে। এবার মেয়েটির কথায় আসুন।

হ্যাঁ। মেয়েটির নাম ইতু, বয়স বেশ কম, সতেরো আঠারোর বেশি নয়। আমার তখন সাতাশ আটাশ।

গুড কম্বিনেশন।

কম্বিনেশন আর হল কই, আমার ইন-বিল্ট রিপালসিভনেসটা মেয়েটাকে সিঁটিয়ে রেখেছিল। এভাবেই হয়তো বাকি পথটা কেটে যেত। কিন্তু মাঝপথে একটা ঘটনা ঘটেছিল।

ঘটনা! সুইট সামথিং?

সুইট হওয়ারই তো কথা মশাই, কিন্তু যার কপাল খারাপ তার সকলই গরল ভেল।

আগে শুনিই না।

ব্যাপারটি হয়েছিল, ওদের পাঁচজনের টিকিটটা ছিল ইতুর কাছে। একটু আগে যখন পাটনায় টিকিট দেখতে এসেছিল তখন মেয়েটাই টিকিট বের করে দেখায়। এটুকু আমি দেখেছিলাম। তারপর মেয়েটা নাকি আনমনে টিকিটটা হাতে পাকিয়ে বেখেয়ালে একটা খালি খাবারের বাক্সের গার্ডারে গুঁজে রেখে দেয়। সেটা মনে ছিল না, তারপর হঠাৎ বাক্সটা নেড়ে সেটা খালি টের পেয়ে জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দেয়। তখন ভাগ্যিস সকালবেলা আর ট্রেনটা সবে পাটনা স্টেশন ছেড়ে ধীরে চলছে। মেয়েটা হঠাৎ চমকে উঠে বলল, এ মাঃ, আমি টিকিটটা ফেলে দিলাম যে! শুনে সবাই তো চেঁচামেচি শুরু করে দিল। হঠাৎ বিপদ ঘটলে অনেক সময়েই বুদ্ধি স্থির থাকে না। আমি তাড়াতাড়ি উঠে চেন টেনে বললাম, ব্যস্ত হবেন না, আমি দেখছি। বলে ট্রেন ভালো করে থামবার আগেই আমি নেমে পিছন দিকে ছুটতে লাগলাম। সবে পাহাড় পর্বতে চড়ে এসেছি, বডি খুব ফিট ছিল। কাজেই বেশ খানিকটা এবড়ো খেবড়ো জমি পেরিয়ে গিয়ে সাদা রঙের বাক্সটা পেয়ে গেলাম। গার্ডার থেকে টিকিটকা খুলে নিয়ে ফের দৌড়ে এসে কামরায় উঠে পড়লাম। গার্ড আর অ্যাটেনড্যান্ট এসে ব্যাপার স্যাপার জেনে একটু সতর্ক করে দিয়ে চলে গেল।

তখন তো আপনি হিরো!

অতটা না হলেও বরফ একটু গলল। ধন্যবাদ টন্যবাদ হল, 'বাবা, তুমি বাঁচালে', গোছের সাধুবাদও পাওয়া গেল, এমনকি এতক্ষণ আমাকে দর্শনযোগ্য মনে না হলেও ইতুও ভারি কৃতজ্ঞতার চোখে তাকিয়ে ক্ষমা চাওয়ার মতো কিছু একটা বলেছিল। আর ইতুর মা খুব উদ্যমের সঙ্গে প্রচুর লুচি খাওয়ালেন। সঙ্গে তরকারি, আচার, মিষ্টি।

যাক, মশাই, লুচিটা শেষ অবধি জুটেছিল?

হ্যাঁ। আমি রিফিউজ করার চেষ্টা করেছিলুম, তবে উনি ছাড়লেন না।

তারপর?

অবশেষে পাঁচজনের সঙ্গেই আমার বেশ সহজ সম্পর্ক হয়ে গেল। এমনকি ওঁরা ওদের বাড়িতে যাওয়ার জন্যও আন্তরিকভাবে নেমন্তন্ন করলেন।

গেলেন নাকি?

কী করব বলুন, মেয়েটাকে এতই ভালো লেগে গিয়েছিল যে মুখখানা কিছুতেই ভুলতে পারলাম না। সাধারণত ট্রেনের আলাপ ট্রেনেই শেষ হয়, কিন্তু আমার ভিতরে কী যে একটা গণ্ডগোল করে দিল মেয়েটা! তবে হ্যাংলার মতো পরদিনই ছুটে যাইনি। কয়েকদিন পর এক বিকেলে ঠিকানা খুঁজে গিয়ে হাজির হলাম। তাঁরা বেশ খাতিরও করলেন। এমনকী ইতুও এসে সামনে বসল। চা-টা খেয়ে চলে এলাম। প্রথমদিন খুব বেশিক্ষণ বসলে খারাপও তো দেখায়। কিছুদিন পর আবার গেলাম। ইতুদের বাড়ি আর ওর মামার বাড়ি হরিশ মুখার্জি রোডের একটা মাল্টিস্টোরিডের পাশাপাশি দুটো ফ্ল্যাটে। দুই পরিবারে খুব ভাব। মামার ছেলেপুলে নেই। আর ইতু তার মা-বাবার একটিই সন্তান। খুবই আদরের পাত্রী।

তখন আপনি কী করতেন?

না, তখনও আমি চোর হইনি। চাকরি বাকরির চেষ্টা না করে আমি একটা ব্যবসা করার চেষ্টা করছিলাম। তার আগে টু হুইলার সারানোর একটা দোকান দিয়েছিলাম পার্টনারশিপে। আমার লেবার, পার্টনারের ক্যাপিটাল। কিন্তু পার্টনার পার্টনারশিপ ভেঙে দিল। এরপর গুঁড়ো মশলা।

গুঁড়ো মশলা? অফ অল থিংস গুঁড়ো মশলা? কেন মশাই, টু-হুইলার ছেড়ে গুঁড়ো মশলা কেন?

আমাদের কি কোনো চয়েস আছে মশাই? এক চাক্কিওলার সঙ্গে একটু ভাব ছিল। সেই আমাকে পরামর্শ দিল, সস্তার হোটেলগুলোতে প্রচুর গুড়ো মশলার চাহিদা। সে আমাকে সাপ্লাইয়ের লাইন ধরিয়ে দেবে। সস্তায় মশলা কিনে এনে যদি তার চাক্কিতে পেষাই করে নিই তাহলে সে আমার ব্যবসায়ে টাকা খাটাতেও রাজি।

ব্যবসাটা কি চলেছিল?

হ্যাঁ। আর আশ্চর্যের বিষয় চাক্কিওয়ালা বিহারী লোকটা আমাকে সত্যিই সাহায্য করেছিল। বছর দুয়েকের মধ্যে আমার অবস্থা বেশ ভদ্রস্থ হয়ে উঠল। যে সময়ে ইতুর সঙ্গে আলাপ সেই সময়ে আমার মান্থলি ইনকাম প্রায় হাজার পনেরো টাকা নিট। ব্যবসা ভালো চলছে, এমন কি আমি কয়েকজন এজেন্টকেও কমিশন বেসিসে কাজ দিয়েছি। আমার সংসারের হালও ফিরেছে।

আপনার ফ্যামিলি কি বড়ো?

না। সেইটেই বাঁচোয়া। বাবা মারা গেছে, ছোটো বোন আর মাকে নিয়ে আমার ফ্যামিলি ছোটোই, তবে বোনের বিয়েতে কিছু ধার কর্জ হয়ে গিয়েছিল। লাভ ম্যারেজ বলে বাঁচোয়া। নেগোশিয়েট করে বিয়ে দিতে গেলে আরও ধসে যেতাম।

এবার ইতুর কথায় ফিরুন।

হ্যাঁ হ্যাঁ। দাঁড়ান, বাথরুমের আলোটা দেখে নিই।

নিভে গেছে?

হ্যাঁ। এবার ওঁকে ঘুমনোর সময়টুকু ছাড় দিতে হবে। তবে খুব বেশি দেরি করা চলবে না, রাত প্রায় তিনটে বাজে।

অন্তত মিনিট দশেক ছাড় দিন। অবশ্য সেফগার্ড হিসেবে আমি তো আছিই। তবু হঠাৎ মধ্যরাতে একটা চেঁচামেচি হওয়াটা ভালো নয়। আমাদের পাড়ায় আবার নাইট গার্ড ঘোরে। জানি। ওসব না জেনে কি আর কাজে নামতে হয়?

এবার বলুন।

ইতুর মামি একদিন তাঁদের ফ্ল্যাটে আমাকে ডেকে পাঠালেন। জিজ্ঞেস করলেন, আমি ইতুর প্রতি ইন্টারেস্টেড কি না। আমি সঙ্গে সঙ্গে কবুল করলাম যে, ইতুকে আমার ভীষণ পছন্দ। উইন তখন আমার বাড়ি ঘর রোজগার এ সবের খোঁজ খবর নিলেন। আমি সব বলে দিলাম। উনি বিরস মুখে বললেন, দ্যাখো বাপু, ইতু বাপের এক মেয়ে। মামারও বড্ড আদরের ভাগ্নি। তোমার যা অবস্থা তাতে স্বাভাবিক নিয়মে ইতুর সঙ্গে তোমার বিয়ে হওয়া সম্ভব নয়। তবে তোমাদের মধ্যে যদি ভাব-ভালোবাসা হয়ে থাকে তবে গার্জিয়ানরা কেউ আপত্তি করবে না। বরং তোমারও একটা হিল্লে হয়ে যাবে।

ইতুর মনোভাব কী বুঝলেন?

সেইটেই তো গল্প। আমি একদিন ওদের বাড়ির বাইরে ইস্কুলের পথে ওর সঙ্গে দেখা করলাম। যেমনটা নিয়ম আর কি। ইতু আমাকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ঘাবড়াল না। এমন কি রেস্তোরাঁয় গিয়ে বসতেও রাজি হল। যেন এসব তার কাছে কিছু নতুন ব্যাপার নয়।

অত তাড়াহুড়োর দরকার নেই। এ জায়গাটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট। একটু আস্তে ধীরে বলুন।

আপনি ভাবছেন একটা রোমান্টিক অ্যাফেয়ার? তা নয় মশাই, একেবারেই তা নয়। আমি প্রস্তাবটা উত্থাপন করতেই ইতু হঠাৎ হেসে ফেলল। তারপর একেবারে সোজা চোখে চোখ রেখে বলল, দেখুন, আপনি যে কেন ঘুরঘুর করেন তা আমি অনেক আগেই জানি। আরও কয়েকজন আমার সম্পর্কে আপনার মতোই আপনার মতোই দুর্বলতা প্রকাশ করেছে। কিন্তু আমি ইন্টারেস্টেড নই। আমার জীবনে কিছু অ্যাম্বিশন আছে। মাত্র সাড়ে সতেরো বছর বয়সে আমি আমার অ্যাম্বিশন বিসর্জন দিতে পারব না। আপনি প্লিজ, এসব নিয়ে আর ভাববেন না। মেয়েদের নিয়ে চিন্তা করা ছাড়া কি বাঙালি ছেলেদের আর কোনো কাজ নেই?

ইস, বড্ড কড়া মেয়ে তো! আপনি কী করলেন?

মনের দুঃখে ব্যবসা বন্ধ রেখে ফের হিমালয়ে চলে গেলাম।

হিমালয়ে?

হ্যাঁ। দেখলাম কিছু বিপজ্জনক মেহনত না করলে দুর্বল মনকে জব্দ করা যাবে না। প্রায় দেড় মাস ধরে আমি বিপজ্জনক সব পাহাড়ে ট্রেকিং করে বেড়ালাম। আর তখনই সিদ্ধান্ত নিই যে, মূল্যবোধ-টোধ সব বিসর্জন দিয়ে একটা ভয়ংকর কিছু করতে হবে। বিগ মানি, বিগ সাকসেস, বিগ ব্যাং। নারী চিন্তাকে আর প্রশ্রয় দেব না। ফিরে এসে কয়েকদিন গুম হয়ে বসে নিজের মনের ট্রানজিটারি স্টেটটাকে মোটিভেট করলাম। তারপর কাজে নামলাম।

কী কাজ?

অ্যান্টিক। হীরাভাই নামে এক গুজরাট অ্যান্টিক মার্টেন্ট আছে। তার সঙ্গে জুটলাম। হীরাভাই লোক চেনে। আমাকে তাড়াল না। বরং তালিম দিল কিছু। আমি তার হয়ে অ্যান্টিক জোগাড় করতে শুরু করি। এ ব্যবসায়ে জালি বা দু নম্বরি জিনিসের হাত বদলও খুব হয়। কলকাতার অ্যান্টিকের দোকানগুলোয় জালি জিনিসেরই কারবার। হীরাভাই আসল নকল ভালো বোঝে। তার ক্লায়েন্ট বা কালেক্টররা বোকা বা শৌখিন কাস্টমার নয়। কাজেই আমাকে জিনিসের সন্ধানে নানা জায়গায় হানা দিতে হতে লাগল, নানা অদ্ভুত লোকের সঙ্গে ভাব করতে হল, বিপদেও পড়তে হয়েছে বেশ কয়েকবার। এক বুড়ো পার্শি তো তার একশো বছরের পুরনো একটা চার নলা বন্দুক দিয়ে আমাকে গুলিও করেছিল।

মাই গড!

না, আমি তার জিনিস চুরি করতে যাইনি। গিয়েছিলাম দর করতে। তাই থেকে সামান্য অল্টারকেশন। বুড়োটা ক্ষ্যাপাটে গোছের। এই ব্যবসায়ে একটু-আধটু বিপদ আছেই। ভেরি ইন্টারেস্টিং। আপনার কি এখনও অ্যান্টিকেরই ব্যবসা?

হ্যাঁ। আমার ব্যবসাটা কিন্তু চোরাই জিনিসের নয়। বেশিরভাগ জিনিসই আমি কিনে নিই। তবে সব সময়ে কিনতে চাইলেই কেনা যায় না। যার জিনিস সে হয়তো অত্যন্ত বেশি দাম চায়, কিংবা কোনো দামেই বেচতে রাজি হয় না। তখন আমাকে একটু পরিশ্রম করতে হয়।

চুরি?

হ্যাঁ।

কিন্তু আপনি তো সাধারণ চোর নন?

কে বলল আমি সাধারণ চোর নই? আমি অত্যন্ত সাধারণ, অত্যন্ত নীতিবোধহীন চোর। একজন কনফার্মড চোর। তবে আমি চুজি। কারো বাড়িতে তাদের সোনাদানা বা টাকাপয়সা চুরি করতে যাই না। আমার টার্গেট শুধু অ্যান্টিক এবং তাও প্রপার নেগোসিয়েশন ফেল করলে, দর কষাকষিতে রফা না হলে, তবেই। কিন্তু তাবলে আমাকে মহৎ চোর বলে ভাববার কোনো কারণ নেই।

ঘড়িটা নিয়ে কি আমার বাবার সঙ্গে আপনার নেগোসিয়েশন হয়েছিল?

হ্যাঁ, ফোনে। উনি সাত লাখ টাকার এক পয়সা কমে ওটা ছাড়বেন না। অথচ আমার কাস্টমার পাঁচের বেশি দিতে চাইলেন না। মুশকিল কী জানেন, অ্যান্টিকের কোনো ধরাবাঁধা প্রাইস ট্যাগ নেই। মনে করুন একটা গুপ্ত যুগের কয়েনের দাম আমরা মোটামুটি এক লাখ টাকা ঠিক করে রাখলাম। হট হেডেড কালেক্টর বা কাস্টমার হলে এবং সে যদি জিনিসটার জন্য খেপে ওঠে তাহলে দশগুণ দাম দিয়ে নিয়ে যাবে। আর যদি কুল কাস্টমার হয়, তাহলে অনেক নীচে দর দেবে। এই অ্যান্টিকের বাজারটা কিন্তু অদ্ভুত।

তাই দেখছি, কিন্তু এসব কথার মধ্যে যে ইতু হারিয়ে গেল!

না, হারায়নি, সে আমার মনের মধ্যে আজও আছে। প্রত্যেক দিন, রাতে শোওয়ার সময় তার মুখ আমার মনে পড়বেই। ঠিক কথা, তার সঙ্গে আর আমার কোনো যোগাযোগ নেই, খবরও রাখি না। সম্ভবত তার বিয়েও হয়ে গেছে। তাতে অবশ্য কিছু যায় আসে না।

কিচ্ছু না?

না।

আপনি তার খবর রাখেন না কেন? এক আধবার ফোনও তো করতে পারেন!

কেন? তাকে তো আমার রক্তমাংসের শরীরে আর দরকারও নেই। ওয়ান ওয়ে প্রেমের তো ওইটেই সুবিধে। প্রত্যাশা থাকে না, প্রত্যাঘাত থাকে না, দখল থাকে না, কিন্তু

অন্যভাবে শি বিকামস দি ক্যাপটিভ লেডি। যখন মনের মধ্যে তার আর আমার খেলা শুরু হয়, তখন সে আমি যেমন বলাই তেমনই বলে, যেমন তাকে দেখতে চাই সে তেমনই সেজে আসে। সত্যিকারের ইতু হয়তো সেরকম নয়।

একটা কথা বলব?

বলুন না। তবে আমার হাতে কিন্তু আর সময় নেই। এবার অ্যাকশন।

দাঁড়ান, দাঁড়ান, বাবার ঘড়িটার জন্য আপনি কত দাম দিতে চান?

আমি চার লাখ বলেছিলাম।

আচ্ছা, যদি আমি ওঁকে ওই দরেই রাজি করাই?

আপনি! কেন বলুন তো! ওঁর কোনো ক্ষতি করব বলে ভয় পাচ্ছেন নাকি?

ভয় পাচ্ছি না, এমন কথা বলতে পারি না। চুরি করলে আপনি বিনা পয়সাতেই পেয়ে যাবেন। আর যদি আপনার দরে কিনতে চান, তাহলে বাবাকে আমি রাজি করানোর ভার নিতে পারি। দি চয়েস ইজ ইওরস।

চুরি করতে আমি আগ্রহী নই। কিন্তু হাতে সময় কম এবং কাস্টমার ডেটলাইন দিয়ে রেখেছে বলেই কাজটা করতে হচ্ছে।

প্লিজ! ভেবে বলুন।

ঠিক আছে। কিন্তু গ্যারান্টি কী?

আপনি কাল সকাল দশটা নাগাদ বাবাকে ফোন করলেই বুঝতে পারবেন এভরিথিং হ্যাজ বিন টেকেন কেয়ার অফ।

বলছেন?

বলছি। ইটস আ প্রমিস।

ঠিক আছে, আপনার প্রস্তাব আমি মেনে নিলাম। আপনি সত্যিই আপনার বাবাকে ভীষণ ভালোবাসেন। কিপ ইট আপ, কিপ ইট আপ। তাহলে আমি পাইপ বেয়ে নেমে যাচ্ছি।

দাঁড়ান। আরও একটু কথা আছে।

কী কথা?

ইতু সম্পর্কে।

ইতু সম্পর্কে আপনাকে তো সবই বলেছি।

আপনি বলেছেন, কিন্তু আমারও যে কিছু বলার আছে!

আপনি ইতু সম্পর্কে বলবেন? কী আশ্চর্য!

কিছু কিছু আশ্চর্যজনক ঘটনা আজও ঘটে বলেই জীবনটা আনইন্টারেস্টিং হয়ে যায় না।

তাহলে বলুন।

ইতু হরিশ মুখার্জি রোডে থাকে, তাই তো?

হ্যাঁ।

বয়স এখন উনিশ প্লাস বা কুড়ির কাছাকাছি?

হিসেব মতো তাই।

আমার ছকটা মিলে যায় যদি সে নিমচাঁদ বসুর মেয়ে হয়ে থাকে।

আপনি আমাকে খুব চমকে দিয়েছেন। হ্যাঁ, ইতু নিমচাঁদ বসুরই মেয়ে। চেনেন বুঝি?

চিনি। আর আপনি যেমন বলেছেন ইতু হচ্ছে সেরকমই, নরম সরম শান্ত, স্নিগ্ধ চেহারা। স্বভাবে বা মুখশ্রীতে কোনো উগ্রতা নেই। চোখ দুটিও ভীষণ মায়াবি।

সর্বনাশ! আপনিও যে তার প্রেমে পড়েছেন মশাই!

তাতে কি দোষ হয়েছে?

আরে না, না। দোষের কথা হচ্ছে না। পছন্দ হলে আপনি তাকে বিয়ে করে ফেলুন না। আমি আগাম অভিনন্দন জানিয়ে রাখছি। এত সহজে অধিকার ছেড়ে দেবেন?

অধিকার! হাসালেন মশাই, অধিকার কীসের যে ছেড়ে দেব? তার জীবনে আমি বরাবর একজন নন এন্টিটি। এবং তাতে আমার আর কিছু যায় আসে না। আপনাকে তো বললাম,

ইতু নয়, ইতুর ইমেজটাই আমাকে চমৎকার সঙ্গ দেয়। আই অ্যাম ভেরি হ্যাপি নাউ।

অনেকক্ষণ কথা বলে আপনাকে আমার খুব ভালো লাগল মশাই। আপনি একজন লাভিং কেয়ারিং, কনসিডারেট এবং ভদ্র মানুষ। আপনার মনটাও বেশ নরম। আমার মতো রাফ অ্যান্ড টাফ নন। আপনার সঙ্গে ইতুকে চমৎকার মানাবে।

জেনেটিক্স কিন্তু অন্য কথা বলে। জেনেটিক্স বলে, সমধর্মীর মিলন ভালো হয় না।

সায়েন্স-এর নিয়মে কি আর জীবন চলে মশাই? এসব না ভেবে ইতুকে বিয়ে করে আমেরিকায় নিয়ে গিয়ে জমিয়ে সংসার করুন। আপনার মতো সজ্জনের সঙ্গে বিয়ে হলে ইতু সুখী হবে।

তাতে কি আপনি খুশি হবেন?

ভীষণ। ওরকম ভালো একটা মেয়ে কোনো গোলমেলে লোকের পাল্লায় পড়লে খুব কষ্ট পাবে। আমি সত্যিই খুশি হব আপনি বিয়ে করলে।

কিন্তু ইতু খুশি হবে না।

কী করে জানলেন?

অভিজ্ঞতা থেকে।

কথাটার মানে বুঝলাম না।

বলছি। ইতুর সঙ্গে আমার বিয়ের কথা হয়েছিল। মোটামুটি কথা একরকম পাকাও হয়ে গিয়েছিল। গত জুলাই মাসে আমি কয়েক দিনের জন্য দেশে যাই মেয়েটির সঙ্গে পরিচয় করার জন্য। পরস্পরকে গ্রহণযোগ্য মনে হলে সামনের ডিসেম্বরে বিয়ে হওয়ার কথা।

কার কাকে পছন্দ হল না বলুন তো!

বলছি। ইতুর সঙ্গে প্রথম দেখা হওয়ামাত্রই আমার ওকে ভীষণ পছন্দ হয়ে গেল।

হওয়ারই কথা।

তারপর আমরা কলকাতাতেই একটা রেস্তরাঁয় দেখা করে নিজেদের সব সুবিধে আর অসুবিধের কথা পরস্পরকে জানাব বলে ঠিক হল। ফ্রি অ্যান্ড ফ্র্যাঙ্ক কথাবার্তা। গণ্ডগোলটা ঘটল সেখানেই।

কী গণ্ডগোল?

গণ্ডগোলটার নাম অনিরুদ্ধ মিত্র। নামটা কি চেনা-চেনা লাগছে? দীর্ঘশ্বাস ফেললেন নাকি? না না, অনিরুদ্ধ মিত্রকে আমি চিনি না। আপনার কি ধারণা আমি আপনার নাম পুলিশকে জানিয়ে দেব?

এটা আমার নাম তা আপনাকে কে বলল?

কেউ বলেনি। আমার অনুমান। ইতু আমার কাছে খুব করুণভাবে কনফেস করেছে যে, সে একজনকে ভালোবাসে। যাকে ভালোবাসে সে নাকি অভিমান বশে সম্পর্ক রাখছে না। হতেই পারে মশাই, হতেই পারে। ইতুর পাণিপ্রার্থী ও প্রেমিক তো আরও ছিল। অনিরুদ্ধ মিত্র তাদেরই কেউ হবে।

ইতুর বর্ণনা অনুযায়ী অনিরুদ্ধ বেশ লম্বা, টাফ লুকিং এবং দুঃসাহসী মানুষ। পাহাড়ে চড়ে এবং পরোপকার করে বেড়ায়। বোধহয় খুব একটা বলিয়ে কইয়ে ছেলে নয়। ইতু তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল বটে, কিন্তু সেটা একটা মেয়েলি অহংকার থেকে। সে প্রত্যাশা করেছিল, নিরস্ত না হয়ে অনিরুদ্ধ ফের আসবে। কিন্তু অনিরুদ্ধ যে অন্য ধাতুর মানুষ সে তা বুঝতে পারেনি। ইতু কিছুতেই তাকে ভুলতে পারছে না।

কে একজন অজ্ঞাতকুলশীল অনিরুদ্ধ মিত্রকে নিয়ে কি আমাদের মাথা ঘামানোর দরকার আছে মশাই?

ও হ্যাঁ, ভালো কথা। এই অনিরুদ্ধ মিত্রের সঙ্গেও ইতুর আলাপ হয়েছিল দিল্লি থেকে ফেরার পথে, পূর্বা এক্সপ্রেসে। এবং কী আশ্চর্য মিল যে, এই অনিরুদ্ধও ইতুর ফেলে-দেওয়া টিকিট কুড়িয়ে এনেছিল। চেনেন নাকি অনিরুদ্ধকে? মেয়েটা একেবারে যাচ্ছেতাই রকমের আহাম্মক।

কার কথা বলছেন? ইতু?

আপনার মতো ছেলে, কোয়ালিফায়েড, আমেরিকায় সেটেলড, তাকে ছেড়ে কোন ঢ্যাঙা রংবাজের পেছনে ঘুরছে! ছিঃ ছিঃ! আপনি ওকে বোঝাতে পারলেন না? এক কাজ করুন, এসব মেয়েদের মনের জোর কম হয়, আপনি ওকে জোর করে বিয়ে করে আমেরিকায় নিয়ে যান তো। ভালোবাসা পেয়ে গেলে অনিরুদ্ধর ঘা শুকোতে দেরি হবে না। জোর তো করাই যেত। ওর বাড়ির লোকরাও চাপ দিচ্ছিল। কিন্তু আমার বড়ো মায়া হল। চোখ দুটো টস টস করছিল জলে।

কেলো। চোখের জল দেখেই ভুলে গেলেন?

আপনি না পুরুষমানুষ!

পুরুষমানুষ তো আপনিও। ওই একরত্তি মেয়ের সামান্য কড়কানিতে ভড়কে গিয়ে তফাৎ হননি আপনি! জোর তো আপনিও করতে পারতেন।

না পারতাম না। গায়ের জোর ছাড়াও পুরুষমানুষের আরও কিছু জোরের দরকার হয়। যেমন লেখাপড়ার জোর, ক্যারিয়ারের জোর, টাকার জোর, ব্যক্তিত্বের জোর। এসব না থাকলে কীসের জোর ফলাব বলুন তো! যাই হোক, ওসব নিয়ে আর ভাববেন না। ওই অনিরুদ্ধ রংবাজের হাত থেকে যদি ইতুকে বাঁচাতে চান তাহলে টক করে চলে আসুন। বেচারি নিশ্চয়ই এতদিনে নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে।

তাই কি? কালই তো ওর ই-মেল পেলাম।

তাতে অন্যান্য কথার পর লিখেছে, আই ডোন্ট নো হাউ লং আই হ্যাড টু ওয়েট ফর হিম। বাট আই অ্যাম লাভিং টু ওয়েট।

মশাই, আমি একজন চোর। কনফার্মড চোর।

আমাকে আর প্রেমের প্রলাপ শুনিয়ে সময় নষ্ট করবেন না। ভোর হয়ে আসছে। এবার আমাকে সরে পড়তেই হবে। শুধু বলে যাচ্ছি, ইতুর এইসব ছেলেমানুষিকে একদম প্রশ্রয় দেবেন না। ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপঃ।

এর মানে কী?

মনের দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে তেড়েফুঁড়ে উঠুন। মেয়েটাকে দয়া করে বাঁচান।

ওকে বাঁচানোর লোক আছে। আমার কী গরজ, বলুন?

দাঁড়ান, ওই অনিরুদ্ধ রংবাজকে একটু কড়কে দিতে হবে।

হ্যাঁ এটা ভালো প্রস্তাব। খুব ভালো করে কড়কে দিন তো ছোকরাকে। তাকে বুঝিয়ে দিন যে, সে একটি মেয়ের প্রতি চূড়ান্ত অবিচার করছে। গাড্ডায় ফেলে দিলেন মশাই।

কথা দিলেন তো!

কীসের কথা?

অনিরুদ্ধকে রাজি করাবেন।

আচ্ছা জ্বালা তো! একটা ঘড়ি চুরি করতে এসে যে বড্ড চক্করে পড়ে গেলাম।

কথা দিন মশাই, কথা দিন।

ঠিক আছে। ঘড়িটার কথা যেন মনে থাকে।

চার লাখ। ক্যাশ ডাউন।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আর শুনুন। বাবাকে আমি একটা ল্যাপটপ কিনে দিয়ে এসেছি। সেটা বাবার কোনো কাজে লাগে না, পড়ে আছে। ওটাও বাবা আপনাকে ঘড়ির সঙ্গে দিয়ে দেবেন।

ওটা আবার কেন?

আপনাদের বিয়ের যৌতুক। আগাম।

কৈখালির হাটে

নামখানা জম্পেশ। বজ্রবাহু মণ্ডল। এই নাম শুনে প্রাইমারির মাস্টারমশাই হরিপদ গড়াই বলেছিল, তোর নামখানাই তো ভূমিকম্প রে। কিন্তু নাম ধুয়ে তো জল খাবি না বাবা, একটু লেখাপড়ায় মন দে।

তা দিয়েছিল বেজা। বজ্রবাহু বলে আর কে ডাকছে তাকে। বেজা নামই সকলের মুখে। তা বেজা লেখাপড়ায় তেমন বোবাকালাও ছিল না। প্রাইমারি ডিঙিয়ে হাই, তারপর হাইও ডিঙিয়ে গিয়েছিল। সেকেন্ড ডিভিশন। তা তা-ই বা কম কী? কিন্তু এইখানে তার লেখাপড়ার গাড়ি সেই যে থেমে গেল, আর নড়ল না। বাপ অজাগর মণ্ডল সাপকাটিতে মারা যাওয়ার পর বজ্রবাহুর মাথায় বজ্রাঘাত। সংসারের হাল না ধরলে শুকিয়ে মরতে হবে। বিধবা মা, আরও তিনটে ভাইবোন, বাপের ধারদেনা--সব মিলিয়ে বিশ বছরের বেজা হিমসিম। অজা মণ্ডলের তিন বিঘে জমি ছিল পার্টির দয়ায়। তার পাট্টা ছিল না বটে। অজা মণ্ডল মরার পর জমি নিয়ে বখেরা লেগে গেল। জয়েশ পুততুণ্ড লিডার মানুষ। সে বলল, ও জমি তো আমার, অজা ভাগে চাষ করত। জয়েশের ওপর কথা কইবে কে? সুতরাং জমি একরকম ভোগে চলে গেল।

বেজার যখন পাগল হওয়ার জোগাড় সেই সময়ে স্বর্গ থেকে দেবদূতের মতো নেমে এল নব হালদার। সেও লিডার মানুষ। জমিজমা, গরুবাছুর, পাকা বাড়ি নিয়ে ফলাও অবস্থা। তাকে ডেকে বলল, শোনো বাপু, তুমি লেখাপড়া জানা ছেলে, বুদ্ধি-বিবেচনাও আছে মনে হয়। যদি আমার প্রস্তাব মেনে নাও তাহলে ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

বেজা তখন সবাইকেই খুশি করতে মুখিয়ে রয়েছে, এতগুলো উপোসী মানুষকে রক্ষা না করলেই নয়। বলল, যে আজ্ঞে।

আমার মেয়ে মালতীকে তো দেখেছ বাপু। তাকে যদি বিয়ে কর তাহলে তোমার পাশে আমি আছি।

বেজা পক করে খানিক হাওয়া গিলে ফেলল। হাওয়ার ডেলাটা পেটে নামল না, গলাতেই বেলুনের মতো আটকে রইল। যাকে ঘাঁটাপড়া মেয়েছেলে বলে মালতী হল তাই। বয়সে না হোক বেজার চেয়ে তিন চার বছরের বড়ো। একবার বিয়েও হয়েছিল বিষ্টুপুরের নগেনের সঙ্গে। বছর না ঘুরতেই ফেরত এসেছে। তারপর থেকে মালতী আর বিয়েতে বসেনি বটে, কিন্তু পুরুষ-সঙ্গে তার খামতি নেই। সারা গাঁয়ে তাকে নিয়ে ঢি ঢি। নব হালদার মেয়েকে সামাল দেওয়ার মতো ক্ষমতা রাখে না। মালতী তার বাপকে কুকুর বেড়াল বলে মনে করে।

সেই মালতী হালদারকে বেজা বিয়ে করবে কি? সে গলায় বাতাসের বেলুনটা গিলে ফেলার চেষ্টা করল অনেকবার। হল না।

নব হালদার বলল, জমি ফেরত পাবে। তিন বিঘের জায়গায় পাঁচ বিঘে। আর একখানা তিন চাকার ম্যাটাডোরও দেব। নাও ভালো করে ভেবে দেখ।

পেটের দায় বড় দায়। তবু রাজি হতে সময় নিচ্ছিল বেজা। কারণ ইদানীং শোনা যাচ্ছে মালতী নরেশ লস্করের সঙ্গে নটখট করে বেড়াচ্ছে। আর নরেশ হল হলদিঘাটের খুনে গুণ্ডা। ডাকাতির মামলাতেও তার নাম আছে।

নব হালদারের মুখের দিকে চেয়ে বেজার মনে হল, লোকটা বড় নাচার। মালতীকে কারও ঘাড়ে না গছালে তার চলছে না।

বেজা বলল, যে আজ্ঞে।

নব একটু হাসল। বলল, তবে বাপু, বুঝতেই পারছ, মালতী আদরে মানুষ, তোমাদের ওই ভাঙা ঘরে তো আর থাকতে পারবে না। তুমিই দিব্যি এসে থাকবে আমার বাড়িতে। আলাদা ঘরটর আছে। খরচাপাতিও ধর আমারই।

বেজা মাথা নীচু করে রইল। ঘর-জামাই হতে তার আর আপত্তি কীসের?

এই ঘটনার দুদিন বাদে কৈখালির হাটে যাচ্ছিল বেজা। কুমোরপাড়ার মোড়ে মালতীর মুখোমুখি পড়ে গেল।

খুব রসের হাসি হেসে মালতী বিষবিছুটি মাখা গলায় বলল, এই যে নাগর, শুনলুম নাকি আমার সঙ্গে মালাবদল করার জন্য হাঁ করে আছ।

বেজা তটস্থ হয়ে বলল, ইয়ে-মানে আপনার আপত্তি থাকলে--

আহা, আমার আবার আপত্তি কী গো! আমি তো বরণডালা সাজিয়ে বসেই আছি। বলি ভালোমানুষের পো, মধু আর হুল দুটোই সইবে তো!

তারপর সে কী গা-জ্বালানো হাসি!

ভাবী বউয়ের রকমসকম দেখে বড্ড দমে গিয়েছিল বজ্রবাহু। তার নামটাই যা শক্তসমর্থ, সে অতি দুর্বল মানুষ।

তা মালতী যে চোখেই দেখুক তাকে, বিয়েটা কিন্তু হয়ে গেল। ঘটা পটা তেমন কিছুই নয়, তবে হ্যাজাক জ্বেলে, মন্ত্রপাঠ করে, দু-পাঁচ জনকে ভোজ খাইয়ে একরকম হল ব্যাপারটা। কিন্তু যখন একা ঘরে মালতীর মুখোমুখি হতে হল তাকে তখন যে বুকের ধুকপুকুনিটা শুরু হল তার সেটা অদ্যাবধি থামেনি।

বিয়ের রাতে মালাটালা পরে ঘরে ঢুকতেই প্রেতিনীর মতো সে কী খলখল করে হাসি মালতীর। যেন সং দেখাচ্ছে। বলল, বাঃ, বর তো দিব্যি সেজেছে দেখছি! তা এবার কী হবে গো! রসের খেলা নাকি? এস এস নাগর, দেখি তুমি কেমন পুরুষ।

নিজেকে এমন নপুংসক কখনো মনে হয়নি বেজার। তখন তার ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা। মালতী সম্বন্ধে শোনা ছিল তার। লোকে তাকে খারাপই বলে। কিন্তু বিয়ের রাতে যে অবস্থা করে তাকে ছাড়ল মালতী তাতে বেজার চোখ ভরে জল এসেছিল। মালতী শরীর ছাড়া কিছু বোঝে না। আর শরীর দিয়ে তাকে খুশি করার মতো মনের অবস্থাও ছিল না তার সেদিন। অপমানে, লজ্জায়, নিজেকে হীন ভেবে ভেবে ছোট হয়ে গিয়ে সেদিন সে একটা জরদগব। মালতী শেষমেশ একখানা লাথিও মেরেছিল তাকে। সঙ্গে অশ্রাব্য গালাগাল।

সেই রাতে গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে হয়েছিল তার।

কেন যে তার সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দিল নব হালদার তা সে খুব ভেবে দেখেছে। বেশি ভাবতে হয়নি অবশ্য। পরদিনই মালতীর বউদি মঙ্গলা তাকে আড়ালে ডেকে বলেছে, মেয়ের বদনাম ঘোচাতে তোমার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে আমার শ্বশুর। তুমি হলে শিখণ্ডী। সেইরকমই থাক। নইলে কপালে কষ্ট আছে।

মালতীর সঙ্গে এক ঘরে ওই একটা রাতই কেটেছে বজ্রবাহুর। পরদিন থেকেই সে পাশের খুপরিতে চালান হয়ে গেল।

বিয়ে যা-ই হোক, নব হালদার তাকে কথামতো জমি আর তিন চাকার ম্যাটাডোরখানা দিয়েছিল বটে।

সেই ম্যাটাডোরখানা চালিয়েই আজ কৈখালির হাটে এসেছে বেজা। গঙ্গারামের মাল বয়ে এনেছে গঞ্জ থেকে। হাট ভাঙলে ফের ফেরত নিয়ে যাবে। এই করে তার রোজগার কিছু কম হয় না। ছোট ভাই বিশালবাহু চাষবাস দেখে। পরিবারটা বেঁচে গেছে।

আশ্চর্যের বিষয় মালতী এখনও তার বউ। ঠিক বটে মালতীর সঙ্গে আজকাল তার একরকম দেখাই হয় না। তবু বিয়েটা টিকে আছে। মালতী বিয়ের দু-বছর বাদে এখন নতুন পুরুষ ধরেছে। খয়রাপোতার মহাজন বীরেশ মহান্তকে। বীরেশ ফুর্তিবাজ লোক, টাকা ওড়াতে ভালোবাসে। মালতীকে তার পছন্দও খুব। বেজা এসব দেখেও দেখে না। পাশের ঘরে যা হওয়ার হয়। বেজা তার খুপরিতে শুয়ে ঘুমোয়।

বেজা জানে, তাকে আজকাল কেউ মানুষ ভাবে না। তার অনেক বদনাম। কিন্তু বেজা ভাবে, লোকে যাই বলুক তার কর্তব্য সে করেছে। পরিবারটাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে।

কৈখালির হাট মানে এক বিচিত্র জায়গা। দোকান-পসার, বিকি-কিনির এমন রমরমা হাট এ তল্লাটে নেই। অন্তত দশ-বারো খানা গাঁয়ের লোক এসে হাটে ভিড় করে।

বজ্রবাহু ম্যাটাডোর এক চেনা দোকানির হেফাজতে রেখে হাট দেখতে বেরল। কেনাকাটাও কিছু আছে। ছোটো বোন সিতির জন্য একটা হাত-আয়না, মায়ের জন্য মালিশের ওষুধ, একখানা ভালো কাটারি--এইসব টুকিটাকি।

২

জিপগাড়িটা থামিয়ে পেচ্ছাব করতে নেমেছিল বীরেশ মহান্ত। বাঁশবনের ধারে নির্জন জায়গায় দাঁড়িয়ে প্রাকৃতিক কর্মটা সারতে সারতে তার মনে হচ্ছিল, পেচ্ছাবের সেই তেজটা যেন আর নেই। আগে যেমন মাটি খুঁড়ে ফেলত, সেরকমটা আর হয় না আজকাল। শরীরের সেই তেজবীর্য ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে হয়তো। কমারই কথা।

প্যান্টের জিপারটা টেনে জিপগাড়ির দিকে ফিরে আসছিল সে। জিপে মালতী বসা। ছেনাল মেয়েছেলেটা এই দুপুরে কেমন সেজেছে দেখ। জরির কাজ করা ঝলমলে লাল টকটকে শাড়ি, হাতায় কাজ করা ব্লাউজ, মুখে গুচ্ছের স্নো-পাউডার, কপালে মস্ত টিপ, ঠোঁটে রাঙা লিপস্টিক। একেবারে সং। তার ওপর মুখে একখানা ন্যাকা ন্যাকা খুকি-খুকি ভাব। আজকাল আর কেন যেন মেয়েছেলেটাকে পছন্দ হচ্ছে না তার।

জিপ গাড়িটার দিকে যেতে যেতেও থমকে দাঁড়ায় বীরেশ, পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরায়, একটু ভাবে।

কী গো! তোমার হল?

বীরেশ জবার দিল না।

দেরি হচ্ছে কেন? হাটে যেতে সন্ধে হয়ে যাবে যে!

বীরেশ সিগারেট খেতে খেতে ধীরে ধীরে একটা সিদ্ধান্তে আসতে লাগল। নাঃ, এবার এই মেয়েছেলেটাকে ঝেড়ে ফেলতে হবে। অনেক হয়েছে, আর নয়। এর একটা নামকাওয়াস্তে স্বামী আছে। মেনিমুখোটা পাশের ঘরে শুয়ে ঘুমোয়। মেনিমুখো হলেও লোকটাকে কখনো খারাপ লাগেনি বীরেশের। সরল, সোজা ছেলে। নাটকে একটা পার্ট করতে হবে বলে করে যাচ্ছে। পেটের দায় বলেও তো কথা আছে।

কই গো! জবাব দিচ্ছো না কেন?

মালতী জিপগাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে উঁকি দিল।

বীরেশ হাসল, বলল আসছি।

দেরি করছ কেন বল তো!

এই একটু হাত পায়ের আড় ভাঙছি।

একা সিগারেট খাচ্ছো? আমাকেও একটা দাও। বড্ড ঘুম-ঘুম পাচ্ছে।

এগিয়ে গিয়ে বীরেশ ওকে সিগারেট দিল। মেয়েছেলের সিগারেট খাওয়া কেন যেন পছন্দ হয় না বীরেশের।

গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিল বীরেশ।

তোমার আজ কী হয়েছে বলো তো। কেমন যেন আলগা আলগা ভাব! কী হয়েছে বলবে তো!

কিছু নয়, রোজ কি আর একরকম থাকা যায়?

বলি, আমি পুরনো হয়ে যাইনি তো!

তা একা তুমি কেন? আমিও তো পুরনো হচ্ছি।

জিপের পিছনে কয়েক পেটি মাল আছে। বীরেশের দিশি মদের ব্যবসা। কৈখালির হাটে মদের ব্যাপারীরা তীর্থের কাকের মতো চেয়ে বসে আছে। গিয়ে পড়লে পেটি নামাতেও হবে না, লহমায় বিক্রি হয়ে যাবে জিপগাড়ি থেকেই।

বীরেশ গাড়িতে হঠাৎ ব্রেক কষল।

মালতী বলল, কী হল থামলে কেন?

মদের গন্ধ পাচ্ছি যেন! বোতল ভাঙল নাকি?

মালতী হাসল, না গো, তোমার ফ্লাস্ক থেকে আমি একটু হুইস্কি ঢেলে খেয়েছি।

কখন?

যখন তুমি নেমে গিয়েছিলে তখন।

কেমন যেন এ ব্যাপারটাও পছন্দ হল না বীরেশের, যখন মানুষটার প্রতি অপছন্দের ভাব হয় তখন সেটা ধীরে ধীরে বাড়ে। তখন তার সব কিছুই অপছন্দ হতে থাকে।

বীরেশের সিটের ধারের খাঁজে বেটে মোটা বড়োসড়ো স্টিলের ফ্লাস্কটা রাখা। তাতে বরফ মেশানো দামি হুইস্কি। বীরেশ দিনের বেলা খায় না। সূর্য ডুবলে তবে এইসব।

গম্ভীর হয়ে আছো কেন বলো তো!

না, গম্ভীর হবো কেন? ঠিকই আছি।

না, তুমি ঠিক নেই। বলো না গো কী হয়েছে।

এই শুরু হল ন্যাকামি। এটাই সবচেয়ে অসহ্য।

হঠাৎ বীরেশ বলল, আচ্ছা, গায়ে অমন বিটকেল গন্ধ মাখো কেন বলো তো! মাথা ধরে যায়।

ও মাগো, বিটকেল গন্ধ কী? এই সেন্ট যে নিউ মার্কেট থেকে কিনে এনেছিলে তুমি।

আমি?

ও মা, মনে নেই?

তা হবে। গন্ধটা ভালো লাগছে না তো!

ঠিক আছে এটা না হয় মাখব না।

কৈখালির রাস্তা জঘন্য। মাঝে মাঝেই রাস্তার ছাল চামড়া উঠে গিয়ে কোপানো খেতের মতো অবস্থা, বড়ো বড়ো গর্ত, তার ওপর ধুলো তো আছেই। ঝপাং ঝপাং করে জিপ লাফাচ্ছে। তিন চারখানা গো-গাড়ি সামনে রাস্তা আটকে চলেছে অনেকক্ষণ ধরে। জিপ এগোতে পারছে না। ভারি বিরক্তিকর অবস্থা। ঘন ঘন হর্ন দিচ্ছে বটে, কিন্তু সরু রাস্তায় গো-গাড়িই বা সাইড দেবে কী করে?

দুটো হাঁচি দিল মালতী। তারপর রুমালে নাক মুখ চাপা দিয়ে বলল, এই রে! আমার আবার নাকে ধুলো গেলেই সর্দি হয়।

বীরেশ গো-গাড়িগুলোকে পাশ কাটানোর ফিকির খুঁজছে, সুবিধেমতো জায়গা পেলে রাস্তা থেকে ওভারটেক করে ফের রাস্তায় উঠবে। কিন্তু সেরকম সুবিধে পাচ্ছে না। ডানধারে ঝোপঝাড়, বাঁশ বন, গভীর নাবাল কিংবা পুকুর বা খেত।

ক্রমশ ধৈর্য হারাচ্ছে বীরেশ।

ওঃ, এত হর্ন দিও না তো! মাথা ধরে গেল।

হর্ন না দিলে হবে কেন? দেখছো না সাইড দিচ্ছে না।

তবু হর্ন বন্ধ করো।

বীরেশ অবশ্য কথাটাকে পাত্তা দিল না। হর্ন বাজাতে লাগল।

মালতী ফ্লাস্কটা তুলে নিয়ে বলল, একটু খাচ্ছি। বীরেশ বিরক্ত হল, কিছু বলল না।

মালতী ফ্লাস্কের ঢাকনায় হুইস্কি ঢেলে খেতে লাগল।

জিপটার বাঁহাতি স্টিয়ারিং বলে রাস্তাটা ভালো দেখতে পাচ্ছে না বীরেশ। সামনে একটা তুমুল ধুলোর পাহাড় উঠছে দেখে বুঝে নিল, উলটো দিক থেকে গাড়ি আসছে। গো-গাড়িগুলো জড়োসড়ো হয়ে থেমে পড়েছে। সুতরাং তাকেও থামাতে হল।

নেচে নেচে, কেতরে, বহু কসরত করে খানিক রাস্তায় চাকা নামিয়ে একটা ট্রেকার উলটো দিক থেকে এসে পার হয়ে গেল তাদের। ঝাণ্ডা লাগানো পার্টির গাড়ি।

ওই তো, ওরা তো সাইড পেয়ে গেল।

উলটো দিকের গাড়ি যে সুবিধেটা পায় সেটা যে সে পাবে না তা আর মালতীকে বোঝাবার চেষ্টা করল না বীরেশ। তবে সে একটা হিসেব-নিকেষ করে নিয়ে জিপটা ছাড়ল। ডানদিকের চাকা রাস্তার বাইরে খানিকটা নামানো যাবে। ছোট ছোট ঝোপ আছে বটে, তাতে আটকাবে না।

অ্যাকসেলেটর চেপে হর্ন দিতে দিতে জিপটার গতি বাড়িয়ে দিয়ে স্টিয়ারিং শক্ত হাতেই ধরে ডান বাঁয়ে মোচড় দিচ্ছিল বীরেশ।

কিন্তু কপাল খারাপ। বাঁয়ের সামনের চাকাটা বোধহয় একটা পাথরে লেগে গাড়িটা টাল খেয়ে ডান ধারে একটা লাফ মেরে উঠে ডান কাতে পড়ে গেল।

প্রথম ধাক্কাতেই গাড়ি থেকে ছিটকে গিয়েছিল বীরেশ। পড়ে চোখে অন্ধকার দেখল। আর কিছু মনে নেই।

গো-গাড়ির গাড়োয়ানরাই নেমে এসে ধরে ঘাসের ওপর শুইয়ে দিল তাকে। বাকিরা গিয়ে জিপের তলায় চাপা পড়া মালতীকে যখন বের করে আনল তখন তার শরীর নিথর হয়ে গেছে। হয়তো বেঁচেও যেত মালতী, যদি না মদের বোতলের ভারী পেটিগুলো তার বুক আর মুখের ওপর আছড়ে পড়ত।

৩

রাহুটা যে বড্ড প্রবল হে তোমার মেয়ের!

তাতে কী হয়!

ওঃ সে অনেক ফেরে পড়তে হয়।

বেঁচেবর্তে থাকবে তো!

তা থাকবে, শনিটাও যেন কামড়ে আছে।

তাতেই বা কী হয়, ভেঙে বলবে তো!

দাঁড়াও, ভালো করে দেখি। এ মেয়ে তো ভালো করে দেখতেই দিচ্ছে না হাত, বার বার টেনে নিচ্ছে।

শক্তিপদ একটা ধমক দিল মেয়েকে, অমন করছিস কেন?

বকুল খিলখিল করে হেসে বলে, সুড়সুড়ি লাগছে!

শক্তিপদ বিরক্ত হয়ে বলে, এ মেয়েকে নিয়েই হয়েছে আমার মুশকিল, বড্ড অশৈরণ। ক্ষণে ক্ষণে হাসি পায়। ক্ষণে ক্ষণে ব্যথা লাগে, সুড়সুড়ি লাগে, ভয় লাগে।

জ্যোতিষী হরুঠাকুর গম্ভীরভাবে শক্তিপদর দিকে চেয়ে বলে, একটাই নাকি?

মেয়ে এই একটাই। ছেলে আছে তিনটে, তা তাদের নিয়ে ভাবি না। এইটে হয়ে অবধি আমিও যেন বাঁধা পড়ে গেছি। মেয়ের বড্ড মায়া তো।

বয়স কত হল মেয়ের?

এই তো ষোলো পোরে আর কি। বিয়ের যোগটা একটু দেখ তো হরুঠাকুর।

দেখছি বাপু, দেখছি। দেখি মা হাতটা বেশ চ্যাটালো করে মেলে ধরো তো। বকুল হেসেই অস্থির।

তা লেগে যাবে খন বিয়ে।

কবে লাগবে?

শিগগিরই।

তোমাদের জ্যোতিষীদের মুশকিল কি জানো? সব আন্দাজে ঢিল। লেগে যাবে সে তো আমিও জানি। কিন্তু কবে লাগবে, পাত্তর কেমন হবে, সুখে ঘরসংসার করবে কি না সব বিস্তারিত না বললে হয়?

কেতুটা একটু ভেতরে যাচ্ছে বটে, তবে --

বকুল হাতটা এবার সুট করে টেনে নিয়ে বলে, ও বাবা, আমার হাত ব্যথা করে না বুঝি।

শক্তিপদ গলে গেল। মেয়ে হল তার প্রাণ। পাঁচ সিকে পয়সা ফেলে বলল, ওতেই হবে। কপালে যা আছে খণ্ডাবে কে?

হরুঠাকুর বলে, আর বাপু, গ্রহবৈগুণ্য যাই থাক মা মঙ্গলচণ্ডীর কবচটা নিয়ে গিয়ে ধারণ করাও। দামও বেশি নয়। কাজ হয়ে যাবে।

আচ্ছা, সে হবে খন। মেয়ে এখন নেপাল ঘোষের চপ খাওয়ার জন্য অস্থির। আসি হে ঠাকুর।

কৈখালির হাটে এসে যে নেপাল ঘোষের চপ না খেয়েছে সে আহম্মক। তিন রকমের চপ করে নেপাল। আলুর চপ, মোচার চপ আর ভেজিটেবল চপ। তিনটেই ঝুড়ি ঝুড়ি উড়ে যায়। দোকানের সামনে লম্বা লাইন।

জ্যোতিষীর কাছ থেকে উঠে এসে বকুল বলল, উঃ হাতটা একেবারে ব্যথা হয়ে গেছে। তুমি যেন কী বাবা!

শক্তিপদ কাঁচুমাচু হয়ে বলে, তোর নাকি শনির দৃষ্টি আছে। সেই জন্যই আসা। তবে হরুঠাকুর শনির কথাটা কিছু বলল না তো!

আমি তো ভালোই আছি। তুমি অত ভাবো কেন?

মেয়ের বড়ো মায়া। শক্তিপদ ঘরবাঁধা লোক ছিল না তেমন। কাজ কারবার নিয়ে ব্যস্ত মানুষ। চৌপর দিন তার মাথায় নানা বিকিকিনির চিন্তা। তিনটে ছেলে হয়েও তার স্বভাব ঘরমুখো হয়নি কখনো। কিন্তু তিন ছেলের পর মেয়েটা হতেই সে কাত। মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে তার বুকখানা যেন জলে ভরে উঠল। মা লক্ষ্মীরই কেউ হবে। মেয়ে হয়ে ইস্তক তার কাজ কারবারও ফেঁপে ফুলে উঠল। তিনটের জায়গায় সাতখানা ট্রাক হল, দুখানা বাস, তিনটে ট্রেকার, টাকায় ভাসাভাসি কাণ্ড।

চুড়ি কিনি বাবা? ওই তো পিন্টুর দোকান।

এক গাল হেসে শক্তিপদ বলে, কিনবি? তা কেন।

কাচের চুড়ি কম্মের জিনিস নয়। কয়েকদিন বেশ ঝলমল করে তারপর পট পট করে ভাঙে। আগে কাচের চুড়ি দু চোখে দেখতে পারত না শক্তিপদ। কিন্তু মেয়ে চাইলে ব্রহ্মাণ্ড দিতেও রাজি।

দুহাত ভরে চুড়ি পরে বাপকে দেখায় বকুল, কেমন দেখাচ্ছে বাপ?

খুব ভালো মা। তবে তুই তো দস্যি মেয়ে, চুড়ি ভেঙে যেন হাত রক্তারক্তি করিস না।

পাঁচটা টাকা পিন্টুর কোলে ফেলে, মেয়ে আগলে এগোয় শক্তিপদ। তা এগোয় সাধ্যি কি।

দু-পা এগিয়েই মেয়ের বায়না, পুঁতির মালাগুলো কী সুন্দর না বাবা?

হ্যাঁ, তা ভালোই।

না তেমন দামি জিনিসটিনিস নয়, এইসব ছোটোখাটো জিনিসেরই বায়না বটে মেয়ের।

ও বাবা, ওই দেখ নেপালের দোকানে লাইন।

লাইন দেখে শক্তিপদর চোখ কপালে।

ও বাবা, এ যে ঘন্টাখানেক লেগে যাবে। আমার যে খিদে পেয়েছে বাবা!

তাহলে চল বিশ্বনাথের দোকানে একটু মিষ্টি খেয়ে নে।

এ বাবা, মিষ্টি খাই নাকি? চপই খাবো।

দাঁড়া দেখি, লাইনে চেনা মানুষ পাই কি না।

কৈখালির হাটে চেনা মানুষের অভাব নেই তার। সে তালেবর লোক। সবাই চেনে।

লাইনের পাশ দিয়ে এগোতেই একেবারে সামনের দিকে বজ্রবাহুর সঙ্গে দেখা।

বেজা নাকি রে?

শক্তিদা যে! কী খবর?

তা চপ নিচ্ছিস বুঝি?

হ্যাঁ।

আমার জন্যও নিস তো কয়েকখানা। তিন রকমেরই নিবি, এই পয়সা।

দূর। পয়সা রাখো। ক পয়সাই বা দাম।

বাঁচালি বাপ। মেয়েটা তখন থেকে খিদেয় কাতর।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে বেজা গরম গরম চপ নিয়ে এল শালপাতার ঠোঙায়। এনেছেও মেলা।

মেয়েটা হাঁ করে তাকিয়ে বজ্রবাহুকে দেখছিল।

এই তোমার মেয়ে বুঝি?

হ্যাঁ।

তোমার তো মেয়েঅন্ত প্রাণ।

শক্তিপদ একটু লজ্জার হাসি হাসল। সবাই তাই বলে বটে। মেয়ে নাকি শক্তিপদকে একেবারে বশ করে রেখেছে। তাতে একটু অহংকারই হয় তার। মেয়ে তো নয়, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী।

ঘাসের ওপর তিনজন বসেছে ত্রিভুজ হয়ে। চপ খেতে খেতে শক্তিপদ বলে, তা সেই ডাইনির খপ্পরেই এখনও পড়ে আছিস!

সবই কপাল শক্তি দাদা। পেটের দায়ে মেনে নিতে হয়েছে।

সবই জানি। তোর জন্য দুঃখও হয়। গেছো মেয়েছেলেটার তো গুণের শেষ নেই। তা এখন তোর সঙ্গে কেমন করে?

মাথা নেড়ে বেজা বলে, না দাদা, সম্পর্ক নেই। আমি হলুম গিয়ে শিখণ্ডী। নব হালদারের প্রেস্টিজ রাখতে আমাকে দরকার ছিল।

মেয়েটা চপ তেমন খাচ্ছে না। খুব হাঁ করে তাকে দেখছে। বজ্রবাহুর চেহারাটা খারাপ নয়। বহু মেয়েই তাকায়। কিন্তু সে নিজে আর মনের দুঃখে মেয়েদের দিকে তাকায় না। তার জীবনটাই অন্ধকার হয়ে গেছে।

তুমি তো খাচ্ছো না খুকি!

মেয়েটা হঠাৎ লজ্জা পেয়ে মুখ নামায়। ভারি লক্ষ্মীশ্রী আছে মুখখানায়।

বজ্রবাহু বলল, চপে বড্ড ঝাল দেয় নেপাল। তুমি বোধ হয় ঝাল খেতে পারছো না! জিলিপি খাবে? শ্রীধরের জিলিপি ভারি ভালো। সাড়ে আট প্যাঁচের জিলিপি। খাবে?

মেয়েটা চুপ করে আছে। মাথা নীচু। হাসছে।

দাঁড়াও নিয়ে আসি।

বজ্রবাহু গিয়ে গরম জিলিপি নিয়ে এল। মেয়েটা লজ্জায় হাত বাড়িয়ে নিল ঠোঙাটা। বাপকে দিল, বজ্রবাহুকে দিল। নিজে একখানা একটু একটু কামড়ে খেতে লাগল। কিন্তু যেন খাওয়ায় মন নেই।

শক্তিপদ জিজ্ঞেস করে, তা হ্যাঁরে বেজা, তোর ভ্যান চলছে কেমন?

ভালোই। নব হালদার ও ব্যাপারে ঠকায়নি।

কেমন হচ্ছে টচ্ছে?

খারাপ নয় দাদা। একখানা ছোট ট্রাক বায়না করেছি। সামনের মাসেই পাবো। তখন আমি চালাব। ছোট ভাইটাকে এটা দেবো।

ভালো খুব ভালো। ধীরে ধীরে রয়ে সয়ে হোক। আমারও তো ওই রকম ভাবেই হয়েছে কি না।

জানি। তুমি একটা দৃষ্টান্তই তো চোখের সামনে।

শক্তিপদ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, তোর মতো একটা ছেলে যদি পেতাম--

কথাটা শেষ করল না শক্তিপদ। শেষ করার দরকারও ছিল না। সবাই বোঝে।

আমার কথা ভেবো না দাদা। খারাপ ভাগ্য নিয়ে জন্মেছিলাম। এভাবেই জীবন যাবে।

৪

শেফালীর চোখ টকটকে লাল। বিস্তর কেঁদেছে। দিদি মরায় তুমি তো খুশিই হয়েছো জামাইদা, তাই না?

মাথা নেড়ে বেজা বলে, না শেফালী, খুশি হবো কেন? মালতী যেমনই হোক, একটা মানুষ তো। একজন মানুষ মরলে কি খুশি হওয়ার কথা।

আমরা জানি, দিদি কি রকম ছিল।

তোমার ওপর অনেক অন্যায় অত্যাচার হল। তুমি ভালো লোক। এ বাড়ির সবাই কিন্তু তোমার সুখ্যাতি করে।

উদাস মুখে বেজা বলে, তা হবে হয়তো। তোমাকে আমার একটা কথা বলার ছিল।

কী কথা শেফালী?

সে তোমাকে বাবা বলবে। যা বলবে ভেবে দেখো। দিদি খারাপ ছিল বলে ভেবো না যে আমরা সবাই খারাপ।

তা ভাববো কেন?

মালতী মারা গেছে এই দিন সাতেক হল। বীরেশ সামন্ত বেঁচে গেছে। ঘটনাটা নিয়ে সারা গাঁয়ে ফিসফাস গুজগুজ চলছে তো চলছেই।

বজ্রবাহু একটা মুক্তির স্বাদ টের পায় বলে বটে, কিন্তু তার আনন্দ হয় না। বরং একটু দুঃখই হয় মালতীর জন্য। জীবনটা ছড়িয়ে ছিটিয়ে মিসমার করে দিয়ে গেল। নিজে মরল, খানিক মেরে রেখেছিল বজ্রবাহুকেও। মেয়েমানুষকে আজকাল একটু একটু ভয় পায় বজ্রবাহু।

নব হালদার সকালে তাকে ডেকে বলল, সব তো শেষ হয়ে গেল, দেখলে তো! মেয়েটাকে নিয়ে আমার শান্তি ছিল না। এখন ভাবি, তোমাকেও কষ্টের মধ্যে ফেলেছিলাম হে।

না না, কষ্ট কীসের?

কষ্ট নয়? খুব কষ্ট। সবই টের পেতাম। কিন্তু একটা কথা বলি।

কি কথা?

সম্পর্কটা ছাড়ান কাটান হোক আমি তা চাই না।

বজ্রবাহু চুপ করে থাকে।

তোমার দিকটা আমি যেমন দেখছিলাম তেমনই দেখব।

বজ্রবাহু চুপ।

একটা প্রায়শ্চিত্তিরও হবে। বলছিলাম যদি শেফালীকে বিয়ে করো তবে সব দিক বজায় থাকে। সে ভারি ভালো মেয়ে। মালতীর একটা রক্তের দোষ ছিল হয়তো। কিন্তু শেফালী তেমন নয়।

শেফালী ভালো মেয়ে, আমি জানি। কিন্তু প্রস্তাবটা ভেবে দেখতে হবে।

শোকাতাপা নব হালদার দুর্বল গলায় বলে, তুমি ঠকবে না বাবা, কথা দিচ্ছি।

বজ্রবাহু বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে বলে জিনিসপত্র গুছিয়ে ফেলেছিল। শাশুড়ি আর শেফালী আড় হয়ে পড়েছিল।

শাশুড়ি বলেছিল, যাবে কেন বাবা? আমরা কি পর?

শেফালীর মালতীর মতো চটক নেই। কিন্তু সে ভালো মেয়ে, এটা বুঝতে পারা শক্ত নয়। কিন্তু ভালো মেয়ে বলেই যে ঘাড় পাততে হবে এমন কোনো কথা নেই। চার বছর বাদে একটা সম্পর্কের গারদ থেকে মুক্তি পেয়েছে বজ্রবাহু। ফের আবার একটা সম্পর্কে জড়িয়ে পড়তে তার মন চায় না। তাছাড়া এই বাড়ির অনুষঙ্গও তো আছে। শেফালীকে বিয়ে করলে এখানেই বাস করতে হবে। সেটা কি পারবে সে?

তবে নব হালদারকে চটাতেও চাইছে না বেজা, সবে তার ব্যবসা জমে উঠেছে। নব চটলে কোন কলকাঠি নেড়ে তাকে পথে বসায় কে জানে। নবর পিছনে পার্টিও আছে।

সুধাপুর থেকে নবগঞ্জ পর্যন্ত টানা একটা ট্রিপ মারল বেজা, নবগঞ্জেই রাতের ঠেক। চেনা জায়গা। হরিরামের দোকানে মাল খালাস করে সে পয়সা বুঝে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। জোর শীত পড়েছে এবার। সুফল মিত্রের পাইস হোটেলে খেয়ে সে তার ম্যাটাডোরে রাত কাটাবে বলে ফিরছিল। দূর থেকে দেখতে পেল, অন্ধকারে কে একজন তার ম্যাটাডোরের পাশে দাঁড়িয়ে।

বেজা নাকি রে?

শক্তিদাদা যে! এখানে?

একটা ট্রাক ফেঁসেছে। তাই আসা। কে যেন বলল, তুইও এখানে। তাই ভাবলুম দেখাটা হয়ে যাক।

ভালো করেছো।

আজ ফিরবি না?

খামোখা তেল পুড়িয়ে লাভ কি? রাত কাটালে সকালে হয়তো একটা ট্রিপ হয়ে যাবে। মুকুন্দ হালদারের মাল যাবে বলে মনে হচ্ছে।

তা ইয়ে বলছিলাম কি, খুব বরাতজোর তোর!

মালতীর কথা বলছো তো!

খুব বেঁচে গেলি।

বাঁচলুম তো, কিন্তু মনটা ভালো নেই।

কেন বল তো!

নব হালদার ফের বেঁধে ফেলতে চাইছে।

সে কী?

তার ছোট মেয়ে শেফালীকে বিয়ে করার জন্য ধরে পড়েছে খুব। চটাতে ভরসা হয় না। ম্যাটাডোরখানাই তো ভরসা, যদি কেড়ে কুড়ে নেয়। তার লোকবলও তো আছে।

একটু চেয়ে থেকে শক্তিপদ একটু হাসল, তা বটে। তবে অত ভয় খাস না। শক্তিপদ এখনও মরে যায়নি।

তুমি আর কী করবে দাদা! সবই আমার কপাল।

শোন রে বাপু, অত কপালের ওপর বরাত দিয়ে বসে থাকিসনি। এবার একটু পুরুষ হ। লেখাপড়া জানিস, বুদ্ধি আছে, শুধু সাহসটারই যা অভাব।

ঠিকই বলেছো। সাহসেরই অভাব। নইলে কি আর-- যাকগে।

কথা দিয়ে ফেলিসনি তো?

না। সময় নিয়েছি।

ভালো করেছিস। কাল ফিরে একবার আমার বাড়ি যাস। কথা আছে।

ঠিক আছে দাদা। ব্যাপারটা কী!

বড় অশান্তি যাচ্ছে আমার। চিকিচ্ছের দরকার।

কার চিকিচ্ছে?

বলব 'খন।

শক্তিপদর বউ পদ্ম রাগে ঝনঝন করছিল, আসকারা দিয়ে দিয়ে মেয়েটাকে মাথায় তুলেছে, এখন যা মনে চায় তাই করে। তিন দিন মেয়ে কুটোটি দাঁত কাটছে না। বলি এরকম কতদিন চলবে রে হতভাগী?

বিছানায় দক্ষিণের জানালার দিকে মুখ করে শুয়ে আছে বকুল। মুখখানা শুকনো।

বলি রাগটা কার ওপর? কী চাস কী তুই?

বকুল কিছু বলছে না।

পদ্ম বলল, এরপর কি আমি গলায় দড়ি দেবো? তাই চাস?

বকুল চুপ করে চেয়ে আছে। জানালার বাইরে আতাগাছের ডালে ফিঙে পাখি নেচে বেড়াচ্ছে। দুটো প্রজাপতি ঢুকল ঘরে। ফের বেরিয়ে গেল।

মা!

পদ্ম ফিরে চাইল, কী?

আমার শীত করছে। লেপটা টেনে দাও তো গায়ে।

লেপ টেনে পদ্ম তার কপালে হাত রাখল। গলা নেমে এল খাদে, না জ্বর তো নেই। এক গেলাস দুধ দিই মা, খা।

তুমি কেন বললে আমি তিন দিন খাইনি! আমি তো রোজ খাই।

সে তো এতটুকু করে। মুখরক্ষা করার জন্য। ও কি খাওয়া? বলি, উপোস দিচ্ছিস কেন রে মুখপুড়ি?

মনটা ভালো নেই মা।

কেন, সেটা বলবি তো!

পরে বলব। সময় হয়নি। বাবা কোথায় বলো তো!

তার কি আর সময় অসময় আছে! এ সময়ে লোকজন আসে, ব্যবসাপত্তরের কথাই হচ্ছে হয়তো। ঘরসংসারে কি তার মন আছে? ওই তো আসছে বুঝি। খুব হন্তদন্ত দেখছি যেন!

শক্তিপদই। ঘরে ঢুকেই বলল, ওগো, মেয়ের চিকিচ্ছের ব্যবস্থা হয়েছে।

চিকিচ্ছে! কিসের চিকিচ্ছে?

সে আছে, তুমি বুঝবে না। তবে বজ্রবাহু এক কথাতেই রাজি।

কীসের রাজি গো? এ তো বড় সাঁটের কথা কইছো দেখি।

তা সাঁটই ধরে নাও। মেয়ে পেটে ধরেছো, এখনও ওর মনের কথা বুঝতে পারো না, কেমন মা তুমি? আমি চলি, মেলা লোক বসে আছে।

শশব্যস্তে চলে গেল শক্তিপদ।

ওমা! তুই মুখচাপা দিয়ে হাসছিস যে বড়! কী হল বল তো! এসব কী? আমি যে বুঝতেই পারলুম না।

দুধ দেবে বলেছিলে যে!

সে তো বলেছিলুম।

শিগগির নিয়ে এসো। আমার বড্ড খিদে পেয়েছে।

পারিজাত ও ছোটোকাকা

আপনি কি পুলিশের লোক?

কেন বলুন তো! আমাকে কি পুলিশের লোক বলে মনে হয়?

আজকাল কাউকে দেখে কি কিছু বোঝা যায়, বলুন। আমাদের নিমাইবাবুর কথাই ধরুন না কেন। দিব্যি মোটাসোটা, হাসিখুশি, দিলদরিয়া, নির্বিরোধী মানুষ। ভিখিরিকে ভিক্ষে দেন, কীর্তন শুনে কাঁদেন, পাড়ার বাচ্চাদের সঙ্গে ছুটির দিনে ব্যাটবল খেলেন, ঘরে ঠাকুর দেবতার ছবি আছে। অথচ একদিন সকালে তাঁর বাড়ি পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ। তাঁর শোওয়ার ঘরের খাটের তলা দুটো এ কে ফর্টি সেভেন অ্যাসল্ট রাইফেল, দুটো বেলজিয়ান পিস্তল, আর ডি এক্স, কার্তুজ আরও কী কী সব যেন বেরোলো। আমাদের এক গাল মাছি।

নিমাইবাবু ধরা পড়লেন বুঝি।

পাগল! শুনলুম, ওই থলথলে চেহারা নিয়েও তিনি নাকি নিজের বাড়ির ছাদ থেকে পাশের বাড়ির ছাদে লাফিয়ে পড়ে হাওয়া হয়েছেন। তাই বলছিলুম, লোক দেখে আজকাল আর কে যে কী তা চেনা মুশকিল। শুনলুম নিমাইবাবু নাকি কোন টেররিস্ট দলের সর্দার। বুঝুন কাণ্ড।

তা আমাকে দেখে কী মনে হয় আপনার?

শার্লক হোমস হলে বলতে পারতুম। তবে এমনিতে আপনাকে একজন মধ্যবয়স্ক, মধ্যবিত্ত, মধ্যশিক্ষিত, মধ্যম উচ্চতা ও মধ্যম স্বাস্থ্যের ভদ্রলোক বলেই মনে হয়। একজোড়া সন্দেহজনক জম্পেশ গোঁফ থাকলেও আপনাকে ভয়ংকর মানুষ বলে মনে হয় না। আর ওইটেই হয়েছে মুশকিল। আজকাল লোক দেখে চেনার উপায় নেই কিনা।

কথাটা যে খুব ভুলে বলেছেন তা নয়। আমি ভয়ঙ্কর লোক নই। তবে আমাকে যে কেন পুলিশ বলে আপনার মনে হল সেইটেই বুঝতে পারছি না।

বলছি বলে কিছু মনে করবেন না। আজ ছুটির দিনটা বাড়িতে বসে কাটাবো না ঠিক করে সকালে রুটি তরকারি খেয়ে যখন বেরোলাম তখন শরৎকালের আকাশ দেখে মনটা ভারি খুশি হয়ে উঠল। শরৎ আমার ভারি প্রিয় ঋতু। যদিও কলকাতা শহরে শিউলি বা কাশফুল বড়ো একটা দেখা যায় না, হিমেল ভাবটাও ডিজেল আর জনসংখ্যার জন্য তেমন নেই। তবু খানিকটা স্মৃতিতাড়িত হয়েই বেরিয়ে পড়েছিলুম। ভাবলুম আজ একটু প্রকৃতিচর্চা করে কাটাবো।

আপনি কি একটু প্রকৃতিপ্রেমিক?

প্রকৃতিপ্রেমিক কে নয় বলুন তো। আমাদের পূর্বপুরুষেরা তো বনজঙ্গলেই থাকতেন। ফলে এর একটা উত্তরাধিকার আমাদের রক্তে আছেই। ইঁট কাঠ পাথরের মধ্যে নিজেকে মানিয়ে নিই বটে, কিন্তু প্রকৃতি আমাদের সর্বদাই ডাকে।

অতি সত্য কথা। তাই আজ প্রকৃতির ডাকে বেরিয়ে পড়লেন বুঝি?

হ্যাঁ। তবে কলকাতায় প্রকৃতির জনপ্রিয়তা এতই বেশি যে কোথাও গিয়ে শান্তি নেই। ময়দানে যান, গুচ্ছের লোক। লেক-এ যান, গুচ্ছের লোক। নিরিবিলিতে যে উড়ু-উড়ু মন নিয়ে বসে থাকবেন তার জো নেই। তাই আজ ভাবলুম, লোকাল ট্রেনে চেপে বারুইপুর কি লক্ষ্মীকান্তপুর কিংবা ক্যানিং কোথাও গিয়ে কয়েক ঘন্টা কাটিয়ে আসি।

তা গেলেন না কেন?

আরে মশাই, সেই কথাই তো বলছি। বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাস স্টপে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, তখনই দেখতে পেলুম বাস স্টপে একটা লোক আমাকে আড়ে আড়ে লক্ষ করছে। এ ব্যাপারটা কিছু অভিনব। কারণ আমাকে লক্ষ করার মতো কিছু নেই। আমি অতি সাদা-মাটা, নগণ্য মানুষ। অথচ লোকটা বারে বারেই আমার দিকে বেশ তীক্ষ্ণ চোখে তাকাচ্ছিল। এবং সেই লোকটা আপনি।

তা হবে হয়তো। আমি ইচ্ছে করেই যে তাকাচ্ছিলাম তা নয়। আসলে আমি খুব ভুলো মনের মানুষ। ভাবতে ভাবতে কোনো দিকে হয়তো তাকিয়ে থাকি, কিন্তু কিছু দেখি না।

আপনাকে খুব আনমনা লোক বলে মনে হয় না কিন্তু।

কিন্তু একটু আগে আপনিই তো বলছিলেন লোক দেখে কে কেমন তা ঠিক বোঝা যায় না।

হ্যাঁ মশাই, তা বলেছি। তাহলে আপনি নিজেকে ভুলো মনের মানুষ বলেই দাবি করছেন?

দাবি-দাওয়া কীসের? আমি ভুলো মনের মানুষ কি না তাও সঠিক জানি না। তবে গত তেত্রিশ বছর ধরে আমার বউ বলে আসছে আমি নাকি বেজায় ভুলো মনের মানুষ। বউ যা বলে তা নাকি আমি বেমালুম ভুলে যাই। শুনে শুনে আজকাল কথাটা আমার বিশ্বাস হয়ে গেছে। কিন্তু মুশকিল কি জানেন, বাসস্টপে আমি আপনাকে এড়ানোর জন্য তিনটে বাস ছেড়ে দিই। বাস ফাঁকাই ছিল, তবু আমি উঠিনি। দেখলুম, আপনিও হিসেব কষেই ওই তিনটি বাস ছেড়ে দিলেন।

তাই নাকি?

আজ্ঞে হ্যাঁ। ঠিক তাই। চতুর্থ বাসটায় উঠতেই দেখলুম আপনিও উঠে পড়েছেন। তখনই মনে একটা খটকা লাগল।

খটকা। খটকা লাগবে কেন? এরকম তো হতেই পারে। প্রতিদিন এই কলকাতা শহরেই কত লোক তিনটে বাস ছেড়ে দিয়ে চার নম্বর বাসে ওঠে। এতে খটকা লাগার কী আছে? আপনি একটু সন্দেহবাতিকগ্রস্ত, তাই না?

সন্দেহ তো এমনি হয় না মশাই, কারণ থাকলেই হয়। শ্যামবাজার থেকে শেয়ালদা যেতে যেতে আমি বারবারই লক্ষ করছিলাম যে, আপনি আমার ওপর নজর রাখছেন। আমি তখন আকাশ পাতাল ভেবেও বুঝতে পারছি না আমার ওপর কারো নজর রাখার কারণ কী হতে পারে। তাই আপনাকে বাজিয়ে দেখার জন্যই আমি শেয়ালদা না গিয়ে মানিকতলার মোড়েই নেমে পড়লুম। কাছেই আমার মেজো মাসির বাড়ি। অনেক কাল যাওয়া হয় না।

প্রকৃতিচর্চা ছেড়ে অগত্যা মাসির বাড়িতেই এ-বেলাটা কাটিয়ে দেবো বলে মনস্থিরও করে ফেললুম। কিন্তু কী আশ্চর্য! দেখলুম আপনিও ঠিক ওই স্টপেই নেমে পড়েছেন এবং দিব্যি আমার পিছু পিছু আসছেন।

আপনার কি মনে হয় যে মানিকতলায় আমারও কেউ থাকতে নেই? বললে হয়তো বিশ্বাস করবেন না, ওই মানিকতলায় আমার জ্যেঠতুতো ভাই পরেশের বাড়ি। পরেশ বেশ নামকরা লোক, করপোরেশনের কাউন্সিলার। সমাজসেবা-টেবা করে। শোনা যাচ্ছে সামনের ইলেকশনে এম এল এ হওয়ার জন্যও ভোটে দাঁড়াবে।

খুব ভালো কথা। ফ্যামিলিতে একজন পলিটিক্যাল লোক থাকা খুব ভালো। বিপদে আপদে খুব কাজ দেয়।

তা যা বলেছেন। আজকাল পলিটিক্স ছাড়া বেঁচে থাকাই শক্ত।

দুঃখের বিষয় কি জানেন? আমার কোনো পলিটিক্যাল দাদা বা ভাই নেই। পলিটিক্যাল মুরুব্বি না থাকায় আমাদের মতো সাধারণ মানুষকে নানা ধরনের ইনসিকিউরিটিতে ভুগতে হয়। খুঁটির জোর না থাকার ফলে আমরা কোনো সাহসের কাজই করতে পারি না।

খুবই ঠিক কথা। আজকাল সাহসের কাজ না করাই ভালো। অন্যায়ের প্রতিবাদ বা অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এসব করতে গেলে উল্টো বিপত্তি হতে পারে।

হ্যাঁ। তা শেষ পর্যন্ত আপনি তো আপনার ভাই পরেশবাবুর বাড়িতে যাননি।

কে বলল যাইনি?

আমিই বলছি। আজ মাসির বাড়িতেই একটা বেলা কাটিয়ে দেবো বলেই স্থির ছিল। মাসিও আমাকে দেখে বেজায় খুশি। দুপুরে না খাইয়ে ছাড়বে না কিছুতেই। কিন্তু কিছুক্ষণ বসার পরই আমার কেমন উসখুশ শুরু হল। কেবলই মনে হতে লাগল, লোকটা যে আমাকে ফলো করছিল সে কি রাস্তায় এখনও ওৎ পেতে আছে? তিনতলার জানালা দিয়ে চেয়ে অবশ্য রাস্তায় আপনাকে দেখতে পাইনি।

আপনার মাসির বাড়ির নম্বরটা বলুন তো?

তিনের সি।

পরেশের বাড়ি তিনের সি বাই ওয়ান। পাশেই। আপনার মেসোমশাইয়ের নাম কি বিপুলকান্তি সেন?

ও বাবা! আপনি যে অনেক খবর রাখেন মশাই?

বিপুল সেন মস্ত অ্যাডভোকেট। পরেশের সঙ্গে খুব দহরম মহরম।

পরেশ গুপ্তর নাম অবশ্য আমি শুনিনি। তবে আপনার কথা সত্যি হলেও অবাক হওয়ার ঘটনাও অস্বীকার করা যাচ্ছে না। মাসির সঙ্গে অনেকদিন পরে দেখা। সুখ-দুঃখের কথাও মাসির অনেক জমে আছে। কিন্তু উদ্বেগ আর উসখুশুনির চোটে আমার দু-দণ্ড বসে থাকার জো রইল না। কেবলই মনে হতে লাগল, লোকটা এখনও নিশ্চয়ই আমার জন্য রাস্তায় অপেক্ষা করছে। মাসি পর্যন্ত আমার অস্বস্তি লক্ষ করে বলে উঠল, কী হয়েছে তোর? অমন ছটফট করছিস কেন? কথাটা ভেঙে মাসিকে বলতেও পারি না, মাসি নিশ্চয়ই হেসে উড়িয়ে দেবে। আমার মতো একজন অপদার্থর পিছু নিয়ে সময় নষ্ট করার মতো আহাম্মক কে আছে বলুন! তাই সামান্য কিছুক্ষণ বসে দুপুরের খাবার না খেয়েই বেরিয়ে পড়লাম।

দুপুরে না খাওয়াটা আপনার আহাম্মকীই হয়েছে। নিশ্চয়ই মাসি আজ ভালোমন্দ রেঁধেছিলেন। বিপুল সেনের অনেক টাকা, রোজই ভালোমন্দ খায় নিশ্চয়ই।

তা কথাটা আপনি খারাপ বলেননি। মাসির রান্নার লোকটি খুবই উঁচু জাতের।

বামুন নাকি?

আরে না, সেই জাতের কথা বলিনি। বলছি হাই গ্রেড রাঁধুনী। চাইনিজ, মোগলাই সব রাঁধতে জানে। আজ তো শুনলুম গুলাবি বিরিয়ানি আর রেশমি কাবাব রান্না হয়েছিল। তা বলে ভাববেন না ওরা রোজ এরকম রিচ খাবার খায়। আজ মাসির বেয়াইবাড়ি থেকে কারা যেন আসবে। সেইজন্যই ওসব স্পেশাল ডিশ।

একটু টেস্ট করে আসতেও পারতেন।

টেস্ট কি মশাই। সত্যি কথা বলতে কি পৃথিবীতে একটা জিনিসই আমি সত্যিকারের ভালোবাসি। আর তা হল খাওয়া। ভালো খাবরের প্রতি আমার আকর্ষণ দুর্নিবার। সুতরাং মাসির বাড়িতে আজ আমার পাত পেড়ে আকণ্ঠ খাওয়ার কথা। কিন্তু তাতে বাদ সেধেছেন আপনি। কে আমাকে ফলো করছে, কেন ফলো করছে সেই দুশ্চিন্তায় আমার অ্যাপেটাইট-টাই আজ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। শেষ অবধি এক কাপ কফি কোনোরকমে খেয়ে বেরিয়ে এলাম। মাসি অবশ্য খুবই মনঃক্ষুণ্ন হল। হওয়ারই কথা। আমার মা মাসিরা তিন বোন। একমাত্র আমার মা ছাড়া কারোই ছেলে নেই। দুই মাসিরই দুটি করে মেয়ে। ফলে আমি তাদের খুবই আদরের বোনপো।

আপনারা তো বোধহয় দুই ভাইবোন, তাই না?

আশ্চর্য তো! আপনি কী করে জানলেন?

জানি না তো! আন্দাজে বললাম। আপনি বোধহয় আমার কথাটা লক্ষ করেননি।

করেছি। আপনি বলেছেন, আপনারা বোধহয় দুই ভাইবোন, তাই না?

আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি তাই বলেছি। অনুমানের ওপর নির্ভর করে।

অদ্ভুত আপনার অনুমানশক্তি। অবশ্য যদি সেটা সত্যিই অনুমান হয়ে থাকে। আমার মন বলছে আপনি আমার বিষয়ে সব খোঁজখবরই রাখেন।

আরে না না। আপনি সন্দেহবাতিকে ভুগছেন। এই তো একটু আগেই আপনি বললেন পরেশ গুপ্তের নাম আপনি শোনেননি। যদি তা নাই-ই শুনবেন তাহলে পরেশ যে গুপ্ত তা কি করে জানলেন বলুন তো! আমি আপনাকে পরেশের নামটা বললেও পদবীটা কিন্তু বলিনি। পরেশ যে গুপ্ত তা তো আপনার জানার কথাই নয়।

বলেছি নাকি?

হ্যাঁ বলেছেন।

তাহলে না জেনেই আন্দাজে বলেছি।

আমিও তো সেটাই বলতে চাইছি। আন্দাজে বলা অনেক কথা মিলে যায়।

আপনি খুব বুদ্ধিমান লোক, আর সেটাই ভয়ের কথা।

আপনার রজ্জুতে সর্পভ্রম হচ্ছে।

সেটা হওয়াই বরং ভালো। সর্পতে রজ্জুভ্রম হওয়া যে আরও মারাত্মক।

আপনার বিচলিত হওয়ার মতো কিছুই তো হয়নি!

সেটা আপনিই বলতে পারেন বটে, কিন্তু আমার সিচুয়েশনে পড়লে বিচলিত না হয়ে আপনারও উপায় থাকত না। কারণ মাসির বাড়ি থেকে দুপুরবেলা বেরিয়ে আমি আপনাকে কোথাও দেখতে না পেয়ে তাড়াতাড়ি কেটে পড়ার তালে ছিলুম। কিন্তু হঠাৎ দেখলুম আপনি মোড়ের পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে একজন মোটাসোটা লোকের সঙ্গে কথা কইছেন এবং আমার দিকেই তাকিয়ে আছেন। এমনকী সঙ্গের লোকটাকে ইশারা করে আমাকে দেখিয়ে দিলেন বলেও আমার মনে হল। কারণ লোকটাও হঠাৎ ঘাড় ঘুরিয়ে আমাকে দেখল।

আহা, ওই তো পরেশ। ব্যাপারটা হয়েছিল কি, পরেশের বাড়িতে আমার একটু কাজ ছিল। সেটা সেরে বেরোতে যাবো, পরেশ বলল, চলো দাদা, তোমাকে মোড় অবধি এগিয়ে দিই, কয়েক খিলি পানও কিনতে হবে। আমার আবার শিবুর পান ছাড়া চলে না। তা তাই পরেশের সঙ্গে দাঁড়িয়ে একটু কথা কইছিলুম। খারাপ কথাও কিছু নয়। বাগবাজারের এক গলির মধ্যে আমার পৈতৃক বাড়ি। তিনজলা বেশ বড়ো বাড়িই। তা পুরোনো বাড়ি ভেঙে বহুতল করার একটা কথা চলছে। কিন্তু বাদ সাধছে করপোরেশন। তারা বলছে ওই সংকীর্ণ গলির মধ্যে বহুতলের পারমিশন দেওয়া অসম্ভব। তা সেসব নিয়েই পরেশের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। বলতে কি আপনাকে আমি লক্ষই করিনি।

লক্ষ করেছেন কি না তা জানি না, তবে তাকিয়েছিলেন।

তা ওরকম তো আমরা কতই তাকাই। তাকানো মানেই কি আর দেখা! সবকিছুর দিকেই তাকাচ্ছি অথচ কিছুই দেখছি না, এমন অবস্থা কি আপনার কখনো হয় না?

তা হবে না কেন? সবসময়েই হয়। ভুলো মনের মানুষদের তো আরও বেশি করেই হয়। তবু আমার কেন যেন মনে হচ্ছিল আপনি তাকাচ্ছেন এবং দেখছেনও। তাই ভয়ে আমি

তাড়াতাড়ি বড়ো রাস্তায় এসে দক্ষিণের একটা বাসে উঠে পড়ি।

আপনি এর পর কী বলবেন আমি জানি। আপনি বলবেন যে ওই বাসে আমিও সওয়ার হয়েছিলাম, তাই তো?

যদি অন্তর্যামী না হয়ে থাকেন তবে তা-ই। হাসছেন যে!

হাসছি কি আর সাধে? কাকতালীয় আর কাকে বলে। আমারও যে আজ দক্ষিণ কলকাতার বালিগঞ্জে আমার বড়ো মেয়ের বাড়িতে যাওয়ার কথা ছিল। তার শাশুড়ির অসুখ। যাবো যাচ্ছি করে আর যাওয়া হয়ে উঠছিল না। আজ গিন্নি একেবারে মাথার দিব্যি দিয়ে বললেন, না-যাওয়াটা খুবই দৃষ্টিকটু হচ্ছে। আমাদের কিছু হলেই ওরা এসে দেখা সাক্ষাৎ করে যান।

কাকতালীয় কথাটার অর্থ আমি কিন্তু সঠিক জানি না। কাক আর তাল মিলিয়ে শব্দটা যা দাঁড়ায় তার কোনো মানে হয় কি?

সত্যি কথা বললে বলতে হয়, আমিও জানি না। ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি তাই বলি। বাংলা ভাষাটা যাচ্ছেতাই। বরং ইংরিজি শব্দগুলো একটু বোঝা টোঝা যায়। তা আপনি তো ইংরিজির এম.এ,. কাকতালীয় কথাটার ইংরিজি কী হবে বলুন তো!

স্ট্রেঞ্জ কো ইনসিডেন্স।

বা! এই তো বেশ বোঝা গেল। স্টেঞ্জ কো ইনসিডেন্স!

না মশাই বোঝা গেল না। বরং আরও ঘোরালো হল।

কেন বলুন তো!

আমি যে ইংরিজির এম.এ তা আপনি কি করে জানলেন?

মোটেই জানি না মশাই, আন্দাজে একটা ঢিল ছুঁড়লাম। লেগে গেল।

বটে! আন্দাজে ঢিল ছুঁড়তে থাকলে এক আধটা লাগতে পারে, সবকটা লাগে কি?

তাহলে মশাই, কথাটা আপনাকে ভেঙেই বলি।

আজ্ঞে, আমি তো তার জন্যই আপেক্ষা করছি।

আসলে কারো কোয়ালিফিকেশন বা বেতন কিংবা জাত জিজ্ঞেস করাটা ঘোর অভদ্রতা তাই আমি কারো বেতন জানবার দরকার হলে তাকে গিয়ে বলি, আরে রামবাবু আপনি তো মাসে চল্লিশ হাজার টাকা বেতন পান, তাহলে বারো টাকার বেগুন কিনতে পিছোচ্ছেন কেন। তখন রামবাবু বলে উঠলেন, কে বলল চল্লিশ? আমার বেতন মোটে বাইশ হাজার সাতশো টাকা। কিংবা কারো জাত জানবার দরকার হলে তাকে গিয়ে বললাম, ওঃ আপনারা বামুনরাই দেশটার সর্বনাশ করলেন মশাই। তাতে লোকটা একটু তেড়িয়া হয়ে বলল, মোটেই আমি বামুন নই, আমরা বদ্যি। তেমনি কারো কোয়ালিফিকেশন জানার দরকার হলেই আমি তাকে বলি, আরে, আপনি তো ইংরিজির এম.এ. বলুন দেখি এই শব্দটার ইংরিজি কী হবে। খুবই প্রাচীন এবং বহু ব্যবহৃত কৌশল। কাজও ভালো দেয়। আচ্ছা, আপনি কি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন?

ফেলিনি। আপনা থেকেই বেরিয়ে গেল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলার মতো কিছু ঘটেছে কি?

ঘটেছে।

কী বলুন তো?

আমার বেতন চল্লিশ হাজার, আমি বদ্যি এবং ইংরিজির এম.এ।

বলেন কি মশাই? এঃ, আজ তো দেখছি আমার লটারি মারার দিন ছিল। কেন যে একটা রয়াল ভুটানের টিকিট কেটে রাখিনি!

আপনার মতো বুদ্ধিমান লোকেরা লটারির টিকিট কেটে পয়সা রোজগার করার স্বপ্ন দেখে না। লটারির টিকিট কাটে বোকারা। আপনার মতো লোকেরা বুদ্ধি খাটিয়ে লটারির চেয়ে অনেক বেশি টাকা কামাতে পারে।

কেন যে আমাকে লজ্জায় ফেলছেন জানি না। কয়েকটা কাকতালীয় ব্যাপার থেকে এতটা ধরে নেওয়া কি ঠিক?

তা কাকতালীয় ব্যাপারগুলো আজ এমন হিসেব করে ঘটছিল যে ঘটনাগুলোকে নিতান্তই বেহায়া এবং বেশরম বলতে হয়। বাসটা যখন ল্যান্সডাউন দিয়ে যাচ্ছে তখন আমি দুশ্চিন্তায় রীতিমতো ঘামছি। আপনার হাত এড়ানোর জন্য আমি অগত্যা আচমকাই একটা স্টপে নেমে পড়লাম।

বুঝেছি! বুঝেছি! ওই ন্যাপার দোকানের সামনে তো! দেখুন যোগাযোগ আর কাকে বলে। মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে যাচ্ছি অথচ খালিহাতে। গিন্নি পই পই করে বলে দিয়েছিলেন, ওগো বেয়াই বাড়িতে খালি হাতে যেও না কিন্তু, ভালো দোকান থেকে একশো টাকার ভালো মিষ্টি নিয়ে যেও। কথাটা একদম খেয়াল ছিল না। মনে পড়তেই ওই ন্যাপার দোকানের স্টপে নেমে পড়লাম।

হ্যাঁ, সেখানে একটা বড়ো মিষ্টির দোকান ছিল বটে।

থাকতেই হবে, নইলে নামবো কেন?

কিন্তু মশাই, নেমে আপনি তো দাঁড়িয়ে দোকানের সাইনবোর্ড পড়তে লাগলেন, মিষ্টি তো কিনলেন না!

বলিনি বুঝি আপনাকে? আমারও দেখছি আপনার হাওয়া লেগেছে। জরুরি কথা বেমালুম ভুলে যাই। আসলে সমস্যা হল, আমার বেয়াইমশাই হলে ব্লাড সুগারের রুগি। চারশোর নিচে সুগার মোটে নামেই না। কিন্তু মিষ্টি খাওয়ার এমনই লোভ যে ঠাকুরের বাতাসা অবধি চুরি করে খান। তাই সে বাড়িতে মিষ্টি নিয়ে যাওয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। বাস থেকে নেমেই কথাটা মনে পড়ে গেল বলে আমি আর মিষ্টি কিনিনি।

ব্লাড সুগার খুবই খারাপ জিনিস। আমার বাবারও সম্প্রতি ধরা পড়েছে এবং তাঁরও খুব মিষ্টি খাওয়ার ঝোঁক।

তাহলেই বুঝুন, এক বর্ণ মিথ্যে বলিনি।

আপনি বলেনও ভারি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে। শুনলে বিশ্বাস করতে ইচ্ছেও করে।

তাই তো বলছি। সত্যি কথার একটা আলাদা জোর আছে। বিশ্বাস না করেই পারা যায় না।

আপনার বড়ো মেয়ের শ্বশুরবাড়িটা কোথায় যেন?

সাউথে।

সাউথ তো বিরাট জায়াগা। বেহালা, টালিগঞ্জ, গড়িয়া, কসবা। শুধু সাউথ বললে কিছুই বোঝা যায় না।

কথাটা আপনি খারাপ বলেননি। সাউথ কথাটা ভারি গোলমেলে। আজকাল তো সোনারপুর-টুরও শুনি সাউথের মধ্যে চলে এসেছে। কলকাতা শহরের পরিধি যে শেষ অবধি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে সেইটেই বোঝা যাচ্ছে না। বাসন্তী, গোসাবা, সবই না শেষে কলকাতার মধ্যে চলে আসে।

খুব ঠিক কথা। সাউথ ক্রমশ স্ফীত হচ্ছে। নর্থও হাত পা গুটিয়ে বসে নেই। মধ্যমগ্রাম, বিরাটি, বারাসাত, রাজারহাট ছাড়িয়ে সেও ধাওয়া করেছে উত্তর চব্বিশ পরগণা গ্রাস করে নিতে।

আপনি তো ছোকরা মানুষ। আমরা একটু বয়স্করা তো দেখেছি। ওই যে আপনাদের ঝা চকচকে সল্টলেক সিটি, একসময়ে কী অখদ্দে জায়গাই না ছিল। সাপ গোসাপের আড্ডা, জলা, ভেড়ি। আমরা তো বলতাম বাদা অঞ্চল। এখনও সেখানে মাঝে মাঝে সাপখোপ বেরোয়।

শেয়ালের ডাকও শোনা যায়।

আগে এই লেকেই কত শেয়াল ছিল। আমাদের আমলের কথা বলছি।

আপনার বয়স কত?

সাতান্ন।

প্লাস?

ওসব প্লাস মাইনাস ঠিক বুঝতে পারি না। গত শ্রাবণে সাতান্ন কমপ্লিট করেছি। সার্টিফিকেটে অবশ্য দুবছর কমানো আছে।

আপনাদের আমলে বয়স কমানোর একটা ব্যাড হ্যাবিট ছিল, তাই না?

হ্যাঁ, তা ছিল। ছেলে যাতে বেশিদিন চাকরি করতে পারে। মেয়ে যাতে বুড়ি হলেও ছুঁড়ি থাকে তার জন্যই বয়স কমানো হত।

ব্যাপারটা কিন্তু মিথ্যাচার।

তা তো বটেই।

তবু আপনারা যাঁরা বয়স্ক তাঁরা নিজেদের আমলের পঞ্চমুখে প্রশংসা করেন।

ও হল নস্টালজিয়া। আপনিও বয়স হলে এই আমলের প্রশংসা করবেন।

বয়স তো আমার কিছু কম হল না!

তাই নাকি? আমার হিসেবমতো আপনার বয়স ঊনত্রিশ বছর দু মাস হতে পারে।

কত বললেন?

ঊনত্রিশ বছর দু মাস। খুব আন্দাজেই বলছি।

দাঁড়ান মশাই, হিসেব করে দেখি। আমারও তো অত অ্যাকিউরেট হিসেব করা নেই কিনা। দাঁড়ান, জাস্ট এ মিনিট।

হ্যাঁ হ্যাঁ, সময় নিন না। এখনও বেশি রাত হয়নি। মোটে তো আটটা বাজে।

আপনাকে কিন্তু পুলিশে দেওয়া উচিত।

কেন মশাই, কী করলাম?

আমার বয়স সত্যিই ঊনত্রিশ বছর দু মাস। কিন্তু আপনি সেটা কি করে জানলেন?

জানার প্রশ্ন উঠছে না। চেহারা দেখেই বয়স অনুমান করা যায়।

তা যায়। কিন্তু এতটা অ্যাকুউরেট ক্যালকুলেশন করা যায় না।

তাও যায়। আমার মনে হচ্ছিল আপনার বয়স আঠাশ থেকে ত্রিশের মধ্যেই হবে। তাই একটা মাঝামাঝি রফা করে নিয়ে বলে দিলাম। তা সেটা লেগেও গেল দেখছি। এক একদিন এরকম হয় মশাই, মানুষের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বা তৃতীয় নয়ন যা-ই বলুন বেশ ভালো কাজ করতে থাকে।

ভালো কথা, আপনার বড়ো মেয়ের শ্বশুরবাড়িটা কোথায় যেন বলছিলেন।

সাউথে। এখান থেকে কাছেই।

সাউথে এবং এখান থেকে কাছেই-- এই কথা দুটোর কোনো অর্থ হয় না।

কেন মশাই, বাংলা কথাই তো।

হ্যাঁ, কিন্তু ও থেকে কিছু বোঝা যায় কি?

আহা, বুঝবার দরকারটাই বা কি? আমার বড়ো মেয়ের শ্বশুরবাড়ি দিয়ে আমাদের তো কোনো প্রয়োজন সিদ্ধ হবে না।

হবে। কারণ, আপনি সেখানেই যাবেন বলে বেরিয়ে শেষ অবধি সেখানে যাননি। আমার যতদূর মনে পড়ছে আপনি যেন বলেছিলেন, আপনার বড়ো মেয়ের শ্বশুরবাড়ি বালিগঞ্জে। অথচ আপনি ল্যান্সডাউন রোডে নেমে পড়েন।

কথাটা ঠিকই বলেছেন। আমার বড়ো মেয়ে মৌটুসির শ্বশুরবাড়ি বালিগঞ্জেই এবং আমার সেখানেই যাওয়ার কথা ছিল বটে। কিন্তু হঠাৎ মনে পড়ে গেল যে, তার চেয়েও একটা জরুরি কাজ আমার আছে।

সেটা কি টালিগঞ্জের মেজো মেয়ে মৌবনের শ্বশুরবাড়িতে যাওয়া!

আশ্চর্য! অতি আশ্চর্য! বয়সে নিতান্তই আমার ছেলের বয়সি না হলে আমি আপনাকে একটা নমস্কার জানাতাম।

কেন মশাই, আমি তেমন ভালো কাজ তো কিছু করিনি।

করেছেন বৈকি! আমার মেজো মেয়ের নাম যে মৌবন সেটা আপনার জানার কথাই নয়। এমন কি আরও আশ্চর্যের ব্যাপার হল তার শ্বশুরবাড়ি যে টালিগঞ্জে সেটাই বা আপনি

জানলেন কি করে?

জানি না মশাই, আমি কিছুই জানি না। আপনি কি কি অজুহাত দিতে পারেন তা আন্দাজ করতে গিয়ে যা মুখে এসেছে বলে দিয়েছি। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বা তৃতীয় নয়ন কিছুই আমার নেই।

কিংবা একটু বেশি মাত্রাতেই আছে। আমার মেজো মেয়ের নাম বা তার শ্বশুরবাড়ি কোথায় তা ঠিকঠাক বললেও একটা জায়াগায় আপনার ভুল হচ্ছে। আমি কিন্তু বড়ো মেয়ের বদলে মেজো মেয়ের বাড়িতে যাচ্ছিলাম না। আসলে হঠাৎ মনে পড়ে গেল, মহেন্দ্র সিং নামে একটা লোকের কাছে আমি ছ হাজার টাকা পাই। লোকটা অনেকদিন ধরে লেজে খেলাচ্ছে। গতকালই তাকে তার মোবাইল ফোনে ধরে কিছু হুমকি দেওয়াতে সে টাকাটা আজই দিয়ে দেবে বলে কথা দিয়েছে। অধমর্ণদের তো জানেন, যতক্ষণ পারে টাকাটা আটকে রেখে সুদে খাটিয়ে নেয়। তা কথাটা মনে পড়তেই আমি গন্তব্য বদল করে মহেন্দ্র সিং - এর কাছেই যাচ্ছিলাম।

কিন্তু যাননি।

কেন যাইনি তারও গভীর কারণ আছে। মহেন্দ্র সিং ল্যান্সডাউনের একটা গলিতে থাকে। ন্যাপার দোকান থেকে একটুখানি পথ। যাবো বলে পা বাড়িয়েই হঠাৎ দেখি মহেন্দ্র, পাশে তার বউ।

আপনি কি চেঁচিয়ে মহেন্দ্র সিংকে ডেকেছিলেন?

আহাম্মক হলে ডাকতাম। মহেন্দ্র সিং-এর গাড়ি এয়ারকণ্ডিশণ্ড, জানালার কাঁচ আঁট করে বন্ধ ছিল।

তারপর?

তারপর আর কি? তারপর অগত্যা কিছুক্ষণ হাঁটা।

হ্যাঁ। আমার পিছু পিছু।

শুধু আপনি কেন, আমার সামনে আরও অনেক লোক হাঁটছিল।

আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে, এত জরুরি কাজ ফেলে অবশেষে আপনি এই লেক-এর ধারে এসে বসে আছেন কেন? আপনি কি জানেন, আপনার জন্য আজ দুপুরে আমার খাওয়া হয়নি?

আপনি কি আমাকে আজ দুপুরে খেতে দেখেছেন?

না, তা দেখিনি।

আমারও আজ দুপুরে খাওয়া হয়নি। কাছেই সাদার্ন অ্যাভিনিউতে একটা ভালো চীনে রেস্তরাঁ আছে। যাবেন নাকি?

এটা কি আরও একটা ষড়যন্ত্র?

খিদের মধ্যে ষড়যন্ত্রের কী আছে বলুন। আপনি আমার ওপর একটু ক্ষুব্ধ হয়ে আছেন, তাই আমার খুব ইচ্ছে করছে আপনাকে কিছু খাওয়াই। চাইনিজ তো আপনি ভালোই বাসেন।

না মশাই, আমার অ্যাপেটাইট নেই। ধন্যবাদ।

প্রেমে পড়লে দুরকম হতে পারে। কারও খুব খিদে হয়, আবার কারো একদম খিদে থাকে না। দুটোই এক্সট্রিম।

কিন্তু আমি প্রেমে পড়িনি তো!

দেশবন্ধু পার্কে রোজ সকালে যে স্বপ্নের মতো একটা মেয়ে ঘুরে বেড়ায়, তার দিকে কি আপনি খুব হতাশ চোখে চেয়ে থাকেন না?

অ্যাঁ!

আহা লজ্জা পাওয়ার কী আছে বলুন তো! আপনি তো আপনার প্রিয় বন্ধুদের বলেইছেন যে ওই স্বপ্নের মতো মেয়েটি এতটাই স্বপ্নের মতো যে, আপনি আজ অবধি তার সঙ্গে ভরসা করে কথাটাও বলে উঠতে পারেননি। আর যতই তাকে দেখছেন ততই মেয়েটিকে আরও অধরা মনে হচ্ছে। আপনার নাকি ধারণা হয়েছে মেয়েটি রিয়াল নয়।

ইয়ে...দেখুন...এসব.....

ঘাবড়ানোর মতো কিছু তো নয়। এরকম তো হতেই পারে। প্রেমে পড়লে অনেক সময় আত্মবিশ্বাস কমে যেতে থাকে। কত কি মনে হয়। মনে হয়, আমি তো কুচ্ছিৎ, আমি তো আনস্মার্ট, আমি তো ভিতু, আমি তো মোটেই ওর যোগ্য নই, আমাকে নিশ্চয়ই পাত্তা দেবে না। হয় না বলুন!

ইয়ে, মানে আমি....

আহা, আরও একটু ধৈর্য ধরে শুনুন না।

আপনি এসব কি করে...

ওটা কোনো কথা নয়। ঘটনাটা সত্যি কি না সেটাই আসল কথা। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন নাকি?

হ্যাঁ। আসলে ও মেয়েটা সত্যিকারের রক্তমাংসের মানুষ নয়।

তাহলে তো চিমটি কেটে দেখতে হয়।

ছিঃ কী যে বলেন! কিন্তু আপনি কি করে এসব...?

রবার্ট ব্লেক এজেন্সির নাম শুনেছেন?

রবার্ট ব্লেক এজেন্সি? না তো! তারা কারা?

একটা প্রাইভেট গোয়েন্দা সংস্থা।

ও বাবাঃ হঠাৎ তাদের কথা কেন?

আপনার সম্পর্কে গত এক মাসে তারাই সব তথ্য সংগ্রহ করেছে।

ও বাবা! কেন?

গূঢ় কারণ আছে যে।

কী কারণ?

ওই মেয়েটিই।

ওই মেয়েটি! কেন, সে কি আমাকে পুলিশে দিতে চায়? কিন্তু শুধু তাকিয়ে থাকা ছাড়া আমি তো আর কোনো অসভ্যতা করিনি! তাছাড়া আমি ড্যাব ড্যাব করেও তো চেয়ে থাকি না। খুবই বিশুদ্ধ চোখে তাকে আলতোভাবে দেখি। হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন, আমি খুব হতাশা নিয়েই চেয়ে থাকি। কারণ, তাকে আমার মর্ত্যের মানবী বলেই মনে হয় না। কিন্তু আমি তাকে কখনো ডিস্টার্ব করিনি।

করেছেন বৈকি! ডিস্টার্ব না করলে এত জলঘোলা করার দরকারই হত না।

তাহলে ঠিকই ধরেছিলাম। আপনি পুলিশের লোক।

আমি কথাটা অস্বীকার করছি না।

মেয়েটি কি আমার নামেই অভিযোগ করেছে?

আপনার নামেই।

আর কেউ নয় তো। মানে অনেক দুষ্টু লোক তো থাকে, সুন্দর মেয়েদের পিছনে লাগে। ওরকম কারও সঙ্গে আমাকে গুলিয়ে ফেলেনি তো!

না। লম্বা, ফর্সা, হ্যাণ্ডসাম, বাঁ গালে আঁচিল। আপনিই।

বুঝেছি। আমাকে অ্যারেস্ট করার আগে আমি আপনাকে একটা অনুরোধ করতে পারি কি?

পারেন।

আমাকে দয়া করে ইভ টিজার হিসেবে অ্যারেস্ট করবেন না। সেটা লজ্জার ব্যাপার হবে। আমাদের পরিবারটি সম্ভ্রান্ত, তাদেরও মান থাকবে না। দয়া করে আমাকে একজন উগ্রপন্থী বা তোলাবাজ বা সাট্টা ডন যা খুশি অভিযোগে গ্রেফতার করুন। ইভ টিজারের চেয়ে এসবও বরং ভালো।

তার মানে আপনি ইভ টিজিং-এর মতো পেটি ক্রাইমের আসামি হতে চান না! কিন্তু অভিযোগ করলেই তো হবে না। অভিযোগ প্রমাণ হবে কীসে?

আমি অভিযোগ স্বীকার করে নেবো।

ও বাবা! আপনি তো ডেনজারাস লোক মশাই!

বিশ্বাস করুন, ইভ টিজার হিসেবে আমাকে আদালতে তুললে আমার বাবা আমার মুখদর্শন করবে না। মেয়েটা হয়তো আমাকে খানিকটা শাস্তি দিতে চায়। তা যে কোনো অভিযোগে আমি কিছুদিন জেল খাটলেই তো হল! কী বলেন?

কথাটা ভেবে দেখতে হবে।

পুলিশ তো ঘুষটুষ খায়, তাই না? এ বাবদে না হয় আমি দুপাঁচ হাজার টাকা দেবো।

বলছেন?

বলছি বলে কিছু মনে করবেন না যেন। খারাপ ভেবে বলিনি। চাইনিজ খেতে চাইছিলেন, চলুন আজ আপনাকে আমিই না হয় খাওয়াচ্ছি।

সেটা কি খুবই খারাপ দেখাবে না? আমি বয়সে বড়ো, সম্পর্কেও বড়ো।

বয়সে বড়ো মানছি। কিন্তু সম্পর্কেও বড়োটা বুঝতে পারলাম না। তা সে না হয় না-ই বা বুঝলাম। চলুন, যাওয়া যাক।

আরে মশাই, ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? কথাটা আগে খোলসা হোক।

বেশ খোলসা হোক। আপনি কত চান?

সেটা পরে ঠিক করা যাবে। তার আগে আজকের চাইনিজ ডিনারের দামটা কার দেওয়া উচিত সেটা পরিষ্কার হওয়া দরকার।

আমিই দেবো।

সেটা যে হয় না।

কেন হয় না?

তাহলে একটু ব্যাকগ্রাউণ্ডটা যে আপনার জানা দরকার।

ওর আর ব্যকগ্রাউণ্ড কী?

আছে মশাই। ব্যাকগ্রাউণ্ড হচ্ছে ভোরবেলার দেশবন্ধু পার্ক। সেখানে আপনি একখানা বেঞ্চে বসে থাকেন আর সামনে একটা স্বপ্নের মেয়ে ঘুরে বেড়ায়, তাই তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আপনি বলছেন মেয়েটাকে আপনি ডিস্টার্ব করেন না।

আজ্ঞে না!

অথচ মেয়েটা বলছে আপনি ওকে রীতিমতো ডিস্টার্ব করছেন।

যে আজ্ঞে।

ডিস্টার্ব করা বলতে আপনি কী বোঝেন?

পিছু নেওয়া, সিটি দেওয়া, ফলো করা, মন্তব্য ছুঁড়ে দেওয়া, চিঠিচাপাটি পাঠানো। এইসব আর কি।

আরও একরকমভাবে ডিস্টার্ব করা সম্ভব।

সেটা কি ভাবে?

আপনি এক্সটারনালি মেয়েটিকে ডিস্টার্ব করেননি ঠিকই। কিন্তু ইন্টার্নালি হয়তো করেছেন। হয়তো নয়, করেছেনই।

আজ্ঞে না।

কি করে বুঝলেন করেননি? আপনি কি মেয়েটির মনের ভেতরটা দেখেছেন?

আরে না। মেয়েটা তো আমাকে কখনো লক্ষই করেনি! যে আমাকে লক্ষই করেনি তাকে আমার পক্ষে মানসিক উৎপীড়ন করা কি সম্ভব?

সম্ভব।

কীভাবে?

উৎপীড়ন না বলে যদি নাড়া দেওয়া বলি তাহলে কেমন হয়?

নাড়া দেওয়া! এ কথাটার অর্থ কি একটু আলাদা হয়ে যাচ্ছে না?

তা যাক না। ধরুন সেটাই হয়েছে।

একটু বুঝিয়ে বলুন।

খুব সাদামাটা কথায় বললে বলতে হয় পারিজাতবাবু, আপনি যেমন আড়চোখে মেয়েটিকে লক্ষ করেছেন তেমনভাবে মেয়েটিও আপনাকে লক্ষ করেছে। এবং সে একটু নাড়া খেয়েছে। এবং তারও মনে হয়েছে তার স্বপ্নের পুরুষটি রোজ সকালে তার জন্যই বসে থাকে। কিন্তু পুরুষটি নিতান্ত ভদ্র এবং কাপুরুষ বলে কখনো মেয়েটিকে হৃদয়ের কথা জানাতে পারেনি। অগত্যা মেয়েটি তার ছোটো কাকার শরণাপন্ন হয়। ছোটোকাকা ডাকসাইটে পুলিশ অফিসার। সে ওই রর্বাট ব্লেক এজেন্সিকে ছেলেটি সম্পর্কে খোঁজ খবর সংগ্রহ করতে লাগায়। সংগৃহীত তথ্যে দেখা যাচ্ছে পারিজাত সেনগুপ্ত মেধাবী, কৃতবিদ্য, লম্বা বেতন, সম্ভ্রান্ত পরিবারওলা ছেলে। কাপুরুষ সন্দেহ নেই। কিন্তু বরণীয়। আপনার চোখ ছলছল করছে কেন?

বিশ্বাস হচ্ছে না।

আপনি আজ সকাল থেকে আগাগোড়াই আমাকে অবিশ্বাস করে আসছেন।

এখনও করছি। এরকম হয় না।

ঠিক আছে, এসব ছোটোখাটো বিতর্কের অবসান আজ চাইনিজ রেস্তরাঁয় খাবার টেবিলেই হয়ে যাবে। কিন্তু বড়ো প্রশ্নটা হল, ডিনারের দাম কার দেওয়া উচিত!

আমার।

না। আমার। কারণ আমি মৌসুমীর ছোটোকাকা। সম্পর্কে বড়ো।

মৌসুমী কে?

স্বপ্নের মেয়ে।

যাঃ!

আপনি সকাল থেকেই আমাকে সব ব্যাপারে অবিশ্বাস করছেন।

এখনও করছি। তবে ডিনারের বিলটা আপনি দিলে আমি আপত্তি করব না।

তাহলে চলুন, ওঠা যাক। এখন খিদে পাচ্ছে তো?

হ্যাঁ, এখন বেশ খিদে হয়েছে ছোটোকাকা।

তিন নম্বর বেঞ্চ

আচ্ছা, এটাই তো পূর্ব দিক থেকে তিন নম্বর বেঞ্চ? তাই না?

হ্যাঁ। এটাই তিন নম্বর বেঞ্চ।

আর আপনিই কি মধু রায়?

হ্যাঁ।

তাহলে আমি ঠিক জায়গাতেই এসেছি। আমার নাম নব চৌধুরী।

আপনি ঠিক জায়গাতেই এসেছেন। তবে আসাটা উচিত হয়নি।

কেন বলুন তো? আমি আজ সকালেই আপনার এস এম এস পেয়েছি। আপনি আমাকে এই জায়গায় দেখা করতে বলেছেন।

আপনি কি আমাকে চেনেন?

না।

তাহলে? কোন সাহসে একজন অচেনা লোকের এস এম এস পেয়ে আপনি বিনা দ্বিধায় তার কথামতো চলে এলেন?

বিনা দ্বিধায় এসেছি, এ কথা বলা যায় না। এস এম এস-টা পেয়ে আমি অনেক দুশ্চিন্তা করেছি। অজানা নানা রকম আশংকাও হয়েছে। এবং তারপর বেশ ভয়ে ভয়েই এসেছি।

এ যুগে ভয় পাওয়াটাই স্বাস্থ্যের লক্ষণ। যত ভয় পাবেন ততই সুরক্ষিত থাকবেন। আসল কথা হল, আপনি একজন অবিমৃশ্যকারী এবং হঠকারী মানুষ।

আপনি কি আমাকে বকাঝকা করছেন?

করাই তো উচিত। একজন অজ্ঞাতকুলশীলের রহস্যময় বার্তা পেয়ে লেকের ধারে এই শীতের রাতে সাড়ে নটায় দেখা করতে আসাটা কি অবিমৃশ্যকারিতা নয়? আমি একজন গুণ্ডা, অপহরণকারী, ব্ল্যাকমেলার বা খুনিও তো হতে পারি।

তা তো বটেই। তবে কিনা কৌতূহল বলেও তো একটা ব্যাপার আছে। চেনা ছকের বাইরে এই যে একটা বেশ অ্যাডভেঞ্চার বা রহস্যময় অ্যাপয়েন্টমেন্টের থ্রিলটাও অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু আপনি কি সত্যিই গুণ্ডা বা অপহরণকারী বা ব্ল্যাকমেলার বা খুনির কোনো একটা?

হলে কী করবেন? পালাবেন, না লড়বেন?

অবস্থা বুঝে ভাবতে হবে।

বসুন।

বসলাম। কিন্তু শুনেছি রাতের দিকে পুলিশ লেকে খোঁজ নেয়। আমাদের এত রাতে বসে থাকতে দেখলে ধরে নিয়ে যেতে পারে।

আপনার চেয়ে পুলিশকে আমি একটু বেশি চিনি। আমি অনেকদিন জেল খেটেছি।

ও বাবা। আপনার অপরাধটা কী?

সেটা বলতে গেলে মহাভারত। তবে ভয় নেই, পুলিশ আসবে না। আপনি কি পুলিশকে ভয় পান?

কে না পায়?

আপনার ভয়ডর কিছু কম বলেই আমার ধারণা।

না, না, কী যে বলেন। আমি তো ভীতুই।

কথাটা প্রশংসাসূচকভাবে বলিনি। আমি মিন করেছি, আপনি একজন আহাম্মক। আহাম্মকদের অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা থাকে না। সময় মতো, পরিস্থিতি বুঝে ভয় পাওয়াটাও বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণের লক্ষণ। শুধু বুক ফুলিয়ে যেখানে-সেখানে হাজির হয়ে যাওয়াটা কাজের কথা নয়।

কী মুশকিল! আপনিই তো আসতে বলছেন, এলাম বলে উলটে রাগারাগিও করছেন। তাহলে কি আমি চলে যাব?

না। এসে যখন পড়েছেন তখন বসুন। তবে সাবধান করে দিচ্ছি ভবিষ্যতে কখনো কোনো অচেনা লোকের এস এম এস পেয়ে বোকার মতো কোনো অজানা ফাঁদে পা দেবেন না! বুঝেছেন? আমি উগ্রবাদী বা ভাড়াটে খুনি হলে কী করতেন শুনি!

ভেবে দেখিনি।

তার মানে এই নয় যে, আমি ভালো লোক বা আমার উদ্দেশ্য মহৎ।

বুঝলাম। কিন্তু উদ্দেশ্যটা কী?

উদ্দেশ্য? উদ্দেশ্যটা যে ঠিক কী তা আমিও গুছিয়ে ভেবে আসিনি। বোধহয় আপনাকে একটু মেপে নেওয়াই আমার উদ্দেশ্য ছিল।

আমাকে মেপে নেবেন? কিন্তু কেন? মেপে নেওয়া তো মস্তানদের ধর্ম।

তা তো বটেই। আমি তো বলিনি যে, আমি মস্তান নই।

তা বলেননি। কিন্তু আপনি কি বিশ্বাস করেন যে প্রত্যেকটি মানুষেরই অস্তিত্বের একটা তরঙ্গ আছে?

আছে নাকি?

অবশ্যই আছে। লোকটা বদরাগী, মারমুখো, খ্যাপাটে, কিংবা খুব নরম-সরম, ভীতু, ম্যাদাটে মারা কি না তা কাছাকাছি এলে একটু-আধটু টের পাওয়া যায়। মস্তানদেরও একটা ওইরকম কিছু আছে, কাছাকাছি হলে টের পাওয়ার কথা। কিন্তু আপনার পাশে বসে সেরকম কিছু পাচ্ছি না।

নিজের বোধ-বিবেচনা আর অনুভুতির ওপর আপনি বেশ আস্থাশীল। কিন্তু আমি কোমর থেকে এখন একটা ভোজালি বা পিস্তল বের করলেই আপনার আস্থা ভেঙে যাবে।

তা হয়তো যাবে। কিন্তু আমার অনুমান, আপনার কাছে ওসব নেই।

না থাকলেই কি? নিজের স্ত্রীকে খুন করার দায়ে আমি যে এক বছর জেল খেটেছি সেটা ভুলে যাবেন না।

ভোলোর কথা উঠছে কেন? আপনি যে স্ত্রীকে খুন করেছেন তা তো আমি জানিই না। তাছাড়া আপনার সঙ্গে এই তো আমার প্রথম দেখা হল।

হ্যাঁ হ্যাঁ, তাও তো বটে। আসলে আমার সব সময়ে মনে হয়, আমি যে একজন খুনি এবং নিজের বউকে মেরেছি এটা বোধহয় বিশ্বসংসারের কারো অবিদিত নেই।

নিজের স্ত্রীকে খুন করেছিলেন নাকি?

লোকে তো তাই বলে। আদালতের রায়েও তাই বলা হয়েছিল।

সেক্ষেত্রে যতদূর জানি, আপনার যাবজ্জীবন বা ফাঁসিটাসি হওয়ার কথা। মাত্র এক বছরের জেল হওয়ার তো কথা নয়।

যাবজ্জীবনই হয়েছিল।

তাহলে কি আপনি জেল থেকে পালিয়ে এসেছেন?

না। তবে চেষ্টা করেছিলাম। খুব চেষ্টা করেছিলাম জেল ভেঙে পালানোর। দুবারই ধরা পড়ে যাই। আমার ক্লস্ট্রোফোবিয়া আছে। বদ্ধ জায়গায় থাকতে পারি না। দম বন্ধ হয়ে আসে, মাথা পাগল-পাগল লাগে। দ্বিতীয় কথা, আমার মেয়েটা আন অ্যাটেণ্ডেড ছিল, তার জন্যও জেল থেকে পালিয়ে আসা খুব জরুরি ছিল আমার।

আপনাকে কি সরকার বাহাদুর দয়া করে ছেড়ে দিয়েছে?

হাসালেন মশাই। দুনিয়ার কোনো দেশে কি দয়ালু সরকার বলে কিছু আছে? সব দেশেরই সরকার হল অন্ধ, কালা, বোবা এবং হৃদয়হীন। মানুষের জন্য তারা আজ অবধি কিছুই করেনি। সরকার মানেই হচ্ছে একটা সিস্টেম। আর সেই সিস্টেমটা যারা চালায় তাদের অধিকাংশ হল এই সিস্টেমের যন্ত্রাংশের মতো। সিস্টেমটা যা বলায় এবং করায় তারাও তাই বলে এবং করে। কিন্তু এসব কথা একটু কচকচির মতো হয়ে যাচ্ছে।

বুঝেছি। আপনি বরং জেল থেকে কী করে মাত্র এক বছর পর ছাড়া পেলেন সেইটে বলুন।

আমি জেলে যাওয়ার ছয় মাস বাদে আমার মেয়েটা কথা কয়ে উঠল যে!

সে কী? আপনার মেয়ে কি তার আগে বোবা ছিল?

না। কিন্তু নিজের চোখের সামনে মাকে খুন হতে দেখেই সম্ভবত মানসিক ধাক্কায় তার সাময়িক বিকার ঘটে। ফলে সে কথা বলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। সাড়াশব্দহীন, বিভ্রান্ত এবং বোবা। চোখের চাউনিও ভ্যাকান্ট। ছয় মাস সে চুপ করে বসে থাকত। চলাফেরা ছিল অসংসগ্ন, আচরণ ছন্নছাড়া, আলো দেখলে ভয় পেত, জোরালো শব্দ শুনলে চমকে উঠত।

কে তাকে দেখে রাখত?

আমি একটু একা মানুষ। মা-বাপের একমাত্র সন্তান। মা-বাবা দুজনেই একটা রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা যান। মা বুকে আগলে রেখেছিলেন বলেই শিশু আমি বেঁচে যাই। তারপর বিপত্নীক দাদু পেলেপুষে খানিক বড়ো করে দিয়ে গত হলেন। এক জ্যাঠা ছিলেন। তিনি পাঁড় মাতাল, জেঠিমা চিররুগণা। তাদের ঘাড়ে ভর করে কিছুদিন কাটে। কিন্তু জেঠতুতো তিন দাদাই ছিল ষণ্ডা-গুণ্ডা এবং বখা ছেলে। সেখানে টিকতে পারিনি বেশি দিন। মাত্র ষোলো বছর বয়স থেকেই আমি টিউশনি করে পেট চালাতে থাকি। বাবার চাকরির সুবাদে কিছু টাকা পাওয়া গিয়েছিল। কষ্টেসৃষ্টে সি.এ. পাস করে যাই।

সি.এ? ওরে বাবা! আপনি তো রীতিমতো--

দুনিয়ায় কয়েক লক্ষ সি.এ আছে। উত্তেজিত হওয়ার কিছু নেই। এটা দারিদ্র্য বা দারিদ্র্য মোচনের গল্প নয়।

তাহলে বললেন যে!

আপনি জিজ্ঞেস করেছিলেন আমার জেল খাটার সময় আমার মেয়েকে কে দেখে রাখত। সেটা বলার জন্য এই পটভূমি দরকার ছিল।

হ্যাঁ হ্যাঁ, ব্যাকগ্রাউণ্ড বলেও একটা ব্যাপার আছে।

আমি জানতে চাই, আমি কি আমার অটোবায়োগ্রাফিটা যথেষ্ট সংক্ষেপে বলতে পেরেছি?

হ্যাঁ। মাত্র তিন মিনিট বত্রিশ সেকেণ্ড লেগেছে।

আপনি বেশ ফাজিল এবং তরলমতি। আসলে কী জানেন? আমি দুঃখের কথা বেশিক্ষণ শুনতে পারি না। একটু হাঁফ ধরে যায়।

অল্প বয়সের ধর্মই তাই। তবে দুনিয়ায় দুঃখের গল্প সংখ্যায় সুখের গল্পের চেয়ে অনেক বেশি।

তা বটে। কিন্তু সি.এ পাস করার পর আর তো দুঃখ থাকার কথা নয়। কারণ, আমাদের বেশির ভাগ দুঃখের গল্পই তো অর্থনীতি রিলেটেড! তাই না?

হ্যাঁ, কিছু কিছু প্রচলিত মতবাদ সে কথাই বলে। এটা ঠিকই যে, আর্থিক অভাব ঘুচলে পৃথিবীর অধিকাংশ দুঃখই অন্তর্হিত হয়। তারপর যেগুলো থাকে সেগুলোকে টাকা পয়সার প্রাচুর্য দিয়ে তাড়ানো যায় না। আর সেই কারণেই সেগুলো ভয়ঙ্কর।

তার মানে কি এর পর আরও কোনো ভয়ংকর দুঃখের গল্প আসছে?

না, ভয় পাবেন না। আমি শুধু বলতে চাইছি, টাকাপয়সা ছাড়াও আর একটা ব্যাপার থেকে দুঃখ বা প্রবলেম উপজাত হয়, সেটা হল রিলেশন।

রাইট । রিলেশনের কথাটা আমি ঠিক ভেবে দেখিনি।

রিলেশনগুলোর মধ্যে আবার সবচেয়ে সেনসিটিভ হল স্বামী-স্ত্রীর রিলেশন।

আমি এটাই এক্সপেক্ট করছিলাম। আফটার অল এটা তো বধূহত্যারই গল্প।

হ্যাঁ, এটা বধূহত্যারই গল্প। খুনের উপকরণ বা হাতিয়ার হিসেবে ক্লিভার জিনিসটাকে আপনার কেমন মনে হয়?

ক্লিভারটা কী জিনিস বলুন তো?

কসাইখানায় দেখেননি, হাতল লাগানো চৌকো মতো একটা ইস্পাতের ভারী চপার গোছের, যা দিয়ে হাড়টাড় কাটে।

প্লিজ, আপনি আর ডিটেলসে যাবেন না, ওসব রক্তমাংস আমার একদম সহ্য হয় না।

তাহলেই বুঝে দেখুন, শুনেই আপনার যদি রি-অ্যাকশন হয় তাহলে চোখে দেখে আমার চোদ্দো বছরের মেয়েটার কী অবস্থা হয়েছিল। তার ওপর নিজের মা।

বোঝা একটুও শক্ত নয়, খুব বুঝতে পারছি। তবে সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি আমি শুনতে চাই না।

চিন্তিত হবেন না, সে ঘটনা বলার জন্য আপনাকে ডাকিনি। আসলে বলতে চাইছি, আমি একজন জেল-খাটা লোক।

ছয় মাস বোবা থাকার পর আপনার মেয়ে হঠাৎ কি একদিন কথা বলে উঠল?

হ্যাঁ।

এখানে আমার একটা প্রশ্ন।

করুন।

আপনি কি আমাকে চেনেন?

না।

তাহলে এ কথাগুলো আমাকেই কেন বলা দরকার?

আপনি শুনতে না চাইলে না-ও শুনতে পারেন। শুভরাত্রি।

আরে না, না। রাগ করলেন নাকি? একটু কৌতূহল হচ্ছে। আর কিছু নয়। গল্পটা ইন্টারেস্টিং, বলুন।

কোথা থেকে বলব?

মনে হচ্ছে সবটাই শোনা ভালো। তবে বীভৎস রস যতটা সম্ভব বর্জন করে।

আপনি কোমল হৃদয় মানুষ।

তা বলতে পারেন।

আমার অফিসটা আমার বাড়ির কাছেই। আমি রোজ লাঞ্চ করতে বাড়ি আসতাম। কিন্তু যেদিন দুপুরে আমার স্ত্রী খুন হন সেদিন আমি বাড়ি আসিনি। কারণ তার আগের দিন বোম্বে থেকে একটা বড়ো কোম্পানির এক বড়োকর্তা আমাকে ফোনে একটা খুব বড়ো অফার দেন। এবং পরদিন আমাকে পার্ক স্ট্রিটের একটা রেস্তোরাঁয় লাঞ্চে নেমন্তন্ন করেন। সেখানেই কথাবার্তা পাকা হওয়ার কথা। আমি স্ত্রীকে সেটা জানিয়ে রেখেছিলাম। লাঞ্চে আমি ট্যাক্সি নিয়ে পার্ক স্ট্রিটে যাই। কিন্তু সেই রেস্টুরেন্টে আমার জন্য কেউ অপেক্ষা করে ছিল না নির্দিষ্ট টেবিলে। আমি একটু বোকা বনে ফিরে আসি।

সেই সময়েই খুনটা হয়ে গিয়েছিল তো!

হ্যাঁ। আই ওয়াজ ফ্রেমড, ভেরি টাইটলি ফ্রেমড। প্রথম কথা আমার কোনো অ্যালিবাই ছিল না। দ্বিতীয় কথা, আমি ছাড়া অন্য খুনি হলে একমাত্র সাক্ষী হিসেবে আমার মেয়েটাকে বাঁচিয়ে রাখত না। তাকেও মারত, আর সেটাই স্বাভাবিক। তৃতীয় কথা, খুনের একমাত্র সাক্ষী আমার মেয়ে আমার সপক্ষে কোনো কথা বলতে পারেনি। যদিও মোটিভের অভাব, আমার অতীতের জীবনযাপনের রেকর্ড ইত্যাদি মোটামুটি ফেভারে ছিল। কিন্তু আমার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা এটিকে বধূ নির্যাতন, অনাদায়ী পণ এবং অন্যান্য নানা অজুহাত দাঁড় করিয়ে আমাকে ফাঁসিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। আর তাতে তারা সফলও হয়। আমার উকিল বাঁচানোর চেষ্টা করেও হেরে যায়।

খুনটা তাহলে কে করেছিল?

সেটা এ গল্পে অপ্রাসঙ্গিক। এটা ক্রাইম অ্যাণ্ড ডিটেকশনের কাহিনি নয়। মোট কথা, আমাকে জেলে যেতে হয়েছিল। আমার কথা কেউ বিশ্বাস করেনি, আজও অনেকে করে না।

আপনার সম্পর্কে আপনার শ্বশুরবাড়ির ধারণা এখন কীরকম?

জানি না। তাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক চুকে গেছে।

তাহলে আপনার মেয়ে? আপনি জেলে যাওয়ার পর তার কী হয়েছিল?

আমি আদালতে আর্জি জানিয়েছিলাম, আমার মেয়েকেও আমার সঙ্গে জেলে রাখা হোক। আদালত তা নাকচ করে ওর দাদু-দিদিমাকেই কাস্টোডিয়ান করে দিয়েছিল।

বুঝলাম, আপনার বেশ খারাপ সময় গেছে।

খুব খারাপ। তবে একটা ভালো ব্যাপারও হয়েছিল, বলা যায় মন্দের ভালো। আমার মেয়ে যখন তার মামাবাড়িতে আশ্রয় পেল তখন সেখানে দিনরাত আমার নিন্দেমন্দ হত। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল খুনটা আমারই হাতের কাজ। আমার মেয়ে সেগুলো শুনতে পেত। তার মাথা তখন বিভ্রান্ত, তবু সেই কথাগুলো তার মাথায় কোনো-না-কোনো ভাবে ধাক্কা দিতে থাকে। খুব আবছাভাবে সে বুঝেছিল, তার বাবা বিপন্ন। কিন্তু তার কিছু করার ছিল না। ছয় মাস বাদে একদিন ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই সে হঠাৎ সংবিৎ ফিরে পায় এবং চিৎকার করতে থাকে। চিৎকার করে সে শুধু এক নাগাড়ে একটা কথাই বলে যাচ্ছিল, আমার বাবা খুন করেনি। আমার বাবা খুন করেনি....

ভেরি ইন্টারেস্টিং!

হ্যাঁ। তাতে অবশ্য আমার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা বিব্রত হয়ে পড়ে এবং তার মুখ বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টাও হয়। শুনেছি তার মেজমামা তাকে মারধরও করেছিল। কিন্তু আমার মেয়েটা খুব স্টাবোর্ন। সে ওই কথা থেকে নড়েনি। আর তার চেঁচামেচিতেই পাড়াপ্রতিবেশিরা এসে জড়ো হয় এবং একটা জনমতও তৈরি হতে থাকে। শেষ অবধি জনমতের চাপেই কেস রি-ওপেন হয়। নতুন করে সাক্ষী নেওয়া হয়, আমার মেয়ে পুলিশের কাছে এবং আদালতে খুনটার নিখুঁত বিবরণ দিয়েছিল।

আর তার সাক্ষ্যতেই আপনি ছাড়া পেলেন তো!

হ্যাঁ। বেকসুর খালাস।

কিন্তু খুনটা! সেটা কী করে হয়েছিল?

আমি আপনাকে আমার স্ত্রীর হত্যাকাণ্ড বা তজ্জনিত কল-আউট শোনাব বলে ডাকিনি। কিন্তু কথাটা কেন যে সেদিকেই গড়িয়ে গেল কে জানে। আপনি কি এতে কোনো ইন্টারেস্ট

পাচ্ছেন? চারদিকে নানাভাবে মানুষ খুন হচ্ছে, কোনো না কোনো কারণে। ব্যাপারটা বড্ড জলভাত হয়ে গেছে, তাই না?

কোনো কোনো ঘটনা আছে যা ম্যাগনেটের মতো কথাকে টেনে নেয়। আপনি অন্য প্রসঙ্গে গেলেও কথার গতি খুব অদ্ভুতভাবে সেই দিকেই মুখ ফেরায়।

তার মানে কি ব্যাপারটা খানিকটা ভৌতিক?

আমি ভূতে বিশ্বাসী নই।

আমিও নই। তবে কথাটা আপনি ঠিকই বলেছেন। কথার একটা নিজস্ব ইনার্সিয়া আছে। হ্যাঁ, আপনাকে যেন কী বলছিলাম?

আপনার স্ত্রীর খুনের ঘটনাটা। আমরা এক জায়গায় থেমে আছি। আপনি একটা চৌকাঠে ঠেকে গেছেন। আর এগোতে চাইছেন না। অবশ্য গোপন করার মতো কিছু থাকলে আমিও আর জানতে চাইব না।

যে ঘটনা সবাই জানে, যা নিয়ে খবরের কাগজ এবং টিভিতে বিস্তর জল্পনা-কল্পনা হয়েছে তার আবার গোপনীয়তা কীসের? এখন অবশ্য সবাই ভুলেও গেছে। ঘটনাটা পাঁচ বছর আগেকার। মাস মেমরি পুরনো কথা মনে রাখতে পারে না।

তা তো ঠিকই। গোপন করার মতো কিছু না থাকলে আমি এর শেষটা জানতে চাই।

খুনি কে, তা তো!

হ্যাঁ।

আমার মেয়ে আদালতে দাঁড়িয়ে শপথ নিয়ে যা বলেছিল তা হল এই যে, সেদিন সে স্কুলে যায়নি। প্রাক্তন হেডমিস্ট্রেস মারা যাওয়ায় স্কুল বন্ধ ছিল। দুপুর একটা নাগাদ কলিংবেলের আওয়াজ পেয়ে সে গিয়ে দরজা খোলে। যে লোকটা ঘরে ঢোকে সে বেশ লম্বা-চওড়া, সবুজ শার্ট আর কালো প্যান্ট পরা, চাপ দাড়ি আছে, ডান হাতে বালা। লোকটা তার এবং আমাদেরও চেনা। নাম সংগ্রাম সিংহ। মাঝে মাঝে লোকটা তাদের বাড়িতে আসত। তার বাড়ি কোথায় তা সে জানে না। তবে সে তাকে কাকু বলে ডাকত। মায়ের

সঙ্গেই তার বন্ধুত্ব ছিল বেশি। সেদিন বাড়িতে এসে সংগ্রাম সিংহ নাকি তার মাকে সিনেমায় নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দেয়। মা যেতে চায়নি। এ নিয়ে দুজনের মধ্যে একটু মান-অভিমান মতো হয়। অবশ্য তখন সে নিজের ঘরে ফিরে গিয়েছিল। দূর থেকে শুনতে পাচ্ছিল, সংগ্রামের সঙ্গে তার মায়ের কথাবার্তা ক্রমে ঝগড়ার পর্যায়ে যাচ্ছে। আর তারপরেই তার মায়ের আর্তনাদ। সে ছুটে এসে দেখে সংগ্রাম সিংহ সদরদরজা খুলে দ্রুত বেরিয়ে যাচ্ছে, আর তার মা পড়ে আছে মেঝের ওপর।

এই সংগ্রাম সিংহ লোকটা কে?

আমি জানি না।

তাহলে আপনার চেনা লোক হল কি করে?

আমি আমার মেয়ের জবানিটা বলছি। কথাগুলো আমার নয়, আমার মেয়ের।

বুঝতে পারলাম না। সংগ্রাম সিংহ কি তাহলে--?

আমার স্ত্রীর গোপন প্রেমিক কি না? বোধহয় না। আমার স্ত্রীর কোনো প্রেমিক ছিল বলে আমার জানা নেই।

সংগ্রাম সিংহকে জেরা করে কিছু জানা যায়নি?

পুলিশ তাকে খুঁজে পায়নি।

অ্যাবসকণ্ডি?

হবে হয়তো, আমি জানি না।

কী করত লোকটা?

আমার মেয়ের ভারশন অনুযায়ী সংগ্রাম সিংহ একজন ব্যবসায়ী। বড়োবাজারের দিকে কোথাও তার বাবার আড়ত আছে।

তাহলে তাকে খুঁজে পাওয়া গেল না কেন?

কয়েকজনকে সন্দেহবশত ধরা হয়েছিল। তবে আমার মেয়ে তাদের আইডেন্টিফাই করতে পারেনি। ডাক্তার বলেছিল, ওর মেমরি এখনও অর্ডারে নেই।

আপনাকেও নিশ্চয়ই সংগ্রাম সিংহ সম্পর্কে জেরা করা হয়?

হ্যাঁ। আমি আমার মেয়ের কথারই পুনরাবৃত্তি করে যাই। এ কথাও বলি যে, আমি তাকে আমার স্ত্রীর বন্ধু হিসেবেই একটু-আধটু চিনতাম। তার সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা নেই।

ফোন নম্বর-টম্বর?

হ্যাঁ। আমার স্ত্রীর ফোনবুকে সংগ্রাম সিংহের মোবাইল নম্বর পাওয়া যায়। কিন্তু সেই নম্বরের কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি।

ধরা গেল না তাহলে?

পুলিশ ধরতে না পারলেও আমি ধরেছি।

আপনি! কীরকম?

ছাড়া পাওয়ার পর আমি একদিন আমার মেয়ে স্কুলে যাওয়ার পর তার ঘরে একটা বই খুঁজে পাই। ইংরিজি গোয়েন্দা গল্প। বইটায় একটা বিশেষ পেজমার্ক দেখে সন্দেহ হয়েছিল। সেই জায়গাটা খুলে দেখি, সেখানেও একটি চোদ্দ বছরের মেয়েকে তার মায়ের অস্বাভাবিক মৃত্যু নিয়ে জেরা করা হচ্ছে আর মেয়েটা একটা কাল্পনিক আততায়ীর বিবরণ দিয়ে যাচ্ছে। এবং সেখানেও সে তার বাবাকে বাঁচানোর চেষ্টা করছিল।

তার মানে সংগ্রাম একটা ফিকটিশাস ব্যাপার?

হতে পারে।

তাহলে খুনটা কে করল?

আবার বলছি, আমার স্ত্রীর মৃত্যুরহস্য উদঘাটন করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি বলতে চাই, আমার মেয়ের কথা। আমার মেয়ে অত্যন্ত ইনোভেটিভ, স্টাবোর্ন এবং যাকে ভালোবাসে তাকে রক্ষা করার জন্য সব কিছু করতে পারে। তার বয়স এখন উনিশ, সে বুদ্ধিমতি, সুলক্ষণা।

ও।

তার নাম পূর্ণা। পূর্ণা রায়।

মাই গড। আপনি পূর্ণার বাবা?

হ্যাঁ, পূর্ণা আমাকে বলেছিল, আমি ওকে আমার কথা কিছু বলতে পারিনি। কিন্তু আমি চাই তুমি ওকে বলো। আমি আপনাকে বললাম।

বুঝতে পারছি। পূর্ণা দুষ্টু আছে।

ধন্যবাদ। আপনি অনুমতি দিলে আমি এবার উঠব।

শুনুন, দয়া করে আপনি-আজ্ঞে করবেন না। সেটা ভালো শোনাবে না।

তথাস্তু।

অন্ধকার

কে? কে রে ঘরের মধ্যে?

চুপ! চেঁচালে খুন হয়ে যাবেন।

ওরে বাবা। কে মশাই আপনি? আমি ভীতু মানুষ, তার ওপর হার্ট পেশেন্ট।

ইস্কিমিয়া তেমন গুরুতর কোনো হার্ট ডিজিজ নয় খবরদার বেড সুইচে হাত দেবেন না যেন!

আরে না মশাই, বেড সুইচটা কোনো রাতেই আমি হাতড়ে খুঁজে পাই না। তাই একটা টর্চও রাখি। কিন্তু আজ সেটাও কোথায় গড়িয়ে গেছে কে জানে!

টর্চটা আমি সরিয়ে নিয়েছি। বেড সুইচটাও আমি প্লাস দিয়ে কেটে আলগা করে দিয়েছি। কাটা তারে হাত লাগলে আপনি শক খাবেন।

ওরে বাবা। এ তো খুব বিপজ্জনক অবস্থা।

বেশি নড়াচড়া না করে চুপ করে বসে থাকুন, তাহলে কোনো ভয় নেই।

ভয় নেই! কিন্তু আমার বুকটা যে বড্ড ধড়ফড় করছে! আমি কি আপনার অনুমতি নিয়ে একটু জল খেতে পারি? না থাক। তারে হাত লাগলে তো আবার শক লাগার ভয়।

জল আপনার ডান পাশের টুলে আছে। তার রয়েছে আপনার বাঁ পাশে। ভয় নেই, জল খেতে পারেন।

ধন্যবাদ। জলটা খেয়ে এখন একুট ভালো লাগছে। আপনার হাতে কি অস্ত্রশস্ত্র কিছু আছে?

আছে।

পিস্তল না ড্যাগার?

জেনে কী হবে? লড়াই করার ইচ্ছে আছে নাকি?

পাগল! হিরো হওয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আমার নেই। শুধু বলছি, অস্ত্র থাকলে সেটা পকেটে রাখুন। পিস্তল জিনিসটা খুব আনপ্রেডিক্টেবল,বাই চান্স ট্রিগারে চাপ পড়লে গুলি বেরিয়ে আসতে পারে।

আপনার ভয় নেই। দুঃসাহসী কিছু না করলে আপনি নিরাপদ।

না না। দুঃসাহস বা সৎসাহস কোনোটাই আমার নেই। বরং যত বয়স বাড়ছে ততই আমার ভয়ও বাড়ছে। রাস্তায় বেরলে গাড়ি চাপা পড়ার ভয়, ভূমিকম্প হলে বাড়ি চাপা পড়ার ভয়, ট্রেনে উঠলে ফিসপ্লেট সরিয়ে নেওয়ার ভয়, প্লেনে উঠলে হাইজ্যাকারের ভয়। অল্প বয়সে এসব তো ছিল না।

হ্যাঁ সেটা আমি জানি।

জানেন! কী জানেন ভাই?

উনিশশো একাশি সালে আপনি লাইট হেভিওয়েটে ন্যাশনাল বক্সিং চ্যাম্পিয়ন ছিলেন।

জানেন দেখছি! তবে ওসব তো অতীত।

দয়া করে অতীতের বাক্স খুলে বসবেন না। ফাইনালে আপনি সার্ভিসেসের মেজর ব্রাউনকে হারিয়েছিলেন।

আপনার হোমওয়ার্ক খুবই ভালো। কিন্তু মশাই, আপনি আমার সম্পর্কে এত খোঁজখবর নিয়েছিলেন কেন বলুন তো? আমার যে আবার একটু ভয়-ভয় করছে।

এটা সাহসী বা বীরের যুগ নয়। বরং বিবেচকদের যুগ। প্রাচীনকালে বীরদের একটা সম্মান বা সমাদর ছিল। সৎ কাজে প্রাণ বিসর্জন দিলে লোকে বাহবা দিত। দুঃখের বিষয়, সে যুগটা আর নেই। সুতরাং ভয় পাওয়া একদিক দিয়ে সুলক্ষণ।

আমি কাপুরুষ বলে আপনি হয়তো ঠাট্টা করছেন। কিন্তু ওই যে বললাম, বুড়ো বয়সে এখন আমার নানারকম বিচিত্র ভয় হয়েছে। টেররিজম, গ্লোবাল ওয়ার্মিং, দুই হাজার

আঠাশ সালে যে বৃহৎ উলকাপিণ্ডটা পৃথিবীকে ধাক্কা মারতে পারে বলে একটা ক্ষীণ ভয় বৈজ্ঞানিকরা দেখিয়ে রেখেছেন, সেটা নিয়েও আমার দুশ্চিন্তা। আজকাল সারাদিন আমি একটার পর একটা ধারাবাহিক দুশ্চিন্তা করে যাই। বুড়ো বয়সের লক্ষণ আর কী!

আপনার বয়স এখন সাতচল্লিশ বছর চার মাস।

হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক তাই। আশ্চর্য, আপনি কী করে জানলেন বলুন তো? আমাকে নিয়ে তো কেউ মাথা ঘামায় না। এমনকী আমার পরিবারের প্রায় কেউই আমার জন্মদিনটা মনে রাখেনি। আমি নিজেই ভুলে যাই। আপনি যে মনে রেখেছেন এতে ভারি অবাক হয়েছি।

আপনার জন্ম উনিশশো একষট্টি সালের আগস্ট মাসে।

ঠিক ঠিক।

আপনার পাসপোর্টে এই তারিখটাই রয়েছে।

পাসপোর্ট! পাসপোর্ট! আশ্চর্য! আমার একটা পাসপোর্ট ছিল বটে! কিন্তু সেটা তো কবেই হারিয়ে গেছে। পাসপোর্ট আমার কোনো কাজে আসেনি। আমি কোনোদিনই বিদেশে যাওয়ার সুযোগ পাইনি। পাসপোর্টটা কবেই তামাদি হয়ে গেছে। আপনি সেটা কোথায় পেলেন বলুন তো? গত দশ-বারো বছর আমি সেটা চোখেও দেখিনি।

আপনি অলিম্পিক টিমে চান্স পাবেন ভেবে পাসপোর্টটা করিয়ে রেখেছিলেন। শেষ অবধি আপনি সুযোগ পাননি। তারপর হতাশা এবং রাগে আপনি বক্সিং ছেড়ে দিয়ে রেলের চাকরিতে ঢুকেছিলেন। তারপর আপনি কিছুদিনের জন্য নকশাল হয়ে যান। কিছুদিন কাঠের ব্যবসা করেন। ঠিকাদারিতেও নেমেছিলেন। কোনোটাতেই সুবিধে করতে পারেননি।

আশ্চর্য! আশ্চর্য! এ সবই সত্যি। আমার জীবনটা নানারকম বিশৃঙ্খলা আর এক্সপেরিমেন্টের একটা সমষ্টি মাত্র। আপনি একজন বহিরাগত হয়েও কী করে আমার সম্পর্কে এত জানলেন, সেটাই বুঝতে পারছি না। আপনার সম্পর্কে আমার ভয় বাড়ছে, শ্রদ্ধা এবং কৌতূহলও। আপনি কি কোনো মহাপুরুষ? অন্তর্যামী? ঈশ্বরের প্রতিনিধি?

আমি একজন চোর।

ইয়ে, তা চোর বলেই মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু চোরেরা যেমন হয় আপনাকে যেন ঠিক সেরকম মনে হচ্ছে না। তাছাড়া আমার তো তেমন কিছু নেইও।

আপনি মোট চারবার ব্যবসাতে নেমে মার খেয়েছেন।

হ্যাঁ হ্যাঁ। আপনি তো সবই জানেন।

সিউড়ির মেয়ে সোমার সঙ্গে আপনার পরিচয় হয় এবং সেই পরিচয় থেকে প্রেম এবং বিয়ে। ঠিক বলছি তো?

হ্যাঁ, কবে--

আপনাকে কিছু বলতে হবে না। আমি সবই জানি। সোমা অত্যন্ত ভালো ছাত্রী ছিল। ফ্যাশন ডিজাইনিং-এ ছিল তার বিশেষ মেধা। আপনার মতো একজন ভ্যাগাবণ্ডকে বিয়ে করার পরই সে তার ভুল বুঝতে পারে। আপনি বক্সার হিসেবে অ্যাগ্রেসিভ হলেও রিং-এর বাইরে আপনি অত্যন্ত ভীতু এবং বললে হয়তো খারাপ শোনাবে, একটু বোকাও।

বোধহয় আপনার অ্যাসেসমেন্টট-এ কোনো ভুল নেই।

নেই, সেটা আমি জানি। মাত্র এক বছরের মধ্যেই সোমার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক এতটাই তেতো হয়ে যায় যে, সোমা আপনাকে গুণ্ডা লাগিয়ে মারও খাইয়েছিল।

না না, এটা বোধহয় অতটা নিশ্চয় করে বলা যায় না। গুণ্ডারা আমাকে মারে ঠিকই, কিন্তু সোমাই যে তাদের লাগিয়েছিল, এটা প্রমাণ হয়নি।

প্রমাণ যে হয়নি তার কারণ আপনি পুলিশ কেস করেননি। থানায় যাননি, এফ আই আর করেননি। ইন ফ্যাক্ট, আপনি পুলিশের কাছে সেটা রোড অ্যাক্সিডেন্ট বলে চালানোর চেষ্টা করেছিলেন। সেটা হয়তো আপনার ইগোর জন্যই হবে।

যাকগে, প্রসঙ্গটা বরং থাক।

থাকল। সোমার সঙ্গে আপনার আইনত বিচ্ছেদ হয়ে যায় বিয়ের দেড় বছরের মাথায়।

হ্যাঁ, হ্যাঁ।

তারপর আপনি সিউড়ি থেকে চলে আসেন। যাদবপুর বিধানপল্লির উদ্বাস্তু আবাসনে আপনার বাড়িতে। শুরু হয় আপনার বিল্ডিং মেটেরিয়ালের ব্যবসা। আর এই ব্যবসাতেই মা লক্ষ্মী আপনার দিকে ঢলে পড়েন।

হ্যাঁ, তবে সহজে হয়নি। সময় লেগেছিল। প্রথম দিকে বড্ড কষ্ট গেছে। অনেক সময়েই পেমেন্ট নিয়ে গোলমাল হত। আমি আবার কাস্টমারদের সঙ্গে তেমন যুঝতে পারতাম না কিনা। কিন্তু মশাই, আমার মতো একজন সামান্য মানুষ সম্পর্কে আপনি এত খোঁজখবর নিয়েছেন কেন! এটা তো আমার কিছুতেই মাথায় আসছে না, আমার এত গুরুত্ব হল কী করে? শুনে বড়ো ভালো লাগছে বটে, আবার ভয়ও হচ্ছে।

ভয়টা কীসের?

ভাবছি, আপনি আমার কোনো অপরাধের কথা জানতে পেরেই আমার কাছে এসেছেন কি না। আপনি হয়তো চোর নন, ডিটেকটিভ কিংবা এমন নয়তো যে আমার কোনো অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে এসেছেন।

আপনার কৃত অপরাধে বা অন্যায় সম্পর্কে আপনি কোনো স্বীকারোক্তি করতে পারেন কি?

পারি। আমার বেশ কিছু অপরাধ আছে।

কোন স্তরের অপরাধ?

আমার মনে হয় আপনার কিছুই অবিদিত নেই। আমি একবার আমার এক বন্ধুর সঙ্গে ওষুধের দোকান খুলেছিলাম। বন্ধুটি ভালোই ছিল। কিন্তু দোকানটা যখন খুব চালু হল এবং বেশ লাভ হতে লাগল তখন সে আমার হিসেব-নিকেশের মাথা ছিল না বলে, আমাকে ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করতে থাকে। সে গাড়ি-টাড়ি কিনল, বাড়ি দোতলা করল, দেদার টাকা ওড়াতে লাগল। আমাকে একটা কাঁচা হিসেব দেখিয়ে দিয়ে বলত, লাভ তেমন হচ্ছে না। আমি খুব রেগে যাই। তারপর একদিন কয়েক পেটি ওষুধ গোপনে বেচে দিয়ে টাকাটা হাতিয়ে নিয়ে হাওয়া হয়ে যাই।

আর কিছু?

পলিটিক্যাল অ্যাজিটেশনের সময় একবার নিতান্তই নিজের প্রাণরক্ষার জন্য হেঁসো চালিয়ে একজন লোককে প্রায় খুন করে ফেলি। লোকটা মরেনি, তবে চিরকালের জন্য তার একটা চোখ নষ্ট হয়ে যায় আর ঘাড় বেঁকে যায়।

আর কোনো অপরাধ?

ছোটোখাটো আরও কিছু আছে বটে, তবে সেগুলো তেমন গুরুতর নয়। সত্যি কথা বলতে কী, আমি লোক তেমন খারাপ নই। তবে আমার বিচার করার আমি কে বলুন! কিন্তু এই মধ্যরাতে কি এসব প্রশ্ন করার জন্যই আপনি এই তিনতলা অবধি উঠে এলেন? নীচের দরজা বন্ধ। সুতরাং আপনাকে নিশ্চয়ই খুব বিপদের ঝুঁকি নিয়ে দেওয়াল বেয়ে বা আর কোনো পন্থায় উঠতে হয়েছে।

দেখুন, চোরদের সব পরিস্থিতিকেই মানিয়ে নিতে হয়। তিনতলা কেন, আপনি দশ তলাতে থাকলেও আমি ঠিকই হাজির হয়ে যেতাম।

ওরে বাবা! আমার আবার হাইটকে ভীষণ ভয়। ছাদ থেকে নীচে তাকালেই আমার হাত পা সিরসির করে। আপনি খুবই ডাকাবুকো লোক মশাই।

এ সবই অভ্যাসের ব্যাপার। আমার প্রফেশনটাই একটু চ্যালেঞ্জিং। রিস্ক আছে, মজাও আছে।

কিন্তু রিস্ক নিয়ে আপনি আমার কাছে কী জিনিস চুরি করতে এসেছেন তা তো বললেন না।

সবই বলব।

আমার স্ত্রীর কিছু গয়নাগাটি আছে বটে, কিন্তু সেগুলো সবই ব্যাঙ্কের লকারে রাখা। সোনাদানা ছাড়া আর যা সব দামি জিনিস আছে তার জন্য আপনার মতো খানদানি চোর এ বাড়িতে পায়ের ধুলো দিতে আসবেন বলে মনে হয় না। মোবাইল ফোন, ডিভিডি প্লেয়ার, কম্পিউটার বা বাসনপত্র--এ সবের কোনো সেকেণ্ডহ্যাণ্ড মার্কেটও তো নেই। ক্যাশ টাকাও ধরুন, আমার আন্দাজমতো হাজার চার-পাঁচের বেশি হবে না।

আপনার স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েরা দোতলায় থাকেন, আপনি একলা তিনতলায়! কেন বলুন তো?

বিস্তারিতভাবে শুনতে চান কি?

সংক্ষেপে বললেও হবে। বাকিটা আমি আন্দাজ করে নেবো।

সেই ভালো। আপনি আমার সম্পর্কে যদি এত জানেন তাহলে আপনার বোধহয় এও জানা আছে যে, আমার লেখাপড়া বেশি দূর এগোয়নি। আমি বক্সিং এবং ফুটবল নিয়ে কৈশোর-যৌবন কাটিয়েছি বলে পড়াশুনো হয়নি। আমাকে অশিক্ষিতই বলা যায়। কিন্তু আমার স্ত্রী কেমিস্ট্রিতে পিএইচ ডি এবং একটি ভালো কলেজের অধ্যাপিকা। আমাদের বিদ্যাবত্তার এই পার্থক্যই আমাদের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করে রেখেছে।

সোমাদেবীর সঙ্গেও ঠিক এরকমই একটা কারণে আপনার দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছিল, তাই না?

হ্যাঁ, আমি ন্যাড়া হয়েও দুবার বেলতলায় গেছি। বিদিশাকে বিয়ে করা আমার ঠিক হয়নি। আমার বরং উচিত ছিল কম শিক্ষিতা, সাদামাটা একটি মেয়েকে বিয়ে করা। আমার ক্লাসের কিন্তু তা হয়নি। বিদিশাকে দোষ দিচ্ছি না। তার পক্ষে আমাকে শ্রদ্ধা করা বা গুরুত্ব দেওয়া সম্ভব নয়। আমার ছেলেমেয়ে দুটিও ভারি মেধাবী। দুজনেই যে যার ক্লাসে ফার্স্ট হয়। কিন্তু তাদের সঙ্গেও আমার সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারেনি। আমি এ ব্যাপারে খানিকটা একঘরে।

বুঝেছি।

বুঝবেন বইকি। আপনি বুদ্ধিমান।

আপনার ব্যবসার টার্নওভার বছরে কত?

দুই থেকে আড়াই কোটি টাকা।

আপনার মার্জিন কত থাকে?

কম বেশি কুড়ি থেকে তিরিশ পার্সেন্ট। অবশ্য তা থেকে ট্যাক্স ইত্যাদি বাদ দিলে অনেকটাই কম। ধরুন ক্লিয়ার ইনকাম পনেরো থেকে কুড়ি পার্সেন্ট। তাছাড়া মন্দা আছে, ডেমারেজ আছে, গুণ্ডামানি আছে, চাঁদা এবং ঘুষ আছে। এসব কেন জানতে চাইছেন?

কেউ আপনাকে ব্ল্যাকমেল করতে চাইলে তার কতটা লাভ হবে সেটা জানার জন্য।

ব্ল্যাকমেল! ও বাবা, ব্ল্যাকমেল তো খুব খারাপ জিনিস! আপনি কি আমাকে ব্ল্যাকমেল করার কথা ভাবছেন?

আমি ব্ল্যাকমেলার নই। পেশাদার চোর।

তাহলে?

আগামীকাল আপনার লেবার পেমেন্ট। তাছাড়া কাল আপনার একটা মোটা ক্যাশ রি-ইমবার্সমেন্ট আছে। আমার হিসেবমতো মোট বারো লক্ষ টাকা। এই টাকাটা কোথায়?

আমাদের পেমেন্ট হয় সাধারণত বেলা তিনটের পর। সকালে বেলা বারোটা নাগাদ আমাদের লোক ব্যাঙ্কে গিয়ে টাকাটা তুলে আনে।

কোন ব্যাঙ্ক?

চার্টার্ড ব্যাঙ্ক। কিন্তু ব্ল্যাকমেল নিয়ে কথাটা এখনও শেষ হয়নি। কে আমাকে ব্ল্যাকমেল করতে চাইছে মশাই?

আপনাকে কেউ ব্ল্যাকমেল করতে চাইছে একথা আমি বলিনি। বলেছি, যদি কেউ ব্ল্যাকমেল করতে চায় তাহলে তার কতটা সুবিধে হবে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, আপনাকে ব্ল্যাকমেল করা বেশ কঠিন ব্যাপার। কারণ আপনার তেমন কোনো সিক্রেসি নেই।

কথাটা ঠিকই বলেছেন। আমার জীবনে পর্দার আড়ালে তেমন কিছু নেই।

কিংবা থাকলেও আপনি তা জানেন না।

তার মানে? আপনি কি আমার জীবনের কোনো গোপন কথা জানেন?

একজন প্রথম শ্রেণির চোর হতে গেলে একজন ভালো ইনভেস্টিগেটরও হতে হয়। ভিকটিমকে নিয়ে কালচার না করলে তার সম্পর্কে ইনফরমেশন পাওয়া সম্ভব নয়। আর

ইনফরমেশনই সবচেয়ে গুরুতর জিনিস।

আপনার মতো অদ্ভুত চোর আমি জীবনে দেখিনি।

আপনি কটা চোর দেখেছেন?

সেটাও ভাববার কথা। আমদের বাড়িতে কয়েকবার চুরি হলেও চোরের সাক্ষাৎ পাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়নি। এই প্রথম একজন চোরকে চোখের সামনে দেখছি।

আপনি কি অন্ধকারেও দেখতে পান?

না। আসলে না দেখলেও আপনার উপস্থিতি টের পাচ্ছি, আপনার সঙ্গে কথাও বলছি। একটা কথা বলবেন?

কী কথা?

আমার বাড়িতে কোনো দৃশ্যমান রেনপাইপ নেই, বাড়ির গায়ে তেমন খাঁজখোজ নেই। তাহলে আপনি কী করে তিনতলার ঘরে উঠে আসতে পারলেন।

চেষ্টা করলে আপনিও পারবেন। একটা কাজ বারবার করলে তাতে একটা দক্ষতা এসে যায়। লোকে কত উঁচু পাহাড়েও তো ওঠে, তিনতলা তো তুচ্ছ।

তা বটে। আপনি চোর হলেও বেশ শ্রদ্ধা হচ্ছে আমার। কিন্তু আপনি কাজ ফেলে আমার সঙ্গে গল্প করছেন দেখে একটু অবাক হচ্ছি।

গল্প করছি না তো! জানার চেষ্টা করছি।

ঠিক আছে, কী জানতে চান বলুন।

আপনি সিউড়ি থেকে চলে আসবার পর আপনার স্ত্রী সোমাদেবীর সঙ্গে আপনার কি যোগাযোগ ছিল?

না। ওই চ্যাপ্টারটা সম্পূর্ণ মুছে গিয়েছিল।

আপনি তাহলে সোমাদেবী সম্পর্কে কোনো খোঁজই রাখেন না?

না। কারণ, সোমার আর আমার মধ্যে যে দূরত্বটা তৈরি হয়েছিল তার মূলে ছিল আমার প্রতি সোমার তীব্র বিতৃষ্ণা। যে আমাকে এতটা অপছন্দ করে, তার সম্পর্কে আমার আর কৌতূহল থাকার কথা নয়।

আপনাকে যারা মেরেছিল তাদের আপনি চিনতে পেরেছিলেন?

সিউড়ি ছোটো জায়গা। চেনা শক্ত ছিল না। যে পাঁচজন আমাকে অ্যাটাক করে তাদের তিন জনের নাম আমার আজও মনে আছে।

তাদের নাম কি বিলু, বাপ্পা, শিবেন, আমজাদ আর বাটুল?

বাপ্পা, শিবেন আর বাটুলকে আমার মনে আছে। বাকি দুজনেরও মুখ চিনি। আশ্চর্যের বিষয় আপনিও তাদের চেনেন দেখছি।

হ্যাঁ, চিনি।

তাহলে আপনিও বোধহয় সিউড়ির লোক!

তা তো হতেই পারে। আপনার কি কখনো সেই মারের বদলা নিতে ইচ্ছে হয়নি?

না তো!

কেন আপনাকে মারধোর করা হয়েছিল, সে বিষয়ে জানবার কোনো আগ্রহ হয়নি?

হয়েছিল। কিন্তু আমি নিজেকে সংবরণ করি।

কেন, কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরতে পারে, এই ভয়ে?

এসব অনেক আগেকার ব্যাপার। অতীত। এসব নিয়ে এখন আর মাথা ঘামিয়ে কী হবে বলুন!

আপনি একজন লাইট হেভিওয়েট বক্সার। এলেবেলে বক্সার নন, ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন। গুণ্ডাদের মার খেলেন, উলটে তাদের মারেননি?

না। সত্যি কথা বলতে হলে স্বীকার করতেই হবে যে, রিং-এর বাইরে আমি খুব কমই ওসব করেছি। বক্সিং-এর একটা মজা হল, শুধু মারতে জানলেই হয় না। প্রভূত মার হজম

করার ক্ষমতাও দরকার। আপনাকে আরও একটু জানাচ্ছি, ওরা আমার সঙ্গে হাতাহাতি লড়াই করেনি। মেরেছিল রড আর লাঠি দিয়ে। ওদের দুজনের হাতে পিস্তল আর ড্যাগার ছিল। কী বলব আপনাকে, অস্ত্রশস্ত্রকে আমি বরাবর ভীষণ ভয় পাই। কারো হাতে মারণাস্ত্র দেখলেই আমি নার্ভাস বোধ করি। হয়তো এটা একটা স্নায়বিক দুর্বলতা।

তাহলে আপনি বিনা প্রতিবাদে মার হজম করেছিলেন?

হ্যাঁ। হেড ইনজুরি হওয়ায় আমি অজ্ঞান হয়ে যাই।

আপনার কি এখনও ধারণা যে সেই পরিকল্পিত মারের পিছনে সোমাদেবীর কোনো হাত ছিল না?

হ্যাঁ। আমার ধারণা সোমা এটা করেনি।

আপনার এই ধারণার কোনো কারণ আছে?

সোমা আমাকে অপছন্দ করত, এটা ঠিক। কিন্তু আমার প্রতি তার বিদ্বেষ প্রকাশের অন্য পন্থা ছিল। আমি অপদার্থ হলেও পুরুষ মানুষের একটু অহঙ্কারও তো থাকে। আমি একজন অনিচ্ছুক মহিলার সঙ্গে জোর করে সম্পর্ক বজায় রাখার মানুষ নই। সুতরাং আমি মনে মনে ঠিক করেই রেখেছিলাম যে, সোমাকে রেহাই দেব। সেটা ওকে জানিয়েও দিয়েছিলাম। সুতরাং, সোমার দিক থেকে মারধরের প্রশ্নই ওঠে না।

সোমাদেবী কি কখনো আপনার কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছেন?

না। কিন্তু আজ হঠাৎ সোমার কথা উঠছে কেন?

কারণ আছে।

কী কারণ?

আপনি কি জানেন যে আপনার সঙ্গে যখন সোমাদেবীর বিচ্ছেদ হয় তখন তিনি প্রেগনেন্ট ছিলেন?

অ্যাঁ! কী আশ্চর্য? আমি তো এটা জানতাম না! সোমাও আমাকে জানায়নি! আশ্চর্য! অতি আশ্চর্য!

এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এরকম তো হতেই পারে। তাই না? প্রকৃতির নিয়মানুসারেই মেয়েরা অন্তঃসত্ত্বা হয়ে আসছে।

সে তো ঠিক কথা। কিন্তু সোমা আমাকে জানাল না কেন?

তার একটা কারণ এটা হতে পারে যে, উনি যে অন্তঃসত্ত্বা তা উনি নিজেও হয়তো তখনও বুঝে উঠতে পারেননি। কিংবা ব্যাপারটা অনভিপ্রেত ছিল বলে উনি হয়তো অ্যাবরশনের কথা ভেবেছিলেন।

ও। তাহলে তো চুকেবুকেই গেল। অ্যাবরশন হয়ে থাকলে তো--

কিন্তু আমি যতদূর জানি, অ্যাবরশনটা হয়নি।

তাহলে কি সন্তানটি জন্মেছিল?

হ্যাঁ। তবে ভিন্ন পিতৃপরিচয়ে।

তার মানে কি সোমা আবার বিয়ে করেছিল?

করাটাই তো স্বাভাবিক। তার সঙ্গে পুষ্পেন্দু বলে একজন অধ্যাপকের একটু ভাবও ছিল।

ঠিক ধরেছেন। সোমাদেবী পুষ্পেন্দুকেই বিয়ে করেছিলেন।

তারা নিশ্চয়ই সুখে আছে।

হ্যাঁ।

আমি কি জানতে পারি সোমার সন্তানটি ছেলে না মেয়ে?

ছেলে।

আমার হিসেবমতো ছেলেটার বয়স এখন বোধহয় বাইশ বছর। তাই না?

হ্যাঁ। আপনার কি বাৎসল্যের ভাব হচ্ছে?

হচ্ছে। হঠাৎ এতদিন পর আমার একটা ছেলে আছে জেনে আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। মাথাটা ডগমগ করছে। কী আশ্চর্য ঘটনা! আমার একটা ছেলে আছে এবং তার বয়স এখন

বাইশ বছর--এ যে ভাবাই যায়না। ধন্যবাদ, আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ।

আপনি অত আহ্লাদিত হবেন না। কেননা একটু প্রবলেমও আছে। লিগালিটি প্রমাণ হলে অলক দত্ত ওরফে ঘোষ আপনার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী।

উত্তরাধিকারী! সত্যি বলছেন?

শুনে কি আপনি খুশি হলেন? ভাগীদার জুটল বলে দুশ্চিন্তা হচ্ছে না আপনার?

না। বরং ভীষণ আনন্দ হচ্ছে।

সে কী?

তার কারণ আমার বিল্ডিং মেটোরিয়ালের ব্যবসাকে আমার স্ত্রী একদম পছন্দ করেন না। তিনি সূক্ষ্ম রুচিসম্পন্ন শিক্ষিতা মহিলা। কুলিকামারি, মুটে-মজদুর এবং খাতক-মহাজন-দালাল কন্টকিত এই কারবার ওর দুচোখের বিষ। সোমার মতো বিদিশাও হয়তো আমাকে ত্যাগ করে যেত। কিন্তু বিদিশার চেহারাটা ভালো নয় বলে এবং ওঁর বাপের বাড়ির দিকটাকে আমি নিয়মিত সাহায্য করি বলে এবং আমার এক শালাকে ম্যানেজার করে রেখেছি বলে উনি আমাকে ছেড়ে যাননি। কিন্তু আমার পুত্রটি যে কিছুতেই তার বাবার ব্যবসার হাল ধরবে না, তা আমি জানি। সে লেখাপড়া শিখে, ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হয়ে অন্য পথ ধরবে। সুতরাং আমার একজন উত্তরাধিকারী দরকার। অলক সম্পর্কে আপনি কি আমাকে কিছু বলতে পারেন?

পারি।

অলক কি জানে যে, ওর বাবা?

না। পুষ্পেন্দু দত্তকেই সে বাবা বলে জানে। তবে পুষ্পেন্দু দত্তের সঙ্গে তার কোনো মিল নেই। পুষ্পেন্দুবাবু পণ্ডিত মানুষ, আলাভোলো লোক, সংস্কৃতিবান, সুপুরুষ, নম্রস্বভাব। অলক ছফুট লম্বা, পেটানো শরীর এবং রোখাচোখা ছেলে। সে অবশ্য লেখাপড়ায় ভালো। সম্ভবত সেও ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ারই হবে। তবে পিতৃপরিচয় নিয়ে তার হয়তো ইদানীং একটু খটকা দেখা দিয়েছে।

তা হোক, তা হোক। বেঁচেবর্তে থাকলেই হল। পুষ্পেন্দুর ছেলে হয়েই বেঁচে থাক। এই খবরটার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আর কয়েক বছর পর আমি এই ব্যবসাটা বেচে দেব বলে ভেবে রেখেছি। বেশ কিছু টাকা পাওয়া যাবে। আমি যদি তা থেকে অলককে কিছু দিতে চাই সে নেবে কি?

বলা কঠিন। কারণ সোমাদেবীর বুটিক আর ডিজাইনার ড্রেস থেকে ভালো আয় হয়। পুষ্পেন্দুবাবু এখন কলেজের প্রিন্সিপাল হিসেবে মোটা মাইনে পান। আর অলকই বা একজন অচেনা সোর্সের টাকা নিতে যাবে কেন?

তাও তো বটে! তাহলে থাক, দরকার নেই। এবার বলুন, আপনার জন্য আমি কী করতে পারি?

আমি একজন চোর এবং অনভিপ্রেত অনুপ্রবেশকারী। আমার জন্য কিছু করতে চাইছেন কেন?

আপনার ইনফরমেশনটা যদি সত্যি হয় তাহলে স্বীকার করতেই হবে যে, অনেকদিন পর আমি এমন একটা খবর পেলাম যা আমার বাকি জীবনটায় একটা আনন্দের সঞ্চার করবে। তাই আমি প্রতিদান দিতে চাই।

আপনার কোনো বিশ্বাসী ভিডিও ক্যামেরাম্যান আছে?

হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?

বলুন না, আছে?

আছে।

কাল আপনার বারো লাখ টাকা ডাকাতি হবে।

সে কী! সর্বনাশ!

মন দিয়ে শুনুন। এই ডাকাতিকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করবেন না। বরং একটা গাড়ি ভাড়া করে তা থেকে গোটা ঘটনাটার একটা ভিডিও রেকর্ডিং করিয়ে রাখবেন। রেকর্ডিং যেন নিখুঁত হয়।

এসব করার মানে কী?

মানেটা পরে বুঝবেন। আপনার ম্যানেজার শালা নিজস্ব কারবার খোলার চেষ্টা করছেন। তার এখন অনেক টাকার দরকার।

সর্বনাশ!

ঘাবড়াবেন না। কিন্তু রেকর্ডিংটা করাবেন।

অবশ্যই। কী বলে যে আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাব?

জানাতে হবে না।

আপনি আসলে কে?

আমিও একজন বক্সার। লাইট হেভিওয়েট।

আপনি এত কথা কী করে জানলেন?

আমি কিছুদিন যাবৎ আপনাকে কাল্টিভেট করছি। নানা অ্যাঙ্গেল থেকে অ্যাসেসমেন্ট করতে গিয়ে কিছু ইনফরমেশন হাতে এসে যায়।

কিন্তু কেন?

আজ থাক। অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে। আবার কোনো এক অন্ধকারে আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। আজ আসি। নমস্কার।

দাঁড়ান, দাঁড়ান, এক্ষুনি চলে যাবেন না! ও মশাই--

রাসমণির সোনাদানা

সন্ধেবেলা বেরোবে বলে চুল আঁচড়াচ্ছিল রাঙা। আয়নার সামনে দাঁড়ালে বরাবর তার মন ভালো হয়ে যায়। অনেকে বলে তার মুখশ্রীতে একটা ধ্রুপদী আদল আছে। যেমনটা পটচিত্রে বা ঠাকুরদেবতার ছবিতে দেখা যায়। খুব নিখুঁত গড়নের মুখ। সরু চিবুক, ছোটো কপাল, পাতলা ঠোঁট, থুঁতনিতে একটা আবছা খাঁজ, গালে টোল এবং চোখ। হ্যাঁ, তার চোখ নাকি অনেকের সর্বনাশ করে বসে আছে। এতটা নিখুঁত হওয়া কি ভালো? তার নিজের তো বাপু তেমন পছন্দ নয় ব্যাপারটা। বরং একটু লম্বাটে মুখ হলে সে খুশি হত। একটু খুঁত-টুত থাকা কিছু খারাপও তো নয়। একটু খুঁত সৌন্দর্যকে বরং কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেয়। তবু আয়নার সামনে দাঁড়ালে তার খুশি হওয়ার কারণ আছে।

খুব মন দিয়ে একদম কপালের মাঝখানে একটা লাল টিকলি পরছিল সে। ঠিক সেই সময়ে আয়নায় তার পিছনে একটা চকিত সাদা রঙের ঝলক যেন উদ্ভাসিত হয়েই সরে গেল। ভারি অবাক হয়ে ঘাড় ঘোরালো রাঙা। ঘর ফাঁকা, দরজা বন্ধ। কেউ কোথাও নেই। তবে কি ভুল দেখল? না কি এই বয়সেই চোখের দোষ হল তার! স্পষ্ট দেখেছে।

ঘরখানা মস্ত বড়ো। একখানা সেকেলে বিশাল কারুকাজ করা পালঙ্ক। সাবেক আমলের মেহগনি কাঠের কয়েকটা আলমারি, ব্রিটিশ আমলের নামি দোকানের থ্রি পিস আয়নাওলা ড্রেসিং টেবিল, গরম জামাকাপড় রাখার জন্য বড়ো চেস্ট অফ ড্রয়ার্স। এই ঘরে থাকতেন রাসু ঠাকুমা। সম্পর্কে তার বাবার পিসি। বাল্যবিধবা। এখনও পশ্চিমের দেয়ালে রাসমণির একখানা রঙিন ব্লো আপ করা ফটো বাঁধানো আছে কারুকার্যময় ফ্রেমে। এ ঘরে সেই কোন আদ্যিকালের গন্ধ যেন এখনও বিদ্যমান। আর ফটোর ওই মুখখানা, ও মুখ যেন রাঙার সঙ্গে অদল বদল করা যায়।

দেশ থেকে কিছুদিন আগেই তাদের বিস্মৃত অতীতের এক বুড়োমানুষ এসেছিল দেখা করতে। পূর্ব পাকিস্তানের নানা অসুবিধের কথা বলছিল বসে। হাপরহাটি, খানসেনা, রাজাকার এসব কথা কানে এসেছিল রাঙার। দেশ নিয়ে বাপ-জ্যাঠাদের ভীষণ আবেগ আছে এখনও। রাঙার নেই। তার জন্ম এদেশে। পার্টিশনের অনেক পরে। সেই বুড়ো লোকটার সামনে দিয়েই যখন সে কলেজে যাবে বলে বেরোচ্ছিল, তখন লোকটা হঠাৎ বড়ো বড়ো চোখে চেয়ে আর্তনাদের গলায় বলে উঠেছিল, আরে, এ যে রাসু ঠাইরেন! এক্কেরে রাসু ঠাইরেন!

রাঙা চমকায়নি, তাকে আর রাসমণিকে নিয়ে এ বাড়িতে একটা চাপা ফিসফাস আছে। প্রকাশ্যে কেউ তাকে কিছু বলে না। কিন্তু বাড়ির লোকের ধারণা, রাসমণিরই পুনর্জন্ম ঘটেছে রাঙার মধ্যে।

ওসব অবশ্য রাঙা মানে না এক বংশে একরকম দেখতে দুটো মানুষ জন্মাতেই পারে। এসব জিন-এর ব্যাপার। পুনর্জন্ম-টন্ম সে বিশ্বাস করে না। তবে সে বুঝতে পারে, তাকে রাসমণির পুনরাবির্ভাব ভেবে এবাড়ির লোকেরা একটু ভয়ও পায় যেন। এটার কোনো স্পষ্ট প্রকাশ নেই। তবে রাঙা টের পায় এবং ব্যাপারটা উপভোগও করে। বাড়ির লোক বলতে অবশ্য তার মা বাবা, ছোট ভাই জয়, আর কাকা কাকিমা। কাকা কাকিমার ছেলেপুলে নেই। আর যারা আছে তারা কিছু জ্ঞাতি, কিছু আশ্রিত, পূর্ববঙ্গে তাদের বাড়িতে এরা থাকত। এখনও আছে।

এই যেমন রাখালকাকা। এক সময়ে এ বাড়ির কাজের লোক ছিল। তার তিন কুলে কেউ নেই। এখন বুড়ো হয়েছে। দীর্ঘকালের অধিকারবোধ থেকে সে এখন এ বাড়ির একজন অভিভাবক গোছের। আছে নবদাদু আর ঠাকুমা। নবদাদু হল রাঙার ঠাকুর্দার পিসতুতো ভাই। কোন সূত্রে যে এসে পড়েছিল এ বাড়িতে কে জানে! কিন্তু রয়ে গেছে। আছে শ্যামাপদ জেঠু, আত্মীয় নন, একসময়ে তাদের এস্টেটে আদায় উসুলের কাজ করতেন। পরিবারের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় চলে এসেছেন। তিনি কাজের লোক, এ বাড়ির বাগানখানা তাঁর হাতের গুণেই ভারি দেখনসই হয়েছে। এদের মাঝখানেই বড়ো হয়েছে

রাঙা। এদের কাউকে পর বলে মনে হয়নি কখনো। ঘাড়ে বসে খায় বলে মা বাবা বা কাকা কাকিমা কখনো অনুযোগ করে না। দেশের বাড়িতে এরকম অনেক লোক খেত, থাকত। এ পরিবারের ঐতিহ্যই তাই। তাবে পাকিস্তান থেকে চলে আসবার পর ঠাঁটবাট বজায় রাখতে একসময়ে সর্বস্বান্ত হতে বসেছিল তারা, এ গল্পও শুনেছে রাঙা। আরও একজন আছে এ বাড়িতে। তার নাম বেণু। রাঙার চেয়ে কয়েক বছরের বড়ো। তার ঠাকুর্দা এ বাড়ির বুড়ো কর্তার খাস চাকর ছিল। সা জোয়ান চেহারা। শোনা যায় তবে অপঘাতে মৃত্যু হয়েছিল। কারো কারো সন্দেহ তাকে মেরেছিল বুড়োকর্তার পাইকরাই। বেণু এ বাড়ির আশ্রিত এবং চাকরের নাতি বলে তার সামান্য হীনমন্যতা আছে। তবে এ বাড়ির পরবর্তী প্রজন্ম তাকে দূরছাই করেনি, গতরেও খাটায়নি। বেণু লেখাপড়া শিখেছে। ছাত্র আন্দোলন করে। একটু আধটু পলিটিকসও। তবে মাঝে মাঝে সে কাউকে কিছু না বলে হঠাৎ কয়েকদিনের জন্য উধাও হয়ে যায়। তার জন্য বকুনিও খায় খুব। মৃদু মৃদু মিষ্টি হাসি। সে বকুনি টকুনি সব হজম করে নেয়। রাঙা জানে, বেণু দেখতে নরম সরম লাজুক প্রকৃতির হলেও ভারি জেদি। বেশ সাহসীও। এই মফসসল শহরে সে ছেলেছোকরাদের পাণ্ডা গোছের লোক। ক্লাব, পুজো কমিটি, নাগরিক কমিটি সবতাতেই সে অপরিহার্য।

তিনতলা থেকে নামবার সময় আজ সন্ধেবেলা একটু আনমনা লাগছিল রাঙার। তিনতলাটা একদম ফাঁকা। চারটে ঘর, দরদালান, স্টোর রুম, ওপেন টেরাস নিয়ে কম জায়গা নয়। এ-তলাটায় রাঙা ছাড়া কেউ থাকে না। আর একা এই পুরো একটা ফ্লোর নিয়ে থাকাটা রাঙার ভারি পছন্দ। গত চার বছর ধরে সে এখানে আছে। শোওয়ার ঘর ছাড়াও আছে স্টাডিরুম আর লাইব্রেরি, আর একটা ঘর নিজের মনের মতো সাজিয়ে সে ড্রয়িং রুম করেছে, বন্ধুবান্ধব এলে হই-হই করে আড্ডা হয়। চতুর্থ ঘরটায় একটা নিজস্ব জিম করার ইচ্ছে আছে। তবে আপাতত তাতে ডাঁই হয়ে আছে সাবেক আমলের বেশ কিছু বাড়তি অপ্রয়োজনীয় আসবাবপত্র।

একতলায় নেমে সে মায়ের ঘরের দরজার সামনে একটু দাঁড়ায়। সরযূবালা এই ভরসন্ধেবেলাতেও চোখে চশমা এঁটে একটা লম্বা ফর্দ দেখছিল। এই মহিলাকে রাঙা কখনো অলস সময় কাটাতে দেখেনি জ্ঞান হয়ে অবধি। সরযূবালা প্রতাপশালী মহিলা নয়।

ডাকসাইটে নয়। তার হাঁকডাক, তর্জন গর্জন কখনো কেউ শোনেনি। বরং মিষ্টি মুখশ্রীর এই মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আসা মহিলাটি শ্বশুর শাশুড়িদের কাছে নতমুখেই থাকত। কিন্তু রাঙা মাকে চেনে। অন্য কোনো মহিলার সঙ্গে তার মায়ের কোনো তুলনাই হয় না। সরযূবালাই এই পরিবারটিকে নিঃস্ব ভিখিরি হয়ে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল। সকলের অমতে খুলেছিল শাড়ির দোকান। রাসমণির দোকান, এই শহরে আজও এত গুডউইল আর কারো নেই। রাসমণির দোকান হল রিটেল আউটলেট। সরযূবালা সেই সঙ্গে পাইকারি ব্যবসাও চালু করেছে। রাঙা শুনেছে দেশে তাদের জমিদারির আয় ছিল বছরে সাত লক্ষ টাকা। কিন্তু রাসমণির দোকান আর পাইকারি ব্যবসা থেকে এখন তাদের আয় আরও অনেক বেশি। আর সেটা শুধু সরযূবালার জন্যই। একটা পরিবারকে মহাপতনের হাত থেকে ওই স্থিরবুদ্ধির শান্ত মহিলাই টেনে তুলেছে। গোটা পরিবার এই মহিলাকে মেনে চলে।

মা!

সরযূবালা মুখ ফিরিয়ে তাকায়, বেরোচ্ছিস বুঝি?

আজ কাকলির জন্মদিন।

রাত কোরো না। একটা চাদর টাদর নিলে পারতে। সন্ধের পর আজকাল হিম পড়ে।

ভ্যাট। এত সুন্দর করে শাড়িটা পরলাম, এর ওপর চাদর চাপালে বিচ্ছিরি দেখাবে না। মোটেই হিম পড়েনি।

সরযূবালা আর কিছু বলল না।

মা।

সরযূবালা ফের তাকায়, কিছু বলবি?

আমি যখন ড্রেসিং টেবিলের সামনে সাজছিলাম তখন একটা অদ্ভুত ব্যাপার হল।

সরযূবালা একদৃষ্টে চেয়ে বলে, কী হল?

মনে হল একটা সাদা কাপড়-পরা কেউ আমার পিছনে এসে দাঁড়িয়েই চোখের পলকে সরে গেল।

ঘরের জোরালো টিউবলাইটের আলোয় দৃশ্যতই সরযূবালার মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

ও ঘরে তোকে আর শুতে হবে না।

ও মা! কেন বলো তো!

সরযূবালা মাথা নেড়ে বেশ জোরের সঙ্গে বলে, আমি আর তোকে ও ঘরে থাকতে দেব না। সারা বাড়িতে কত ঘর ফাঁকা পড়ে আছে। নব জ্যাঠাদের পাশের ঘরটাতে আজই বিছানা পাতিয়ে রাখছি। শুবি।

পাগল হলে মা? তিনতলায় তো আমি বেশ আছি। আমার একটুও ভয় করে না তো।

সরযূবালাকে ক্লান্ত চিন্তিত বিষণ্ন লাগছিল এখন। বলল, তোমার ভয় না করলেও আমার করে।

মা, একটু ভেবে দেখ। এক দিন দুদিন নয়, আমি টানা চার বছর তিনতলায় একা আছি। কখনও তো ভয় পাইনি।

তোমার প্রাণে কি ভয়ডর আছে মা? এই তো জয় সেদিনই বলছিল, মা, দিদি আরশোলা ছাড়া আর কিছুই ভয় পায় না কেন বলো তো?

ওটা তো ভীতুর ডিম। আদর দিয়ে দিয়ে তুমিই ওকে ওরকম বানিয়েছ। তোমার আদর বুঝি কম?

আমি তা বলে প্যামপার্ড নই ভাইয়ের মতো।

তর্ক থাক। আমি চাই না, তুমি আর তিনতলায় থাকো।

একটা কথা বলবে মা?

কী কথা?

কথাটা তুমি আমাকে কখনো বলোনি। আমি রাখালকাকার কাছে শুনেছি। তুমি নাকি রাসুঠাকুমার ভূতকে দেখতে পেতে।

সরযূবালা ফর্দটার দিকে চোখ রেখে গম্ভীর গলায় বলল, ওদের ওরকমই সব কথা। রাখালদার ভীমরতি হয়েছে।

আর আমিই নাকি রাসমণি?

সরযূবালা বিরক্ত হয়ে বলে, জানি না। এখন যা তো! মোট কথা আজই কিন্তু আমি ছগন আর বলাইকে পাঠাব তোর বিছানা তুলে নিয়ে আসতে।

না মা, ওটা কোরো না। সাদা কাপড়ের ঝলকটা যদি রাসুঠাকুমারই হয় তা হলে আমাদের একটা ধারণা ভুল বলে প্রতিপন্ন হবে।

কীসের ধারণা?

তোমাদের তো ধারণা আমিই আগের জন্মের রাসমণি? রাসমণির ভূত যদি ফের দেখা দেয় তা হলে বুঝতে হবে রাসমণি আমি হয়ে জন্মায়নি!

সরযূবালা চুপ করে মেয়ের দিকে চেয়ে রইল।

আরও একটা কথা মা। রাসমণি যদি এতদিন পরে হঠাৎ ফের হাজির হয়েই থাকে তা হলে বুঝতে হবে তার কোনো জরুরি প্রয়োজন আছে।

বড্ড বাড়াবাড়ি করছো বাসন্তী।

রাসমণি তো আমাদের কোনো ক্ষতি করেনি মা। বরং আমাদের অনেক উপকারই হয়েছে। আমি ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করি না, কিন্তু তর্কের খাতিরে যদি ধরেই নিই যে আজকের ঘটনাটা চোখের ভুল নয়, ওই সাদা কাপড়ের আভাসটা আসলে রাসুঠাকুমারই থানকাপড়, তা হলেই বা ভয়ের কী? বরং আমার কৌতূহল হচ্ছে, ঠাকুমা আমাকে কী বলতে চায়!

ঠিক আছে, তুমি যদি দোতলায় আসতে না চাও তা হলে আমিই আজ তোমার সঙ্গে শোবো। খাটটা তো মাঠের মতো বড়ো, কোনো অসুবিধে হবে না।

না মা, তাও হবে না। তুমি থাকলে রাসুঠাকুমা যদি আমার সঙ্গে কথা বলতে না চায়? আমার সঙ্গে তার কোনো গোপন কথা থাকতে পারে! তুমি কাছে থাকলে আসবেই না হয়তো।

সরযূবালা বিরক্ত গলায় বলল, সে বুঝি খুব ভালোমানুষ ছিল! কম জ্বালিয়েছে আমাদের? বেঁচে থাকতে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেয়েছে, মরে গিয়েও কম পিছু লাগেনি বাবা।

তা হলে তুমি তোমার দোকানের নাম রাসমণির দোকান রাখলে কেন মা? মানুষটাকে যদি এতই ঘেন্না তোমার, তা হলে আমিই সেই রাসমণি জেনেও আমাকে এত ভালোবাসছ কি করে?

আমি কি তোমাকে বলেছি যে, আমি তোমাকে রাসমণি বলে মনে করি?

বলতে হয় না মা। এ-বাড়ির কেউ কথাটা আমাকে মুখ ফুটে কখনো বলেনি, কিন্তু গুঞ্জনটা আমার কানে আসে। আমি টের পাই।

তা যদি হয়েও থাকো তা হলেও রাসুপিসি আর তুমি তো এক নও। তার জীবন আলাদা, তোমার জীবন আলাদা। এখন এসো গিয়ে। দেরি করে বেরোলে ফিরতে দেরি হবে।

রাঙা বেরিয়ে পড়ল। মুখে একটু দুষ্টুমির হাসি। তার বুদ্ধিমতী ব্যক্তিত্বময়ী মাকে জব্দ করা বড়ো সহজ কাজ নয়। আজ একটু জব্দ করতে পেরে তার বেশ খুশি-খুশি লাগছে। আসলে সে মাকে ভীষণ ভালোও বাসে। কিন্তু মা সবসময়ে এত সিরিয়াস, এত গোমড়ামুখ যে, ওই কঠিন আস্তরণটাতে মাঝে মাঝে একটু আধটু আঘাত করতে ইচ্ছেও করে। ফিরে এসে সে আজ মাকে খুব আদর করবে।

কাকলির বাড়িতে আজ অনেক লোক। বন্ধুরা তো আছেই। তা ছাড়া কয়েকজন অচেনা ছেলে আর মেয়েকেও দেখতে পেল রাঙা। এ শহরের সকলেই তার চেনা বা মুখচেনা কিন্তু এই চার-পাঁচজনকে সে আগে কখনো দেখেনি। কয়েকটা চেয়ারে, ঘরের কোণের দিকে তারা বসেছিল চুপচাপ। রাঙা বড়ো হলঘরটায় ঢুকতেই একটা হুল্লোড় উঠল, রাঙা এসেছে! রাঙা এসেছে!

কাকলি এসে তার হাত ধরে বলল, বড্ড দেরি করলি মুখপুড়ি। তুই না এলে জমে? শিগগির গান ধর।

রাঙা এ শহরের এক নম্বর গায়িকা। সব ফাংশনে তাকে গাইতে হয়। সুতরাং সে তৈরি হয়েই এসেছে। ব্যাগ থেকে গানের খাতা বের করে সে হারমোনিয়াম নিয়ে বসে গেল। তবলায় তার অনেকদিনের সঙ্গতকার সেই তন্ময়।

পরপর খান সাতেক গান গেয়ে যখন দম নিচ্ছে তখন ঘরের কোণ থেকে অচেনা ছেলেমেয়েদের মধ্যে থেকে একজন একটু মোটাসোট চেহারার ছেলে উঠে এসে সামনে দাঁড়াল, আপনে তো বড়ো ভালো গান করেন! গলায় জোয়ারি আছে।

রাঙা একটু হাসল। প্রশংসা পেতে সে অভ্যস্ত।

ছেলেটা করুণ মুখ করে বলল, আমিও গান করি। ঢাকা রেডিওতে মেলা প্রোগ্রাম করছি।

কথায় সুস্পষ্ট বাঙালি টান লক্ষ করল রাঙা। বলল, কী গান আপনি?

মেইনলি ভাটিয়ালি আর ভাওয়াইয়া, দমের গান করি।

বাঃ, তাহলে শোনান না। আপনি একজন রেডিও আর্টিস্ট আর চুপচাপ বসে আছেন!

ছেলেটা করুণ মুখে মাথা নেড়ে বলে, ইচ্ছা করে না, বুঝলেন? গান গাইতে হইলে মনটায় একটু আনন্দ থাকা লাগে। দ্যাশের যা অবস্থা, আমরা তো পলাইয়া আইছি। গলায় গান ফুটবে না।

কেন, কী হয়েছে আপনার?

শোনেন নাই? ইস্ট পাকিস্তানে শয় শয় মানুষরে মাইরা ফালাইছে!

ও হ্যাঁ, খুব খারাপ অবস্থা নাকি?

কওনের না। আমরা তো পলাইছি। কিন্তু সকলে তো পারে না। মরত্যাছে, আমার আববাজান মাটি কামড়াইয়া পইড়্যা আছে। তার কোনো খবর নাই।

মনটা খারাপ হয়ে গেল রাঙার। কত বয়স হবে ছেলেটার! বড়োজোর সাতাশ আঠাশ। এই বয়সে একজন উদীয়মান গায়কের এ কীরকম দুরবস্থা!

কাকলি এসে বলল, তোর সঙ্গে পরিচয় করানো হয়নি। ওর নাম আবুল কাদের। পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসেছে তাড়া খেয়ে। আমাদের কেমিস্ট্রির প্রফেসর রউফ সাহেবের বাড়িতে এসে উঠেছে। মন খারাপ করে থাকে বলে আমি ওদের আজ নেমন্তন্ন করে এনেছি। কী অন্যায় বল তো, বাঙালি হয়ে জন্মানোটা কি অপরাধ?

রাত্রিবেলা খাওয়ার টেবিলে একটা থমথমে ভাব। রাঙা, বাবা কাকা আর নবদাদুর কাছে ঘটনাটা বলছিল। দেখা গেল তারা সবাই পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থার কথা জানে।

বাবা বলল, আমাদের গ্রামের বাড়িটা তো আমরা বিক্রি করিনি। এস্টেটের কর্মচারী গফুর মিঞা বাড়িটা আগলে রেখেছিল। পরশুদিন শুনলাম, সেখানে মিলিটারি ক্যাম্প হয়েছে। বাড়ি দখল করে তারা জিনিসপত্র লুটপাট তো করেছেই, গফুর মিঞা তার ছেলেদের দিয়ে নাকি বেগার খাটিয়ে মারছে, মারধোর করছে। শেষে হয়তো মেরেই ফেলবে।

দেশের প্রতি তার বাপ-কাকার যে গভীর টান আছে সেটা রাঙার নেই ঠিকই, তবে কথাটা শুনে আজ তারও একটু কষ্ট হল। দেশের বাড়ি সে দেখেনি, কিন্তু অনুপুঙ্খ বিবরণ বহুবার শুনেছে। উঁচু দেওয়াল আর পাম গাছে ঘেরা দশ বিঘে জমির ওপর ছিল তাদের দোতলা বিরাট বাড়ি। তার দুটো মহল। সামনের দিকে কাছারিঘর, বৈঠকখানা, নাচঘর, চাকরদের থাকার জায়গা, আর ভিতরের দালানে অন্দরমহল। অনেকবার বাড়িটাকে মনশ্চক্ষে কল্পনা করে নিয়েছে সে! তেমন টান না থাকলেও, ওটা যে তাদের পূর্বপুরুষদের ভিটে সেটা তো অস্বীকার করা যায় না, দেশভাগ না হলে সেও তো আজ এই বাড়িতেই থাকত।

বাবা হঠাৎ বলল, তর বলে আইজ সন্ধ্যাবেলা কী একটা হইছে! তর মায় কইতাছিল!

রাঙা হেসে বলল, চোখের ভুলই হবে। ওটা কিছু নয়।

তর একলা ওই ঘরটার মইধ্যে থাকনের কাম কি?

না না, আমি ভয় টয় পাইনি। ভূত নয় বাবা, ভয়ের কিছু নেই।

বুইঝ্যা দেখিছ, তর মায় তো একসময় রাসুপিসির ভূতরে দেখত।

রাঙা হেসে বলল, তোমাদের তো ধারণা আমিই সেই রাসমণি, রাসমণি যদি আবার জন্মে থাকে তাহলে আর ভূতের তো অস্তিত্ব থাকার কথা নয়।

কাকা এতক্ষণ চুপচাপ ছিল। এবার বলল, কাউরে লগে লইয়া শুইলেই তো হয়। তর কাকিমা গিয়ে শুইব তর লগে?

আচ্ছা কাকু, তোমরা কী বলো তো! মানুষ তো কত ভুলটুল দেখে। এত টেনশনের কী আছে? মাকে বলেই বড্ড ভুল হয়ে গেছে দেখছি।

কাকা আর কিছু বলল না, তবে চিন্তিত মুখে বসে রইল।

২

রাতে ঘরে শুতে এসে কিছুক্ষণ আপনার সামনে চুপ করে বসে রইল রাঙা। মনটা খারাপ লাগছে, সবসময়ে মন খারাপের কারণটা ধরা যায় না। হয়তো একটা কারণ নয়, অনেকগুলো ছোটো ছোটো কারণ মিলিয়ে মনটা মেঘলা হয়ে থাকে। সে একটু সচেতনভাবেই বসেছিল। পিছনে কি সাদা ঝলকটা ফের দেখা দেবে? দিক না। যদি সত্যিই ভূত আসে, রাসমণির ভূত, সে তো ভয় পাবে না, সে কথা বলবে।

বেশ কিছুক্ষণ বসে রইল রাঙা। ঘষে ঘষে খুব যত্ন করে মুখে ক্রিম মাখল। চুল আঁচড়াল ভালো করে। মুখখানা মন দিয়ে দেখল অনেকক্ষণ।

যখন শুতে যাবে বলে মশারিটা তুলেছে ঠিক সেই সময়ে তার পিছনে একটা স্পষ্ট দীর্ঘশ্বাসের শব্দ হল। চকিতে ঘুরে দাঁড়াল রাঙা। ঘর ফাঁকা, কেউ কোথাও নেই, আবার কি মনের ভুল? হয়তো বাইরের ঝটকা বাতাস জানালা দিয়ে ঢুকতে গিয়ে শব্দটা তুলেছে। হতেই পারে।

আচমকা দেওয়ালে রাসমণির ছবিটার দিকে চোখ পড়তেই রাঙা প্রায় আর্তনাদ করে উঠতে যাচ্ছিল। এ কী! রাসমণির ছবির দুটো চোখ ওরকম জ্বলন্ত আর জীবন্ত হয়ে উঠেছে কেন? তীক্ষ্ণ সাঙঘাতিক দুটো চোখ যেন ফুটো করে ফেলছে তাকে! পর মুহূর্তেই আবার ছবির চোখ ছবি হয়ে গেল।

বুকটা ধকধক করছে রাঙার। এসব বোধহয় তার মনের কল্পনা। সন্ধেবেলা ওই থানকাপড়ের ঝলক তার মনের মধ্যে বাসা করে আছে। আর তাই থেকেই এসব জটিল কল্পনা তার চারদিকে দৃশ্য আর শব্দ তৈরি করছে।

জল খেয়ে সে শুকনো গলাটা একটু ভিজিয়ে বিছানায় ঢুকে পাতলা কাঁথাখানা গায়ে টেনে নিয়ে বেডসুইচ টিপে আলো নিবিয়ে দিল। আজ কি ঘুম আসবে তার?

ঘর অন্ধকার আর নিঃশব্দ হয়ে গেল। নিঃসাড়ে শুয়ে রইল বাসন্তীরাঙা। তার কি ভয় করছে? তার কি একা লাগছে? তার কি মা বা কাকিমা কাউকে ডাকা উচিত?

মাথাটা কিছুক্ষণ গরম রইল। তারপর কখন নিজের অজান্তে চোখে ঘুমের ভার নেমে এল।

রাত কত হবে কে জানে, বুকে একটা চাপ টের পেতেই ঘুম ভেঙে গেল তার। বুকের ওপর কে একটা ঠাণ্ডা হাত চেপে ধরে আছে?

কে? বলে রাঙা চিৎকার করে উঠল।

হাতটা সরে গেল আচমকা।

রাঙা এক ঝটকায় উঠে বসে বলল, তুমি কে?

একটা মৃদু ফোঁপানির শব্দ শোনা যাচ্ছে নাকি? কেউ কান্না চাপবার চেষ্টা করছে? হাত বাড়িয়ে সে বেডসুইচটা খুঁজছিল।

কে যেন চাপা গলায় ধমক দিল, বাত্তি জ্বালাইছ না হারামজাদি।

হারামজাদি! তাকে কেউ এসব গালাগাল দেয়নি কখনো। ভারি অবাক হয়ে রাঙা বসে যাওয়া গলায় বলল, কে তুমি?

অখন আমি কেডা না? আমার রাইজ্যপাট, খাট পালঙ্ক দখল কইরা আছছ, আমার সর্বস্ব মুইঠের মইধ্যে পাইছছ, অখন আমি কেডা, না? নিমকহারাম, পোড়ারমুখি, বজ্জাত, লজ্জা করে না জিগাইতে?

সে শুনেছে তার বদমেজাজি দুর্মুখ রাসুঠাকুমা এরকমভাবেই গালাগাল করত লোককে। তার দোর্দণ্ডপ্রতাপ জমিদার বাবা আর দাদারা অবধি ভয় পেত তাকে। বাড়ির বউরা থাকত শতহস্ত তফাতে।

খুব নরম গলায় রাঙা বলল, তুমি রাসুঠাকুমা?

নির্বইংশার মাইয়া, গর্ভস্রাব, তগো সবগুলিয়ে যদি চাবাইয়া খাইতে পারতাম তবে জ্বালা জুড়াইত।

আচমকা জ্বর ছাড়ার মতো ভয়ডর উড়ে গেল রাঙার। সে খুব স্বাভাবিক বোধ করতে লাগল। হ্যাঁ, এ রাসমণি। এবং ভূত। ভূত যদি থেকে থাকে তবে তাও একটা এনটিটি, একটা অন্য ধরনের অস্তিত্ব। সুতরাং তাকে ভয় পাওয়ার কারণ নেই। সেই সঙ্গে এত গালাগাল খেয়েও, কেন কে জানে, ওই বালবিধবা রাসুঠাকুমার ওপর তার রাগ হচ্ছে না তো! মায়া হচ্ছে।

সে একটু আদুরে গলায় বলল, তুমি আমার রাসুঠাকুমা। সবাই বলে আমি ঠিক তোমার মতো দেখতে।

আমারে বশ করতে চাস হারামজাদি?

রাগ করেছ। কেন ঠাকুমা? আমি তোমার কোনো ক্ষতি করিনি! তোমার একগাদা গয়না মা আমাকে দিয়েছিল। আমি সব ফিরিয়ে দিয়েছি। তুমি যদি চাও তোমার খাট পালঙ্ক ঘর সব আমি ছেড়ে দেব। বুঝেছ?

এই শয়তান, তর বাপ ঠাকুর্দা কোন ঘটির দ্যাশে জন্মাইছিল রে, তুই যে বড়ো কটর কটর কইরা কইলকাতার বুলি ছাড়তাছ? জিববা টাইনা ছিড়া ফালামু। ক্যান, দ্যাশের ভাষা মুখে ফোটে না? ইঃয়ে, কইলকাতার বিবি আইছে!

রাঙা হেসে ফেলে পরিষ্কার বাঙাল ভাষায় বলল, কে কয় দ্যাশের বুলি কইতে পারি না? খুব পারি, শোনবা?

শুনতাছি। ক' হারামজাদি, গয়নাগুলি তর শয়তান মায়টারে ফিরাইয়া দিলি ক্যান! পছন্দ হয় নাই বুঝি? বাপের জন্মে দ্যাখছছ ওইসব গয়না? আমার নেকলেসটার লকেটে যে হীরাখান আছে তার দাম জানছ? তগো বাড়ি বেচলেও দাম উঠব না।

তুমি কী গয়না ফিরত চাও ঠাকুমা?

চাইলে দিবি?

দিমু।

তাহইলে দে।

লইয়া তুমি কী করবা ঠাকুমা? তোমার শরীর আছে যে, গয়না পরবা?

তর খুব চোপা, না? কটর কটর কথা কইতে পারছ তো খুব! গয়না আমি পরুম তরে কে কইল? আমি বিধবা না?

মরার পরও কেউ বিধবা থাকে নাকি ঠাকুমা?

অন্ধকারে একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ হল। তারপর সেই চাপা, ফ্যাসফ্যাসে কণ্ঠস্বর বলল কী জানি, সধবাও বোঝলাম না, বিধবাও বোঝলাম না।

তুমি খুব কষ্ট পাইছ, না ঠাকুমা?

আ লো পটের বিবি, আমার কষ্টের তরা কী বুঝবি? রঙ চঙ মাইখ্যা, আচল উড়াইয়া চরতে যাছ, হোটেলে গিয়ে অজ্ঞাত কুজাতের হাতে ছাইভস্ম গিলছ, তুই আমার কষ্টের কী বুঝবি রে পুরুষ চাটা মাইয়ালোক?

বুঝি ঠাকুমা, একটু একটু বুঝি। আমিও তো তোমার মতোই এক মাইয়ালোক। মাইয়ালোকই তো মাইয়ালোকের কথা বোঝে।

ঢঙের কথা আর কইছ না রে কুকি। আমার দুইটা ভাইয়ের বউ, দুইটা ভাইয়ের ব্যাটা বউ তারা বুঝছে? তারাও তো মাইয়ালোক, বোবাডাঙ্গার পুরুষ তো না। তারা বুঝল না

ক্যান? তগো সব কয়টারে চিনি। সব শয়তান। সব শয়তান।

আইচ্ছা ঠাকুমা, শয়তান জাইন্যাও আমার মায়রে তুমি তা হইলে গয়নাগুলি দিলা ক্যান?

কারে দিমু? তর মায়টা শয়তান হইলেও আমারে ডরাইত খুব।

আর হেই লিগ্যাই তুমি মরার পর মায়রে ভয় দেখাইতা?

না দেখাইলে শয়তানে যে সব বেইচ্যা কুইচ্যা পেটায় নমঃ করত!

একটা কথা কমু ঠাকুমা?

কী কথা?

আমি কিন্তু তোমারে খুব ভালোবাসি।

মিছা কথা কইছ না রে অতি সাইর্যা। তগো মতো মিটমিটা বজ্জাতরে আমি রগে রগে চিনি।

তোমারে ক্যান ভালোবাসি জান? তোমার কষ্টের কথা যখন শুনি তখন আমার চক্ষে জল আহে।

ফের একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস। একটু চাপা কান্না। তারপর একটু চুপচাপ। তারপর ফ্যাসফ্যাসে চাপা গলাটা বলল, তখন আমার নয় বছর বয়স, বিয়া হইয়া শ্বশুরবাড়িতে গেছি। শাশুড়ি একদিন কইল, যাও তো বউ, তুমি তো ছোটোখাট্টো মানুষ, পাটাতনে উইঠ্যা শুকনা বড়াইয়ের ডালাখানা নামাইয়া আন। জীবনে পাটাতনে উঠি নাই। তবু শাশুড়ির হুকুমে গিয়া উঠলাম। বড়াইয়ের ডালা লইয়া লামুন কেমনে? শাড়ি সামলাইতে পারি না। পাও জড়াইয়া এক্কেবারে উপর থিকা পড়লাম নীচে। পইড়াই অজ্ঞান। বুঝলি? ডাইন হাতের কবজি আর ডাইন পায়ের গুড়মুরা ভাঙছিল। গ্রামদেশে তো আর ডাক্তার বৈদ্য নাই। একটা ঘাটের মড়া হাতুইড়া ডাক্তার আইয়া ত্যানা জড়াই বাইন্ধা বুইন্ধা দিয়া গেল। ভাঙ্গা হাড় বেকা হইয়া জোড়া লাগল ছয় মাসে। হেই থিক্যান ডাইন হাতে জোর পাইতাম না। ডাইন পা টাইন্যা হাটতে হইত।

আহা রে।

আর ওই যে বেণু, অর ঠাকুর্দা কী করছিল জানছ?

কী ঠাকুমা?

শুনলে আমারে ঘিন্না করবি নাকি?

না ঠাকুমা, ঘিন্না করুম না। কও।

তখন বিধবা হইয়া বাপের বাড়িতে আইয়া থানা গাড়ছি। বয়সে ডাক দিছে। শরীর গরম। তগো মতো ছাড়া গরু তো আছিলাম না। কিন্তু শরীর মানে কই? বেণুর ঠাকুর্দা তখন সা-জোয়ান। রং কালা হইলে কী হয়, তার গতরখান আছিল আলিসান। আমি তার উপর নজর দিলাম। হ্যায়ও ট্যার পাইল। একদিন রাত্রকালে বলদটা আমার ঘরে ঢুকতে যাইয়া একটা জলের ঘটি ফালাইল উলটাইয়া। আর যাইব কই, লহমায় লোক লস্কর জুইট্যা গেল। আমার বাবার রাগ তো দেখছ নাই, তর বাপ-খুড়ার মতো ম্যাদমারা মানুষ না। রাত্রে তারে জুতা দিয়া মাইরা গোয়ালঘরে আটক রাখা হইল। তিনদিন পরে তার লাশ ভাইস্যা উঠল পুকুরে।

কও কী ঠাকুমা? তারে মারল কে?

এই মাইয়া, তর লগে কী দিল্লাগি গল্প করনের লিগ্যা আইছি নাকি? আমার গয়না ফিরত দে।

আমি ফিরত দিমু কেমনে ঠাকুমা? গয়না তো আমার কাছে নাই, মায়ের কাছে। তুমি মায়ের কাছে গিয়া কও।

ওই কঞ্জুষের বেটি আমারে সোনাদানা ফিরত দিব? ওই শয়তান মাইয়ালোকরে তো খুব চিনছ, কত শাপ-শাপান্ত করছি, গাইল্যাইয়া দম ছুটাইয়া দিছি, তবু ওই নষ্ট মাগির হাভাইত্যা বেটি আমার গয়না বন্ধক রাইখ্যা দোকান দিছে!

ও ঠাকুমা, ওইসব বন্ধকি গয়না তো মায় আবার ছুটাইয়া আনছে। দোকানখানও তোমার নামেই দিচ্ছ।

আহা লো, মইরা যাই। আমার নামে দোকান দিয়া বড়ো উদ্ধার করছে আমারে। একটা পয়সা আমার ভোগে লাগে? বাৎসরিক শ্রাদ্ধটা পর্যন্ত করে না নিমকহারামগুলা।

অত রাগ হও ক্যান ঠাকুমা? আগে কও গয়না দিয়া কী করবা?

ফের একটা দীর্ঘশ্বাস। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতা।

ফের সেই চাপা গলা যেন বিষণ্ন এক সরোবরে ডুব দিয়ে উঠে এসে বলল, আমাগো পুকুরে যখন বড়ো বড়ো মাছ ঘুপ্পুস কইরা ঘাই মারে সেই শব্দ শুনছছ? রাইতবিরাইতে মনে হয় য্যান কেউ পুকুরে ফাল দিয়ে পড়ল। কত মাছ, রুইত, কাতল, কালাবাউশ! পুকুরপাড়ে ঢেঁকিশাকের জঙ্গল, গন্ধভাদাইল্যা, খারকল, মানকচু। আম, জাম, লিচু গাছে অন্ধকার হইয়া থাকে চাইরধার। সন্ধ্যাকালে জোনাকি জ্বলে, থোকা থোকা জোনাকি, আর প্যাচায় ডাকে, আফইরা দুফইরে ঘুঘুর কান্দন শুনছছ? শোনছ নাই। মনটা উড়াল দিয়া কোনখানে যায় গিয়া। বৃষ্টি যখন লামে, তখন মনে হয় মাটি ছিদ্র হইয়া যাইত্যাছে, আর শীত! ওই কাল ঠাণ্ডা জলের উপর সর পড়ে, অখনও শেফালি ফোটে, করবী ফোটে, আম পাকে, জাম পাকে, বড়ো বড়ো জম্বুরা ঝুইলা থাকে। লোক নাই, লস্কর নাই, তবু বাড়িটা য্যান তগো লিগা বইস্যা থাকে, কান্দে। অখনও বাবা বইস্যা থাকে বাইর বাড়ির বারান্দায়। দাদু বইসা থাকে কাছারিঘরে, চাইয়া থাকে চুপ কইরা।

তারা তো মরছে ঠাকুমা!

আমিও তো মরছি। মরলে কী হয় তুই জানছ? মরলে কি সব যায় গিয়া নাকি?

কত মানুষরে আৎকা আৎকা দেখতে পাই। কবে মইরা গিয়া আইজও ভিটার মায়া কাটে নাই। আহে, ঘুইরা ফিরা দেখে। পোক আছে, মাকড় আছে, ইন্দুর আছে, চামচিকা আছে, ঝুল কালি আছে, তারা আছে। ঠাণ্ডা, তবদা-লাগা বাড়িটায় বড়ো শান্তি। কত মানুষ ছায়ার মতো ঘুইরা বেড়ায়, মুখে কথা নাই, চাইরদিকে হাতায় পিতায়, চাইয়া চাইয়া দ্যাখে। এই হারামজাদি, দ্যাশ দ্যাখছছ? ভিটামাটির গন্ধ কেমন জানছছ? কামরাঙ্গা, করমচা, ডেউয়া, ডেফল খাইছছ জন্মে? তুই বুঝবি কেমনে? আমার মায় ঠাকুমায় অখনও দালানে বইয়া থাকে। বড়ো শান্তি রে!

ফের দীর্ঘশ্বাস, তারপরই গলাটা হঠাৎ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল, খেদা! খেদা আপদগুলিরে। বাইরইয়া বাইর কইরা দে!

ভয় পেয়ে রাঙা বলে উঠল, কারে ঠাকুমা? কারে খেদামু?

ওই যে আপদগুলি ঢুকছে। বন্দুকের কান্দা দিয়া গফুররে মারল! রহিম শেখরে নদীতে চুবাইল। বাড়িঘর ভাঙত্যাছে। লোকে ডরায়, কয়, অগো লগে কি আমরা পারি? অরা হইল মিলিটারি, খেদা! খেদা!

বলতে বলতে সেই কান্না, তারপর সব চুপচাপ হয়ে গেল। ঠাকুমা! ও ঠাকুমা! গেলা গিয়া নাকি?

আর কোনো সাড়াশব্দ নেই। অনেকক্ষণ বিছানায় বসে রইল রাঙা। তার সন্দেহ হল ঘটনাটা সত্যিই ঘটেছে। নাকি স্বপ্ন দেখছিল এতক্ষণ! উঠে গিয়ে চোখেমুখে জল দিল রাঙা। মাথাটা গরম। কিন্তু মনটা ভারি বিষণ্ন লাগছে এখন।

উত্তরের জানালা দিয়ে হিম বাতাস আসছিল। তার টনসিলের একটু দোষ আছে। তবু খোলা হাওয়ায় একটু দাঁড়িয়ে রইল সে। মাথাটা ঠাণ্ডা হোক।

অনেকক্ষণ কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারল না সে। ঘটনাটা সত্যি না স্বপ্ন? ভূত-প্রেত আত্মা এসব তো সে মানে না, ভয়ও পায় না। তিনতলায় বিশাল এলাকা জুড়ে সে চার বছর একা বাস করেছে। সে শুনেছে বটে তার মা সরযূবালাকে নাকি মরার পর রাসু ঠাকুমা রোজ ভয় দেখাত। সেসব তো বিশ্বাসও করেনি! তাহলে এটা কী হল?

দাঁড়িয়ে থেকে থেকে হঠাৎ অদেখা, প্রায় অচেনা, দুর্মুখ ওই বালবিধবা রাসমণির জন্য তার দুচোখ দিয়ে টস টস করে জল পড়তে লাগল।

৩

এই হল কবি হাফিজুরের বাড়ি। পুরোনো ঝুরঝুরে পোড়ো এই বাড়িতে কেউ থাকে না এখন। হাফিজুরের কোনো উত্তরাধিকারী নেই। মারা যাওয়ার পর কেউ দাবি করতে

আসেনি এই বাড়ি। বিশ বছর আগে এই এঁদো বাড়িতেই একা থাকত কবি। রাঙা শুনেছে লম্বা, ফর্সা, রোগা আর সুপুরুষ সেই মানুষটার চেহারা ছিল কবির মতোই। আধময়লা পায়জামা আর পাঞ্জাবি পরে সারা শহর ঘুরে বেড়াত পায়ে হেঁটে। উদভ্রান্ত উদাসীন, নির্লোভ সেই মানুষটির কোনো শত্রু ছিল না। সকলেই ভালোবাসত তাকে। কেউ কেউ বলে, হাফিজুর যে এ শহরে এসে বাসা বেঁধেছিল তা এমনি নয়, কোনো এক হিন্দু রমণীর প্রেমে পড়েছিল সে। সেই টান ছেড়ে আর নিজস্ব ভুবন রচনা করতে পারেনি হতভাগ্য মানুষটি। হয়তো মুখ ফুটে নিবেদনও করতে পারেনি তার প্রেম। হ্যাঁ, বিশ ত্রিশ পঞ্চাশ বছর আগে এরকম সব প্রেম হত। আজকাল আর হয় না।

আজ ছুটির দুপুরে কোন মতিচ্ছন্ন হল তার কে জানে! রাঙা তাদের বাড়ির পিছন দিককার সুঁড়ি পথ ধরে, মাধবতলার পুকুরপাড়ের নির্জন মেটে রাস্তাটা হেঁটে পার হয়ে আজ কেন যে এই জঙ্গলে ঢাকা, শ্যাওলায় ধরা পড়ো-পড়ো বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াল কে জানে! স্বেচ্ছায় নয়। সে তার মাথার মধ্যে কুয়াশার মতো ঘনিয়ে থাকা এক ঘোরের ভিতর এসব করছে। এই পরিষ্কার রোদের দুপুরেও কে একজন যেন টর্চের আলোয় অন্ধকারে পথ দেখিয়ে তাকে এইখানে নিয়ে এল। কিন্তু এখানে কোন কাজ? সাপখোপের বাসা, শিয়াল তক্ষকের আস্তানা, এখানে তাকে আনল কেন?

কিন্তু আচ্ছন্ন মাথায় কিছু না বুঝেই সে আগাছার জঙ্গল ভেদ করে ছায়াচ্ছন্ন ছোটো বাড়িটার দিকে এগিয়ে গেল। কেউ কোথাও নেই। সুনসান দুপুর। শুধু বাতাসের হু-হু হাহাকার। গাছের পাতায় নির্ঝরের শব্দ। পায়ে পায়ে ভেজানো দরজা ঠেলে ঠুকে সে অবাক হয়ে দেখতে পেল, সামনের হলঘরটায় দশ-বারোখানা মাদুর আর শতরঞ্চি যেমন তেমন করে বিছানো আছে। কয়েকটা বালিশ আর এক আধটা মাদুর বা শতরঞ্চিতে কোঁচকানো চাদরও পাতা। ঘরের এধারে ওধারে পড়ে আছে কিছু পোড়ো সিগারেটের টুকরো আর দেশলাই। পরের ঘরটা ছোটো, সেটাতেও একই দৃশ্য। সারি সারি দুঃখী বিছানা, মাদুর আর শতরঞ্চি। কারা থাকে এখানে? তারা কি ভালো লোক?

না, ভয় হল না রাঙার। সে জানে সে এখানে একটা কাজে এসেছে। কী কাজ তা তাকে তো কেউ বলেনি! মাথার ওই ঘোরই আজ আচ্ছন্ন করে রেখেছে তাকে। ওই ঘোর-ঘোর ভাবটাই তাকে এনেছে এখানে।

দুটো ঘর পার হলেই আর একটা কুঠুরি। অন্ধকার, তার কোনো জানালা নেই, ছাদ ফেটে আকাশের চিলতে দেখা যাচ্ছে। মেঝের ওপর ডাঁই হয়ে আছে ভাঙা ইঁট, ছাদের পলেস্তারা।

সে কি কিছু খুঁজছে? হ্যাঁ, কিন্তু কী তা স্পষ্ট বুঝতে পারছে না সে। ঘরটার মধ্যে ছুঁচোর গায়ের গন্ধ, আরশোলার নাদির গন্ধে বাতাস ভার হয়ে আছে। সে আস্তে আস্তে বাঁ দিকের দেওয়াল ঘেঁষে কয়েক পা এগোল। একটা কুলুঙ্গি না? হ্যাঁ, অপরিসর, ধুলোটে একটা কুলুঙ্গি। সেখানে জুতোর বাক্সের মতো বহু পুরোনো ধুলোয় ধূসর নোংরা একটা ঢাকনা খোলা বাক্স পড়ে আছে। ওপরে জমেছে পাখির বাসা, ভেঙে পড়া পলেস্তারার টুকরো, ঝুল আর কালি। হাত বাড়িয়ে সে বাক্সটা নামাল, মেঝের ওপর উপুড় করে ঢেলে ফেলল।

রাবিশে কয়েকটা পুরনো ময়লা কাগজ। তিন চারটের বেশি নয়। একসময়ে হয়তো দামি প্যাডের কাগজই ছিল। এখন আর তার জাত চেনা যায় না। ব্যগ্র হাতে কাগজগুলো তুলে নিল সে। যত্ন করে ভাঁজ করল। তারপর ভ্যানিটি ব্যাগ ভরে নিয়ে বেরিয়ে এল।

বড়ো ঘরটায় পা দিতেই চমকে উঠল সে। সামনে নিঃশব্দে দাঁড়ানো কয়েকজন অল্পবয়সি ছেলে। অবাক চোখে দেখছে তাকে। তাদের মধ্যে বেণু।

বইন, তুমি এখানে?

একটু হেসে রাঙা বলে, এখন এখানে আস্তানা গেড়েছ বুঝি? সেইজন্যই কয়েকদিন তোমার টিকির নাগাল পাওয়া যায়নি।

একটু ম্লান হেসে বেণু বলল, কী করব বলো। এরা সব খানসেনা আর রাজাকারদের তাড়া খেয়ে পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসেছে। শহরের সব বাড়িতেই ওপার থেকে লোকজন এসে ভরে ফেলছে। তাই কবি হাফিজুরের বাড়িটাই একটু সাফসুতরো করে নিয়ে ওদের সঙ্গেই আছি। চাঁদা তুলতে হচ্ছে। নইলে ওদের চলবে কী করে?

রাঙা জানে। গত কয়েকদিন সে রেডিও শুনছে, খবরের কাগজ পড়ছে। পাকিস্তানের ভিতরে একটা বাঙালির অস্তিত্বের মরণপণ লড়াই সে টের পাচ্ছে।

ছেলেগুলোর দিকে চেয়ে দেখল রাঙা। গুণ্ডা বদমাশের চেহারা নয়। বরং খানিকটা সরল, গ্রামের ছেলে বলে মনে হয়। তাকে দেখে খুব অবাক।

সে বলল, তোমরা চলে এসেছো, কিন্তু বাড়ির লোকজন?

সামনের ছেলেটা গম্ভীর মুখে মাথা নেড়ে বলে, জানি না বইনদি, মায়ে বাবায় কইল, ইয়ং ম্যানগুলারেই নাকি আগে ধরে, মাইরা ফালায়। তরা পলাইয়া যা। আমরা পলাইতে চাই নাই। কিন্তু লড়ুম কী দিয়া কন? বন্দুক, মেশিনগানের সামনে তো আর লাঠি সড়কি দিয়া লড়া যায় না।

আর একজন একটু এগিয়ে এসে বলল, অস্ত্র পাইলে আমরা কি ছাড়ুম নাকি বইনদি? কিন্তু মেলা দাম চায়। আমাগো টাকা কই?

বেণু বলল, বর্ডার এখন খুলে দেওয়া হয়েছে। হাজার হাজার লোক আসছে রোজ। আর কয়েকদিনের মধ্যে কী অবস্থা হবে তাই ভাবছি। লোকে চাঁদা দিচ্ছে অনেক, কিন্তু তাতেও তো হবে না।

রাঙা ঠোঁট কামড়ে একটু ভাবল। তারপর বলল, বেণুদা, তোমার সঙ্গে আমার একটু কথা আছে। আজ সন্ধেবেলায় বাড়ির পিছনদিককার আমগাছটার কাছে থেকো। সাতটা।

আচ্ছা। তুমি কি আমার খোঁজে এসেছিলে?

হ্যাঁ।

বলে আর দাঁড়াল না রাঙা। চলে এল।

ঘরে এসে সে ব্যাগ খুলে কাগজগুলো বের করল। পর পর সাজিয়ে রাখল টেবিলে। মোট চারটি কবিতা। কাগজ ময়লা হয়ে গেলেও পড়া যায়। প্রথম কবিতাটা এরকম :

> যদি বলি মেঘের রোদ্দুর,
>
> তা হলে হয়তো বুঝবে না।

যদি বলি দূর, বহু দূর,

শুধু দূর করেছ রচনা!

কবিতার নীচে লেখা, শ্রীমতী সরযূ চৌধুরীকে নিবেদিত দূরের কবিতা।

দ্বিতীয় কবিতাটা এরকম :

কেন এত দূর হয়ে থাকো?

মাঝখানে গাঙ ছলো ছলো

খেয়া নেই, মাঝি নেই সাঁকো,

পারাপার কীসে করি বলো!

এটারও নীচে লেখা : নীহারিকার মতো দূরবর্তিনী সরযূ চৌধুরীকে নিবেদিত।

তৃতীয়টাও সেই দূরের কবিতা :

মেঘের ভিতরে এই রোদ

যাকে বলি মেঘের রোদ্দুর,

বুঝি আরজন্মের প্রতিশোধ,

রচনা করলে শুধু দূর।

নীচে সেই সরযূ চৌধুরীকে নিবেদিত।

চতুর্থ কবিতা এরকম :

কবিতার দাস ছিলাম না কোনোদিন,

আজও দাসখৎ লেখা ওই শ্রীচরণে,

বাঁধা গাধা এক গবেট অর্বাচীন,

মুক্তি কি পাবো একেবারে শ্রীমরণে?

শ্রীমতী সরযূ চৌধুরীকে হতভাগ্য হাফিজুরের নিবেদন।

৪

আলমারির গায়ে চকচকে স্টিলের চাবিটা দুলছিল টিকটিক করে। সন্ধেবেলা দৃশ্যটা দেখে চমকে উঠল সরযূবালা, সর্বনাশ! সে কি ভুলে চাবিটা এভাবেই রেখে গেছে! এত ভুল তো তার হয় না কখনো।

তাড়াতাড়ি আলমারি খুলে সে লকারটা দেখল, বন্ধ। তবু সে লকার খুলে গয়নার বাক্সটা নাড়া দিতেই ফ্যাকাশে হয়ে গেল। গলা শুকিয়ে কাঠ। বাক্সটা হালকা লাগছে না?

দেড়শ ভরিরও বেশি ভারী সাবেক গয়নার নিরেট বাক্স সহজে নাড়ানোই যায় না। সরযূ বাক্সটা সাবধানে নামিয়ে আনল। তালা খুলতেই অবাক হয়ে দেখল, গয়নার চিহ্ন মাত্র নেই। শুধু কয়েকটা কাগজ পড়ে আছে।

ওপরে ছোট্ট একটা চিরকূট, মা আমার জিনিস আমি সব নিয়ে গেলাম। মানুষকে বাঁচাতে। তোমার জন্য রেখে গেলাম তোমার জিনিস। দেখবে ওর দাম গয়নার চেয়ে কম নয়।--বাসন্তীরাঙা।

হতবাক হয়ে কিছুক্ষণ বসে থেকে সরযূ ময়লা কাগজগুলো তুলে নিল হাতে। চোখে চশমা এঁটে আলোর নীচে পড়তে লাগল।

পড়তে অনেক সময় লাগল সরযূর। দুখানা চোখ ধীরে ধীরে বর্ষার দিঘির মতো কানায় কানায় ভরে উঠল। তারপর উপচে টসটস করে পড়তে লাগল তার কোলে।

আগু পিছু

বউ পালিয়ে যাওয়াটা কোনো পুরুষের পক্ষেই গৌরবজনক ব্যাপার নয়। তাই নিতাই ওরফে নিত্যানন্দ কদিন হল কাঁচুমাচু মুখ করে ঘুরে বেড়োচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে মুখটায় যে একটু শোকতাপের পাউডার মেখে রাখতে হয় সেটা তাকে পই পই করে বুঝিয়েছে নিতাইয়ের বোন ফুলু। নিতাইয়ের মতো ফুলু বোকার হদ্দ নয়। কারবারি, মহাজন এবং ফুর্তিবাজ লারেলাপ্পা মার্কা নিজের স্বামীকে ওই মোটাসোটা শরীরটা নিয়েও তো বগলদাবা করে রেখেছে! বুদ্ধি না হলে কি পারত? এতদিনে আরও গোটা তিনেক না-বিয়ে-করা সতীন জুটে যেত ঠিকই। শেফালি, মন্দা আর গিরি--তিন তিনটে জাঁহাবাজ মেয়েছেলেকে তো শেষ অবধি তাড়িয়ে ছেড়েছে। মনোরঞ্জন অর্থাৎ নিতাইয়ের ভগ্নিপোত এখন ফুলুর পোষা বেড়াল। একটু-আধটু নেশা করে বটে, তাও ঘরে বসে। তাতে ফুলুর সংসারে শান্তি বিরাজ করছে বটে, কিন্তু নিতাইয়ের সুবিধে হয়নি। পয়সাওয়ালা ভগ্নিপোতের ঘাড় ভেঙে বিনি-মাগনা যে ফুর্তিটুর্তি করত তা এখন বন্ধ। ফলে সন্ধের পর নিতাইয়ের এখন নিত্যি হাইয়ের পর হাই তোলা আর আড়মোড়া ভাঙা।

বউ পালিয়ে গেছে টের পেয়ে ভোরবেলা মা চিল-চেঁচানি শুরু করেছিল বটে, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী, নিতাইয়ের খারাপ লাগেনি। ঘুম ভেঙে উঠে সে যখন প্রথম হতভম্ব ভাবটা কাটিয়ে উঠল তখনই ভারি আহ্লাদ হয়েছিল তার। তার বউয়ের নাম পিউ। ভারি মিঠে নাম। অবশ্য নামের মিষ্টত্বটুকু গলার আওয়াজে আর জিবের ধারে কবেই উবে গিয়েছিল। তা পিউ একখানা চিঠি গুঁজে রেখে গিয়েছিল দরজার কড়ায়। তাতে লেখা, শ্রীচরণেষু, আমি চিরতরে চলিয়া গেলাম (সত্যি তো রে বাপু?)। তোমার মতো অমানুষের ঘর আর করিব না (নাঃ, এ কথাটা না মেনে উপায় নেই। একেবারে হক কথা)। আমাকে খুঁজিয়া লাভ হইবে না (কে খুঁজতে যাচ্ছে বাওয়া? আমাকে তেমন শর্মা পাওনি)। বেশি ট্যাণ্ডাইম্যাণ্ডাই করিলে

গবাই তোমার ঘাড় ভাঙিয়া দিবে (গবাইয়ের সঙ্গেই গেছে তাহলে? ভালো ভালো, গবাইয়ের দোহাত্তা রোজগার। ষণ্ডাগুণ্ডা লোক, তাকে ঘাঁটাতে যাচ্ছে কে?)। শাশুড়ি ডাইনি আমার নথ বাঁধা রাখিয়া সুধীর সেকরার কাছে পঞ্চাশ টাকা লইয়াছিল, আমি সাত দিনের মধ্যে নথ ফেরত চাই (টাকা কি গাছে ফলে রে মাগি? নথ দিতে গেলি কেন?)। ইত্যাদি। আরও সব কথা আছে। তারা যে কত খারাপ, কত নির্যাতন করেছে সেইসব পুরোনো কাসুন্দি, তাতে ঝাঁঝ নেই তেমন। চিঠিটা ভোরবেলা মায়ের হাতেই ধরা পড়েছিল। তারপর চেঁচামেচি। সারা পাড়া মাত করে মা কেবল বলছিল, কী কেলেঙ্কার! কী কেলেঙ্কার!

নিতাই হাসি-হাসি মুখেই মাকে একটা ধমক দিয়ে বলল, আহা অমন চেঁচাতে আছে? এতে চারদিকে টি টি পড়ে যাবে! মুখে কুলুপ দিয়ে বসে থাকো। যা হয়েছে হয়েছে।

তারপর খুশি মনে নিতাই গেল নবর দোকানে চা খেতে। মনটা দিব্যি হালকা লাগছে, বুকটা ফুরফুর করছে। ফিচিক ফিচিক হাসি লিক করছে ঠোঁটে। তার মেজাজ দেখে নব অবধি বলে ফেল, কি গো নিতাইদা, কাল রাতে ফ্লাশের বোর্ডে দাঁও মেরেছ নাকি?

ফুলু পাশের পাড়ায় থাকে। খবর পেয়ে রিকশায় চেপে এসে হাজির, অ্যাই বড়ো বড়ো চোখ। 'কী হয়েছে? কী হয়েছে?' বলে বাড়ি গরম করে তুলল।

তারপর তাকে নিয়ে পড়ল ফুলু, হ্যাঁ রে দাদা, তোর আক্কেলটা কী বল দিকি! তোর মুখে যে হাসি ধরছে না! যার বউ পালিয়ে যায় সে অমন দাঁত কেলিয়ে বেড়োলে লোকে ভাববে কী বল দিকিনি! একে তো গুণের শেষ নেই, তার ওপর এই কেলেঙ্কারি, এখন ডগোমগো হয়ে ঘুরে বেড়ালে যে লোকে গায়ে থুথু দেবে!

নিতাই ফুলুকে যমের মতো ডরায়। কারণ, সে জানে ফুলু জাঁহাবাজ মেয়ে, তার হাঁকেডাকে সবাই কেঁচো হয়ে থাকে। পারতপক্ষে সে ফুলুর মুখোমুখি হয় না। ধমক খেয়ে মিনমিন করে বলল, হাসলাম কোথায়? মনে দুঃখই তো হচ্ছে। তবে কি না দুঃখেও তো লোক হাসে।

সে তোর মতো আহাম্মকেরা হাসে। দুদিন দাড়ি কামাসনি বুঝি? আরও দু-চার দিন আর খেউরি হয়ে দরকার নেই। রুখু রুখু ভাবটা থাকাই ভালো। আর বোকার মতো লোকের

কাছে পেটের কথা খোলসা করতে বসিস না যেন। গম্ভীর হয়ে থাকবি। বউ যদি থানা-পুলিশ করে তাহলে মুশকিল আছে। আজকাল চারশো আটানববই না কি যেন একটা মাথামুণ্ডু ধারা হয়েছে। খাণ্ডার বউরা থানায় গিয়ে শ্বশুর-শাশুড়ি-ননদ-দেওর-ভাতার সবাইকে জেলে পুরছে। আমাদের বুড়ো উকিল বৃন্দাবন খুড়োর কাছে একবার গিয়ে বুদ্ধি পরামর্শ নিয়ে আসিস। এঁটে বেঁধে কাজ করা ভালো।

এ বড়ো ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার হল নিতাইয়ের। পালাল বউ, তাকে কেন উকিলবাড়ি ছুটতে হবে কে জানে বাবা!

তবে ফুলুর তাড়ায় যেতে হয়েছিল বটে নিতাইকে।

বৃন্দাবন খুড়োর চেহারাটা শুকনো, লম্বা নাক, তোবড়ানো গাল, জুলজুলে বিষয়ী চোখ। বৃন্দাবন খুড়োর মুখে জীবনে কেউ হাসি দেখেনি। মামলা-মোকদ্দমার বাইরে বিষয়েই বৃন্দাবন কথা কয়, তা হল তার পুরনো আমাশা। আমাশা নিয়ে কথা কইতে বড়ো ভালোবাসে বেন্দা-উকিল। আর আমাশার তত্ত্ব জানেও মেলা।

তাকে দেখে মোটেই খুশি হল না বেন্দা-উকিল। গোমড়া মুখে নিজের হাতের নখ নিরীক্ষণ করতে করতে ঘড়ঘড়ে গলায় জিজ্ঞেস করল, বিয়ে হয়েছিল কবে?

আজ্ঞে, বিয়ের কথা ছাড়ান দেন খুড়ো। ও কি আর বিয়ে?

বলো কি হে! বিয়েই হয়নি নাকি?

সে তেমন কিছু নয়। গো-ঘাটের মেলায় দেখা। বারকয়েক চোখোচোখি হল। তা আমিই আগ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলুম, কোথা থেকে আসা হচ্ছে, কী বৃত্তান্ত। দেখলুম দুঃখী মেয়ে, মা-বাপ নেই, কাকার সংসারে দাসীবৃত্তি করে আছে। আমার আবার বড্ড নরম মন কি না। তাই সঙ্গে করে নিয়ে এস বাড়িতে তুলি। সেই থেকেই এক সঙ্গে থাকা। মা একবার বিয়ের কথা তুলেছিল। বাবাকে তো জানেন, ওয়ান পাইস ফাদার-মাদার। বাবা খেঁকিয়ে উঠে বলল, বিয়ে কীসের অ্যাঁ! বিয়ে কীসের? শাঁখা-সিঁদুর পরিয়ে রাখো, ওতেই হবে। তো তাই হল। এই হচ্ছে বৃত্তান্ত।

তাহলে তো নাবালিকা হরণের কেস!

তা হরণ বলেন হরণ, বরণ বলেন বরণ। তবে স্বামী-স্ত্রীর মতোই ছিলাম।

তা বললে তো হবে না বাপু। বউয়ের বয়স কত?

কুড়িটাক হবে বোধহয়। জিজ্ঞেস করা হয়নি।

হিঁদুর মেয়ে?

কে খোঁজ করেছে বলুন। তবে কাকার নাম বলেছিল দুঃখহরণ মণ্ডল।

সেটা আসন নাম কি না খোঁজ করে দেখেছ?

না মশাই, কে এত ঝঞ্ঝাট করে?

ঘটনা কদিনের?

বছর দুই হবে।

ছেলেপুলে?

আজ্ঞে না। হয়নি কিছু।

পুলিশকে জানিয়েছ?

আজ্ঞে না। সামান্য ব্যাপার আর তাদের টানাটানি করিনি। কী হবে বলুন, পুলিশের তো কত গুরুতর কাজ থাকে।

সামান্য ব্যাপার কি হে । ফোর নাইনটি এইট করলে যে কোমরে দড়ি পড়বে।

কিন্তু খুড়ো, আমি করলামটা কী? সেই মাগিই তো আমাকে কাঁচকলা দেখিয়ে পগারপার হল।

তা বললে তো হবে না। আইন হচ্ছে আইন। বিয়ের কেউ সাক্ষীটাক্ষী আছে? তাই বা থাকবে কেমন করে, অনুষ্ঠান তো হয়নি বলছ।

যে আজ্ঞে।

কিন্তু তুমি বললে তো হবে না। তোমার বউ যদি বলে যে, হ্যাঁ, সাত পাক হয়েছিল তাহলেই তুমি প্যাঁচে পড়বে।

তাহলে কি ক'দিনের জন্য হাওয়া হয়ে যাব খুড়োমশাই?

আহা, তা কেন? হাওয়া হলে যে হুলিয়া বেরোবে। ফেরারি বলে দেগে রাখবে।

তাহলে?

পঞ্চাশ টাকা রেখে যাও। দেখছি ভেবে কী করা যায়।

খুড়োমশাই, টাকাটা খাতায় লিখে রাখুন বরং। টিপছাপ দিয়ে যাচ্ছি। কদিন পরেই দিয়ে যাব।

ওরে বাপু, এসব ধারবাকিতে হয় না। ফেলো কড়ি, মাখো তেল। ধারকর্জ করে আনো গে যাও। পঞ্চাশ টাকায় আমি কারো সঙ্গে কথাই কই না। মনোর বউ বলেছিল বলে, নইলে হাড়হাভাতেদের কেস আমি ছুঁই নাকি?

তাহলে ওবেলা দিয়ে যাব খন।

উকিল যে তাকে খেলাবে এটা বোঝার মতো বুদ্ধি নিতাইয়ের আছে। বৃন্দাবন উকিলের পসারটসার নেই। প্রথম বউ গত হওয়ার পর বুড়ো বয়সে দ্বিতীয়বার বিয়ে বসতে গিয়ে নফরগঞ্জে গাঁয়ের লোকের হাতে হেনস্তা হয়ে ফিরেছিল। হুঁ হুঁ বাবা, সব খবর নিতাই রাখে। এখন টাকার খাঁই হয়েছে খুব। তা হবে নাই বা কেন? পালপাড়ার লক্ষ্মী ভামনিকে পুষতে হচ্ছে যে!

ঝামেলা যে একটা পাকিয়ে উঠেছে তা বুঝতে পারছিল নিতাই। মেয়েছেলেটা দুর্মুখ ছিল বটে, কিন্তু পালিয়ে যাওয়ার পর সে যেন নাগিনী হয়ে উঠেছে। ব্যাপারটা তাই ভালো করে বুঝে উঠতে পারছিল না নিতাই, গোলমালটা কোথায়। দোষঘাট তো তার নয়, বউয়ের। তবে তার বিপদ হচ্ছে কেন?

একটু বেলার দিকে পাড়াপড়শি ভেঙে পড়ল বাড়িতে। মেলা মেয়েছেলে, কাচ্চা-বাচ্চা আর প্রবীণ মানুষ। সবাই কথা কইছে। অনেকেই নাকি আগে থেকেই বুঝেছিল এরকমধারা হবে। কী করে বুঝেছিল কে জানে। তবে গাঁ-গঞ্জে এরকম কিছু ঘটলে লোকে যাত্রা-থিয়েটার দেখার মতো আনন্দ পায়। বাড়িতে এত বেলা অবধি হাঁড়ি চড়েনি।

অরন্ধনই বা হবে বুঝি আজ। চেঁচামেচি করে মায়ের গলা ভেঙেছে। নিতাইয়ের বুড়ো বাপ অকারণে কাকে তড়পাচ্ছে কে জানে। এত ভ্যাজর ভ্যাজর ভালো লাগছে না নিতাইয়ের।

বন্ধুবান্ধবরা ইদানীং তাকে একটু এড়িয়ে চলে। যার ট্যাঁকে পয়সা নেই তার সঙ্গে ভাব রাখার বিপদ আছে। ধারকর্জ চায়, টাকা নিয়ে শোধ দেয় না, অন্যের পয়সায় চা-বিস্কুট সাঁটাতে চেষ্টা করে বা মদ খায়।

তবে বউ চলে যাওয়ায় একটু খাতির হয়েছে নিতাইয়ের। সন্ধেবেলা বিভু এসে ডেকে নিয়ে গেল। কালো দাসের দোকানে মদের ঠেক। ইয়ার-বন্ধু জমেছে মেলা। সবাই বৃত্তান্ত জানতে চায়। গেলাসও এগিয়ে দিল, সঙ্গে ছোলা ভেজানো, পেঁয়াজ কুচি, লঙ্কা আর ডালের বড়া। দুপুরে খাওয়া জোটেনি বলে খালি পেটে লঙ্কা আর ধেনো দুটোই এমন নাচানাচি শুরু করল যে দ্বিতীয় চুমুকটা আর দিতেই পারল না নিতাই। ওয়াক তুলে গেলাস ঠেলে সরিয়ে রাখল।

বিভু বলল, আহা, ওর মনটা ভালো নেই রে, অমৃতেও অরুচি হচ্ছে।

তা হচ্চে বটে নিতাইয়ের। শরীরটায় জুত হচ্ছে না। বন্ধুদের প্রশ্নের জবাবে শুধু উদাস গলায় বলতে পারল, কেন গেল, কোথায় গেল জানতে চেয়ো না ভাই। ওসব আমি মোটে জানিই না। ঘুম ভেঙে উঠে দেখি, পাখি উড়ে গেছে।

কার সঙ্গে গেল বল তো!

গবাইয়ের নাম তো করেছে চিঠিতে।

দূর দূর। গবাই তো সারা সকাল কাঠ-চেরাই কলে বসে আছে। হরিপদর দোকানের কন্ট্রাক্ট পেয়েছে, তার কি আর এখন নাওয়া-খাওয়ার সময় আছে। পরের বউ নিয়ে পালালে অন্তত গা-ঢাকা তো দেবে! আর তার বাড়ি তো মাধবের বাড়ির পাশেই। বল না রে মাধু।

মাধু মাথা নেড়ে বলল, না হে বাপু, গবাই যত গুণ্ডাই হোক, বাপকে বাঘের মতো ডরায়। ওবাড়িতে ওসব জিনিসের সুবিধে নেই।

নিতাই ভারি অবাক হল। তাহলে গেল কার সঙ্গে? কোথায়? বাপের বাড়িতে তো সুবিধে হবে না। সেখানে গেলে ঝাঁটার বাড়ি জুটবে।

নিতাই মদটা খেল না। খাবারটাও না। উঠে পড়ল। তার একুট লম্বা হয়ে শোওয়া দরকার। কিন্তু সন্ধেবেলা তার বাড়িতে শোওয়ার সুবিধে নেই। মেলা চেঁচামেচি সেখানে। উঠোনের ওধারে তার দুই ভাইয়ের সংসার। তাদের মেলা কাচ্চাবাচ্চা।

নিতাই বহুদিন বাদে বাজারের পাশে তার বন্ধ দোকানঘরটা খুলল। কাঠমিস্ত্রির কাজে তাদের বংশগত রোজগার। তবে ওসব তার পোষায় না বলে প্রথমে কিছুদিন চেষ্টা করার পর হাল ছেড়ে দোকানে তালা দিয়ে ফেলে রেখেছিল। বিক্রিই করে দিত, ভালো দাম উঠল না বলে বেচেনি।

ভিতরে ঝুলে ঝুলাক্কার সাপখোপ থাকতে পারে, ইঁদুর আরশোলা ছুঁচোদের তো পোয়াবারো। অন্ধকারে ভিতরে ঢুকতে সাহস হল না তার। বগলাপতির দোকান থেকে একটা টেমি ধার করে নিয়ে এল।

ভিতরে ভারি শ্রীহীন অবস্থা। যাঁদা চালানো খুঁটি দুটো আছে, আড়কাঠটা নেই। একধারে তক্তপোশের ওপর কিছু পুরোনো কাঠ পড়ে আছে এখনও। যন্ত্রপাতির থলেটা অবশ্য সে নিয়ে গিয়েছিল নিজের বাড়িতে।

তক্তপোশটা একটু ঝেড়েঝুড়ে নিয়ে শুয়ে পড়ল নিতাই। শরীর ভালো নেই। পেটটায় গোঁতলান দিচ্ছে।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল খেয়াল করেনি। মাঝরাতে ঘুম ভাঙল। উঠে কিছুক্ষণ বুঝতে পারল না সে কোথায়। রাত কটা বাজে তাও ঠাহর হল না। মশায় খুবলে নিয়েছে গা। কী চুলকানি রে বাবা!

বুরবকের মতো কিছুক্ষণ বসে রইল সে। বাড়ির লোক ভাবছে, কোথাও মাতাল হয়ে পড়ে আছে। প্রায়ই তো থাকে।

বেরিয়ে এসে কচুবনের ধারে পেচ্ছাপ করল নিতাই। তারপর দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভেঙে হাই তুলল। আকাশে বেশ চাঁদ উঠেছে আজ। কুয়াশাও আছে। শরৎকাল শেষ হয়ে

আসছে। একটু ঠাণ্ডা লাগছে এখন।

দোকানটা কোনোকালেই তেমন চলত না। খদ্দের নেই বলে জলচৌকি, পিঁড়ি, ঠাকুরের সিংহাসন বা তক্তপোশ তৈরি করত নিতাই। সস্তার জিনিস। মাঝে মধ্যে এক-আধটা ভালো জিনিসের অর্ডারও পেয়েছে। কিন্তু সময়মতো সাপ্লাই দিতে পারত না বলে ক্রমে ক্রমে ব্যবসা লাটে উঠেছিল। সামন্তবাড়িতে তার নিজের হাতে তৈরি একখানা আলমারি আছে, আজও লোকে তার প্রশংসা করে বলে শুনেছে সে।

সময়টা মনে হচ্ছে ভোরের দিকেই। তেজেন চৌকিদারের লাঠির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না। বহু দূরে একটা কীর্তনের দল বেরিয়ে পড়েছে বলে মনে হয়। খোলকরতালের আওয়াজ আসছে।

টিউবওয়েল এখন ফাঁকা। গিয়ে চোখেমুখে ঠাণ্ডা জল থাবড়াল সে। কাল সারা দিনটাই উপোস গেছে একরকম। শরীরটা হালকা আর দুবলা লাগছে। আঁজলা করে পেট পুরে জল খেল সে। হ্যাঁ, এবার বেশ একটু ভালো বোধ হচ্ছে।

পিউ পালিয়ে যাওয়ায় যে-আনন্দটা হচ্ছিল কাল, আজ আর সেটা কেন যেন হচ্ছে না। গোটা ঘটনাটা কামড় দিয়ে ধরে আছে কোথাও। বাড়িমুখো রওনা হতে গিয়েও হল না নিতাই। এত ভোরে গিয়ে লাভ নেই। মা এখন সারা বাড়িতে গোবরছড়া দিচ্ছে। বাবা স্তবস্তুতি করছে। চায়ের জল চাপবে রোদ ওঠার পর। দোকানঘরে ফিরে একটু শুল নিতাই। ঘুম আর আসবে না। পেটে কিছু থাকলে ঘুমটা হয় বটে।

খানিক এপাশ ওপাশ করে লোকজনের সাড়া শব্দ কানে আসতে লাগল। পাঁচুর চায়ের দোকানে আঁচ পড়েছে। ধোঁয়ার গন্ধ আসছে। সে উঠে পড়ল।

জন্মে লেড়ো বিস্কুট খায় না সে। আজ পাঁচখানা খেল। সঙ্গে দু' কাপ চা। চা খেতে খেতেই বলল , ওরে পাঁচু তোর বেঞ্চখানার তো অবস্থা সঙ্গিন দেখছি। কবে পায়া ভেঙে পড়ে গিয়ে লোকের চোট হবে।

পাঁচু খেঁকিয়ে উঠে বলল, তোকে তো সেই কবে বলেছিলাম, মজুরি দেবোখন, সারিয়ে দে, তা কথাটা কানে তুলেছিলি?

বলেছিস নাকি? ভুলেই মেরে দিয়েছি।

মদ গিলে পড়ে থাকলে কি আর মনে রাখার কথা?

দেবোখন সারিয়ে।

আর দিয়েছিস। নতুন একখানা কিনতে গেলে মেলা টাকার ধাক্কা।

আমার যন্ত্রের থলিটা আনিয়ে দে তবে বাড়ি থেকে।

পাঁচু অবাক হয়ে বলে, বটে! মতিগতি পাল্টালি নাকি?

বাড়ি গেল না নিতাই। বেঞ্চখানা নিজের দোকানে টেনে নিয়ে গিয়ে মন দিয়ে সারাতে বসে গেল। পুরনো কাঠের সঙ্গে নতুন কাঠের রং মিলিয়ে দিল যাঁ দা ঘষে। কুড়িটা টাকা এল ট্যাঁকে। খারাপ লাগল না।

যখন বাড়ি ফিরল তখন বেলা দুপুর। বাড়ি থমথম করছে। তাকে দেখে মা চুপিচুপি কাছে এসে বলল, ওরে, পুলিশ এসেছিল যে!

পুলিশ!

হ্যাঁ, তোকে থানা যেতে বলে গেছে। নইলে ধরে নিয়ে যাবে। শুকনো মুখে ঢোঁক গিলে নিতাই বলে, কিন্তু আমি করেছিটা কী তা বলল?

তারা কি আর অত কথা কয়? দেমাকও খুব। কেমন যেন চোখ পাকিয়ে পাকিয়ে ধমকে ধমকে কথা কয়। ভাত হয়ে গেছে, দুটো খেয়ে রওনা হয়ে যা বাবা, দেরি করিসনি। তোর বড়োদাকে বলে রেখেছি, সঙ্গে যাবে খন।

নিতাই মাথা নেড়ে মিয়োনো গলায় বলল, এখন কি আর গলা দিয়ে ভাত নামবে?

খেয়ে যা বাবা, কখন ছাড়ে তার তো ঠিক নেই। সারা রাত হয়তো ফটকেই রেখে দিল। তোর বড়দাও ভয় খাচ্ছে যেতে। জোর করে রাজি করিয়েছি। কী গেছো মেয়েছেলের পাল্লাতেই না পড়েছিস বাবা! কোথাকার জল কোথায় গড়ায় দেখ!

ভাত গলা দিয়ে নামতে চাইছিল না ঠিকই। জোর করে কয়েক গ্রাস খেয়ে উঠে পড়ল নিতাই। আগে তার পাতের ভাত পিউ খেত। এখন কুকুরে খাবে। তা খাক। পুরো ভাত সাঁদ

হল না ভিতরে।

রওনা হওয়ার সময় তার বড়োদা পরমানন্দের বউ টগর হঠাৎ ভিরমি খেল। চোখের পাতাটাতা উল্টে গোঁ গোঁ শব্দ। পরমানন্দ কাঁচুমাচু মুখে ঘরের বাইরে এসে বলল, এই অবস্থায় যাই কী করে বল দেখি।

নিতাই বুঝল, সময়মতো ভিরমি খাওয়ার জন্য বউ ভারি উপকারী জিনিস। তাই সে বলল, থাক, তোকে যেতে হবে না। ঝামেলাঝঞ্ঝাটে জড়িয়ে কাজ নেই।

থানা দূর কম নয়। দুপুর রোদে হাঁটা দিল নিতাই। শীত গ্রীষ্ম টের পাওয়ার মতো মনের অবস্থা নয়। গলা শুকিয়ে কাঠ, হাতে-পায়ে যেন জোর বল নেই। কত দিনের জন্য ফাটকে পুরবে তাও সে জানে না। কিন্তু অপরাধটা যে কী হল সেটাই বুঝতে পারছে না নিতাই। তবে ভাবছে। খুব ভাবছে। বউ যত সোজা জিনিস ভেবেছিল তত যে নয় এটা বুঝতে পেরে ভারি আশ্চর্য হচ্ছে সে।

মাইল দুই হেঁটে যখন থানায় পৌঁছল তখন তার অবস্থা কহতব্য নয়। সেপাইরা প্রথমে তো ঢুকতেই দিতে চায় না। একবার ফিরে যাওয়ার কথা ভেবেছিল। পালিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু মুশকিল হল, তার যাওয়ার জায়গাই মোটে নেই। গাঁয়ের বাইরে তার দুনিয়াটা বড়োই ছোটো।

একটা সেপাই তার নড়া ধরে একটা ঘরে টেনে নিয়ে গিয়ে বলল, এই যে ছোটোবাবু, এই সেই লোক। নিতাই দাস।

টেবিলের ওপাশ থেকে যে-লোকটা মুখ তুলে তাকাল তাকে দেখতে মোটেই পুলিশের মতো নয়। দিব্যি কার্তিক ঠাকুরের মতো ফুটফুটে চেহারা। রং ফরসা। ছোকরা বয়স। তবে মুখটা গম্ভীর।

পিউ তোমার কে হয়? ছোকরা চোখ পাকিয়ে জিজ্ঞেস করল।

নিতাই মাথা চুলকে বলল, বউ।

বউ?

নিতাই থমমত খেয়ে বলল, আজ্ঞে, বিয়ে ঠিক হয়নি বটে, তবে বউ বলেই ভাবতুম।

বিয়ে হয়নি কেন?

আজ্ঞে, বিয়ের খরচা খরচা আছে।

তার মানে লিভিং টুগেদার! তাতে কি রেহাই পাবে ভেবেছ?

আজ্ঞে রেহাই তো চাইনি। সে পালিয়ে গেল, কী করব বলুন?

পালিয়েছে? নাকি খুন করে লাশ পুকুরে ফেলে দিয়েছ?

চোখ কপালে তুলে নিতাই বলল, মাইরি, মা কালীর দিব্যি ছোটবাবু, না।

সুন্দরপানা ছোটবাবু ভ্রূ কুঁচকে বলল, কিন্তু লাশের গলায় যে আঙুলের ছাপ আছে।

কথাটা কানে ঢুকতেই কী যে হল নিতাইয়ের কে জানে। মাথাটা ঘুরে সে উবু হয়ে বসে পড়ল। পিউ জলে ডুবে মরেছে তাহলে!

মায়ের দিব্যি সে তো এতটা ভাবেনি! ঝগড়াঝাঁটি হয়ে থাকে বটে তাদের মধ্যে, কিন্তু তা বলে সে কখনও চায়নি মেয়েটা মরুক।

ওহে নাটক রাখো। উঠে দাঁড়াও তো দেখি।

সেপাই তার পিঠে হাঁটুর একটা গুঁতোও দিল। তবু সহজে উঠতে পারছিল না নিতাই। চোখ দুটো বড়ো অন্ধকার হয়ে আসছে। ভিরমি খাবে কি না তা বুঝতে পারছিল না সে। কষ্টে চেয়ারাটা ধরে সে দাঁড়াল। হাত পা থরথর করে কাঁপছে। চোখে জল আসছে। কোন পাষণ্ডের সঙ্গে বেরিয়ে বেঘোরে মরল মেয়েটা তা কে জানে।

সুন্দরপানা বাবুটি বলল, এঃ আবার মায়াকান্না হচ্ছে। খুন করার সময় হাত কাঁপেনি?

নিতাইয়ের আর কেন যেন ভয় করছিল না। ভয়ের জায়গায় মন জুড়ে বড্ড একটা কষ্ট। সে মাতাল, অপদার্থ, নিষ্কর্মা ঠিকই, বউয়ের তেমন আলাদা কদরও করেনি। কিন্তু আজ এখন বড্ড মনটা খারাপ হচ্ছে। বড়ো ব্যাকুল হয়েছে মনটা। আর কান-গরম হওয়া একটা রাগও উঠে আসছে তার খিদে-পাওয়া পেটের ভিতর থেকে।

সহজে রাগ হয় না নিতাইয়ের। মাতাল অবস্থায় বেহেড হয়ে কী করে সেটা সে নিজেই জানে না। কিন্তু পেটে মদ না থাকলে সে ঠাণ্ডা মানুষ। অপদার্থ বলে নিজেকে চেনে, তাই রাগটাগ তার নেই। কিন্তু আজ কোথা থেকে পাগলা রাগটার কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙল কে জানে। সে হঠাৎ একটা ঝাঁকাড় দিয়ে উঠে ফ্যাঁসা গলাতেই গর্জন করে উঠল, কোন সুমুন্দি মেরেছে একবার বলুন তো ছোটোবাবু।

তার ওই ভাঙা গলার গর্জনেই ভারি অবাক হয়ে সুন্দরপানা লোকটা তাকাল, অ্যাই, চেঁচাবে না!

পিছন থেকে সেপাইটা তার পাছায় ফের একটা হাঁটুর গুঁতো দিয়ে বলল, এই, শালার তেজ দেখ! অ্যাকটিং হচ্ছে! অ্যাকটিং!

কী হল নিতাইয়ের কে জানে, ফিরে অন্ধের মতোই একটা ঝটকা মারল সেপাইটাকে। প্রস্তুত ছিল না বলেই--মানুষ তো--তিন হাত পিছনে ছিটকে গিয়ে দেয়ালে ধাক্কা খেল।

সুন্দরপানা লোকটা টেবিল থেকে একটা ভারী কাঠের রুল তুলে ঘচাত করে বসিয়ে দিল তার কোমরে, শুয়োরের বাচ্চা! মস্তানি হচ্ছে!

গোলমাল শুনেই বোধহয় একজন ভারী চেহারার লম্বা বয়স্ক পুলিশ ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়ে বলল, কী হে গাঙ্গুলি, গোলমাল কীসের?

সুন্দরপানা ছেলেটা সঙ্গে সঙ্গে গলা নামিয়ে বলল, কিছু নয় স্যার। একটু গরম দেখাচ্ছিল।

লক আপ-এ ভরে দাও তাহলে! বড়ো সাহেব ভিজিটে আসছে। বেশি গোলমালে কাজ নেই। পলিটিক্সের লোক থাকবে সঙ্গে, কিপ এভরিথিং কোয়ায়েট। এর কেসটা কী?

ওই যে পিউ নামের মেয়েটা।

ও তো পেটি কেস। মিটিয়ে দিলেই হয়।

মেটাবো স্যার। একটু শিক্ষা দিচ্ছিলাম।

আর গোলমালের দরকার নেই। ঝামেলা মিটিয়ে ফেল।

ঠিক আছে স্যার।

বয়স্ক লোকটা চলে যেতেই পিছন থেকে সেপাইটা এসে ক্যাঁত করে একটা লাথি বসাল তার পাছায়, শুয়োরের বাচ্চা! খানকির পুত!

আর মোটেই ভয় করছে না নিতাইয়ের। একদম না। সেও আচমকা পিছন ফিরে খুব ঠাণ্ডা মাথায় সেপাইটার দিকে এক পা এগোলো। তাতে কী হল কে জানে, সেপাইটা হঠাৎ ঝট করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

সুন্দরপানা গাঙ্গুলির হাতে রুলটা এখনও আছে। চাপা গলায় বলল, আজ ছেড়ে দিচ্ছি, কিন্তু ফের যদি গোলমাল শুনি, বউয়ের ওপর বীরত্ব ফলাস তাহলে কিন্তু--

নিতাই গলা উঁচু করে বলল, বউই নেই তো ওসব কথা ওঠে কেন? যে ওকে মেরেছে তাকে আগে দা দিয়ে কাটি, তারপর ফের থানায় আসব।

লোকটা এবার তেমন রাগ করল না। 'বাচ্চু' বলে কাকে যেন ডাকল। লোকটা উঁকি দিতেই বলল, মেয়েটাকে নিয়ে আয়।

একটু বাদেই যখন লোকটার পিছু পিছু পিউ এসে ঘরে ঢুকল তখন নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না নিতাইয়ের। মতিভ্রমই হবে, একটু চেয়ে থেকেই সে হঠাৎ হাউ হাউ করে কেঁদে উঠে গিয়ে পিউকে জড়িয়ে ধরল, তুই বেঁচে আছিস।

গাঙ্গুলি চেঁচিয়ে উঠল, অ্যাই, অ্যাই, এখানে কোনো অশ্লীলতা নয়। যাও বাইরে যাও, পগারপার হও।

বৃত্তান্তটা একটু বাদে, থানা থেকে নিরাপদ দূরে একটা গাছতলায় বসে খোলসা হচ্ছিল।

পালালি কেন?

ইচ্ছে হল, তাই। ভালোবাসো না কেন?

কে বলল বাসি না?

আমি বুঝতে পারি।

ছাই বুঝিস।

কাজকর্ম করো না, মদ গেলো, বাড়ির লোক আমাকে দুরছাই করে। পালাবো না তো কী? আবার পালাব।

কার সঙ্গে পালাবি?

যমের সঙ্গে।

গবাইয়ের নাম দিলি কেন?

ভয় দেখানোর জন্য।

থানায় জুটলি এসে কী করে?

নিজে এসেছি নাকি? থানার বাইরে একটা গাছতলায় বসে কাঁদছি, সেপাই ধরে নিয়ে গেল। ওই লম্বাচওড়া হোঁতকা লোকটা, খুব গোঁফ আছে, লোকটা কিন্তু ভালো। সব শুনে বলল, দাঁড়া, তোর বরের ভূতটা ছাড়াই।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, নিতাই বলে, ভূত আগেই ছেড়েছে রে। এখন বাড়ি চল।

বিনাবাক্যে উঠে পড়ল পিউ। তার বোঁচকাটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে আগে আগে হাঁটতে লাগল নিতাই। পিছনে পিউ।

ঝড়

একটা মেয়ে হাসি-হাসি মুখ করে একটা বিস্কুট খাচ্ছে-- এই হল বিজ্ঞাপন। তা বদ্রী অনেকক্ষণ খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনটা দেখল। খবরের কাগজ তার নয়, পাশে বসা পুলিনবিহারীর। পুলিন খুব খবরের কাগজ পড়ে। কেন পড়ে কে জানে! বদ্রী বিজ্ঞাপনটা দেখতে দেখতে ভাবল, তাকেও ওই বিস্কুট খেতে বলা হচ্ছে। বিজ্ঞাপন তো তাই বলে।

এই মেয়েটা যখন বিস্কুটটা খাচ্ছে, তখন তোমারও বাপু, খাওয়া উচিত। কিন্তু কেন খাবে, বদ্রি এটাই বুঝতে পারে না। কোলে রাখা গামছাটা তুলে সে কপালের ঘাম মুছল। গরমটাও পড়েছে বাপ। একেবারে কাঁঠাল-পাকানো গরম। যেমন ভ্যাপসা, তেমনি চনচনে। রোদ্দুরের মুখে আবডাল দেওয়ার মতো ছেঁড়া কাঁথাকানির মতো একটু মেঘও নেই। আকাশ একেবারে নিকোনো উঠোন। মাটিতে কোদাল মারলে এখন ঠন করে শব্দ হয়।

বিস্কুট খাওয়ার বিজ্ঞাপনটা চাপা পড়েছে। পুলিনবিহারী পাতা ওল্টাল। এবার একটা টিভির বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে। সেখানেও একটা মেয়েছেলে, টিভির ওপর হাতের ভর দিয়ে হেলে দাঁড়ানো, হাসি-হাসি মুখ। মেয়েছেলে ছাড়া দুনিয়ায় যেন কিছু হওয়ার জো নেই! বদ্রী একটা শ্বাস ফেলল।

পুলিনবিহারীর বয়স তেষট্টি, মাথায় কাঁচাপাকা চুল, শক্ত গড়ন। গায়ে ঘেমো ময়লা একখানা পলিয়েস্টারের পাঞ্জাবি, আধময়লা ধুতি, চোখে চশমা। মাতব্বর লোক। একটা খবর একটু ঝুঁকেই পড়ছিল। জম্পেশ খবরই হবে। দুনিয়ায় খবরের অভাব কী? খবরের কাগজ হল কুচুটে মেয়েছেলের মতো, যত রাজ্যের গালগল্প ফেঁদে বসে মানুষের কাছে।

ট্রেন চলছে বটে, কিন্তু জানালা দিয়ে তেমন হাওয়া আসছে না। যা আসছে তা যেন কামারশালায় হাপরের ফুঁ। জানালার ধারটা পাওয়া যায়নি। ওদিকে দুটো লোক। বাকি দুজন সে আর পুলিনবিহারী। তিন জনের সিটে চারজন। এটাই নিয়ম। ঠাসন্ত ভিড়। ওপরে পাখা-টাখা ছিল এককালে। কে খুলে নিয়ে গেছে।

বদ্রী আলালের ঘরের দুলাল নয়। গরমও সয়, শীতও সয়। তবে মাঠে-ঘাটে খোলামেলায় থাকার একটা রকম আছে। এই যে খাঁচায় পোরা অবস্থা এটা তার অভ্যাস নেই।

ট্রেনটা একটা আঘাটায় দাঁড়াল। তা এরকম দাঁড়ায়। পুলিনবিহারীর বাঁ হাতে ঘড়ি। দেখে নিয়ে বলল, চারটেয় পৌঁছোতে পারলে ফেরার শেষ ট্রেনটা পেয়ে যাবো।

ফিরতেই হবে। কচি মেয়েটাকে রেখে এসেছি।

আহা, অত উতলা হলে চলে? জলে তো আর ফেলে আসিসনি। পিসির কাছেই তো আছে। বিলাসী বুক দিয়ে আগলে রাখে।

না ফিরলে চিন্তা করবে। রাতে পিসির কাছে থাকতে চায় না। তার ওপর বিলাসীর যা গন্ধমাদন ঘুম। রাতে ভয় খেয়ে পিসিকে ডাকলেও উঠবে না।

ঘড়িটা আবার দেখে পুলিন বলল, আর চারটে স্টেশন। তারপরই নেমে পড়ব। মেরে কেটে তিন মাইল রাস্তা। মনে হচ্ছে হয়ে যাবে। ফেরার শেষ ট্রেন সাড়ে নটা।

যারা দাঁড়িয়ে ছিল তাদের মধ্যে একজন বলল, নটা কুড়ি, যাবেন কোথা?

মৌলবির বাজার।

অ। দূর আছে।

পুলিন পাঞ্জাবিটা তুলে ঘ্যাঁস ঘ্যাঁস করে পেট চুলকোলো। চশমটা ঘামে পিছলে নাকের ডগায় নেমে এসেছে। সামনের দুটো দাঁত নেই। বলল, আর দেরি না করলেই হল।

এদিককার ট্রেন এরকমই চলে। দাঁড়ায়, জিরোয়, ঘুমিয়েও পড়ে। ট্রেন নড়ছে না।

বদ্রীর একটা আঁকুপাকু লাগে। গরম, ঘাম, ভিড় সব সহ্য হয় কিন্তু দেরিটা ভোগাবে। তেমন দেরি হলে--বদ্রী ঠিক করেই রেখেছে--দাঁইহাট স্টেশন থেকেই ফিরতি ট্রেন ধরবে। বিলাসী শ্বশুরবাড়ি থেকে মোটে আসতে চায় না। সেখানে বিরাট সংসার। অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আনিয়েছে। কালই তার রওনা হওয়ার কথা। তার মেয়ে নন্দরানির বয়স মোটে তিন। বিলাসীর তিনটে মেয়ে একটা ছেলে। দিনের বেলাটা নদু ওদের সঙ্গে বেশ থাকবে। তবে রাত হলে তার বাপকে চাই। মা মরা মেয়ে, বাপের বড্ড নেই-আঁকড়া। বাপের দিক থেকে একটা একরকমের ভাবনা থাকে। আবার মেয়ের দিক থেকেও আর একরকমের ভাবনা আছে। এমন হতে পারে, মেয়ে বাপের কথা তেমন ভাবছে না! যেমনটা মেয়ে ভাবছে বলে মনে করছে তেমনটা নয়।

পুলিনদা, কী হবে?

পুলিন একটা ময়লা রুমালে নাক মুছল। চশমাটা ফের নাকে বসিয়ে বলল, অত ভাবছিস কেন? খবরের কাগজটা ভাঁজ করে একটু হাওয়া খাওয়ার চেষ্টা করল পুলিন। পুলিনবিহারীর পিছটান তেমন নেই। গাঁয়ের মাতব্বর হলে কি হয়, বাড়িতে বিরাট সংসারে তেমন পৌঁছে না কেউ। ছেলেরা লায়েক হয়েছে, মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে, পুলিনবিহারীও নানা কাজে বারমুখো। যেখানে সেখানে দেহখানা রাখলেই হয়। দুচার দিন তার খোঁজও হবে না।

পুলিন বলল, কাজটা আসল, না ফেরাটা আসল?

ভারি তো কাজ! বলে বদ্রী মুখ ফিরিয়ে নিল।

কে একজন বিড়ি ধরিয়েছে, তার ঝাঁঝালো গন্ধ আসছে এদিকে। এই দমবন্ধ অবস্থায় বিড়ির গন্ধ যেন আরও গরম করে দিল কামরাখানা। চারদিকে অনড় ভিড়। তবে গোলমালটা কম। গরমে হাঁফসে গিয়ে লোকের আর কথা বলার মতো দম নেই। শুধু শালা, সুমুন্ধির পুত, রেল কোম্পানির ইয়ে করেছে গোছের কয়েকটা কথা কানে এল।

গাড়ি একটা স্তিমিত ভোঁ দিয়ে অবশেষে ছাড়ল। পুলিন ঘড়ি দেখে বলল, হয়ে যাবে।

কী হয়ে যাবে?

সময় থাকবে হাতে। ভাবিসনি।

আরও চারটে স্টেশন, তার মধ্যে কত কী হয়ে যেতে পারে।

পুলিন মুখটা কুঁচকে বাইরের দিকে চেয়ে রইল। আজ রোদটাও উঠেছে। চারদিকটা যেন স্টিলের বাসনের দোকান হয়ে আছে।

পরের স্টেশনটা কাছেই ছিল। থামতেই কিছু লোক নামায় কামরাটা কিছু হালকা হল। জানালার দিকের দুটো লোক উঠল বটে, কিন্তু বদ্রী ওদিকে এগোলো না। তেরছা হয়ে রোদ পড়ছে জানালা দিয়ে।

ঝালমুড়ি, শসা আর দাঁতের মাজনের ফিরিওলারা হেদিয়ে পড়ে নেমে গেছে। একটা বাচ্চা চা-ওলা উঠে হাঁক মারছিল।

পুলিন বলল, চা খাবি?

ও বাবা, এ গরমে চা!

বিষে বিষক্ষয়।

আমার দরকার নেই। তুমি খাও।

পুলিন চা নিল। চুমুক মেরে বলল, আগে অটো রিকশা সব যেত। রাস্তাটা দু'বছর আগে এমন ভাঙল যে আর কিছুই যায় না।

দেশের অবস্থা যে ক্রমে খারাপ হচ্ছে এটা জানে বদ্রী। তবে তাতে তার বিশেষ আসেও না যায়ও না। সে উদয়াস্ত খেতে পড়ে থাকে। শরীরখানা পাত করে তবে অন্ন জোটে বরাবর। এ ব্যবস্থার ভালোও নেই, মন্দও নেই। চলে যায়। খরা, বন্যা হলেই যা বিপদ।

পরের স্টেশনে দুড়দাড় লোক নামতে লাগল দেখে বদ্রী একটু অবাক হল। পুলিন বলল, আজ হরিপুরের হাট। চৈত্র সংক্রান্তির মেলাও বসেছে কদিন হল। হরিপুরের জন্যই ভিড়, নইলে এ ট্রেন ফাঁকা যায়।

বড্ডই ফাঁকা হয়ে গেল। গরমটাও যেন খানিক উড়ে গেল খোলা বাতাসে। পুলিন চায়ের ভাঁড়টা এতক্ষণ ফেলেনি, হাতে ধরে ছিল। এবার সেটা জানালার বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে

বলল, তোর কপালটা ভালো, বুঝলি! বিয়েটা যদি লেগে যায় দেখবি কপাল খুলে যাবে।

ভালোর তো লক্ষণ দেখছি না। যাত্রাটাই খারাপ হল। ট্রেন যা লেট মারছে স্টেশন থেকেই না ফিরতে হয়।

কথাটা গ্রাহ্য করল না পুলিন। বলল, স্বয়ং কাত্যায়নীর সংসার, বুঝলি তো? এক ছটাক বাড়িয়ে বলা নয়। এ তল্লাটের সবাই জানে। অজাপুর থেকে বউ এল, তেরো বছর সবে বয়স। একেবারে লক্ষ্মীপ্রতিমা। গাঁয়ে ঢুকতেই দু বছরের খরা কেটে বৃষ্টি নামল। গাছে গাছে ফলন। বউ যেখান দিয়ে যান যেন লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ পড়ে। ভাসুরকে ভাত দিতে গিয়ে বিপত্তি, ঘোমটা পড়ে গেল। দু হাত জোড়া। কী করে? সবাই দেখতে পেল বউ আর এক জোড়া হাত বের করে ঘোমটাটা তুলে দিল মাথায়।

ও গপ্পো আগে শুনেছি।

বলেছি নাকি তোকে?

তুমি বলোনি। অন্য এক বউ সম্পর্কে এরকম আর একজন কেউ বলেছিল।

ও যে এই বউয়েরই গল্প। পাঁচমুখে ছড়িয়েছে। এ তল্লাটে সবাই জানে।

তা না হয় হল, কিন্তু সে তো পুরোনো কাসুন্দি। তোমার খুড়োর মেয়ে তো আর সে নয়।

ওরে ওনারা যে পরিবারে আসেন সেই পরিবারটাই জাতে উঠে যায় কিনা। ওর একটা ধারা থাকে।

কত কাল আগেকার কথা সব। ওর ধারা আর নেই গো পুলিনদা।

তা এক দেড়শো বছর হবে। এমন কিছু বেশি দিনের কথা নয়। ধর আমার বাবার বয়স।

ধরলাম। কিন্তু তাতেও সুবিধে হচ্ছে না। যদি সেই ধারাই হবে তাহলে আমাকে পাত্তর ঠাওরাচ্ছো কেন?

পুলিন গোঁফের ফাঁকে একটু হাসল, কেন তুই কি খারাপ পাত্তর? পনেরো বিঘে জমি, দু-বিঘে মাছের পুকুর, বাড়িতে অতগুলো ফলন্ত গাছের বাগান।

পাত্তরের আর কিছু লাগে না বুঝি?

আর কী লাগে?

কেন, চরিত্তির, পেটে বিদ্যে, বংশগৌরব।

তোর কি চরিত্তির খারাপ? বিদ্যেও ধর, বাংলাটা জানিস, ইংরিজিতে নাম-সই কম নাকি? হারাধন বিশ্বাসের নাতি--বংশই কি ফ্যালনা?

স্টেশনগুলো পটাপট পেরিয়ে এল তারা।

পুলিন একটু হুটোপাটা করে উঠল, ওরে নাম নাম। সামনের স্টেশনটাই। গাড়ি ধিইয়ে এল।

নেমে পড়ল তারা। পুলিন ঘড়ি দেখে এক গাল হেসে বলল, দেরি করেনি রে। চারটে বেজে পাঁচ মিনিট। হেসে খেলে সাড়ে নটার গাড়ি পাবো।

তোমার তিন মাইল যদি চার বা পাঁচে দাঁড়ায় তাহলে অন্য কথা।

ওরে না না। অত নয়।

উদোম মাঠের ভিতর দিয়ে পথ। পাকা না হলেও রাস্তাটা পাথরকুচির ছিল বটে। তবে বহুকাল সারানো হয়নি। ভেঙেটেঙে একশা।

পুলিন বলল, এইবার রাস্তাটা স্যাংশন হয়েছে। সারানো হবে। সামনের বছর যখন জামাইষষ্ঠীতে আসবি তখন পাকা রাস্তা দিয়ে অটোয় চেপে হাসতে হাসতে গোঁফে তা দিতে দিতে আসবি। বুঝলি?

গাছে এখন কাঁঠালের ফুলটিও আসেনি গো, গোঁফে তা দিয়ে হবে কী? দ্বিতীয়বার ছাঁদনাতলায় বসার ইচ্ছে নেই গো মোটে। তুমি ধরে নিয়ে এলে বলে আসা। নদুকে আমি সৎ মায়ের হাতে দেবো, ভেবেছো নাকি?

আচ্ছা আচ্ছা, আগে দেখ তো। কাকা বলে ভাবিসনি যে বুড়ো। বাবার পিসির ছেলে। বয়স আমার চেয়েও পাঁচ বছর কম। তারই দ্বিতীয় পক্ষের কনিষ্ঠা। পনেরো ষোলোর বেশি হবে না।

সবই জানে বদ্রী। পুলিন একবার নয়, বহুবার বলেছে। বলে বলে কান ঝালাপালা করে দিয়েছে। তাই বাঁচার জন্য আসা। একবার দেখে নাকচ করে দিলেই হবে। বিয়ে করতে বড়ো বয়েই গেছে বদ্রীর। মেয়েটার জন্য গাঁয়ের শোভাখুড়ির সঙ্গে বন্দোবস্ত হয়ে আছে। বদ্রী যখন মাঠে যায় খুড়ি এসে দেখে। বছর পাঁচেক বয়স হলে তখন আর খবরদারির তেমন দরকারও হবে না। পাঁচটা গাঁয়ের মেয়ের সঙ্গে খেলবে-ধুলবে, বড়ো হয়ে যাবে। বদ্রীর তখন ঝাড়া হাত পা। বিয়ে আর নয়। ত্রিশ বত্রিশ বয়স হল তার। আর দরকার কী বিয়ের?

পুলিনবিহারী আগড়ম বাগড়ম বলতে বলতে পথ হাঁটছে আগে আগে। পিছনে বদ্রী।

ঘরটাও পাওয়া গেছে পাল্টি। একেবারে যেন তোর জন্য পাঠিয়েছেন ভগবান।

বদ্রী জবাব দিচ্ছে না। হাঁ করলেই গলা বুক শুকিয়ে যাচ্ছে, এমন গরম।

প্রথম গাঁ গোবিন্দপুর, দ্বিতীয় সোনাডাঙা, তিন নম্বর মৌলবির বাজার। আন্দাজ আছে বদ্রীর। তিন মাইলই হবে।

মৌলবির বাজার যেন মরুভূমির মধ্যে একখানা দ্বীপ। বড্ড গাছপালা চারদিকে। ধূলিধূসর ভাবটা নেই।

কেন জানিস তো! সাতাশখানা পুকুর আছে, একখানা দিঘি। তার ওপর ইরিগেশনের খাল। এ গাঁ একেবারে লক্ষ্মীমন্ত। হবে না? স্বয়ং কাত্যায়নী লীলা করে গেছেন।

বদ্রীর একটু ভয় ভয় করছে। কেন কে জানে!

ঘাবড়োচ্ছিস নাকি?

না, ঘাবড়াবো কেন?

মৌলবির বাজার যে লক্ষ্মীমন্ত গাঁ এটা মনে মনে স্বীকার করতে হলে বদ্রীনাথকে। গাছপালা আছে। পাড়ায় পাড়ায় পুকুর। গাঁও বিশাল। মেলা লোকের বাস। রোজ বাজার বসে। হপ্তায় দুদিন হাট।

পুলিনবিহারী দূর থেকে দেখাল, ওই যে শিব-মন্দির দেখছিস, ওর পিছনেই বাড়ি।

বাড়িখানা পুরোনো হলেও ভালোই। পাকা দেয়াল, মেঝে, ওপরে টিনের চাল। মস্ত উঠোন, তিনটে ধানের গোলা, সবজি বাগান, নারকোল আর সুপুরির গাছ আছে।

পুলিনবিহারী হাঁক মারল, কই রে, কোথায় গেলি সব?

হাঁক-ডাকের দরকার ছিল না। দাওয়াতেই একধারে দুজন লোক বসে গ্যাঁজালি করছিল। রোগা কালোপানা একজন লোক উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ও বাবা, ভাইপো যে!

এই কাকা, বুঝলি? এরই মেয়ে।

কাকার কপালে রসকলি, গলায় কণ্ঠি, গায়ে গেঞ্জি, পরনে ধুতি। মুখখানায় ধূর্তামি আছে। বদ্রী ভালো করে দেখে নিল।

পুলিন বারান্দায় উঠে বলল, হাতে মোটেই সময় নেই। রাত সাড়ে নটায় ফিরতি ট্রেন। বুঝেছো তো?

সম্পর্কে খুড়ো হলেও বয়সে কম। ফলে সম্পর্কটা ঘোরালো। খুড়ো কদম দাস বলল, আজই ফেরত যাবে কেন? চোত সংক্রান্তিতে মেলা বসিয়েছি এবার, দুটো দিন থেকে যাও।

ঘন ঘন মাথা নেড়ে পুলিনবিহারী বলল, না না, এই বদ্রীর জন্যই আসা। তা তার থাকার উপায় নেই কিনা।

বলেই গা থেকে জামা খুলে ফেলল পুলিনবিহারী। তার সারা গায়ে দগদগ করছে ঘামাচি। বলল, হাতপাখা দাও তো একটা। আর ডাব।

কদম দাস তাড়াতাড়ি ভিতর বাগে গেল। যে লোকটা বসে এতক্ষণ কদমের সঙ্গে কথা বলছিল সে এবার উঠে কাছে এসে বলল, এদিকটায় রোদ। ওদিকটায় ছায়া আছে।

বদ্রী এ লোকটাকেও ভালো করে দেখল। বয়স অল্পই। ছোকরা গোছের। ভারি বিনয়ী, নরমসরম ভাব।

পুলিন বলে উঠল, এক্রাম নাকি রে?

আজ্ঞে।

তোর মোকদ্দমার কী হল?

চলছে।

মোকদ্দমার কথায় পুলিনের আলাদা উৎসাহ আছে। মামলা-মোকদ্দমার ব্যাপারটা সে খুব পছন্দ করে। পাঞ্জাবিটা কাঁধে ফেলে বলল, ফাঁকে চল তো, শুনি ভালো করে।

বদ্রী দেখল, কথা কইতে কইতে তারা ফটক অবধি গিয়ে দাঁড়াল। কথা আর শেষ হয় না। মামলা-মোকদ্দমার কথা শেষ হওয়ারও নয়।

কদম দাস সঙ্গে একটা রাখাল গোছের ছেলেকে নিয়ে বেরিয়ে এল। রাখাল ছেলের দুহাতে কাটা ডাব।

জলটুকু খেয়ে নাও ভাই। তারপর অন্য ব্যবস্থা হচ্ছে।

ডাবটা হাতে নিয়ে বদ্রী বলল, এক ঘটি জলও দেবেন। বড্ড তেষ্টা।

হ্যাঁ হ্যাঁ। ওরে পুটু, শিগগির গিয়ে কুয়ো থেকে জল তুলে নিয়ে আয়।

রাখাল ছেলেটা দৌড়োলো।

ও ভাইপো, ডাব খাবে না?

পুলিনবিহারী হাতটা তুলে বরাভয় দেখাল। কথা থামল না।

ডাবটা শেষ করে বদ্রী ঢক ঢক করে ঘটির জলটাও মেরে দিল। ভিতরটা একেবারে ঝামা হয়ে ছিল এতক্ষণ।

রাখাল ছেলেটা দুটো লোহার চেয়ার এনে বারান্দায় পেতে দিয়ে বলল, উঠে বসুন। দাওয়ার দড়িতে একটা মোটা চাদর ঝুলিয়ে ছায়ার ব্যবস্থাও হল। হাতপাখা চলে এল।

কিন্তু মুশকিল হল, পুলিনবিহারীকে নিয়ে। তার কথা আর শেষ হচ্ছে না। এক্রামকে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আরও তফাত হল। তারপর চোখের আড়াল।

কদম দাস বোধহয় ভিতর-বাড়িতে খবর করতে গিয়েছিল। হঠাৎ বদ্রী দেখতে পেল, ঘরের দরজায় কিছু মেয়েমানুষের ভিড় আর ঠেলাঠেলি। দু' চারটে কচি-কাঁচাও আছে। বদ্রী আজ দাড়ি কামিয়ে গোঁফ ছেঁটে এসেছে। গায়ে একখানা সবুজ পাঞ্জাবি, পরনে তাঁতের ধুতি। ঘামে একটু দুমড়ে মুচড়ে গেলেও পোশাক খারাপ নয়। বদ্রী পিছন দিকে আর

তাকাল না। হাতপাখায় বাতাস খেতে খেতে বে-আক্কেলে পুলিনবিহারীর চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করছিল মনে মনে। বিপদের মুখে ফেলে কোথায় যে হাওয়া দিল। কাণ্ডজ্ঞান বলে যদি কিছু থাকে। বদ্রীকে একটা লজ্জার অবস্থায় ফেলে এরকম চলে যাওয়াটা কি ভালো হল?

রাখাল ছেলেটা একখানা আগাম টুল মুখোমুখি পেতে দিয়ে চলে গেল। তাতে এসে বসলেন একজন রোগামতো বুড়ো মানুষ। তার সাদা গোঁফ, গায়ে গেঞ্জি। গায়ের রং তামাটে। গলায় একটু চাপা কফের শব্দ হচ্ছে। মুখে একটু আপ্যায়নের হাসি।

বাবাজীবনের কথা খুব শুনেছি বিপিনের কাছে।

এসব কথার জবাবে কী বলতে হয় তা বদ্রী জানে না। তার একবারই বিয়ে হয়েছিল। তাতে মেয়ে দেখার ঝামেলা ছিল না। মেয়ে দেখে রেখেছিল জ্যেঠিমা। দিন ঠিক হলে সেইদিন খেত থেকে একটু সকাল সকাল ফিরে বরযাত্রীদের সঙ্গে রওনা হয়ে পড়েছিল। পাশের গাঁয়ের মেয়ে। ট্যাং ট্যাং বাজনা বাজিয়ে বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। ঝুটঝামেলা ছিল না। টানা পাঁচ বছর সংসার। এই বছর দেড়েক আগে বাসন্তীর কী যে রোগ হল, ধরাই গেল না। পেটে ব্যথা বলে যখন তখন অজ্ঞান হয়ে যেত। ডাক্তার দেখে ওষুধও দিত। তারপর বাড়াবাড়ি হওয়ায় শহরের হাসপাতালে নিয়ে গেল। তখন শেষ অবস্থা। ডাক্তার বলল, দেরি করে ফেলেছেন। অ্যাপেন্ডিক্স বার্স্ট করে গেছে। নইলে আজ এই ঘেমো দুপুরে এই এতদূর ঠেঙিয়ে আসতে হত না।

বুড়ো একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, এ বংশের মেয়ে যে সংসারে যায় সে সংসারে সুখ একেবারে খুলে পড়ে, বুঝলে? স্বয়ং কাত্যায়নী এ সংসারে এসেছিলেন তো। আমার প্রপিতামহের আমলে। বুঝলে? খুব রোখাচোখা পুরুষ ছিলেন, আবার দেবদ্বিজে ভক্তি ছিল খুব। তা আমার প্রপিতামহী এলেন, নামেও কাত্যায়নী, কাজেও কাত্যায়নী...

আজ্ঞে সে গল্প শুনেছি।

সবাই জানে কিনা। এ বংশের খুব নাম। তা তোমার ক'টি ছেলেপুলে?

একটিই মেয়ে, তিন বছর বয়স।

ভালো হাতে পড়বে। সৎমা বলে ভাবতেও পারবে না কখনো।

খুব ঘামছে বদ্রী। আরও জনা কয় এসে আশেপাশে দাঁড়িয়েছে। তাদের মধ্যে একজন বেশ জাঁদরেল চেহারার মহিলা। লজ্জায় সংকোচে তাকাতে পারছিল না বদ্রী। এদিকে ভিড় হওয়াতে বাইরের হাওয়া আসতে পারছে না। গরম হচ্ছে।

জাঁদলের মহিলাই হঠাৎ বললেন, ওরে খুবলো, বাতাস কর না। কত দূর থেকে এসেছে। গরম হচ্ছে।

খুবলো একটা বছর পনেরো-ষোলোর ছেলে। পাখাটা নিয়ে টেনে বাতাস করতে লাগল। উৎসাহের চোটে দু' একবার ফটাস ফটাস করে পাখার চাঁটিও লাগিয়ে ফেলল মাথায়। মাথাটা একটু নামিয়ে নিল বদ্রী। এরা যে কার কে হয় তা বুঝতে পারছে না সে। বোঝার অবশ্য বিশেষ দরকারও নেই। তার এখন লক্ষ্য হল রাত নটা কুড়ির শেষ ট্রেনটা ধরা। মেয়েটা বাপ ছাড়া থাকতে পারবে কি?

জরদগব অবস্থা। মেয়ে দেখতে এসেছে সে, উলটে তাকেই হাঁ করে দেখছে সবাই। মাথাই তুলতে পারছে না বদ্রীনাথ।

জাঁদরেল মহিলার হাতখানা দেখতে পাচ্ছিল বদ্রী। হাতে শাঁখা আছে, নোয়া আছে। সধবা। কার বউ কে জানে।

কদম দাস ব্যস্ত পায়ে এসে জাঁদরেল মহিলাকে বলল, তোমাদের হল? এরা সব রাতের ট্রেনে ফিরবে যে!

জাঁদরেল বলল, আহা, ফিরবে তো কী? দেরি আছে।

ছটা বেজে গেছে কিন্তু।

বদ্রীর হাতে ঘড়ি নেই। ছ'টা শুনে তার একটু চিন্তা হল। তিন মাইল রাস্তা অন্ধকারে হাঁটতে হবে। গাড়িটা পেলে হয়। পুলিনবিহারীর ভাবগতিক ভালো ঠেকছে না তার। পুলিনের ফেরার ঠেকা নেই, তার আছে।

ভিড়ের ভিতর থেকে আর একটা শাঁখা-পরা কালো আর রোগা হাত এগিয়ে এল। হাতে একখানা কাঁসার রেকাব। তাতে মিষ্টি। সঙ্গে এক গ্লাস জল।

খাও বাবা।

খিদে আছে। রেকাবটা হাত বাড়িয়ে নিলও বদ্রী। কিন্তু এত জনার চোখের সামনে খায়ই বা কী করে? এ তো বড়ো অসুবিধের মধ্যেই পড়া গেল।

সে বলল, পুলিনদা আসুক।

কদম ব্যস্তসমস্ত হয়ে বলে, তাই তো! ভাইপোকে তো দেখছি না। গেল কোথা? ওরে ও পুটু, একটু রাস্তায় গিয়ে দেখ তো বাবা। বড়ো বে-আক্কেলে লোক। ডেকে আন।

ছোঁড়াটা দৌড়ে গেল।

বদ্রী বসে রইল চুপ করে। হাতপাখা চলছে, তবু ঘামছে। গামছাটা ব্যাগে ঢুকিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু এদের সামনে সেটা বের করা যাচ্ছে না। লজ্জা হচ্ছে।

পুলিন বেশিদূর যায়নি। এসে গেল। আগর ঠেলে ঢুকতে ঢুকতেই বলল, ওরে বাবা, উকিলের ওপর ছেড়ে দিলে কি আর মামলা জেতা যায়? তদ্বির হল আসল কথা। উকিলের কি? দক্ষিণাটি নিয়ে কথা কয়ে ছেড়ে দেবে। পয়েন্ট দিতে হবে না?

ভিড় ঠেলে গন্ধমাদনের মতো বারান্দায় উঠে পুলিন বলল, এঃ, এ যে বাঁদর নাচের ভিড় লাগিয়েছিস তোরা। সর সর বাতাস আসতে দে।

তাকেও একটা রেকাব ধরানো হল। পুলিন খেতে খেতে বলল, এক্রামকে জোরালো কয়েকটা পয়েন্ট ধরিয়ে দিয়েছি। খুব খুশি।

খাওয়া-দাওয়া মিটতেই কদম বলল, এবার যে একটু ঘরে আসতে হচ্ছে। একটু গরম হবে ঘরে। কিন্তু বারান্দায় তো আর পাত্রী দেখানো যায় না।

পুলিন বলল, আহা বাইরেই কি গরম কম নাকি? আয় রে বদ্রী। অত ভাবিস না, সাড়ে নটার ট্রেন ধরতে পারবি।

ঘরখানা একটু ঝুঁঝকো আঁধার। জানালা দরজা বিশেষ বড়ো নয়। তাছাড়া জানালার বাইরেই বড়ো বড়ো গাছ। একধারে বড়ো চৌকি বেডকভার দিয়ে ঢাকা। চৌকির পায়ের ধারে বেঞ্চিতে মেলা ট্রাঙ্ক বাক্স থাক দিয়ে সাজানো।

এক ধারে একখানা কাঠের চেয়ার। অন্য ধারে কিছু ছিল না। রাখাল-ছেলে পুটু বারান্দার চেয়ার দুটো তুলে এনে পাতল। ঘরে বেশ ভিড় জমে গেছে চারধারে। বসতেই খুবলো ফের পাখা চালাতে লাগল পিছন থেকে। পুলিন বলল, জোরে চালা বাবা। ঘেমে নেয়ে যাচ্ছি। কই গো, আনো মেয়েকে। এরে বাবা, গেরস্ত ঘরেই তো যাবে। বেশি সাজানো গোছানোর দরকার নেই।

অন্দরমহলের দরজায় একটু ঠেলাঠেলি পড়ে গেল! মেয়ে আসছে। একটু কেমন ভয় ভয় করছিল বদ্রীর। মেয়ের চারখানা হাত বেরোবে না তো!

ভিড় ঠেলে যাকে আনা হচ্ছিল তার দিকে বদ্রী চাইতেই পারল না। দেয়ালে একখানা পাখির বাঁধানো ছবি দেখছিল। হলুদ রঙের পাখি। কী পাখি কে জানে বাবা। সুতোর কাজ।

ওরে দেখ, দেখ। দেখে নে। অন্য দিকে চেয়ে আছিস যে।

বদ্রী মাথাটা প্রথমে নুইয়ে তারপর তুলল। সব মুখই কালো লেপাপোঁছা দেখাচ্ছিল। বাইরে এতক্ষণ বসেছিল বলে চোখটাও ধাঁধানো। ঘরটাও অন্ধকার।

তবু তার মধ্যেই এক জোড়া চোখে তার চোখ আটকাল। একজোড়া? নাকি তিনটে? মেয়ের কি তিনটে চোখ? যা সব গল্প শুনেছে পুলিনের কাছে, হওয়া বিচিত্র কি?

তবে না। কপালে একটা লম্বাটে বড়ো টিপ পরেছে বলে ওইরকম। মুখচোখের তেমন হদিশ পেল না। পেয়ে হবেটাই বা কী? ফেরার পথে পুলিনকে শুধু একটা কথাই বলতে হবে, পছন্দ হয়নি।

হঠাৎ ঝাঁ করে এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া কোথা থেকে যে এল কে বলবে। বদ্রীর মনটাই আজ নানা অলৌকিকের বাসা হয়ে আছে। সে একটু চমকে উঠল। এ কী রে বাবা, ঠাণ্ডা হাওয়া মারে কেন?

কে একজন হেঁড়ে গলায় বলে উঠল, ঝড় আসছে।

কথাটা শেষ হওয়ার আগেই একটা সিংহ গর্জনের মতো মেঘ ডেকে উঠল। সেরেছে। এতক্ষণ লক্ষ করেনি বদ্রী। লক্ষ করবেই বা কি ভাবে। যা ঘিরে ছিল সবাই মিলে।

পুলিনবিহারী পান চিবুচ্ছে। কোত্থেকে পেল কে জানে। তার খুড়োর বাড়ি পেতেই পারে। বলল, আসুক বাবা, আসতে দে। ঘামাচিগুলো মরে তাহলে।

দু' চারজন ছিটকে বেরিয়ে গেল। ঝড় এলে গেরস্ত বাড়িতে কিছু সারা-তাড়া থাকে।

জাঁদরেল মহিলা বলল, ও কাতু, অমন মাথা নুইয়ে আছিস যে। মুখটা তোল। ভালো করে দেখুক। নইলে পছন্দ হবে কী করে?

নাঃ, মিঠে হাওয়াটা বন্ধ হল না। বরং বাড়ল। চোতের কালবোশেখি কত তাড়াতাড়ি আসে তা বদ্রী আর পাঁচজন চাষির মতোই জানে। দম ফেলার সময়টুকু দেয় না। কড়াৎ কড়াৎ করে দুটো বাজ পড়ল, আর মুঠো মুঠো ধুলো উড়ে এল বাতাসে। ঝপাঝপ জানালা-দরজা বন্ধ করছিল সবাই। একটা হুড়োহুড়ি।

পুলিন বলল, ওরে আসতে দে, আসতে দে। এ যে সূচীভেদ্য করে ফেললি বাপ।

বাস্তবিকই, দরজা জানালা বন্ধ হওয়ার পর ঘরখানা জম্পেশ অন্ধকার হয়ে গেল হঠাৎ। বাইরে তুমুল গর্জন করে একটা বড়ো হাওয়ার ঝটকা টিনের চালে মটমট শব্দ করে গেল। দু নম্বর ঝটকায় দরজাটা উঠল মড়মড় করে। তারপর একেবারে হুহুংকারে কেঁপে উঠল চারদিক। বাইরে চেঁচামেচি, দৌড়াদৌড়ি, ঠাস ঠাস কপাট জানালার শব্দ।

ঝড়ের গর্জনে ঘরের ভিতরকার কথাবার্তাও চাপা পড়ে গেল। কানে তালা ধরিয়ে বাজ পড়ল কোথাও। খুব কাছেই।

বদ্রীর অবশ্য ভয় নেই। প্রতিবারই খোলা মাঠে এই ঝড়ের সঙ্গে তার দু-চারবার দেখা হয়। ঘরে বসে সে শুধু শব্দটা শুনে তাণ্ডবটা কীরকম তা আন্দাজ করছিল। বেশি বাড়াবাড়ি হলে ট্রেনটা পিছলে যাবে।

আচমকাই ফের মনের ভুল? নাকি চোখের বিভ্রম! পরিষ্কার দেখল সে, একটা নয়, দুটো নয়, তিন তিনটে চোখ অন্ধকারে তিনটে পিদিমের শিখার মতো জ্বলছে। স্থির।

নাঃ, আজ তার মাথাটাই গেছে। কোথায় কী? ঘর যেমনকে যেমন অন্ধকার। তার মধ্যেই পুলিন টর্চ জ্বালাল। পাত্রীর চেয়ার ফাঁকা। উঠে গেছে কোন ফাঁকে। ঘরের ভিড়ও পাতলা

হয়ে গেছে। সেই বুড়ো, জাঁদরেল মহিলা আর কদম দাস দাঁড়িয়ে।

পুলিন বলল, ও তো মুশকিল হল রে। যাবি কী করে?

পাঁচ দশ মিনিটের বেশি তো আয়ু নয়। থেমে যাবে। বদ্রী বলল।

সে যাবে। কিন্তু রাস্তাটার কী অবস্থা হবে জানিস?

একটু হাসল বদ্রী। সে হেলে চাষা, জলকাদা ভেঙে চাষ। এ সব বাবু-ঘেঁষা কথা শুনলে মায়া হয়।

ঝড়ের তাড়স বাড়ল। বৃষ্টিটা এখনও শুরু হয়নি।

কদম দাস বলল, আমের বউলগুলো সব গেল।

পুলিন বলল, যায় যাক, তবু ঠাণ্ডা হোক। চাষবাস লাটে উঠতে বসেছিল।

তা বটে। চালের টিন ধরে টানাটানি করছে ঝড়-বাবাজীবন। ওপড়ায় আর কি!

কদম দাস ঊর্ধ্বমুখে চেয়েছিল। চালের নিচে কাঠের পাটাতন। পাটাতনে রাজ্যের জিনিস।

এ ঘরের না হলেও অন্য কোনো ঘরের টিন মড়াৎ করে উলটে গেল বটে। বিকট শব্দে সেটা আছড়ে পড়ল কোথাও। দুটো গাছ ভেঙে পড়ার শব্দ হল পর পর।

সুপুরি আর জাম গাছটা গেল। কদম দাস মুখ শুকনো করে বলল।

পুলিন টর্চটা নিবিয়ে বলল, অ বদ্রী।

বদ্রী বলল, ঘড়িটা দেখ পুলিনদা।

ছটা বত্রিশ। টাইম দেখে হবেটা কি? ঝড় না থামলে তো নড়ার উপায় নেই।

এরপর খানিকক্ষণ কথাবার্তা বন্ধ। তারপরই বৃষ্টিটা এল। প্রথম চড়বড়ে কয়েকটা ফোঁটা। তারপর তুমুল। তারপর মুষলধারে।

বদ্রী চুপ করে বসে রইল। বাইরের ঝড়বৃষ্টি বা মেয়ের চিন্তা বা শেষ ট্রেন কোনোটার কথাই ভাবছে না সে। ভাবছে, ভুল দেখল। কী দেখল সে? কাত্যায়নীর গপ্পো তো গপ্পোই।

ওরকম অনেক রটনা হয়। তাহলে এরকমধারা হচ্ছে কেন?

বুড়ো মানুষটি হঠাৎ বলল, সুলক্ষণ।

পুলিন বলে, কীসের সুলক্ষণ?

এই কালবোশেখীর কথাই বলছি।

অ।

কদম একটা শ্বাস ফেলে বলল, যাক, ফাঁড়াটা কেটেছি। গোয়ালঘরের একটা টিন গেছে। তা যাক।

বদ্রী বসে আছে চুপচাপ। তার যেন আর তাড়া নেই। গেলেও হয়, না গেলেও হয়।

তাড়াটা এল পুলিনের দিক থেকেই, ওরে ওঠ, সাতটা বাজে যে।

ঝড় থেমেছে। বৃষ্টিটাও ধরে এল। টিনের চালে এখন শুধু মিঠে রিমঝিম। বদ্রী উঠল।

কদম দরজাটা খুলে দিয়ে বলল, চললেন তাহলে। কষ্ট পেয়ে গেলেন একটু। যেতেও কষ্ট আছে। জলকাদা।

বদ্রী বলল, ও কিছু নয়।

দাওয়ায় পা দিয়েই বুঝল, সামনের অন্ধকারে মেলা লণ্ডভণ্ড কাণ্ড হয়ে আছে। গাছ পড়েছে, ডাল ভেঙেছে, মেলা চাল উড়ে গেছে। লোকজনের চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছে খুব। আতঙ্কের গলা।

টর্চ জ্বেলে জ্বেলে হাঁটতে হাঁটতে মাঠ পেরোচ্ছে দুজন। চারদিকে বিশাল অন্ধকার মাঠ। ভেজা বাতাস বইছে। জলে কাদায় পিছল পথ।

ও বদ্রী, কিছু বল।

কী বলব?

পছন্দ হল?

বদ্রী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, পছন্দ না হয়ে উপায় আছে।

মনে থাকা

ব্যাটনের বডি ফিট। দেখনসই কিছু নয়। বরং তাকে একটু লিকলিকেই দেখায়, রঙখানা ঘোরতর কালো। এতই কালো যে কপালের সীমানা থেকে কোথায় তার মাথাভর্তি জংলা চুলের শুরু তা বোঝা মুশকিল। চুল নিয়েও ব্যাটনের খুব গুমোর। মাথার ওপর তার চুল এমন চুড়ো হয়ে থাকে যেন কালো টোপর। নাকতলা বিবাদীবাগ একখানা মিনিবাস চালায় ব্যাটন। হাত চমৎকার। আজ অবধি নো অ্যাকসিডেন্ট নো লাইসেন্স ক্যাপচার। পুলিশ জাতটাকে মিনিবাসের ড্রাইভাররা দু-চোখে দেখতে পারে না। কিন্তু ব্যাটনের উল্টো, পুলিশকে তার খুব শ্রদ্ধাভক্তি। কারণ সে নিজেই পুলিশের চাকরি মনেপ্রাণে চেয়েছিল। হয়নি। যা চাওয়া যায় তাই কি আর ভগবান দেন। দু'দুবার ইন্টারভিউ দিয়ে ফিরে আসে।

তার দু-নম্বর পছন্দ ছিল ট্রাক ড্রাইভার। তা ট্রাক কিছুদিন চালিয়েছিল ব্যাটন। কিন্তু সেবার দুমকার কাছে ট্রাকে ডাকাত পড়ায় প্রাণে বেঁচে গেলেও আর ও কাজ করতে সাহস হয়নি। মিনিবাস চালানোটা তার তিন নম্বর পছন্দ। না, সে খারাপ নেই। নাকতলা ডালহৌসি মাকু মারা ছাড়াও মাঝে মাঝে বরযাত্রী নিয়ে যাওয়া বা পিকনিক পার্টি নিয়ে এ-ধার ও-ধার ট্রিপ মেরে আসা--সব মিলিয়ে ব্যাপারটা কিছু খারাপ নয়। সপ্তাহে একদিন ছুটি। বসে না থেকে সেদিনটা সে একবেলা ট্যাক্সি চালায়।

আজ তার ছুটির দিন। সে আজ ট্যাক্সিটা বের করেছিল ভোর চারটেয়। মালিকের এক আত্মীয়কে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিতে হল। ভোরের ফ্লাইট ধরাতে। যশোর রোডে একটা দোকানে একটু চা খেয়ে সওয়ারি ধরল উল্টোডাঙার। উল্টোডাঙা থেকে গর্দিশ। কপালে জুটল এক রুগি। পুরো ভুখা পার্টি। গরিবগুরবো চেহারা। একজন বুড়োমানুষকে নিয়ে একটা মেয়ে আর একটা ছেলে কাঁদতে কাঁদতে উঠল গাড়িতে। বুড়ো নেতিয়ে পড়েছে,

ঘাড় লটকানো। পাড়ার দুটো ছেলে বুড়ো আর তার লোকদের পিছনে তুলে নিজেরা সামনের সিটে ঠেসে বসল। তারপর এ হাসপাতাল আর সেই হাসপাতাল। কোথাও জায়গা পাওয়া গেল না। বুড়ো গোঙাচ্ছে, ছেলেমেয়ে দুটো হাউমাউ করছে।

বাঙ্গুর অবধি চেষ্টা করার পর ব্যাটন বলেই ফেলল, দেখুন মশাই, মিটারে একশো টাকা উঠে গেছে। এরপর মিটার ঘোরাতে হবে। আপনারা পারবেন তো এত টাকা দিতে?

পাড়ার ছেলে দুটো মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। পিছনে মেয়েটা কান্না থামিয়ে বলল, কত?

মিটারে একশো। তার মানে একশো ঊনচল্লিশ উঠে গেছে।

ও বাবা, অত টাকা তো নেই।

তাহলে কী হবে? বলে ব্যাটন ভ্রূ কুঁচকে পিছনে চেয়ে বলল।

কাঁদুনে মেয়েটা বলল, আমার একটা মাকড়ি যদি খুলে দিই?

মাকড়ি? না, না ওসবের মধ্যে আমি নেই। যা আছে দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিন।

কিন্তু আমার বাবা! বাবা যে মরে যাবে।

ব্যাটন একটা হাঁফ ধরা শ্বাস ছেড়ে বলল, তেলের দামটা কে দেবে বলুন।

ছেলেটা বলল, বেহালায় একটা হাসপাতাল আছে, সেটায় একবার নিয়ে যাবেন? তারপর ছেড়ে দেবো।

ব্যাটন ঘাড় থেকে বোঝা নামাতে পারলে বাঁচে। গাড়ি ছেড়ে সে বলল, আমাদের দিকটাও তো দেখবেন। আমিও গরিব মানুষ।

কেউ কিছু বলল না।

বেহালার হাসপাতালে বরাতজোরে বুড়োর জায়গা হয়ে গেল। ভাড়ার জন্য গাড়ি নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়েছিল ব্যাটন। পুরোটা না পেলেও যদি কিছু পাওয়া যায়। ট্যাক্সি চালাতে গিয়ে আজ ঝকমারিই হল। অন্তত পৌনে দুশো টাকা গচ্চা।

তবে গরিব হলেও মেয়েটা আর ছেলেটা খুব একটা চারশো বিশ নয়। আধঘন্টা পর ভাই বোন বেরিয়ে এল। মেয়েটা তার হাতে চারখানা ন্যাতানো দশ টাকার নোট আর দু-খানা ছেঁড়াখোঁড়া দুটাকার নোট দিয়ে বলল, অপনার ঠিকানাটা যদি দেন, আমি বাকি টাকা পৌঁছে দিয়ে আসব।

ও ছেড়ে দিন। লাগবে না।

না না শুনুন। আমরা গরিব বটে কিন্তু লোককে ঠকাই না। আমার বাবা মাস্টার ছিলেন। ঠিকানাটা দিয়ে রাখুন। কবে পারব জানি না। বাবাকে ভর্তি করিয়েছি, এখন কী হবে কে জানে। অনেক খরচ। কিন্তু হাতে কিছু এলেই দিয়ে আসব।

ব্যাটন ঠিকানাটা একটা কাগজে লিখে দিয়ে বলল, আমাকে বাড়িতে পাবেন না। তবে আমার বুড়ি মা আছে, তাকে দিয়ে আসবেন আপনার নামটা বলে। আপনার নাম কী?

অণিমা।

ব্যাটন পালিয়ে বাঁচল।

না, অণিমা টাকা দিতে আসেনি। ব্যাপারটা ভুলেই গেছে ব্যাটন। কটাই বা টাকা!

তিন মাস পর এক বর্ষাকালে মিনিবাস চালাচ্ছিল ব্যাটন। সকাল থেকে ঘনঘোর বৃষ্টি। দুপুরের মধ্যেই কলকাতা জলে ভাসতে লাগল প্রায়। ডালহৌসি থেকে বেলা সাড়ে বারোটায় যখন বাস ছাড়ল ব্যাটন, তখন রাস্তায় এক ফুট-দেড় ফুট জল আর মোড়ে মোড়ে জ্যাম। টার্মিনাসে পৌঁছেই গাড়ি তুলে নিতে হবে। আজ আর গাড়ি চলবে না। ব্যাটন নানা রাস্তায় ঘুরিয়ে জ্যাম আর জল কাটিয়ে নাকতলা পৌঁছনোর চেষ্টা করছিল। বাসটা জমা করে বাকি দিনটা শুয়ে-বসে কাটানো যাবে। ফুটুসের বাড়িতে তাস খেলা যেতে পারে। নইলে মদনদার বাড়িতে ভিডিও।

গাড়িটা যখন ভবানীপুরে এসে পড়েছে তখনই বিপত্তি। সামনে বিশাল জ্যাম। বাসে লোকজন যারা ছিল তারা জ্যাম দেখে সরকারকে গালাগাল দিতে লাগল। কেউ কেউ ড্রাইভারকে নানা পরামর্শও দিচ্ছে। ফালতু কথা।

একটা মেয়ে পিছন থেকে ড্রাইভারের কেবিনে উঁকি মেরে বলল, গাড়ি আর যাবে না, না?

তাচ্ছিল্যের চোখে মেয়েটার দিকে একবার চেয়ে ব্যাটন বলে, কোথা দিয়ে যাবে?

কিন্তু আমার যে একটু তাড়া আছে।

কিছু করার নেই। নেমে যদি অন্য কিছু ধরতে পারেন দেখুন।

একটু কেমন যেন লাগল ব্যাটনের। তিন মাস লম্বা সময়। আর মেয়েটারও সেদিনকার মতো আলুথালু অবস্থা নয়। একটু সেজেছে। নীল শাড়ি, চুল খোঁপায় বাঁধা, কপালে টিপ। তবে ব্যাটন ঘাঁটল না, চেনাও দিল না। কী দরকার!

কিন্তু মেয়েটা তার দিকে চেয়েই আছে, এটা চোখের কোণ দিয়ে লক্ষ করল ব্যাটন।

আচ্ছা শুনুন, আপনার মুখটা খুব চেনা।

ব্যাটন একটু হাসল। কিছু বলল না।

আপনি আমার বাবাকে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়েছিলেন না?

আপনার বাবা কেমন আছেন?

ভালো। ওটা স্ট্রোক ছিল না। দু-দিন পরেই বাড়িতে নিয়ে আসি।

ভালো।

আপনার টাকাটা শোধ দিতে পারিনি।

আরে তাতে কী আছে। ওটা ভুলে যান।

ভুলব? ভুলবার কি উপায় আছে? কত ভদ্র ব্যবহার করেছিলেন আপনি সেদিন! সহজে কি ভোলা যায়?

কিছুই করিনি। ওরকম সবাই করে।

আপনি কি মিনিবাস চালান?

সব চালাই। মিনি ট্যাক্সি। কোথায় যাবেন?

নাকতলা। আমার কাকার বাড়ি।

অ। বসে থাকুন।

আসলে আমাকে আবার উল্টোডাঙা ফিরতে হবে।

আজই ফিরবেন? পারবেন বলে মনে হয় না।

বাইরে প্রবল থেকে প্রবলতর জোরে বৃষ্টি পড়ছে। চারিদিক ঢেকে গেছে ধুন্ধুমার বৃষ্টিতে। রাস্তায় জল বেড়ে যাচ্ছে।

আতঙ্কিত মেয়েটি বলে, না ফিরলেই যে নয়।

আজ না বেরোলেই ভালো করতেন।

উপায় ছিল না যে।

কেন উপায় ছিল না তা আর জানতে চাইল না ব্যাটন। গরিবের সংসারে কতরকম দরকার এসে হানা দেয়। সে বলল, ওয়েদার ভালো হলে ফিরতে পারবেন।

বাস ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগোতে লাগল, জলময় ভবানীপুরে বিস্তর গাড়ি ফেঁসে রাস্তায় ব্লক তৈরি করেছে। কাটিয়ে এগনো খুব ঝামেলা। অখণ্ড মনোযোগে বাসটা চালাচ্ছিল ব্যাটন।

নাকতলা টার্মিনাসে যখন বাস থামল তখন দু'চারজন ছাড়া বাসে যাত্রী ছিল না। প্রচণ্ড বৃষ্টিতে চারদিকে লঙ্কাকাণ্ড হয়ে যাচ্ছে।

মেয়েটা জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে। হাতে বেঁটে ছাতা! এই বৃষ্টিতে অবশ্য ছাতা কোনো কাজেই লাগবে না। ব্যাটন ড্রাইভারের সিটে বসে ছিল। নামেনি। তাড়া নেই। মেয়েটার দিকে চেয়ে বলল, কী করবেন?

মেয়েটা ম্লান মুখে বলল, আজ যে কী বৃষ্টি!

একটু ইতস্তত করে মেয়েটা নামল। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রবল বৃষ্টি ঝরোখায় আবছা হয়ে গেল। কোথায় গেল কে জানে!

ব্যাটন মেয়েটার কথা একটু ভাবল। টাকা শোধ দিতে চায়--তার মানে মেয়েটার স্বভাব ভালো। ভালো স্বভাবের লোকজন দুনিয়া থেকে কমে যাচ্ছে।

দশ মিনিটের মাথায় পানুর চায়ের দোকানে বসে মেয়েটাকে ভুলে গেল ব্যাটন। মনে রাখার কোনো কারণ তো নেই।

দিন পনেরো বাদে নাকতলা টার্মিনাসে বেলা দুটোয় গাড়ি নিয়ে ঢুকেই ব্যাটন স্টার্টার শম্ভুর কাছে শুনল কে একটা মেয়ে তার জন্য অপেক্ষা করছে। শম্ভুর দোকানের বেঞ্চে বসে আছে অনেকক্ষণ ধরে। তার ওপর গরমটাও পড়েছে আলিসান। ব্যাটনের মেজাজ আজ টপে ছিল। কিন্তু এ খবরটা শুনে একটু যেন নরম হল। সেই ভালো মেয়েটা নাকি? অণিমা না কী যেন নাম!

অণিমাই। শম্ভুর দোকানের বেঞ্চের কোণে বসে গরমে ঘামছে।

আরে, কী খবর?

অণিমা ম্লান একটু হেসে বলল, ধার কবে পুরো শোধ হবে জানি না। আজ কিছু দিয়ে যাচ্ছি।

ব্যাটন অবাক হয়ে বলল, আরে সামান্য টাকার জন্য অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন?

আপনার কাছে সামান্য, কিন্তু আমাদের তো ঋণটা রয়ে গেছে।

মেয়েটা তার ব্যাগ থেকে একটা ময়লা পঞ্চাশ টাকার নোট বের করে তার হাতে দিয়ে বলল, আজ এর বেশি পারলাম না।

ব্যাটন টাকাটা নিয়ে পকেটে রেখে বলল, চা খেয়েছেন?

না। আমি চা খাই না।

তাহলে ঠাণ্ডা কিছু খাবেন?

হেসে অণিমা বলে, আমার টনসিলের দোষ আছে।

তাহলে ডাব খান।

অণিমা একটু লজ্জা পেয়ে বলল, না থাক। আমি যাই।

কোথায় যাবেন?

কাকার বাড়ি।

আপনার কাকা কে বলুন তো!

চিনবেন না। কাকাও গরিব। বৈষ্ণবঘাটা বাই লেনে বাড়ি। জ্যোতিষি করেন, পুরুতগিরি করেন।

অ। একটু তাচ্ছিল্য ফুটল ব্যাটনের গলায়।

অণিমা বলল, গরিব হলেও ওই কাকাই দফায় দফায় আমাদের সাহায্য করেন। বেশি পারেন না। যা পারেন দেন। ব্যাচেলার মানুষ তো।

ব্যাটন বলল, আপনার মুখ শুকিয়ে গেছে। একটা ডাব খান। গরমে খুব ভালো জিনিস।

মেয়েটা উঠে দাঁড়িয়েছিল। এ কথায় বসে পড়ল। হ্যাঁ বা না কিছুই না বলে শুধু একটু হাসল।

ডাবওয়ালার কাছ থেকে এটা ডাব নিয়ে এল ব্যাটন নিজেই, স্ট্র লাগানো। অণিমা চুক চুক করে অনেকক্ষণ ধরে ডাব খেল। তারপর বলল, খুব তেষ্টা পেয়েছিল ঠিকই।

কোনো দরকার নেই, তবু ব্যাটন হঠাৎ বলল, আচ্ছা। আপনাদের চলে কীসে?

অণিমা হেসে বলল, চলে আর কোথায়? বাবা রিটায়ার করার আগেও অবস্থা ভালো ছিল না, এখন আরও খারাপ। আমি টিউশানি করি আর উল বুনি। তাতে যা হয়।

বাড়িটা কি নিজেদের?

না। আমরা বস্তিতে থাকি। আজকাল বস্তিতেও বড্ড বেশি ভাড়া। আচ্ছা, আজ আসি?

ঠিক আছে।

আবার একদিন এসে বাকিটা শোধ দিয়ে যাব।

আমার কিন্তু আর বেশি পাওনা নেই।

অণিমা মাথা নেড়ে বলে, মিথ্যে কথা বলতে হবে না। আমার হিসেব মতো আপনি একশো সত্তর টাকা পাবেন। আমি তো একশো টাকাও পুরো দিতে পারিনি।

ব্যাটন এই আশ্চর্য মেয়েটার দিকে তাকিয়ে এই প্রথম বুকে একটা কষ্ট টের পেল। বড্ড ভালো তো মেয়েটা। এরা এত কষ্ট পায় কেন?

আসি। বলে মেয়েটা চলে গেল।

ব্যাটন মেয়েছেলেদের নিয়ে ভাবে না মোটেই। সে বিয়েটিয়ে করবে না। ওসব তার পোষাবে না। গাড়ি চালাবে, খাবে দাবে স্ফূর্তি করবে। এই তার জীবনদর্শন।

কিন্তু আজ মনে হল, এরকম মেয়ে পেলে--

ব্যাটনের বাস গতির জগতে। ঝড়ের বেগে কলকাতার খারাপ রাস্তায় যখন মিনি চালায় তখন কোমল, নরম সব চিন্তা-ভাবনা কোথায় উড়ে যায়।

অণিমাও বেশিক্ষণ মাথায় রইল না। তবে মাঝে মাঝে মেয়েটাকে মনে পড়তে লাগল তার।

মাস দেড়েক, বাদে এক রোববারের সকালে তাদের বাড়িতে মেয়েটা এসে হাজির।

সকাল ছ'টা বাজে। ব্যাটনের এ সময়টায় গাঢ় ঘুম হয়।

মা এসে ডেকে তুলল, ওরে ওঠ ওঠ, একটা মেয়ে এসেছে।

ব্যাটন উঠল। দেখল, অণিমা বারান্দায় একটা লোহার চেয়ারে বসে আছে। ঘর্মাক্ত মুখ। মুখে লাজুক হাসি।

আরে, কী ব্যাপার?

অণিমা মৃদু হেসে বলল, ঘুম ভাঙালাম বুঝি?

ব্যাগ খুলে পঞ্চাশ টাকার নোট বের করে বলল, আরও কিছু রইল। আমি তো প্রায়ই কাকার কাছে আসি। একসময়ে দিয়ে যাবখন।

ব্যাটন কী বলবে ভেবে পেল না। তবে তার সত্যিই বুকটা আজ কেমন করল। হাত বাড়িয়ে টাকাটা নিয়ে বলল, চা খেয়ে যাবেন কিন্তু।

মাথা হেলিয়ে মেয়েটা বলল, আচ্ছা। আমি চা খাই না। কিন্তু আজ আপনার কথায় খাব।

ওঃ, আপনি চা খান না তা মনেই ছিল না।

অণিমা তার মায়ের সঙ্গে বসে গল্প করতে লাগল। ব্যাটন গেল মুখ ধুতে। মুখ ধুতে ধুতে সে টের পেল তার বুকের ভেতর গুপিযন্ত্র বাজছে। ভালো লাগছে। সকালটা যেন আর অন্য সব সকালের মতো নয়। পেয়ার, মহববতের অনেক ঘটনা সে হিন্দি-বাংলা ফিলমে দেখেছে। এ যেন সেরকমই ব্যাপার। তবে কি পেয়ার হয়ে গেল নাকি? এই কি শালা মহববত?

অণিমা অনেকক্ষণ রইল। মায়ের সঙ্গে কিছু কাজও করল। সে চলে যাওয়ার পর মা বলল, কে রে মেয়েটা?

আমিই কি ভালো চিনি?

সতীশ ভটাচাযের ভাইঝি হলে তো ভালো ঘর।

তার মানে?

আমরাও তো বামুন।

বামুন না চাঁড়াল তা তো মনেই থাকে না। যাকগে, ও লাইনে ভেবো না। লাভ নেই।

মেয়েটা এল আরও এক মা, বাদে। শরৎকাল। ভারি সুন্দর এক সকাল।

ব্যাগ থেকে টাকা বের করে ব্যাটনের হাতে দিয়ে বলল, শোধ কিন্তু হল না।

কেন? সবই তো দিয়ে দিলেন।

সব কি দিতে পারি? দয়া করেছিলেন, সময় দিয়েছিলেন, ভালো ব্যবহার করেছিলেন,--সে সব কি শোধ হয়?

ব্যাটন ভ্যানতারা ভালোবাসে না। হঠাৎ বলে বসল, মা বলছিল আমরাও বামুন।

জানি তো! তাতে কী?

ইয়ে--মানে--বলছিলাম কী--

মেয়েটা হাসল। তারপর তাকে বিস্ময়ে পাথর করে দিয়ে বলল, আমাকে ভুলতে চান বুঝি? আমাকে বিয়ে করলেই কিন্তু আপনি আমাকে ভুলতে শুরু করবেন আর আমার কথা এভাবে মনেই হবে না। আমি আপনাকে ভুলতে চাই না বলেই মনে মনে ঠিক করেছি আপনাকে কিছুতেই বিয়ে করব না। একজন ভালো লোক হয়ে আপনি আমার মনের মধ্যে থাকবেন।

ব্যাটন এত অবাক কোনো কালে হয়নি।

দুর্ঘটনা

ধবংসস্তূপের ভিতর থেকে অংশু যখন নানা ব্যথা বেদনা সত্ত্বেও উঠে দাঁড়াতে পারল তখনো ধাঁধার ভাবটা তার যায়নি। সাধারণত দুর্ঘটনায় পড়লে খুব জোরালো ধাক্কায় মনের ক্রিয়া কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। পূর্বাপর কিছু মনে পড়ে না। মন যুক্তিহীন আচরণ করতে থাকে। তবে এ স্মৃতিভ্রংশ নয়। অংশু জানে।

নিজের ছোট্ট প্রিয় ফিয়াট গাড়িটার ছয় ছত্রখান চেহারাটা অংশু খুব মন দিয়েই দেখল। যাকে বলা যায় টোটাল ডিজইন্টিগ্রেশন। চেসিস ছাড়া কিছু আস্ত নেই বা যথাস্থানেও নেই। একটা দরজা উপুড় হয়ে পড়ে আছে ঢালু জমির ঘাসের ওপর। দরজার একপ্রান্ত দিয়ে একজোড়া ভারি সুন্দর পা ও গোলাপি সালোয়ারের প্রান্ত দেখা যাচ্ছে। আঙুলে রুপোর চুটকি, নখে পালিশ।

নীচু হতে খুব কষ্ট হচ্ছিল অংশুর। কোমরটার জখম বোধহয় বেশ গভীর। তার বয়স বিয়াল্লিশ। এ বয়সে এ ব্যথা সহজে সারবার নয়। তবু নীচু হয়ে অংশু দরজাটা তুলবার চেষ্টা করল। প্রথমবারে পারল না। দ্বিতীয় চেষ্টায় পারল।

অংশুর ভিতরে কোনো শব্দ এমনিতেই ছিল না। দরজার তলার দৃশ্যটা দেখে তার ভিতরটা যেন আরো নিস্তব্ধ ও চিন্তাশূন্য হয়ে গেল। রাণু বেশি যন্ত্রণা পায়নি নিশ্চয়ই। মাথাটা তুবড়ে গেছে পিছন থেকে। মৃত্যু ঘটেছে তৎক্ষণাৎ।

অংশু দরজাটা ছেড়ে দিলে সেটা ফের রাণুর ওপর ধর্ষণকারীর মতো চেপে বসে যায়। অংশু হাইওয়ের দিকে মুখ তুলে তাকায়। হাইওয়ের এই অংশটা খুবই নির্জন। টানা লম্বা রাস্তার দুদিকটাই ফাঁকা। তবু দুর্ঘটনার গন্ধে লোক জুটবেই। এখনো জমেনি। একটু পর পর দু দুটো লরি ঝড়ের বেগে চলে গেল।

তার গাড়িটাকে মেরেছে একটা লরি। তার দোষ সে লরিটাকে ওভারটেক করার চেষ্টা করেছিল। কয়েকবার চেষ্টা করেও প্রথমদিকে পারেনি। লরিটা সাইড দিচ্ছিল না। কত রকমের বদমাশ ড্রাইভার থাকে। অংশুর সন্দেহ লরিওলা তার গাড়ির আয়নায় সামনের সিটে বসা অংশুর পাশে রাণুকে দেখছিল। রাণু তো দেখবার মতোই। মেয়েছেলে দেখলে কিছু কিছু পুরুষ অদ্ভুত আচরণ শুরু করে দেয়। লরির ড্রাইভার সম্ভবত সেরকমই একজন। বহুক্ষণ ধরে লরিটা অংশুর পথ আটকে রেখে যাচ্ছিল। কখনো খুব স্পিড দিচ্ছিল, কখনো ঢিলাঢালাভাবে এগোচ্ছিল।

ঠিক এই জায়গাটাতেই অংশু একটু ফাঁক পেতে অত্যন্ত তীব্র গতিতে লরিটাকে পাশ কাটাচ্ছিল। না কাটালেও ক্ষতি ছিল না। তবে রাণু বারবার বলছিল, উঃ, সামনের লরিটার ডিজেলের ধোঁয়া আমার একদম সহ্য হচ্ছে না। ওটাকে কাটাও তো। তাই কাটাচ্ছিল অংশু। তবে এ সময়ে সে একটা মারাত্মক ভুল করে। ড্রাইভারের কেবিনটা সমান্তরালে চলে আসতেই অংশু বাঁদিকে চেয়ে একটু নিচু হয়ে ড্রাইভারের উদ্দেশে চেঁচিয়ে গাল দিয়েছিল, এই শুয়ারকা বাচ্চা, মাজাকি হো রহা হ্যায়?

ড্রাইভারটা কোন দেশি তা বলা শক্ত। লরিওয়ালাদের কোনো দেশ থাকে কি? বিশেষ করে দূরপাল্লার লরিওয়ালা? অংশু দীর্ঘকাল হাইওয়েতে গাড়ি চালানোর অভিজ্ঞতা থেকে জানে, এইসব লরিওয়ালা যে-দেশেরই হোক, চণ্ডীগড় থেকে ডিব্রুগড় বা দিল্লি থেকে ব্যাঙ্গালোর ট্রিপ মেরে মেরে এদের গা থেকে প্রাদেশিকতা মুছে গেছে। এদের দেশ, ঘর সব এখন এক লরির প্রশস্ত কেবিন। ফিয়াটের ঘাতক লরিওয়ালার মুখটায় খোঁচা খোঁচা দাড়ি ছিল, মুখখানা ছিল প্রকাণ্ড, মাথায় বড়ো বড়ো রুক্ষ চুল, রোমশ হাত। একবার জানালা দিয়ে তাকাল ছোট্ট ফিয়াটের দিকে। তারপর আচমকা লরিটা ডানদিকে ঘেঁষতে শুরু করল অত্যন্ত বিপজ্জনকভাবে। অংশু তখনও পুরোপুরি কাটাতে পারেনি, পিছোনোরও উপায় নেই।

কী হচ্ছে তা বুঝবার আগেই রাণুর দিকটায় লরিটা প্রথম ধাক্কা মারে। সেটা এমন কিছু গুরুতর ছিল না। অংশু সামাল দিতে পারত। রাণু একটা তীব্র চিৎকার করে উঠেছিল বটে,

কিন্তু তাও পারত অংশু। কিন্তু লরিটা রসিকতা করছিল না। টাটার সেই অতিকায় হেভি ডিউটি ট্রাক অংশুর দেওয়া গালাগালটা ফেরত দিল দ্বিতীয় ধাক্কায়। সেটা ঠিক ধাক্কাও নয়। রোড রোলার যেমন থান ইট ভেঙে চেপে বসিয়ে দেয় রাস্তায় অবিকল সেইভাবে পিষে দিল প্রায়।

অংশু নিজের ট্রাউজারের ভেজা ভাবটা টের পেল এতক্ষণে। না, রক্ত নয়। গাড়িটা যখন তাকে আর রাণুকে গর্ভে নিয়ে চক্কর খেয়েছিল তখন অংশুর পেচ্ছাপ হয়ে যায়। অনেকগুলো ঘটনার মধ্যে একটা। অংশুর একটু গা ঘিনঘিন করল।

বলতে কি এই গা ঘিনঘিন করাটাই দুর্ঘটনার পর অংশুর প্রথম প্রতিক্রিয়া। এছাড়া তার মন সম্পূর্ণ ফাঁকা, সুখ-দুঃখ শূন্য।

একটু খোঁড়াতে খোঁড়াতে অংশু তার গাড়ির ধবংসস্তূপ থেকে সরে এল। নীচের দিকে ঢালু জমি গড়িয়ে গিয়ে একটা চওড়া নালায় শেষ হয়েছে। নালাটা জলে ভর্তি। দুটো ছাগল নির্বিকারভাবে আগাছা চিবোতে চিবোতে উঠে আসছে। অংশু একটা গাছের তলায় ছায়ায় বসল। কিছু করা উচিত। কিন্তু কী তা সে স্থির করতে পারছিল না।

একটা সমস্যা অবশ্যই রাণু। বেশ বড়ো রকমের সমস্যা। বেঁচে থাকলে রাণু সমস্যা হত না। যেমন করেই হোক নানারকম অনভিপ্রেত প্রশ্ন তারা দুজন মিলে এড়িয়ে যেতে পারত। কিন্তু রাণু এখন মৃত। অর্থাৎ নিরেট একটি বোঝা বা ভার মাত্র। অংশুর গাড়িতে তার উপস্থিতি নিয়ে যাবতীয় প্রশ্নের জবাব অংশুকে একাই দিতে হবে। রাণুর বদলে যদি সে নিজে মারা যেত বা দুজনেই, তাহলে কোনো সমস্যা ছিল না। সে মরে রাণু বেঁচে থাকলে রাণু শুধু ঘটনাস্থল থেকে সরে পড়লেই হত। দুজনে মরলে অবশ্য প্রশ্ন উঠত কিন্তু জবাবদিহি করার কিছু ছিল না।

অবশ্য এসব সমস্যা খুব গুরুত্ব দিয়ে ভাবছে না অংশু। তার ফাঁকা অভ্যন্তরে কিছু গুঞ্জন উঠছে মাত্র। বেকুব এবং রাগী এক লরিওলা যে কী ঘটিয়ে গেল তা সে নিজেও জানে না। তবে প্রতিশোধটা সে বড়ো বেশি নিয়েছে। দূরপাল্লার লরি ড্রাইভারদের এত আত্মসম্মানবোধ থাকার কথা নয়। 'শুয়ার কি বাচ্চা' বা ওই ধরনের গালাগাল তাদের কাছে

জলভাতের সামিল। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে এত বড়ো প্রতিশোধের পিছনের কারণ একটাই। দূরপাল্লার নারীবর্জিত দৌড়ে লোকটার ভিতরে একটা পুঞ্জীভূত যৌন কাতরতা ছিল। সেটাকে উসকে দিয়েছিল রাণু। আর সেই বেসামাল কাম থেকে এসেছিল ক্রোধ। ক্রোধ থেকে হিংসা। ইন্ধন ছিল অংশুর নিতান্তই বহু ব্যবহৃত এবং বিষহীন একটি গালাগাল।

একটু দূর থেকে অংশু ধবংসস্তূপটা দেখতে পাচ্ছে। রাণুর পা দুটো এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না। অংশুর মনে হচ্ছিল, তার এখান থেকে অবিলম্বে সরে পড়া উচিত। কিন্তু কাজটা খুব বাস্তব বুদ্ধিসম্মত হবে না। ওই ধবংসস্তূপ হাজারটা আঙুল তুলে তাকে নির্দেশ করবে, চিহ্নিত করবে।

হাইওয়ের ওপর পাঁচ সাতজন লোক দাঁড়িয়ে পড়েছে। দু তিনটে গাড়ি এবং লরিও থামল। ঢালু বেয়ে উঠে আসছে কাছাকাছি গ্রামের কিছু লোক। তাদের ভয়, বিস্ময় ও কাতরতার স্বাভাবিক উক্তিগুলি শুনতে পায় অংশু।

একজন স্যুটপরা বয়স্ক ভদ্রলোক অংশুর সামনে এসে দাঁড়ায়। অংশু চোখ ভালো করে তোলে না। এক পলক তাকিয়ে মুখটা নামিয়ে রাখে।

লোকটা জিজ্ঞেস করে, গাড়ি কে চালাচ্ছিল? আপনি?

হ্যাঁ। বলেই অংশু টের পায় তার গলার স্বর ভাঙা এবং বিকৃত। কেমন কেটে যাচ্ছে।

কী করে হল বলুন তো!

লরি। ফের গলার স্বরে একটা কাঁপুনি টের পায় অংশু।

ভদ্রমহিলা...! বলে ভদ্রলোক কথাটাকে ভাসমান রাখেন।

অংশু গলা খাঁকারি দেয়। এতক্ষণে সে শরীরেও কাঁপুনিটা টের পাচ্ছে। বলে, কী অবস্থা?

ভালো নয়। হাসপাতালে রিমুভ করতে হবে।

অংশু নড়ে না। মাটির দিকে চেয়ে থাকে।

আপনার ইনজুরি কীরকম?

কিছু বলতে তো হবে! শেষ অবধি সমস্যাটা কাটিয়ে উঠতে পারল অংশু। দয়া পরবশ একজনের গাড়ি হাসপাতালে পৌঁছে দিল তাদের। তাকে ও মৃত রাণুকে।

ডিসিজড-এর নাম?

রাণু সরকার।

ঠিকানা?

ম্যাকওয়ের অ্যাণ্ড কোম্পানি। সিকস্টিন...

এটা তো অফিসের ঠিকানা?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

হোম অ্যাড্রেস?

দেখুন, উনি ছিলেন, আমার কলিগ। আমরা একটা প্ল্যান্ট ভিজিট করতে যাচ্ছিলাম অন অফিসিয়াল স্ট্যাটাস। ওঁর হোম অ্যাড্রেসটা আমার জানা নেই।

অফিসে নিশ্চয়ই আছে!

আছে। বলে হাঁফ ছাড়ল অংশু।

আপনিও তো বেশ ইনজিয়োরড, না?

একটু তো লাগবেই। অত বড়ো অ্যাক্সিডেন্ট।

আপনি কি ভর্তি হবেন না?

না। তার দরকার নেই। ওয়ান টেটভ্যাক উইল বি এনাফ। আমি কি যেতে পারি এখন?

কোথায় যাবেন?

বাড়ি। আমার একটু রেস্ট দরকার।

পুলিশ এনকোয়ারি হবে, জানেন তো।

জানি।

অংশু আরও কিছু প্রশ্নের জবাব দিয়ে বেরিয়ে এল। রিকশা ধরল একটা।

সমীরণের বাগানবাড়িটা ভারি ছিমছাম, নির্জন, সুন্দর। বিশাল বাগানে অনেক পাখি ডাকছে। অংশু স্নান করেছে। প্যান্ট আণ্ডারওয়্যার ধুয়ে রোদে শুকোতে দিয়েছে। একটা মস্ত তোয়ালে জড়িয়ে বসে আছে বারান্দার বেতের চেয়ারে। দু কাপ চা খেয়েছে সে। শরীর বা মনের অস্থিরতার কোনো উপশম ঘটেনি।

সমীরণের বাগানবাড়িটা মোটামুটি ভাবে ফুর্তিরই জায়গা। সমীরণ নিজে তার মেয়েমানুষদের নিয়ে এখানে আসে মাঝে মাঝে। সুতরাং এখানে একটি বার আছে। অংশু মদ খায় না। সে আর রাণু এসে বড়োজোর চা বা কফি খেয়েছে, মুরগির ঝোল দিয়ে ভাত সেঁটেছে, তারপর একটা শোওয়ার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করেছে। সেই আসঙ্গই ছিল মদ।

আজ দু কাপ চায়ের পরও তার অন্য কিছু প্রয়োজন বলে মনে হল।

অংশু ডাকল, বিশু।

বিশু এলে বলল, কী আছে তোমাদের বলো তো! হুইস্কি বা ব্র্যাণ্ডি!

সব আছে।

একটু ব্র্যাণ্ডি দাও তো। সোডা মিশিয়ে কিন্তু।

বিশু চলে গেল। অংশু পাখির ডাক শুনতে লাগল। পাখি, অনেক পাখি।

বারান্দার সামনেই একটা ঢ্যাঙা লোহার ফ্রেমে শেকল বাঁধা একটা দোলনা ঝুলে আছে। তারা দুজনে--অর্থাৎ অংশু আর রাণু যে দোলনায় চড়ত তা নয়। তবে মাঝে মাঝে রাণু গিয়ে বসত ওখানে। সে বসত পা মুড়ে। হাতে থাকত স্কেচের প্যাড আর পেনসিল। অনেক পাখির স্কেচ করেছিল।

ওর ব্যাগটা কোথায় গেল? ভেবে অংশু হঠাৎ সোজা হয়ে বসে। তারপর ভাবে, যেখানেই থাক তাতে কী আর যায় আসে? ভেবে ফের গা ছেড়ে দিল সে।

ব্র্যাণ্ডিতে প্রথম চুমুক দিয়ে তার খুব ভালো লাগল না। এর আগে এক আধবার সে সামান্য খেয়েছে। কোনোবারই ভালো লাগেনি বলে অভ্যাস করেনি। আজ ভালো না লাগা

সত্ত্বেও সে ধীরে ধীরে, জোর করে পুরোটা খেয়ে নিতে পারল। বেশি নয় অবশ্য। এক পেগ হবে।

মাথাটা একটু কেমন লাগছে কি?

অংশু চোখ বুজে বসে থাকে অনেকক্ষণ।

খাবেন না স্যার! লাঞ্চ রেডি।

অংশু একটু চমকে ওঠে। সামান্য সেই চমকে শরীরটা নড়তেই কোমর থেকে ব্যথাটা চিড়িক দিয়ে উঠে আসে মেরুদণ্ড বেয়ে। স্পাইনাল কর্ডে যদি লেগে থাকে তবে ভয় রয়ে গেল। ঘাড়ের দিকেও একটা ব্যথা মাথাচাড়া দিচ্ছে। যদি স্পণ্ডিলাইটিসের মতো কলার নিতে হয়?

আজ স্যার দিদিমণি এলেন না?

ডাইনিং হল-এর দিকে যেতে যেতে অংশু বলল, না।

আপনি কি স্যার অসুস্থ?

অংশু একটা শ্বাস ফেলে বলল, একটু চোট হয়েছে। তেমন কিছু নয়।

গাড়িও আনেননি আজ স্যার।

সার্ভিসিং-এ গেছে।

এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে অংশুর রাগ হচ্ছিল না। কারণ, এসব সৌজন্যমূলক প্রশ্ন খুবই প্রাসঙ্গিক। বিশু তো আর জেরা করছে না। জবাব দেওয়াই উচিত। চেপে গেলে সন্দেহের বীজ বপন করা হবে।

অংশু প্রকৃত মুশকিলে পড়ল খেতে বসে। চমৎকার সরু চালের সাদা গরম ভাত, কাঞ্চনবর্ণ মুরগির কারী, ধোঁয়া ওঠা ডাল, মুচমুচে আলু ভাজা, মাছের ফ্রাই, চাটনি দেখে আজ তার বারবার ওয়াক আসছিল। এতক্ষণে রাণুকে কাটা ছেঁড়া করা হচ্ছে কি? নাকি ঠাণ্ডা ঘরে ফেলে রেখেছে। ওর সৎকারেরই বা কী হবে? কে এসে নেবে ডেডবডি? ওর

স্বামী? কিন্তু ওই বডির কিছু দায়িত্ব তো অংশুরও আছে। অংশু তো কম ভোগ করেনি ওই শরীর, যতদিন জ্যান্ত ছিল।

অংশু বিস্তর নাড়াঘাঁটা করে সব ফেলে ছড়িয়ে উঠে পড়ল।

খেলেন না স্যার?

আজ পারছি না। একটা পান আনো তো বিশু। জর্দা দিয়ে।

এসব খাওয়াদাওয়া ইত্যাদির অ্যারেঞ্জমেন্টের জন্য প্রতি রবিবার অংশুকে পঞ্চাশটা করে টাকা দিতে হয়। আজ আবার এক পেগ মদের দাম আছে। খরচটা আপাতত বেঁচে যাচ্ছে অংশুর। সামনের রবিবার সে অবশ্যই আসছে না।

বারান্দায় যেতে গিয়েই হলঘরের টেলিফোনটা নজরে পড়ল তার। একটু থমকাল সে। তাদের কলকাতার বাড়িতেও টেলিফোন আছে। কথা বলবে কি, একটু ইতস্তত করে অংশু। তারপর হঠাৎ সিদ্ধান্ত নেয়, বলবে। বলাই উচিত। ফিরলে সকলের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দুর্ঘটনার কথা বলতে তার ভীষণ অস্বস্তি হবে। মুখ না দেখেই বলে দেওয়া ভালো। বলতে যখন হবেই।

কিছুক্ষণের চেষ্টায় সে বাড়ির লাইন পেল। ধরল তার বোন রীতা।

শোন, আজ একটা বিচ্ছিরি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে।

অ্যাক্সিডেন্ট--বলে রীতা একটা আর্তনাদ করে উঠল ওধারে।

শোন, ডোন্ট বি নারভাস। আমার কিছু হয়নি।

কিছু হয়নি?

আমার কিছু হয়নি, তবে গাড়িটা গেছে। আর.....

আর কী?

আমার সঙ্গে আমার একজন কলিগ ছিল। তার অবস্থা ভীষণ খারাপ।

বাঁচবে না?

বোধহয় না।

সে কী?

চেঁচাস না। ঠাণ্ডা হয়ে শোন। আমি ব্যাণ্ডেল থেকে কথা বলছি।

ব্যাণ্ডেল থেকে? ব্যাণ্ডেল থেকে কেন? তুমি তো প্ল্যান্টে গিয়েছিলে।

হ্যাঁ। প্ল্যান্টেই ভদ্রমহিলা ধরলেন আমাকে। ব্যাণ্ডেলে ওঁর কে একজন আত্মীয় থাকেন, গুরুতর অসুস্থ। আমাকে একটু পৌঁছে দিতে বললেন।

ভদ্রমহিলা! কে গো?

আমাদের পাবলিসিটি অফিসার। রাণু সরকার।

তুমি ব্যাণ্ডেল গেলে পৌঁছে দিতে?

কী আর করব। ট্রেনের নাকি আজ কি সব গণ্ডগোল ছিল হাওড়ায়, তাই।

ট্রেনের গণ্ডগোল! তাহলে কী হবে। মা আর বউদি যে বড়দার সঙ্গে তারকেশ্বর গেল।

তারকেশ্বর। ও গড! অংশু হাল ছেড়ে দিল প্রায়।

কী বলছ?

অংশু মনে মনে নিজেকে বলল, ইডিয়ট, এর চেয়ে ঢের বেশি চক্করে পড়েও দুনিয়ার চালাক লোকেরা বেরিয়ে আসে। তুমি কি গাড়ল? চালাও, চালিয়ে যাও।

অংশু একটু ধীর স্বরে বলল, ট্রেনের গণ্ডগোল ছিল কি না তা তো আমার জানার কথা নয়। ভদ্রমহিলা বলছিলেন, তাই ধরে নিয়েছি আছে।

ব্যাণ্ডেলে কোথায় আছো তুমি এখন? কোথা থেকে কথা বলছ?

অংশু এত মিথ্যেকথা একসঙ্গে জীবনে বলেনি। একটু ঢোঁক গিলে বলল, হাসপাতালের কাছ থেকে।

ভদ্রমহিলার কি রকম লেগেছে?

মাথাটা থেঁতলে গেছে।

উঃ মা গো।

একটু চুপ করে থেকে রীতা বলল, কী হয়েছিল মেজদা?

লরি। একটা লরি এসে মেরেছিল বাঁ দিকে।

বাঁচার কোনো চানস নেই?

না।

গাড়িটা?

গেছে। একদম গেছে।

তুমি তাহলে কী করে ফিরবে?

দেখছি। ফেরার জন্য চিন্তা নেই। পারব।

শোনো মেজদা, ছোড়দা একটু আড্ডা মারতে বেরিয়েছে সকালে। ও ফিরলে তোমাকে গিয়ে তুলে আনবে। ও ওর গাড়ি নিয়েই বেরিয়েছে। নইলে আমিই চলে যেতাম--

না, তার দরকার নেই।

বাবাকে বলব তো?

বলিস। তবে আগে বলিস যে আমার কিছু হয়নি।

সত্যিই হয়নি তো?

হলে কি আর ফোন করতে পারতাম?

তুমি কখন ফিরবে?

রাণুর একটা ভালোমন্দ খবর পেলেই। ছাড়ছি। ভাবিস না।

তুমি কিন্তু তাড়াতাড়ি এসো।

অংশু ফোন রেখে দিল। শোওয়ার ঘরে এসে সে দরজা বন্ধ করে বিছানায় গড়িয়ে পড়ে। শরীরের ভার আর বহন করা যাচ্ছে না।

বিছানাটা নরম ফোম রবারের। ভারি নরম। এই বিছানাতেই সে আর রাণু--। কিন্তু রাণুর স্মৃতি তাকে একটুও তাড়া করছে না। তবে এতক্ষণে দুর্ঘটনার পুরো ভয়াবহতা সে একা ঘরে স্মরণ করতে পারল। ওইরকম ভাবে চুরমার হয়ে-যাওয়া একটা গাড়ির ভিতরে থেকেও কী করে সে বেঁচে গেল সেটা এখনও ভেবে পাচ্ছে না সে। বাঁচলেও এমন আস্ত অবস্থায় তো কিছুতেই নয় তবু আশ্চর্য কিছু ব্যথা-বেদনা নিয়ে সে বেঁচেই আছে। ভাবতেই শিউরে উঠল সে। তার শরীর থেকে রক্তপাতও হয়েছে সামান্য। মাত্র চার জায়গায় ছড়ে বা চিরে গেছে, জামাকাপড় অবশ্য ছিঁড়েছে কিন্তু তা ব্যবহারের অযোগ্য নয়। এত বড়ো একটা অ্যাক্সিডেন্ট যাতে রাণু তৎক্ষণাৎ মারা গেলে, ফিয়াটটা হয়ে গেল খণ্ড খণ্ড, তাতে পড়েও সে এমন ফুলবাবুটির মতো অক্ষত, অনাহত রয়ে গেল কেন?

ক'দিন আগেই রিপ্লর 'বিলিভ ইট অর নট'-এ সে পড়েছিল একজন লোক মটরগাড়িতে লেভেল ক্রসিং পার হওয়ার সময় একটা ট্রেন এসে সেটার ওপর পড়ে এবং প্রায় ছশো মিটার মোটরগাড়িটাকে থেঁতলাতে থেঁতলাতে পিষে দলা পাকিয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলে। আশ্চর্য এই যে মোটরচালক সামান্য কিছু কাটা ছেঁড়া নিয়ে তা সত্ত্বেও দিব্যি বেঁচে গিয়েছিল, হাসপাতালে পর্যন্ত ভর্তি হতে হয়নি। অংশুর ব্যাপারটাও তাই নয় কি?

এ বাড়িতে যে এত পাখি ডাকে তা আগে কখনো লক্ষ করেনি অংশু। আজ সঙ্গে রাণু নেই বলেই বোধহয় করল। পাখিদের গণ্ডগোলেই বোধহয় তার ঘুম এল না। শরৎকালের দিব্যি মনোরম আবহাওয়াটি ছিল আজ। ভারহীন কিছু মেঘ পায়চারি করে ফিরছে আকাশে। এবার বাদলাটা গেছে খুব। তাই চারিদিকটা ধোয়া মোছা চমৎকার। কিন্তু এমন মনোরম আবহাওয়া পেয়েও তার ঘুম এল না এক ফোঁটা। অবশ্য তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। পেটে ভাত পড়েনি, রাণু মারা গেছে, ঘুম আসার কথাও তো নয়। তবু চুপচাপ চোখ বুজে অংশু পাখিদের গণ্ডগোল শুনতে লাগল।

ঘুম তো নয়ই, একে বিশ্রামও বলে না। মন প্রশান্ত না থাকলে বিশ্রাম ব্যাপারটাও একটা শক্ত ব্যায়াম মাত্র। এই বিশ্রামের ব্যায়ামটা তাকে করতে হচ্ছে একটাই মাত্র কারণে। তার প্যান্ট এখনও শুকোয়নি। না শুকোলে বেরোবে কী করে?

নিজের ফিয়াট গাড়িটার কথা শুয়ে শুয়ে ভাবল অংশু। সেকেণ্ড হ্যাণ্ড কিন্তু চমৎকার অবস্থায় ছিল কেনার সময়। তার হাতে সেট হয়ে গিয়েছিল। ইন্সিওর করা আছে, কিছু টাকা ক্ষতিপূরণ পেয়ে যাবে অংশু। তবে গাড়িটা তো আর ফিরবে না। পার্টসগুলো চুরি হয়ে যাবে অ্যাক্সিডেন্ট স্পট থেকে। চাকা, ব্যাটারি।

অংশু ফের উঠে হলঘরে আসে। খুবই কষ্টে। তারপর থানায় ফোন করে।

আপনারা অ্যাক্সিডেন্ট স্পট-এ কোনো পাহারা রেখেছেন?

না স্যার।

একটু পাহারা রাখলে ভালো হত না? পার্টস চুরি যাবে যে!

আমাদের লোক বড্ড কম।

তাহলে?

কিছু করার নেই স্যার। চুরি যাওয়ার হলে এতক্ষণে হয়ে গেছে।

হোপলেস। বলে অংশু ফোন রেখে দেয়।

ট্রাউজার এখনো শুকোয়নি। কোমরের কাছে বেশ ভেজা। তবু অংশু প্যান্ট পরে নেয়, জামা গায়ে দেয়, বিশুকে একটা রিকশা আনতে বলে বারান্দায় বসে পাখির ডাক শোনে।

রাত আটটা নাগাদ যখন বাড়ি ফিরল অংশু তখন সে অনেকটাই বিপর্যস্ত, বিভ্রান্ত, হা-ক্লান্ত। তবে বিপর্যয়ের ভাবটা সে ইচ্ছে করেই একটু বাড়িয়ে তুলেছিল। যাতে বেশি প্রশ্নের জবাব দিতে না হয়।

বাইরের ঘরেই তার জন্য অপেক্ষা করছিল সবাই। পারিবারিক ডাক্তারও তৈরি হয়েছিলেন। সে বাড়িতে পা দেওয়ামাত্র মা এসে তাকে প্রথম ধরল।

একটি প্রশ্নেরই জবাব দিতে হল তাকে।

মেয়েটা কি মারা গেছে?

হ্যাঁ।

ইস।

ডাক্তার তাকে ঘুমের ওষুধ দিলেন, নাড়ি টাড়ি দেখলেন একটু। তারপর ঘুমের হাতে ছেড়ে দিলেন।

অংশু ঘুমলো। প্রচণ্ড গভীর টানা ঘুম। পরের দিনটাও পড়ে থাকতে হল বিছানায়। মাঝে মাঝে অফিস এবং থানা থেকে ফোন এল বাড়িতে। ভাগ্য ভালো যে, তাকে ফোন ধরতে হল না। সে অসুস্থ, শয্যাগত এবং আণ্ডার সেডেশন, সুতরাং জবাব দেওয়ার দায় নেই। বাড়ির লোকেরা সারাদিন প্রায় নিঃশব্দে রইল।

কিন্তু এই অবস্থা তো স্থায়ী হবে না। তাকে জাগতে হবে এবং মুখোমুখি হতে হবে সকলের। অনেক প্রশ্ন আছে ওদের। সঙ্গত প্রশ্ন, বিপজ্জনক প্রশ্ন। প্রশ্ন করবে পুলিশ, প্রশ্ন করবে অফিসের সহকর্মীরা। একটা নিটোল, ছিদ্রহীন মিথ্যে গল্প বানানো খুব সহজ হবে না। কোনো মিথ্যেই তো ছিদ্রহীন নয়।

চোখ খুলতেই লজ্জা করছিল অংশুর। আলপনার মুখ শুকনো, চোখ সজল। মুখ দেখে মনে হয়, সারা রাত তার পাশে বসে জেগে কাটিয়েছে। তার ছোটো ভাই অ্যাক্সিডেন্ট স্পট থেকে ঘুরে এসেছে, এটাও সে টুকরোটাকরা কথা থেকে টের পেল। থানা পুলিশ ইনসুরেন্স সবই সে সামলাচ্ছে।

পরের রাত্রিটাও গভীর ঘুমে কেটে গেল অংশুর। জাগল বেলায়। আলপনা তার গায়ে মৃদু নাড়া দিয়ে বলল, তোমার অফিস থেকে ফোন এসেছে। জরুরি দরকার।

কে ফোন করেছে?

ডিরেকটর নিজে। আধ ঘন্টা পর আবার ফোন করবে।

অংশু চুপচাপ চেয়ে রইল। আস্তে আস্তে পর্দা উঠছে রঙ্গমঞ্চের। হাজার জোড়া চোখ তার দিকে চেয়ে থাকবে। সে রঙ্গমঞ্চে একা।

আধ ঘন্টা পরই ফোনটা এল।

অংশু?

বলছি।

কেমন আছো?

একটু ভালো।

বেলা বারোটায় একবার অফিসে আসতে পারবে?

পারব।

আজ মিসেস সরকারের ডেডবডি রিলিজ করেছে সকালে। সোজা অফিসে আসছে। এখান থেকেই ক্রিমেশনে নিয়ে যাবে।

অফিসের সিঁড়িতে তারা নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে। সামনে লরি, লরির ওপর খাটে রাণু শুয়ে আছে। অফিস থেকে বিশাল একটা টায়ারের আকৃতির মালা দেওয়া হয়েছে তার বুকের উপর।

প্রতীকটা চমৎকার। এক লরি মেরে দিয়ে গেছে রাণুকে। আর এক লরির ওপর এখন সে শোওয়া। বুকে ফুলের চাকা। চমৎকার।

এতগুলো লোকের এই সমবেত নিস্তব্ধতা ভারি অস্বস্তিকর। অংশুর অল্প অল্প ঘাম হচ্ছে। লরিটা চলে যাচ্ছে না কেন? কেন চলে যাচ্ছে না?

ডিরেকটর চাপা স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, ফিলিং সিক অংশু?

একটু।

স্বাভাবিক। ইট ওয়াজ এ গ্রেট শক। মিসেস সরকারের হাজব্যাণ্ড আর বাচ্চাকে আনতে গাড়ি পাঠানো হয়েছে। দে আর বিয়িং লেট।

অংশু বুকের দুটো বোতাম খুলে ফেলল। স্ট্যানস পালটাল পায়ের। তারপর একটা গাড়ি এসে থামল লরিটার পেছনে।

অংশু স্থির হয়ে এবার। পিছনের দরজাটা খুলে একজন রোগা ও পাগলাটে চেহারার লোক নেমে আসে। পরনে পায়জামা, হ্যাণ্ডলুমের খয়েরি পাঞ্জাবি। চুল বড়ো বড়ো। সামান্য দাড়ি আছে। চুল দাড়ি কাঁচাপাকা, কিন্তু লোকটার বয়স খুব বেশি নয়, পঁয়ত্রিশ

টয়ত্রিশ হবে। অংশুর বাঁ পাশ থেকে কে যেন চাপা স্বরে বলে উঠল, এ রাসক্যাল। ডাউনরাইট রাসক্যাল।

লোকটার পিছনে একটা বাচ্চা নেমে এল। নীল প্যান্ট, সাদা জামা। বেশ রোগা। বছর পাঁচেকের বেশি বয়স নয়। মুখটায় কেমন ভ্যাবাচ্যাকা ভাব। চোখে ভয়।

নিস্তব্ধটা ভাঙল আচমকা। নিখুঁত একটা বিদ্যুৎগতি ছুঁচের মতো ঘুরে বেড়াতে লাগল। কানে হাতচাপা দিয়ে অংশু একটা কাতর শব্দ করল, উঃ!

ছেলেটাকে কে যেন লরির উপর তুলে দিয়েছে। রোগা, হাড্ডিসার, হতভম্ব ছেলেটা আর কোনো শব্দ বা কথা খুঁজে পাচ্ছে না। শুধু তীক্ষ্ণ পাখির স্বরে ডাকছে, মা... মা...মা... মা...

অংশু ধীরে ধীরে বসে পড়তে থাকে। দুহাতে প্রাণপণে বন্ধ করে থাকতে চেষ্টা করে শ্রবণ। কিন্তু সব প্রতিরোধ ভেঙে সেই তীক্ষ্ণ পাখির ডাক তার ভিতরে সূচীমুখ হয়ে ঢুকে যায়। লণ্ডভণ্ড করে দিতে থাকে তার অভ্যন্তর। মা... মা.. মা... মা...

অংশু মাথা নাড়ে। শব্দটা ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করে সে। তবু দম আটকে আসতে থাকে। সে হাত তুলে বলতে চেষ্টা করে, ডেকো না! ওভাবে ডেকো না! আমি পারছি না...

কিন্তু কিছুই উচ্চারণ করতে পারে না অংশু। দু হাতে কান চেপে সে অভিভূতের মতো চেয়ে থাকে। একটা শব্দের বুলেট বারবার এসে বিদ্ধ করে তাকে। ঝাঁঝরা করে দিতে থাকে।

দৌড়

ভোরবেলা হরিশংকরের কাকাতুয়াটা ডাকছিল নিমাই ওঠো, নিমাই ওঠো,--পাখিরা যে কি করে টের পায় ভোর হচ্ছে। এখনও আকাশ পর্যন্ত গভীর অন্ধকারে ডুবে আছে চারদিক, শুধু এক সুন্দর পাতলা বাতাস বইছে পুবের আকাশে, আকাশের গাঢ় নীলে ময়ূরের পেখমের মধ্যে কিছু বেশি উজ্জ্বলতা, কুয়াশাও আছে। মর্ত্যের খুব কাছাকাছি দু একজন দেবতা বা পরি এসে যান এক সময়ে, কবীর তো দেখেছে রায়দিঘিতে ভোরবেলা স্নান করে উড়ে গেল দুটি পরি দেবযানে। হাঁটতে হাঁটতে আনমনা কোন দেবতা একবার পথ ভুল করে এসে পড়েন পালচৌধুরীদের বাগানে। বুড়ি কমললতা ফুল চোরের ভয়ে স্থলপদ্ম তুলে রাখছিলেন বাগান থেকে। সেই সময়ে একদম মুখোমুখি দেখা তার সঙ্গে। সাদা চাদরে ঢাকা শরীর, মুখে কি স্বর্গীয় আভা। বিড় বিড় করে বলেছিলেন, স্বর্গের পথটা কি এই দিকে। খড়ম পরা একজোড়া পায়ের শব্দ রায়দিঘির পাশ দিয়ে রাস্তা বেয়ে দৌড়োয় মাঠের দিকে। খুব জোরে নয় অনেকক্ষণ ধরে সেই পদশব্দ বাজতে থাকে আধোজাগা কিশোরীর হৃদপিণ্ডে। সোহাগ জানে দ্রুত পায়ে পাগল কুন্দন ছাড়া আর কেউ দৌড়োয় না। পাগল? না হলে একে কেউ মানবে কেন? দৌড় কুন্দনের পেশা। দৌড়তে দৌড়তে কুন্দন কাকাতুয়ার দার্শনিক ডাক শোনে, নিমাই ওঠো, নিমাই ওঠো, নিমাই ওঠো। জলে ঘাই দেয় মাছ। গাছ থেকে শিউলি ও শিশির পড়তে থাকে টুকটাক। এই ভোরবেলা পৃথিবীর উপোসি শিশুরাও ঘুমোয়। একটিও পরমাণু অস্ত্র থাকে না জাগ্রত। মরুভূমি থাকে শীতল হয়ে। এই সময় কোথাও নেই কোনো মাতাল, খুনি, বেশ্যা, শুধু দেবলোকের আলো, স্বর্গের গন্ধ। দেবলোকে বোধহয় ভোর ছাড়া অন্য বেলা নেই। সেখানে তো দিনরাত নেই, আছে শুধু ভোর। কুন্দন যখন দৌড়োয় তখন সে আর সে থাকে না। দৌড়তে দৌড়তে সে হয়ে যায় এক গতিময় আনন্দ শুধুই আনন্দ। আর কিছু নয়। কুন্দন যখন এই গঞ্জে এসে জুটল তখন

তার না আছে চাল, না আছে চুলো। দুনিয়ায় আপনজন বলেও কেউ নেই। গরিব পুরুতের ঘরে জন্মেছিল। তারপর কায়ক্লেশে কিছু বড়ো হয়ে বুঝলো, দুনিয়াটা বড়ো কঠিন ঠাঁই। বারো বছর বয়সে দুই বন্ধু মিলে বাড়ি থেকে ভেগে পড়ল। মাঠে ময়দানে, লোকের বাড়ির বারান্দায়, হাটখোলার নীচে রাত কাটাত দিন কাটাত, ভিক্ষে সিক্ষে বা ছোটোখাটো মজুরি করে। তবে এক জায়গায় নয়। চরৈবেতি বলে স্থানে থেকে স্থানান্তরে। এইভাবে বাংলা বিহার উড়িষ্যা দেখে নেওয়া গেল। বন্ধুটি জমে পড়ল মধ্যপ্রদেশে। এক রেল স্টেশনের বেঞ্চে শুয়ে ছিল দুজনে। মাঝরাতে কিছু লোক পুলিশ নিয়ে এসে তুলল তাদের। বন্ধুটির বাবা বেশ প্রভাবশালী লোক। তিনি ছেলেকে ফেরত নিয়ে নিলেন। কিন্তু কুন্দনকে কেউ ফেরত চায়নি বলে তাকে ছেড়ে দেওয়া হল। তখন আর একা একা ভালো লাগত না। ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়ল এই গঞ্জে। নদীর ধারে একটা একচালার নীচে চক্কোত্তি মশাই বসতেন। দুখানা চোখ যেন বুকের ভিতর অবধি দেখতে পায়। আর কী তেজ সেই দুচোখে। কিছু বললেন না। শুধু কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। আর সেই দুই চোখের ভিতর দিয়ে কুন্দন যেন স্বর্গ মর্ত্য, পাতাল অবধি দেখতে পেল। তা চক্কোত্তি মশাইয়ের কাজই লোক নিয়ে। যত মানুষ তত তার আনন্দ। আর মানুষ আসেও তার কাছে ঝেঁটিয়ে। যত ঝামেলা চাপিয়ে দেয় তার মাথায় আর তিনিও হাসিমুখে সব দায় কাঁধে নেন। কুন্দনকে দ্বিতীয় দিন ডেকে বললেন, এখানে কিন্তু খাট জুটবে না, শুতে হলে খড়ের বিছানায়। ভূতের বেগার খাটতে হবে। পারবি?

পারব।

তা হলে লেগে থাক।

কুন্দন লেগে রইল।

সুখ কেমন, বিলাসব্যসন কেমন তা কুন্দন জানে না! তবে মাঝে মাঝে তার বুকের মধ্যে এমন উথাল পাতাল আনন্দ ঠেলে উঠে যে সে পাগল পাগল হয়ে যায়। চক্কোত্তি মশাই ঠিক টের পান। মাঝ রাত্তিরে যখন সে জেগে বসে আনচান করে তখন চকোত্তি মশাই এসে

বলেন, আটে কাঠে দড় তো ঘোড়ার উপর চড়ো। একটু আহ্লাদ হলেই যে বড়ো উঠে পড়িস। ও রকম করতে নেই। লেগে থাকবি। আরও কত কি হবে।

কুন্দনের কোনোকালেই ভবিষ্যৎ চিন্তা ছিল না। যেমন আছে তেমনি সে ভালো থাকে সব সময়। এই যে দৌড়োয় এও একদিন চক্কোত্তি মশাই বলে দিয়েছিলেন। পালাতে পালাতে স্বভাবটাই পালাই পালাই হয়ে গেছে। এক জায়গায় বাঁধা পড়লেই মনটা আঁকুপাঁকু করে। একদিন চক্কোত্তি মশাই ডেকে বললেন, ওরে, ভোরবেলা অন্ধকার থাকতে উঠে জপ সেরে উঠে পড়বি, যতদূর অবধি পারবি ভোঁ ভোঁ দৌড় লাগাবি। ওভাবেই পালানোর ইচ্ছাটা চলে যাবে। আর পালাবি বা কোথায় বাবা, সব জায়গাতেই তিনি। কুন্দন তাই রাত তিনটেয় উঠে জপ সারে। তারপর দৌড়াতে লাগে। কী যে আনন্দ। কী যে নির্ভার। আস্তে আস্তে তার শরীর 'নেই' হয়ে যায়। থাকে শুধু গতি, শুধু আনন্দ। বুড়ো তেঁতুলগাছটা পেরিয়ে পাল চৌধুরীদের মস্ত ভাঙা বাড়ির ঘের পাঁচিলের পাশ ঘেঁষে দৌড়োতে দৌড়োতে প্রায়ই সে এক অদ্ভুত গন্ধ পায়। বুড়ি কমললতা এই অন্ধকারে রোজ বাগানে ঘুরে বেড়োন, ওরে ও কুন্দন দাঁড়া বাবা, একটু দাঁড়া।

কি ঠাকুমা?

সেই যে একদিন দেখলুম, কই, আর তো দেখি না তাকে, তুই দেখিস?

না ঠাকুমা, আমি পাপতাপী মানুষ।

চক্কোত্তি মশাইকে একটু বলবি? আমার যে বড়ো দরকার তাকে।

কীসের দরকার?

কত কথা জেনে নেওয়ার আছে। রাঙা গাইটা দু বছর বিয়োয়নি, নারকোলগাছটা মরকুটে মেরে গেল, আমার নাতি গদাই সেই যে শনপুরে গেল, আজও বদলি হয়ে আসতে পারল না সে।

ওঃ ঠাকুমা, ভগবানকে পেলে ও সব জিজ্ঞেস করবে?

রামোঃ। কেন রে বিটলে রামো কীসের? সংসারটা কি ভগবানই মাথায় চাপিয়ে দেয়নি? এই সব কথা তার সনে তুলব না তো কি? ওসব তুই বুঝবি না, চক্কোত্তি মশাইকে বলিস সে বুঝবে।

বলব ঠাকুমা। আর শোনো। বলব গো, আমার দৌড়টা যে মাটি হচ্ছে।

বিটলে ছোঁড়া, অত দৌড়ঝাঁপ কীসের রে? আলায় সালায় ঘুরিস ঘারিস যদি সেই তেনার দেখা পেয়ে যাস, তবে বলিস কিন্তু, পাল চৌধুরীদের বাগানে যেন একবারটি সময় করে আসে বুঝলি? গায়ে সাদা চাদর ছিল। বড়ো বড়ো চোখ ছিল, আর ভারি একটা মিষ্টি গন্ধ। বলবি তো।

আমি কি আর দেখবো ঠাকুমা? দেখলে বলব।

হরিশঙ্কর তার কাকাতুয়াটাকে কালী দুর্গার নাম শেখায়নি, ভালো ভালো কথা কিছু শেখায়নি কিছু, এক বুলি, নিমাই ওঠো... নিমাই হল হরিশঙ্করের ছেলে। তা এগঞ্জে নিমাইয়ের মতো ছেলে আর নেই। চুরি, ডাকাতি, খুন, রাহাজানি তার হাতের ময়লা, তার উপর গাঁজা, চরস, তাড়ি কিছু বাদ নেই। সারারাত নানা কুকর্ম করে এ ভোর রাতে নিমাই বিছানা নেয়। হরিশঙ্কর বুড়ো হচ্ছে। তার ছেলে একবার জীবনে এই ভোরবেলার সৌন্দর্য একটু দেখুক। একটু বসে ভগবানের নাম নিক। নিজে ডাকতে সাহস হয় না বলে কাকাতুয়াকে শিখিয়েছে। সেই হরিশঙ্কর জামতলায় খাটিয়ার উপর বসে এই ভোরবেলায় তুলসীদাসের মানস পড়ছে। রামচরিতমানস পড়তে পড়তে কতবার যে সে কেঁদে ভাসায় তার হিসাব নেই। কিন্তু কুন্দন ভেবে দেখেছে এই ভোরবেলার আধো অন্ধকারে হরিশঙ্কর তার চালসে ধরা চোখে নিশ্চয় বইয়ের অক্ষর দেখতে পায় না। সে বই খুলে মুখস্থ বলে যায়। কুন্দন ভাই। দাঁড়াও। তোমার নিমাই উঠল হরিশঙ্কর দাদা? না ভাই, সে উঠবে বেলা বারোটায়। আমার যেমন কপাল। তুমি রামচন্দ্রকে এত ভালোবাসো? তোমার চিন্তা কীসের? হরিশঙ্কর মাথা নেড়ে বলে, অনেক পাপ। মেলা পাপ জমা হয়ে গেছে যে আমার। সুদের কারবার। হবে না পাপ? চক্কোত্তিবাবুকে বলো, হরিঙ্কর বড়ো পাপী আর এই আধুলিটা নিয়ে যাও, বাবার তামাক কিনে নিও। একটু হাসে কুন্দন। আধুলিটা নিয়ে ফের

দৌড়োতে থাকে। মোয়াজের জীবনে কোনো দুঃখ ছিল না কোনোদিন। এই যে চারপাশের দিনরাত্রির আকাশ, আলো, লোকজন, জন্ম, মৃত্যু, শোক, দুঃখ, এই সবই তার কাছে এক অফুরান অভিজ্ঞতা। দুটি চোখ মেলে সে সব দেখে, দুটো কান পেতে সে সব শোনে, চোখ বুজে সে কত কি ভাবে। জীবনে দুঃখের কোনো ছায়া নেই। কিন্তু এবার বুঝি আসে। এবার বুঝি সে কিছুতেই জীবনের একটা মস্ত ফাঁড়া কাটাতে পারে না। এই ভোরে সে খোলা জানালার পাশে এসে দাঁড়ায়। কেডস পায়, ধুতি আর চাদর পরা কুন্দন পাগল অন্ধকার থেকে এসে অন্ধকারে মিলিয়ে যায় ছায়ার মতো, এক লহমার জন্য শুধু দেখা যায়, লম্বা ও রোগা এক মূর্তিকে। সোহাগ ভাবে, দুঃখ নেই। তাই বলেই কি আর দুঃখ নেই। ভাত জোটে না, টগনা জোটে না। ভাঙা ঘরে জল পড়ে, পুজোয় নূতন কাপড় নেই, রূপটান নেই। তবু সত্যিকারের দুঃখ কিছু টের পায় না সোহাগ। বেশ আনন্দে ডগমগ হয়েই তো কেটে যায় তাদের দিন। তার বাবা যখন চাকুরি করত, অনেক টাকা মাইনে পেত, তখন অনেক দুঃখ ছিল। চাহিদা ছিল, সুখ ছিল, আহ্লাদ ছিল, বাবা যেই চাকরি ছেড়ে চক্কোত্তি মশাইয়ের জোয়াল কাঁধে নিল অমনি অভাব এল আর দুঃখ ঘুচলো। চক্কোত্তিমশাই বাবাকে বলেছিলেন, পরের কাজ মানেই নিজের কাজ। যত পর তত তুই, তত আমি। বাবা কি বুঝল কে জানে। কিন্তু সব ছেড়েছুড়ে দিল। মা প্রথম দিকে খুব রাগারাগি করত। আজকাল মা একদম মাটির মানুষ। ভোর থাকতে উঠে দশ হাতে অভাবের সংসার সামলায়। আগে কাজের লোক ছিল, তখন মার ব্যাধি সারত না। আজকাল ব্যাধি নেই, মুখ ভরা হাসি। রোজই ভোরবেলা গিয়ে চক্কোত্তি মশাইয়ের ঘরখানা ঝাঁট পাট দিয়ে আসে সোহাগ। আর রোজই চক্কোত্তি মশাই তার দিকে চেয়ে হাসি মুখে জিজ্ঞাসা করেন, কিরে, কিছু বলবি? কি আর বলবে সোহাগ। মাথা নেড়ে বলে, না। চক্কোত্তি মশাই গুড়ুক গুড়ুক তামাক খেতে খেতে বলে, যখন যা ইচ্ছা জাগে আমার কাছে এসে বলে খালাস হয়ে যাস। কথা লুকোতে বড়ো কষ্ট। বলার তো লোক নেই। যা বলতে সাধ যাবে, যা ছাপাতে ইচ্ছা যাবে সব বলে ফেলবি। হালকা লাগবে। সোহাগ অনেকক্ষণ ধরে দৌড়-পায়ের আওয়াজটা শুনল। আর মিলিয়ে দেখল, ঠিক ওইরকম তালে তালে তার বুকেও হৃদপিণ্ডের শব্দ হচ্ছে। এরকম কেন হয়? সোহাগ। ও সোহাগ। যাই মা। আঁধার থাকতেই তাদের দিন শুরু হয় আজকাল। আগে

কত বেলায় উঠত, গা ম্যাজ ম্যাজ করত, আলসেমি ধরত, ঘুম ছাড়তে চাইত না, চোখ থেকে আজকাল শরীর আর মন কত চনমনে থাকে। পুজোপাঠ সারতে সারতে শীতের রোদ উঠল কোমল আর লাবণ্যময়। ঠিক যেন শিউলি বোঁটার বন। বাবা বেরলো না কাজে, ঘরে ঘরে যাবে। কত কথা হবে। কত আলোচনা হবে। কত সমস্যার সমাধান, কত রোগের নিদান, কত অভাবের মোচন। চলবে সেই রাত পর্যন্ত। সোহাগ গরু ছাড়ল, গোয়াল পরিষ্কার করল, উঠোন নিকোলো, গাছে জল দিল। কাজের কি শেষ আছে। গাছপালা গরুবাছুর, কুকুর পাখি, সব প্রাণবন্ত। সবাই অপেক্ষা করে তার স্পর্শের জন্য, তার আদরটুকুর জন্য। এদের আগে চিনতোই না সোহাগ। আজকাল এ বাড়িতে যে কটা কাক আসে তাদের প্রত্যেকটাকে আলাদা করে চেনে সোহাগ। কেমন করে সে জড়িয়ে পড়ল চার পাশটার সঙ্গে।

এবার চক্কোত্তি মশাইয়ের ঘরটা সেরে আসি মা, মা বলল, বলিস, আমি একটু বেলায় যাব। বলব।

সোহাগ কাপড় ছাড়ল, চুল আঁচড়াল, টিপ পরল। চক্কোতি মশাই সব নিখুঁত চান। একটু ঢিলেমিও তার সহ্য হয় না। সকালের শীতে একটা সূতির চাদর গায়ে পথটুকু বেশ হেঁটে চলে এল।

ওরে মারে তোর শীত নেই? বলে চক্কোত্তি মশাই খুব দুলে দুলে বলল, হাসেন।

শীত কোথায় চক্কোত্তি মশাই, লাগছে না তো।

ওরে মারে? শীতে আমি দেখ কেমন থুপথুপে হয়ে গেছি।

তাহলে আংরা জ্বেলে দিই?

না, তাহলে আর শীতের আরাম কি?

তবে শীতের কথা বলেন কেন?

তেমন তেমন শীত লাগলে বসে জপ করিস, শীত কাটবে।

আপনি তো শুনি নামময়। সেটা কেমন চক্কোত্তি মশাই?

চক্কোত্তি মশাই দুলে দুলে হাসলেন। বললেন, সে যে কীরকম তা বোঝানো যায় না। ভিতরে যেন আর একভাগ কাঁপন বয়ে যায় শরীরে, তোরও হবে।

উঃ বাবা আমার তা হলে ভয় করবে।

ভয় কি রে? মন যত বস্তু ভাবে তত কম্পন কমে যায়। নামের উপর থাকবি, নামময় হয়ে থাকবি, বস্তু স্পর্শও করবে না।

একদিন জপে বসে যা ধপাস ধপাস শব্দ হয়েছিল না বুকের মধ্যে, ভয় খেয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিলাম।

ভয় কি রে? তুইও তো শব্দই। সৃষ্টির মূলেই তো এক শব্দ। দেখতো লাউ কাঁধে কে আসে। শীতল না?

কাঞ্চন ফুলের ঝোপের পাশ দিয়ে মোরামের বাঁকা রাস্তা। সে দিক থেকে আসছে যে, সে শীতলই বটে। রোগা, কালো, দাঁত উঁচু। পরনে এই শীতেও ধুতি আর একখানা গেঞ্জি। কাঁধে একখানা মাঝারি লাউ, চক্কোত্তি মশাই ভারি আহ্লাদে চেঁচিয়ে উঠলেন, জববর মাল এনেছিস তো। তোর গাছের বুঝি? শীতল এক গাল হেসে লাউটা নামিয়ে রেখে পেন্নাম ঠুকে বলল, আজ্ঞে।

তা কতগুলো হয়েছিল?

হয়েছিল মেলা।

চক্কোত্তি মশাই লাউটা দুহাতে তুলে ভারি আদর করে বললেন, ওরে আমার শীতলের লাউ রে, কত ভাগ্যি আমার, শেতল লাউ দিয়েছে। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে খুক খুক করে হাসল সোহাগ। তারপর বলল আহা চক্কোত্তি মশাই, লাউ বুঝি আপনাকে কেউ দেয় না। সবজি ঘরে এখনও চার পাঁচটি লাউ পড়ে আছে।

তা দেবে না কেন। মেলা দেয়। কিন্তু শীতল যে দিল এ হচ্ছে ওর দেওয়া। দিতে যে শেষ অবধি ইচ্ছে জাগল এটা কি কম কথা রে। গাছে লাউ হয়েছে মেলা। শীতল তার ছেলেপুলে

আর বউ মিলে খেয়ে খেয়ে অরুচি ধরেছে, তারপর একদিন হঠাৎ মনে পড়েছে। এবার একখানা চক্কোত্তি মশাইকে দিলে হয়। তাই না রে শীতল?

শীতল মাথা চুলকে লাজুক লাজুক হাসছিল। সোহাগ মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। গোবর জল গুলে ন্যাতা নিয়ে কাজে লেগে গেল। মনটা পড়ে রইল অন্যদিকে।

কবীরের কাছে এ পৃথিবীটা একেবারে আনকোরা নতুন। যে দিকে চায় সে দিকেই বিস্ময় আর বিস্ময়। কাক যে ছড়ানো মুড়ি ঠুকরে খায়, বেজি যে তুড় তুড় করে ছোটে, মাকড়সা যে শূন্যে ঝুলে থাকে, এ সবই তার কাছে বিশাল বিশাল ঘটনা। রেলগাড়ির মতো তাজ্জব জিনিস সে আর দেখেনি। আকাশে যে এরাপ্লেন ওড়ে সেটা নাকি পাখি নয়, তার পেটের মধ্যে মানুষ বসে থাকে, এ কি সত্যি হতে পারে? পাঁচ বছরের কবীরের মাথায় কোনো জিনিসই অসম্ভব মনে হয় না। সে পক্ষীরাজ ঘোড়া, ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমির কথা খুব বিশ্বাস করে। আর রাক্ষস খোক্কস তো আছেই রায়দিঘির ওপাশের জঙ্গলটায়, আর সন্ধে হলে তাদের উঠোনেও ভূত দাপাদাপি করে এসে। কুন্দন দাদাকে সে একবার জিজ্ঞেস করেছিল, রাক্ষসের সঙ্গে লড়াই লাগলে তুমি পারবে?

রোজ তো রাক্ষসের সঙ্গেই লড়াই করি।

যাঃ তুমি পারবে না। রাক্ষস তোমাকে বগলে চেপে রেখে দেবে।

কেন রে আমি কি থার্মোমিটার?

হিঃ হিঃ কী বলে, থার্মোমিটার।

বগলে চেপে ধরলে কী করব জানিস, এমন কাতুকুতু দেবো যে হাসতে হাসতে দমবন্ধ হয়ে মরে যাবে।

ইস। রাক্ষসের কী বড়ো হাত, কত বড়ো বড়ো দাঁত, আর তাল গাছের মতো লম্বা, তোমাকে খেয়েই তো ফেলবে।

অত সোজা নয় রে। রোজ তো রাক্ষসের সঙ্গে লড়াই করি। ধরে আছাড় মারি। চুলের মুঠি ধরে খুব ওঠবোস করাই।

ইঃ অত সোজা নয়।

তুই জানিস না। বড়ো হয়ে তোকেও কত রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। চারদিকে কত রাক্ষস ঘুরে বেড়োচ্ছে দেখবি। তারা কি তোকে ছাড়বে?

কামড়ে দেবে?

কামড়ায়ই তো, ভীষণ কামড়ায়। চল তোকে খালধার থেকে ঘুরিয়ে আনি। যাত্রার নৌকো এসেছে দেখিগে, যাই চল।

এটাতে খুব আনন্দ কবীরের। সে কাঁধে চড়ে বেড়াতে ভালোবাসে। বিশেষ করে কুন্দনের কাঁধ হলে তো কথাই নেই। রাতে যাত্রার আসর বসবে। রাবণবধ পালা। কবীর বায়না ধরল যাবে। মা কেবল বলে, না বাপু ওখানে ঘুমিয়ে পড়বি, কে পা মাড়িয়ে দেবে, মশা কামড়াবে, বার বার পেচ্ছাপ করতে যাবি। তুই পিসির কাছে শুয়ে ঘুমিয়ে থাক। কবীর জানে কান্নার মতো জিনিস নেই। কাঁদলে সব পাওয়া যায়। চড় চাপড় জোটে ঠিকই, কিন্তু বড়োরা শেষ অবধি হাল ছেড়ে বায়না মেটায়। শেষ অবধি বাবার কাঁধে চেপে গেলও কবীর। রাবণ রাজাকে শুধু একটা সিনে দেখতে পেয়েছিল, সাধুর বেশে সীতা হরণে এসেছে। তারপর হাতের মোয়াটা খেতে খেতে এমন ঘুম পেল। সে কী বলবে। তবে কবীর রাম রাবণের যুদ্ধটা স্বপ্নেই দেখে নিয়েছে। ওঃ সে যে কী ভীষণ যুদ্ধ রাবণের দশটা মুণ্ডু খ্যাঁচ খ্যাঁচ করে কেটে ফেলা হচ্ছে। আর রাবণ সেই মুণ্ডু কুড়িয়ে নিয়ে টুপির মতো পরে নিচ্ছে আর হ্যা হ্যা করে খুব হাসছে। কী কাণ্ড বাবা তুলসীর সঙ্গে বেলতলায় চোর-পুলিশ খেলতে গিয়েছিল কবীর। তখন রাক্ষস আর ভূত আর রেলগাড়ির অনেক গল্প হল দুজনে। তুলসী বলল, তার বাবা রাক্ষসকে দেখেছে? কোথায় রে?

বাবা তো রাতে ডিউটিতে যায়। হাতে লণ্ঠন থাকে। বাঁ হাতে টিফিনের বাক্স। রোজ একটা রাক্ষস টিফিনের লোভে বাবার পিছু নেয়। সেদিন বাবা পায়ের শব্দ পেয়ে ফিরে চাইতেই রাক্ষসটা কচুবনের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। লণ্ঠনের আলোয় বাবা কী দেখল জানিস?

কী? কুলোর মতো দুটি পা।

কবীরের মুখখানা কাচুমাচু হয়ে গেল। তবু গলায় জোর এনে বলল, জানিস, কুন্দনদার সঙ্গে রাক্ষসদের কুস্তি হয়

যাঃ কুন্দনদা পারবেই না।

পৃথিবী জায়গাটা যেমন ভালো তেমনি আবার ভয়ের। কত কী যে আছে। রাক্ষস, ভূত, ব্রহ্মদত্যি, ছেলেধরা। চক্কোত্তি মশাই যখন বিকেলবেলা গাছে জল দেন তখন কবীর একটা ছোট্ট কাটারি নিয়ে পিছু পিছু ঘোরে।

চক্কোত্তি মশাই, তুমি সব জানো?

কী জানবো রে?

সবাই বলে তুমি নাকি সব জানো।

দূর বোকা, আমি তো মুখ্যু সুখ্যু মানুষ। তোর কোন খবরটা দরকার?

আমার অনেক খবর দরকার। আচ্ছা, রাক্ষসের সঙ্গে কি কুন্দনদার কুস্তি হয়?

সে বলে বুঝি? তা হতে পারে।

তুমি রাক্ষসকে দেখেছো?

তা দেখতে চেষ্টা করলে দেখা যায়।

কামড়ায় না?

রাক্ষস ভালোও আছে, মন্দও আছে। রাক্ষস কি এক রকম রে? মানুষের যেমন ভালো আছে, মন্দও আছে।

রাক্ষসের আবার ভালো আছে না কি?

থাকবে না? না থাকলে চলে?

আমাকে রাক্ষস দেখাতে পারো?

তেমন চোখ যদি হয় তো দেখাতে পারি একদিন।

তেমন চোখ মানে কি?

এই যে ধর তোর দুটো চোখ, তুই কতদূর দেখতে পাস? কেন, ওই আকাশ অবধি।

বাঃ বেশ। ওই যে ডুমুর গাছে একটা ফিঙে নেচে বেড়াচ্ছে দেখতে পাচ্ছিস?

না তো। ডুমুর গাছ কোথায় বলো তো?

ওই যে বাবলা ঝোপটার ওদিকে।

ও বাবা, নাঃ কিছু দেখতে পাচ্ছি না। তুমি পাচ্ছ?

পাচ্ছি, তুইও পারবি। দূরের জিনিস দেখার চেষ্টা করবি। তবে হবে। এই যে তোর চার দিকের বাতাসে কত ছোট্ট ছোট্ট টুকুন টুকুন পোকা ঘুরে বেড়ায় তাদের দেখতে পাস?

না। চেষ্টা কর পারবি। চোখ কখনো হবে দূরবিন, কখনও অনুবীক্ষণ। কান হবে মাইক্রোফোনের মতো টনটনে। নাক হবে কুকুরের নাকের মতো। তবে না।

তা হলে রাক্ষস দেখতে পাবো?

কত কী পাবি। রাক্ষস, ভূত, প্রেত, জীবাণু, নক্ষত্র, সব।

তুমি ভূত দেখেছো?

কত কী দেখি।

আচ্ছা চক্কোত্তি, মশাই চাঁদে নাকি মানুষ আছে। বীরুদা বলছিল।

থাকবে না কেন। মানুষ বলিস মানুষ সত্তা বলিস সত্তা, আছে। সব জায়গাতেই আছে প্রাণের খেলা। প্রাণের প্রকাশ। আমাদের বুদ্ধি দিয়ে, চোখ দিয়ে, বিবেচনা দিয়ে সব বোঝা যায় না।

ঝারিতে গাছের গোড়ায় গোড়ায় জল ঢালতে ঢালতে কবীর সব শোনে। আছে তা Ë। ¯ আছে। সব আছে।

তোর কি কিছু বলার আছে রে কুন্দন?

আজ্ঞে আছে চক্কোত্তি মশাই। আমার অনেক কথা।

কী কথা রে?

আজকাল জপে বসলে কেমন যেন একটা হয়। মনটা আটকে থাকে। উঁচুতে নীচুতে যায় না।

আর?

যখন দৌড়োই তখন আজকাল মাঝে মাঝে ভারী হয়ে যায় পা, চলতে চায় না। আর?

আরও যেন কী সব হয়। ঠিক বুঝতে পারি না। চক্কোত্তি মশাই দুলে দুলে হাসলেন। তারপর বললেন, কুষ্টিটা বসন্ত পণ্ডিতকে দিস। দেখে রাখবে।

আমার আবার কুষ্টি।

যা না বসন্ত পণ্ডিতের কাছে। করে দেবেখন।

কুষ্টি দিয়ে হবে কী?

রোগের চিকিচ্ছে হবে। যা বলছি করগে যা। আমার রাগটা অন্য। আমার সন্ন্যাস নেওয়া লাগবে।

সব কিছু কি সবাইকে সয় রে? ম্যাচফোকরে পরে বেঘোরে প্রাণটা যাবে। দুনিয়ায় জন্মেছিস কি ব্রহ্মচর্যের ব্যায়াম করবি বলে? যা যা ...

আপনার মতলব ভালো নয় চক্কোত্তি মশাই।

ভালোমন্দের ভারটা একজনের ওপরেই ছেড়ে দে না।

পরদিন দৌড়াতে দৌড়াতে যেখানে পা শ্লথ হয়ে এল সেখানে থামল কুন্দন। চারদিকে চাইল। একটা খোলা জানালা। জানালার ওপাশে আবছায়া ও কে? সোহাগ? একটা শ্বাস ফেলে কুন্দন আবার দৌড়তে লাগল। হরিশঙ্করের কাকাতুয়া ডাকছে, নিমাই ওঠো, নিমাই ওঠো--। সুঘ্রাণ পাতলা বাতাস বইছে। পুবের আকাশে পেখম মেলেছে এক অলৌকিক ময়ূর। পরিও দেবতাদের নেপথ্য সঞ্চার স্পষ্ট টের পাওয়া যায় এ সময়ে। পালচৌধুরীদের বাগানে বুড়ি কমললতা আজও দাঁড়িয়ে আছে সেই দেবতার জন্য, যদি পথ ভুলে চলে আসে। চারদিকে শুধু দেবলোকের আলো, স্বর্গের গন্ধ। কুন্দন কেন বাঁধা পড়বে? তার

দুখানা দূরগামী পা আছে, আছে বন্ধনযুক্ত ইচ্ছাশক্তি, সে কেন বাঁধা থাকবে এইখানে? সে তো গাছ নয়। চরৈবেতি, চরৈবেতি, চেনা পথ ছেড়ে, গঞ্জের গণ্ডি পেরিয়ে কুন্দন আজ ঝাঁপিয়ে পড়ল বিপুল পৃথিবীর বুকে। সে আজই গণ্ডি ভাঙবে। ভাঙবেই। কাকাতুয়াটা তীব্র স্বরে ডাকতে লাগল। নিমাই, নিমাই, শচীমায়ের গলা না? না কি চক্কোত্তি মশাই। না কি তার হৃদপিণ্ডেই ডেকে উঠল এমন। কেউ ডাকল। কুন্দন প্রাণপণ দৌড়তে লাগল। যখন হাফসে ক্লান্ত শ্রান্ত কুন্দন থামল, তখন সামনেই চক্কোত্তিমশাই। তাঁর চালা ঘরে বসা। দুলে দুলে হাসছেন, জিরো, জিরো, জিরিয়ে নে। আরও কত দৌড় বাকি আছে।

মুহূর্ত

আজ যুদ্ধের খবর ভালো নয়, কৃষ্ণা।

জানি বাসুদেব। পঞ্চপতির মুখভাব দর্শন ও ক্ষত পরিচর্যা করতে গিয়েই তা বুঝতে পেরেছি। সুতপুত্রের স্পর্ধা সীমাহীন। অর্জুন তাকে বধ করবেন এতে আমার সন্দেহ নেই।

রাধেয় উত্তম যোদ্ধা, যাজ্ঞসেনী। স্পর্ধা তার অঙ্গের ভূষণের মতোই সহজাত।

যশোদানন্দন, তুমি কি তার প্রতি অনুরক্ত?

না যাজ্ঞসেনী, এ অনুরাগের প্রকাশ নয়। এ হল সত্যের সম্মুখীন হওয়া।

ভগবান, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে আমি তোমাকে লক্ষ করেছি। অধিরথ-তনয়ের প্রতি তোমাকে কখনো বিরক্ত, কখনো অনুরক্ত মনে হয়েছে। সে কুশলী সৈনিক, সে দাতা, অন্য গুণাবলিও থাকতে পারে, কিন্তু পুরুষোত্তমের স্নেহ আকর্ষণ করার মতো কোন সৎকাজ সে করেছে? দ্যূতসভায় আমার অপমানের সময় তার ভূমিকা নিশ্চয়ই তুমি বিস্মৃত হওনি সখা।

আমি যে কিছুই বিস্মৃত হতে পারি না, সখি। হায়, আমার যে কেন বিস্মৃতি নেই!

তোমার বিস্মৃতি তো সম্ভব নয় স্মার্ত। তবে হাহাকার কেন?

মাঝে মাঝে মনে হয়, অন্য মানুষের মতো বিস্মৃতি থাকলে হৃদয়ের অনেক ক্ষতের যন্ত্রণা উপশম হত। তুমি জানো পাঞ্চালী, এই যুদ্ধে এক পক্ষ অবলম্বন করেও আমি সম্পূর্ণ পক্ষপাতশূন্য?

সে কি সম্ভব?

প্রিয় বা অপ্রিয় বলে আমার কিছু নেই, শত্রু নেই মিত্রও নেই, আমার তাই পক্ষপাতও নেই।

আমি সামান্য নারী, আমি কি অত বড়ো কথা বুঝতে পারি? আজ যুদ্ধের সংবাদে তুমি বিচলিত, এটুকু শুধু বুঝতে পারছি জনার্দন। কী হয়েছিল আমি তা পঞ্চপতির কাছে জিজ্ঞাসা করতে সাহস পাইনি। তারা গম্ভীর বদন, অধোমুখ। তুমি আমাকে বলো।

তুমি বীরজায়া, বীরতনয়া, ক্ষাত্র শোণিতের অধিকারিণী। জয় পরাজয়ের সংবাদে নিস্পৃহ থাকার মানসিকতা তোমার আছে। পাঞ্চালী, শুধু অর্জুন ছাড়া তোমার পতি চতুষ্টয় আজ কর্ণের কাছে পরাজিত, বিধবস্ত ও পর্যুদস্ত হয়েছে। তাঁদের পক্ষে সবচেয়ে লজ্জার কথা, কর্ণ তাঁদের পরাজিত করেও করুণাপরবশ বধ করেনি। ব্যঙ্গ ও কটূক্তি করে ছেড়ে দিয়েছে। এই অপমান বৃশ্চিক দংশনের মতো তাঁদের যন্ত্রণার কারণ হয়েছে।

কর্ণ তাঁদের বধ করেনি কেন? সুতপুত্র কি হত্যাকুণ্ঠ?

এ প্রশ্নের জবাব আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়।

ত্রিকালদর্শী, তোমার অজানা তো কিছুই নেই।

সেইটেই আমার অধিকতর মনোবেদনার কারণ। সে সব জানে তার যে কী জ্বালা!

তুমি কি ভাবো কর্ণ অর্জুনকে পরাজিত করলে রেহাই দিতেন?

না সখি, কর্ণ নিজমুখেই পাণ্ডব চতুষ্টয়কে বলেছে, সে অর্জুনের বধাভিলাষী। এই চারজনকে সে উপযুক্ত প্রতিপক্ষ বলেই মনে করেনি। গন্ধমূষিক বধ করে সে তার হাতকে দুর্গন্ধযুক্ত করতে চায় না।

আশ্চর্য তার অহঙ্কার!

অধিরথপুত্র সে অহঙ্কারী তা সুবিদিত। সখি, তোমার কাছে এক আবেদন নিয়ে এসেছি।

বলো সখা, তোমাকে অদেয় আমার তো কিছুই নেই।

রাধেয়র বিনাশ যে অতি সন্নিকটে তা আমি মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছি।

সেই সুদিন সমাগত হলে পাণ্ডব শিবিরের কুলনারীদের সঙ্গে আমি শঙ্খ ও উলুধবনি দেব।

তাও জানি। তোমাদের সুখের দিন আর বিলম্বিত নয়। কর্ণ আজ কবচ-কুণ্ডলহীন, শিরে ঋষির অভিসম্পাত বহন করছে। যত বীরই হোক, কর্ণ এখন বধযোগ্য। নিজের মৃত্যুকে সে নিজেই অবধারিত করে তুলেছে। সে জানে আমি শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুনের সারথি। তবু অকম্পিত সে।

এই ক্ষাত্রতেজ সুতপুত্রের মধ্যে কীভাবে সম্ভব?

আমাকে প্রশ্ন কোরো না কৃষ্ণা।

সর্বজ্ঞ, তুমি কিছু গোপন করছ।

অনেক গোপনীয় প্রকাশযোগ্য নয়। মহাবীর রাধেয় নিপাত হওয়ার পর হয়তো বা সব সত্য প্রকাশিত হবে।

আমি কর্ণের কথা শুনতে ভালোবাসি না সখা। আমার ক্রোধ উপজাত হয়। আমি বিচলিত বোধ করি।

এত ঘৃণা?

এত ঘৃণা। কিন্তু আজ কি তুমি কর্ণের কথাই বলতে এসেছ?

হ্যাঁ পাঞ্চালী, কর্ণের নিধন সন্নিকট। আমার মনে হয়, কর্ণ যেদিন প্রাণত্যাগ করবে সেদিন পৃথিবী একটু ম্লান হয়ে যাবে।

বাসুদেব, এ কী কথা তোমার মুখে? কর্ণ কি কোনো মহৎ মানুষ? কৌরবদের পক্ষ নিয়ে সে কি পাণ্ডবপক্ষের বিরুদ্ধে বিকট অন্যায় করেনি?

সখি, কর্ণ বড়ো দুর্ভাগা। কর্ণ বড়ো একাকী। অহংকারীরা নিঃসঙ্গই হয়ে থাকে। কর্ণ তার ভবিতব্য জানে, এও জানে ভবিতব্যের বিরুদ্ধে তার কিছুই করার নেই।

তুমি এক পাষণ্ডের গুণগান করছ পার্থসারথি!

তুমি রুষ্ট হোয়ো না সখি। আমি যা দেখি তুমি তা দেখতে পাও না, এইটুকুই তোমার সঙ্গে আমার তফাৎ।

জানি ত্রিকালেশ্বর, তোমার চাইতে বহুদর্শী আর কে আছে।

আজ তোমাকে আমি এক স্থানে নিয়ে যেতে চাই। যাবে?

কোথায় নিয়ে যাবে? আমার ঘরগৃহস্থালী পড়ে আছে, আমার পতিরা ক্লান্ত, বিক্ষত হয়ে আমার পরিচর্যার অপেক্ষায়। এ সময়ে আমি কি কোথাও যেতে পারি?

তুমি জানো না যে, আমি মায়া সৃষ্টি করতে পারি। আমি একটি লহমায় সময়কে অসীমে প্রসারিত করতে পারি। এক লহমা, একবার মাত্র আঁখিপাতের সময়টুকু যদি দাও তবেই যথেষ্ট, কেউ কিছু টেরও পাবে না।

কিন্তু কোথায় নিয়ে যেতে চাও?

এক মহাপরাক্রমশালী বীর, এক বিপুল ঐশ্বর্যবান মানুষ এক অবিচল পাহাড়ের মতো স্থিতধী ব্যক্তিত্ব আজ তার নিজেরই ধবংসস্তূপের মধ্যে বিরাজ করছে। চলো, একবার তার কাছে যাই।

সে কি কর্ণ, সখা?

হ্যাঁ সখি, সে কর্ণ। কিন্তু সে-কর্ণকে তুমি জানো এ সেই দুষ্কৃতি নয়। ভাগ্যচক্রে তার যে ভাবমূর্তি তৈরি হয়েছে, সে তার সত্য পরিচয় নয়।

কর্ণ কি আমার সাক্ষাৎপ্রার্থী?

না। সে কেন তোমার সাক্ষাৎপ্রার্থী হবে?

তবে তার কাছে আমার কী দরকার?

অচিরেই কর্ণ বিলুপ্ত হবে, আর তার দেখা পাবে না। একবার তার সত্য পরিচয় তোমার কাছে উন্মোচিত হোক। এই হতভাগ্যের জন্য যদি তোমার একবিন্দু অশ্রুও ব্যয় হয় তবে তা আমার কাছে এক স্বর্গীয় শোভার মতো পরিলক্ষিত হবে। একটি নিমেষ মাত্র ভিক্ষা দাও সখি।

কর্ণ যদি আমাকে অপমান করে?

আমি তো আছি সখি।

কিন্তু কর্ণের জন্য আমার অশ্রুমোচন তুমি কেন দেখতে চাও চতুর চূড়ামণি? তোমার মনের যে হদিস পাই না।

কখনও তা তোমাকে বলব। শুধু এই ক্ষণটি বয়ে যেতে দিও না।

বেশ, তবে তাই হোক কৃষ্ণ। তবে তাই হোক।

কৃষ্ণ একটু হাসলেন মাত্র। চারদিকের আবহে যেন অশ্রুতপ্রায় করুণ বীণাধবনি শোনা যাচ্ছিল। কৃষ্ণ শুধু চোখের একটি পলক ফেললেন।

অতি শোভাময় এক কক্ষে কর্ণ সমাসীন। চোখ নিমীলিত, বদন প্রশান্ত, একটি শ্বেত বস্ত্রখণ্ডে আবৃত ঋজু দেহে উগ্র পুরুষকার টান টান হয়ে আছে। কর্ণ একাকী, সঙ্গীহীন।

কৃষ্ণ ও দ্রৌপদী প্রবেশমাত্র কর্ণ বিস্মিত আয়ত চক্ষু তুলে চাইল। বিস্ময় ক্ষণকাল অবস্থান করল চোখে। স্মিত হাস্যে উদ্ভাসিত মুখ নিয়ে কর্ণ দণ্ডায়মান হল। করজোড়ে বলল, লীলাময় শ্রীকৃষ্ণ! স্বয়ং পাঞ্চালী! এ যে বিনা মেঘে বজ্রপাত। আজকাল আমার ভাগ্যোদয়ে যে-কেউ ঈর্ষান্বিত হবে। অম্বা কুন্তীও সেদিন এসেছিলেন। এই দীন ধন্য!

দ্রৌপদ্রী কর্ণকে আগেও দেখেছেন। এখনও দেখলেন। আভরণহীন এই কর্ণ যেন দীপ্ত তাপস, যেন দীপশিখা, যেন দহন। তিনি এমন সৌন্দর্য কমই দেখেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ স্মিত হাস্যে বললেন, আমরা কিছু চাইতে আসিনি মহাবাহু।

কর্ণ করুণ একটু হেসে বলল, কর্ণের আজ আর কিছু নেই, তাই কর্ণ আজ সব দিতে পারে কেশব।

কুরুসেনাপতি, দাত্যশ্রেষ্ঠ, পাঞ্চালী তোমাকে অভিবাদন জানাতে এসেছে।

বল কী পার্থসারথি! সতীশ্রেষ্ঠা ওই নারীর গুণকীর্তন করেন দেবতারা। পঞ্চমহাবীর পঞ্চপ্রদীপের মতো তাঁকে উদ্ভাসিত করেন। দ্রৌপদীর মতো নারীর কাছে কর্ণের অনেক কিছু শেখার আছে।

দ্রৌপদী ভারি সঙ্কুচিত হয়ে বললেন, ওরকম বলবেন না মহাভাগ। আপনি ভারতশ্রেষ্ঠ বীর, মহাত্যাগী, দানশীল, পুণ্যবান। মহাত্মা, আমার জানতে ইচ্ছে করে অম্বা কুন্তী আপনার সকাশে এসেছিলেন কেন।

কর্ণ মৃদু হাস্য করে বললেন, তাঁর ভ্রম।

ভ্রম! ভ্রম কেন?

তাঁর আশঙ্কা হয়েছিল, কর্ণ তাঁর পুত্রদের নিশ্চিত বিনাশ করবে। তিনি সেই আশঙ্কার কথাই আমাকে জ্ঞাপন করতে এসেছিলেন।

সেইজন্যেই কি আপনি আজ যুদ্ধে পাণ্ডব চতুষ্টয়কে পরাজিত করেও বধ করেননি?

না বরবর্ণিনী, তারা নিজেরাই কৌশলে আমার পাশমুক্ত হয়েছিল।

এ কথা সত্য নয় মহাবল। আপনি বধ না করে প্রাণ ভিক্ষা দিয়েছেন বলে ভীম এখনও বিলাপ করছেন।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কর্ণ মাথা নেড়ে বললেন, যুদ্ধ, বীরত্ব, আত্মত্যাগ, দান ইত্যাদির ওপর আমি আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেছি পাণ্ডবপ্রিয়া। যুদ্ধজয় আমাকে আর আকর্ষণ করে না।

শুনেছি আপনি আর্যপুত্র অর্জুনের বধাভিলাষী।

কর্ণ তার বিবর্ণ মুখখানা তুলে বলল, আপনি কী চান আর্যে? যদি অর্জুনের প্রাণরক্ষাই আপনার উদ্দেশ্য হয় তবে...।

দ্রৌপদ্রী অতিশয় দম্ভের সঙ্গে বললেন, না ধনুর্ধর, আর্যপুত্র অর্জুন স্বয়ং জগৎজয়ী। তিনি আপনাকে অবশ্যই পরাভূত করবেন। আমি এসেছি সখা কৃষ্ণের অনুরোধে।

বিস্মিত কর্ণ চতুষ্পার্শে তাকাল। তারপর স্মিত আননে বলল, দেবী, আপনি বীরপত্নী। অপিচ ধর্ম সর্বদাই জয়ী হয়।

আর্যপুত্র অর্জুনের প্রতি আপনার ঈর্ষার কথা সকলেই অবগত আছেন। এই যুদ্ধে আপনি জয়ী হবেন না।

দেবী, এ কি অভিশাপ?

না আর্য, এ আমার বিশ্বাস।

কর্ণ সহাস্যে বলল, যুদ্ধে জয় বা পরাজয় আছেই। আমি ওসব নিয়েও চিন্তিত নই। তুচ্ছ দেহ পরিত্যাগ করা চিন্তার বিষয়ও নয়।

কৃষ্ণ বললেন, রাধেয়, আমি যুদ্ধের বিষয় নিয়ে কথা বলতে আসিনি।

কর্ণের মুখ উজ্জ্বল হল। বলল, বাল্যাবধি অস্ত্রানুশীলন করে আসছি। অস্ত্রের ঝনৎকার এখন আর আমার ভালো লাগে না। আর প্রিয় নয় শত্রুবধ। হে ত্রিকালদর্শী আমি আজ কঠিনতর সংগ্রামের সম্মুখীন। আমাকে বুঝিয়ে দাও, এই জয়-পরাজয়, এই যুদ্ধবিবাদ, এই গৌরব ও পরাভব, এই সম্মান ও অপমান, এর মূল্য কী?

মহাত্মন, আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন মোহানার নিকটবর্তী নদী। বিস্তার আছে, স্রোত নেই। মন্দীভূত, শ্লথ নির্বিকার।

বেণুকর, আমি শুনেছি তোমার মোহন বাঁশির সুরে গোপীরা সম্মোহিত হয়ে যেত। আমার সেই সুর শুনতে ইচ্ছে হয়।

মহাবল, বাঁশি সর্বদাই বাজছে, শোনার জন্য হৃদয় আর ব্যাকুলতা হলেই হয়।

দ্রৌপদী কর্ণকে অবলোকন করছিলেন। ক্ষাত্র ও ব্রাহ্ম দুটি তেজ একীভূত হলেই কি একরম পিঙ্গল তীব্রতা আসে মানুষের! অথচ ইনি সুতপুত্র! দৌপদী কৃষ্ণের দিকে তাকালেন। চোখে প্রশ্ন।

অন্তর্যামী কৃষ্ণ বললেন, তুমি কৌন্তেয়কে কিছু জিজ্ঞেস করবে না যাজ্ঞসেনী?

কৌন্তেয়! সখা, আমার শ্রবণে কি ভ্রম হচ্ছে?

না সখি, কোনো ভ্রম নয়। ইনিই জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব, সূর্যের ঔরসে মাতা কুন্তীর গর্ভে জাত। পরিত্যক্ত, ভাগ্যতাড়িত, অভিশপ্ত বিধুর এই মানুষটি নিজ কৃতিত্বে তোমার স্বামী হতে পারত, আবার ষষ্ঠ পাণ্ডবের একজন হয়েও তোমার পতিত্ব লাভ করতে পারত।

লজ্জায় অধোবদন দ্রৌপদীর দিকে চেয়ে কর্ণ বলল, বরাঙ্গনা, আপনি সঙ্কুচিত হবেন না। আমাদের সেই বয়স অতিক্রান্ত। উপরন্তু আজ আমি জীবনের উপান্তে উপস্থিত। কবচ-কুণ্ডল

নেই, শিরে গুরুর অভিশাপ, এক বিঘাতিনী লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। এই কর্ণ এক ছায়াশরীর মাত্র।

দৌপদী চোখ তুলে তাকালেন। স্খলিত কণ্ঠে বললেন, আমাকে ক্ষমা করুন বরেণ্য। প্রমাদবশত আমার স্পর্ধা প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু দেব, পরাজয়ের আগেই কেন আপনি হেরে বসে আছেন?

কর্ণ মাথা নেড়ে বলল, হারিনি যাজ্ঞসেনী, জিতিওনি। জননী কুন্তী এসে যেদিন আমাকে জন্মবৃত্তান্ত শোনালেন সেদিনই নদীতটে, সায়ংকালে যুদ্ধজীবী রণোন্মাদ কর্ণের অবসান ঘটে গিয়েছিল। ইন্দ্র ছলে হরণ করেছিলেন কবচকুণ্ডল, কিন্তু তার চেয়েও অনেক বড়ো সর্বনাশ ঘটে গিয়েছিল সেই দিন। কার বিরুদ্ধে আমার সংগ্রাম অর্জুনপ্রিয়া? কর্ণের মুঠিতে ধনুক সেই দিনই আলগা হয়ে গিয়েছিল। আজ কর্ণ আর যোদ্ধা কর্ণ নয়, বীর নয়, আজ কর্ণ এক ব্যথিত হৃদয়, হৃতশক্তি, নিষ্প্রাণ এক মানুষ। অর্জুন যাকে হত্যা করবে সে অনেক আগে নিহত হয়েছে।

দ্রৌপদী হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠলেন, ওরকম বলবেন না আর্য, হঠাৎ আমার হৃদয় বিদারিত হচ্ছে।

সান্ত হও কৃষ্ণসখী, বাস্তব ও সত্যকে অবলোকন করো। কর্ণ কি পারে কৌন্তেয়কে অস্ত্রাঘাত করতে? তোমার অর্জুন তার প্রার্থিত জয় পেয়ে যাবে। তার জয়ধবনি উঠবে চারদিকে। আর চিরকাল মানুষের ঘরে ঘরে ধিক্কৃত হবে কর্ণ দুর্বল পুরুষকার, দৈব বলবান।

হে বীর, উত্থিত হোন, সত্যকে প্রকাশ করুন, পাণ্ডবেরা অপনাকে শিরোধার্য করে নিন, রণহূঙ্কার অবসিত হোক।

মাতা কুন্তীও তাই চেয়েছিলেন।

দ্রৌপদীর দুটি অপরূপ চোখ থেকে অশ্রুবিন্দু নেমে আসছে। কৃষ্ণ এক দৃষ্টে তা দেখছিলেন। মৃদু কণ্ঠে বললেন, এঁকে প্রণাম করবে না দ্রৌপদী?

দ্রৌপদী কর্ণের দিকে চেয়ে দৃপ্তকণ্ঠে বললেন, আমি পঞ্চবীরের ভাগ্যবতী পত্নী, আমি বীরমাতা, বীরের কন্যা। আমি শ্রেষ্ঠ পুরুষদের সাহচর্য পেয়েছি। তবু আর্য, আজ স্বীকার করি আমি আপনার মতো পুরুষ দেখিনি।

দ্রৌপদী আভূমি প্রণাম করলেন।

কৃষ্ণ মৃদুস্বরে বললেন, নিমেষ অতিক্রান্ত যাজ্ঞসেনী। এই নিমেষ অনন্তকালের মধ্যে মিলিয়ে যাবে। এ এক সুন্দর মুহূর্ত মাত্র, মহাকালের বুদ্বুদ। তবু কী সুন্দর! কী অপার্থিব সুন্দর!

লক্ষ্মীপেঁচা

ওঃ, এ যে একেবারে হরিপদ জিনিস রে!

আজ্ঞে, ভালো জিনিস বলেই তো আপনার কাছে আসা। এ সব জিনিসের কদর কজন করতে পারে বলুন। আর দামই বা দিতে পারে কজন?

তা আনলি কোথা থেকে। বাজারি জিনিস নয় তো! তোকে বাপু বিশ্বাস নেই।

কী যে বলেন। কবে নেমকহারামি করেছি বলতে পারেন? দ্বিজপদ আর যা-ই হোক বিশ্বাসঘাতক নয়। সত্যি কথাই বলছি, গেরস্ত ঘরেরই মেয়ে। আতান্তরে পড়েছে। এঁটোকাঁটা হয়নি এখনও।

গেরস্তঘরের মেয়ে বলছিস? পরে আবার পুলিশের ঝামেলা হবে না তো! দেখিস বাপু। আমার একটু চরিত্রের দোষ আছে বটে, তা বলে আমি মেয়েছেলে দেখলেই কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে বসি না।

সে আর বলতে! আপনার সঙ্গে তা ধরুন তিন বছরের কাজ কারবার আমার। আপনাকে চিনতে কি আর বাকি আছে? এ ভালো মেয়ে বাবু, সরল সোজা, গরিব ঘরের মেয়ে। নিজের ইচ্ছেতেই এসেছে। ও নিয়ে ভাববেন না।

ওরে তাই কখনো হয়! আমার একটা নিয়ম আছে তো! ঘরে ওর কে কে আছে সব খতেন দে। বাপ কী করে?

নেই।

মরেছে?

কবে ?

আর কে আছে?

মা আছে, দুটো ছোটো ছোটো ভাইবোন আছে।

চলে কী করে?

গতর খাটিয়ে। ওর মা খেতের কাজটাজ করে, মুড়িটুড়ি ভাজে। চলে না। বড্ড অসুবিধের মধ্যে আছে।

মেয়েটাকে কাছে ডাক, একটু কথা কয়ে দেখি।

মেয়েটা একটু দূরে মালঘরের দরজার কাছে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কথাটাথাগুলো শুনতে পেয়েছে কি না বোঝা গেল না। কোনো ভাবান্তর নেই। তবে দেখতে বেশ। ছোটোখাটো চেহারা, তেমন কালো নয়, মুখের ডৌলটুকু ভারি মিঠে। যোগেনের চোখে লেগে গেছে।

মেয়েটা কাছাকাছি এসে হেঁটমুণ্ডু হয়ে দাঁড়াতেই যোগেন জিজ্ঞেস করে, বলি নিজের ইচ্ছেয় এসেছ, নাকি এ হতভাগা ধরেবেঁধে এনেছে? দেখো বাপু, আমি ঝুট ঝামেলা পছন্দ করি না। বুঝেসুঝে এসে থাকলে ভালো, নইলে বাপু আমার পোষাবে না।

মেয়েটা কথা কইল না। যেমন দাঁড়িয়ে ছিল তেমনই দাঁড়িয়ে রইল।

ও দ্বিজু, কথা কয় না কেন রে? বোবা নাকি?

না না, বোবাকালা, হাবাগোবা ও সব কিছু নয়। তবে মুখরা নয় আর কি।

মুখরা নয় সে না হয় হল, তা বলে বোবা হলে চলে কী করে? তোমার নাম কী গো মেয়ে?

বোবা যে নয় তা বোঝা গেল। ক্ষীণ কণ্ঠে জবাব এল, অধরা।

অধরা! বাঃ বেশ নাম। তা দ্বিজপদর কাছে সব ভালো করে শুনে বুঝেসুঝে নিয়েছ তো!

মেয়েটা আবার চুপ।

দেখো বাপু, আমার লুকোছাপা কিছু নেই। সব দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। দেশের বাড়িতে আমার বিয়ে-করা বউ আছে, ছেলেপুলে আছে। আমার বয়সও ধরো এই

ঊনপঞ্চাশ চলছে। বাড়ি ছেড়ে কারবার আঁকড়ে পড়ে থাকি। রসকষহীন জীবন, বুঝলে? তাই মেয়েমানুষের দরকার হয়ে পড়ে। পয়সা ন্যায্যই পাবে, কিন্তু পরে আবার ঝামেলা পাকিয়ে তুলো না। আগেরজন তো গয়নাগাঁটি, সম্পত্তির ভাগ চেয়েও ক্ষান্ত হল না। পরে বিয়ে করার জন্য চাপাচাপি শুরু করে দিল। ও সব মতলব থাকলে আগে থেকেই খোলসা হও।

মেয়েটা চুপ।

দ্বিজপদ কাঁচুমাচু মুখে বলে, আহা, আনকোরা মেয়েটাকে এমন পষ্টাপষ্টি বলতে আছে! ঘাবড়ে যাবে যে বাবু। ও সব যা বলা কওয়ার তা বলে কয়েই এনেছি। আপনাকে ভাবতে হবে না।

দ্যাখ দ্বিজপদ, পুতুলকেও তো তুই বলে কয়েই এনেছিলি। তাতে কাজ হয়েছিল? কী হাঙ্গামাটাই বাধাল, বল!

তা বাবু, কিছু মনে যদি না করেন, পুতুল থাকলেও আপনার ওই সরস্বতীর সঙ্গে মাখামাখি করাটা ঠিক হয়নি।

যোগেন ফুঁসে উঠে বলে, কেন, ঠিক হয়নি কেন? সরস্বতীর সঙ্গে কি আর কার সঙ্গে মাখামাখি করলুম তাতে ওর কী? ও কি আমার মাগ নাকি? পয়সার সঙ্গে সম্পর্ক, ব্যস পয়সাতেই সম্পর্ক শেষ।

আচ্ছা সে সব কথা একটু আবডালে বলবেন। এ একেবারে আনকোরা, কাঁচা মেয়ে। ভয় খেয়ে যাবে।

যোগেন নরম হল। আসলে মেয়েটিকে তার বেশ ভালোই লাগছে। বাইশ তেইশ বছরের বেশি বয়স নয়। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আছে। উলোঝুলো নোংরা ভিখিরির চেহারা নয়।

তা ওহে মেয়ে, সব বুঝলে তো! কথা না কও একটু ঘাড়খানা নাড়তেও তো পারো!

মেয়েটা ঘাড় নাড়ল না, কথাও কইল না।

মুশকিলে ফেললে দেখছি। অমন কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে থাকলে কিছু কি বুঝবার জো আছে? বলি কালা নও তো!

দ্বিজপদ বলে, না কালা নয়। ওই যে বললুম একটু লাজুক আছে। মনটাও ভালো নেই, এই প্রথম বাড়ির বাইরে আসা।

একটা শ্বাস ফেলে যোগেন বলে, সঙ্গে জিনিসপত্র কিছু আছে? শাড়ি সায়াটায়া?

দ্বিজপদ শশব্যস্তে বলে, না না, ও সব থাকবে কোত্থেকে? যা পরনে দেখছেন তাই সম্বল।

যোগেন একটু হাসল, ওহে দ্বিজপদ, এত বড়ো কারবারটা যে চালাই তাতে একটু বুদ্ধির দরকার হয়। এর আগে তুই আরও দুজন এনেছিলি, তাদেরও ওই পরনেরটুকু ছাড়া আর কিছু ছিল না। ওসব কি আর আমি বুঝি না? শুরুতেই আদায় উসুল করতে লেগে পড়া।

কী যে বলেন বাবু।

ঠিকই বলি। ওহে মেয়ে, যাও, ওই পিছন দিকে গুদোম ঘরের লাগোয়া ডানহাতি একখানা ঘর পাবে। সেখানে গিয়ে বোসো।

মেয়েটি ভারি সঙ্কোচের সঙ্গে পায়ে পায়ে চলে গেল।

যোগেন মুখ তুলে বলে, বন্দোবস্ত কী রকম?

আজ্ঞে ওই যা দেন, তাই দেবেন আর কি! মাসে হাজার টাকা, আর খাওয়া-পরা। বাড়তি শুধু দশটি হাজার টাকা।

আঁতকে উঠে যোগেন বলে, তার মানে?

দ্বিজপদ কাঁচুমাচু হয়ে বলে, বললুম না ওরা বড়ো বিপাকে পড়েছে! কিছু জমি বাঁধা পড়ে আছে। ছাড়াতে হলে দশ হাজার টাকা না হলেই নয়। ওর মা চেয়েছে।

বলি, টাকা কি গাছে ফলে রে দ্বিজপদ?

বাবু, মেয়েমানুষের রেট কি এক জায়গায় বসে আছে? তা ছাড়া দেখছেন তো জিনিসটি একেবারে হরিপদ। তা হরিপদ জিনিসের জন্য দরটাও তো হরিপদই হবে, না কি?

পাগল হলি নাকি? দশ হাজার টাকা মুখের কথায় ফেলে দেব আমি সেই বান্দা নই।

তা হলে হল না বাপু। ওর মা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে, মেয়েকে এ সব নোংরামির মধ্যে নামানোর তার মোটে ইচ্ছে নেই। পেটের দায়ে রাজি হয়েছে। ওই দশটি হাজার টাকা পুরোপুরি চাই। নইলে মেয়ে ফেরত নিয়ে যেতে বলে দিয়েছে।

যোগেন কেমন যেন কাহিল হয়ে পড়ল। মিনমিন করে বলল, নাঃ, এটা বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে।

আজ্ঞে সে আপনি যা মনে করেন। বাড়াবাড়ি মনে করলে ও মেয়ের দায় আপনাকে ঘাড়ে নিতে হবে না। মেলা লোক গেঁজে হাতে কবে বসে আছে।

ওঃ, খুব যে চ্যাটাং চ্যাটাং কথা হচ্ছে! বলি এ তল্লাটে খপাত করে দশ হাজার টাকা ফেলার লোক পাবি তুই?

হাসালেন বাবু আপনি তো মান্ধাতার আমলে পড়ে আছেন দেখছি।

তার মানে?

সাহাগঞ্জ কি আর আগের মতো আছে? দু-দুটো কোল্ড স্টোরেজ, পাঁচখানা চালকল, তিনটে পাউরুটির কারখানা, সাতটা লেদ মেশিন, সাতটা পোলট্রি, হাইওয়েতে পুব পশ্চিমে দু-দুটো পেট্রল পাম্প, পয়সাওলা লোকের অভাব বলে আপনার মনে হয়?

যোগেন বৃথা একটু তড়পাল, ওরে চিনি তোর পয়সাওলাদের। ওই তো মদন গুছাইত, হরেন মণ্ডল, চিনি ঘোষ আর সুধীর পুততুণ্ড। এই তো! দশ হাজার টাকা ফেলতে কাত হয়ে যাবে তারা।

কিন্তু অধরার মা যে একটি আধলাও কম নেবে না বাবু। তা হলে মেয়েটাকে ডাকুন, বেলাবেলি বাড়ি পৌঁছে দিয়ে যাই।

যোগেন একটু বিপাকে পড়ল। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর রাতটা সে একটু ভোগসুখে কাটাতে চায়, বহুকালের অভ্যাস। বরাবর তার রাখা মেয়েমানুষ ছিল। এমন কিছু লুকোনো-চুরোনো ব্যাপার নয়। পুতুল বেশ মেয়ে ছিল। সে বিদেয় হওয়ার পর

হাড়হাভাতে জুটল একটা তার নাম লক্ষ্মী। সেটা চুরি করত খুব। তাকে তাড়ানোর পর এখন বড্ড ফাঁকা যাচ্ছে।

দ্বিজপদ, পরে যদি টের পাই যে লাইনের মেয়ে গছিয়ে গেছিস তাহলে কিন্তু ভালো হবে না।

ওই যে বললুম বাবু, দ্বিজপদ আর যা-ই হোক নেমকহারাম নয়। চাই তো ওর গাঁয়ে গিয়ে তল্লাশ নিয়ে আসতে পারেন। বেশি দূরেও নয়, রেলরাস্তাপার হয়ে মেটে পথ ধরলে দু ক্রোশ দূরে বিষ্টুপুর। খেতের ওপর দিয়ে রাস্তা, সাইকেল, ভ্যান, অ্যাম্বাসাডার সব যেতে পারে।

দশ হাজার টাকা না হয় দিলুম, তারপর যদি মেয়েটা বিগড়োয় বা পালায়? ভালো করে তো বুঝেই উঠতে পারলুম না এখনও।

বিগড়োবার মেয়ে নয়। স্বভাব ভারি ভালো। পালানোর কথাও ওঠে না। আর পালালে তো আমি আছি।

সব দিক বিবেচনা না করে কাজ আমি করি না, তুই তো জানিস।

তা আর বলতে! তবে টাকাটা আজই গিয়ে হাসি মাসির হাতে দিতে হবে। তার বড়ো ঠেকা।

কাল আসিস।

না বাবু, আজই। আপনার কারবার নগদে চলে, আমি জানি। টাকাটা ফেলুন, চলে যাই। বিষ্টুপুর ঘুরে ফিরতে রাত হয়ে যাবে আমার।

বেজার মুখে উঠল যোগেন। আলমারি খুলে টাকাটা দিয়ে দিল। আহাম্মকিই হল বোধ হয়। মেয়েটার মুখখানা বড়ো ভালো লেগে গেল যে! টুলটুলে মুখ, ভারি মিষ্টি।

যাওয়ার সময় দ্বিজপদ বলে গেল, বাবু, একেবারে কুমারী মেয়ে! ঘরও ভালো। পেটের দায়ে নানা ধান্দাবাজি করে বেড়োই, নরকবাস আমার কপালে আছেই। কিন্তু এ কথাটা বিশ্বাস করবেন, দশ হাজার টাকা আপনার জলে ফেলা হচ্ছে না।

বেলা চারটার পর মালঘর খোলে। তখন খদ্দেরের ভিড় লেগে যায়। বস্তা বস্তা ভুসিমাল, চটের বস্তা, দড়ি এইসব বোঝাই হয় লরি, টেম্পো আর ভ্যানে। যোগেনের তখন দম ফেলার সময় থাকে না।

মেয়েটাকে একটু বাজিয়ে দেখার ইচ্ছে ছিল, তা সেটা আর রাত আটটা অবধি হয়ে উঠল না। খাজাঞ্চি আর সে মিলে রাত আটটা নাগাদ যখন হিসেব নিকেশ করে উঠল তখন দেখল আজকের আদায় উসুল বড্ডই যেন ভালো। মালও গেছে প্রচুর। এত বড়ো মালঘর ফাঁকা হয়ে যেন হাঁ-হাঁ করছে।

খাজাঞ্চি বলল, উঃ, আজ বিক্রিটাও হয়েছে বটে!

তাই দেখছি। কত হল বল তো?

বাহান্ন হাজার টাকার বেশি। সব নগদ আদায়। মাত্র চারজন খাতা লিখিয়েছে। তা সেখানেও না হক আরও দশ বারো হাজার টাকা হবে।

হুঁ। বড্ড ভালো।

খাজাঞ্চি বিদেয় হলে সদর দরজা বন্ধ করে মালঘরের পিছনে নিজের ঘরখানায় এসে জামাটামা ছাড়ল যোগেন। আশ্বিন মাসেও আজ ঘাম হচ্ছে। টাকার গরমই হবে। পুজোর আগে বিক্রিবাটা ভালোই হয়। কিন্তু এত ভালো নয় তা বলে। যোগেন হিসেব দেখে অনুমান করল, কম করেও আজ তার পনেরো হাজার টাকা থাকবে।

দিনে পনেরো হাজার টাকা রোজগারটা যদি বজায় থাকে তা হলে আর ভাবতে হবে না। দুটো মেয়ের বিয়ে লাগিয়ে দেবে আর সনাতন মুহুরির সম্পত্তিটাও খরিদ করতে পারবে। বায়না করে রেখেছে মাস দুয়েক হল। আরও কিছু শখ-আহ্লাদ আছে। তা সে সব হবেখন।

যোগেন মালঘরেই থাকে। পিছন দিকটায় গোটা দুই খুপরি বানিয়ে নিয়েছে। রান্নাঘর, টিউবওয়েল, পায়খানা সবই আছে। এখানে থাকায় মালঘরে পাহারাও হয়, আর ব্যবসাটার সঙ্গে নিজেকে সেঁটে রাখতে সুবিধে হয়।

হাতমুখ ধুয়ে এসে ঘরে রাখা সিংহাসনে গুচ্ছের ঠাকুর দেবতাকে আজ খুব পেন্নাম ঠুকল সে। দিনটা বড়ো পয়া।

প্রণাম করে ওঠার সময় মাথায় বজ্রাঘাতের মতো মেয়েটার কথা মনে পড়ল। তাই তো! আশ্চর্য! কাজেকর্মে মেয়েটার কথা মনেই ছিল না তার। সাড়াশব্দও তো পাওয়া যাচ্ছে না! তাহলে কি পালাল নাকি? উরেববাস, দশ দশটি হাজার টাকা গুনে দিয়েছে যে একটু আগে দ্বিজপদকে।

তাড়াতাড়ি উঠে সে ও পাশের ঘরটায় ঢুকে দেখল, না, পালায়নি। চৌকিতে পাতা বিছানায় পড়ে নিঃসাড়ে ঘুমোচ্ছে। দুটো পা চৌকির বাইরে ঝুলে আছে। আর জানালা দিয়ে আসা পূর্ণিমার দুধের মতো চাঁদের আলোয় বিছানা ভেসে যাচ্ছে। আর মুখখানা যেন খুব ফুটে উঠেছে জ্যোৎস্নায়।

দাঁড়িয়ে দেখছিল যোগেন। এ কে? এ আসলে কে? অমন মুখ, অমন পায়ের গড়ন, অমন চমৎকার চুলের ঢল। এ কি রাখা মেয়েমানুষের রূপ!

মাথায় ফের একটা বজ্রাঘাত। সর্বনাশ! এ এল আর সঙ্গে সঙ্গে তার বিক্রিবাটা চৌগুণে উঠে গেল যে! কী করে হয়! অ্যাঁ! কী করে!

ঘুনঘুন করে একটা প্যাঁচা ডাকছে বাইরে। রোজই ডাকে। রাতের বেলাতেই তাদের কাজকর্ম কিনা! কিন্তু হঠাৎ সেই প্যাঁচার ডাকটা কানে বড়ো লাগল যোগেনের। প্যাঁচাটা কি কোনো সঙ্কেত দিচ্ছে তাকে? কিছু বলছে?

পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে আসছিল যোগেন। দরজার কাছে উপুড় করে রাখা লোহার বালতিটায় পা লেগে খটাং করে শব্দ হল একটা।

সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটা চমকে জেগে গেল।

জ্যোৎস্নায় সব দেখা যাচ্ছে। মেয়েটা চোখ চেয়ে অবাক হয়ে চারদিক দেখছে। তারপর তাকে দেখে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। অপরাধী গলায় বলল, আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।

যোগেনের মুখে কথা এল না। কেমন যেন শ্বাস আটকাচ্ছে গলার কাছটাতে। সে দাঁড়িয়ে রইল।

মেয়েটা তার ভাঙা খোঁপাটা বেঁধে নিল। তারপর যোগেনের দিকে চেয়ে মিষ্টি গলায় বলল, এখানে কি টিপকল আছে?

আছে বইকী? আছে বইকী। এই তো পিছন দিকটায় উঠোন। এসো, পাম্প করে দিচ্ছি।

বুকটা বড়ো ধক ধক করছে যোগেনের। বড়ো ভয়-ভয় করছে, বড়ো অদ্ভুত লাগছে। মেয়েটা আঁজলা করে জল খেল, চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিল।

তারপর বড়ো বড়ো দুটি চোখ তুলে তাকাল তার দিকে।

মেয়েটা আঁচলে মুখ মুছতে মুচতে বলল, এই বুঝি ঘরদোর?

যোগেনের কাঁপুনি থামছে না। বলল, হ্যাঁ।

মেয়েটা একটা শ্বাস ফেলে বলল, এখানেই থাকতে হবে বুঝি আমাকে?

যোগেনের মাথায় কথা আসছে না। সে আমতা আমতা করে বলে, তা-ইয়ে-ইচ্ছে হলে--

আমার আবার ইচ্ছে অনিচ্ছে বলে কিছু আছে নাকি? নষ্ট হতে এসেছি, আমার ইচ্ছেয় কি কিছু হবে?

যোগেন হঠাৎ শুনতে পেল, অশ্বত্থ গাছ থেকে প্যাঁচাটা খুব ডেকে উঠল। খুব ডাকছে। ভীষণ ডাকছে। ভয়টা যেন সমস্ত বুক আর মাথা গ্রাস করে নিল তার। শরীরের কাঁপুনিটাও এমন বেড়ে গেল যেন মূর্ছা হবে। কিন্তু মুখে কথা আসছে না।

মেয়েটা জ্যোৎস্নায় ঊর্ধ্বমুখে চেয়ে থেকে বলল, মা বেচে দিল আমাকে। আপনি কিনে নিলেন। আমি যেন একটা কী। এখনও বিশ্বাস হয় না। কখন নষ্ট করবেন আমাকে?

এইবার যোগেনের মুখে কথা এল, নষ্ট! নষ্ট হবে কেন? নষ্ট হওয়ার কথা নাকি তোমার?

মেয়েটা ধীরে মুখ নামিয়ে তার দিকে ফিরে বলল, তাই তো কথা!

যোগেন প্যাঁচার ডানার শব্দ শুনতে পাচ্ছে। জ্যোৎস্নায় উড়ে বেড়াচ্ছে পাখিটা। তার ছায়া একবার যেন স্পর্শ করে গেল তাকে। শিউরে উঠল যোগেন। ছায়াটা ঘুরে বেড়োচ্ছে চারদিকে। সাবধান করছে তাকে। ভয় দেখাচ্ছে।

না, না, তোমার কোনো ভয় নেই।

মেয়েটা অবাক হয়ে বলে, টাকা দিলেন যে!

তাতে কী!

মেয়েটা অবাক হয়ে বলে, আপনি যে বললেন আপনার একজন মেয়েমানুষ না হলে চলে না।

বলেছি! কথাটা ধোরো না মা, বড্ড ভুল হয়ে গেছে।

মেয়েটা অবাক হয়ে বলে, মা! মা বলে ডাকছেন আমাকে?

যোগেন মাথা নেড়ে বলে, তাই তো ডাকলুম।

ওমা! কেন?

কী হচ্ছে তা বুঝতে পারল না যোগেনও। সে নয়, তার ভিতর থেকে যেন অন্য কেউ কথা কইছে। থতমত খেয়ে সে বলে, মুখ থেকে বেরিয়ে গেল যে!

মেয়েটা হেসে বলে, তা হলে কী হবে?

কিছু হবে না মা। ঘরে এসো, কিছু খাও।

খাব? হ্যাঁ, আমার বড্ড খিদে পেয়েছে।

তা খেল মেয়েটা। ডাল, ভাত, তরকারি কী যত্ন করে ছোটো ছোটো গরাসে খেল দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল যোগেন। নাঃ, তার মনে আর কোনো ধন্দ নেই। সে যা বোঝার বুঝে গেছে।

আমাকে কি দিয়ে আসবেন মায়ের কাছে?

যোগেন গর্জন করে উঠল, পাগল!

তা হলে?

লক্ষ্মীকে হাতে পেলে ছাড়তে আছে? আমার একটা ছেলে আছে মা। ব্যবসা বাণিজ্যে মন নেই, তার লেখাপড়ায় মন। ছেলে বড়ো ভালো। তার সঙ্গে তোমার বিয়ে দেব।

মেয়েটা লজ্জায় মাথা নোয়াল।

ঘরজামাই

বাঁকা নদীতে তখন জল হত খুব। কুসুমপুরের ঘাটে নৌকো ভিড়ত। জ্যৈষ্ঠমাসে শ্বশুরবাড়িতে আসছিল বিষ্ণুপদ। কী ঠাটবাট। কোঁচানো ধুতি, গিলে করা পাঞ্জাবি, হাতে সোনার বোতাম, পায়ে নিউ কাট, ঘাড়ে পাকানো উড়ুনি। চোমড়ানো মোচ আর কোঁকড়া চুলের বাহার তো ছিলই। আরও ছিল, কটা রং আর পেল্লায় জোয়ান শরীর। নৌকো ঘাটে লাগল। তা কুসুমপুরের ঘাটকে ঘাট না বলে আঘাটা বলাই ভালো। খেয়া নৌকো ভিড়তে না ভিড়তেই যাত্রীরা ঝপাঝপ জলে কাদায় নেমে পড়ে। বিষ্ণুপদ সে ভাবে নামে কি করে। উঁচু পাড়ের ওপর স্বয়ং শ্বশুরমশাই ছাতা মাথায় দাঁড়িয়ে, পাশে তিন সম্বন্ধী, নতুন জামাইকে অভ্যর্থনা জানাতে এসেছে। বিষ্ণুপদ টলোমলো নৌকোয় বাঁ হাতে সাতসেরী একখানা রুই মাছ আর ডান হাতে ভারী স্যুটকেস নিয়ে ডাইনে বাঁয়ে হেল-দোল করছে। তবে হ্যাঁ, বিষ্ণুপদ পুরুষমানুষই ছিল বটে। দেমাকও ছিল তেমন। নৌকো থেকে জামাই নামছে, নৌকোর মাঝি এগিয়ে এল ধরে নামাবে বলে। বিষ্ণুপদ বলল, কভি নেহি। আমি নিজেই নামব।

তা নামলও বিষ্ণুপদ। সাতসেরি মাছ আর স্যুটকেস সমেত। বাঁ পা-টা কাঁদায় গেঁথে গিয়েছিল মাত্র, আর কিছুই হয়নি। মাছ বা স্যুটকেসও হাতছাড়া হয়নি, সেও কাদায় পড়ে কুমড়ো গড়াগড়ি যায়নি। তিন শালা দৌড়ে এসে কাদা থেকে বাঁ পাখানা টেনে তুলল। জুতোখানা অবশ্য একটু খুঁজে বের করতে হয়েছিল।

সেই আসাটা খুব মনে আছে বিষ্ণুপদর, কারণ সেই আসাই আসা। একেবারে চূড়ান্ত আসা। শ্বশুরমশাই মাথায় ছাতা ধরলেন, দুই চাকর মাছ আর বাক্স ভাগাভাগি করে নিল। পাড়ার দুচারজন মাতববরও জুটে গিয়েছিল সঙ্গে।

শ্বশুরমশাই কাকে যেন হাসি মুখে অহঙ্কারের সঙ্গে বললেন, কেমন জামাই দেখছ?

আহা, যেন কার্তিক ঠাকুরটি। তোমার বরাত ভালোই হরপ্রসন্ন।

গৌরবে বুকখানা যেন ঠেলে উঠল বিষ্ণুপদর।

বাড়িতে ঢুকেই মেয়ে মহলে হুড়োহুড়ি, উলু, শাঁখ। সে এক এলাহি কাণ্ড। সদ্য পাঁঠা কাটা হয়েছে মস্ত উঠোনের একধারে। বাঁশে উলটোকরে ঝুলিয়ে তার ছাল ছাড়ানো হচ্ছে। আর এক ধারে অন্তত বিশসেরি পাকা একখানা কাতলা মাছ বিশাল আঁশ বঁটিতে ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ করে কাটছে দুজন মুনীশ। সারা বাড়িতে একটা উৎসবের কলরব। শুধুমাত্র একটি জামাইয়ের জন্য। পাড়ার বাচ্চারা সব ঝেঁটিয়ে এসেছে। বউরা সব দৌড়ে আসছে কাজকর্ম ফেলে।

কাছারিঘরে নিয়ে গিয়ে বসানো হয়েছিল তাকে। নীচু একখানা চৌকির ওপর গদি, তাতে ধপধপে চাদর তাকিয়া। গোলাপজল ছিটোনো হল গায়ে। দুজন চাকর এসে বাতাস করতে লাগল। গাঁয়ের সজ্জন, মুরুব্বি সব দেখা করতে এল। সকলের চোখই সপ্রশংসিত।

সে একটা দিনই গেছে। এখন বাঁকা নদীতে জল নেই, বালিয়াড়ি আছে। বর্ষার জল নামলে নদী আর সে জল বইতে পারে না, পাড় ভাসিয়ে দেয়। খেয়া বন্ধ হয়েছে অনেক দিন। কংক্রিটের ব্রিজ হয়ে অবধি এখন ভারী ভারী বাসের গতায়াত। কুসুমপুর ঘেঁষেই পাকা সড়ক, তা ধরে নাকি হিল্লি-দিল্লি যাওয়া যায়।

ওই পাকা সড়ক থেকেই রিকশা করে পঁক পঁক করতে করতে বিষ্ণুপদর জামাই গোবিন্দ এল। একে কি আসা বলে! খবর নেই, বার্তা নেই, পাতলুনের ওপর হাওয়াই শার্ট চাপিয়ে চটি ফটফটিয়ে এসে দাঁত কেলিয়ে হাজির হলেই হল।

নতুন জামাই কত ভারভাত্তিক হবে, তা নয়। এ যেন এক ফচকে ছোঁড়া ফস্টিনস্টি করতে এসেছে। তা হচ্ছেও ফস্টিনস্টি। দাওয়ায় মামাতো শালীরা সব ঘিরে ধরেছে, হা হা হি হি হচ্ছে খুব। চারদিকে গুরুজন, তোয়াক্কাই নেই। কিন্তু দুঃখ অন্য জায়গায়। জামাইয়ের সঙ্গে মেয়ে মুক্তির ভাব হচ্ছে না, কিছু একটায় আটকাচ্ছে। মেয়েকে বিয়ের পর থেকেই ফেলে রেখেছে বাপের বাড়িতে। খুবই দুশ্চিন্তার ব্যাপার।

কাঁঠাল গাছের ছায়ায় সাতকড়ি পুরোনো কাঠ জুড়ে একখানা চৌকি বানাচ্ছে। গুষ্টি বাড়ছে, জিনিসও লাগছে। গাছের ছায়ায় একখানা মোড়া পেতে বসল বিষ্ণুপদ।

সাতকড়ির দাঁতে ধরা একখানা বিড়ি। তাতে অবশ্য আগুন নেই। বিড়িখানা দাঁতে ধরে রেখেই সাতকড়ি বলে, মেয়েখানা দিব্যি পার করেছো জামাইদা। এখন আমার কপালে কি আছে তাই ভাবছি। তিন তিনটে মেয়ে বিয়োলো বউ। সবই কপাল।

সাতকড়ির দুঃখটা বেশ করে অনুধাবন করে নেয় বিষ্ণুপদ। দোষটা যে কার তা এই বয়সেও সে ঠিক বুঝতে পারে বলে মনে হয় না। কিছু কিছু ব্যাপার স্যাপার আছে তা শেষ অবধি বুঝ-সমঝের মধ্যে আসেই না। কপাল বললে ল্যাটা চুকে যায় বটে, কিন্তু তাতে মনটা কেমন সায় দেয় না।

সাতকড়ি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, কেমন কার্তিকের মতো জামাই!

বিষ্ণুপদর একটু আঁতে লাগে। সবাই কার্তিক হলে তো কার্তিকের গাছি লেগে যাবে। সে তাচ্ছিল্যভরে বলে, হুঁ কার্তিক! না কেলে কার্তিক!

সাতকড়ি র‍্যাঁদা চালাতে চালাতে বলে, রং ধুয়ে কি জল খাবে জামাইদা? নাটাগড়ে তোমার জামাইয়ের মোটর গ্যারেজখানা দেখেছো? দিনরাত আট-দশজন লোক খাটছে। বাপ আর চার ভাই মিলে মাস গেলে অন্তত পাঁচ-ছ-হাজার টাকা কামাচ্ছে। তার ওপর চাষবাস, মুদিখানা। এ যদি কার্তিক না হয় তাহলে কার্তিক আর কাকে বলে শুনি!

তা বলে অমন পাতলুন-পরা ফচকে জামাই আমার পছন্দ নয় বাপু। চেহারা দেখ, পোশাক দেখ, হাবভাব দেখ, জামাই বলে মনে হয়? একটু ভারভাত্তিক, গুরুগম্ভীর না হলে মানায়! আমরাও তো জামাই ছিলুম, না কি? সহবত কিছু কম দেখেছিস?

সাতকড়ি পুরোনো লোক। হাতের কাজ থামিয়ে বিড়িটা ধরিয়ে নিয়ে বলে, পুরোনো

কথা তুললেই ফ্যাসাদ, বুঝলে জামাইদা? ওসব নিয়ে ভেবো না। মেয়ে খেয়ে-পরে সুখে থাকলেই হল।

বিষ্ণুপদ একটু গম্ভীর হয়ে থাকে। তার জামাই গোবিন্দ একটু তেড়িয়া গোছের লোক। নিতান্ত দায়ে না পড়লে পেন্নাম টেন্নাম করে না, বিশেষ পাত্তাও দেয় না শ্বশুরকে। কানাঘুষো শুনেছে, শ্বশুর ঘরজামাই ছিল বলে গোবিন্দ একটু নাক সিঁটকোয়। বিপদ হল নাটাগড় থেকে তার নিজের বাড়ি গ্যাঁড়াপোতা বিশেষ দূরে নয়, পাঁচ-ছ মাইলের মধ্যে। আর গ্যাঁড়াপোতায় গোবিন্দর এক দিদির বিয়ে হয়েছে। যাতায়াতও আছে। জামাই একদিন ফস করে বলেও বসল, আপনার মা ঠাকরোন যে এখনও বেঁচে আছেন সে কথা জানেন তো!

বড্ডই স্পষ্ট খোঁচা। কথাটা ঠিক যে, নিজের বাড়ির পাট একরকম চুকিয়েই দিয়েছিল বিষ্ণুপদ, বাপ আর ভাইদের সঙ্গে সদ্ভাবও ছিল না। বিয়ের পর এ যাবৎ দুচার বার গেছে বটে, কিন্তু সে না যাওয়ারই শামিল। গত দশ-বারো বছরের মধ্যে আর ওমুখো হয়নি। কিন্তু তাতে দোষের কি হল সেইটেই বুঝে উঠতে পারে না বিষ্ণুপদ। সেই কারণেই কি জামাই তাকে অপছন্দ করে?

সাতকড়ি বিড়িটা খেয়ে বলে, আগে কত শেয়াল ডাকত সাঁঝবেলা থেকে, এখন একটারও ডাক শোনো?

বিষ্ণুপদ একটু অবাক হয়ে বলে, শেয়াল! হঠাৎ শেয়ালের কথা ওঠে কেন রে?

বলছিলুম, পুরোনো দিনের কথা তুলে লাভ নেই। শেয়াল নেই, কুসুমপুরের ঘাট নেই, বাঁকা নদী মজে এল, পাকা পুল হল, শেতলা পুজোয় মাইক বাজা শুরু হল, ফি শনিবার বাজারে ভিডিও বসছে। এত সব হল, আর জামাই পাতলুন পরলেই কি কল্কি অবতার নেমে এল নাকি?

কিন্তু পুরোনো দিনের কথা বিষ্ণুপদই বা ভোলে কি করে? গ্যাঁড়াপোতায় নিজের বাড়িতে তার কদর ছিল না। তিনটে ভাই আর তিনটে বোন নিয়ে সংসার। বাবার অবস্থা বেহাল ছিলই। তার ওপর বিষ্ণুপদ ছিল একটু পালোয়ান গোছের। ডন-বৈঠক, মুগুর ভাঁজা, ফুটবল, সাঁতার এইসব দিকে মন। অনেক সময় হয়, এক মায়ের পেটে জন্মেও সকলে সমান আদর পায় না। বিষ্ণুপদ ছিল হেলাফেলার ছেলে। স্পষ্টই বুঝত এ বাড়িতে তার

কদর নেই। কদর জিনিসটা সবাই চায়, নিতান্ত ন্যালাখ্যাপারও কদরের লোভ থাকে। দুবেলা দুটো ভাত আর মেলা গঞ্জনা জুটত। কাজ বাজের চেষ্টা নেই, দুটো পয়সা ঘরে আনার মুরোদ নেই, বোনগুলো ধুমসো হয়ে উঠছে--সেদিকে খেয়াল নেই। নানা গঞ্জনায় জীবনটা ভারি তেতো হয়ে যাচ্ছিল। গ্যাঁড়াপোতার বটতলাই ছিল তখন সারা দিনমানের ঠেক। গাঁয়ের আরও কয়েকটা ছেলে এসে জুটত। পতিতোদ্ধারের জন্য মহাকালী ক্লাব খুলেছিল তারা। মড়া পোড়ানো থেকে বন্যাত্রাণ, কাঙালী ভোজন, বারোয়ারী পুজো, মারপিট, যাত্রা থিয়েটার কথকতা সবই ছিল তাদের মহা মহা কাজ। বাইরে বাইরে বেশ কাটত। ঘরে এলেই মেঘলা, গুমোট, মুখভার, কথার খোঁচা, বাপান্ত। সেই সময়ে গ্যাঁড়াপোতার পাশেই কালীতলা গাঁয়ে এক শ্রাদ্ধবাড়িতে খুব খেটেছিল বিষ্ণুপদ। সেই শ্রাদ্ধবাসরেই তাকে দেখে খুব পছন্দ হয়ে গেল ভারী শ্বশুর হরপ্রসন্নর। টাকাওলা লোক। পাঁচ গাঁয়ের লোক এক ডাকে চেনে। চারটে ছেলের পর একটা মেয়ে। বাপের খুব আদরের। হরপ্রসন্ন তখন ঘরজামাই খুঁজছেন। শ্রাদ্ধবাড়িতেই ডেকে কাছে বসিয়ে মিষ্টি মিষ্টি করে সব হাঁড়ির খবর নিলেন। গরিব ঘরের ছেলেই খুঁজছিলেন, নইলে ঘরজামাই হতে রাজি হবে কেন? বিয়ের গন্ধে বিষ্ণুপদও চনমন করে উঠল। এতকাল ওকথাটা ভাববার সাহসটুকু অবধি হয়নি। বিয়ে যে তার কোনোকালে হবে এমনটি সে কারও মুখে শোনেওনি কোনোকালে। যেই কথাটা উঠল অমনি বিষ্ণুপদর ভিতরে তুফান বয়ে যেতে থাকল। পারলে আগাম এসে শ্বশুরবাড়িতে হামলে পড়ে।

সেই বিয়ে নিয়েও কেচ্ছা কম হয়নি। প্রথমেই বাপ বেঁকে বসল। মাও নানা কথা কইতে শুরু করল। ঘরজামাই যখন নিতে চাইছে তখন মেয়ে নিশ্চয়ই খুঁতো। তাছাড়া এ বংশের কেউ কখন ওই ঘরজামাই থাকেনি, ওটা বড়ো লজ্জার ব্যাপার।

বিষ্ণুপদ দেখল তাঁর সুমুখে ঘোর বিপদ। বিয়ে বুঝি কেঁচে যায়। চিরটা জীবন তাহলে গ্যাঁড়াপোতায় খুঁটয় বাঁধা থেকে জীবনটা জলাঞ্জলি দিতে হবে। এ সুযোগ আর কি আসবে জীবনে? সে তার মাকে বোঝালো, ধরো, আমি তোমার আর একটা মেয়েই, তাকে বিয়ে দিয়ে বেড়াল-পার করছো। এর বেশি তো আর কিছু নয়।

ঘরজামাই থাকা মানে জানিস? শ্বশুরবাড়িতে মাথা উঁচু করে থাকতে পারবি ভেবেছিস? তারা তোকে দিয়ে চাকরের অধম খাটাবে। দিনরাত বউয়ের মন জুগিয়ে চলতে হবে। এ যে বংশের মুখে চুনকালি দেওয়া।

বাপের সঙ্গে কথা চলে না। তবে বাপ সবই শুনল, শুনে বলল, কুলাঙ্গার, বিয়ের বাই চাপলে মানুষ গাধা হয়ে যায়।

তলিয়ে ভাবলে গাধার চেয়ে ভালোই বা কি ছিল বিষ্ণুপদ? দুবেলা দুমুঠো খাওয়া আর অচ্ছেদ্দায় দেওয়া লজ্জা নিবারণের কাপড় জামা, এ ছাড়া আর কীসের আশা ছিল বাপ মায়ের কাছে। গাধা বলায় তাই দুঃখ হল না বিষ্ণুপদর। সে মাকে আড়ালে বলল, ধরো তোমার একটা ছেলে বখেই গেছে বা মরেই গেছে। গাধা গরু যাই হই আমার আখের আমাকে দেখতে দাও তোমরা। গলার দড়িটা খুলে দাও শুধু।

হরপ্রসন্ন অর্থাৎ তার ভাবী শ্বশুর লোক মারফৎ খোঁজ নিচ্ছিল। বিষ্ণুপদর বাবা সেই লোকদের কড়া কড়া কথা শোনাতে লাগল। তা একদিন জোঁকের মুখে একেবারে এক খাবলা নুন পড়ে গেল। হরপ্রসন্নর এক অমায়িক ভাই দুর্গাপ্রসন্ন এসে বিষ্ণুপদর বাপকে কড়কড়ে হাজার টাকা গুনে দিয়ে বলল, বরপণ বাবদ আগাম পাঠিয়ে দিলেন দাদা। বিয়ের আসরে আরও হাজার।

হরপ্রসন্ন মানুষকে প্রসন্ন করতে পারতেন বটে। বাপের মুখে খিল পড়ল, মুখখানাও হাসি-হাসি হয়ে উঠল। মাও আর রা কাড়ে না। শুধু চোখের জল মুছে একদিন বলল, শ্বশুরবাড়ি গিয়ে কি মাকে মনে থাকবে রে বাপ? ওরা বড়ো মানুষ, টাকায় ভুলিয়ে দেবে।

কথাটা ভাঙল না বিষ্ণুপদ। ভাঙলে মা দুঃখ পাবে। সে আসলে ভুলতেই চায়। ভাবী শ্বশুরের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার মাথাটা নুয়ে আসছিল বারবার।

বাবা আর এক ভাই গিয়ে পাত্রীও দেখে এল একদিন। ফিরে এসে বলল, দেখনসই কিন্তু নয়। তবে গাঁ-ঘরে চলে যাবে। এ বাড়িতে তো আর থাকতে আসছে না, আমি মত দিয়েই এসেছি।

পাত্রী কেমন তা বিষ্ণুপদ জানত না। কথাটা তার খেয়ালই হয়নি। লাঞ্ছনার জীবন থেকে মুক্তি পাওয়াটাই তখন বড়ো কথা। পাত্রী সুন্দরী না বান্দরী তা নিয়ে মাথা ঘামানোর কিছুই ছিল না। গ্যাঁড়াপোতা ছেড়ে অন্য জায়গায় যাচ্ছে এই ঢের।

আর বিয়েটাও হল দেখার মতো। বাদ্যি বাজনা ঠাট ঠমক জাঁক জমকে পাত্রী চাপা পড়ে গেল কোথায়। শুভদৃষ্টির সময় এক ঝলক দেখে কিছু খারাপ লাগল না বিষ্ণুপদর। কম বয়সের চটক আছে একটা। পাত্রী নিয়ে মাথা ঘামানোর মতো অবস্থাও তখন তার নয়। তাকে নিয়েই তখন হইচই। চারদিকের লোক জামাইয়ের চেহারা দেখে ধন্য করছে। এতদিন পর জীবনে প্রথম একটা কাজের কাজ করেছে বলে আনন্দ দেমাকে বুঁদ হয়ে ছিল বিষ্ণুপদ।

বিচক্ষণ হরপ্রসন্ন গোপনে নাকি বউ-ভাতের খরচাটাও জুগিয়েছিল। গ্যাঁড়াপোতায় সেই প্রথম ও শেষবার আসা বিষ্ণুপদর বউ পাপিয়ার। মোট বোধহয় দিন সাতেক ছিল। ওই সাতদিনে তাকে যথেষ্ট উত্ত্যক্ত করেছিল বিষ্ণুপদর হিংসুটে বোনেরা। মাও খোঁচানো কথাবার্তা বলত। বড়োলোকের মেয়ে বলে কথা। তার ওপর বাড়ির ছেলেকে লুট করে নিয়ে যাচ্ছে।

অষ্টমঙ্গলায় শ্বশুরবাড়িতে পাপিয়াকে রেখে গ্যাঁড়াপোতায় ফিরল বিষ্ণুপদ। তখন তিনটে মাস বড়ো জ্বালা যন্ত্রণায় কেটেছে। কেউ কথা শোনাতে ছাড়েনি। গঞ্জনা একেবারে মাত্রাছাড়া হয়ে উঠেছিল। কথা ছিল জামাইষষ্ঠীতে পাকাপাকিভাবে শ্বশুরবাড়ি চলে যাবে বিষ্ণুপদ। সুতরাং বাড়ির লোক ওই তিনমাস সুদে আসলে উশুল করে নিল। বিষ্ণুপদ কারো কথার জবাব দিল না, ঝগড়া কাজিয়া করল না। তার সামনে সুখের ভবিষ্যৎ। কটা দিন একটু সয়ে নিল দাঁত চেপে। শ্বশুরবাড়িতে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। তোয়াজে, আদরে একেবারে ভাসাভাসি কাণ্ড। চাইবার আগেই জিনিস এসে যায়। ডাইনে বাঁয়ে চাকরবাকর। লটারি জিতলেও ঠিক এরকমধারা হয় না।

তবে সব কিছুর মূলেই শ্বশুর হরপ্রসন্ন। কী চোখেই যে দেখেছিলেন বিষ্ণুপদকে! সব জায়গায় সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে ঘুরতেন। কাজকারবার, চাষবাস, মামলামোকদ্দমা, ধানকল-

আটাচাকি, গাঁয়ের মোড়ল মুরুব্বির থেকে শুরু করে সরকারি আমলাদের সঙ্গেও ভাব-ভালোবাসা ছিল তাঁর।

সম্বন্ধীরা কি আর ভালো চোখে দেখছিল এইসব বাড়াবাড়ি? চার সম্বন্ধীই বিয়ে করে সংসারী। ছেলেপুলে আছে। ভবিষ্যৎ আছে। তারা কি আর বিপদের গন্ধ পায়নি এর মধ্যে? খুবই পেয়েছিল এবং পেছন থেকে তাদের বউদেরও উসকানি ছিল, আরও চমকে দিচ্ছিল বউদের বাপের বাড়ির লোকজন। বিয়ের পর বছর ঘুরতে না ঘুরতেই অশান্তি হচ্ছিল বেশ।

কিন্তু হরপ্রসন্নর মাথায় গোবর ছিল না। তিনি আগেভাগেই জানতেন এরকমধারা হবেই। মেয়ের নামে আলাদা বাড়ি, কিছু জমি আর একখানা কাঠচেরাইয়ের কল করে রেখেছিলেন। ছেলেদের ডেকে একদিন খুব ঠাণ্ডামাথায় বিষয়সম্পত্তির বাঁটোয়ারা বুঝিয়ে দিয়ে বললেন, দেখ বাবারা, কোনো অবিচার যদি করে থাকি তো এইবেলা বলে ফেল। তা হলে গাঁয়ের পাঁচটা লোক সালিশে বসুক এসে। আমার মনে হয়, সেটা ভালো দেখাবে না।

ছেলেরা একটু গাঁইগুই করলেও শেষ অবধি মেনে নিল। তারা কিছু কম পায়নি।

হরপ্রসন্ন তাঁর বিশাল বাস্তুজমি পাঁচভাগ করে দেয়াল তুলে দিলেন। আগুপিছু এবং পাশাপাশি পাঁচখানা বাড়ি হল। নিজের নামে বড়ো বাড়িখানা শুধু রইল। বেঁচে থাকতেই সংসারে শান্তির জন্য ছেলেদের পৃথগন্ন করে দিলেন। শ্বশুরই ছিল তার গুরু। ফচকে নিতাই বলত, বাপু হে, তুমি দেখছি বিয়ে বসেছ তোমার শ্বশুরের সঙ্গেই।

তবে হ্যাঁ, সবটাই এমন সুখের বৃত্তান্ত নয়। তার বউ পাপিয়া বড়ো অশান্তি করেছে। কথায় কথায় কান্না, আবদার, রাগ। সে ঘরজামাই থাকুক এটা পাপিয়া একদম চাইত না। এমন কথাও বলত, তুমি তো আমার বাবার চাকর। বিষ্ণুপদ মধুর সঙ্গে এইসব ছোটখাটো হুল হজম করে গেছে। কারণ সত্যি কথাটা হল, বউকে নয়, শ্বশুরকে খুশি করতেই প্রাণপণ চেষ্টা করত বিষ্ণুপদ। সে বুঝত এই একটা লোকের কাছে তার কদর আছে।

প্রথম প্রথম যতটা খাতির-যত্ন ছিল তা কালধর্মে কমে গিয়েছিল। তা যাক, এক জায়গায়, স্থায়ীভাবে থিতু হয়েছিল সে। সেইটেই বা কম কি? জমিজমা, চালু কারবার, দিব্যি বাড়ি, ছেলেপুলেও হতে লাগল। প্রথমটায় মেয়ে, তারপর দুই ছেলে।

সেই মেয়েরই জামাই ওই গোবিন্দ। শ্বশুর বেঁচে থাকতে সম্বন্ধীদের সঙ্গে তেমন সদ্ভাব ছিল না। শ্বশুর মরার পর একটু হয়েছে। বড়ো সম্বন্ধী পরিতোষই এই বিয়ের প্রস্তাবটা নিয়ে আসে। পাল্টি ঘর, অপছন্দের কিছু ছিল না। বিয়ে হয়েও গেল। তবে কেমন যেন একটু ফণা-তোলা সাপের মতো। একটুতেই কেমন যেন রোখা-চোখা ভাব দেখায়।

তাকে ভাবিত দেখে সাতকড়ি এতক্ষণ কথা বলেনি। এবার বলল, তোমার বরাত হল সোনার ফ্রেমে বাঁধানো। নিজের বিয়ে যেমন বোমা ফাটিয়ে করলে, মেয়েটারও তেমনি।

২

পোলের মাঝখানটায় দাঁড়িয়ে কৃষ্ণকান্ত ঝুঁকে নদী দেখছিল। ব্যাটারা বানিয়েছে ভালো। দিব্যি তকতকে জায়গা। বর্ষাবাদল না থাকলে শুয়ে ঘুমোনো যায়, বসে ভাত খাওয়া যায়। ঝড়বৃষ্টি হলে পোলের তলায় সেঁদিয়ে গিয়ে ঘাপটি মেরে থাকলেই হল। পোলটা হয়ে ইস্তক কৃষ্ণকান্ত এখানেই থানা গেড়েছে। বড়ো পছন্দের জায়গা। কত উঁচু! এখানে দাঁড়ালে কতদূর অবধি দেখা যায়, আর হাওয়া-বাতাসও খেলে।

সবাই জানে না, কিন্তু কৃষ্ণকান্ত খবর রাখে, পোল বাঁধতে তিনটি নরবলি হয়েছিল, রাজঠাকুরকে পাঁচখানা পাঁঠা মানত করতে হয়েছিল। তাতেও হয়নি। রোজ ব্যাটারা থাম বানাত আর নিশুত রাতে হারুয়া-ভূত এসে থাম নড়িয়ে গোড়া আলগা করে রেখে যেত। শেষে বাতাসপুরের শ্মশান থেকে হাতে-পায়ে ধরে নকুড় তান্ত্রিককে এনে ভূত বশ করতে হয়েছিল।

কিন্তু এত করেও লাভটা হল লবডঙ্কা। পোল বানানো হল বলে বাঁকা নদী রাগ করে সেই যে শুকনো শুরু করল, এখন তো লোপাট হওয়ার জোগাড়। শালারা নদীকে গয়না পরাতে গিয়েছিল। বেহদ্দ বেকুব না হলে মা মুক্তকেশীকে কেউ গয়না পরায়? বাঁকা নদীর জলে চান করলে আগে পুণ্যি হত। কৃষ্ণকান্ত রোজ নিশুত রাতে পোলের তলায় শুয়ে শুনতে পায়, হারুয়া-ভূত নদীর দুধারে দুই ঠ্যাং ফাঁক করে রেখে ছ্যাড়ছ্যাড় করে নদীতে পেচ্ছাব করছে। এখন খা শালারা ভূতের মুত।

কৃষ্ণকান্ত রেলিং থেকে ঝুঁকে নদী দেখছে আর আপনমনে হাসছে। নদীর যত বৃত্তান্ত তা তার মতো আর কেউ জানে না। নন্দবাবুর মেয়ে শেফালি পোল থেকে লাফিয়ে পড়ে মোলো--এবৃত্তান্ত সবাই জানে। বিষ্ণুপদর ছেলে জ্ঞানের সঙ্গে তার একটু ইয়ে ছিল। টের পেয়ে নন্দবাবু খুব ঠ্যাঙায়। অপমানে শেফালি এসে ঝাঁপ খেল। কিন্তু কেউ জানে না, বাঁকা নদী কিছুদিন হল খুব ডাকাডাকি করছিল শেফালিকে। পরীক্ষায় ফেল হয়ে বিশ্বেসদের ফটিকও ঝাঁপ খেল। সে কি এমনি এমনি? বাঁকা রোজ সব কচিকাঁচা ছেলেপুলেকে ডাকছে। একটি দুটি করে এসে ঝাঁপ খাবে আর মরবে।

তারপর যে কাণ্ডখানা হয় সেটাও কেউ টের পায় না। কৃষ্ণকান্ত পায়। মরা মেয়ে বা ছেলের জন্য মা-বাপেরা যখন কান্নাকাটি করছে তখন শেফালি দিব্যি বাঁকা নদীর বালিয়াড়িতে দাগ কেটে এক্কাদোক্কা খেলে আর ছুটোছুটি করে বেড়ায় মনের আনন্দে। ফটিকই বা কোন দুঃখে আছে? হারুয়া-ভূতের সঙ্গে ঘুরেঘুরে বটফল-নাটাফল পাড়ে আর খায়। ভরদুপুরে পোলের তলায় ছায়ায় শুয়ে শুয়ে আধবোজা চোখে সব দেখতে পায় কৃষ্ণকান্ত। মাঝে মাঝে হরপ্রসন্নবাবু এসে পোলটার দিকে চেয়ে খুব রাগারাগি করেন, এত জল ছিল নদীতে, সব গেল কোথায়? অ্যাঁ? গেল কোথায় অত জল? এই বলে ইয়া বড়ো বড়ো ঢ্যালা তুলে পোলের গায়ে ভটাভট ছুঁড়ে মারেন। ঠিক দুক্কুরবেলা ভূতে মারে ঢেলা।

পোলটাকে ঘুরেফিরে সারাদিনই দেখে কৃষ্ণকান্ত। ঝাঁ ঝাঁ করে যখন বাস আর লড়ি পোল পার হয় তখন শব্দটা যা ওঠে তাতে বুকটা ঝনঝন করতে থাকে। পোলের তলায় বসে থাকলে মনে হয়, এই বুঝি সব হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। আবার যখন বাতাস বয় তখন পোলটার গায়ে বাতাসের ঘষটানির শব্দটা কেমন যেন বড়ো বড়ো শ্বাসের আওয়াজ তোলে।

রেলিংটা বেশ চওড়া। উঠে হাঁটাহাঁটি করা যায়। মজাও খুব। কৃষ্ণকান্ত উঠে পড়ল রেলিং-এর ওপর। তারপর হাঁটতে লাগল। বাঁ ধারে নদীর খাদ, ডানধারে পাকা রাস্তা। বেশ লাগছে তার।

পোলের মুখে একটা ট্রাক দাঁড়িয়ে চাকা বদলাচ্ছে। ক্লিনারটা চেঁচিয়ে বলে, এই শালা পাগল, পড়ে যাবি যে!

কৃষ্ণকান্ত খুব হাসে, পড়ব মানে! পড়লেই হল! এ হল আমার পোল। সেঁটে ধরে রাখে।

এদিককার লোকগুলো সুবিধের নয়। বড্ড লাথিঝাঁটার ঝোঁক এদের। যতদিন হরপ্রসন্ন বেঁচে ছিলেন ততদিন তেমন চিন্তা ছিল না কৃষ্ণকান্তর। চণ্ডীমণ্ডপে পড়ে থাকত। হরপ্রসন্ন মরার পর চণ্ডীমণ্ডপ গেল ঘরজামাই বিষ্ণুপদর ভাগে। সে ব্যাটা বজ্জাতের ধাড়ি। প্রথমটায় চোখ রাঙিয়ে, পরে মেরেধরে তাড়াল। গিয়ে উঠেছিল হাটখোলায় এক চালার নীচে। চৌকিদার শিবু এসে একদিন বলল, প্রতিরাতের জন্য চার আনা করে পয়সা লাগবে। তা সেখান থেকেও উঠতে হল। কিন্তু শালারা বুঝতে চায় না যে, মানুষের একটা মাথা গোঁজবার জায়গা চাই। এই পোলটা হয়ে ইস্তক তার একখানা ঘরবাড়ি হয়েছে। পোলের তলায় ওপরে যেমন খুশি শোয়, বসে থাকে ঘুরে বেড়ায় কারো কিছু বলার নেই।

একটা বাস ঢুকছে কুসুমপুরে। জানালা দিয়ে লোকগুলো হাঁ করে তাকে দেখছে। কে যেন চেঁচিয়ে উঠল, গেল শালা মায়ের ভোগে।

না, অত সহজে যাচ্ছে না কৃষ্ণকান্ত। পোলের রেলিং ধরে সে রোজ হাঁটাহাঁটি করে। সে বুঝতে পারে, এ হল তার নিজের পোল। সরকার বাহাদুর তার জন্যই বেঁধে দিয়েছেন। এ হল তার তেতলা বাড়ি। পুব ধারের প্রান্তে এসে আবার ঘুরে পশ্চিমধারে এগোতে থাকে সে।

ছাতা মাথায় গুটিগুটি হেঁটে একটা লোক আসছিল। তাকে দেখে একটা লাফ মেরে পোলের শানের ওপর নামল কৃষ্ণকান্ত।

ঘরজামাই যে, একখানা বিড়ি ছাড়ো তো!

লোকটা দাঁড়াল। তার দিকে চাইল। তারপর বলল, পোলটা দিব্যি বাপের সম্পত্তি পেয়ে গেছিস দেখছি।

বাপের বাপ বড়ো বাপ। এ হল সরকার বাহাদুরের জিনিস। দেবে নাকি একখানা বিড়ি?

বিড়ি? তোর সাহস তো কম নয় দেখছি!

এতক্ষণ রেলিংয়ের ওপর খেলা দেখালুম যে! সারা দিনমান দেখাই। তবু কোনো শালা কিছু দেয় না, জানো?

কস্মিনকালে আমাকে বিড়ি সিগারেট পান খেতে দেখেছিস?

কৃষ্ণকান্ত একটু অবাক হয়ে বলে, বিড়ি খাও না? খাও না কেন বলো তো ঘরজামাই! বিড়ি তো খুব ভালো জিনিস।

ঘরজামাই! বলে খেঁকিয়ে ওঠে বিষ্ণুপদ, ঘরজামাইটা আবার কী রে? তোর তো দেখছি বেশ মুখ হয়েছে।

কৃষ্ণকান্ত গম্ভীর হয়ে বলে, খারাপটা কী বললুম শুনি! তুমি হরপ্রসন্নবাবুর ঘরজামাই হয়ে এসেছিলে না এ গাঁয়ে?

তাতে তোর বাপের কী? বলে ছাতাটা ফটাস করে বন্ধ করে বিষ্ণুপদ। লক্ষণটা ভালো নয়। ছাতাটা যেমন জুত করে ধরেছে, পেটাতে পারে।

না, এই বলছিলুম আর কি। কৃষ্ণকান্ত দু পা পিছিয়ে গিয়ে বলে, বিড়ি না দাও দশটা-বিশটা পয়সাও তো দিতে পার। সরকার বাহাদুর এত বড়ো পোলটা আমার জন্য বানিয়ে দিতে পারলেন, আর তোমরা একটু পার না?

এঃ, সরকার বাহাদুর তেনার জন্য পোল বানিয়েছেন! তোর বাপের পোল!

কৃষ্ণকান্ত বুঝল, হবে না। সব সময়ে হয় না। মাঝে মাঝে আবার হয়েও যায়। লোকটাকে ছেড়ে কৃষ্ণকান্ত পোলের নিচে নেমে এসে ছায়ায় বসল। বেশ জুৎ করে বসল। মাথার ওপর ছাদ, চিন্তা কিসের?

একটা বিড়ি হলেও হত, কিন্তু না হলেও তেমন কষ্ট নেই। তার মাথায় হঠাৎ একটা কথা এল। আচ্ছা, ঘরজামাই থাকলে কেমন হয়? ঘরজামাই থাকা তো খারাপ কিছু নয়। বিষ্ণুপদ কিছু খারাপ আছে কি? দিব্যি আছে। এতদিন কথাটা খেয়াল হয়নি তো তার!

এদিককার লোকগুলোও যেন কেমনধারা একবার ডেকে তো বলতে পারে, ওরে কেষ্টপাগলা, ঘরজামাই থাকবি? কেউ বলেওনি, তাই কৃষ্ণকান্তর খেয়াল হয়নি।

ঘরজামাই থাকার মেলা সুবিধে। কাপড়জামা জুতো ছাতা সব বিনি মাগনা পাওয়া যাবে। চারদিকে দেয়ালওলা ঘর হবে। দু বেলা দিব্যি খ্যাঁট। কাজকর্মও নেই। বগল বাজিয়ে মজাসে থেকে যাও। বিষ্ণুপদ যেমন আছে।

ইস, কথাটা আগেই খেয়াল করা উচিত ছিল। কিন্তু আর দেরি করাটাও ঠিক নয়। এইবার একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলা দরকার। কৃষ্ণকান্ত উঠে পড়ল।

রাস্তায় নামতেই কে যেন হাঁক মারল, ওরে কেষ্টা, বলি হনহন করে চললি কোথা?

দিল পিছু ডেকে। কৃষ্ণকান্ত ফিরে দেখে সাতকড়ি। লোকটা বড়ো ভালো নয়। একখানা জলচৌকি করে দিতে বলেছিল কৃষ্ণকান্ত, বহুদিন হল ঘোরাচ্ছে। জলচৌকি হলে কৃষ্ণকান্তের একটু সুবিধে হয়। পোলের তলায় উবু হয়ে বসে থেকে থেকে হাঁটু দুটোয় ব্যথা। জলচৌকি হলে দিব্যি গা ছেড়ে বসে আরাম করা যেত। তা সাতকড়ি কখনও না করেনি। শুধু বলে রেখেছে, বিশ্বাসবাবুদের বড়ো কাঁঠালগাছটা কাটা হলেই করে দেবে। কাঁঠালগাছটা প্রায়ই গিয়ে দেখে আসে কৃষ্ণকান্ত। বে-আক্কেলে গাছটা মরেও না, পড়েও না। এবারও রাজ্যের কাঁঠাল ফলেছে। তবে সে নজর রাখছে।

সাতকড়ি সঙ্গ ধরে বলে, বড়ো ব্যস্ত দেখছি যে!

কৃষ্ণকান্ত গম্ভীর হয়ে বলে, কাজে যাচ্ছি।

এ গাঁয়ে দেখলাম, একমাত্র তুই-ই কাজের লোক। সারাক্ষণ কিছু না কিছু করছিস।

কৃষ্ণকান্তর হঠাৎ মনে পড়ল, সাতকড়ির তিনটে না চারটে বিয়েরযুগ্যি মেয়ে আছে। পাত্র খুঁজে খুঁজে হয়রান হচ্ছে কবে থেকে। কৃষ্ণকান্ত গলাটা একটু নামিয়ে বলল, সাতকড়িদাদা, আমাকে ঘরজামাই রাখবে?

সাতকড়ি একটু থমকাল বটে, কিন্তু পরমুহূর্তে সামলে নিয়ে বলে, ঘরজামাই থাকতে চাস নাকি?

আজ ঠিক করে ফেললাম ঘরজামাই হয়েই থাকা ভালো। চারদিকে দেয়াল, মাথার ওপর ছাদ, দুবেলা খাওয়া, সকাল বিকেল চা। কী বলো! বিষ্ণুপদ কেমন আরামে আছে দেখছ তো?

সাতকড়ি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, তোর মতো জামাই পেলে কে না লুফে নেবে বল! আমিও নিতুম। তবে কি না আমরা হচ্ছি গরিব মানুষ। নিজেদেরই ঘরে ঠাঁই হয় না, তো জামাইকে রাখব কোথায় বল।

আমি বারান্দাতেও পড়ে থাকতে রাজি।

তুই তো রাজিই, কিন্তু জিনিসটা ভালো দেখায় না। শত হলেও জামাই বলে কথা, তার খাতিরই আলাদা। তার ওপর ধর আমাদের খাওয়াদাওয়াও তো শাক জুটলে অন্ন জোটে না। ঘরজামাই যদি থাকতে চাস তো তারও ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কে যেন বলছিল সেদিন, ঠিক মনে পড়ছে না, ভালো একটা পাত্র পেলে খবর দিতে। ঘরজামাই রাখবে কে বলো তো!

একটু বাড়ি-বাড়ি ঘুরে দেখ তো। যার দরকার সে ঠিকই বেরিয়ে এসে তোকে ধরবে।

মা কালীর দিব্যি কেটে বলছো তো!

ওরে হ্যাঁ রে হ্যাঁ। ফিরিওলারা যেমন হাঁক মেরে মেরে পাড়ায় পাড়ায় ঘোরে তেমনি হাঁক মেরে মেরে গাঁটা একটা চক্কর দিয়ে আয়। সবাইকে জানান দিতে হবে তো। একটু বেশ গলা ছেড়ে হাঁক মারবি, ঘর-জামাই রাখবে গো-ও-ও। ঘর-জামা-আ-আ-ই। পারবি না?

কৃষ্ণকান্ত খুশি হয়ে বলল, এ আর শক্ত কি?

যা লেগে পড় কাজে। হিল্লে হয়ে যাবে।

তেমাথার মোড়ে সাতকড়ি ভিন্ন পথ ধরল।

কেউ যদি একটু ধরিয়ে দেয় তাহলে সব কাজই কৃষ্ণকান্ত ঠিকঠাক করতে পারে। ধরিয়ে দেওয়ার লোকই যে সব সময়ে পাওয়া যায় না, এইটেই কৃষ্ণকান্তর মুশকিল। এই যে

সাতকড়িদাদা, এ বেশ ভালো লোক। কি করতে হবে, কেমন করে করতে হবে তা ধরিয়ে দিল। এখন বাকিটা জলের মতো সোজা।

হাঁক মারতে মারতে কৃষ্ণকান্ত পুবপাড়ায় ঢুকে পড়ল।

মল্লিকবাড়ির বউ মালতী উঠোন ঝেঁটিয়ে ধানের তুষ তুলে রাখছিল হাঁড়িতে, সেই প্রথম ফিরিওলার ডাকটা শুনতে পেল। কিন্তু কী হেঁকে যাচ্ছ তা বুঝতে না পেরে আগর ঠেলে বাইরে এসে দাঁড়াল।

ওরে এ কেষ্ট, কী বিক্রি করছিস? হাতে তো কিছু দেখছি না! কেষ্ট রাস্তা থেকে নেমে এসে এক গাল হেসে বলল, ঘর-জামাই রাখবে আমাকে?

মালতী হেসে গড়িয়ে পড়ল, ওরে সুবাসী, দৌড়ে আয় ছুট্টে আয়। দেখসে পাগলা কী বলছে!

ছোট বউ সুবাসী এল, বাড়ির আরও মেয়েরা বেরিয়ে এল। হাসাহাসির ধুম পড়ে গেল তাদের মধ্যে।

কৃষ্ণকান্ত বুঝল, হবে না। বেশির ভাগ সময়েই হতে চায় না। মাঝে মাঝে হয়। কৃষ্ণকান্ত ফের পথে নেমে পড়ল।

গড়াইদের বাড়ির বুড়ো মদন গড়াই বেতের কাজ করছিল। হাতের দা খানা নেড়ে তেড়ে এল বেড়ার ধারে, ব্যাটা নতুন চালাকি ধরেছে। খুব বিয়ের শখ হয়েছে, হ্যাঁ!

কৃষ্ণকান্ত আরও একটু এগিয়ে গেল। এগোতে এগোতেই বুঝতে পারল সে বেশ একখানা কাণ্ডই বাধিয়েছে। কেউ হাসছে, কেউ তাড়া করছে, কেউ গাল দিচ্ছে। তবে হাসির দিকটাই বেশি। ছেলেপুলেরাও লেগেছে পাছুতে। দুচারটে ঢিলও পড়ল গায়ে। নানা কথা কানে আসছে, পাগলা বলে কী রে... কে করবে লো, ঘরজামাই থাকবে...বসবি নাকি বে ওলো নিত্যকালী, পোলের নিচে থাকবি ঘর বেঁধে...মরণ...কে যেন খ্যাপিয়েছে আজ পাগলাকে...এঃ, শালার আজ বড়ো রস উথলেছে দেখছি...

গোবিন্দ খেতে বসেছিল ভিতরের বারান্দায়। তাকে ঘিরে শালীরা। সামনে শাশুড়ি। কচি বউ ঘোমটা টেনে দরজায় দাঁড়ানো। থালা ঘিরে বাটি। ঠিক এই সময় পাগলার হাঁক শোনা গেল। ছোট ফ্রক পরা শালি পটলী ছুটে গিয়ে খিলখিল করে হাসতে হাসতে ফিরে এল, এ মা, কী অসভ্য! বলছে, ঘর-জামাই রাখবে গো, ঘর-জামাই!

শাশুড়ির মুখখানা কালো হয়ে গেল, কে বলছে রে?

কে আবার! কেষ্ট পাগল।

গোবিন্দ হাসি চাপতে গিয়ে এমন বিষম খেল যে খাওয়া বরবাদ হওয়ার জোগাড়। অন্য শালীরা হাসছে। তাদের কারও গায়ে লাগছে না। তারা সব মামাতো শালী।

গোবিন্দ চেয়ে দেখল, দরজায় তার বউটাও নেই। পালিয়েছে। বোধহয় লজ্জায়।

৩

হাতে কলমে না করলে চাষের মর্ম বোঝা কোনো শর্মার কর্ম নয়। চাষা যখন চষে তখন সে মাটির সঙ্গে কথা কয়, বলদের সঙ্গে কয়, লাঙলের সঙ্গে কয়, মেঘ-বাদল-রোদের সঙ্গে কয়, বাজঠাকুরের সঙ্গে কয়, সাপখোপের সঙ্গে কয়, নিজের কপালের সঙ্গে কয়, এমনকি ভগবানের সঙ্গেও কয়। এই সব কটা জিনিস মিলিয়ে তবে চাষ। কত তোতাই পাতাই করে, সোহাগ করে, মিতালি পাতিয়ে তবে এক একজনের সঙ্গে ভাব সাব হয়। তার চারদিকে ঝাঁ ঝাঁ করছে প্রাণ। মাটির ঢেলাটাও তার কাছে জ্যান্ত, লাঙলটা কাস্তেটা সবই জ্যান্ত। এরা সব সতীশের বন্ধু-বান্ধব। ছাঁচতলায়, উঠোনে যে সব গোখরো ঘুরে বেড়ায় তারাও বাস্তুর লক্ষ্মী--সতীশ তাদেরও বন্ধু মনে করে। সেদিন চাষের মাঠে এক কেউটে সুমুখে পড়ে কোমর অবধি ফণা তুলল। শানানো কাস্তে ছিল সতীশের হাতে, এক চোপাটে কেটে ফেলতে পারত। কিন্তু কাটেনি। শুধু বিড়বিড় করে বলেছিল, ধান কাটতে গিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছি বাপু, মাপ করে দাও। কেউটেটা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফণা নামিয়ে চলে গেল। ঝড় বাদলার দিনে ভারি বাতাস আসে, চালাঘর উড়ে যেতে চায়, যায়ও। ছেলেপুলে বউ নিয়ে সতীশ জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকে শুধু। জানে ঝড় দুনিয়ার নিয়মে আসে, তারও বিষয়কর্ম

আছে। ঘাসের মতো মাথা নুইয়ে থাকতে হয়, ঝড় গরিবের ক্ষতি কিছু করে না। মেঘের ওপর থেকে বাজঠাকুর যখন বজ্রের বল্লম ছুঁড়ে মারেন তখনও সতীশ নিশ্চিন্তে খেতে কাজ করে। জানে, মরার হলে কেউ কি ঠেকাতে পারবে?

প্রাণ, চারদিকে কেবল প্রাণের খেলা দেখতে পায় সতীশ। সবাই ভারি জ্যান্ত, ভারি বন্ধুর মতো।

আগে বাঁকা নদীতে জল ছিল খুব। উপচে পড়ত। আজকাল আর জল নেই। বালির ওপর বালি জমা হয়ে উঁচুতে উঠেছে নদীর খাত। একধার দিয়ে শুধু নালার মতো জল বয়ে যায়। যখন জল ছিল, তখন বাঁকা নদীর জল ছেঁচে ক্ষেত ভাসিয়েছে সতীশ। আজকাল একটু কষ্ট, বর্ষাবাদল না হলে খেত জল পায় না। নদীকেও কেমন মানুষ-মানুষ লাগে সতীশের। সেও যেন কিছু বলে, কিছু শোনে।

ভারি ঠাণ্ডা সুস্থির সতীশের জীবন। সকাল থেকে রাত অবধি তার খাটুনির শেষ নেই। খেত চাষ, বলদ গরু কুকুর বেড়াল কাক সকলের যত্নআত্তি করে, ছেলেপুলে বউ সকলের পালনপোষণ আছে, গাছপালা আর পঞ্চভূত আছেন। সকলকেই সতীশ খুশি রাখতে চেষ্টা করে। কেউ জানে না, তার দুটো হেলে বলদ কখন হাসে কখন কাঁদে। তার গরুটা কখন উদাস হয়ে যায়। তার কুকুর চারটে, তার তিনটে বেড়াল এদেরও কি ঠিকমতো কেউ বুঝতে পারে, সতীশ ছাড়া? বাতাসে যাঁরা ঘুরে বেড়ান, রাতবিরেতে যাদের দেখলে লোকে ভিরমি খায় তাঁদেরও টের পায় সতীশ। গভীর রাতে মাঝে মাঝে সে যখন ঘুম ভেঙে উঠে মহাবিস্ময়ে তারাভরা আকাশের দিকে চেয়ে থাকে তখন টের পায়, কারা যেন বাতাসের মধ্যে বাতাসের শরীর নিয়ে মিশে কাছাকাছি আসে। একটু গা শিরশির করে তার।

একদিন বেহান বেলায় ঘাড়ে ভারী লাঙ্গল আর দুটো বলদ নিয়ে মাঠে যাচ্ছে সতীশ। আলের ওপর মুখোমুখি একটা ফুটফুটে ছেলের সঙ্গে দেখা। পরনে হেঁটো ধুতি, খালি গা। কী যে সুন্দর তার মুখচোখ। সতীশ হাঁ করে দেখছিল। ছেলেটা তার কাছাকাছি এসে একগাল হেসে বলে, এই দেখ, আমি দাঁত মেজেছি। আমার হাতে দেখ একটুও ময়লা নেই। আমি আজ কোনো দুষ্টুমি করিনি।

এত সুন্দর করে বলল যে ওই সামান্য কথাতেই কেন যেন জল এল সতীশের চোখে। সে ধরা গলায় বলল, তোমার ভালো হবে বাবা, তুমি বড়ো ভালো ছেলে।

ছেলেটা খুশি হয়ে নদীর ধার দিয়ে কোথায় চলে গেল। সতীশ কাউকে বলেনি, বলতে নেই। মনে মনে সে জানে, সেদিনই সে ভগবানকে দেখেছে।

দুপুরবেলা দুটো তৃষ্ণার্ত বলদকে মাটির গামলায় নুন মেশানো জল খাওয়াচ্ছিল সতীশ। উঠোনে ছায়া এসে পড়ল।

সতীশ, আছিস নাকি রে?

মনিবকে দেখে সতীশ তটস্থ হল। বাঁকা নদীর পোল পেরিয়ে মনসাতলা দিয়ে টুকটুক করে ছাতাটি মাথায় দিয়ে উনি নিত্যই আসেন। আসেন, এসে চাষের সময় খেতের ধারে আলের ওপর বসে থাকেন। ধান ঝাড়া হলে দেখতে আসেন। ধান মাপবার সময় দেখতে আসেন। কী দেখেন তা সতীশ জানে না। বিঘেপ্রতি যা ন্যায্য পাওনা হয় তা সতীশ বরাবর তুলে দিয়ে আসে মনিবের গোলায়। খরা বা বান হলে কমবেশি হয়।

মেয়ে খেঁদি দৌড়ে একটা জলচৌকি এনে পেতে দিল দাওয়ায়। মুখের ঘামটি কোঁচায় মুছে মনিব বসলেন। ফর্সা মুখখানা রোদের তাতে রাঙা হয়ে আছে। চুল আর গোঁফ কিছু পেকেছে, তবু মান্যিগণ্যি করার মতোই চেহারা।

খেঁদির কাছে চেয়ে এক ঘটি জলের অর্ধেকটা খেয়ে নিলেন। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, বেশ আছিস তোরা।

এ কথাটার মানে হয় না। শুনলে লজ্জা করে সতীশের। ভালো থাকা মন্দ থাকার সে কীই বা জানে। তবে মেখেজুখে আছে, মিলেমিশে আছে। চারদিকটার সঙ্গে তার ভারি ভাবসাব। মনে হয় পোকাটা মাকড়টা অবধি তাকে চেনে জানে।

সে মনিবের সামনে উঠোনে উবু হয়ে বসে বলে, দুটো ডাব পাড়ি।

ডাব! না রে, এ দুপুরে তোকে আর গাছে উঠতে হবে না।

কিছু নয় কর্তাবাবু। হনুমানের মতো উঠব আর নামব। যাওয়ার সময় কয়েকটা গন্ধরাজ লেবু নিয়ে যাবেন। এবার মেলা ফলেছে।

ডাবটা আস্তে আস্তে খেতে খেতে মনিব বললেন, সেই শ্বশুরমশাইয়ের আমল থেকে তোকে দেখে আসছি। একইরকম রয়ে গেলি। তুই বুড়ো হস না!

সতীশ মাথা চুলকে বলে, বয়স ভাঁটিয়ে গেছে অনেক দিন। সে কি আর আজকের কথা? বুড়োও হচ্ছি নিশ্চয়ই, বয়স তো হলই।

সেইরকম পাকানো চেহারা, শক্তপোক্ত, সারাদিন রোদে জলে খাটিস, বয়স মানিস না, তোর রকমটা বুঝতে পারি না।

ওই আজ্ঞে একরকম। চাষাভুষোর শরীর তো।

ওরে, আমিও পালোয়ান কিছু কম ছিলুম না। দেখেছিস তো আমার সেই চেহারা!

আজ্ঞে দেখিনি আবার! সব চোখের সামনে ভাসছে। যেদিন বিয়ে করতে এলেন নৌকো থেকে পালকি ঘাড়ে করে নামিয়েছিলাম। বুড়োকর্তার সে কি আহ্লাদ। কার্তিকের মতো জামাই হয়েছে।

আর লজ্জা দিস না। আজকাল নড়তে চড়তে হাঁফ ধরে যায়।

শরীর তো কিছু বেজুত দেখছি না। অনেকটা সেরকমই আছেন।

বিষ্ণুপদ উদাস চোখে মাঠঘাট পেরিয়ে কোন উধাওয়ের দিকে যেন চেয়ে থাকে। তারপর একটু ধরা-ধরা গলায় বলে, বিষয়-বিষয় করেই বোধহয় এরকম ধারা হল, কী বলিস!

গন্ধরাজ লেবু কটা কুয়োর জলে ধুয়ে এনে দাওয়ার ওপর রেখে সতীশ বলে, আপনার বিষয় না থাকলে আমার পেট চলত কী করে? আপনার জমিতে চাষ, আপনার ভুঁয়েই বাস।

বিষ্ণুপদ বড়ো বড়ো চোখে কেমন বিকল এরকম নজরে সতীশের মুখের দিকে চেয়ে বলে, ঠিক জানিস?

কিসের কথা বলছেন?

এ জমি যে আমার, এই চাষবাস যে আমার।

তা কে না জানে! হরপ্রসন্নবাবু আপনার নামে লিখে দেননি এসব?

কর্তাবাবুর আজ বড়ো বড়ো শ্বাস পড়ছে, লক্ষ করে সতীশ। মুখখানাও ভার। আজ বাবুর মনটা ভালো নেই। এই মন নিয়ে কারবার নেই সতীশের। তার মন বলে কি বস্তু নেই? থাকলেও ঠাহর পায় না। সকাল না হতেই কাজে নেমে পড়তে হয়। শরীর বেটে দিতে হয়, জান চুয়াতে হয়, তবে মাঠে মাঠে ফলন্ত মা লক্ষ্মীকে দেখা যায়। তখন শরীরে কেমন একখানা ফুরফুরে হাওয়া এসে লাগে।

বিষ্ণুপদ ডাবের খোলাটা সতীশের বাড়ানো হাতে ধরিয়ে দিয়ে ধুতির খুঁটে মুখ মুছে বলেন, লিখেই তো দিয়েছিলেন রে। তুই তো লেখাপড়া শিখিসনি, দলিলে কি লেখা থাকে তাও জানিস না।

সতীশ গম্ভীর মাথা নেড়ে বলে, তা অবশ্য জানি না। তবে এটা মনে হয় কোন জমিটা কার তা স্পষ্ট করে বলা থাকে দলিলে।

তা থাকে। তবে আমরা হচ্ছি ভাড়াটে। আসল জমি হল সরকার বাহাদুরের। ভোগ দখল বিক্রি, বা বিলিব্যবস্থার অধিকার আছে মাত্র। সরকার ইচ্ছে করলেই কেড়ে নিতে পারে।

সতীশ মাথা নেড়ে বলে, সেটাও ঠিক নয়। এই আলো বাতাস এসব তো সরকার বাহাদুরের নয়, নাকি?

আলো বাতাস! তা কি করে সরকারের হতে যাবে?

তাহলে জমিও নয়। দুনিয়াটা যার এসব হচ্ছে তারই জিনিস।

বিষ্ণুপদ সতীশের দিকে মায়াভরে চেয়ে থাকে বলে, তোর মধ্যে এই একটা জিনিস আছে। এটিই তোকে বুড়ো হতে দেয় না। এর জন্যই এই বয়সেও তোর গায়ে মোষের মতো জোর। তোর মতো নয়, তাহলেও শ্বশুরমশাইয়ের মধ্যেও এরকম একটা ব্যাপার ছিল।

তিনি ছিলেন আমার অন্নদাতা দেবতা। ওরকম মানুষ হয় না।

বিষ্ণুপদ একটু হেসে বলে, তুই তো সবার মধ্যেই ভগবান দেখতে পাস। এ খুব ভালো। আমাকে শেখাবি কি করে সবকিছুর মধ্যে ভগবানকে দেখতে হয়?

সতীশ লজ্জায় মুখ নিচু করে হাসে, কী যে বলেন তার ঠিক নেই। আমি শেখাবো কি? মুখ্যুসুখ্যু মানুষ আমরা। ওসব আস্পর্ধার কথা শুনতে নেই। তবে এটা জানি, জমির মালিক যদি আপনি না হন তবে সরকার বাহাদুরও নয়। আপনার যা বন্দোবস্ত সরকার বাহাদুরেরও তাই।

বুঝেছি রে। আর বোঝাতে হবে না। তুই সবকিছুর মধ্যে ভগবান দেখিস, আর আমি দেখি বিষয়।

তাই দেখেন কর্তাবাবু, তাই ভালো করে দেখেন।

বিষ্ণুপদ একটু ম্লান হেসে বলে, দূর পাগল! বিষয়ের মধ্যে আছেটা কী? তাও যদি নিজের জোরে করতে পারতুম তো বলার মুখ থাকত। এ হল পড়ে পাওয়া চৌদ্দ আনা। শ্বশুরমশাই ঘর-জামাই করতে চাইল, তখন বড়ো গরিব ছিলুম তো, বাপের কাছে কলকে পেতুম না, তাই নেচে উঠেছিলুম। ভাবলুম না জানি চারখানা হাত গজাবে। এসে সাজানো সংসারে ঘটের মতো বসলুম। ফক্কিকারিটা যদি তখনও বুঝতে পারতুম রে। আজ যেন কোথায় একটা খোঁচা টের পাচ্ছি।

মানুষকে দুঃখ পেতে দেখলে সতীশের কেমন যেন জলে-পড়া অবস্থা হয়। সে একটু ব্যগ্র হয়ে বলে, তা এর মধ্যে খারাপটা কিসের দেখলেন? আমি তো কিছু খারাপ দেখছি না!

খারাপ নয়? পাঁচজন কি আর আমাকে ভাল বলে রে? আড়ালে রঙ্গ রসিকতা করে, আমি টের পাই। সম্বন্ধীরাও ভালো চোখে দেখে না। এমন কি বড়ো ছেলেপুরেরাও নয়। এই তো আজ জামাই এল, তার ভাবখানা যেন লাটসাহেবের মতো, শ্বশুর বলে যে কেউ একজন আছে তা গায়েই মাখতে চায় না।

সতীশ মাথা চুলকোয়। বাবুর সমস্যাটা কোথায় হচ্ছে তা ঠিক ধরতে পারছে না সে। ওই হল মুশকিল। নিজেকে বাবুটাবুদের জায়গায় বসিয়ে তো আর ভাবতে পারে না। তার তো

ওসব বড়ো বড়ো সমস্যা নেই। তবু সে বলল, জামাই তো দিব্যি আপনার। এই তো সেদিন বে হল। গাড়ি চেপে জামাই এল, কাছে থেকে বেশ করে দেখলুম।

বিষ্ণুপদ ঠাট্টা করে বলে, কি দেখলি? ভবগান নাকি?

সতীশ একটু লজ্জা পেয়ে বলে, কিছু খারাপ নয় তো।

বিষ্ণুপদ একটু চুপ করে থেকে বলে, খারাপ কাউকে বলি কি করে? খারাপ আমার কপাল। ভাবছি এখানে তোর কাছাকাছি একখানা ঘর তুলে থাকব। আমাকে চাষের কাজ শেখাবি?

কি যে বলেন তার ঠিক নেই।

তোর সঙ্গে থেকে থেকে চাষাবাস শিখব, বুড়ো বয়সকে ঠেকাতে শিখব, আর ভগবান দেখতে শিখব। শেখাবি?

আজ বাবুর কথাগুলো বড়ো উঁচু উঁচু দিয়ে চলে যাচ্ছে। সতীশ নাগাল পাচ্ছে না। কী বলতে হবে তাও মাথায় আসছে না তার।

ঠিক এই সময়ে তার বউ সুরবালা রান্নাঘর থেকে ঘোমটা-ঢাকা অবস্থায় আধখানা বেরিয়ে এসে বলল, বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে। বাবুকে বলো এখানেই স্নান করে দুটি খেয়ে যেতে।

বিষ্ণুপদ গায়ের জামাটা খুলতে খুলতে বলে, সে কথাটাও মন্দ নয়। খাওয়াবি নাকি রে সতীশ দুটি ভাত?

সতীশ এত অবাক হল যে বলার নয়। বাবু খাবেন! তার বাড়িতে? সে উত্তেজিত হয়ে বলে, কচুঘেঁচু কী রান্না হয়েছে কে জানে! এ কি আপনি মুখে দিতে পারবেন? কত ভালো খাওয়া হয় আপনাদের!

রোজ তো নিজের মতোই খাই। আজ না হয় তোর মতোই খেয়ে দেখি। তেলটেল থাকলে দে। স্নানটা করে আসি।

এই যে দিই।

বলে সতীশ ছোটাছুটি শুরু করল। তেল এনে দিল। নিজেই গিয়ে কুয়ো থেকে জল তুলল। একখানা নতুন গামছা কিনেছিল হাট থেকে। সেইটি বের করে দিল।

বিষ্ণুপদ সত্যিই স্নান করে এসে খেতে বসে গেল।

খেতে খেতে বলল, আমার মা এখনও বেঁচে আছে তা জানিস? গ্যাঁড়াপোতায় আমাদের বাড়ি। বহুকাল যাওয়া হয়নি। বিষয় সম্পত্তি নিয়ে এমন মজে আছি যে--

সতীশ কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। মিনমিন করে বলল, মোট চালের ভাত, গিলতে আপনার কষ্ট হচ্ছে খুব।

ছেলেবেলায় এই মোটা চালের ভাতই জুটতে চাইত না। কষ্ট ছিল খুব, আর কষ্টে থাকলে মানুষ কত কী করে ফেলে। শ্বশুরমশাই এমন লোভানীতে ফেলে দিলেন যে সব ছেড়েছুড়ে একেবারে পুষ্যিপুত্তুরটি হয়ে চলে এলুম। একটা বড়ো লাফ মেরে খানাখন্দ সব ডিঙিয়ে এলুম বটে, কিন্তু একবার ফিরে দেখা তো উচিত ছিল ভাইরা, বোনরা, আমার মা-বাবা তারা ডিঙোতে পারল কিনা। উচিত ছিল না, বল?

সতীশ সুরবালার দিকে চেয়ে বলে, বাবুকে আর একটু ডাল দাও বরং। আর একটু চচ্চড়িও নিন। ঝাল হয়নি তো বাবু?

ঝালটাই তো ব্যঞ্জন ছিল রে। ভাত পাতে আর কীই বা জুটত। শুধু লঙ্কা। বোনগুলোর একটাও ভালো বিয়ে হয়নি। শুনেছি। ভাইগুলোও বড়ো কেউকেটা হয়নি। বাবা দুঃখে কষ্টে গেছে। মাটা এখনও ধুকধুক করে বেঁচে আছে।

সতীশ উঁচু হয়ে বসে পাতে আঁকিবুকি কাটছে। তার হল চাষাড়ে খিদে। যখন খেতে বসে তখন অন্ন ব্যঞ্জনের স্বাদ পায় না, গোগ্রাসে শুধু গিলে যায়। চোখের পলকে পাত সাফ। আজ তার ভাত যেন উঠতেই চাইছে না। পাহাড়প্রমাণ পড়ে আছে পাতে।

আপনার পেট ভরল না বাবু।

বিষ্ণুপদ খুব ধীরে ধীরে উঠে পড়ল। আঁচিয়ে এসে বলল, এই দাওয়াতেই একটা মাদুর পেতে দে, একটু গড়িয়ে নিই। এখানে দিব্যি হাওয়া আছে।

সতীশের মেয়ে খেঁদি একটা পান সেজে এনে দিল। পান খায় না বিষ্ণুপদ। তার কোনো নেশা নেই, এক বিষয় সম্পত্তির নেশা ছাড়া। তবু আজ পানটা খেল।

আমাদের বালিশ বড়ো শক্ত কর্তাবাবু। তুলোর বড্ড দাম বলে পুরোনো ন্যাকড়া ট্যাকড়া ভরে খোল সেলাই করে নিই। আপনার অসুবিধে হবে।

তুই অনেকক্ষণ ধরে কেবল ভদ্রতা করছিস। কাছে এসে বোস।

সতীশ বসল।

আধশোয়া হয়ে অনেকক্ষণ আবার সামনের মাঠঘাটের দিকে চেয়ে চেয়ে পান চিবোয় বিষ্ণুপদ। তারপর বলে, মানুষ যে কী চায় সেটাই তো বুঝতে পারে না। তুই বুঝিস?

সতীশ ঘনঘন মাথা চুলকে বলে, ক্ষেতে কিছু লাল শাক হয়েছে। খেঁদি তুলে দেবেখন। নিয়ে যাবেন। মা ঠাকরুণ লাল শাক বড়ো ভালোবাসেন।

আমাকে একটা ঘর করে দিবি? ওই ক্ষেতের মাঝখানটায় হবে। চারদিকে ধানক্ষেত থাকবে, মাঠ ময়দান থাকবে, গাছপালা থাকবে। একা একা বেশ থাকব। দিবি?

এবারও ধান ভালো হবে না। খেতে জল না হলেই বড়ো মুশকিল। নদীটাও শুকোল।

বালিশে মাথা রেখে বিষ্ণুপদ চোখ বুজল। আপন মনে বলল, কত বয়স হয়ে গেল রে।

৪

পাগলাটাকে আজ বেধড়ক পিটিয়েছে ছানু। একেবারে অমিতাভ বচ্চনের কায়দায়। সে একা নয়, তাদের শীতলা মাতা স্পোর্টিং ক্লাবের ছেলেরাও ছিল। তবে তারা বেশি মারেনি। ছানুরই রাগটা বেশি চড়ে গিয়েছিল। ঘর-জামাই রাখবে! ঘর-জামাই রাখবে বলে চেঁচিয়ে পাড়া মাত করলে কার না রাগ হয়! জামাইবাবু খেতে বসেছে সবে, এমন সময় কোথা থেকে পাগলাটা এসে হল্লা জুড়ে দিল। তার বাবা ঘর-জামাই ছিল বলে একটু চাপা কানাকানি হাসি মস্করা বরাবরই শুনে আসছে ছানু। আজকের বাড়াবাড়িটা তাই সহ্য হয়নি।

কিন্তু মারটা একটু বেশি হয়ে গেছে। নাক দিয়ে ঝরঝর করে রক্ত পড়ছিল, একটা চোখ কালশিটে পড়ে বুজে গেছে, কাঁকালেও জোর লেগেছে। কোঁকাতে কোঁকাতে অজ্ঞান-মতো হয়ে গিয়েছিল।

খাওয়া ফেলে গোবিন্দই এসে জাপটে ধরল তাকে, করছোটা কী? মেরে ফেলবে নাকি?

ছানু তখনও রাগে ফুঁসছে, কত বড়ো সাহস দেখলেন। বাবাকে অপমান!

গোবিন্দ ঠাণ্ডা গলায় বলল, নিজেদের ঘাড়ে নিচ্ছো কেন? পাগলরা কত কিছু বলে, কত কিছু করে, তার কি কিছু ঠিক আছে? এঃ, এর যে খুব খারাপ অবস্থা।

ক্লাবের ছেলেরাই দৌড়ে জল নিয়ে এল। বহুক্ষণ জলের ঝাপটাতেও কাজ হল না।

গোবিন্দ গম্ভীর মুখ করে বলল, ভিক্ষে করে খায়, কখনও তাও জোটে না, ওর কি এত মার খাওয়ার মতো ক্ষমতা আছে শরীরে? দেখছো না কেমন হাড়-বের-করা চেহারা, দুর্বল!

ছানু একটু ভয় খেয়ে গিয়েছিল তখন। যদি মরে টরে যায় তাহলে কী হবে? একটু কাঁপা গলায় বলল, ওরকম না বললে কি মারতুম?

গোবিন্দ গিয়ে পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরিয়ে কৃষ্ণকান্তের নাকে অনেকক্ষণ ধোঁয়া দিল। কাজ হল না তাতে। বলল, পাগল আর দুর্বল বলেই মারতে পেরেছো, নইলে কি পারতে?

পাগলটা বড্ড টানা মারছে শরীরটাতে। খিচুঁনির মতো।

ও গাঁয়ে ডাক্তার নেই? গিরীন না কে একজন ছিল না?

ক্লাবের একটা ছেলে বলে, হ্যাঁ, আমার কাকা। কাকা তো বেলপুকুর গেছে।

গোবিন্দ গম্ভীর হয়ে খানিকক্ষণ ভেবে বলল, রাস্তায় ফেলে রাখা ঠিক হবে না। তোমরা ধরো ওকে। দাওয়ায় তুলে শুইয়ে দাও। এ বোধহয় আজ খায়নি। পেটটা খোঁদল হয়ে আছে।

ক্লাবের ছেলেরা ধরাধরি করে, চণ্ডীমণ্ডপে তুলে শোয়াল কৃষ্ণকান্তকে। কে একটা পাখা নিয়ে এসে মাথায় বাতাস করতে লাগল।

ছানুকে ভিতর বাড়িতে নিয়ে গেল তার দিদি, তোকে মা ডাকছে।

পাপিয়া--অর্থাৎ ছানুর মা ছেলের দিকে চেয়ে বলে, খুন করেছিস নাকি পাগলটাকে?

তুমিই তো আমাকে ডেকে বললে পাগলটা কি সব অসভ্য কথা বলছে, গিয়ে দেখতে।

তা বলে অমন মারবি?

বেশি মারিনি। বেকায়দায় লেগে গেছে।

জামাই তোকে কী বলছিল? বকছিল নাকি?

জামাইবাবু মনে হয় রেগে গেছে।

এ কথায় তার দিদি আর মায়ের মুখ শুকোলো।

পাপিয়া চোখের জল মুছে বলে, বিয়ের পর দু মাসও কাটেনি, এর মধ্যে জামাইকে কে যে ওষুধ করল কে জানে, বিষ নজরে দেখে আমাদের। মেয়েকে নেওয়ার নামটিও করে না। কেমন যেন রোখা-চোখা রাগ-রাগ ভাব। সাতবার খবর পাঠিয়ে আনিয়েছি এ নিয়ে কথা বলব বলে। দিলি সব ভণ্ডুল করে। জামাই আরও রেগে রইল। এখন কী হবে?

কী হবে তার ছানু কী জানে? তবে গোবিন্দদা যে তাদের বিশেষ পছন্দ করে না এটা সে টের পায়। কিন্তু মাথা ঘামায় না। সংসারের সম্পর্ক-টম্পর্ক নিয়ে মাথা ঘামাতে তার ভালোই লাগে না।

পাপিয়া চোখের জল মুছে বলে, সব অশান্তির মূলে ওই একটা লোক। লোভী, স্বার্থপর, অন্ধ। বিয়ের পরই আমি পই পই করে বলেছিলাম, ওগো, বাবার সম্পত্তি আঁকড়ে পড়ে থেকো না, নিজের পায়ে দাঁড়াও। চলো আমরা অন্য কোথাও চলে যাই। মতিচ্ছন্ন হলে কি কেউ ভালো কথা কানে নেয়? বাবার পিছনে পিছনে চাকরবাকরের মতো ঘুরত। গাঁয়ে কত হাসাহাসি হয়েছে তাই নিয়ে, গ্রাহ্যও করত না।

মেয়ে মুক্তি বলল, ওসব কথা থাক তো এখন। চণ্ডীমণ্ডপে ভীষণ ভীড় জমে গেছে। আমার ভয় করছে।

পাপিয়া আর একবার চোখে আঁচল-চাপা দিয়ে কাঁদল। তারপর মুক্তিকে বলল, কিছু টাকা বার করে ক্লাবের ছেলেদের হাতে দে। নাটাগড়ের হাসপাতালে নিয়ে যাক। মরলে সেখানেই মরুক, এখানে যেন না মরে।

মুক্তি চলে গেলে ছানুর দিকে চেয়ে পাপিয়া বলে, জামাই আসে অমনি ওরা এসে জোটে।

কারা মা?

তোর মামাতো দিদি আর বোনেরা। ওরাও মাথাটা খাচ্ছে। মুক্তির দিকে ফিরেও চায় না। শালীদের সঙ্গে ঠাট্টা তামাশা করে ফিরে যায়।

বিরক্ত হয়ে ছানু বলল, এখন একটা বিপদের সময় কেন যে জামাই নিয়ে পড়লে!

বিপদ তো তুই-ই বাধিয়েছিস মুখপোড়া। সংসারে কত রকম বিপদ আছে তা জানিস?

ছানু রাগে দুঃখে ঠোঁট কামড়াল। বুকে বড্ড ভয়ও তার। মাথাটা কেমন করছে যেন। সে ক্যারাটে মারার কায়দায় একখানা লাথিও কষিয়েছিল পাঁজরে। সত্যিই মরে যাবে নাকি পাগলটা?

সে ঘুরে সদর দরজার কাছে এসে দূর থেকে ভিড়টা দেখতে গেল। তার দিদি মুক্তি গোবিন্দদার সঙ্গে কী যেন কথা বলছে একটু তফাতে দাঁড়িয়ে। গোবিন্দদার মুখটা লাল টকটক করছে। খুব রাগের সঙ্গে কী যেন বলছে। মুক্তি বোধহয় কাঁদছে। বার বার আঁচল তুলছে চোখে।

মরে গেল নাকি?

আজ বাজারে একটা সিনেমা দেখানো হবে। শিবা। দারুণ ঝাড়পিটের ছবি। ফিলমটা দেখা লাটে উঠল।

এ একটা অদ্ভুত ব্যাপার। পাগলটা যদি মরে যায় তাহলে পুলিশ আসবে, তাকে ধরবে, বিচার হবে, সাজাও হবে। পাগলটার জন্য দরদ উথলে উঠবে মানুষের। অথচ লোকটা যে খেয়ে না খেয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে, রোজ মরতে মরতে বেঁচে ছিল তখন দরদটা ছিল কোথায়?

যে কোনো দিন বাঁকা নদীর পোলের ওপর থেকেও তো পড়ে মরতে পারে। রোজ রেলিং-এর ওপর ওঠে এ মুড়ো থেকে ও মুড়ো পায়চারি করে।

ভীড়ের ভিতর থেকে চেঁচামেচি ক্রমে জোরালো হয়ে উঠছে, কে মেরেছে রে? বাপের জমিদারি পেয়েছে নাকি? যা তো বলাগড় থানায় গিয়ে একটা খবর দিয়ে আয় তো, কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে যাক।

আর একজন খুব তেজের গলায় বলে, ঘর-জামাই রাখার কথায় বাবুদের খুব আঁতে লেগেছে বোধহয়। সাতে পাঁচে নেই পাগলটা, পোলের নিচে পড়ে থাকত। ইস, একেবারে খুনই করে ফেলেছে!

ধরে দে না ঘা কতক ছোঁড়াটাকে টেনে এনে। পালাল কোথায়?

ছানু কী করবে বুঝতে পারছে না। তার বীরত্ব উবে গেছে। মাথাটা কেমন কেমন লাগছে।

গোবিন্দকে দেখতে পেল ছানু, ভীড় সরিয়ে চণ্ডীমণ্ডপে উঠে গেল। গোলমালটা একটু কম। সবাই খুব মন দিয়ে নিচু হয়ে কী যেন দেখছে। ভগবান! মরে যাচ্ছে নাকি? এবারকার মতো বাঁচিয়ে দাও ভগবান। জীবনে আর কারও গায়ে হাত তুলব না।

ছানু বিহ্বল হয়ে অবশ হয়ে বসে পড়ল বারান্দায়।

কতক্ষণ বসে আছে তা খেয়াল ছিল না। হঠাৎ দেখতে পেল তার দিদি মুক্তি এক গ্লাস গরম দুধ আঁচলে ধরে নিয়ে যাচ্ছে দ্রুত পায়ে।

চোখ মেলেছে! চোখ মেলেছে! চিৎকার উঠল একটা।

ভগবান! বলে ডেকে কেঁদে ফেলে ছানু। পাঁচ সিকে মানত করে ফেলে শীতলা মায়ের কাছে। একটা শোরগোল উঠল চণ্ডীমণ্ডপে।

কেষ্ট পাগলা উঠে বসেছে। দুধ খাওয়ানো হচ্ছে তাকে। একরকম জড়িয়ে ধরে আছে তাকে গোবিন্দ। দুধ খাওয়াচ্ছে।

মারমুখো ভীড়টাকে শেষ অবধি সামলে নিল গোবিন্দই। উঠে দাঁড়িয়ে জোরালো গলায় ধমকের সুরে বলল, যে যার বাড়ি যান। এখানে ভীড় করে লাভ নেই। কৃষ্ণকান্তর দায়িত্ব আমি নিচ্ছি। এখন হাওয়া-বাতাস খেলতে দিন।

ভীড়টা পাতলা হতে লাগল। শেষ অবধি রইল গোবিন্দ, মুক্তি আর ক্লাবের দুটো ছেলে, যারা ছানুর বন্ধু।

গোবিন্দ হাতছানি দিয়ে ডাকল ছানুকে। ছানু দুর্বল পায়ে গিয়ে দাঁড়াল চণ্ডীমণ্ডপের কাছটিতে। কখন একটা শতরঞ্চি পেতে বালিশে শোয়ানো হয়েছে কৃষ্ণকান্তকে। চোখ মিটমিট করছে। ঠোঁটে একটু ভ্যাবলাকান্ত হাসি। পাগল বলে কথা, সে কি আর মারধর অপমানের কথা মনে রাখে! গোবিন্দ ছানুর দিকে চেয়ে বলে, কেসটা খুব খারাপ করে ফেলেছিলে। ছানু শুকনো গলায় বলে, আর হবে না।

খুব ভয় পেয়েছো, না?

ছানু চুপ করে থাকে।

আর ভয়ের কিছু নেই। কৃষ্ণকান্ত মনে হচ্ছে, টিকে যাবে। গাঁয়ের লোক বলাবলি করছিল, ও নাকি আগে এই চণ্ডীমণ্ডপেই থাকত।

মুক্তি বলে, হ্যাঁ থাকত। নোংরা করে রাখে বলে বাবা তাড়িয়ে দিয়েছিল।

তোমাদের চণ্ডীমণ্ডপ, তোমরা যা ভালো বুঝেছ করেছ। কিন্তু লোকে ব্যাপারটা ভালো চোখে দেখেনি। হরপ্রসন্নবাবু নিজেই থাকতে দিয়েছিলেন ওকে। একধারে পড়ে থাকত। কী এমন ক্ষতি হচ্ছিল তাতে?

তার দিদি মুক্তির সঙ্গে জামাইবাবু গোবিন্দর যে তেমন বনিবনা হচ্ছে না, এটা ছানুও জানে। তার দিদি বোধহয় এ কথার জবাবে একটা বাঁকা কথা বলে বসত। সম্পর্কটা এভাবেই খাট্টা হয়ে যায়। ছানু ছলছল চোখে বলল, না, ক্ষতি কিসের? আমি বাবাকে রাজি করিয়ে ওকে রেখে দেবো।

দেখো চেষ্টা করে। হরপ্রসন্নবাবুর মায়াদয়ার শরীর ছিল। অনেকের আশ্রয়দাতা ছিলেন। লোকে সেকথা এখনও বলে। সব জায়গা থেকে তাড়া খেয়ে এখন গিয়ে পোলের নিচে থাকে।

এতক্ষণ ছেলে দুটো কথা বলেনি। এবার তাদের একজন রবীন বলল, পোলের নিচেও তো দুপাশে খোলা। ঝড় জল হলে ভেজে।

প্রাণেশ বলল, রেলিঙের ওপর ওঠে রোজ হাঁটে। কবে যে পড়ে মরবে।

গোবিন্দ একটু গম্ভীর চিন্তান্বিত মুখে বলে, হরপ্রসন্নবাবুর বিষয়বুদ্ধিও ছিল, মহত্ত্বও ছিল। তার বিষয়বুদ্ধিটুকু শুধু নিলাম, মহত্ত্বটা নিলাম না এটা ভালো নয়।

খোঁচাটা কাকে তা টের পেল ছানু। কান একটু গরম হল।

মুক্তি বলল, ওভাবে বলছো কেন? দাদু দাদুর মতোই ছিল, তা বলে সবাই তার মতো হবে নাকি?

সেই কথাটাই তো বলছি। সবাই কি আর ওরকম হয়? অনেকে শাঁসালো শ্বশুর পেয়ে মা-বাপকে আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিয়ে আসে। যাকগে, একে একটু দেখো। আমার ফেরার বাসের সময় হয়েছে। আমি এবার উঠব।

মুক্তির মুখ রাগে অভিমানে ফেটে পড়ছে। গোবিন্দকে খবর দিয়ে না আনালে আসতে চায় না। এলেও রাতে থাকে না। ছানু বোঝে, কোথায় একটা গণ্ডগোল পাকিয়ে উঠছে। গোবিন্দদা বাবাকে একদম সহ্য করতে পারে না। আর দিদি বাবাকে ভীষণ ভালোবাসে। তাই কি ওদের ঝগড়া?

২

হেগে মুতে ফেলে বলে ছেলেরা আর মাকে ঘরে থাকতে দেয় না। বারান্দায় হোগলার বেড়া তুলে ঘিরে দিয়েছে, সেই বেড়ারও ওপর নিচে ফাঁক। শীতের হাঁড়-কাঁপানো হাওয়া, বর্ষাবাদলা, ধুলো বালি, সাপ-ব্যাঙ সবই ঢোকে। দরজা বলে কিছু নেই। খাঁ খাঁ করছে

একটা দিক। বেড়াল-কুকুর ঢুকে পড়ে অহরহ। শরীরে নানা রোগভোগ নিয়ে বুড়ি একখানা নড়বড়ে চৌকির ওপর পড়ে থাকে। এ একরকম ঘরের বার করে দেওয়া। একরকম বিদায় দিয়ে দেওয়া।

গ্যাঁড়াপোঁতায় দিদির বাড়িতে গেলে একবার করে যায় গোবিন্দ। বুড়ো মানুষদের ওপর তার এমনিতেই একটা টান আছে। পুরোনো সব দিন যেন ঘিরে থাকে তাদের, কত গল্প শোনা যায়। তাদের কষ্ট গোবিন্দ ঠিক সইতে পারে না।

তার ওপর এ হচ্ছে সম্পর্কে তার দিদিশাশুড়ি। নাতজামাই এ গাঁয়ে আসে জেনে বুড়ি বড্ড কাকুতি মিনতি করে ধরেছিল। গোবিন্দর দিদি হিমিকে। নাতজামাই এলে যেন একবারটি চোখের দেখা দেখতে পায়। তারপর গোবিন্দ প্রায়ই যায়। মানুষকে মানুষের এত অপমান করার অধিকার নেই। থাকতে পারে না। বুড়িকে তার ছেলেরা যেভাবে লাঞ্ছনা গঞ্জনা দিচ্ছে এরকমটা কোনো বুড়ো মানুষেরই সঠিক পাওনা নয়। গোবিন্দ ইচ্ছে করে রাগে ফেটে পড়ে খুব অপমান করতে এদের।

এসে সে একখানা মোড়া পেতে কাছেই বসে থাকে। রসগোল্লা বা সন্দেশ নিয়ে আসে বুড়ির জন্য। বুড়ির নোংরা বিছানা বা কাপড় জামা, মুতের মেটে হাঁড়ি কিছুতেই সে ঘেন্না পায় না।

বুড়ি তার সাড়া পেলেই উঠে বসে। রোগা জীর্ণ চেহারা। রোগের যন্ত্রণায় চোখ মুখ বসে গেছে। তবু গোবিন্দ এলে ফোকলা মুখে খুব হাসে।

এসেছিস ভাই? তোকে দেখলে আমার প্রাণটা কেন ঠাণ্ডা হয় রে?

আপনার ঠাণ্ডা হয়, আর আপনার অবস্থা দেখলে যে আমার মাথা গরম হয়।

এরকমই তো হওয়ার কথা। সংসার বড়ো জঞ্জাল।

সংসার জঞ্জাল কেন হবে ঠাকুমা? সংসারকে জঞ্জালে বানালে তবেই তা জঞ্জাল হয়। আপনার ছেলেরা বড্ড অমানুষ।

বুড়ি ভয় খেয়ে বলে, ওরে, জোরে বলিসনি। শুনলে আমাকে খুব হেনস্তা করবে। একটু ওদের কথা বল, শুনি।

গোবিন্দ হাসে। ওদের কথা বলতে, বড়ো ছেলে আর তার সংসারের কথা। গোবিন্দ বলে, সে ছেলেও তো আপনাকে ছোলাগাছি দেখিয়ে কেটে পড়েছে। নাতি নাতনি কাউকে চোখে দেখেছেন?

বুড়ি থোতা মুখ করে বলে, কোত্থেকে দেখব বল! কে দেখাবে? তারা কি আর আসে? তবে ভালো থাকলেই ভালো।

ভালো থাকবে না কেন? দিব্যি ভালো আছে। আপনার ছেলে শ্বশুরের পয়সায় হেসে-খেলে আছে।

তোর বউটা কেমন হল? ভালো? যত্ন আত্তি করে?

এখনও ভালো করে ঘরে আনিনি।

ওমা! তা কেন রে?

ইচ্ছে হয় না। মেয়েটা বড্ড মুখরা। একটু তেল মজিয়ে নি।

ত্যাগ দিবি না তো!

গোবিন্দ হাসে, বিয়ে করার ইচ্ছেই ছিল না আমার। বিয়ে করলেই নানারকম ভজঘট্ট পাকিয়ে ওঠে। আপনার নাতনিটিও সোজা নয়। বিয়ের রাতেই আমাকে পরামর্শ দিয়েছিল আলাদা বাসা করে থাকতে। সেই যে পিত্তি জ্বলে গেল, আর ঠাণ্ডা হল না।

তোর কিন্তু বড্ড রাগ ভাই। আমার নাতনিটাকে এনে একবার দেখাবি আমায়?

আরও নাতনি দেখার শখ! এ বাড়িতেই গোটা দুয়েক নাতি নাতনি আছে আপনার।

তাকে দেখিনি তো কখনও। বড্ড দেখতে ইচ্ছে যায়। কবে মরে যাবো, একবার মুখখানা দেখে রাখি। কেমন চেহারা রে? বাপের মতো মুখ পেয়েছে?

হ্যাঁ।

তাহলে দেখতে ভালোই হবে। তোর পছন্দ তো?

চেহারা খারাপ নয়। আপনি তো তাদের কথা শুনতে চান, কিন্তু তারা কখনও আপনার কথা ভুলেও মুখে আনে না কেন ঠাকুমা? এটাই কি সংসারের নিয়ম?

বুড়ি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, শুনেছি বিষ্টু নাকি এ বাড়িতে খুব কষ্টে ছিল বলে তার রাগ আছে। বিয়ে করে বিদেয় হওয়ার জন্য বড্ড অস্থির হয়েছিল। তা সে তার ছেলেপুলে নিয়ে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকলেই হল। এই বুড়ো বয়সে একটা কথাই কেবল মনে হয়, যে কটা দিন আছি যেন শোকতাপ পেতে না হয় আর। ওইটাই ভয়ের ব্যাপার, বুঝলি? ছেলেপুলে নাতি নাতনি যখন অনেকগুলো হয়ে যায় তখনই ভয় হয়, কোনটা পড়ল, কোনটা মরল। বড়ো জ্বালা।

বুঝেছি ঠাকুমা।

আর একটা হয়, সবাইকে খুব দেখতে ইচ্ছে করে। বিষ্টুর তো দুই ছেলেও আছে। তারা কেমন?

আর পাঁচটা ছেলের মতোই।

এই পোড়া চোখে তো আর দেখতে পাব না তাদের। তোর চোখ দিয়েই যেন দেখতে পাচ্ছি।

এত মায়া কেন বলুন তো ঠাকুমা! এত মায়া থাকলে যে শরীর ছাড়তে কষ্ট হবে।

বুড়ি একটু কেঁপে ওঠে, শরীর কি আর ছাড়তে চায় রে! এত কষ্ট, তবু শরীর ধরে পড়ে আছি। পাপের মন তো, সহজে তাই মরতে দেয় না ভগবান। আরও অনেক ভোগাবে, তবে মারবে।

গোবিন্দ বসে বসে বুড়ির ঘরখানা দেখে। আদপে ঘরই নয়। একটা আব্রু মাত্র। রাতের বেলায় ছেলেরা ঘরে দোর দিয়ে শোয়। বুড়ি বাইরে বেওয়ারিশ পড়ে থাকে। মানুষ যে কী করে এত হৃদয়হীন হয়!

শ্বশুরবাড়ি থেকে পর পর শাশুড়ির কয়েকটা চিঠি এল। কুসুমপুর থেকে যারা নাটাগড়ে আসে তাদের হাত দিয়েই চিঠি পাঠায় শাশুড়ি। একটাই বয়ান। মেয়েকে কবে ঘরে নেবে গোবিন্দ। সংসারে মন দিতে আর ইচ্ছাই হয় না গোবিন্দর। সংসার বড়ো নিমকহারাম জায়গা। তার ওপর ওই বাপেরই তো মেয়ে, তার আর কতটুকু মায়াদয়া হবে? তার চেয়ে একাবোকা বেশ আছে সে। তার বাড়ির লোক বউ আনার জন্য খুব গঞ্জনা দেয়, বিশেষ করে মা। গোবিন্দ মাথা পাতে না। গড়িমসি করে।

গত সপ্তাহেও গ্যাঁড়াপোঁতা গিয়ে বুড়িকে দেখে এসেছে গোবিন্দ। মনে হয়েছে, আর বেশিদিন নেই। বুড়ি বালিশের তলা থেকে একখানা তোবড়োনো সোনার আংটি বের করে তার হাতে দিয়ে বলল, তোর বউকে দিস।

এটা আবার কেন? এ আমি নেবো না। আপনার শেষ সম্বল এসব।

চুপ চুপ! গলা তুলতে নেই। আমার যা ছিল সব ওরা নিয়ে নিয়েছে। এটা অতি কষ্টে লুকিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিলাম। সম্বল বলিসনি, এ আমার শত্রু। অভাবের সংসারে গয়না সব অনেক আগেই গাপ হয়ে গিয়েছিল। পাঁচ গাছা চুড়ি, দুটো ঝুমকো দুল, দুটি মাকড়ি আর তিনটে আংটি ছিল। এইটেই শেষ আংটি। টের পেলেই নিয়ে নেবে। এটা মুক্তির জন্য রেখেছি।

কেন রেখেছে কে জানে। তবে বুড়ি যার জন্য রেখেছে তার কাছে যে এই আংটির কোনো দাম হবে না তা গোবিন্দ ভালোই জানে। মুক্তি তার বাপের একমাত্র মেয়ে বলে গয়নাগাঁটি মেলাই পেয়েছে। হরপ্রসন্ন নাকি নাতনিকে খুব ভালবাসতেন, বিয়ের গয়না তিনিও কিছু দিয়ে গিয়েছিলেন। মুক্তি ওই তোবড়ানো আংটির আসল দাম বুঝতে চাইবে কি?

কিন্তু গোবিন্দ বোঝে। আংটিটা মাথায় ঠেকিয়ে কাগজে মুড়ে পকেটে রেখে সে বলল, এ আংটির দাম লাখ টাকা।

সে তোর কাছে ভাই। তুই যে সোনার মানুষ।

এত চট করে সার্টিফিকেট দিয়ে বসবেন না। এখনও কিন্তু আপনার নাতনিকে নিয়ে ঘর করা শুরু করিনি। সংসারে পড়লেই কে কেমন বোঝা যায়।

তোদের সংসার কি আমি দেখতে যাবো রে? এই যে তুই আমার কাছে আসিস এইতেই তুই সোনার মানুষ। বুড়োবুড়িদের কাছে কেউ আসতে চায় না রে ভাই, সারাদিন দুটো কথা কওয়ার লোক পাই না। আজকাল আরও কি হয়েছে জানিস, শুনলে হাসবি। আজকাল রাত বিরেতে বড়ো ভয় পাই।

কিসের ভয় ঠাকুমা?

দাওয়ার উত্তর দিকে ওই লেবু গাছটা দেখছিস তো!

দেখছি।

ওদিকটায় তো বেড়া দেয়নি ওরা। নিশুত রাতে ঘুম ভেঙে গেলে দেখতে পাই কারা যেন সব এসে দাঁড়িয়ে ওখান থেকে দেখছে আমাকে।

কারা? চোর ছ্যাঁচড় নয় তো?

না রে ভাই। এ বাড়িতে চোর ছ্যাঁচড়েরও আসবার প্রবৃত্তি হয় না। মনে হয় তোর দাদাশ্বশুর আসে, আমার এক ভাসুর, শাশুড়ি আরও সব কারা যেন। তারা কেউ জ্যান্ত মানুষ নয়।

তাহলে ভূত! বলে খুব হাসে গোবিন্দ।

বুড়ি হাসিটাকে গ্রাহ্য না করে বলে, তখন বড্ড ভয় করে। কত ডাকি ছেলেদের, বউদের, কেউ সাড়া দেয় না। হাতে পায়ে ধরে বলেছি, ওরে এদিকটাতেও একটা বেড়া দিয়ে একটা ঝাঁপের দরজা করে দে। তাও কেউ গ্রাহ্য করে না।

ঠাকুমা, আমি যদি ভালো করে বেড়া দিয়ে ঘরখানা বেঁধে দিই তাহলে কী হয়?

কি জানি ভাই, তাতে বোধহয় আমার ছেলেদের আঁতে লাগবে। তোকে কিছু বলবে না, কিন্তু আমাকে দিনরাত ঝাঁপা ঝাঁপা করবে। কাজ কি তোর ওসব করতে যাওয়ার? মাঝে মাঝে যে এসে দেখে যাস সেই আমার ঢের। এখন একটা মানুষ এসে দুদণ্ড কাছে বসলে

এত ভালো লাগে যে মনে হয় আর কিছু চাই না। কেউ যে আসে না তাতেও দোষ দিই না কাউকে । হেগে মুতে ফেলছি, ঘরে নোংরা পড়ে থাকে, ঘেন্নায় আসে না। হ্যাঁ রে তোরও ঘেন্না করে, তাই না?

গোবিন্দ মাথা নেড়ে হেসে বলে, আমার ওসব ঘেন্নাপিত্তির বালাই নেই। আমার এক কাকার পেটে ক্যানসার হয়েছিল। বাহ্যের দ্বার বন্ধ করে ডাক্তাররা পেটের বাঁ পাশে একটা কৌটো লাগিয়ে দিয়েছিল। তাইতে মল জমা হত। নিজে হাতে সেসব পরিষ্কার করেছি। রোগীর সেবায় আমার খুব অভ্যাস আছে। আমাদের বাড়িতে কারও অসুখ বিসুখ হলে আমিই সব করি।

তবে কেন তুই সোনার ছেলে নোস বল তো? তোকে দেখেই যে বুকটা জুড়িয়ে যায় আমার।

রোগীর সেবা তো নার্সরাও করে। তারাও কি সব সোনার মেয়ে? ওটা কথা নয়, আমার ঘেন্নার ধাতটাই নেই।

একটু কাছে আয়। তোর মাথায় হাত দিয়ে একটু আশীর্বাদ করি।

আশীর্বাদের কোনো দাম আছে কি না গোবিন্দ জানে না। কিন্তু বুড়ির রোগা হালকা দুখানা হাত যখন তার একরাশ চুলওলা মাথায় থরথর করে কাঁপছিল তখন গোবিন্দর মনে হল, বুড়ির প্রাণটাই যেন হাত বেয়ে আঙুল থেকে চুঁইয়ে তার ভিতরে ঢুকে আসতে চাইছে। আশীর্বাদের যদি কোনো অর্থ হয় তবে এর চেয়ে বেশি আর কি হবে?

সেই তোবড়োনো আংটিটা নিয়ে এসেছিল আজ গোবিন্দ। মুক্তি সেটা হাতে নিয়ে খুশি হল না, কিন্তু অবাক হল, এটা কিসের?

তোমার ঠাকুমা দিয়েছে। আশীর্বাদ।

হঠাৎ এটা দেওয়ার মানে কি?

মানে জিজ্ঞেস করার কিছু নেই. আশীর্বাদের যদি কিছু মানে থাকে তবে এরও মানে আছে। মুক্তি আংটিটা খুব হেলাভরে একটা দেরাজে রেখে দিয়ে বলে, তুমি বুঝি খুব যাও ও

বাড়িতে?

না। মাঝে মাঝে যাই। তুমি বোধহয় কখনোই যাওনি।

সেটা তো আর আমার দোষ নয়। ও বাড়ির সঙ্গে বাবারই সর্ম্পক নেই।

গোবিন্দ দাঁতে দাঁত চেপে বলে, সম্পর্ক যে কেন থাকে না, সেটাই যে আমার মাথায় আসে না।

মুক্তি প্রসঙ্গটা এড়িয়ে অন্য কথায় চলে গেল।

রাগ গোবিন্দর খুব সাধে হয় না। বুড়িটার লাঞ্ছনা আর অপমান যে একেবারেই অকারণ, কতগুলি নির্মম বেআক্কেলে মানুষের চূড়ান্ত স্বার্থপরতাই যে তার কারণ এটা ভেবে তার মাথা আগুন হয়ে যায়।

তার শ্বশুর বিষ্ণুপদ বোধহয় গোবিন্দর নীরব রাগ আর ঘেন্না টের পায়, তাই গোবিন্দ এলেই একটু তফাৎ হয়, লুকোনোর চেষ্টা করে। এমনকী একসঙ্গে খেতে অবধি বসে না।

তার, দুই শালি, অর্থাৎ মুক্তির ছোটমামার মেয়েরা বিকেলে আলুকাবলি করবে, খাওয়ার নেমন্তন্ন করেছিল। নইলে আগেই চলে যেতে পারত গোবিন্দ। শালা ছানু পাগলটাকে মেরে বসায় যাওয়া হয়নি। গোলমালে আলুকাবলিও মুলতুবি রেখে গোবিন্দ রওনা হওয়ার জন্য চুল আঁচড়াতে যখন ঘরে এল তখন শাশুড়ি খুব কাচুমাচু মুখে ঘরের দরজায় এসে বললেন, উনি কিন্তু এখনও ফিরলেন না।

কে? কার কথা বলছেন?

তোমার শ্বশুর, কখনও তো এত দেরি করেন না। আজ যে কী সব হচ্ছে।

গাঁয়েই কোথাও গেছেন-টেছেন হয়তো।

চারদিকে লোক পাঠিয়েছি। যেখানে যেখানে যান তার কোথাও নেই।

গোবিন্দ ঘড়ি দেখে নিল। বাস ধরার জন্য আর মাত্র আধঘন্টা সময় আছে। পা চালিয়ে হাঁটলে দশ মিনিটে পৌঁছে যাওয়া যায়। কাজেই খুব দেরী হয়ে যায়নি।

তুমি যাচ্ছো বাবা?

হ্যাঁ। শেষ বাস পাঁচটায়।

আজকাল তো কিছুতেই তোমাকে একটি দিনও আটকে রাখতে পারি না। মুক্তির কি করবে তা কি ভেবেছো? বিয়ের পর তো অনেক দিন হয়ে গেল?

বলেছি তো, আরও কিছুদিন আপনাদের কাছে থাক। তারপর ভেবে দেখব।

ব্যাপারটা তো ভালো দেখাচ্ছে না? পাঁচজনে পাঁচকথা বলছে।

আপনার মেয়ের মন এখনও তৈরি হয়নি। আমাদের বড়ো পরিবার। মানিয়ে গুছিয়ে চলা খুব সহজ নয়। মন তৈরি হোক।

পাপিয়া খুব সংকোচের সঙ্গে বলে, আসলে বড়ো আদরে মানুষ তো। অত কাজকর্মের মধ্যে গিয়ে পড়লে খেই হারিয়ে ফেলবে।

গোবিন্দ চিরুনিটা পকেটে গুঁজে রেখে বলল, তা বলে তো আমিও আর ঘরজামাই থাকতে পারি না।

শাশুড়ি বিবর্ণ মুখে বলে, সে কথা কি বলেছি বাবা?

আপনার মেয়ে আমাকে আলাদা সংসার করার প্রস্তাব দিয়েছিল। সেটা কোনোদিনই সম্ভব না। আমরা মা-বাপকে আঁস্তাকুড়ে ফেলতে শিখিনি।

গোবিন্দর হঠাৎ খেয়াল হল, তার গলা সপ্তমে পৌঁছে গেছে। এবং ভিতরে ভিতরে রাগের একটা ঝড় পাকিয়ে উঠছে। সে লজ্জা পেয়ে হঠাৎ চুপ করল। গুম হয়ে গেল।

তারপর গলা কয়েক পর্দা নামিয়ে এনে বলল, আপনি আর আমাকে চিঠি লিখে আনানোর চেষ্টা করবেন না।

পাপিয়া কাঠের মতো দাঁড়িয়ে থাকল, তারপর বলল, আলাদা থাকা কি ঘর-জামাই থাকা বাবা?

তার চেয়ে খুব বেশি ভালোও নয়। আমার আর সময় নেই। আমি যাচ্ছি।

আমার মনটা ভালো নেই বাবা, কি বলতে হয়তো কি বলেছি। তোমার শ্বশুরকে কিন্তু ঘরজামাই থাকতে আমিই বারণ করতাম। লোভে পড়ে হল, তার প্রায়শ্চিত্ত এখনও করতে

হচ্ছে।

কান্না একদম সইতে পারে না গোবিন্দ। কেউ কাঁদলেই--তা সে কপট কান্না হলেও সে কেমন দ্রব হয়ে পড়ে। পাপিয়া দরজার কপাট দুহাতে আঁকড়ে ধরে তাতে মুখ গুঁজে কাঁদছিল।

দ্রব হলেও গোবিন্দ কখনও গলেও যায় না। সে গম্ভীর নিচু গলায় বলে, আপনি কাঁদছেন কেন! কান্নাকাটি দিয়ে তো এ জট খোলা যাবে না।

পাপিয়া তার হেঁচকি মেশানো কান্নার মধ্যেই বলে, তোমরা কি ভাবো ওই লোকটা খুব সুখে আছে? একমাত্র বাবা ছাড়া প্রত্যেকে ওকে দিন রাত অপমান অবহেলা করেছে। আমাদের কাছেও সম্মান পায় না। নিতান্ত বেহায়া আর লোভী বলে বিষয় আঁকড়ে পড়ে থাকে।

ওঁর কথা টেনে আনছেন কেন? আমি তো আপনার মেয়ের কথা বলছিলাম।

তুমি তো ওঁকে দুচোখে দেখতে পারো না। ও সেটা টের পায় বলেই তোমার সামনে আসে না। বোধহয় তুমি আছো বলেই চৌপর দিন কোথায় গিয়ে না খেয়ে বসে আছে।

তাহলে তো আমার না আসাই ভালো।

আমার কপাল! যা বলি তার উল্টো অর্থ হয়। আমি বলতে চেয়েছিলাম শ্বশুরকে অপছন্দ করো বলেই মুক্তিকেও তুমি সহ্য করতে পারো না।

আমি ওভাবে ভাবিনি। আপনারা যা খুশি ব্যাখ্যা করতে পারেন। তবে আমার মনে হয়, চোখের জলটা আমার ওপর না খাটিয়ে আপনার মেয়ের ওপর খাটালে অনেক বেশি কাজ হত।

চোখের জলের কথা বলছো বাবা? আমার চোখের জল ধরে রাখলে এতদিনে সমুদ্র হয়ে যেত। বাকি জীবনটা কাঁদতে কাঁদতেই যাবে। আমি বলি কি, তুমি মুক্তিকে জোর করে নিয়ে যাও।

জোর করে মানে? চুলের মুঠি ধরে নাকি?

দরকার হলে তাই করবে। নিয়ে গিয়ে বাসন মাজাও, কাপড় কাচাও, ঘর মোছাও, লাথি মারো, খুন করো, তবু নিয়ে যাও।

তার মানে আমরা ওসব করি নাকি? লাথি মারি? খুনও করি?

পাপিয়া অসহায়ের মতো বিহ্বল চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে একরকম ছুটে পালিয়ে গেল।

একথা ঠিকই যে, গোবিন্দর একটা খ্যাপাটে রাগ আছে। সেই চরম রাগটা উঠলে তার ভিতরটা শুধু আগুন আর মাথায় মুহুর্মুহু বিস্ফোরণ হতে থাকে। কিন্তু এ রাগটা আর কারও তত নয়, যতটা ক্ষতি করে তার নিজের। সে তখন কোনো কাজ করতে পারে না, ঘুমোতে পারে না, খেতে পারে না। শুধু ভিতরকার নিরুদ্ধ রাগে কাঁপতে থাকে।

সত্যিই হাত-পা থরথর করে কাঁপছিল তার। একরকম টলতে টলতে মাতালের মতো সে বেরিয়ে এল বাইরে। তারপর চণ্ডীমণ্ডপ ডাইনে রেখে সোজা বাসরাস্তার দিকে হাঁটা দিল।

বাবু! বলি ও জামাইবাবু!

গোবিন্দ দাঁড়াল, পাগালটা না? সে তাকাতেই হাতছানি দিয়ে ডাকল। এখন পাগলটার কাছে কেউ নেই। ফাঁকা চণ্ডীমণ্ডপে একা বসে আছে।

যাবে-না যাবে-না করেও গোবিন্দ গেল তার কাছে, কী বলছো?

কৃষ্ণকান্ত একগাল হেসে জিজ্ঞেস করে, বন্দাবস্তটা কিরকম হল? এই চণ্ডীমণ্ডপটা কি আমাকে দিয়ে দিলেন ঘরজামাই?

গোবিন্দ দাঁতে দাঁত চেপে বলে, সে পাত্র পাওনি।

তাহলে কি হবে এখন?

যতদিন পারো থাকবে। দুধটুধ খাওয়াতে পারে কয়েকদিন। গাঁয়ের থেকে চাপ দিলে থেকেও যেতে পারো।

কৃষ্ণকান্ত একটু বিরস মুখে বলে, পাকা কাজ হল না। বড্ড দোটানায় পড়ে গেলুম যে! আপনি তো ঘড়েল লোক, একটা বুদ্ধি করতে পারেন না?

আমার তত বুদ্ধি নেই।

কৃষ্ণকান্তকে ভাবিত দেখাল। বলল, সুবিধের জায়গা নয়। মজা নেই। বড্ড ভ্যাতভ্যাত করছে।

তাই নাকি? তবে ইচ্ছেটা কি?

এখানে পোষাবে না। আমার বাঁকা নদীর পোলই ভাল। ঘরজামাই যদি চণ্ডীমণ্ডপটা লিখে দিত তাহলে বেশ হত। এটা বেচে দিয়ে জিলিপি খেতুম।

গোবিন্দ একটু ম্লান হেসে বলে, চলি হে। আমার আর সময় নেই।

একটু দাঁড়ান বাবু। মাজায় বড়ো ব্যথা, একটু ধরে তুলবেন?

উঠে কোথা যাবে?

একটু কষ্ট করে আমাকে পোলের কাছে পৌছে দিন। সরকার বাহাদুর আমার জন্যই পোলটা বানাল। আমিই দেখিশুনি কিনা।

তাই বুঝি?

খুব মজা হয় সারাদিন। কত রগড় দেখতে পাই।

বলতে বলতে নিজেই উঠে পড়ল কৃষ্ণকান্ত। একটু ককিয়ে উঠল ব্যথায়।

গোবিন্দ পাঁচটা টাকা তার হাতে দিয়ে বলল, নাও জিলিপি খেও।

টাকাটা ছেঁড়া জামারপকেটে রেখে নেমে এল কৃষ্ণকান্ত, দূর শালা? এটা একটা বাজে জায়গা, শতরঞ্চি বালিশ কি আমাদের পোষায়? পোলেরনিচে দিব্যি থাকি? বাবু, বিড়ি দেবেন একটা?

নেই হে।

বিড়ি ছাড়াও চলে কৃষ্ণকান্তর। বিড়ি পেলেও চলে। একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সে গোবিন্দর পিছু পিছু এগোতে লাগল। গোবিন্দ মাঝে মাঝে তার দিকে ফিরে চাইছে। রাগটা কমে যাচ্ছে তার।

ও কি আমার গু বউমা?

আপনার নয় তো আর কার? বাড়িটা যে নরক বানিয়ে ফেলেছেন। এখন কে এসব পরিষ্কার করে বলুন তো! হাঁটতে তো একটু আধটু পারেন, আর উঠোনটুকু পেরোলেই তো পায়খানা। শয়তানি বুদ্ধি থাকলে কে আর কষ্ট করতে যায়, তাই না?

বুড়ি খুব দুশ্চিন্তা মুখে নিয়ে বলে, এ তো মনে হয় বেড়ালটার কাণ্ড বউমা।

বেড়ালের আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, আপনার ঘরে হাগতে এসেছে। লোক ডেকে পরিষ্কার করাতে পয়সা লাগে, বুঝলেন? ঘরভরা তো আর দাসী চাকর নেই। ছিঃ ছিঃ।

বুড়ি আজকাল বড়ো ভয় খায়। সারাটা দিন মনে শুধু ভয় আর ভয়। কখন বয়সের দোষে কোন অকাজটা করে ফেলে তার ঠিক কি? এরা কেউ ছাড়বার পাত্রপাত্রী তো নয়। বাক্যে একেবারে পুড়িয়ে দেয়।

বড়ো নাতনি নাচুনি এসে মাটির হাঁড়ির ভাঙা দুটো চারা আর এক খাবলা ছাই দরজার পাশে রেখে বলে, ও ঠাকমা গুটা তুলে পেছনের কচুবনে ফেলে দিয়ে এসো।

বুড়ি নাতনির দিকে চেয়ে বলে, এই যে দিই।

উঠোনে দাঁড়িয়ে বড়ো বউ পুতুল পাড়া জানান দিয়ে চেঁচাচ্ছে, তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে তবু কি নোলা বাবা। এটা দাও, সেটা দাও। গুচ্ছের খাবে আর ঘরদোর নোংরা করবে। সামলাতে যখন পারো না তখন খাওয়া কেন বাপু? কাল এই এককাঁড়ি কলমি শাক গিলল। তখনই বুঝেছিলুম ঠিক পেট ছাড়বে।

বুড়ি মন দিয়ে শুনছিল। গতকাল কলমি শাকই খেয়েছিল বটে। কিন্তু বুড়ির গলায় তত জোর নেই যে পাল্টা চেঁচিয়ে সবাইকে জানাবে কলমি শাক ছাড়া আর কোনো পদই তাকে দেওয়া হয়নি।

নাচুনি চাপা গলায় বলে, তাড়াতাড়ি করো ঠাকমা, দেরি করলে আরও বকবে।

এই যে যাই।

মাথাটা আজ বশে নেই। কেমন যেন পাক খাচ্ছে। শরীর কিছুতেই খাড়া হতে চায় না। বুড়ি চৌকি থেকে নেমে নোংরাটার সামনে উবু হয়ে বসল। তারপর নাতনির দিকে চেয়ে বলে, এটা বেড়ালের কাণ্ড নয়, তুই-ই বল তো!

বেড়ালগুলোকে ঢুকতে দাও কেন?

ঢুকবে না কে বাবা, কোন আগল দিয়ে আটকাবো! এ যে খোলা ঘর।

বুড়ি নোংরাটা চেঁছে মাটির চারায় তুলল। কচুবনটা যে কত দূর বলে মনে হয়! খিল ধরা হাঁটু আর টলমলে মাথা নিয়ে অতদূর যাওয়া মানে যেন তেপান্তর পার হওয়া।

মেলা পাপ জমেছে বাবা। পাপের পাহাড়। সব ক্ষয় করে যেতে হবে তো...

উঠোন পেরিয়ে পুকুরের ধারে সেই কচুবন যেন এক অফুরান মরুভূমি। বয়সকালে বুড়ি এই উঠোনেই উদূখলে সর্ষে গুঁড়ো করত, ঢেঁকিঘরে পাড় দিত, পাঁজা বাসন মেজে নিয়ে আসত ঘাট থেকে। সেই শরীরই তো এইটে। সেই বাড়ি। সেই উঠোন। কিন্তু আজ আর বনিবনা নেই কারও সঙ্গে কারও। শরীরের সঙ্গে না, উঠোনের সঙ্গে না, কচুবনের সঙ্গে না।

ঢেঁকিঘর উঠে গেছে। উদূখল বিদেয় হয়েছে। ঘরবাড়িতে ধরেছে ক্ষয়। দুই বউয়ের তিন সংসার। তারা পালা করে বুড়িকে পোষে। না পুষলে পাড়ায় নিন্দে হবে বলেই বোধহয় পোষে। নইলে গু-মুত, মরা ইঁদুর, আবর্জনার মতো তাকেও ফেলে দিত আঁস্তাকুড়ে।

বড়ো বউ মাঝে মাঝে মুখের সামনে হাত নেড়ে নেড়ে বলে, এখন তো রস মজে বষ্টুমি হয়েছেন, যখন বিয়ে হয়ে নতুন বউ এসেছিলুম তখন কম ঝাল ঝেড়েছেন? উঠতে খোঁটা, বসতে খোঁটা। আর কী মুখ বাবা, কী অন্তরটিপ্পনি। চোখের জলে বিছানা ভিজত আমার। সংসারে একতরফা কিছু হয় না বুঝলেন! এখন দান উল্টে গেছে।

উঠোনটা পেরোতে পারল কি করে তা জামগাছটার তলায় দাঁড়িয়ে ভেবে পাচ্ছিল না বুড়ি। বুকটা এমন ধড়াস ধড়াস কাঁপছে যে, এখনই না আবার মূর্ছা হয়। চোখে এই দিনের আলোতেও কেমন আঁধার ঘনিয়ে এল যে। কুঁজো হয়ে হাঁটার বড়ো কষ্ট। মাজার ব্যথায় কতকাল সোজা করতে পারেনি শরীরটাকে!

এমন হাঁফ ধরে গেছে যে জামতলার আগাছার মধ্যেই বুড়ি ধপ করে বসে পড়ে। গাছের গায়ে হেলান দিয়ে চোখটা বোজে। হাতে মাটির চারায় নিঘিন্নে মল। তবে বুড়ি আর ঘেন্না পায় না। দিন রাত এসব নিয়ে মাখামাখি, ঘেন্না করবে কাকে?

আজকাল বেশিক্ষণ চোখ বুজে থাকলে একটা ভয় হয়, মরে গেলুম নাকি? ঘুমোনোর সময় মনে হয় আর যদি না উঠি? মরার পর কেমন সব হবে তার চিন্তাও পেয়ে বসে বুড়িকে। যমদূতরা এসে তো ধরবে সব গাজি গাজি করে। তারপর টানতে টানতে বৈতরণী পার করাবে। নিয়ে গিয়ে হাজির করবে যমরাজার সামনে। তখনই বুড়ি পড়বে বিপদে। কি জিজ্ঞেস করে না করে কে জানে বাবা। এ দিকে ছেলেরা যে শ্রাদ্ধশান্তিটাও ভালো করে করবে এমন ভরসা হয় না। শ্রাদ্ধশান্তি ঠিকমতো না হলে আত্মাটা বড্ড খাবি খাবে।

বুড়ি গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসে চোখ বুজে কোথা থেকে কোথায় চলে যাচ্ছিল। খানিক অন্ধকার, খানিক আবছায়া, খানিক হিজিবিজি ঝুলকালি কি সব যেন চোখের সামনে। মাথায় আজকাল অবাক-অবাক সব চিন্তা আসে, ছবি আসে।

বুড়ি একটু বাদে চোখ খুলে চাইল। চোখের পাতাটা খুলতেও যেন কষ্ট, বাকি পথটা আর দাঁড়ানোর চেষ্টা করল না বুড়ি। হামাগুড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে কচুবনের কাছে এসে নোংরাটা ফেলল।

কতকাল যে স্নান করে না খেয়াল নেই। আজকাল কেউ তো আর চান করিয়ে দেয় না। কুয়ো থেকে জল তুলে চান করবে তার সাধ্যি কি? সামনে পুকুরটা দেখে বড়ো লোভ হল, একটু ডুব দিয়ে নিলে হয় না?

কিন্তু পারবে কি? তালগাছের বাঁধানো ঘাটে, পা ঠিক রাখা মুশকিল। আর এ পুকুরের ধারেই ডুবজল। বুড়ি ভাবে, সাঁতার তো জানতুম, কিন্তু সে জানা কি আর কাজে দেবে? আজকাল বড়ো ভয় করে। সব কিছুকে বড়ো ভয় করে।

বুড়ি বসে আর একটু জিরোলো। গলাটা শুকিয়ে আছে তেষ্টায়। কিন্তু ফিরে তাকাতেই আবার তেপান্তরের মাঠ মনে হয় উঠোনটাকে। কত দূরে সব সরে যাচ্ছে! ঘর মানুষজন, ছেলেমেয়ে। বুড়ি চোখ বোজে। ঝিমোয়। হাজারো স্বপ্নের বৃষ্টি মাথায় ঝরে পড়তে থাকে।

ও ঠাকমা, জঙ্গলে বসে কী করছো তখন থেকে? ও ঠাকমা...

এই একটা মাত্র নাতনি নাচুনিই তার যা একটু খোঁজখবর নেয়। কাছে বেশি আসে না, এলে মা বকবে। তবু একটু টান আছে, একটু মায়া।

বুড়ি কথা বলতে গিয়ে দেখল, গলায় কেন যেন স্বর নেই। কিছুতেই একটাও কথা গলায় তুলে আনতে পারল না বুড়ি।

ও ঠাকমা, অমন করছো কেন? ঘরে যাও।

বুড়ি চোখ বুজে ভাবল, মরে গেছি নাকি? ছেলেরা ঠিকমতো শ্রাদ্ধটা করবে তো! শ্রাদ্ধ করে বড়ো ছেলে। তা বুড়ির বড়ো ছেলে হল বিষ্টু। তাকে কি খবরটা ঠিকমতো দেবে এরা। মুখাগ্নি তো সে আর পেরে উঠবে না। অতটা রাস্তা, খবর পেয়ে আসতে আসতে মড়া বাসি হবে। নাঃ বাঁচাটা যেমন ভালো ছিল না, মরাটাও তেমন ভালো হল না বুড়ির।

ও ঠাকমা?

কাকে ডাকছে ছুঁড়িটা? মরে পড়ে আছি এখানে, দেখতে পায় না নাকি? কানে ঝিঁঝি ডাকছে। হাত পা সব ঠাণ্ডা মেরে গেছে। বুকখানা যেন পাথর। আর মাথাটা অন্ধকার।

ও ঠাকমা! ঠাকমা গো! ওঠো না! বলে গায়ে ধাক্কা দেয় নাচুনি।

বুড়ি দেখল, না, এখনো মরেনি সে। ধাক্কা খেয়ে গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছিল, একখানা কাঁকলাস হাত বাড়িয়ে মাটিতে ভর রাখল। একটা শ্বাসও পড়ল ফোঁস করে।

ও ঠাকমা! তোমার কী হয়েছে?

বুড়ি নাতনির দিকে চেয়ে মুখখানা মায়া ভরে দেখল। কত কাছে, কিন্তু কত দূর! বলল, একটু ধন্দ লেগেছিল রে। এখন ঠিক আছি।

ধরে তুলব তোমায়?

ঘেন্না পাবি না তো!

বাঃ তোমাকে আবার ঘেন্না কিসের? মা বকবে বলে, নইলে তোমার ঘর তো রোজ আমিই পরিষ্কার করতে পারি।

অত জুড়িয়ে-দেওয়া কথা বলিসনি রে, ওতে মায়া বাড়ে।

এখন আমাকে শক্ত করে ধরো তো! তোমাকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসি।

নাচুনী ধরে ধরে ঘর অবধি এল। একটা ভেজা ন্যাতা এনে দিল ছুটে গিয়ে, ও ঠাকমা, গুয়ের জায়গাটা লেপে দাও। নইলে বকুনি খাবে।

দিই। বলে বুড়ি উবু হয়ে বসল। মনটা বড়ো চঞ্চল হয়েছে। মুখাগ্নি কে করবে, শ্রাদ্ধটা হবে কি না, এসব ভেবে বড্ড উচাটন লাগছে। বিষ্টু যদি সময়মতো খবর না পায় তাহলে কী হবে? এদের মোটে গা নেই যে!

উঠোনের রোদে বাচ্চারা খেলছে। তারই মধ্যে কে একজন চটি ফটফটিয়ে উঠে এল দাওয়ায়। বুড়ির মেজো ছেলে কৃষ্ণপদ।

আজও ঘরে হেগে ফেলেছো শুনলাম।

বুড়ি সভয়ে চেয়ে থাকে ছেলের দিকে। এদের মুখচোখের চেহারা মোটেই ভালো নয়। কেমন যেন রাগ-রাগ ভাব। কখন যে বকাঝকা করবে তার কোনো ঠিক নেই।

না বাবা, সে একটা বেড়োলের কাণ্ড।

কৃষ্ণপদ মহা বিরক্ত গলায় বলে, এ বাড়িতে বাস করাই যে কঠিন করে তুললে! এরকম হলে তো মুশকিল দেখছি।

বুড়ির বুক গুড়গুড় করতে থাকে। কি বলবে তা ভেবে পায় না। কথার বড়ো ফের থাকে। কখন কোন কথাটায় লোকে দোষ ধরে তার কিছু ঠিক নেই।

এরকম চললে আর দাওয়ায় কিন্তু জায়গা হবে না। গোয়ালঘরটা খালি পড়ে থাকে ওটায় গোবর টোবর দিয়ে দেবখন। ওটাতেই থেকো গিয়ে।

বুড়ি তেমনি চেয়ে থাকে। গোয়াল আর এর চেয়ে কি খারাপ হবে? বুড়ি মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানাল।

কৃষ্ণপদ ঘরে গেল। বুড়ি বিছানায় উঠে একখানা কাঁথা টেনে গায়ে দিয়ে বসল। কখন শীত করে, কখন হাঁসফাঁস করে ভেতরটা তার কিছু ঠিক নেই। আজ কি দিয়ে ভাত দেবে

এরা? মুখে বড্ড অরুচি, কিন্তু পেটে খিদে থাকে। একটু লেবু হলে দুটি খাওয়া যেত।

বেড়ালটা ঘরে এসে একখানা ডন দিয়ে লাফিয়ে বিছানায় উঠল। রোজই ওঠে। তাড়ালেও যায় না। তা ওঠে উঠুক। একটা প্রাণ তো। কাছাকাছি আর একখানা ধুকধুক করছে জানলে কেমন যেন একটু ভরসা হয়।

বেড়ালটার দিকে চেয়ে বুড়ি বলে, আজ বড়ো জ্বালিয়েছিস মুখপুড়ি।

বেড়ালটা চোখ মিটমিট করে ফের কাঁথাকানির মধ্যে আরামে পুঁটুলি পাকিয়ে চোখ বুজল। বড্ড মায়া।

নাতজামাই পাঁচটা টাকা প্রতিবারই হাতে গুঁজে দিয়ে যায়। বুড়ি সেই টাকাটা পরে আর খুঁজে পায় না কিছুতেই। বালিশের তলায় না, তোশকের তলায় না, চাদরের তলায় না, আঁচলে বাঁধা না। কাউকে জিজ্ঞেস করা মহাপাপ। জিজ্ঞেস করলেই বলবে, চুরি করেছি নাকি?

পরশু না কবে যেন এসেছিল নাতজামাই। টাকাটা সেই থেকে খুঁজছে বুড়ি। পাচ্ছে না। পাবে না, জানা কথা। টাকা দিয়ে কিছু করেও উঠতে পারবে না সে। তবে ঘাটখরচার অভাবে গরিবগুর্বোরা যেমন মড়া না পুড়িয়ে মুখাগ্নি করে জলে ফেলে দেয় তার বেলাতেও যেন ছেলেরা অমনিধারা না করে তার জন্যই কেষ্ট আর হরির হাতে টাকাগুলো দেওয়ার ইচ্ছে ছিল বুড়ির। হল না। ঘাটখরচাটা পেলে আর মড়া নিয়ে হেলাফেলা করত না।

দুপুরবেলা বুড়ি ঘুমোচ্ছিল, নাচুনী এসে চাপা গলায় ডাকল, ঠাকমা!

কে রে?

তোমাকে গোয়ালঘরে পার করবে বলে গোয়াল পরিষ্কার হচ্ছে যে! রাখাল ছেলেটা ঝাঁটপাট দিচ্ছে।

বুড়ি নাতনির দিকে চায়, তোর কি তাতে কষ্ট হবে রে ভাই?

গোয়ালে তুমি একা থাকতে পারবে? ভয় করবে না?

যেখানে ফেলে রাখবে সেখানেই পড়ে থাকব মা। আর ক দিনই বা! কিন্তু তোর কি মনে কষ্ট হবে তাতে? বল না।

কষ্ট হবে না? গোয়ালঘর সেই কত দূরে। রান্নাঘরের পিছনে। ওখানে আমগাছটায় ভূত থাকে যে!

কত ভূত এ বাড়িতে। আমি রোজ দেখি।

বলো কি গো!

ওই লেবুতলায়। রোজ নিশুতরাতে আসে। তোর দাদু, জ্যাঠাদাদু আরও কত।

ওম্মা গো!

ভয় পাসনি। ভয়ের কি? যখন বুড়ো হবি তখন দেখবি, তুই ভূতের দলেই হয়ে গেছিস।

গোয়ালঘরে কিন্তু কাঁকড়াবিছে আছে। আর মশা।

সে জানি। আমাকে কম হুল দিয়েছে বিছে? তখন একটা গরু ছিল, রোজ পরিষ্কার করতে যেতুম তো।

বড়ো কাকার সঙ্গে বাবার খুব ঝগড়া হল দুপুরের খাওয়ার সময়। বাবা গোয়ালঘরের টিন আর খুঁটি বিক্রি করবে বলে ঠিক করে রেখেছিল, তুমি থাকলে তো আর তা হবে না। তাই রেগে গেছে।

তাই বুঝি? কোন ভাবে যে রাখবে আমাকে তার ঠিক পাচ্ছে না। এ বাড়ি আমার শ্বশুরদের তিন চার পুরুষের ভিটে ছিল। এখনও নিশুত রাতে তারাই আসে। দেখে যায় আমার কেমন হেনস্থা হচ্ছে।

তোমার কান্না পাচ্ছে না ঠাকমা?

কান্না? না, আজকাল আর কেন কান্না আসে না বল তো! চোখে এক ফোঁটা জল নেই। শুধু কেবল সারাদিন ভয়-ভয় করে। কেবল ভয়। আগে তো কত কাঁদতুম। চোখে কত জল ছিল তখন। আজকাল পোড়া চোখে জলও নেই।

নাচুনী চলে যাওয়ার পর বুড়ি ভাবতে বসল, গোয়ালঘর কি এর চেয়ে কিছু খারাপ হবে? না বাবা, গোয়ালঘরই তো ভালো মনে হচ্ছে। অন্তত একটু চোখের আড়াল হয়ে তো থাকতে পারবে। বেড়াগুলো এতদিনে আর বুঝি আস্ত নেই। চালের টিনেও ফুটো ছিল। তা হোক বাবা, বাক্যের বিষ যদি তাতে কিছু কমে।

গোয়ালের কথা ভাবতে ভাবতেই বেলাটা গেল আজ।

নিশুত রাতে রোজই ঘুম ভাঙে। আজও বুড়ি উঠে বসল। মেটে হাঁড়িতে পেচ্ছাপ করতে বসে খোলা জায়গাটা দিয়ে চোখ গেল, লেবুতলাটার দিকে। বুকটা কেঁপে উঠল হঠাৎ। ভুল দেখছে নাকি? লেবুতলা থেকে একটা ছায়ামূর্তি যে উঠে এল বারান্দায়। এদিকেই আসছে।

বুড়ি বুঝল, ডাক এসে গেছে। ওই নিতে এসে গেছে তাকে।

বুড়ি কাঁপা গলায় বলে উঠল, খাবি বাবা যমদূত? খাবি আমায়? দাঁড়া বাবা, এরা সব কি করতে কি করবে তার ঠিক নেই। ও হরি, ও কেষ্ট, তোরা একটু বিষ্টুকে খবর পাঠাবি তো! মুখাগ্নি না হলে যে আত্মা বড়ো কষ্ট পায়। শ্রাদ্ধও তো সে ছাড়া কেউ করতে পারবে না। বলি ও হরি...

মা!

এ ডাক গত একশ বছরে যেন শুনতে পায়নি বুড়ি। খানিক হাঁ করে থেকে বলে, ভুল হয়নি তো বাবা! মা বলে ডাকছ!

মা! আমি বিষ্টু।

আবার বোধহয় স্বপ্নই দেখছে। আজকাল হিজিবিজি কত কি দেখে।

কে বললি? সত্যিই বিষ্টু তো!

হ্যাঁ মা।

তোকে ওরা খবর পাঠিয়েছে নাকি? আমি তবে কখন মরলুম বল তো! অনেকক্ষণ মরেছি নাকি? মড়া বাসী হয়নি তো?

বিষ্ণুপদ একটু চুপ করে থেকে বলে, তুমি মরোনি মা। বুড়ো বয়সে ওরকম ভীমরতি হয়। একটা টর্চের ফোকাস মেরে চারদিকটা দেখে বিষ্ণুপদ বলল, তাহলে এইখানেই থাকতে হচ্ছে আজকাল!

বুড়ি একটু ধাতস্থ হল এইবার। কাঁপা গলায় বলে, ও বিষ্টু, হঠাৎ এই মাঝরাতে এলি কেন বাবা! খারাপ খবর নেই তো!

না মা। বাসেই তো উঠলুম বিকেলের পর। নাটাগড়ে বাস বদলাতে হল। তার ওপর আবার সেই বাসের চাকা খারাপ হল মাঝরাস্তায়। এই এসে নামলুম।

ও বিষ্টু, কোথায় বসাবো তোকে বাবা! এ হাগামোতা বিছানা এখানে তো বসতে পারবি না বাবা। ওদের সব ডেকে তুলি?

না মা। তোমাকে তো ঘরের বার করেছে দেখছি। আমার সঙ্গেই কি আর ভালো ব্যবহার করবে? ওদের কাছে তো আসা নয়, তোমার কাছেই আসা। বিছানাতেই বেশ বসতে পারব।

প্রবৃত্তি হলে তাই বোস বাবা। বুড়ো বয়সে আর কিছু ধরে রাখতে পারি না। বাহ্যে-পেচ্ছাপ হয়ে যায় আপনা থেকেই। কত কথা শুনতে হয় সে জন্য। তা এবার ভালো ব্যবস্থা হয়েছে। গোয়ালঘরে গিয়ে শান্তিতে থাকব।

এরপর গোয়ালঘরও আছে মা! তোমার ভোগান্তি দেখছি শেষ হয়নি!

টর্চখানা তোর মুখের দিকে একটু তুলে ধর তো! দেখি মুখখানা! কতকাল দেখিনি, ভালো করে মনেও পড়ে না।

এ মুখ কি দেখাতে আছে মা! কত পাপ করেছি।

খুব বুড়ো হয়ে গেছিস নাকি বাবা? কি সুন্দর রাজপুত্তুরের মতো চেহারা ছিল তোর।

ও কথা আর বোলো না মা। শুনলে গা যেন রী-রী করে। শুনলুম, গোবিন্দ তোমার কাছে খুব আসেটাসে।

খুব আসে। সোনার চাঁদ ছেলে। বুক ভরা মায়াদয়া।

বিষ্ণুপদ একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল, হ্যাঁ মা, খুব ভালো।

বুড়ির একখানা কঙ্কালসার হাত বিষ্ণুপদর পিঠে মাকড়সার মতো ঘুরে বেড়োচ্ছে। বিষ্ণুপদ দু হাতে মুখখানা ঢাকে।

ও বিষ্টু কথা কইছিস না যে! আমার যে কথা শুনতে বড়ো ভালো লাগে। নিঃসাড়ে পড়ে থেকে কতবার মনে হয়, মরে গেছি বুঝি!

তোমার কাছটিতে যদি বাকি জীবনটা থাকি মা, তাহলে কেমন হয়?

বিশ্বাস হওয়ার মতো কথাই নয়। বুড়ি থরথর করে কেঁপে ওঠে বলে, মানিক আমার! সোনা আমার! ভোলাচ্ছিস বুঝি! নইলে ঠিক আমি স্বপ্নই দেখছি।

বিষ্ণুপদ ফিসফিস করে বলে, বড়ো ইচ্ছে করে মা।

যখন ছোটোটি ছিলি, যখন শুধু মায়ের ধন ছিলি, তখন মায়ের বুকেই জায়গা হয়ে যেত। এখন তো কত কি হয়েছিস বাবা। বউয়ের জন, ছেলেপুলেরা বাবা, জামাইয়ের শ্বশুর। কেমনধারা সব হয়ে যায় বল তো।

বিষ্ণুপদ টর্চ জ্বেলে জ্বেলে ঘরখানা দেখে। কুসুমপুরে তার পাকা ঘরবাড়ি ক্ষেতখামার টাকা পয়সা। টর্চের আলোয় সে তার সব ঐশ্বর্যের অর্থহীনতা দেখতে পায় যেন। একটা কুকুর দরজায় এসে দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে গেল। এদিকটার বেড়া নেই, দরজার ঝাঁপ নেই। বিষ্ণুপদ টর্চটা নিবিয়ে আর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

মা, তুমি শুয়ে পড়ো। আমি কাছটিতে বসে থাকি।

ঘুম কি আসে বাবা! কতবার ঘুম ভেঙে উঠে দেখি। ওই লেবুঝোপের দিকটায় নিশুতরাতে তোর বাবা আসে, জ্যাঠা আসে আরও কারা সব আসে যেন। ও বিষ্টু, একটু মা বলে ডাক তো!

মা! মাগো! এবার শুয়ে একটু ঘুমোও।

তুই কী করবি? কিছু খাসনি তো! খিদে পায়নি?

না মা। বাস থেকে নেমে হোটেলে খেয়ে নিয়েছি নাটাগড়ে। তুমি এবার ঘুমোও।

পালাবি না?

আজ বড়ো ঘুম জড়িয়ে আসে কেন চোখে? বুড়ি ভালো করে বালিশে মাথা না রাখতেই রাজ্যের ঘুম নেমে আসে চোখে। দেহটা একটুখানি হয়ে বুড়ি আজ ঘুমোয়। বুকটা ঠাণ্ডা লাগে বড়ো। বিষ্টু এসে গেছে। বুড়ির তবে মুখাগ্নি হবে, শ্রাদ্ধ হবে। যমরাজের কাছে গিয়ে আর হেনস্থা হতে হবে না।

বিষ্ণুপদ টর্চ জ্বেলে দেখতে পেল, তার মায়ের মুখে ব্যথা বেদনার অনেক আঁকিবুকি, গভীর সব রেখা। তবু ঠোঁটে একখানা কি সুন্দর ফোকলা হাসি ফুটে আছে।

ভগবানের লোক

লাল শালুর ওপর সাদা অক্ষরে ব্রজেন মন্ডল নামটা বড়ো খোলতাই হয়েছে। এসময়ে একটা শুকনো গরম বাতাস ছাড়ে। তাতে দুটো বাঁশে টান করে বাঁধা শালুর পেট ফুলে উঠছে খুব। বাঁশে মটমট শব্দ হচ্ছে। আর একটু জোরের বাতাস হলে শালুর টানে বাঁশ ভেঙে পড়ত। তা দু'দিন হল বাঁশের খুঁটিতে ব্রজেন মন্ডল দিব্যি লটকে আছে। এখনও পড়েনি মুখ থুবড়ে। পড়ার লোকও নয় কিনা! পড়ো-পড়ো হয়েও ফের খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। এতকাল ধরে তাই দেখে আসছে হীরু। এমনি কি দাঁড়িয়ে থাকে বাপ? এই চারদিকে যা-কিছু সব দাঁড়িয়ে আছে সে কি এমনি। খুঁটোর জোর চাই, মাজার জোর চাই, তবে না! তা ব্রজেন মণ্ডলের কোনটা নেই?

বাতার একটু কমজোরি হতেই শালুটা নেতিয়ে পড়ছিল, হুড়ুম করে বাতাসের আর একটা তোড় আসতেই পটকা ফাটার মতো ফটাস শব্দ করে শালু বুক চিতিয়ে পেট ফুলিয়ে জানান দিল ব্রজেন মন্ডল নেতিয়ে পড়ার লোক নয়।

চোত মাসের দুপুরবেলায় মাঠেঘাটে বিশেষ লোকজন নেই। চারদিক খাঁ খাঁ করছে। এ সময়ে চাষবাস নেই, বিষয়কর্মও তেমন নেই। গরুটরু আছে, তবে রাখাল ছেলেরা যে যেখানে পারে গাছতলার ছায়া খুঁজে নিয়ে গামছা বিড়ে পাকিয়ে মাথার নীচে দিয়ে ঘুম লাগিয়েছে। ভাত-ঘুম বলে কথা। গরু শান্ত জীব, তেমন দূরে যায়ও না বিশেষ। ঘুরে-ফিরে গণ্ডির মধ্যেই থাকে।

বটতলায় শিবের চাতাল। এখানে বসে বিড়ি ধরানোটা ধর্মত কাজ হবে কি না তা বুঝতে পারছে না হীরু। জনমনিষ্যি নেই আর শিবঠাকুর তো নিজেই ধোঁয়াক্কার মানুষ। তার ওপর

প্রেমে ভোলোনাথ। কিন্তু পাপের কথা ভেবে হীরু চাতাল থেকে ঘাসের ওপর বসে শিবলিঙ্গের দিকে পিছন ফিরে বিড়িটা ধরিয়ে ফেলল।

ব্রজেন মাস্টার এবারও ভোটে জিতবে। সবাই বলছে। মাধব দাস লড়ছে বটে, কিন্তু এঁটে উঠবে না। মুখের ফেকো তুলে বাড়ি বাড়ি গিয়ে মাধব লোককে বোঝাচ্ছে যে ব্রজেন মাস্টার আসলে চোর। সরকার বাহাদুরের বরাদ্দ করা টাকার অর্ধেক মেরে দিচ্ছে। তা মিছেও বলে না মাধব। লোকে জানে, পঞ্চায়েতেও নয়-ছয় হয়। তবে কাজও তো একটু-আধটু হচ্ছে বটে। পুরোটাই তো আর গাপ করছে না বাপ। আর কটাই বা টাকার মামলা। বিশ লাখ হাঁকলে দেড় লাখ জোটে, সরকারও নাকি বড্ডই গরিব।

ব্রজেন মন্ডল দরাজ হাতের লোক বটে, সারা তল্লাট লাল শালুতে ছেয়ে ফেলেছে। শালু তো সস্তা জিনিস নয়। তা সঙ্গে বাঁশ বা খুঁটির দাম, শালুতে লাল লেখানোর খরচ, খুঁটি লাগানোর মজুরি--খরচের বহর বড়ো কম নয়। মাধব তেমন কিছু করে উঠতে পারেনি। হাতে লেখা কয়েকটা পোস্টার সেঁটেছে এখানে সেখানে, আর হ্যান্ডবিল ছেড়েছে কিছু। পোস্টার কতক ব্রজেনের লোক ছিঁড়েও দিয়েছে।

দুপুরবেলাটা বড্ড ঝিমধরা সময়। মাথায় জলটি পড়ে, পেটে ভাতটি সাঁদ হয়, দু'চোখে ঘুমের পিসি পিঁড়ি পেতে বসে। এ সময়ে মানুষ তেমন তেড়েফুঁড়ে উঠতে পারে না। চোতের গরমটাও মানুষকে ঝেঁটিয়ে ঘরে ঢুকিয়ে দেয়।

বিড়িটা শেষ করে হীরু উঠল। সঙ্গে চটের মস্ত দুটো ঠাসা থলে। নারায়ণপুর থেকে পথটাও তো কম নয়। বাস থেকে নেমে দু মাইল ঠ্যাঙাতে হয়েছে। কথা ছিল গোবিন্দ ভ্যানগাড়ি নিয়ে থাকবে। তা কোথায় কে! আধঘন্টা দাঁড়িয়ে শেষে হাঁটা ধরতে হল।

বাড়িতে গিয়ে যে পেট-মন শীতল হবে সেই আশা নেই। মা গত অগ্রহায়ণে গত হওয়ার পর থেকে হীরুর বড়োই অসুবিধে হচ্ছে। তিন ভাইয়ের সংসার আলাদা, তারই সংসার নেই। কোনো ভাইয়ের ভাগেও পড়েনি সে। শোওয়ার জায়গা জোটে না বলে সে আজকাল মনোরঞ্জন পালের দোকানঘরখানায় হাতেপায়ে ধরে ঠাঁই নিয়েছে। শুধু রাতটুকুর বন্দোবস্ত।

তা পালমশাই তার শোধটাও বড়ো কম তোলেন না। এই যে গন্ধমাদন বয়ে আনতে হচ্ছে এও বেগার খাটুনি। পালমশাইয়ের মাল। কী নেই ব্যাগের ভিতরে? বিড়ি, মাজন, সাবান, মশলা, তেল, কোকাকোলা অবধি। যাতায়াতের খরচটাও হিসেব করে দেওয়া। এক পয়সা নড়চড় হওয়ার উপায় নেই।

চাষবাসের কিছু জমি আছে তাদের। সামান্যই। কোনোক্রমে ভাগেজোগে খোরাকিটা উঠে যায়। বাড়তি তো থাকেই না, বছরের শেষে একটু টানও পড়ে যায়। নিজের ভাগের ধানটা বড়োদাদাকে দিয়ে দেয় বলে সেই সুবাদে বড়ো বউদি দুটো অছেদ্দার ভাত বেড়ে দেয়। চাষেরও তো কোনো ঠিক নেই। এক বছর হল তো অন্য বছর ভেসে গেল। এ হল নাবাল জায়গা, তার ওপর চড়া পড়ে বিদ্যেধরীর খাত এখন উঠে এসেছে। দু ফোঁটার বেশি জল হলেই খেত-খামার ঘরবাড়ি ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

বরাত ভালো যে, গেল বছর মাছ ধরতে গিয়ে পুকুধারে পড়ে গিয়ে মনোরঞ্জন পালের মাজায় চোট হল। ভগবানেরই লীলা, চোটটা বহরে বেশ বড়ো মাপেরই ছিল। পালের পো বিছানা ছেড়ে উঠতেই পারে না। সেই সুবাদে দোকান দেখাশোনার ভার পড়ল হীরুর ওপর। তা সেই চাকরিরও উমেদার বড়ো কম ছিল না। কিন্তু হীরুর হাতটান নেই বলে চাকরিটা তারই হল। একশো টাকা মাইনে, উদয়াস্ত খাটুনি। দিনের শেষে বিক্রিবাটার টাকা শয্যাশায়ী পালমশাইকে বুঝিয়ে দিয়ে তবে ছুটি।

ইদানীং পালমশাই লাঠি ঠুক ঠুক করে দোকানে গিয়ে বসেন বটে, তবে হীরুকে ছাড়াননি। দোকানের কাজ হল গায়ে-গতরে! পালমশাই সেটা আর পেরে ওঠেন না। হীরু বহাল আছে অতএব।

স্বজাতি, স্বঘর বলে ইদানীং পালমশাই অন্য রকম ইশারা-ইঙ্গিতও করেছেন। তিন মেয়ের ছোটটি হচ্ছে খিরি। বড়ো দুটি পার হয়েছে, একটিই বাকি। ছেলে নেই। ঠারেঠোরে খিরিকে হীরুকে গছাতে মতলব করেছেন। হীরুর যে খুব একটা আপত্তি আছে তা নয়। তবে কিনা খিরি হল রণচন্ডী মেয়ে। চেহারাও কাঠ কাঠ, কোনো শ্রীছাঁদ নেই। তার ওপর তার কটকটে কথা যে-কারও শরীরে জ্বালা ধরিয়ে দেয়।

সকালে এক খুঁচি মুড়ি তার বরাদ্দ। তা সেই মুড়িটা একটি ছোট্ট ধামায় করে খিরিই এনে দেয়। সঙ্গে একখানা কী দু'খানা কাঁচা লঙ্কা, একটু আচারের তেল। তা সেটা যখন দেয় তখন মুখখানা লক্ষ করেছে হীরু। যেন কাক-কুকুরকে দিচ্ছে এমনই একটা তাচ্ছিল্যের ভাব। এ মেয়ে ঘাড়ে চাপলে তাকে দিয়ে পদসেবা করিয়ে না ছাড়ে। কিন্তু হীরু তবু রাজি পেটের দায়ে। খিরিকে বিয়ে করলে দোকানের চাকরি তার বাঁধাই রইল? বিক্রিবাটা ব্যাপারটা সে ভালোই বোঝে। এমনিতে বোকাসোকা হলেও দোকান চালানোয় তার একটা ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা আছে বলে তার নিজেরই মনে হয়।

আরও কথা আছে। মনোরঞ্জন পাল হল ব্রজেন মন্ডলের লোক। সাক্ষাৎ ভায়রাভাইও বটে। হাইওয়ে থেকে যে চওড়া রাস্তাখানা গাঁ ঘেঁষে তৈরি হচ্ছে তার পাথরকুচি, মাটি কাটা, সাঁকো তৈরি ইত্যাদি নানা বরাত আছে। পালমশাই একটা-দুটো বরাতের জন্য কোমর বেঁধে লেগে পড়েছেন। খিরিকে বিয়ে করলে হীরুরও তাই বরাত খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা। খিরি মুখনাড়া দিক আর যা-ই করুক সেসব সয়ে নেওয়া যাবে। পেটে খেলে পিঠে সয়। জামাই হলে পালমশাই তো আর ফেলবেন না।

বন্ধুবান্ধবরা অবশ্য শুনে বলেছে, ধুর বোকা, তোর সঙ্গে পালের পো কখনও মেয়ের বিয়ে দেবে ভেবেছিস? লোভ দেখিয়ে খাটিয়ে নিচ্ছে। খিরি দেখতে পেত্নির মতো হলে কি হয়, বাপের ট্যাঁকের জোর তো আর কম নয়।

এ কথাটাও ভাববার মতো বটে। সে কি আর একটা পাত্র হল? চালচুলো নেই, রোজগার বলতে পাল মাশাইয়ের দেওয়া ভিক্ষেটুকু। তবে দেবে কেন? এমনও নয় যে, খিরির সঙ্গে তার ভাব-ভালোবাসা আছে।

চোতের রোদে হাফসে পড়ে সে যখন পালমশাইয়ের দোরগোড়ায় পৌঁছল তখন বেলা আড়াইটে।

চোতপাবনের জন্য কি সব কোটা হচ্ছে উঠোনে। কাজের লোক জুটেছে জনা পাঁচ-ছয়। পালগিন্নি খাম্বাজ মহিলা, মুখে কখনও হাসি দেখেনি হীরু। জলচৌকিতে বসে কাজকর্ম

তদারক করছেন। পাশে খিরিও দাঁড়ানো। তেমনই আঁশটে মুখ, চোখের দৃষ্টিতে খরখরে ভাব।

ব্যাগ রেখে চলে আসছিল হীরু, পালগিন্নি হাঁক দিলেন, ফেরত পয়সা দিয়ে গেলে না যে বড়ো?

হীরু থমকাল, বলল, ফেরত হলে তো দেব? পরান সাহার দোকানে সাতাত্তর টাকা বাকি রাখতে হয়েছে। জিনিস-পত্তরের দাম বেড়েছে কিনা।

কেউ কিছু বলল না। তবে এমনভাবে তাকিয়ে রইল যেন কথাটা বিশ্বাস করেনি। কাজের লোককে কে আর কবে বিশ্বাস করেছে।

হীরু চলে এল।

পুকুরে স্নান সেরে, লাউয়ের ঝোল দিয়ে ভাত খেয়ে দাওয়ায় শুয়ে রইল একটু। তা বলে ঘুম এল না। নানা ভাবনা এসে ভন ভন করে মাথায়। বোধহয় চব্বিশ বছর বয়স হল তার। কোথাও কোনো আশার আলো দেখতে পাচ্ছে না সে।

বিকেলে দোকান খুলতে হবে। তা বিকেলেরই বা দেরি কি?

দুনিয়াটাই এরকম। কিছু লোক করেকম্মে খায়, কিছু লোক ভেরেন্ডা ভাঁজে।

পালমশাইয়ের দোকানখানা এ-তল্লাটে সবচেয়ে বড়ো। জব্বর দোকান। দড়িদাড়া, লাঙলের ফাল, কুড়ুল কাটারি, মশলাপাতি, আটাময়দা, চাল, ডাল, তেল, স্নো, পাউডার, শ্যাম্পু থেকে শুরু করে অ্যালাপ্যাথিক ওষুধ অবধি। তাই সন্ধের মুখে খদ্দেরের আনাগোনা বেশ ভালোই। আশপাশের গাঁ থেকেও খদ্দের আসে। তবে গাঁয়ের লোক নগদের কারবার বিশেষ করে না। বেশির ভাগই খাতায় লেখায়। ধারবাকি আদায় উশুল করতেও হীরুকেই তাগাদায় বেরোতে হয়।

ভিতরবাগে পালমশাই চেয়ারে বসা। সামনে বেঞ্চ পাতা। তাতে গাঁয়ের কয়েকজন বয়স্ক মানুষ এসে সন্ধেবেলা রোজ বসে কূটকচালি করে। আজও এসেছে। ভোট নিয়েই কথা

হচ্ছে কদিন ধরে। আরও কয়েকদিন চলবে। একটু রাতের দিকে ব্রজেন মণ্ডলও এল। বলল, কাল মিটিং ডেকেছি হে। সবাই যেও।

যোগেন প্রামাণিক বলল, তোমার আবার মিটিং লাগে নাকি? হাসতে হাসতে জিতে যাবে।

ঘন ঘন মাথা নাড়া দিয়ে ব্রজেন মন্ডল বলে, যত সোজা ভাবছ তত নয়। এবার দান উল্টে যেতে পারে।

বল কী? সুয্যি কি পশ্চিমে উঠছে আজকাল?

তা নয়। তবে মাধব বাড়ি বাড়ি গিয়ে কুচ্ছো গাইছে। কুঁচো দলগুলো এবার ক্যান্ডিডেট দেয়নি, তারা নাকি সব মাধবের পিছনে।

এ যে চিন্তায় ফেললে ভায়া!

চিন্তারই কথা কিনা। আর কয়েকটা বছর পেলে গাঁ একেবারে সোনায় বাঁধিয়ে দিতুম। গণতন্ত্র জিনিসটাই বাপু গোলমেলে। ভোটারদের মনে কি আছে আগেভাগে বোঝা ভার। পরের বার আমার জেলা পরিষদে যাওয়ার পাকা কথা হয়ে আছে। তা এবারটায় আটকে গেলে সব কেঁচে যাবে। তাই জোরদার লাগতে হচ্ছে। কাল আমার হয়ে সনাতন দাঁ আসছে বক্তৃতা দিতে।

ও বাবা! সনাতন দাঁ আসছে! তবে তো যেতেই হয়।

এদিকে একশো গ্রাম ঝোলাগুড় কিনতে এসে ঝামেলা পাকিয়েছে পটলি। বাটি আনেনি, বলছে, প্লাস্টিকে দাও। মা বলেছে, তুমি ঠিকমতো বাটির ফের ভাঙো না, তাই গুড় কম হচ্ছে রোজ।

গুড় নিবি তাতে প্লাস্টিক লাগে কীসে? প্লাস্টিক কিনতে পয়সা লাগে না বুঝি?

তা পটলি শুনতে চায় না। বলে, না ওজনে কম হয় বলে মা রোজ আমাকে বকে।

কোথাও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠা ভারি শক্ত ব্যাপার। হীরু সেটা হাড়ে হাড়ে টের পায়।

আটটা নাগাদ পালমশাই বাড়ি রওনা হলেন। ন'টা অবধি দোকান খোলা রেখে দিতে হয়। ন'টায় ঝাঁপ ফেলে বাড়ি থেকে টক করে খেয়ে আসে হীরু। তারপর ক্যাশ গুনে হিসেব মিলিয়ে রাখে। পালগিন্নি বা খিরি তাকে বিশ্বাস না করলেও পো তাকে অবিশ্বাস করে না। ওই একটা গুণেই বোধহয় মনোরঞ্জন পাল তাকে একটু নেক নজরে দেখে, জামাইও করতে চায় হয়তো। তবে পাল চাইলেই তো হবে না, খিরি চাইছে কোথায়? কিংবা তার মা!

দোকান বন্ধ করে দিলে ঘরটা একেবারে গুদামঘর। হাওয়াবাতাসের বালাই নেই। আর তখন দোকানের ভিতরকার মশলাপাতি, শুকনো লঙ্কা, আরশোলার নাদি, কেরোসিনের মেশানো গন্ধ ওঠে খুব। প্রথম প্রথম শ্বাস নিতে কষ্ট হত হীরুর। আজকাল সয়ে গেছে। দিব্যি ঘুমোয়।

আজ কিছুতেই ঘুম শালা আসতে চাইছে না কেন যে! হাড়মুড়মুড়ি ব্যায়ারামের মতো আড়মোড়া আসছে তার, হাই উঠছে, কিন্তু চোখে মোটে আঠা নেই। তাড়াং তাড়াং করে খোলা দুই চোখ অন্ধকার দেখছে চেয়ে চেয়ে। আসলে চিন্তা হচ্ছে বড্ড।

রাতে ইঁদুরের দৌড়োদৌড়ি, গোদা গোদা ছুঁচোর যাতায়াত, আরশোলার ফড় ফড় আর মশার পোঁ কানে আসে। মশার জন্য আগে গায়ে কেরোসিন মেখে শুতো। তাতে মশা দমন হত কি না কে জানে, তবে গায়ে চিনি চিনি গোটা উঠত খুব। সেই থেকে কেরোসিন মাখা বন্ধ করেছে। মশা আর কত রক্ত খাবে?

ঘুম যখন আসে তখন হীরু একেবারে মড়া। কামান দাগলেও ঘুম ভাঙে না।

আজ অবশ্য ভাঙল। কামানের চেয়েও গুরুতর ব্যাপার। একজন তার চুলের মুঠি ধরে টেনে বসিয়েছে, একখানা দোধার ছোরা ধরে আছে গলায়।

চাবি দে।

কীসের চাবি, কোথায় চাবি তা ঘুমচোখে ভালো বুঝতে পারল না হীরু। হাঁ করে চেয়ে রইল।

একটা জোরালো থাপ্পড়ে অবশ্য ঘুমের আবল্যিটা কেটে গেল।

বালিশের তলা থেকে চাবির গোছাটা বের করে দিয়ে বলল, ধারাবাকির কারবার। দুই আড়াইশোর বেশি নেই কিন্তু।

চুপ করে বসে থাক। নড়বি তো মরবি। দুশো তিপান্ন টাকা আছে হীরু জানে। কিছু বলল না।

ক্যাশবাক্স ফাঁক করে টর্চ ফেলে চারদিক দেখতে লাগল লোকটা।

হীরু জানে দোকানঘরে মুদিয়ালি আর মনোহারি জিনিস ছাড়া কিছু তেমন নেই। নিতান্ত ছ্যাঁচড়া চোর ছাড়া কে আর চুরি করতে আসবে? কিন্তু এই যে চুরি হচ্ছে এর দায়ও তার ওপরেই বর্তাবে। চোরের গপ্পো কেউ বিশ্বাস করবে না। সবাই বলবে, ও-ই মাল সরিয়ে চোরের গল্প ফেঁদেছে।

অভিমানভরে কথাটা সে বলেই ফেলল, এই যে দাদা, আমাকে বরং বেঁধেছেঁদে রেখে যান। নইলে আমার কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। চাকরিটাও যাবে।

লোকটা টর্চের আলো ঘুরিয়ে তার মুখে ফেলল।

তোর নজর তো বড্ড ছোট রে!

কথাটা শুনে হীরুর বড্ড রাগ হল, থাপ্পড় খেয়েও যেটা হয়নি। সে বলল, ছোটো মানুষের নজর তো ছোটোই হবে।

কত মাইনে পাস?

একশো টাকা।

মোটে?

তাই বা দিচ্ছে কে বলুন! ও চাকরির জন্যই কত জন ঘুরঘুর করেছে।

এর চেয়ে লেংটি পরে সাধু হয়ে গেলে পারতিস। লোকে সাধুদের পেন্নাম করে, পয়সা দেয়, চাল, ডাল, সিধে দেয়।

ভেক ধরা আমার পোষাবে না মশাই।

কীসের আশায় পড়ে আছিস এখানে? মনোরঞ্জন তোকে জামাই করবে বুঝি?

হীরু মিইয়ে গিয়ে বলে, কে জানে কী করবে।

লোকটা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, সেই জন্যই তো বললাম তোর নজর বড্ড ছোটো।

আমার নজর বড়ো হবে কি করে? লাথি-ঝাঁটা খেয়ে বেঁচে আছি। নজর বড়ো করে তো লাভ নেই মশাই।

আচ্ছা ধর, ভগবান যদি এখন তোকে বর দিতে চায় তুই কী চাইবি বল তো!

হীরু একটু হাঁ হয়ে রইল। লোকটা পাগল নাকি? তারপর বলল, আমাকে বর দিতে ভগবানের বড়ো বয়েই গেছে।

আহা, ধর না কেন, ভাগবান এই আমাকেই তোর কাছে পাঠিয়েছেন বর দেওয়ার জন্য। কী চাইবি বেশ ভালো করে ভেবে বল তো!

পাগলই হবে। দুনিয়ায় কত রকমেরই আছে।

আপনি যদি ভগবানের লোকই হবেন তাহলে কি চুরি করতে আসতেন?

দুর বোকা, ভগবানের লোক চুরি করলেও দোষ হয় না। তার মধ্যেও কিছু ভালো মতলব থাকে। এবার চেয়ে ফেল দেরি করিসনি।

হীরু একটু নড়েচড়ে বসে বলল, মাথায় কিছু আসছে না মশাই।

সে কী রে! কত কি চাওয়ার আছে। চেয়ে ফেল, চেয়ে ফেল। টাকা-পয়সাই তো চাইবি, নাকি? তাই চা না হয়।

এই ধরুন লাখ দশেক।

মাত্র। ভগবান কি হ্যাতান্যাতা লোক রে, যে দশ লাখ চাইলি। সাধে কি আর বলি তোর নজর বড্ড ছোটো?

তার বেশি হলে গুনব কি করে?

গুনবি? গুনবি কেন? বড়ো লোকেরা কখনও টাকা গোনে দেখেছিস? গরিব আর কৃপণেরা, বসে বসে থুথু লাগানো আঙুল দিয়ে টাকা গোনে।

তা আমি তো গরিবই।

সে না হয় ছিলি। এখন তো নোস। ইচ্ছে করলে দুনিয়ার সব টাকাই তো তোর হতে পারবে।

চক্ষুলজ্জা বলেও তো একটা ব্যাপার আছে মশাই।

ভগবানের কাছে আবার চক্ষুলজ্জা কী রে! অ্যাঁ! এত বড়ো দাঁওটা তোর ফস্কে গেল তো!

তা মশাই দশ লাখই কিছু কম হল! একশো টাকা মাস মাইনের উদয়াস্ত খাটছি, তো লাখও যে মুখ ফুটে চাইতে পেরেছি সেই ঢের। তাই দিক না ভগবান।

দিলে কী করবি?

একখানা বাহারের দোকান খুলে বসব।

খিরিকে বিয়ে করবি না?

দুর মশাই, খিরিকে বিয়ে করার চেয়ে খেজুর গাছকে বিয়ে করা ভালো।

বাঃ, এই তো নজর একটু উঁচু হয়েছে দেখছি।

ঠাট্টা ইয়ার্কি আর ভালো লাগছে না মশাই। সেই সকালে উঠেই ফের দোকান খুলে বসতে হবে। তার ওপর দোকানে চুরি হওয়ার জবাবদিহি আছে। আপনি তো সরে পড়বেন, আমার না হাতে হাতকড়া পড়ে। কাজের লোককে কেউ বিশ্বাস করে না মশাই। ওই বালতির পাশেই দড়ি রয়েছে। আমাকে বেঁধেছেঁদে ফেলে রেখে যান।

আহা, দুটো কথা কইছি, অমন হুড়ো দিচ্ছিস কেন?

ঘুম পাচ্ছে যে। সারা দিন অসুরের খাটুনি গেছে, একটু ঘুমিয়ে না নিলে শরীর চলবে?

আহা, ভেবে নে না তুই আর মনোরঞ্জনের কর্মচারী নোস। তোর ট্যাঁকে এখন দশ লাখ টাকা। এখন তোর কার পরোয়া?

সে তো ঠাট্টা-ইয়ার্কি মশাই, সত্যিকারের তো নয়। কথা দিয়ে তো আর পেট ভরবে না।

কে বলেছে তোকে সত্যি নয়?

তার মানে কি আপনি ভগবানের লোক?

নয় তো কী? নিশ্চয়ই ভগবানের লোক। তোকে বর দিতেই আসা।

হাসালেন মশাই। তা টাকার পুঁটুলিটা কই। একটু খুঁজে নিতে হবে যে! দশ লাখ তোর মঞ্জুর হয়েই আছে। একটু গা ঘামিয়ে দেখ না।

সাত মন তেলও পুড়বে না, রাধাও নাচবে না।

ভগবানের দেওয়া বর কি মিথ্যে হয় রে! তবে নাক সিঁটকোলে সব ফক্কা হয়ে যাবে। দশ লাখ তোকে দেওয়াই রইল, একটু চোখ, কান খোলা রেখে চললে আর গা ঘামালেই হয়।

আর ভ্যাজর ভ্যাজর ভালো লাগছে না মশাই। শরীর এলিয়ে পড়ছে।

ভালো কথা তোর ভালো লাগে না বুঝি?

আজ্ঞে, কথায় কি আর চিঁড়ে ভেজে? চাকরিটা গেল, বিয়ের আশা গেল। কী যে হবে কে জানে।

খুক করে অন্ধকারে একটা হাসির শব্দ হল। লোকটা বলল, ভগবান যাকে দেন আগে তার সর্বনাশ করেন। তারপর ভরে দেন।

আমাদের আর ভাগবান দিয়ে কাজ নেই। পালমশাই খুশি থাকলেই হয়।

ছায়ামূর্তিটা ভোজবাজির মতো অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

দেখ কান্ড। ক্যাশবাক্স সাফ করে গেছে, তাকে বেঁধেও রেখে গেল না। এখন যে তার ঘোর বিপদ।

তা বিপদই বেঁধে উঠল বটে। চুরির খবর পেতেই পালমশাই এলেন, খিরি এল, পাল গিন্নি এলেন, পাড়া প্রতিবেশী জড় হল।

পালগিন্নি চোখ পাকিয়ে স্বামীকে বললেন, তখনই বলেছিলুম কি না যে ছোকরাকে অত বিশ্বাস কোরো না। তুমি তো একেবারে জামাই করতে চেয়েছিলে। এখন শিক্ষা হল তো!

পালমশাই বললেন, আহা, জামাইটা তো কথার কথা।

চোরের গল্পটা যথারীতি কেউ বিশ্বাস করল না। তবে পুলিসও ডাকল না কেউ।

পালমশাই বললেন, দুধ-কলা দিয়ে কালসাপ পুষেছিলুম। খুব শিক্ষা দিলি। এখন বিদেয় হ।

তা চোখের জল ফেলে ভগবানের লোকটাকে শাপশাপান্ত করতে করতে পটতলায় শিবের থানে এসে একা চুপ করে বসে রইল হীরু। তার সামনে মাঠঘাট বড্ড ফাঁকা, বড্ড শূন্য লাগছে আজকে।

ব্রজেন মন্ডলের নাম লেখা ভোটের শালুটা বাতাসে দু'বার পটকা ফাটার মতো আওয়াজ করল। নেতিয়ে পড়ছে, ফের বাতাসে ফুলেফেঁপে উঠছে। কে হারল, কে জিতল তার খবর রাখে না লাল শালু, সে শুধু তার কাজ করে যাচ্ছে।

কে যেন বলে উঠল, দেখলি?

হীরু আনমনে জবাব দিল, দেখলাম।

তারপরেই চমকে উঠে চারদিকে চেয়ে দেখল কেউ কোথাও নেই। তাহলে বলল কে কথাটা?

ভাগবানই কি? কে জানে, ভগবানের কায়দাকানুন সে তেমন বুঝে উঠতে পারছে না। ভগবানের লোক এসে তাকে পালমশাইয়ের ঠাঁই থেকে তাড়িয়েছে। এখন আবার ভূতের গলায় কথাও কইছে।

অনিচ্ছে সত্ত্বেও হীরু উঠে পড়ল। দশ লাখ টাকা নাকি তার মঞ্জুর হয়েই আছে। গা ঘামালে আর মাথা খাটালে নাকি বেরিয়ে পড়বে। তা গা ঘামিয়েই দেখা যাক তাহলে।

ভোটের লাল শালুটা পটকা ফাটার মতো একটা আওয়াজ দিল। তাকে সাবাসই জানাল বোধহয়।

জন্ম

কানাইয়ের খুব বিশ্বাস ছিল যে ভবেন বিশ্বেসই তার বাপ। তা বলে আইন মোতাবেক নয়। ওই যেমন হয় আর কি। তার মা শেফালী ভবেন বিশ্বেসের বাড়িতে দাসী হয়ে আছে কম করেও পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর। এখনও খাটে, ভবেনের বিশাল বাড়ি, ময়দানের মতো তিনটে উঠোন, লাগোয়া মস্ত আম আর লিচুবাগান, মেলা নারকোল গাছ, সবজির খেত, পনেরোটা গরু নিয়ে বিরাট পাকা গোয়াল, সার সার ধান চালের গোলা, চালকল, আটাচাকি, তেলকল মিলিয়ে ডাইনে বাঁয়ে মা লক্ষ্মী। আইন মোতাবেক ভবেনের চার ছেলে, তিন মেয়ে। না, কানাইকে তারে মধ্যে ধরা হয় না। ধরতে নেই। তবে ভবেনের জনের দরকার, নইলে এত দিক সামাল দেবে কে? সুতরাং কানাইও মাস মাইনে আর খোরাকি পায়, গতরে খাটে। বিশ বছর বয়সও হল তার। লেখাপড়াও শিখেছিল একটু। টেনেমেনে মাধ্যমিক পাস করার পর সে ভবেনের খাজাঞ্চি হরিপদর লাগোয়া হল। ভবেনই তাকে ডেকে বলে দিল, হিসেবের কাজটা শিখে রাখ, পরে কাজে দেবে।

হিসেবের কাজ সব বিকেলবেলায় হয়, সারা দিনের আদায় উসুলের পর। আর দিনমানে ফাইফরমাসের অভাব নেই। তারই ফাঁকে ফাঁকে সে ভবেনের ছড়ানো ঐশ্বর্যের দিকে চেয়ে থাকে। তার মনে হয়, এ সবের একটা হিস্যে তারও ছিল। না, আইন মোতাবেক নয়।

শেফালী সোজা সরল মানুষ। তার পেটে কথা থাকে না। তার ওপর ভবেন বিশ্বেসের মতো তালেবর লোকের সঙ্গ করার একটা বড়োই তো আছে। একদিন বর নয়ন দাসের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটির পর ছেলেকে বলেই ফেলেছিল, তুই কি ওর মতো হেঁজিপেঁজির ছেলে? তোর আসল বাপ হল ভবেন বিশ্বেস।

কলঙ্কের ব্যাপার একটা আছে বটে, কিন্তু গৌরবও তো কম নেই। শুনে একরকম খুশিই হয়েছিল কানাই। আর তারপর থেকেই সে রোজ মিলিয়ে মিলিয়ে দেখেছে, ভবেন বিশ্বেসের সঙ্গে তার মিল কতটা। তা তার মা শেফালী দাসী মিছে বলেনি। কানাই হল লম্বাই চওড়াই সা জোয়ান ছেলে, আর তার আইন মোতাবেক বাপ নয়ন দাস হল খেঁকুড়ে চেহারার একরত্তি মানুষ। মেলে না। কিন্তু ভবেন বিশ্বেসের সঙ্গে মেলাও। খাপে খাপে মিলে যায়। ভবেন বিশ্বেস লম্বাই চাওড়াই বিরাট মানুষ। রংটাও ফর্সার দিকেই। কানাইয়েরও অবিকল তাই। মিল খুঁজে পেয়ে নিশ্চিন্ত হল কানাই। দুঃখের কথা, বাপকে জ্যাঠা ডাকতে হয়, এই যা। তবে মনে মনে সে ভবেন বিশ্বেসকে বাবা বলেই ডাকে।

মনে মনে বাপ আর মুখে জ্যাঠা বলে ডাকাটা হল দু নৌকোয় পা রেখে চলার মতো। সামাল দেওয়া মুশকিল। বাপ আর জ্যাঠা এমন গুলিয়ে যায় যে মাঝে মধ্যে বিপত্তি দেখা যায়।

মুনশির হাটের রজব আলি এসেছিল সেদিন পাখি নিয়ে। ভবেন বিশ্বেসের ছোটো মেয়ে বিনীর খুব পাখি পোষার শখ। দরদালানে বিস্তর পাখির খাঁচা ঝোলানো। সারাদিন কিচিরমিচির, হেগেমুতে একশো করে। দুর্গন্ধে তেষ্টানো যায় না। তার মা শেফালীই সব পায়খানা পরিষ্কার করে। বাবুর মেয়ে পুষেই খালাস, ভোগান্তি অন্যের। তা বিনী একটা কথা-বলা ময়নার কথা বলে রেখেছিল। রজব আলি নিয়ে এসেছে সেদিন। কথায় কথায় রজব তাকে বলল, তুই তো শুনি সব কাজের কাজী। ইলেকট্রিকের কাজ জানিস, পাম্পসেট সারাতে পারিস, কাঠের কাজ জানিস, তা এত গুণ নিয়ে পড়ে আছিস কেন? মুনশির হাটের মহাজন মহাদেব পোড়েল লোক খুঁজছে। কাজের লোক পেলে হাজার দু-হাজার বেতন দেবে। যাবি?

কথাটা মিথ্যে নয়। লেখাপড়ায় তেমন দড় না হলেও কানাই হাতের কাজে খুব পাকা। পাম্পসেট, জেনারেটার থেকে শুরু করে এ বাড়ির যাবতীয় যন্ত্রপাতিই সে টুকটাক সারিয়ে দেয়। ভবেন বিশ্বেসের মেজো ছেলে গোবিন্দ ছাদে মস্ত ডিশ অ্যান্টেনা লাগিয়ে ঘরে ঘরে কেবল কানেকশন দিয়েছে সে কাজও কানাইকেই করতে হয়। এ সবের জন্য বাড়তি

পয়সাও পায় না সে। তার জন্য দুঃখও বিশেষ নেই তার। ভাবে, নিজের বাড়িরই তো কাজ।

রজব আলির প্রস্তাব শুনে সে উদাস মুখে বলে ফেলেছিল, বাপ পিতেমোর ভিটে ছেড়ে কোথায় যাব রবজ ভাই!

শুনে রজব হাঁ, বলল, এ আবার কবে থেকে তোর বাপ পিতেমোর ভিটে হল রে? তোর বাপ তো নয়াগঞ্জের লোক! বাপের ভিটে এখানে দেখলি কোথায়?

বেফাঁস কথা। বুঝতে পেরে কানাই কথা ঘোরাতে লাগল।

রজব বলল, ভালো করে ভেবে দেখিস। মহাদেব বুড়ো হয়েছে। ভবেন বিশ্বেসের চেয়েও তার ভালো অবস্থা। দুগুণ তিনগুণ হবে, ম্যানেজার গোছের লোক খুঁজছে। চাপাচাপি করলে দুই কেন, তিন হাজারেও রাজি হয়ে যাবে। আর বেতন ছাড়াও রোজগার আছে মেলা। সাত মেয়ের পর তার একটা মাত্র ছেলে। তা সে ছেলেও লায়েক হয়নি।

প্রস্তাব খুবই লোভনীয়। কিন্তু কানাইয়ের হল দু নৌকোয় পা। আইন মোতাবেক সে ভবেন বিশ্বেসের ওয়ারিশান নয় বটে, কিন্তু ধর্মত ন্যায্যত এই যে বিরাট বাড়ি, চাষের জমি, নানা কারবার এ সবের একটা অংশ তারও। এইটে ভেবে একটা সুখ আছে। সেই সুখ কি অন্য কোথাও পাওয়া যাবে?

কুমোরপাড়ার হিমি পিসির জাঁতির খিল খুলে গিয়েছিল। কানাইকে ধরে পড়ল, দে বাবা লাগিয়ে। ত্রিশ বছরের পুরনো জিনিস। এমনটি আর পাওয়া যায় না। বখসিস দেবোখন।

এ কথায় দেমাকে একটু লাগল কানাইয়ের। বলল, বখসিসের কথা কেন বলেন পিসি? ওসব দিতে হবে না। গায়ে ভদ্রলোকের রক্তটা তো আছে।

পিসি চোখ বড়ো বড়ো করে বলে, ওমা! তাই বুঝি?

জাঁতিটায় রিপিট এঁটে যখন পৌছে দিল কানাই তখন পিসি তাকে আদর করে বসিয়ে একথা-সেকথার পর হঠাৎ বলল, হ্যাঁ রে, তুই তো ভদ্রলোকের ছেলে। তা অমন চাকরবাকরের মতো খেটে মরিস কেন?

কথাটার প্যাঁচ ধরতে পারেনি কানাই। ভালোমানুষের মতো বলে ফেলল, নিজের বাড়ির কাজ, লজ্জার কী আছে বলুন!

পিসি মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বলল, তাও তো বটে। আমরাও তো বলাবলি করি, কানাইয়ের চেহারাখানা দেখে কে বলবে ভদ্রলোকের ছেলে নয়? তেমনই লম্বা-চওড়া, তেমনই ফর্সাটে রং, তেমনই হাত পায়ের গড়ন।

কানাই তবু প্যাঁচ ধরতে না পেরে প্রশংসা মনে করেই মিটি মিটি হাসছিল।

হিমি পিসি নাড়ু আর জল খাইয়ে হঠাৎ আলটপকা বলে ফেলল, বুড়ো টসকাবার আগে একটু বুঝেসুঝে নিস বাবা। তোর ন্যায্য দাবি আছে কিন্তু।

এ কথায় একটু থমকায় কানাই। তবে কি সবাই জানে নাকি? কথাটা তো সেদিকেই ইশারা করছে।

লজ্জারই কথা। কানাইয়ের লজ্জাও করছিল। কিন্তু একটু আনন্দও যে না হচ্ছিল তা নয়। জানাজানি হওয়ায় অন্তত ব্যাপারটা নির্যস সত্যি বলেই প্রমাণ হচ্ছে।

হিমি পিসি ভালোমানুষের মতো বলল, বুড়োকে ভাঙিয়ে কত লোক করেকর্মে খাচ্ছে, আর তুই আঁটি চুষছিস। আমরা তো বলি, অত ভালো ছেলে...

নাড়ু খেয়ে কানাই উঠে পড়ল।

দাবিদাওয়ার কথাটা অবশ্য সে ভাবে না। ও সব করতে গেলে হিতে বিপরীত হতে পারে। মনে মনে এটুকু জেনেই সে খুশি যে, সে একটা তালেবর লোকের ছেলে। জানা বাপটা নয়, ছুপা বাপটাকেই তার পছন্দ।

গায়েগতরে আলিসান হয়ে ওঠার পর সে একদিন মেপে দেখেছে, ভবেন বিশ্বেসের চেয়েও সে দু ইঞ্চি লম্বা। মাপজোখ করার সহজ উপায় তো ছিল না। তবে ভবেন বিশ্বেস যখন বারান্দার থামের পাশে দাঁড়িয়ে উঠোনে মুনীশদের ধান ঝাড়াই দেখে তখন মাথাটা থামের একটা চাপড়া-খসা জায়গায় পৌঁছয়। ওই মাপটা ধরে সে মেপে দেখেছে।

ইদানীং সন্ধের পর খাজাঞ্চির সঙ্গে তারও ডাক পড়ে ভবেনের ঘরে। মেঝের ওপর বিভিন্ন খাতে আসা টাকাপয়সার স্তূপ। গোনাগাঁথা, খাতায় হিসেব তোলা এসব ভবেনের চোখের সামনেই হয়। বুড়ো হরিপদর চেয়ে সে অনেক বেশি চটপটে বলে ভবেনের যেন একটু পক্ষপাত দেখা দিচ্ছে তার প্রতি।

একদিন সন্ধেবেলা খাজাঞ্চি চলে যাওয়ার পর ইশারায় তাকে বসতে বলেছিল ভবেন।

ভবেন গম্ভীর গলায় বলল, কত মাইনে পাস যেন?

তিনশো টাকা। আর খোরাকি।

কম নয় তো! নয়ন কত পায় জানিস?

আজ্ঞে, রোজ কুড়ি টাকা করে। খোরাকি আছে।

ও বাবা, সে তো পাঁচ-সাতশো টাকার ধাক্কা! আর তোর মা?

দেড়শো টাকা আর খোরাকি।

তা হলে একুনে কত হল?

হাজারখানেক হবে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভবেন বলে, কত টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে রে বাপ! তাই তো তেমন জমছে না আমার তবিলে।

কথাটা ঠিক নয়। তার ভবেন বাবা কত কামায় তার হিসেব কানাই ভালোই জানে। দিনে খরচখরচা বাদ দিয়ে আড়াই থেকে তিন হাজার। ফসলের সময়ে এর পাঁচ থেকে সাত গুণ বেশি।

ভবেন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, যা যায় যাক। তবু তো গরিবেরা খেয়েপরে বাঁচছে। কী বলিস?

যে আজ্ঞে।

আমার বাঁ হাঁটুতে আজকাল বড্ড ব্যথা হয়। বাতে ধরেছে। গনাকে একটু তামাক সাজাতে বলে আয় তো। তারপর হাঁটুটা দাবিয়ে দে একটু।

পা দাবানোর হুকুমে খুশি হল কানাই। পাপ হলে কী হয়, চাকর আর মনিবের দূরত্ব তো আছেই। পা দাবানোর সুবাদে তবু একটু কাছাকাছি হওয়া গেল।

তামাকের সুন্দর গন্ধ ছাড়তে ছাড়তে ভবেনবাবু বলল, তোর মা এসেছিল কাল, তোর হয়ে দরবার করতে। অনেক ধানাইপানাই করল। তা তুই কিছু খারাপ আছিস বাপু? এর চেয়ে বেশি কেউ দেবে গ্রামদেশে।

কথাটা বলার ইচ্ছে ছিল না, তবু কেমন যেন ফস করে বেরিয়ে গেল মুখ থেকে, একজন তিন হাজার টাকায় সাধছে আমাকে।

অ্যাঁ, বলে বড়ো করে চোখ মেলল ভবেন। কিছুক্ষণ তার দিকে চেয়ে থেকে বলে, তিন হাজার! তা কাজটা কিসের?

ম্যানেজারি।

বলিস কী? কে সাধছে?

মুনশির হাটের মহাদেব মহাজন।

কে বটে লোকটা? কিসের কারবার?

তা জানি না। তবে মেলাই নাকি ব্যবসাপত্তর। জমিজিরেত।

সে তোকে ম্যানেজারি দিতে চায় কেন?

তার একজন চৌখস লোক চাই।

তোকে চৌখস ঠাউরেছে বুঝি?

এখনও ঠাওরায়নি। বাজিয়ে নেবে।

তোর কী ইচ্ছে? যাবি?

কথাটা বলার ইচ্ছে ছিল না। তবু কে যেন ভিতর থেকে জোর করে কথাগুলো ঠেলে বের করে দিল, আজ্ঞে বাপ পিতোমোর ভিটে ছেড়ে কার যেতে ইচ্ছে হয় বলুন। তবে আতান্তরে পড়লে যেতে হবে।

কথাটা বলে ফেলে সে কর্তার দিক থেকে যেমনটা আশা করেছিল তেমনটা ঘটল না দেখে অবাক হল।

কথাটার মধ্যে যে প্যাঁচটা আছে সেটা হয় ধরতে পারল না, নয়তো এড়িয়ে গিয়ে ভবেন কিছুক্ষণ গুড়ুক গুড়ুক করে তামাক খেয়ে গেল। তারপর হঠাৎ বলল, তোর তো আর ভাইবোন নেই।

না, আমি একা।

হুঁ

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তারপর ভবেন নলটা সরিয়ে রেখে বলল, তুই তো গোবিন্দর সঙ্গে কাজ-টাজ করিস। সে তোকে কিছু দেয়-টেয়?

না, আমি চাইনি।

চাসনি যেন?

কাজটা শিখে রাখলাম। বড়োদার তেমন হয়ও না কিছু। কিন্তু, যত বাড়িতে লাইন দিয়েছি তাদের অর্ধেক ঠিকমতো পয়সা দেয় না। গত মাসেও তিন বাড়ির লাইন কেটে দিতে হয়েছে।

অসন্তুষ্ট ভবেন বলে, এককাঁড়ি টাকা জলে গেল। তখনই বলেছিলুম গাঁ-গঞ্জে লোকের ভাতই জোটে না তো টি ভি দেখবে।

ঠিকমতো করতে পারলে হয়। লোকে না খেয়েও ওসব দেখতে চায়।

কিছু হবে বলছিস?

ধীরে ধীরে হবে। কারেন্ট থাকে না বলে লোকে অর্ধেক দিনই দেখতে পায় না কিছু।

সেটাই তো বলছি। ওসব বিলাসিতা কি এখানে মানায়? দেখুক কিছুদিন। বেশির ভাগ ব্যবসাই তো ধারবাকিতেই ডোবে কি না।

আজ্ঞে।

তা গোবিন্দ যা হোক কিছু করছে। আর তিনজন তো বসে বসে হেদিয়ে গেল। বটু কী পড়ছে যেন?

আজ্ঞে ক্লাস এইট হল।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভবেন বলল, গতবার ফেল মেরেছে। অবিশ্যি পড়েই বা কী হবে? কাজ কারবারে লাগলে কাজ হত। কিন্তু বাবুদের তো ইদিকে মনই নেই।

কথাটা জানে কানাই। দুঃখেরই কথা ভবেনের পক্ষে।

ভালো চোখে দেখেও না আমাকে।

বড়ো মানুষ হলেও ভবেন বিশ্বেসেরও দুঃখের দিক আছে। চার চারটে ছেলের কেউই বাপকে যে বিশেষ গ্রাহ্য করে না এ সবাই জানে। তারা একটা বাবু গোছের, একটু আলগোছ। চাষ-বাস, মুনিশ খাটানো, চালকল, তেলকল এসব নিয়ে এই যৌবন বয়সে মাথা ঘামাতে তারা নারাজ। যতদিন মাথার ওপর বাপ বাবাজীবন গ্যাঁট হয়ে বসে আছে ততদিন ঘামাবেও না।

ভয় কি জানিস, অন্ধি-সন্ধি চিনল না তো, আমি মরলে সব না উড়িয়ে-পুড়িয়ে দেয়। আমার তো শত্তুরের অভাব নেই, আমি মরলে তারা এসে নানা শলা-পরামর্শ দেবে, মাথায় হাত বুলিয়ে সব গাপ করে ফেলবে।

সব বাবারই এক রা। কথা কিছু নতুন নয়। কানাই খুব যত্নের সঙ্গে তার ছুপা বাবা আর প্রকট জ্যাঠার বাঁ পায়ের হাঁটু দাবাতে দাবাতে দার্শনিকের মতো বলল, অত ভাবেন কেন? কপালে যা আছে তা তো হবেই।

এ কথায় ভবেনের হাঁটু চমকে উঠল। ভবেন চোখ কপালে তুলে বলে, বলিস কি? একটা জীবন কম কষ্ট করেছি! বাপ তো রেখে গিয়েছিল লবডঙ্কা। খেয়ে না-খেয়ে, মাথার ঘাম

পায়ে ফেলে এই যে এত সব করলুম সে কি ভূতভুজ্যিতে যাবে নাকি?

এসব কথার জুতসই জবাব কানাইয়ের জানা নেই। সে বুঝল, ভবেন একটু সান্ত্বনা চাইছে, একটু বল-ভরসা। তোয়াজি কথা বললে কাজ হয় এ সময়ে। কিন্তু তার মাথায় আজ বোধহয় ভূতেই ভর করেছে। যা বলার কথা নয়, সেসব কথা সে ঘুণাক্ষরেও ভাবে না, সেইসব কথাই যেন ভিতর থেকে অনিচ্ছেতেও ঠেলে বেরিয়ে আসছে। সে নির্বিকারভাবে বলে, তা ছেলেপুলে তো আরও আছে আপনার। তাদের ওপরেই ভরসা করে দেখুন না।

বাপ পিতেমোর ভিটে কথাটা ভবেন শুনেও শোনেনি। কিন্তু এ কথাটা জায়গামতোই লাগল বোধহয়। ভবেন সোজা হয়ে বসে বলে, কী বললি কথাটা? অ্যাঁ! কী বললি রে হনুমান?

তটস্থ হয়ে কানাই বলে, কিছু ভুল বললুম নাকি বাবা?

ওই! ফের ওই বাপ-জ্যাঠায় গণ্ডগোল! মুখ ফসকে 'বাবা' ডাক বেরিয়ে গেছে। ভবেন নিচু হয়ে নিজের এক পাটি চটি তুলি নিয়ে কটাস করে কানাইয়ের পিঠে বসিয়ে চাপা গর্জন করে ওঠে, যত বড়ো মুখ নয় তত বড়ো কথা! বেরো হারামজাদা, বেরো! আজই তোকে বরখাস্ত করলুম। ফের এ বাড়ির ছায়া মাড়ালে কেটে ফেলব। দূর হ সুমুখ থেকে।

পেট আর মুখের কথার তফাত রাখতে না জানলে মানুষের দুর্গতি হবেই। পেটে বাপ, মুখে জ্যাঠা বরাবর বজায় রাখতে পারলে টিকে থাকতে পারত। তা আর হল না। তার ওপর জুতোপেটাও হতে হল। মনিবের জুতো খেলেও আঁতে লাগে, বাপের জুতো খেলেও আঁতে লাগে। তবে ভরসা এই যে, মনিবের জুতোয় যতটা আঁতে লাগে, বাপের জুতোয় ততটা নয়। মনকে এইটুকু বুঝিয়ে সে বেরিয়ে এল।

মা শেফালী দাসীকে কথাটা বলতে চায়নি সে। কিন্তু ভবেনের বাড়ি হচ্ছে খোলা হাট। ঘটনাটা দু-চারজনের চোখে পড়েই থাকবে। তাই রটে যেতে দেরি হয়নি।

রাতে শেফালী বলল, হ্যাঁ রে, কর্তা নাকি তোকে জুতোপেটা করেছে?

না, তেমন জোরে মারেনি। ওই একবারই--তা লাগেনি তেমন।

তা তুই করেছিলি কী? কর্তার টাকাপয়সা সরাসনি তো!

আরে না না, ওসব নয়। খামোখা ফস করে চটে গেল।

বুড়োর ভীমরতি ধরেছে। সারাদিন জান চুঁইয়ে খাটছিস, ক পয়সা ঠেকায় তোকে? কাল গিয়ে বিষ ঝেড়ে দিয়ে আসবখন।

আরে না, ওসব করতে যেও না।

তা বলে চটি দিয়ে মারবে?

আহা, বাপ বলেই ধরে নাও না কেন? তাহলে আর তত গায়ে লাগবে না।

বাপ তো সে বটেই, কিন্তু তা বলে অপমান করবে কোন মুখে?

কথাটা চাউর হল খুব। শুধু দেখা নয়, সেদিন বৈঠকখানায় যা কথাবার্তা হয়েছিল তা আড়ি পেতে শুনেছেও কেউ কেউ। কথাটা এমনভাবে রটল যে কানাই ভবেনের কাছে সম্পত্তির ভাগ চেয়েছে ছেলে হিসেবে।

আড়ালে লোক গা টেপাটেপি করে হাসছে আর ভবেনের বাড়িতে মেজাজ চড়ছে।

সন্ধেবেলা গিন্নিমা ডেকে পাঠাল।

কানাইয়ের তেমন ভয়ডর হচ্ছিল না। মাথা উঁচু করেই গিয়ে গিন্নিমার ঘরে ঢুকল। ভবেন বিশ্বেসের বউ রোগাভোগা মানুষ। মুখ গম্ভীর, চোখে খর দৃষ্টি।

তার দিকে চেয়ে বলল, কী সব শুনছি?

কানাই হেঁটমুণ্ড হয়ে বলল, খারাপ কিছু বলিনি। কথাটা ঘুরিয়ে ধরেছে লোকে।

গিন্নিমা উঠে ঘরের দোর দিয়ে এল। তারপর গলার স্বর নামিয়ে বলল, কতটা কী জানিস বল তো।

আজ্ঞে, আমি আর কী জানব? কিছু জানি না।

ঢং করতে হবে না। কর্তার কীর্তি কিছু কম নেই। কিন্তু বলি, তোর এত সাহস হয় কি করে? দাবিদাওয়া তুলেছিলি?

আজ্ঞে না।

তোর মা তোকে বুদ্ধি পরামর্শ দেয়নি তো। ও বোকা মেয়েছেলে, সব করতে পারে।

না, আমার মা এর মধ্যে নেই।

আগেকার দিনের বড়োলোকদের ওরকম কত মেয়েছেলে থাকত। তা বলে তাদের ছেলেপুলেরা দাবিদাওয়া তুলবার মতো বুকের পাটা দেখায়নি। তোকে কে বুদ্ধি দিচ্ছে বল তো!

আজ্ঞে ওসব ব্যাপার নয়।

ব্যাপার নয় মানে? তুই কোন সুবাদে সেদিন কর্তাকে বাবা বলে ডেকেছিলি? মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে। অন্নদাতাও তো বাপেরই সমান।

এসবও তোকে কেউ শেখাচ্ছে। এই আমি বলে দিচ্ছি, মুখ থেকে আর কোনো বেফাঁস কথা বেরোলে কিন্তু কালু হাঁসুয়াকে খবর দিয়ে খুন করাব, বুঝেছিস?

কালু হাঁসুয়া ভাড়াটে খুনি, সবাই জানে। অন্য সময় হলে নামটা শুনে ভয় পেত কানাই। আজ যেন তবু ভয় হয় না। শুধু বলল, বুঝেছি।

বিষয়সম্পত্তির দিকে হাত বাড়ালে রক্ষে থাকবে না, এটা ভালো করে জেনে যা।

কানাই চুপচাপ চলে এল।

দুদিন ধরে কাজকর্ম নেই। ঘরে বসে বসে মাজায় ব্যথা। তিনদিনের দিন সে একটু বেরোল। তালবাগানে কপিখেতের পাশে শীতের রোদে বসে বিড়ি ফুঁকছিল নিতাই। তাকে দেখে ডাকল, ওরে ইদিকে আয়। তোকে নিয়ে তো হুলুস্থুলস কাণ্ড। বোস এখেনে।

তা বসল কানাই।

নিতাই বলল, নতুন কথা তো কিছু নয় রে। ওসব আমরা সেই কবে থেকেই জানি। বোকার মতো বলে ফেলে অমন চাকরিটা খোয়ালি। মুখ বুজে থাকলে আখেরে লাভই হত। তেলকলের ম্যানেজার তপন, ট্রাক্টরের ড্রাইভঅর মদনা কেউ কি মুখ খুলেছে বল?

অবাক হয়ে কানাই বলে, তাদের আবার কী বৃত্তান্ত?

তোর যা ওদেরও তাই।

তার মানে?

তোর কি ধারণা তুই একা ভবেন বিশ্বেসের বে-আইনি ছেলে?

খুব হাসছিল নিতাই। কানাইয়ের তাতে গা জ্বলে গেল। বলল, প্রমাণ আছে?

সে কি তোরই আছে?

কানাই এই প্রথম ভবেন বিশ্বেসের ছেলে হিসেবে তেমন গৌরব আর বোধ করছিল না। বলল, না প্রমাণ নেই।

তবে? তপন আর মদনাও জানে তারা কোত্থেকে এসেছে। তবে রা কাড়ে না। তাতে সুবিধে একটাই। কর্তা তার এসব বে-আইনি ছেলেদের বিধিব্যবস্থা ঠিকই করে দেয়। তুই বাড়াবাড়ি করে ফেললি কিনা। চুপচাপ থাকলে দেখতিস পাকা বাড়ি হয়ে যেত, তলে তলে জমিজমাও করে দিত। কর্তা পাষণ্ড নয়। শত হলেও রক্তের সম্পর্ক তো!

কানাই একটু ভেবে দেখল দুইয়ে দুইয়ে চারই বটে। তপন নামে মাত্র ম্যানেজার হলেও কুল্যে ছশো টাকা বেতন পায়। তা তারও পাকা বাড়ি হয়েছে গত বছর। মদনারও বাড়ি উঠছে গোয়ালপাড়ায়। ট্রাক্টর চালিয়ে সে হাজার টাকার বেশি পায় না। দুজনেই কানাইয়ের চেয়ে বড়ো।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কানাই উঠে পড়ল। মনটা বড্ড তেতো হয়ে গেল তার। সে ওদের মতো নয়। আদায় উশুলের পথে যায়নি কখনো। তার শুধু এই ভেবেই সুখ ছিল যে, আসলে সে ভবেন বিশ্বেসের ছেলে। সেই সুখটা হঠাৎ চড়াই পাখির মতো ফুরুত করে উড়ে গেছে কোথায় যেন।

তিন দিন বাদে মুনশির হাটে মহাদেবের কাজে লেগে পড়ল কানাই। মহাদেব সোজাসাপটা মানুষ। প্রথম হাজার টাকা মাইনে, কাজ পছন্দ হলে তিন মাস পর থেকে দু হাজার। আরও কাজ দেখাতে পারলে বেতন যে আরও বাড়ানো হবে সেটাও সাফ জানিয়ে দিল মহাদেব।

কাজের ধরন একই রকম। কানাইয়ের কাছে কাজ একটা নেশার মতো। খাটতে তার ভালোই লাগে। কাজ দেখে মহাদেবও খুশি। পাঁচটা কারবারে তার মেলা টাকা খাটছে। আর এ কথাও সত্যি যে মহাদেব ভবেনের চেয়েও বড়োলোক।

দিনরাত কোথা দিয়ে উড়ে যেতে লাগল তা ভালো করে টেরও পেল না কানাই। বছর খানেক বাদে মহাদেব একদিন তাকে ডেকে বলল, তোমার কাজ দেখে খুশি হয়েছি বাবা। এখন থেকে তিন হাজার করেই পাবে। পুজোয় পার্বণী, জামাটা কাপড়টা--এসব নিয়ে ভেব না।

কানাই ওসব নিয়ে ভাবে না। কাজে ডুবে থাকে। কালেভদ্রে গাঁয়ে গিয়ে চুপি চুপি মাকে দেখে আসে। তার বোকাসোকা মা পেটের দায়েই হোক বা অন্য কোনো কারণেই হোক যে ভুলটা করেছিল তার জন্য আজকাল তার দুঃখই হয়। তার মনের মধ্যে এখন আর ভবেনকে নিয়ে বাপ-জ্যাঠার দ্বন্দ্ব নেই। সে ভবেনের কথা আর ভাবে না।

মহাদেবের ঠাণ্ডা লেগে জ্বর হওয়ায় একদিন সকালে তার গদি সামলাচ্ছিল কানাই। মহাদেবের কর্মচারীরা এখন তারই তদারকিতে থাকে। কাজও মেলা।

বেলা দশটা নাগাদ একজন বুড়ো রোগা মানুষ লাঠিতে ভর দিয়ে এসে গদিতে ঢুকল।

কানাই প্রথমে গ্রাহ্য করেনি। লোক তো মেলাই আসে।

লোকটা তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে হাঁ করে চেয়ে রইল তার দিকে।

কাকে খুঁজছেন? মহাদেববাবুর জ্বর, আজ আসেননি।

তোমাকেই খুঁজছি বাবা। আমি ভবেন বিশ্বেস। তোমার বাবা।

কানাই ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, বসুন।

ভবেনকে চেনাই যায় না। বছর খানেকের মধ্যেই বুড়িয়ে খুনখুনে হয়ে গেছে। বসে একটু হাঁফ ছেড়ে বলল, নানা ব্যাধিতে শরীরটা শেষ হয়ে গেছে। তার ওপর মনের কষ্ট। বড়ো ছেলে ঝগড়া করে আলাদা হয়ে গেছে বউ নিয়ে। মেজো জন মায়ের গয়না চুরি করে

বোম্বাই না কোথায় পালিয়ে গেছে। সেজো ব্যবসা করতে গিয়ে পথে বসেছে। ছোটোটাও শুনছি মদটদ খায়। আমার অবস্থা বড়ো খারাপ।

খুব মন দিয়ে শুনল কানাই। তারপর বলল, তা এখন কী করবেন?

বিষয়সম্পত্তি যে যায় বাবা কানাই। চারদিকে ষড়যন্ত্র। চারদিক থেকে নানা ফন্দিফিকির নিয়ে লোক আসছে। শুনি, তুই মহাদেবের কাজকারবার নাকি ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে তুলেছিস। সবাই তোর সুখ্যাতি করে। তা বাবা, আমাকে রক্ষে কর। এসে বিষয় সম্পত্তি সামাল দে। যা চাস দেব। শত হলেও তুই তো আমারই সন্তান।

কানাই একটু হাসল। বলল, একসময়ে আমারও কথাটা ভেবে খুব অহংকার হত। কিন্তু আজ আর হচ্ছে না কর্তাবাবু।

ভুলভ্রান্তি যা হয়েছে, মাপ করে দে। সত্যিই বলছি তোকে, ওরা আর আমার কেউ নয়। ফিরেও তাকায় না। আজ ভাবি, অবৈধ ছেলে হলেও তোর বরং একটু মায়াদয়া ছিল। বড্ড ভুল করে ফেলেছি বাবা।

কিন্তু আজ যে আর আপনাকে আমার বাবা বলে মনে হয় না কর্তাবাবু! একদিন এমন ছিল, আপনাকে বাবা বলে ডাকার জন্য প্রাণ আনচান করত। আজ যে সেই ইচ্ছেটা মরে গেছে।

না হয় না-ই ডাকবি। তবু ফিরে চল। মহাদেব যা দেয় তার চেয়ে আমি দু-চার হাজার বেশিই দেব।

বিষয়ম্পত্তির ভাগ দেবেন?

আইনে তো তা মানবে না, তবে পুষিয়ে দেব।

কানাই খুব হাসল, আপনার আইনের ছেলেরা যেমনই হোক, বাপকে যতই তুচ্ছতাচ্ছিল্য করুক, বিষয় তারাই পাবে। আর এই আমরা যারা আপনাদের মতো লোকের কামকামনার অবৈধ সন্তান, যত ভালোই হই আমাদের কপালে ঢুঢু। দুনিয়াটা ভারি মজার জায়গা মশাই।

দুটো কাঁচা গালাগালও যদি দিস তো দে। বড্ড আতান্তরে পড়ে এসেছি রে বাবা, রক্ষে কর।

আপনি আমার কাছে কেন এসেছেন জানেন?

জানব না কেন? তোর সাহায্য চাইতেই আসা।

সে তো ঠিকই। পয়সা ছড়ালে ম্যানেজার আপনি অনেক পাবেন। কিন্তু কানাই দাসের মতো এমন বশংবদ পাবেন না। আপনি ভালোই জানেন, কানাই আপনার অবৈধ সন্তান, সে আপনাকে বাবা বলে ভাবত, আপনার বিষয়সম্পত্তি রক্ষা করতে দিনরাত বেগার খাটত, নামমাত্র মাইনে পেত, তবু অন্য কোথাও যেতে চাইত না। তাকে তাড়িয়ে ভুল করেছিলেন বটে। সেটা বুঝতে একটু দেরিও করে ফেলেছেন। আজ আবার তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছেন কেন জানেন?

কেন?

আপনার বিশ্বাস কানাই গিয়ে ফের বুক দিয়ে সব আগলাবে। বিষয়সম্পত্তি রক্ষা করবে যতদিন না আপনার বৈধ সন্তানেরা এসে ভার নিচ্ছে। ঠিক বলছি তো কর্তাবাবু?

না, না, ওরকম ভাবিসনি।

কর্তাবাবু, একসময়ে কানাইয়ের আপনার মতো একজন বাবার দরকার ছিল। আজ আর নেই।

ভবেন স্তূপাকার হয়ে বসে রইল।

সংসার

বিয়ে তো জীবনে একবারই হয়! এই বলে বড়ো অভিমান করে থাকে নতুন বউ।

বেশির ভাগ বাঙালি ছেলেই বিয়ের পর প্রথম নারীসঙ্গ পায়। বউ-এর বরটিও তাদের একজন। জীবনে এই প্রথম নারীর নিবিড় সান্নিধ্য এমনিতেই তার মাথার সবটুকু ঘোলাটে করে রেখেছে। এই নিজস্ব মেয়ে মানুষটির কাছে কতভাবে নিজেকে বড়ো করে দেখানো যায় তার নানা ফন্দি ফিকির মাথায় খেলছে সব সময়। কী বললে খুশি হবে মেয়েটি, কি করলে মুগ্ধ হবে একেবারে? একবার ইমপ্রেস করার জন্য বলে ফেলেছিল 'জানো, সামনের বছর আমি একটা স্কুটার কিনবো।' নূতন বউ শিউরে বলেছিল খবরদার না। ভীষণ অ্যাক্সিডেন্ট হয় ওতে।

ছেলেটি ভীষণ খুশি হয় তাতে! আসলে স্কুটার তার কসটিং-এই আসে না, নিকট ভবিষ্যতেও আসবে না। কিন্তু বিয়ের সাত দিনের মাথাতেই মেয়েটি বলে দেয় সবাই হনিমুনে যায়। আমরা যাবো না?

শুনে ছেলেটা মনে মনে গুম হয়ে যায়। বিয়েতে সব সময় বাজেট ছাড়িয়ে খরচ হয়। তারও হয়েছে। তাছাড়া ছুটি পাওনা নেই তেমন। ছেলেটা আবার ঘরকুনোও। জবাব দিলে এ সব ইংরিজিয়ানার কুফল। বিদেশি প্রথা। আমরা এ সব মানব না। বউ খুশি হয় না। অভিমান করে বলে--বিয়ে তো জীবনে একবারই হয়! সবাই যায়। বিদেশি প্রথা আবার কি। তুমি তো বাপু দিব্যি প্যান্ট শার্ট পরে অফিস যাও, সেটা ইংরিজিয়ানা নয় বুঝি?

ছেলেটা সিগারেট ধরায়। খুব সিরিয়াস ভাবে বউ এর মুখ দেখে। তারপর বলে--দেখি।

বউ আশান্বিত হয়ে বলে--খুব দূর নয়। নির্জন জায়গায় যাবো কিন্তু। শুধু তুমি আর আমি।

পুরী?

আমার পাহাড় ভালো লাগে।

দার্জিলিং?

হ্যাঁ--এ্যা। বউ হেসে গাল কাত করে দেয়। বিয়ের পর থেকে মা একটু গম্ভীর। ছেলের সঙ্গে খুব ভালো করে কথা কন না। তাকানোর মধ্যে কেমন যেন একটু উদাস উদাস অভিমান ভাব। খেতে বসেছে ছেলেটির মা ভাত দিয়ে বলল--সীমা বলছিল দাদা বৌদি হানিমুনে যাচ্ছে। তা কোথায় যাওয়া ঠিক করলি?

কোথায় আর যাব? এখনও কিছু ঠিক নেই। ছেলেটি হঠাৎ লজ্জা পেল যেন, সেটা ঢাকতে গোগ্রাসে খায়।

আস্তে খা। মা একটু চুপ করে থেকে বলেন, উনিই নতুন বৌ-এর মাথা খাচ্ছেন। কেবল শুনি বলেন, যাও ঘুরে টুরে এসো। একটু নিরিবিলিতে ঘুরে এলে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা ভালো হয়।

উনি হলেন ছেলেটির বাবা। প্রশ্রয় কিছুটা বেশিই দেন নতুন বৌকে। বলেন, সংসারের চার্জ এবার থেকে তোমার বৌমা, বুঝে সুঝে নাও।

মা তাতে খুশি হন না, আড়ালে বলেন--কেন, আমার কি গতরে শুঁয়োপোকা ধরেছে। সংসারের টানাপোড়েনগুলো ছেলেটা বুঝতে পারত না। এখন কিছু কিছু পারছে।

নতুন বৌ একদিন রাতে বলল, সীমা আজ কি বলেছে জান! বলেছে দাদা বিয়ের আগে একটুও স্টাইল করত না। আজকাল খুব পোশাকের দিকে নজর। আমায় বলেছে, বিয়েতে দাদার অনেক খরচ হয়েছে। হানিমুনটুন করতে গেলে সংসার ভেসে যাবে। কি হিংসুক দেখো।

ছেলেটা উদাস, মন খারাপ গলায় বলে--ওর মনটা ভালো।

ছাই ভালো! তোমার আমার বেশি ভাব পছন্দ করে না। আমি দেখব বিয়ের পর ও নিজে হানিমুনে যায় কি না!

ছেলেটার অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম আসে না। পুজোর আর দেরি নেই। দার্জিলিং এ মরশুম পড়ে গেল। রিজার্ভেশানের মারকাট হচ্ছে। কতলোক যে দার্জিলিং-এ যাবে!

অনেক ধস্তাধস্তির পর দার্জিলিং-এর দুটো রিজার্ভেশান পায়। বারোদিনের ছুটি নেয়। বাবার হাতে সেই মাসে বরাদ্দের পঞ্চাশ টাকা কম দেয়। মার মুখ গম্ভীর। বোন মুখরা, বলেই দেয়--মধুচন্দ্রিমা টন্দ্রিমা বড়োলোকেরা করে। ছেলেটার মন খারাপ হয়। কিন্তু বউ খুশি, বাড়ির সবাই হিংসে করুক তাকে। হিংসে করে জ্বলুক।

পথের কষ্ট যা হবার হল। অনর্থক পয়সা বেরিয়ে যাচ্ছে। কুলি, খাবার, চা। দার্জিলিং-এ যত সস্তায় থাকবে ভেবেছিল, হল না। কুড়ি টাকা রোজের হোটেল ভর্তি। বহু কষ্টে একটা বাড়িতে 'বত্রিশ' টাকার পেয়িং গেস্ট হয়ে থাকতে হল। কুড়ি টাকা পারহেড রোজের বাজেট ছিল। তার উপর বারো টাকা বাড়তি! সুতরাং বউকে চুপি চুপি বলল--চারদিনের বেশি থাকা যাবে না। কারণ টাকা নেই। বড়ো মেঘলা দার্জিলিং। বৃষ্টি পড়ছে প্রায়ই। চাঁদ-টাদ দেখা যায় না, পাহাড় মুখ লুকিয়ে আছে। ছেলেটা কম্বল চাপা দিয়ে ঠ্যাং নাচাতে নাচাতে বলে টাকাটাই লস।

বউ ঝামটা মেরে বলে, লস আবার কী? আসা তো হল। লোকে বলতে পারবে না ওরা হানিমুনে যায়নি।

পুজোর দিন ক'টা কলকাতায় কাটাতে হল না, ছেলেটার এইটুকুই লাভ।

বউ পাথরের মালা কিনতে চায়, বরের জন্য সস্তায় সোয়েটার, ননদের জন্য আর কিছু। ছেলেটা সব রকম কেনাকাটায় বাধা দিতে থাকে। কেবল বলে, উহুঁ। বাজেটে আসবে না।

দুদিন পর রোদ উঠল। খুব বেড়োলো দুজনে সেদিন। পরদিন জিপ ভাড়া করে টাইগার হিল, ঘুম, মনস্ট্রি, সিঞ্চল লেক দেখল। এক স্বর্গীয় আনন্দের জলে যেন মুখ ধুয়েছে বউ। এমন উজ্জ্বল দেখালো তার মুখ। ছেলেটা নিসর্গ থেকে কোনো আনন্দ পায় না--কেবল টাকার চিন্তা। তবুও বউ-এর মুখ দেখে তারও কেমন একটু খুশির ভাব এল। আহা, ও তো খুশি হয়েছে।

ফেরার সময় শিয়ালদা স্টেশনেই টাকা শেষ। ট্যাক্সি করে বাড়ি এসে ভাড়া মেটাল।

বাড়িঘর কেমন জীর্ণ লাগছে ছেলেটার। মা বাবাকে কি আর একটু বুড়ো দেখাচ্ছে। সীমারও কন্ঠার হাড় বেরিয়েছে বুঝি! কিন্তু একটা বড়ো পরিবর্তন দেখল ছেলেটি। সে ফিরে আসায় সবাই খুশিতে ছুটে এসে ধরল তাদের।

অ বউমা, কেমন দেখলে? ভালো ছিলে তো সব? কি রকম বাজারদর ওখানে। বাঃ বৌদি, এই মালাটা আমার জন্য এনেছো? ভীষণ সুন্দর তো!

বৌ নিজের নাম করে অনেক জিনিস কিনেছিল, কিন্তু ছেলেটি অবাক হয়ে দেখল--সে সব জিনিস অকৃপণভাবে সবাইকে বিলিয়ে দিচ্ছে বউ! সে রাতে যখন চাঁদ উঠল ছাদে শুয়ে ছেলেটি ভাবল বাঃ মিষ্টি চাঁদটি বেশতো।

বানভাসি

পরশুদিন দুপুরে ভাত জুটেছিল। আর আজ এই রাতে। হিসেবে দু'দিন দাঁড়ায়। তবে খিদেটিদে উবে গিয়েছিল জলের তোড়ে তল্লাট ভেসে যেতে দেখে। পরশু থেকে আজ অবধি কাশীনাথ তার নৌকোয় কতবার যে কত জায়গায় খেপ মেরে লোক তুলে এনেছে তার লেখাজোখা নেই। রায়চক উঁচু ডাঙা জমি, এইরকম দু-একটা জায়গা ডোবেনি। এখন সেইসব জায়গায় রাসমেলার ভিড়। খোলা মাঠেই বৃষ্টির মধ্যে বসে আছে মানুষ। কেউ কেউ মাথার ওপর কাপড়-টাপড় টাঙিয়ে মাথা বাঁচানোর একটা মিথ্যে চেষ্টা করছে। কেউ বাচ্চাটাচ্চার মাথায় ছাতা ধরে আছে সারাক্ষণ। তাতে লাভ হচ্ছে না। ভিজছে, সব ভিজে সেঁধিয়ে কুঁকড়ে যাচ্ছে। এরপর মরবে।

রিলিফ এলে অন্য কথা। কিন্তু তাই বা আসবে কোন পথে। রেল বন্ধ, সড়ক বন্ধ, চারদিকে অথই জল।

কুলতলি থেকে একটা পরিবারকে তুলে এনে রায়চকে নামিয়ে ভাঙড়ে যাচ্ছিল আরও কিছু লোককে তুলে আনতে। শরীর নেতিয়ে পড়ছে, হাত চলতে চাইছে না, কেমন যেন আবছা দেখছে সে। মাথার মধ্যে ঝিমঝিম। কাশীনাথ বুঝতে পারছিল আর বেশিক্ষণ নয়। দুদিন পেটে দানাপানি নেই। জুটবেই বা কোথা থেকে। কাল দুপুরে এক বুড়ি তাকে দু গাল চালভাজা খাইয়েছিল। আর রায়চকের বাজারে টিউবওয়েল থেকে পেট পুরে জল। সেই কয়লাটুকুতেই শরীরে ইঞ্জিন চলছিল এতক্ষণ। আর নয়। কিন্তু নেতিয়ে পড়লেও চলবে না। বড়ো ড্যামের জল ছেড়েছে, তার স্রোতে নৌকো না সামলালে উল্টে যাবে। নয়তো কোন আঘাটায় গিয়ে পাথরে বা গাছে ধাক্কা মেরে নৌকো টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। এই নৌকো এখন মানুষের জীবনতরী। ডুবলে চলে?

ঘুমও আসছিল তার। আর বারবার ঢুলে পড়ছিল। বইঠা বা লগির ওপর হাত থেমে থাকছে বারবার। ফের চমকে জেগে উঠছে। নয়াবাঁধের কাছে নৌকোটা একটু ভিড়িয়ে কয়েক মিনিটের জন্য চোখ বুজে ঘুমের আলিস্যিটা ছাড়াতে গিয়েছিল সে। যখন চোখ মেলল তখন রাত হয়ে গেছে। গোলাগুলির মতো বৃষ্টির ফোঁটা ছুটে আসছে আকাশ থেকে। ঝলসাচ্ছে মারুনে বিদ্যুৎ।

জামাটা খুলে নিংড়ে নিল কাশীনাথ। ভাঙড়ে দুর্যোগে যাওয়ার চেষ্টা করা বৃথা। নৌকো ডুববে। সে কোমরজলে নেমে নৌকোর বাঁধনটা অন্ধকারেই একটু দেখে নিল। বটগাছের শেকড় শক্ত জিনিস। পাটের মোটা কাছিও মজবুত। নৌকো আর যাবে না। তবে নৌকোর খোলে জল উঠেছে অনেক। ফের নৌকো ভাসাতে হলে জল ছেঁচতে হবে। আপাতত জলেই ডুবে থাক। ভাসন্ত বানে নৌকোর ওপর মানুষের খুব লোভ। জলে ডুবে থাকলে--আর যাই হোক চুরি যাবে না।

বৃষ্টিকে ভয় খেয়ে লাভ নেই। জলে তার সর্বাঙ্গ ভিজে সাদা হয়ে আছে। সে নেমে পাড়ে উঠল। নয়াবাঁধ চেনা জায়গা। দু পা এগোলেই হাটের অন্ধকার কয়েকটা চালাঘর। সেখানে এণ্ডিগেণ্ডি নেয়ে বানভাসি মানুষের ভিড়। তারপর বসতি, চেনাজানা কেউ নেই এখানে। তার দরকারও নেই। সে বটতলা থেকে আর এগোল না। একটা মোটা শিকড়ের ওপর বসে পড়ল। ঘুম নয়, একটু ঝিমুনি কাটানো দরকার।

ঘুমিয়ে পড়েওছিল। হঠাৎ মুখের ওপর জোরালো টর্চের আলো এসে পড়ল, কে রে? কে ওখানে?

চমকে সোজা হল কাশীনাথ। সামনে ছাতা মাথায় কয়েকজন লোক। অন্ধকারে ভালো ঠাহর হল না, তবু আন্দাজে বুঝল, এলেবেলে লোক নয়।

কাশীনাথ কী বলবে ভেবে পেল না। সে কাশীনাথ, কিন্তু এর বেশি তো আর কিছু নয়!

তা সেটা তো আর দেওয়ার মতো কোনো পরিচয়ও নয় তার।

কাশীনাথ ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল, এই একটু জিরিয়ে নিচ্ছিলাম আজ্ঞে। চোর ছ্যাঁচড় নই, নৌকো বাই।

মাছ ধরো?

আগে ধরতুম। এখন হাটেবাজারে মাছ নিয়ে যাই।

কে একজন চাপা গলায় বলল, ওলাইচণ্ডীর কাশীনাথ।

সামনের লোকটা বলল, ও এই কাশীনাথ।

কাশীনাথ খুব অবাক হল। এরা তাকে চেনে। কী করে চেনে? তাকে চেনার কথাই তো নয়।

তোমার নৌকো কোথায়?

বটগাছে বেঁধে রেখেছি। শরীরে আর দিচ্ছিল না বলে একটু ডাঙায় বসে জিরিয়ে নিচ্ছিলাম বাবু। দোষ হয়ে থাকলে মাপ করে দেবেন। না হয় চলেই যাচ্ছি।

আরে না না, দোষের হবে কেন? তবে এটা কি আর জিরোনোর জায়গা? তুমি তো মেলা লোকের প্রাণ রক্ষে করেছ হে বাপু।

করেছে নাকি কাশীনাথ? প্রাণরক্ষে করা কি সোজা কথা? প্রাণ বাঁচানোর মালিক ভগবান। সে কিছু লোককে বানভাসি এলাকা থেকে তুলে এনে ডাঙা জমিতে পৌঁছে দিয়েছে মাত্র। তারা যে কীভাবে এরপর বেঁচে থাকবে তা সে জানে না।

কাশীনাথ টর্চের আলোর দিকে চেয়ে বলল, ভাঙড়ের দিকে যাচ্ছিলাম বাবু, তা শরীরে বড্ড মাতলা ভাব। তাই--

বুঝেছি। বলি দানাপানি কিছু পেটে পড়েছে?

ওসব তো ভুলেই গেছি। কারই বা দানাপানি জুটছে বলুন। সব দাঁতে কুটো চেপে শুধু ডাঙা খুঁজছে।

লোকটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তাই বটে হে। লোকের দুর্দশা দেখলে আঁত শুকিয়ে যায়। নয়াবাঁধে তবু আমরা কিছু চিঁড়ে-গুড় আর খিচুড়ির ব্যবস্থা করেছি। দিন দুই হয়তো পারা যাবে। রিলিফ না এলে তারপর কী যে হবে কে জানে।

কাশীনাথের পায়ে অন্তত গোটা সাতেক জোঁক লেগেছে। সে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে সেগুলোকে উপড়ে ফেলতে ফেলতে বলল, সে আর ভেবে কী হবে! কিছু তো মরবেই।

তা বাপু বলি কি, তোমার পরিবার-পরিজন সব কোথায়?

কেউ নেই বাপু। আমি একাবোকা মানুষ।

ঘরদোর?

ওলাইচণ্ডীতে আছে একখানা কুঁড়ে। তা সেটাও বন্যার তোড়ে ফি বছর ভেসে যায়। এবারেও গেছে। এখন নৌকোই ঘরবাড়ি বাবু।

লোকটা একটু হাসল। বলল, আমাকে চেনো? আমি হলাম নয়াবাঁধের সাধুচরণ মণ্ডল।

কাশীনাথ তটস্থ হয়ে বলল, বাপ রে! আপনি তো মস্ত মানুষ বাবু।

হেঁ হেঁ। নামটা শোনা আছে তা হলে।

খুব খুব। তল্লাটের কে না চেনে বলুন।

আমি একটু মুশকিলে পড়েছি যে কাশীনাথ। তোমাকে যে পেলুম তা যেন ভগবানের আশীর্বাদে। বলছিলুম কি, মংলাবাজার চেনো?

খুব চিনি। নিত্যি যাতায়াত।

সেইখানে কয়েকজনকে পৌঁছে দিতে হবে। নয়াবাঁধে এসে আটকে পড়েছে। এই সাংঘাতিক স্রোতে নৌকো ছাড়তে রাজি হচ্ছে না মাল্লারা।

তা স্রোত আছে বটে!

তোমার মতো একজন ডাকাবুকো লোকই খুঁজছিলাম আমি। যদি পৌঁছে দিতে পারো তবে ভালো বকশিস পাবে।

বকশিসের কথায় কাশীনাথ হেসে ফেলল। হাতজোড় করে বলল, এ তো ভগবানের কাজ বাবু। বকশিস কিসের? ও সব লাগবে না।

বলো কী? পয়সা হল লক্ষ্মী। তাকে ফেরাতে আছে?

অতশত জানি না বাবু। তবে এ সময়টায় পয়সার ধান্দা করতে মনে সরছে না। মানুষের যা দুর্দশা দেখছি। আমি পৌঁছে দেবখন।

তা হলে এসো, আমার বাড়িতে চাট্টি ডালভাত খেয়ে নাও। শরীরের যা অবস্থা দেখছি, না খেলে পেরে উঠবে না।

ঠিক আছে, চলুন।

সাধুচরণের বাড়িখানা বিশাল। প্রকাণ্ড উঠোনের তিনদিক ঘিরে দোতলা বাড়ি। পাঁচ-সাতখানা হ্যাজাক জ্বলছে। উঠোনে ত্রিপলের নীচে বড়ো বড়ো কাঠের উনুনে মস্ত লোহার কড়াইতে খিচুড়ি রান্না হচ্ছে। তারদিকে মেলা লোকলস্কর, মেলাই চেঁচামেচি। বৃষ্টির মধ্যেই বাঁশে ঝুলিয়ে খিচুড়ির বালতি নিয়ে লোক যাচ্ছে পিছনের উঠোনে বানভাসিদের খাওয়াতে।

সাধুচরণ তাকে নিয়ে ঘরে বসাল। বলল, গা মুছে নাও। বড্ড ধকল গেছে তোমার হে। শুকনো কাপড় পরবে একখানা?

কাশীনাথ হাসল, তাতে লাভ কী? আমাকে তো ঝড়ে-জলে বেরোতেই হবে।

তাই তো।

দশ-পনেরো মিনিটের মধ্যেই শালপাতা আর গরমভাতের হাঁড়ি চলে এল। সাধুচরণ বলল, তোমাকে ওই লঙ্গরের খিচুড়ি খাওয়াচ্ছি না বাপু।

কাশীনাথ তার খাতির দেখে একটু অবাকই হচ্ছে।

পেটে রাক্ষুসে খিদে ছিল, কিন্তু ভাতের গ্রাস মুখ পর্যন্ত পৌঁছতেই কেমন গা গুলিয়ে উঠল তার। মনে হল, এই খাওয়ানোটার ভিতরে একটা অহংকার আছে।

খাও খাও, পেট পুরে খাও হে।

ডাল ভাত ঘ্যাঁট এবং পুঁটি মাছের ঝোল--আয়োজন খারাপ নয়। কিন্তু কাশীনাথ পেট পুরে খেতে পারল কই? কত মানুষের উপোসি মুখ মনে পড়ল। কত বাচ্চার খিদের

চেঁচানি। ঘটির জলটা খেয়ে সে উঠে পড়ল। পাতে অর্ধভুক্ত ভাত-মাছ পড়ে রইল। পাতাটা মুড়ে নিয়ে সে বেরিয়ে এসে আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিয়ে ঘটির জলে আঁচিয়ে নিল।

সাধুচরণ কোথায় গিয়েছিল। ফিরে এসে বলল, এই অন্ধকারে তো আর মংলাবাজার যেতে পারবে না। বারান্দার কোণে চট পেতে দিতে বলেছি। শুয়ে ঘুমোও। কাল সক্কালবেলা বেরিয়ে পড়ো।

এর চেয়ে ভালো প্রস্তাব আর হয় না। সে বলল, যে আজ্ঞে।

তারপর চটের বিছানায় হাতে মাথা রেখে মড়ার মতো ঘুম।

কাকভোরে ঘুম ভাঙল। বাড়ি নিঃঝুম। এখনও আলো ফোটেনি। সে বসে আড়মোড়া ভাঙল। গা-গতরে ব্যথা হয়ে আছে। তবে কালকের চেয়ে অনেক তাজা লাগছে। অনেক জ্যান্ত। সে উঠে পড়তে যাচ্ছিল, একটা মেয়ে এসে দাঁড়াল। কিশোরী মেয়ে, পরনে একখানা হাঁটুঝুল ফ্রক। আবছা আলোয় যতদূর দেখা গেল, মেয়েটি রোগাটে।

তুমিই আমাকে মংলাবাজারে নিয়ে যাবে?

তা তো জানি না। সাধুচরণবাবু বললেন, কাদের যেন পৌঁছে দিতে হবে।

আমাকে আর পিসিকে।

তা হবে।

পিসি পৌঁছাবে। কিন্তু আমি জলে ঝাঁপ দেবো। আমাকে বাঁচাতে পারবে না।

কাশীনাথ হাঁ করে মেয়েটার মুখের দিকের চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, জলে ঝাঁপ দেবে! কেন?

মরব বলে।

মরারই বা এত তাড়াহুড়ো কীসের?

সব কথা বলার সময় নেই। তবে এটুকু জেনো, আমি জ্যান্ত অবস্থায় মংলাবাজারে যাব না। সারারাত জেগে বসে ওই জানালা দিয়ে তোমাকে লক্ষ করেছি, কখন ঘুম ভাঙে।

তুমি কি সাধুচরণবাবুর কেউ হও?

আমি ওঁর ছোট মেয়ে বিলাসী।

বটে! তাহলে তোমার দুঃখু কীসের? মরতে চাইছ কেন?

সে অনেক কথা। কাল রাতে নয়নের সঙ্গে আমার পালিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বন্যা হয়ে সব ভেস্তে গেল। বাবা টের পেয়ে আমাকে মংলাবাজারে মামাবাড়িতে পাচার করতে চাইছে। বিয়েও ঠিক করে ফেলেছে।

এ তো সাংঘাতিক ঘটনা।

তাই বলে রাখছি তোমাকে, আমি কিন্তু মরব। তুমি কিন্তু দায়ী হবে।

আমাকে কী করতে বলছ?

বললে শুনবে?

বলেই দেখো না।

গোবিন্দপুর চেনো?

কেন চিনব না?

আমাকে সেখানে পৌঁছে দাও।

সেখানে কী আছে?

ওটাই নয়নের গাঁ। কাছেই। বন্যা না হলে আধঘন্টা হাঁটলেই পৌঁছানো যেত।

কাশীনাথ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, গোবিন্দপুরের অবস্থা কী তা জানি না। যদি ডুবে গিয়ে থাকে তা হলে তোমার নয়ন কি আর সেখানে বসে আছে?

তবু আমাকে যেতে হবে। এ বাড়ি থেকে না পালালে আমি বাঁচব না।

তারপর আমার কী হবে জানো? সাধুচরণবাবু আমাকে আস্ত রাখবেন কি? সমস্ত লোক চারিদিকে নামডাক। লোকলস্কর থানা-পুলিশ সব তাঁর হাতে।

আমার হাতে এই সোনার বালাটা দেখছ। তিন ভরি। আমার দিদিমা দিয়েছিল।

এটা তোমাকে দিচ্ছি।

পাগল! ওসব আমার দরকার নেই।

মা শীতলার দিব্যি আমায় যদি না নিয়ে যাও।

উঃ, কী মুশকিল! শুনেছি তুমি নাকি খুব সাহসী লোক। অনেকের প্রাণ বাঁচিয়েছ। আমাকে বাঁচাতে পারবে না? এমন কী শক্ত কাজ?

তুমি নয়নের কথা ভেবে দুনিয়া ভুলে বসে আছ। আমার তো তা নয়। আমাকে যে আগুপিছু ভাবতে হয় গো!

হঠাৎ মেয়েটা ফোঁস ফোঁস করে কাঁদতে শুরু করল।

কী মুশকিল।

পায়ে পড়ি, আমাকে নিয়ে চলো। আমার যে বুকটা জ্বলে যাচ্ছে।

দেখ বিলাসী, যদি ধর তোমাকে গোবিন্দপুর নিয়েই যাই, তা না হয় গেলুম। কিন্তু যদি নয়নকে খুঁজে পাওয়া না যায় তখন তোমাকে ঘাড়ে করে আমি কোথায় কোথায় ঘুরব?

ঘুরতে হবে না। যে কোনো ঘাটে নামিয়ে দিও। আমি ভিক্ষে করে হোক, দাসীগিরি করে হোক, চালিয়ে নেব। বন্যার জল নামলে ঠিক নয়ন এসে আমাকে নিয়ে যাবে।

আর ইদিকে আমার হাতে হাতকড়া?

তোমার কিচ্ছু হবে না, দেখো। মা শীতলা তোমার ভালো করবেন।

ভগবান তখনই ভালো করেন যখন আমরা ভালো করি। বুঝলে!

তোমার পায়ে পড়ি।

বড্ড মুশকিলে ফেললে।

নইলে যে আমি মরব।

কাশীনাথ মৃদু স্বরে বলে, সে তোমার কপালে লেখাই আছে।

চলো না। লোকজন উঠে পড়লে যে আর হবে না।

ঠিক আছে। চলো। রাবণে মারলেও মারবে, রামে মারলেও মারবে।

ভোর-ভোর নৌকো ছাড়ল কাশীনাথ।

মেয়েটা উলটো দিকে বসা। তাকে বইঠা ধরিয়ে লগি দিয়ে অগভীর জলে নৌকো ঠেলে নিচ্ছে। একটু তাড়াহুড়োই করতে হচ্ছে। লোকজন টের পেলে তাড়া করবে। কাশীনাথের ঘাম হচ্ছে খুব।

ডাঙাপথে গোবিন্দপুর যতটা দূর, জলপথে তত নয়। সাঁ করেই চলে এল তারা। সুপুরি, নারকেল গাছ, কয়েকটা দালানের ওপর দিকটা ছাড়া গোবিন্দপুর গাঁ নিশ্চিহ্ন।

দেখলে তো, কী বলেছিলাম।

মেয়েটা তার পুঁটুলি কোলে নিয়ে হাঁ করে দৃশ্যটা দেখছে। দু চোখে জলের ধারা।

এবার কী করবে বল!

মেয়েটা তার দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকাল।

কিশোরী মুখখানি এখন ভোরের আলোয় পদ্মফুলের মতো সুন্দর দেখাল। কান্নায় ভরাট গলায় বলল, কোথাও নামিয়ে দাও আমায়, যেখানে খুশি।

কাশীনাথ একটু ভেবে বলল, শোনো মেয়ে, নামিয়ে দিলে তোমার বিপদ হবে। তার চেয়ে চলো, আমি ভাঙড়ে যাচ্ছি কিছু লোককে তুলে আনতে। তাদের পৌঁছতে পৌঁছতে বেলা মরে যাবে। তারপর তোমাকে সাঁঝের পর বরং নয়াবাঁধেই নামিয়ে দেব। বাড়ি চলে যেও।

বাবা আমাকে মেরেই ফেলবে।

দু-চার ঘা মারবে হয়তো। কিন্তু আবার ভালোও বাসবে। বাড়ি হল আশ্রয়। আমাকে দেখ না, আমি এক লক্ষ্মীছাড়া। ভাববার কেউ নেই।

মেয়েটা গুম হয়ে বসে রইল।

নয়ন ভাঙড়ে গেল। বানভাসি লোক তুলল। তাদের পৌঁছে দিল ডাঙা-জমিতে। রায়চকে আজ রিলিফের খিচুড়ি দিচ্ছিল। বিলাসীকে নিয়ে নেমে পড়ল কাশীনাথ। বলল, চাট্টি খেয়ে

নাও। আর জুটবে কি না কে জানে!

মেয়েটা আপত্তি করল না। খিচুড়িও খেল পেট ভরে। তারপর বলল, জানো, আমি এভাবে লঙ্গরখানায় বসে খাইনি কখনো। আমার বেশ লাগছে। মানুষের কী কষ্ট, তাই না? খুব কষ্ট?

কাছেপিঠে থেকে আরও দুটো খেপ মেরে কিছু লোক এনে ফেলতে হল কাশীনাথকে। সঙ্গে সারাক্ষণ বিলাসী। কেমন লাগছে?

খুব ভালো লাগছে, কষ্টও হচ্ছে। একটা কথা বলব?

কী?

আমি নয়নের দেখা পেয়েছি।

অ্যাঁ! কোথায় দেখা পেলে? বলোনি তো!

রায়চকে। আমাকে দেখে তাড়াতাড়ি ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল।

বললে না কেন? ধরে আনতাম।

মাথা নেড়ে বিলাসী বলে, তাকে আমার আর দরকার নেই যে!

সে কী। তার জন্যই না বিপদ ঘাড়ে করে বেরিয়ে এলে!

সে এসেছিলুম। এখন এত মানুষ আর তাদের কষ্ট দেখে মনটা অন্যরকম হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে নয়নও আমাকে চায় না।

বাঁচালে। তা হলে চলো নয়াবাঁধে তোমাকে রেখে আসি।

বিলাসী ঘাড় হেলিয়ে বলল, হ্যাঁ।

নৌকো বাইতে বাইতে কাশীনাথ বলল, বাবার মারের আর ভয় পাচ্ছ না?

বিলাসী আনমনে দূরের দিকে চেয়ে থেকে বলল, বাবা আর কতটুকু মারবে?

ভগবান যে তার চেয়েও কত বেশি মেরেছে এত মানুষকে!

কাশীনাথ একটু হাসল।

হ্যাঁ

অধ্যাপক ঢোলাকিয়া অবশেষে এক জানুয়ারির শীতার্ত রাতে তার টেবিল ছেড়ে উঠল। টেবিলের ওপর অজস্র কাগজপত্র ছড়ানো, তাতে বিস্তর আঁকিবুকি এবং অসংখ্য অঙ্ক। এক অঙ্ক ও আঁকিবুকির সমুদ্র থেকে একটি মাত্র কাগজ তুলে নিল ঢোলাকিয়া, ভাঁজ করে কোটের বুক-পকেটে রাখল। গত সাতদিন ঢোলাকিয়া জীবন-রক্ষার্থে সামান্য আহার্য গ্রহণ করা ছাড়া ভালো করে খায়নি, ভালো করে ঘুমোয়নি, বিশ্রাম নেয়নি। এখন সে একটু অবসন্ন বোধ করছিল, কিন্তু মনটা খুশিতে ভরা। মনে হচ্ছে সে কৌশলটা আবিষ্কার করতে পেরেছে।

ঢোলাকিয়াকে লোকে বলে অযান্ত্রিক মানুষ। এই কম্পিউটার এবং ক্যালকুলেটরের যুগে ঢোলাকিয়া পড়ে আছে দেড়শো বছর পিছনে। সে এখনও কাগজে কলম দিয়ে আঁক কষে, রেখাচিত্র আঁকে। পৃথিবীর যত শক্ত অঙ্ক আর রেখাচিত্র, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হিসাব-নিকাশ যখন যন্ত্রই করে দিচ্ছে তখন মানুষ কেন অযথা পরিশ্রম করবে? ঢোলাকিয়ার বক্তব্য হল, অঙ্ক আমার কাছে আর্ট, লাইন ড্রয়িং-এ আমি সৃষ্টিশীলতার আনন্দ পাই। যন্ত্র তো মানুষের মস্তিষ্কেরই নকল। যন্ত্র আর্ট বোঝে না, সৃষ্টিশীলতাও তার নেই। প্রোগ্রাম করা যান্ত্রিকতা আমার পথ নয়।

ঢোলাকিয়ার মতো আরও কিছু মানুষও আজকাল কম্পিউটারের চেয়ে কাগজ কলম বেশি পছন্দ করে। সংখ্যায় মুষ্টিমেয় হলেও এ ধরনের কিছু মানুষের ইদানীং যে উদ্ভব হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। ঢোলাকিয়া তার বাড়িটাকে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে সাজায়নি। আজকাল বোতাম টিপলেই ঘরের আকার ও আকৃতি বদলে নেওয়া যায়। কম্পিউটারে নানা রকম নকশা দেওয়াই থাকে। সে সব নকশার নম্বর ধরে বিভিন্ন বোতামের সাহায্যে ওপর

থেকে বা আড়াআড়ি নানা ধরনের হালকা ভাঁজ করা দেয়াল এসে ঘরকে বদলে দিতে পারে। আছে বাতাসি পর্দা, যা দিয়ে বাইরের পোকামাকড় বা বৃষ্টির ছাঁট বা ঝোড়ো হাওয়া রুখে দেওয়া যায়-- জানালা বা দরজায় কপাটের দরকার হয় না। বাতাসি পর্দাকে অস্বচ্ছ করে দেওয়ারও ব্যবস্থা আছে। জানালা দরজার প্যানেলে সরু সরু ছিদ্র দিয়ে প্রবল বায়ুর প্রবাহই হচ্ছে বাতাসি পর্দা। ঢোলাকিয়া তার বাড়িটাকে শীততাপ নিয়ন্ত্রিতও করেনি। ঠাকুরর্দার আমলের পুরনো ঘরানার বাড়িতে সে যেন বিংশ শতাব্দীকে ধরে রেখেছে।

ঢোলাকিয়া আজ কিছু চঞ্চল, উন্মন। সে তার স্টাডি থেকে বেরিয়ে বাড়ির বিভিন্ন ঘরে উদভ্রান্তের মতো কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়াল। নিজেকে শান্ত করা দরকার। বেশি আনন্দ বা বেশি দুঃখ কোনোটাই ভালো নয়।

ঢোলাকিয়ার বাড়িতে জনমনিষ্যি নেই। এমনকী কুকুর বেড়ালটা অবধি নয়। ঢোলাকিয়া বিয়ে করেনি, মা-বাবা থাকে গাঁয়ের বাড়িতে। ঢোলাকিয়াকে সবাই অসামাজিক মানুষ বলেই মনে করে। আসলে সামাজিক হতে গেলে কাজকর্ম, ভাবনা-চিন্তা এবং গবেষণার সময় অত্যন্ত কম পাওয়া যায়। সে একাই বেশ থাকে। অবশ্য সে জানে, একা বেশি দিন থাকা চলবে না। এই সোনালি দিনের আয়ু বেশি নয়। কারণ রাষ্ট্রব্যবস্থার নিয়ম অনুযায়ী বিয়ে করাটা বাধ্যতামূলক। এবং সন্তান উৎপাদনও। দু হাজার তিরিশ সাল থেকে পরবর্তী দশ বছরের মধ্যে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বস, দুরারোগ্য ক্যানসার আর এইডস, মারাত্মক ভূমিকম্প, বিশ্বযুদ্ধ ও ঘূর্ণিবাত্যায় পৃথিবীতে বিপুল লোকক্ষয়ের পরিণামে এখন জনসংখ্যা বিপজ্জনকভাবে কম। সারা ভারতবর্ষে জনসংখ্যা এখন এক কোটি তিপ্পান্ন লক্ষ মাত্র। এবং ভারতের জনসংখ্যাই পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম। চীনে আড়াই কোটি মানুষ বেঁচে-বর্তে আছে। গোটা ইউরোপে আছে দু কোটির সামান্য বেশি। আমেরিকায় মোট পঞ্চান্ন লক্ষ। আফ্রিকায় তিন কোটি দশ লক্ষ। বিপদের কথা হল, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি বাড়ছে না। বরং কমছে। ফলে কাউকেই অবিবাহিত থাকতে দেওয়া হয় না। সন্তান উৎপাদনও করতেই হবে। কিন্তু অরুণ ঢোলাকিয়ার দুশ্চিন্তাই হল বিবাহিতজীবন। একটা মেয়ের সঙ্গে বাস করতে হবে, তার ওপর ছেলেপুলের চ্যাঁ ভ্যাঁ-- এসব কি সহ্য হবে তার?

একটা কুশনের ওপর বসে কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ হল সে। মনকে শান্ত ও সজীব রাখার এটাই প্রকৃষ্ট উপায়।

স্যাটেলাইট টেলিফোনটা সংকেত দিল। পকেট থেকে ফোনটা বের করে অরুণ ঢোলাকিয়া বলল, বলুন।

ক্রীড়া দফতর থেকে অবিনশ্বর সেন বলছি। আপনার কাজ কি শেষ হয়েছে?

হ্যাঁ, আমি প্রস্তুত।

ভালো কথা। কিন্তু এখনও আপনার বিপক্ষ গোষ্ঠী ব্যাপারটা মানতে চাইছে না।

তারা কি বারবার একটা আপত্তিই জানাচ্ছেন? না কি নতুন কোনো পয়েন্ট বের করেছেন?

না, নতুন পয়েন্ট নয়। তারা সেই পুরোনো কথাই আরও জোর দিয়ে বলছেন, কোনো অ-খেলোয়াড়কে দলভুক্ত করা যায় না।

আমি তো বলেইছি, আমি খেলোয়াড় নই বটে, কিন্তু আমি একজন বিশেষজ্ঞ। আমার পারফরম্যান্স হবে সম্পূর্ণ ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশনের ওপর।

ওদের ওখানেই আপত্তি। চূড়ান্ত দলে আপনাকে জায়গা দিতে হলে একজন দক্ষ খেলোয়াড়কে বাদ দিতে হয়। যেক্ষেত্রে আমরা চাপে থাকব।

সেনবাবু, আপনাদের মানসিকতা পিছিয়ে আছে। এমন একদিন আসতে বাধ্য যখন খেলোয়াড় এবং বিশেষজ্ঞ এ দুটোই দরকার হবে। একথা ঠিক যে আমি ক্রিকেট খুব বেশি বুঝি না, ব্যাট করাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু তবু আমি যা করতে পারি তা আপনাদের টিমে কেউ পারবে না।

সেটাও পরীক্ষাসাপেক্ষ। আপনি কবে ডেমনস্ট্রেশন দিতে পারবেন?

আপনারা অর্থাৎ নির্বাচকমণ্ডলীর সবাই যদি উপস্থিত থাকেন তবে আগামীকালই আমি ডেমনস্ট্রেশন দিতে পারি। কিন্তু দোহাই, একবারের বেশি দুবার পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়।

কেন?

আমার কলাকৌশল বেশি লোকের কাছে এক্সপোজ করা ঠিক হবে না। আমি কৌশলটা একেবারে বিশ্বকাপের আসরেই প্রয়োগ করতে চাই।

খুব মুশকিলে ফেললেন।

আর একটা কথা।

কী?

আমার অ্যাকশনের কোনো ভিডিও তোলা চলবে না। কোনো ক্যামেরা বা রেকর্ডারও নয়।

আপনি বড্ড বেশি দাবি করছেন।

করছি, কারণ আমি একাই ভারতকে বিশ্বকাপ জিতিয়ে দেব বলে মনে করছি।

নির্বাচকরা এটাই মানতে চাইছেন না। যাই হোক, আপনি কাল সকাল দশটায় ক্রীড়াকেন্দ্রে চলে আসুন।

ফোনটা পকেটে রেখে অরুণ ঢোলাকিয়া উঠে পড়ল। বাড়ি থেকে বেরিয়ে সে নির্জন রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগল। কলকাতা শহরে আজকাল মাত্র বত্রিশ হাজার লোক বাস করে। এক সময়ে এখানে এক কোটি মানুষ বাস করত। তখনও শহরটা ছিল ঘিঞ্জি, নোংরা, ভিড়াক্কার, এখন শহর গাছপালায় ভর্তি। চওড়া রাস্তার দুধারে বড়ো বড়ো গাছের সারি, প্রচুর বাগান, পার্ক, জলাশয়। এসবেরই ফাঁকে ফাঁকে অনেক দূরে দূরে একখানা করে বাড়ি।

এবার প্রচণ্ড শীত পড়েছে। গতকালও দু ডিগ্রি সেলসিয়াস ছিল। অরুণ ঢোলাকিয়ার গায়ে পশমের জামা আছে, তা সত্ত্বেও তার শীত করছিল। একটু হাঁটাচলা না করলে মাথার জটটা খুলবে না।

মাইলখানেক হাঁটল অরুণ, একজন মানুষের সঙ্গেও দেখা হল না। শুধু দুটো ওভারক্র্যাফট নিঃশব্দে রাস্তা দিয়ে গেল।

আঞ্চলিক বাজার নামে কথিত একটা করে বহুমুখী কেন্দ্র শহরের বিভিন্ন জায়গায় তৈরি হয়েছে। এগুলো আসলে বাজার, ক্লাব, রেস্তোরাঁ ইত্যাদির সমাবেশ।

ঢুকতেই একটা হলঘর। মাঝখানে বিশাল এক ফোয়ারা তার চারপাশে চমৎকার বসার জায়গা। দুঃখের বিষয় বসবার লোক নেই। হলঘরের মধ্যে রয়েছে বিস্তর গাছপালা এবং সবুজ লনও। ছাদটা স্বচ্ছ আবরণে তৈরি বলে এই ঘরে সূর্যের আলো আসতে পারে। হলঘরের চারদিকে ছোটো ছোটো থিয়েটার এবং ভিডিও হল। টিকিট কাটতে হয় না, থিয়েটার এমনিই দেখা যায়। তবে নাটক করার মতো দল বেশি নেই বলে থিয়েটার হলগুলো বেশির ভাগই অচল থাকে। ভিডিও হল-এও লোক হয় না।

স্বয়ংক্রিয় সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় চলে এল অরুণ ঢোলাকিয়া। এখানে কিছু রেস্তোরাঁ এবং দোকানপাট। কিছু মানুষজন দেখা যাচ্ছে। তবু খুবই ফাঁকা। এখানেই লোকটার আসার কথা।

অরুণ চারদিকে চেয়ে সবুজদ্বীপ রেস্তোরাঁয় গিয়ে ঢুকল। খুবই ছোটো রেস্তোরাঁ। সব মিলিয়ে দশটা টেবিল পাতা আছে। খুবই কম আলোয় দেখা গেল, খদ্দের নেই বললেই হয়। একটা টেবিলে চারজনের একটি পরিবার বসে খাচ্ছে। স্বামী-স্ত্রী এবং দুটি বাচ্চা। আর কোণের দিকে একজন লোক চুপচাপ বসে আছে।

ঢোলাকিয়া সেদিকেই এগিয়ে গেল।

নমস্কার।

লোকটা মুখ তুলে একটু হাসল, বোসো ঢোলাকিয়া।

সে বলল, কী খাওয়া যায় বলো তো?

যা খুশি। তবে আমি নিরামিষাশী।

সে তো আমিও। ভেজিটেরিয়ানদের সংখ্যাই তো বেশি।

নুডলসের অর্ডার দিয়ে লোকটি পকেট থেকে একটা খুদে টেলিভিশন সেট বের করে ঢোলাকিয়ার হাতে দিয়ে বলল, ওতে চার মিনিটের একটা কভারেজ আছে দেখে নাও।

ছোটো টি ভি সেটটার মধ্যেই ভিডিও টেপ রয়েছে। ঢোলাকিয়া সেটটা অন করল। একটা ক্রিকেট মাঠ। একজন ব্যাটসম্যান দাঁড়িয়ে। একজন বল করতে দৌড়চ্ছে। বল করল, পিচে পড়ে বলটা নীচু হয়ে গেল। খুব নিচু। ব্যাটসম্যান সেটাকে আটকে দিল। দ্বিতীয় বলটা নিচু হল না, কিন্তু অফ স্টাম্পে পড়ে বাঁই করে ঘুরে স্টাম্পের দিকে এল। ব্যাটসম্যান বিপজ্জনক বলটাকে ফের আটকাল। দেখতে দেখতে ঢোলাকিয়া বলল, এ বল-এ আজকাল খেলা হয় না।

জানি। নতুন নোভা বলে ক্রিসক্রস সেলাই থাকে।

হ্যাঁ।

তুমি যে পরীক্ষানিরীক্ষা করতে চাইছ তাতে নোভা বল হয়তো সাহায্য করবে। কিন্তু মনে রেখো পঞ্চাশ বছর আগে পুরোনো ক্যাট বলেও এরকম সেলাই থাকত।

জানি। আমার কাছে পুরনো সব রকম বলেরই নমুনা আছে।

পরের বলটা-- আশ্চর্যের বিষয়--পিচে পড়েই সম্পূর্ণ গড়িয়ে স্টাম্পের দিকে গেল। ব্যাটসম্যান আটকাতে পারল না। বোল্ড।

লোকটা একটু হেসে বলল, দেখলে?

ঢোলাকিয়া মাথা নেড়ে বলল দেখলাম, আপনি চল্লিশ বছর আগে শুটারস দিতেন।

হ্যাঁ, সারা পৃথিবীতে আমিই একমাত্র শুটারস আর লুপ বল করতে পারতাম। তবে ছ'টা বলের মধ্যে একটা দুটো বা তারও কম। ডেলিভারির ওপর কন্ট্রোল সহজে আসে না। কঠোর অনুশীলন দরকার, কেরিয়ারের শেষ দিকে আমি কৌশলটা খানিক রপ্ত করতে পেরেছিলাম, কিন্তু পুরোটা নয়। আজ অবধি কৌশলটা কাউকে শেখাইনি।

ঢোলাকিয়া কিছুক্ষণ নিঃশব্দে খাবার খেয়ে গেল, তারপর বলল, কাল ওরা আমার পরীক্ষা নেবে।

লোকটা একটু হাসল, মুখ না তুলেই বলল, ঈশ্বর তোমার সহায় হোন। যদি ওরা তোমাকে টিমে নেয় তাহলে এই প্রথম একজন নন-ক্রিকেটার টিমে ঢুকবে।

হ্যাঁ, আমি ওদের বুঝিয়েছি যে, আমি ক্রিকেটার না হলেও একজন বিশেষজ্ঞ।

লোকটা সকৌতুকে একটু চেয়ে মাথা নাড়ল। খাওয়া শেষ করে লোকটা বলল, এবার চল, হাতেকলমে ব্যাপারটা দেখা যাক।

বাইরে পার্কিং লটে লোকটার ছোটো হেলি-কারে এসে উঠল তারা। এ গাড়ি মাটি দিয়ে চলে না, হুশ করে হাওয়ায় ভেসে পড়ে। দ্রুত গতি, ব্যাটারি চালিত মোটর পাখির ডানার মতো দুটি ফ্লোটারকে চালু রাখে, পাখির মতোই স্বচ্ছন্দে ওড়ে এই গাড়ি। দশ মিনিটের মধ্যেই তারা নিরিবিলি শহরতলির একটা উজ্জ্বল আলোয় সজ্জিত মাঠে এসে নামল। মাঠের মাঝখানে বাইশ গজে ক্রিকেট পিচ। চারদিকে আলোর স্তম্ভ জায়গাটাকে দিনের অধিক আলোকিত করে রেখেছে।

লোকটা অনুচ্চ স্বরে ডাকল, রজনী?

মাঠের ধারে একটা ছোটো তাঁবুর ভিতর থেকে একটি কিশোরী মেয়ে ঘুমচোখে বেরিয়ে এসে হাই তুলল।

লোকটা বলল, আমার ছোটো মেয়ে রজনী। ও যদি ছেলে হত তবে ওকে আমার সব বিদ্যে শেখাতাম। আমার ছেলে নেই, চারটিই মেয়ে।

মেয়েরাও তো ক্রিকেট খেলে।

খেলে, আমার মেয়েরা ক্রিকেটে আগ্রহী নয়। মেয়েটা পিচের এক ধারে নিঃশব্দে তিনটে স্ট্যাম্প পুঁতে দিয়ে সরে দাঁড়াল, তারপর বলল, ইনিই কি তিনি?

লোকটা বলল, হ্যাঁ, আমাদের তুরুপের তাস, এসো ঢোলাকিয়া, বল করো।

রজনী একটা ব্যাগ থেকে সাদা রঙের একটা বল বের করে অরুণ ঢোলাকিয়ার দিকে ছুঁড়ে দিল, এই সেই বিতর্কিত বল নোভা, বলটাকে যদি পৃথিবী হিসেবে ধরা যায় তাহলে এর একটা সেলাই গেছে বিষুব রেখা বরাবর, অন্যটা দুই মেরু ভেদ করে, বলের দুপিঠে এক জায়গায় সেলাই দুটো কাটাকাটি করেছে, আর এই দুটো জায়গাই অরুণের কাছে গুরুত্বপূর্ণ, বলটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছিল অরুণ। নজরে পড়ল দুটো সেলাই

যেখানে কাটাকাটি করেছে, যেখানে হালকা পেনসিল দিয়ে চারটি অক্ষর -- ডি ও এন টি, ভ্রূ কুঁচকে ঢোলাকিয়া একটু ভাবল, এর মানে কি ডোন্ট? সে মেয়েটার দিকে এক ঝলক তাকাল, মেয়েটা খুব বিরক্তি মাখানো মুখে অন্য দিকে চেয়ে আছে।

বৃদ্ধ রামনাথ রাই তার দিকে মিটমিটে চোখে লক্ষ রাখছে। রামনাথ ষাট সত্তরের দশকে ভারতীয় একাদশে খেলেছিল। তার রেকর্ড তেমন ভালো কিছু নয়, কিন্তু অরুণের মাথায় আইডিয়াটা ঢুকিয়েছিল এই লোকটাই, অঙ্কের জগতে অরুণ ঢোলাকিয়ার খ্যাতি সাংঘাতিক। বিশেষ করে জ্যামিতিক এবং ত্রিকোণমিতিক গণনায় সে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তার রৈখিক গণনায় সে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তার রৈখিক গণনা, বিচার ও বিশ্লেষণ পৃথিবীর যে কোনো বিষয়েই গ্রহণ করা হয়ে থাকে। বৃদ্ধ রামনাথ একদিন তার দ্বারস্থ হয়ে বলল, বাপু ক্রিকেটের জন্য তুমি কিছু করো।

সেই সূত্রপাত, রামনাথই তাকে ক্রিকেট বুঝিয়েছিল এবং আগ্রহী করে তুলেছিল। মাস তিনেক ধরে সে নোভা বল নিয়ে মেতে আছে। আজ নিজের সাফল্য সম্পর্কে সে ঘোর আত্মবিশ্বাসী। ভারতীয় নির্বাচকমণ্ডলী তার মতো নামী লোকের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে পারছে না, তাকে হয়তো দলে নেওয়াও হবে। এর জন্য বৃদ্ধ রামনাথের কাছে সে কৃতজ্ঞ। কিন্তু মুশকিল হল বলের গায়ে 'ডোন্ট' কথাটা লিখে রজনী কী বোঝাতে চাইছে? তাহলে কি মাঠের আশেপাশে বা ঊর্ধ্বাকাশে গুপ্তচর রয়েছে? তার বোলিং অ্যাকশন কি রেকর্ড করা হবে?

অরুণ ঢোলাকিয়া ফুটফুটে মেয়েটার দিকে বারবার তাকাল, কিন্তু মেয়েটা একবারও তার দিকে তাকাল না। উদাসীন মুখে ঘাসের ওপর বসে নিজের নখ দেখছে এখন।

ঢোলাকিয়া বিদ্যুৎবেগে চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নিল। বৃদ্ধ রামনাথকে বিশ্বাস করা ঠিক হবে না।

সুতরাং অরুণ যে ছটা বল করল তার একটাও গড়িয়ে গেল না। একটাও লুপ হল না।

উত্তেজিত রামনাথ মাথা নেড়ে বলল, পিচ জায়গামতো পড়ছে না।

তাই তো দেখছি, মনে হচ্ছে শুটার বা লুপ আমাদের কাগজে কলমেই থেকে যাবে।

রামনাথ রাই প্রচণ্ড হতাশ দৃষ্টিতে চেয়ে বলল, তাহলে তোমার পরিশ্রম বৃথাই গেল?

তাই মনে হচ্ছে।

আবার চেষ্টা করে দেখ, নোভা বলের ভিতরে এক ধরনের সিনথেটিক আঠা থাকে। তার ফলে বলটা ক্যাট বলের চেয়ে একটু বেশি লাফায়। মুশকিল কি সেখানেই হচ্ছে?

ঢোলাকিয়া জানে, সেটা সমস্যা নয়। সমস্যা রামনাথ নিজেই। অরুণ সেটা রামনাথকে বলে কী করে?

তবে সে আর এক ওভার বল করলে, ইচ্ছে করে। প্রথম পাঁচটা বল করল বিশ্রীভাবে। কিন্তু ষষ্ঠ বলটা করল তার ক্ষুরধার ক্যালকুলেশন দিয়ে। বলটা নীচে পড়ে মাটি কামড়ে বুলেটের মতো ছুটে গিয়ে মিডল স্ট্যাম্প ছিটকে দিল।

বাঃ, এই তো হচ্ছে? বলে চেঁচিয়ে উঠল রামনাথ।

রজনী হঠাৎ উঠে তাঁবুর দিকে হাঁটতে লাগল, ঢোলাকিয়া ভাবল সে কোনো মারাত্মক ভুল করে বসল নাকি? তবে বুদ্ধি করে সে ডান হাতের গ্রিপ বাঁ হাত দিয়ে ঢেকে রেখেছিল। এবং শুধু গ্রিপ ছাড়াও অনেক ব্যাপার আছে যা নকল করা সহজ নয়, বিশেষ এক গতিতে, বিশেষ এক কোণ থেকে ডায়াগোনাল রান আপ নিয়ে আসতে হবে। ডেলিভারির সময়ে গোটা হাতেরও একটা বিশেষ কম্পন চাই, এসব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় অনুধাবন ও অনুশীলন সোজা কথা নয়। তবু মনটার খুঁতখুঁতুনি থেকেই গেল।

রামনাথ তাকে আরও বল করার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল, কিন্তু অরুণ রাজি হল না, টেলিফোনে একটা হেলি-ট্যাক্সি ডাকিয়ে এনে বাড়ি ফিরল।

একটু রাতের দিকে ফোনটা এল।

আমি রজনী।

ওঃ, রামনাথবাবুর ছোট্ট মেয়েটা?

হ্যাঁ। আপনি আজ খুব ভুল করেছেন, বলের ওপর আমি লিখে রেখেছিলাম 'ডোন্ট'।

হ্যাঁ, দেখেছি।

তা সত্ত্বেও শেষ বলটা ওরকম করলেন কেন?

না করলে তোমার বাবা হতাশ হতেন।

তাহলেও ক্ষতি ছিল না, আজ মাঠের চারপাশে লোক ছিল, আপনি তাদের দেখেননি, কিন্তু আমি জানি, দক্ষিণ আফ্রিকার বিশেষজ্ঞরা আপনার অ্যাকশনের ছবি তুলে নিয়ে গেছে। আপনি আমার বারণ শুনলেন না কেন?

আমার ভুল হয়েছে। আসলে তুমি একটি বাচ্চা মেয়ে বলে তোমার বারণকে বেশি গুরুত্ব দিইনি।

আমার বয়স চোদ্দ, আজকাল এ বয়সের ছেলেমেয়েরা যথেষ্ট বুদ্ধি রাখে।

কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার বিশেষজ্ঞরা জানল কি করে?

আমার বাবাই জানিয়েছে। চল্লিশ বছর আগে বাবাকে ভারতীয় টিম থেকে অন্যায়ভাবে বাদ দেওয়া হয়। এটা তারই প্রতিশোধ।

কিন্তু উনিই তো আমাকে এ কাজে নামিয়েছিলেন।

হ্যাঁ, কারণ তিনি জানেন, আপনার মতো একজন ধুরন্ধর অঙ্কবিদকে দিয়েই কাজটা সম্ভব। আমার বাবাও একজন ম্যাথামেটিশিয়ান, কৌশলটা আপনাকে দিয়ে আবিষ্কার করিয়ে সেটা অন্য দেশকে বেচে দেওয়ার মতলব ছিল তাঁর।

এখন তাহলে কী হবে?

সেটা আপনিই ঠিক করুন। আর এক মাস পরেই বিশ্বকাপ। দু হাজার নিরানব্বই সালের সতেরোই ডিসেম্বর। প্রথম ম্যাচেই ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী দক্ষিণ আফ্রিকা, আপনি কত বড়ো ভুল করেছেন আজ তা বুঝতে পারছেন?

পারছি রজনী, আমার এত দিনের পরিশ্রম বৃথা গেলে আমি খুবই ভেঙে পড়ব।

এখন মন দিয়ে শুনুন।

বলো।

আপনি আমার বারণ শুনবেন না বলে ধরে নিয়ে আমি একটা কাজ করেছি।

কী কাজ?

পিচের সোজাসুজি যে দুটি বাতিস্তম্ভ ছিল আমরা সে দুটি থেকে বীমার রশ্মি ফেলেছিলাম। যত দূর জানি এই রশ্মি ফেললে ক্যামেরার চোখ ঝলসে যায়, মানুষের চোখে কিছু ধরা পড়ে না।

সত্যি?

হ্যাঁ, আমি এবং আমার বান্ধবীরা বুদ্ধি করে এইটে করেছি। তাতে কতদুর কাজ হবে তা আমরা জানি না। ওদের কাছে হয়তো আরও অত্যাধুনিক ক্যামেরা আছে।

সেটা থাকাই সম্ভব।

আমি যে বলটা আপনাকে দিয়েছিলাম তাতেও একটা সলিউশন মাখানো ছিল। তাতে মুভমেন্টের সময় হাওয়া লাগলে সেলাইগুলো সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে যাবে। জানি না এতে কতটা কাজ হবে। কিন্তু আমরা আমাদের সাধ্যমতো করেছি।

তোমাকে কী বলে ধন্যবাদ দেব?

বিশ্বকাপটা জিতুন, তাহলেই হবে।

বিশ্বকাপের শুরুতেই সারা পৃথিবীতে তুমুল আলোচনা, ভারত তাদের দলে একজন নন ক্রিকেটার অঙ্কবিদকে খেলাচ্ছে। হাসাহাসি, ঠাট্টা মশকরা, সমালোচনা, প্রতিবাদ সবই হতে লাগল। তার মধ্যেই কলকাতার ইডেন উদ্যানে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে খেলতে নামল ভারত। টসে জিতে ভারতের অধিনায়ক নানক দাশগুপ্ত প্রতিপক্ষকে ব্যাট করতে পাঠাল ঢোলাকিয়ার পরামর্শে।

প্রথম ওভারেই ঢোলাকিয়ার হাতে বল। সারা মাঠ নিশ্চুপ। একজন অঙ্কের অধ্যাপক অক্রিকেটার কী করতে পারে জানার জন্য সমস্ত পৃথিবীই দম বন্ধ করে বসে আছে। অরুণ ঢোলাকিয়া কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে রইল। তারপর শুরু করল দৌড়।

প্রথম বলটা লুপ। স্টাম্পের সোজা পিচে পড়ে বাঁ দিকে বেঁকে গেল, ব্যাটসম্যানের বাড়ানো ব্যাটকে এড়িয়ে ফের ডানদিকে ঘুরল, না, স্টাম্পে লাগল না। একটু উঁচু দিয়ে চলে গেল উইকেটকিপারের হাতে। ঢোলাকিয়া বিরক্ত। ক্যালকুলেশনের সামান্য ভুল।

দ্বিতীয় বলটা আবার লুপ। কিন্তু ধীর গতির ব্যটসম্যান মরিস বলটাকে তার সিনথেটিক ব্যাট দিয়ে পিটিয়ে দিল কভারে, চার।

আজকাল মাঠে কোনো আম্পায়ার থাকে না। কিন্তু মাঠের চারদিকে অজস্র বৈদ্যুতিন চোখ। স্কোরবোর্ড নির্দেশ দিল চারের।

তৃতীয় বলটা করার আগে ফের একটু ধ্যানস্থ হল সে। ধীরে দৌড়ে এসে বল করল। মরিস ব্যাটটা তুলল কিন্তু সময়মতো নামাতে পারল না। মাটি কামড়ে বলটা গিয়ে তার মিডলস্টাম্প উপড়ে দিল, শুটার।

ওভার যখন শেষ হল তখন স্কোরবোর্ড-এ চার রানে চার উইকেট। হ্যাট্রিক-সহ। দলের অন্য খেলোয়াড়রা এতদিন অক্রিকেটার ঢোলাকিয়াকে পাত্তা দিচ্ছিল না। কিন্তু ওভার শেষ হলে কেউ কেউ এসে তার পিঠ চাপড়ে গেল।

খেলা অবশ্য বেশিক্ষণ গড়াল না। মোট বাইশ রানে প্রতিপক্ষ অল আউট। ঢোলাকিয়ার ঝুলিতে দশ উইকেট। সতীর্থদের কাঁধে চড়ে প্যাভিলিয়ানে ফিরল ঢোলাকিয়া।

দ্বিতীয় ইনিংসের শুরুতেই প্রবল ঝড়বৃষ্টি এসে গেল। তাতে অবশ্য খেলা আটকায় না আজকাল। দুশো মিটার ওপরে অন্য দিক থেকে দশটা পদ্মফুলের পাপড়ির মতো স্বচ্ছ ঢাকনা এসে গোটা মাঠ ঢাকা দিয়ে দিল।

এক ঘন্টার মধ্যেই ভারত জিতে গেল ম্যাচ। জনতা গর্জন করে উঠল। ঢোলাকিয়া জিন্দাবাদ। সমগ্র পৃথিবী স্তম্ভিত। এ কি আশ্চর্য বোলিং। পরদিন পত্রপত্রিকা আর ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে কেউ কেউ দাবি করল ঢোলাকিয়া চাক করছে, ওকে নো বল ডাকা উচিত।

দ্বিতীয় ম্যাচে ইংল্যান্ড, তৃতীয় ম্যাচে অস্ট্রেলিয়া একে একে উড়ে যেতে লাগল। ফাইন্যালে শোচনীয়ভাবে হারল দুর্ধর্ষ ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তারা পনেরো রানে অল আউট।

বিশ্বকাপের উত্তেজনার পর তার নির্জন বাড়িতে ফিরে এল ঢোলাকিয়া। এত উত্তেজনা, এত চেঁচামেচি ও শোরগোল ইত্যাদিতে সে বড়ো অস্বস্তিতে ছিল। নিরিবিলিতে এসে যে খুব শান্তি পেল। তার কাজ শেষ। পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে তার কলাকৌশল আর গোপন রাখা যাবে না। অন্যেরা কপি করে নেবে। তা নিক, লুপ আর শুটার নিয়ে বিস্তর গবেষণা হবে। বদল করা হবে বল, তাতে আর কিছু আসে যায় না অরুণ ঢোলাকিয়ার, সে তার অঙ্ক নিয়ে থাকবে।

অস্বস্তিটা শুরু হল তৃতীয় দিন থেকে। অধ্যাপক অরুণ ঢোলাকিয়ার খুব একা লাগছে। বড্ড একা, তার সময় কাটতে চাইছে না। প্রচুর অভিনন্দন জানিয়ে লোকে ফোন করছে, উপহার পাঠাচ্ছে, অনেকে চলেও আসছে তাকে দেখতে, পৃথিবী জুড়ে তাকে নিয়ে আলোচনা। এসবই তার কাছে বিরক্তিকর এবং অস্বস্তিকর।

কয়েকদিনের জন্য সে সমুদ্রের ধার থেকে ঘুরে এল। কিন্তু সারাক্ষণ একটা নিঃসঙ্গতা সঙ্গে রয়েছে তার। প্রিয় অঙ্কশাস্ত্রও যেন আলুনি লাগছে আজকাল। কেন এমনটা হচ্ছে? সারাক্ষণ একটা অস্থিরতা বোধ করছে সে।

একদিন রাতে বিছানায় শুয়ে নিজেকেই সে প্রশ্নটা করল, এমন লাগছে কেন? কেন এমন লাগছে?

কোনো জবাব খুঁজে পেল না সে।

রামনাথ ফোন করল দশদিন বাদে, অভিনন্দন জানাচ্ছি। তুমি আমাকে ধাপ্পা দিয়েছিলে বলে গত দশদিন ফোন করিনি। আমার অভিমান আর রাগ হয়েছিল, সেটা সামলে উঠেছি।

রামনাথের গলা শুনেই কেন যে বুকটা হঠাৎ এমন দুরুদুরু করতে লাগল কে জানে। ধরা গলায় অরুণ ঢোলাকিয়া বলল, অনেক ধন্যবাদ।

ফোন রেখে অনেকক্ষণ ভাবল অরুণ, রজনীরও কি উচিত ছিল না একবার ফোন করা বা অভিনন্দন জানানো? অদ্ভুত তো মেয়েটা। খুব রাগ হল অরুণের। কেন জানাল না? কেন এত দেমাক ওর। কেন ওর এত অবহেলা তাকে? তার যে ভীষণ রাগ হচ্ছে। রাগে যে জ্বলে যাচ্ছে গা। অসহ্য। অসহ্য।

আরও দুদিন সময় দিল সে, তারপর আরও তিনদিন, নাঃ এ তো সহ্য করা যাচ্ছে না। কিছুতেই না।

সাতদিনের দিন এক সকালবেলা সে রজনীর মোবাইল ফোনের নম্বর বের করল কম্পিউটার সেন্টারে ফোন করে।

রজনীর মিহি 'হ্যালো' শুনেই রাগে ফেটে পড়ল অধ্যাপক অরুণ ঢোলাকিয়া, কী--কী ভেবেছ তুমি। অ্যাঁ। কী ভেবেছ? আমাকে এত অবহেলা করার মানে কী আমি জানতে চাই ...

এই তীব্র রাগের জবাবে মেয়েটা তাকে অবাক করে দিয়ে খিলখিল করে হাসল। তারপর বলল, হ্যাঁ।

হ্যাঁ। হ্যাঁ মানে কী?

হ্যাঁ মানে হ্যাঁ।

অরুণ একটু লাল হল লজ্জায়। তারপর বলল, ও, তাহলে হ্যাঁ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ।

হাতুড়ি

রতন নাকি?

আজ্ঞে।

খবর কী রে।

খবর নাই।

তার মানে? চিঠিটা দিসনি?

কারে দেব? তিনি বাড়িতে থাকলে তো।

কোথায় গেছেন?

কোন চুলোয় গেছেন তা কে জানে। কিম্ভুত জায়গায় পাঠিয়েছিলেন বাপ, এই মারে কি সেই মারে। যেন চোর। তিনটে বাঘা কুত্তার সে কী চিল্লামিল্লি, শেকল ছিঁড়ে ঘাড়ে এসে পড়ে আর কি। বুকের ভিতর তখন থেকে ধড়াস ধড়াস।

দরজা খুলল কে?

কে জানে কে। চাকরবাকরই হবে বোধহয়। তার সে কী পুলিশের মতো জেরা। কোথা থেকে আসা হচ্ছে, নাম কী, নিবাস কোথায়, কী প্রয়োজন। কথা শেষ করার আগেই প্রশ্ন করে। আর সে কী তাড়াং তাড়াং চোখ রে বাবা।

তারপর?

সে কিছু কবুল করল না। 'দাঁড়াও' বলে দরজা দিয়ে ভিতরে গেল। পাঁচ-সাত মিনিট ধরে দাঁড়িয়ে থাকার পর দরজা খুলে এক মহিলা দাঁড়ালেন এসে।

সে কেমন?

দেখতে-শুনতে খারাপ নয়। ফরসা, লম্বা, মুখানাও ঢলঢলে। হলে কী হয়, ওই চেহারাখানাই যা দেখনসই। মেজাজে একেবারে দুর্বাসা।

সর্বনাশ। চিঠিটা কি ওর হাতেই দিলি নাকি?

পাগল। আপনার বলা ছিল দুলাল ছাড়া কারো হাতে চিঠি দেওয়া চলবে না। সে আমার খুব মনে ছিল। তবে মেয়েটা এমন চেঁচিয়ে সব কথা বলছিল যে আমার ধাত ছাড়ার উপক্রম। বারবারই জিজ্ঞেস করে কোথা থেকে আসছি, আর কে পাঠিয়েছে।

কিছু বললি?

না। শুধু একটা কথাই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলা, হাটখোলা থেকে আসছি, দুলালবাবুর সঙ্গেই দরকার। সেই কথাই হাজার বার ধরে বলাল। চোখে কুটিল সন্দেহ।

তারপর কী হল?

ভদ্রমহিলা বলল, আপনাকে আমার সন্দেহ হয়েছে, দাঁড়ান, পুলিশে খবর দেব।

ও বাবা। তুই কী বললি?

ভয় খেয়ে বললাম, আমার দোষটা কোথায় হল বলবেন? এসেছি দুলালবাবুর কাছে একটা দরকারে, তা অমন করছেন কেন? পুলিশে খবরই বা দেবেন কেন? চুরি ডাকাতি তো করিনি। বারবারই জিজ্ঞেস করে দুলালবাবুর সঙ্গে আমার কীসের সম্পর্ক।

তুই কী বললি?

বললাম, চেনাজানা আছে। বিষয়কর্মেই আসা। আচ্ছা দাদা, এই মহিলাটি কে?

ওর নাম পলা।

ওর নাম দিয়ে কী হবে? মহিলা আসলে কে?

ও দুলালের বউদি।

অ, তাই বলুন। দু ভায়ে ঝগড়া বুঝি।

না, কোনো ঝগড়া নেই। দুলালের দাদা রামলালকে পলা বছরখানেক আগেই নিজের হাতে মেরে ফেলেছে।

উরেববাস। বলেন কী?

রামলাল আর পলার বনিবনা ছিল না।

দশ বছর বিবাহিত জীবনে ওদের এক ঝগড়ার মধ্যে রামলাল কিছু ক্লান্ত হয়ে পড়ে-- সেদিন তার বিস্তর খাটুনি গেছে-- চোখ বুজে বিছানায় পড়ে ছিল। সেই সময়ে পলা একটা হাতুড়ি দিয়ে তার কপালে মারে।

উরেববাস।

খুন করার ইচ্ছে হয়তো ছিল না। কিন্তু রামলাল ক্ষীণজীবী মানুষ ছিল। ওই এক ঘায়েই তার প্রাণবায়ু বেরিয়ে যায়।

থানাপুলিশ হয়নি?

না। তার কারণ ওদের হাতে একজন ডাক্তার ছিল। সে প্রথমে ডেথ সার্টিফিকেট দিতে চায়নি। তাকে কিছু টাকাপয়সা দিয়ে কাকুতি-মিনতি করে রাজি করানো হয়। মাথার ক্ষতটা খুব একটা চোখে পড়ার মতোও ছিল না। ডেথ সার্টিফিকেটের জোরে রামলালকে সৎকারও করা গিয়েছিল।

এ যে পতিঘাতিনী সতী।

বলেছি তো, রামলালকে খুন করার ইচ্ছে পলার হয়তো ছিল না। খুনটা অ্যাক্সিডেন্টাল।

আপনি কিছু করলেন না?

কী করব?

উকিল মানুষ, কত কী করতে পারতেন।

পারতাম বটে, কিন্তু তাতে ওদের কচি ছেলেটা ভেসে যেত। সবদিক বিবেচনা করে কেসটা আর করিনি। তবে সন্দেহ হওয়ায় নিজেই খানিকটা তদন্ত করেছিলাম। ডাক্তার পাল আমার কাছে কবুলও করে ফেলেছিল যে, মৃত্যুটা স্বাভাবিক ছিল না।

আপনাকে আমি ভালো করে বুঝতেই পারি না। কেমন মানুষ আপনি বলুন তো।

কেমন মানুষ বলে তোর মনে হয়?

সময় সময় বেশ ভালো, সময় সময় কেমন যেন।

ঠিক ধরেছিস।

এখন দুলালবাবুকে লেখা চিঠিটা কী করব?

রেখে দে। দুলাল ফিরলে গিয়ে দিয়ে আসবি।

ও বাবা, ও বাড়িতে আবার? হাতুড়িবাজ মহিলার খপ্পরে গিয়ে পড়তে হবে জেনেই যে ভয় লাগছে।

যে চাকরটা প্রথম দরজা খোলে সে কেমন?

বড়োসড়ো চেহারা, মাঝবয়সি।

ও হচ্ছে গেনু।

আপনি চেনেন?

হ্যাঁ।

লোক কিন্তু সুবিধের নয়।

জানি। তবে গেনু পলাকে কোলে করে মানুষ করেছে। পলাকে ও বুক দিয়ে আগলে রাখে। বাবার মতোই।

দুলালবাবুর সঙ্গে আপনার জরুরি দরকারটা কীসের?

দুলালের এখন ও বাড়ি ছাড়া উচিত। ও বোকা বলে বুঝতে পারছে না, ও বাড়িতে ও আর নিরাপদ নয়।

কেন বলুন তো।

গেনুর জন্য।

বুঝলাম না।

গেনু দুলালকে ঘেন্না করে।

বাড়িটা পলা গাপ করতে চায় বুঝি?

না। পলা আর দুলাল দুজন দুজনকে চায়।

বলেন কী দাদা। এ তো রোমাঞ্চকর নাটক।

জীবনটাই নাটক।

এইটুকু বলেই থামলেন কেন? বাকিটা বলুন।

আঁশটে গন্ধ পাচ্ছ বুঝি? মানুষ আঁশটে গন্ধ খুব ভালোবাসে। অবৈধ সম্পর্ক কেচ্ছা-কেলেঙ্কারি, বউ ভাগানো মানুষের কাছে খুব রুচিকর।

লজ্জা দেন কেন দাদা। লোক শুঁটকি মাছ খায়, হিং খায়, পেঁয়াজ-রসুন খায়, বিট লবণ খায়--তা এসবের গন্ধ তো আসলে নিঘিন্নে নানা দুর্গন্ধেরই এ পিঠ ও পিঠ। তবু কি ভালোবেসে খায় না?

তা বটে।

মনে হচ্ছে রামলালের খুনের পিছনেও এইটেই কারণ, তাই না?

না হে, রামলাল বেঁচে থাকতে দুলাল পিকচারে আসেনি। সে তখন পাহাড়-পর্বতে ঘুরে বেড়োচ্ছে। বরাবরই ডাকাবুকো, বরাবরই অ্যাডভেঞ্চারের নেশা। লম্বা সাঁতারে খুব নাম ছিল। ভালো অ্যাথলিট। তারপর কয়েক বছর ধরে তার পেশা হয়েছে পাহাড়ে চড়ার। চড়েছেও অনেক পাহাড়ে। বিপজ্জনকভাবে বাঁচতে ভালোবাসে। সে ঘরেই থাকেনি কখনো। পলার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা হওয়ার মতো সুযোগ ছিল না।

তা হলে?

রামলাল মারা যাওয়ার পর খবর পেয়ে দুলাল ফিরে এল। সে খুব বুদ্ধিমান ছেলে। দাদার মৃত্যু যে হার্ট অ্যাটাকে হয়নি তা অনুমান করতে দেরি হল না তার। পলার ভাবগতিক দেখেও সন্দেহটা হয়ে থাকবে। পলা তখন নিজের কৃতকর্মের জ্বালায় পাগলের মতো আচরণ করছিল। শোকের এই বাড়াবাড়িটাও স্বাভাবিক ছিল না। কারণ পলা এবং

রামলালের মধ্যে সম্পর্কটা যে মধুর ছিল না তা সবাই, যারা ওদের চিনত, জানে। দুলাল বউদিকে নানাভাবে লক্ষ করে বুঝতে পারল, ডাল মে কুছ কালা হ্যায়। তখন সে একদিন আমার কাছে আসে।

পাহাড়ে কি সে আপনার সঙ্গেও চড়ত?

তা ঠিক। দুজনে আমরা হিমালয়ে অনেক পাহাড়ে চড়েছি। পরে সে অবশ্য অন্য দলের সঙ্গে জুটে যায়। আমিও ওকালতি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। দুলালের চেয়ে আমি প্রায় দশ বছরের বড়ো।

সে আপনাকে এসে কী বলে?

সে বলে যে, পলার আচরণ তাকে সন্দিহান করে তুলেছে। সে অবশ্য গেনুকে সন্দেহ করেছিল। কিন্তু আমি কিছু ভাবনাচিন্তার পর বুঝতে পারি, কাজটা গেনুর নয়।

কী করে? চাকরটাও তো বেশ গুণ্ডা গোছের।

গেনুকে আমি চিনি।

গেনু কি ভালো লোক? এই যে বললেন সে দুলালকে খুনও করতে পারে।

ঠিক কথা। গেনু খেপে গেলে ভয়ঙ্কর। কিন্তু একটা কথা কি জানিস? গেনু কিন্তু রামলালাকে খুব ভালোবাসত। খুব। রামলাল এমনিতে পলার সঙ্গে ঝগড়া করত বটে, কিন্তু মানুষটা খুব খাঁটি ছিল। আরও একটা কথা, সে প্রাণ থাকতে পলাকে বিধবা করবে না।

আপনি তো জন্মেও ও বাড়িতে যান না, তবে এতসব জানলেন কী করে বলুন তো।

শুনে শুনে জানি।

কথাটা বিশ্বাস হচ্ছে না।

বিশ্বাস না হওয়ার কী?

এই যে বললেন গেনুকে আপনি চেনেন। কীভাবে চেনেন?

গেনু আগে আমার কাছে আসত।

কেন আসত?

এমনি। রামলাল পাঠাত কোনো খবর-টবর দিয়ে। তখন গেনু এসে অনেক কথাটথা বলত।

আর পলা?

বন্ধুর বউ হিসেবে ওই একটু যা পরিচয়। দু-একবার দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে।

সে কি বরাবরই এমন খাণ্ডারনি ছিল?

একটু রোখাচোখা ছিল বই কি। লোককে মুখের ওপর স্পষ্ট কথা বলে দিত।

কী করে জানলেন?

ওই নানাভাবে জানা।

রামলাল মরার পর ও বাড়িতে আপনি যাননি?

না। আমি তখন আমেরিকায় ছিলাম। ঘটনার মাসখানেক বাদে ফিরে জানতে পারি।

তখন যাননি?

না। গিয়ে কী লাভ হত বল।

যেতে তো পারতেন। শত হলেও রামলাল আপনার বন্ধু ছিল।

এমনি যাইনি। গেলে মনটা খারাপ হত।

পলা আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করেনি?

না। এবার দুলালের কথাটা শেষ করুন।

হ্যাঁ, দুলাল। দুলাল যখন আমাকে সবকথা বলল তখন আমার সন্দেহ হল পলাকে। দুলালের সন্দেহ গেনুকে। আমি আমার সন্দেহের কথা দুলালকে বলিনি। দুলাল সন্দেহের বশবর্তী হয়ে গেনুর ওপর চড়াও হয়েছিল। থানা-পুলিশ করারও চেষ্টা করে। কিন্তু প্রমাণ তার হাতে ছিল না। আমি ডাক্তার পালকে ডাকিয়ে অভয় দিয়ে তার পেট থেকে কথা বের

করি। তবে ডাক্তার পালও জানে না খুনটা কে করেছে। তার সন্দেহও গেনুর দিকেই। ব্যাপারটা এ রকম জায়গাতেই ঝুলে আছে।

সত্যটা কেবল আপনি জানেন?

তা বলছি না। সত্য জানা সহজ নয়। তবে জোরালো অনুমান।

তবে ধরিয়ে দিচ্ছেন না কেন।

পাগল। বলেছি তো, পলার জেল হলে ওর ছেলেটা ভেসে যাবে। তা ছাড়া প্রমাণও তো কিছু নেই।

দুলালের সঙ্গে পলার ভাব হল কী করে?

দুলাল যখন এল তখন পলার মানসিক অবস্থা ভয়ংকর। সেই অবস্থায় দুলাল তার বউদিকে খুব আগলে রেখেছিল। সাইকিয়াট্রিস্ট দিয়ে চিকিৎসা করানো, বাইরে বেড়োতে নিয়ে যাওয়া, মন ভালো রাখার জন্য নানা ব্যবস্থা করা--সব করেছিল। আর পলাও ওর মধ্যে একটা খুব নির্ভযোগ্য আশ্রয় খুঁজে পায়।

তারপর?

ঘি আর আগুন। বুঝলি?

বুঝেছি।

ও দুজন দুজনকে বেশ আঁকড়ে ধরেছে।

বিয়ে করবে?

এখনও ততটা এগোয়নি। তবে আমার অনুমান, ওরা সেদিকেই এগোচ্ছে। সেটা গেনুর পছন্দ নয়।

তাও বোঝা যাচ্ছে। গেনুর দুলালকে পছন্দ হওয়ার কথাও নয়।

ঠিক। গেনু চায় না যে, পলা ফের বিয়ে করুক।

আচ্ছা, গেনু কি জানে যে, রামলালকে পলা খুন করেছে?

বোধহয় জানে। সেই সময়ে গেনু বাড়িতে ছিল। হাতুড়িটাও সেই সরিয়ে ফেলে।

হাতুড়ি দিয়েই যে খুন করা হয়েছিল তা আপনি জানলেন কী করে?

অনুমান।

আপনার দেখছি সবই অনুমান।

অনুমানও একটা দামি জিনিস। ঠিক মতো লজিক্যালভাবে অনুমান করতে করতে সত্যে পৌঁছনো যায়।

খুনের সময় আপনি এ দেশে ছিলেন না, এক মাস বাদে ফিরে এসে শুধু কানে শুনেই অনুমান করতে লেগে গেলেন, এ কি বিশ্বাসযোগ্য কথা?

তোর দেখি খুব সন্দেহবাই হয়েছে।

আপনার সঙ্গে থেকে-থেকেই হয়েছে। চামচাগিরি তো সেই কত বছর ধরে করছি।

বাজে কথা। আগে তো তুই নানা ধান্দায় ঘুরতিস। আমাকে এসে মাঝে-মাঝে একটু সেলাম বাজিয়ে গেছিস। গত ছ মাস ধরে দেখছি একটু কাজে মন হয়েছে।

ওকালতি আমার ভালো লাগে না দাদা, এ কর্ম আমার হওয়ার নয়। অত আর্টিকেল আর সাব ল মনে রাখতে গেলে প্রাণটা শুকিয়ে যাবে।

আমারও কি তাই হয়েছে বলে তোর ধারণা?

সত্যি কথা বলব?

বলেই ফেল।

আপনি তো পা থেকে মাথা অবধি রসকষহীন লোক। বিয়েটা অবধি করলেন না। দিন-রাত আইনের বই, মক্কেল আর মামলা নিয়ে পড়ে আছেন। আপনার সঙ্গে থেকে, থেকে আমারও না তাই হয়।

ওরে, আইনের মধ্যে যে রস আছে তার সন্ধান তো পাসনি। পেলে দেখতি বাইরে চেহারা খেজুর গাছের মতো হলে কী হয়, ভিতরটা টইটম্বুর।

সে বস আপনার থাক, আমার দরকার নেই। যা বলছিলেন বলুন।

ওই তো। বলা তো হয়ে গেছে।

না, হাতুড়ির কথাটা শেষ করেননি।

হ্যাঁ, হাতুড়ি। হাতুড়িটা তো আমার অনুমান। শিলনোড়ার নোড়াটাও হতে পারে, আধলা ইটও হতে পারে। মোটা কাঠের রুল হওয়াও বিচিত্র নয়।

কথা ঘোরাচ্ছেন কিন্তু।

মানুষ মারতে যে কোনো অস্ত্রই যথেষ্ট। তবে আবার বলছি, রামলালের মৃত্যুটা হয়তো ইচ্ছাকৃতভাবে ঘটানো হয়নি।

সেটা তো কয়েকবারই বললেন।

তুই প্রসঙ্গটা থেকে সরছিস না কেন?

সরতে বলছেন কেন?

খুন জখম কি ভালো প্রসঙ্গ?

আপনি নিজেই তো ক্রিমিন্যাল ল'ইয়ার, খুনজখম নিয়েই তো আপনার কারবার।

সেই জন্যই তো মাঝে-মাঝে হাঁফ ছাড়তে ইচ্ছে যায়।

তবু হাতুড়িটার কথা আমি জানতে চাই। মারণাস্ত্রটা যে একটা হাতুড়িই সেটা আপনি খুব ভালো করেই জানেন। কী করে জানলেন?

না শুনেই ছাড়বি না?

কেউ ছাড়ে এই ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট?

গেনুই বলেছে।

গেনু পলাকে অত ভালোবাসে, সে কেন বলে দেবে আপনাকে?

না বললে যে তার ঘাড়ে দায় বর্তায়।

তার মানে আপনি তাকে জেরা করে করে জেনেছেন।

তাই বটে।

লোকটা কি বোকা?

না তা নয়। আসলে পলাকে সে মেয়ের মতোই ভালোবাসে। সে একটু প্রাচীনপন্থী লোক। একটা মেয়ে তার স্বামীকে খুন করেছে -- এটাই তার কাছে একটা ভয়ংকর ব্যাপার। পলাকে পাপমুক্ত করার কথাই সে ভেবেছিল। আমার কাছে যখন এসেছিল তখন কথাবার্তায় কিছু অসঙ্গতি পেয়ে আমি তাকে ধীরে ধীরে কবুল করতে বাধ্য করি। সে সবই স্বীকার করে। এমনকী পরদিন হাতুড়িটা অবধি আমাকে এনে দেয়।

বলেন কী? সেটা কোথায়?

আমার কাছেই আছে। হাতুড়িতে পলার হাতের ছাপ পাওয়া গেছে, রামলালের রক্তের চিহ্নও। আমি সব ফরেনসিকে পরীক্ষা করিয়ে ডকুমেন্টসহ রেখে দিয়েছি।

তবু কিছু করলেন না?

না। এগুলো দিয়েও খুনটা প্রমাণ হওয়ার নয়। রামলাল মারা গেছে এবং প্রসঙ্গটা খুঁচিয়ে তোলা অর্থহীন।

আপনি অত উদার লোক নন দাদা। আমার মনে হচ্ছে ডাল মে কুছ কালা হ্যায়।

হ্যায় তো হ্যায়, ছেড়ে দে।

এবার প্রেমের ব্যাপারটা খুলে বলুন।

বলেছি তো। গত কয়েক মাস ধরে পলা আর দুলাল দুজনে দুজনকে খুব আঁকড়ে ধরেছে। ওদের প্রেমটা প্রয়োজনভিত্তিক। পলার একজন শক্তসমর্থ অবলম্বন দরকার ছিল এ সময়ে। আর দুলালের ছন্নছাড়া জীবনেরও একটা নোঙর বাঁধা পড়বার সময় হয়েছে।

আপনি এই দেওর-বউদির সম্পর্ককে পছন্দ করছেন?

করেছিলাম। কিন্তু মনে হচ্ছে গেনু সেটা হতে দেবে না। তাই দুলালকে সাবধান করা দরকার।

ওরা আমার সঙ্গে এরকম করল কেন বলুন তো।

মানসিক চাপ থাকলে মানুষ অদ্ভুত আচরণ করে।

মানসিক চাপ কেন?

বাঃ, এই তোর বুদ্ধি। বাড়িতে সাড়ে তিনজন মানুষ। বাচ্চা ছেলেটাকে বাদ দিলে তিনজন অ্যাডাল্টই তো মানসিক চাপে ভুগছে।

কী রকম?

পলার কথাই ধর। স্বামীর মৃত্যু হয়েছে তার হাতে, সেই পাপবোধ, তার ওপর দেওরকে ভালোবেসে ফেলার অপরাধবোধ ছিঁড়ে খাচ্ছে ওকে। গেনু চোখের সামনে রামলালকে পলার হাতে খুন হতে দেখে অস্থিরতায় ভুগছে, তার ওপর পলা ঢলাচ্ছে দুলালের সঙ্গে, সেই রাগ। দুয়ে মিলে মাথার ঠিক নেই। দুলালের অবস্থাও ভালো নয়। মুক্ত জীবন ছেড়ে বন্ধ জীবনের দিকে এগোচ্ছে, বউদির সঙ্গে প্রেম--সেও স্বাভাবিক নেই। ওদের সকলেরই আচরণে তাই ওই অস্বাভাবিকতা। সবাইকে সন্দেহ করে। অচেনা লোক এলেই ভয় পায়।

একটা কথা জিজ্ঞেস করব দাদা?

বল।

হাতুড়িটা আপনি নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন কেন?

এমনিই। কোনো কারণ নেই।

একেবারেই নেই?

না।

আপনি একজন মস্ত ক্রিমিন্যাল উকিল, অপরাধবিজ্ঞান সম্পর্কেও কম জানেন না। আপনি অযৌক্তিক কোনো কাজ করবেন, এটা বিশ্বাস করা কঠিন। হাসছেন যে।

তোকেও যে সন্দেহবাতিকে পেল।

আর একটা কথা। পলাকে আপনি কতদিন চেনেন?

রামলালের বিয়ের পর থেকে।

রামলালের বিয়ে কবে হয়েছিল মনে আছে?

বছর দশেক। ন বছর কয়েক মাস।

বিয়েতে খুব ঘটা হয়েছিল বোধহয়?

তা হয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ রামলালের বিয়ে নিয়ে পড়লি কেন?

রামলালের বিয়ে নিয়ে নয়, আমি আপনাকে অ্যাসেস করার চেষ্টা করছি।

আমাকে। আমাকে অ্যাসেস করার কী আছে?

আপনি বিয়ে করেননি কেন দাদা?

ওরে বাবা। এ যে উলটোপালটা জেরা করে সাক্ষীর মুখ থেকে কথা আদায়ের চেষ্টা করছে।

ধরুন তাই। জবাবটা দিন।

এমনি করিনি। ইচ্ছে হয়নি।

হাতুড়িটা আপনি লুকিয়ে রেখেছেন কেন?

এমনি।

পলাকে আপনি কতদিন চেনেন?

বছর দশেক।

দুলালকে পলার কাছ থেকে সরিয়ে দিতে চাইছেন কেন?

দুলালকে গেনু খুনও করতে পারে।

আর কোনো কারণ নেই?

আর কী কারণ থাকবে?

বলব?

কী বলবি?

আপনি পাকে-প্রকারে আমাকে সবই বলে দিয়েছেন। অন্তত হিন্ট করেছেন। আমি তা থেকে থিওরিটা দাঁড় করাতে পারব।

সত্যি?

হ্যাঁ। বলব?

গো অ্যাহেড।

কিছু মনে করবেন না তো।

ঠিক বলতে পারলে মনে করব কেন?

তা হলে বলি। পলাকে আপনি বিয়ের অনেক আগে থেকেই চিনতেন। খুবসম্ভব, আপনাদের গভীর প্রেম ছিল। কোনো কারণে পলার সঙ্গে রামলালের বিয়ে হয়। আমার অনুমান, পলাকে বিয়েতে বাধ্য করা হয়েছিল। সেই কারণে বেচারা রামলালের সঙ্গে তার নিত্য খিটিমিটি। খুনটা ইচ্ছাকৃত না হলেও সেই রাগেরই পরিণতি। ঠিক আছে দাদা?

বলে যা।

কিন্তু পলার ওপর আপনার পরোক্ষ প্রভুত্ব বরাবরই ছিল।

তার মানে কি ব্যভিচার?

না। আমি যতদূর জানি আপনার ইগো ভীষণ প্রবল। আপনি অপরের এঁটো জিনিস ভোগ করার মানুষ নন। সেই জন্য পরকীয়া আপনার কাপ অফ টি নয়। কিন্তু প্রভুত্ব অন্য ব্যাপার।

প্রভুত্ব করেছি কি করে বুঝলি?

আপনি প্রভুত্ব ছাড়া মেয়েদের সঙ্গে অন্য সম্পর্ক মানেন না। ঠিক বলেছি?

বলে যা।

কাজেই পলার লাগাম বরাবর আপনার হাতে ছিল। তার বিবাহিত জীবনেও পরোক্ষে আপনার হুকুমেই পলা চলত। তাই ওদের সংসারে শান্তি ছিল না। শান্তি থাক তা আপনিও

চাননি। পলাকে বিয়ে করতে না পারলেও বরাবর সে আপনারই সম্পত্তি হয়ে থেকেছে। শারীরিকভাবে ভোগ করার চেয়ে এইটেই অনেক বেশি প্রয়োজন ছিল আপনার। ঠিক আছে?

চালিয়ে যা।

খুনের দায় থেকে পলাকে বাঁচিয়েছেন আপনিই। কিন্তু পুরোপুরি বাঁচাননি। মারাত্মক প্রমাণাদি নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন। পলার ওপর আপনার আয়রন হ্যান্ড। মুশকিল হল, দুলাল এসে পড়ায়। দুলাল রামলালের মতো ভেড়ুয়া নয়। সে ঝকঝকে পুরুষ। সে এবং পলা প্রেমে পড়ায় আপনার বিপদ দেখা দিয়েছে। দুলাল পলাকে বিয়ে করলে তাকে পুরোপুরি দখল করবে। আপনার জারিজুরি খাটবে না। ঠিক আছে?

বলে যা না।

আর সেইজন্যই আপনি গেনুকে খাড়া করেছেন। বলাই বাহুল্য গেনুও আপনার অনুগত এবং আজ্ঞাবহ। দুলালকে সরিয়ে না দিলে পলা নামক আপনার প্রিয় ক্রীতদাসীটিকে আপনি চিরকালের জন্য হারাবেন। তাই না?

আর কিছু?

হাতুড়িটা দিন দাদা।

কী করবি?

প্রমাণ নষ্ট করে দেব। কারণ পলা যদি একান্তই দুলালকে বিয়ে করে, তা হলেও তাকে আপনি শান্তিতে থাকতে দেবেন না। হাতুড়িটা তাকে ব্ল্যাকমেল করার কাজে লাগাবেন।

পাগল নাকি?

হাতুড়িটা দিন দাদা।

দিচ্ছি। তোকে একটা কথা বলব?

বলুন।

ওকালতিতে মন দে। খুব ভালো ক্রিমিন্যাল ল'ইয়ার হতে পারবি। আমার চেয়ে অনেক বড়ো।

সংলাপ

পেটে গ্যাস হয়, বুঝলেন! খুব গ্যাস হয়।

সেটা খুব টের পাচ্ছি। গত পঁয়তাল্লিশ মিনিটে শ দেড়েক ঢেকুর তুললেন।

দেড়শো! না মশাই, দুশোর বেশি। কী থেকে যে গ্যাস শালা জন্মায় সেটাই ধরতে পারছি না। সেই দুপুরে পাবদা মাছের ঝোল দিয়ে চাট্টি ভাত খেয়েছি সেটাও গিয়ে পেটের মধ্যে গ্যাস সিলিন্ডার হয়ে গেড়ে বসে আছে।

আজ পাবদা কিনেছিলেন বুঝি? ভাল পাবদার কাছে কিছু লাগে না।

যা বলেছেন। আমাদের বাজারে সুকুমার বলে যে মাছওলাটি আছে সেই একটু ভালো জিনিস রাখে। আর সবাই তো কাটা পোনা চিতিয়ে বসে আছে। নয়তো আড়-বোয়াল-তেলপিয়া।

কত করে নিল?

সেটা আর জিজ্ঞেস করবেন না। দামের কথা মুখে আনাই পাপ। অবিশ্বাস্য মশাই, অবিশ্বাস্য। তবে বাবার বয়স হয়েছে, কদিন ধরেই জিজ্ঞেস করছিলেন, হ্যাঁ রে, বাজারে পাবদা ওঠে না? তাই আনা।

আপনার বাবা তো পুলিশে ছিলেন, তাই না?

হ্যাঁ, অ্যাডিশ্যনাল ডি এস পি।

বড়ো পোস্ট।

হ্যাঁ, তা বড়ই।

বাড়িটা তো আপনার বাবারই করা, তাই না? দিব্যি বাড়ি।

হ্যাঁ, তা মন্দ নয়।

এ বাজারে কলকাতায় ওবাড়ি হেসেখেলে বিশ-পঁচিশ লাখ দাঁড়াবে।

হ্যাঁ, পঁচিশ লাখ অফার পেয়েছি।

অফার মানে? বাড়িটা বেচবেন নাকি?

আরে না মশাই, বাড়ি বেচে যাব কোথায়? তবে অনেকে আছে না, ভালো বাড়ি দেখলেই একটা দর হেঁকে বসে, সেরকমই ব্যাপার।

তবু ভালো। আমি ভাবলাম বেচার তোড়জোর চলছে বুঝি। আজকাল প্রোমোটারদের যা দৌরাত্ম্য!

সে তো বটেই। তবে ভাবছি বাবা যতদিন বেঁচে আছেন ততদিন তো আর বাড়ি প্রোমোটারকে দেওয়ার প্রশ্ন উঠছে না। কিন্তু বাবা মারা গেলেই সেই সাবেক সমস্যা। তিন ভাইয়ে ভাগাভাগি। আর বাড়িটাও এমন প্ল্যানে তৈরি যে ঠিক ভাগজোখ হয় না। তখন প্রোমোটারকে না দিয়ে বোধহয় উপায় থাকবে না।

সে তখন ভাববেন। আপনার এক ভাই পলিটিক্স করত না?

আমার বড়দা। ইলেকশনেও দাঁড়িয়েছিল।

আর মেজো জন?

ছোড়দা তো? তিনি ইনকাম ট্যাক্সের উকিল।

মেলা পয়সা, না?

দেদার পয়সা। সব মাড়োয়ারি ক্লায়েন্ট।

সব একসঙ্গেই আছেন তো!

পাগল নাকি? বড়দা গড়িয়ায় বাড়ি হাঁকিয়েছে সেই কবে। সেজদা ফ্ল্যাট কিনেছে ভবানীপুরে। আমিই পৈতৃক বাড়িতে পড়ে আছি।

আপনি তো ব্যাচেলর, আলাদা বাড়িতে থাকার দরকারটাই বা কী?

দরকার নেই ঠিকই। কিন্তু দায়দায়িত্ব ঘাড়ে এসে পড়ে কিনা। এই ধরুন, দাদারা সটকে পড়ল, কেউ বাবা-মায়ের দায়িত্ব নিল না। কিন্তু আমি ব্যাচেলার বলেই সটকাতে পারলুম না।

বয়স কত হল?

প্রায় চল্লিশ।

এমন কিছু বয়স নয় কিন্তু।

বলেন কি? আমার তো সবসময়ে মনে হয় বুড়ো হয়ে গেছি।

বিয়েটা হল না কেন?

কপালে নেই বলে। তিন ভাইয়ের মধ্যে আমিই অগামার্কা, ছাত্র ভাল ছিলুম না। চাকরিও ভালো জোটেনি।

একটা সিন্ধি কোম্পানিতে আছেন না আপনি?

আছি বটে, তবে না থাকার মতোই। অপমানজনক বেতন, হাড়ভাঙা খাটনি। কোনোরকমে গ্রাসাচ্ছাদন চলে যায় আর কী?

তাহলে সংসারটা কি বাবার টাকায় চলে?

চললে তো হতই। কিন্তু ওটা আমিই চালিয়ে নিচ্ছি। বেতনের টাকা সবটাই খরচ হয়ে যায়। তা যাক। আমার আছেই বা কে, খাবেই বা কে?

দাদারা কিছু দেয় না?

নাঃ। আমিও চাই না, তারাও দেয় না।

আপনি তো তাহলে স্কেপগোট, বলির পাঁঠা।

তা বলতে পারেন। তবে অত হিসেব-টিসেব করে কীই বা হবে? চলে তো যাচ্ছে। অসুখ-বিসুখ বা মোটা খরচের পাল্লায় পড়লে অবশ্য বিপদ ঘটবে।

বাবা কিছু দিতে পারেন তো। আফটার অল পুলিশের চাকরি করেছেন, হাতে ভালই থাকার কথা।

আছেও। কিন্তু দেন না। তাঁর সাফ কথা, এতদিন তোমাদের প্রতিপালন করেছি, এখন তোমাদের কর্তব্য মা-বাবার প্রতিপালন করা। এই নিয়েই দাদাদের সঙ্গে খিটিমিটি।

তারা পালিয়ে বাঁচলেন তো!

পালানোরই কথা। আজকাল তো পালানোই রেওয়াজ।

আপনিই পারলেন না তাহলে।

পালানোর কী আছে? ওরা বউ-বাচ্চার ভবিষ্যৎ ভেবে পালিয়েছে, আমার তো সে বালাই নেই।

বিয়েটা করলেন না কেন মশাই? লাভ অ্যাফেয়ার-ট্যাফেয়ার ছিল নাকি?

সত্যি কথা শুনতে চান?

আপনার যদি আপত্তি না থাকে।

লাভ অ্যাফেয়ার বললে বাড়াবাড়ি হবে। একটা মেয়ের প্রতি একটু সফটনেস ছিল। কিন্তু কথাটা তাকে মুখ ফুটে জানাতে পারিনি।

ওঃ, তাহলে আর লাভ অ্যাফেয়ার কী হল?

দুঃখের কথা হল, পরে আমার এক খুড়তুতো বোনের কাছে জানতে পারি যে, সেই মেয়েটারও নাকি আমার প্রতি সফটনেস ছিল। সেও কখনও বলতে পারেনি।

এঃ হেঃ, এ যে খুবই দুঃখের ব্যাপার। মেয়েটার কি বিয়ে হয়ে গেছে?

তা হবে না? সে এখন ছেলেপুলের মা, ঘোর সংসারী।

তার তো হিল্লে হয়ে গেল, আপনার তো হল না।

হিল্লে আর কী? জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া তো? সে কেটে যাবে।

মা বিয়ে দিতে চান না?

আগে চাইতেন। তবে দুই বউমার কাছ থেকে যা ব্যবহার পেয়েছেন তাতে বোধহয় আগ্রহ কমে গেছে। আর আমারও তো বয়স হল।

বয়সের চেয়েও বড়ো কথা হল, আপনি বুড়িয়ে যাচ্ছেন। এটা ভাল কথা নয়। ঠিক কত বয়স হল বলুন তো!

আটত্রিশ পূর্ণ হয়ে ঊনচল্লিশ চলছে।

সাহেবরা তো এই বয়সেই বিয়ে করে। চল্লিশে তাদের জীবন শুরু।

সাহেবরা সব ব্যাপারেই আমাদের চেয়ে এগিয়ে, তাদের সঙ্গে কি আমাদের তুলনা হয়।

আহা, তারাও তো রক্তমাংসের মানুষ। তাদেরও জরা-ব্যাধি আছে।

তা আছে। তবু তুলনা হয় না। জীবনকে ওরা ভোগ করতে জানে। আর আমরা জীবনটা কাটিয়ে দিই মাত্র।

বেড়াতে-টেড়াতে যান না?

না, বেড়ানোর যা খরচ। শখ-আহ্লাদ বলতে কিছুই নেই। আগে ময়দানে ফুটবল খেলা দেখতে যেতুম। এখন আর ইচ্ছে হয় না। সময় পেলে একটু-আধটু টি ভি দেখি। ব্যস। পাড়ার একটা ক্লাবে একটু যাতায়াত আছে। সামান্য সোশ্যাল ওয়ার্ক করি।

সোশ্যাল ওয়ার্ক করা তো খুব ভাল।

মন দিয়ে করলে তো ভালোই। আমি করি সময় কাটানোর জন্য।

কীরকম সোশ্যাল ওয়ার্ক? বন্যাত্রাণ, খরাত্রাণ ওসব নাকি?

সে সবও আছে। তাছাড়া সাক্ষরতা অভিযান, রক্তদান, অ্যান্টিসোশ্যালদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলা--এইসব আর কি।

ভালো ভালো। তবে অ্যান্টিসোশ্যালদের সঙ্গে লাগাটা আবার বিপজ্জনক। এটা তো ওদেরই যুগ কিনা। পুলিশ-প্রশাসন সবই ওদের হাতে।

যা বলেছেন। ভাল করে না বুঝেসুঝে আমিও বড্ড বিপদে পড়ে গেছি।

তাই নাকি? কী ব্যাপার?

টাপু বলে একটা ছেলে আছে আমাদের পাড়ায়। ভালো ছেলে। সে একজন অ্যান্টিসোশ্যালের পাল্লায় পড়ে বখে যাচ্ছিল। তার বাবা এসে ক্লাবে কেঁদে পড়ে। আমরাও ভালো করে না ভেবেটিন্তে অ্যাকশনে নেমে পড়ি। কিন্তু তার ফল দাঁড়ায় মারাত্মক। সেই অ্যান্টিসোশ্যালটা, তার নাম টিপু, দলবল নিয়ে এসে ক্লাবে বোমাবাজি করে গেল এই তো মাত্র দিন পনেরো আগে এক সন্ধেবেলা।

সর্বনাশ! কেউ মার্ডার হয়নি তো!

না। তবে দুজনের সপ্লিন্টার ইনজুরি হয়েছে।

বেঁচে গেছেন তাহলে।

না মশাই, বাঁচা অত সোজা নয়। শাসিয়ে গেছে সবাইকে দেখে নেবে।

ও বাবা, তাহলে তো আপনি বিপদের মধ্যেই আছেন।

তা আছি।

পুলিশ অ্যাকশন নেয়নি?

রুটিন মাফিক নিয়েছে। ওদের কেউ ভয় পায় না আজকাল।

সেই টাপু ছেলেটার কী অবস্থা?

পালিয়েছে।

তাকে ফেরাতে পারবেন মনে হয়?

বলতে পারি না। সবাইকে তো ফেরানো যায় না। সৎপথে থাকার আকর্ষণ আজকাল কমে যাচ্ছে। ইয়ং জেনারেশন আজকাল একটু গা গরম করতে চায় বোধহয়।

এ ব্যাপারে আপনাদের নেক্সট লাইন অফ অ্যাকশন কী?

সবাই ভয় পেয়ে গেছে। অ্যাকশনে কেউ যেতে চাইছে না।

তাহলে আপনারা রণে ভঙ্গ দিলেন বলুন।

একরকম তাই। বোমা-পিস্তলের সঙ্গে লড়াই করব কী করে?

তাই তো বলছিলুম মশাই, অ্যান্টিসোশালদের সঙ্গে লাগা বিপজ্জনক।

খুবই বিপজ্জনক। সেই ঘটনার পরে থেকে টেনশনে আমার গ্যাস আর অম্বল বেড়ে গেছে।

শুনেছি টেনশনে গ্যাস-অম্বল বাড়ে।

আমারও বেড়েছে। রাতে শুয়ে দুশো-আড়াইশো ঢেঁকুর ওঠে।

আর ওসবের মধ্যে যাবেন না।

ইচ্ছে করে কি যাই? একটা ঘটনা থেকে নানা ঘটনার ফ্যাঁকড়া বেরোয় যে!

কীরকম?

টাপুর মা এসে আমাকে ধরে পড়েছিল সেদিন। বলল, দ্যাখ বাবা, ওই টিপু আর ওর দলবল আমার ছেলেটাকে মেরে ফেলবে। তুই একটা কিছু কর। মহিলাকে কিছুতেই বোঝাতে পারি না যে, আমার মতো ভীতুকে দিয়ে কিছু হওয়ার নয়। অগত্যা বললাম, আচ্ছা চেষ্টা করব।

চেষ্টা করেননি তো?

ঠিক চেষ্টা করেছি বলা যায় না তবে টিপুর হদিস করতে শুরু করি।

ও বাবা! আপনি তো সাংঘাতিক লোক!

কী করব বলুন! ভদ্রমহিলা এমন কান্নাকাটি করলেন যে, কিছু না করেও থাকা যায় না।

হদিস পেলেন নাকি?

পেলুম। পাশেই পালপাড়ার একটা ছেলে খবর দিল, ওদের বাড়ির কাছে একটা রাং ঝালাইয়ের দোকানের পিছনে থাকে। হাইড আউট।

মশাই, শুনে যে আমারই বুক ধড়ফড় করছে।

আমারও করছিল।

যাননি তো?

না যাওয়ারই ইচ্ছে ছিল। কিন্তু ঘাড়ে ভূত চাপলে যা হয়।

গেলেন?

একটু রাতের দিকে গেলুম।

বলেন কী?

সেই তো বলছি। গ্রহের ফের। তবে কপাল ভাল যে টিপুকে বেশি খুঁজতে হয়নি। রাত এগারোটা হবে তখন, টিপু মাল খেয়ে ফেরার পথে পান-সিগারেটের দোকানে সিগারেট ধরাচ্ছিল।

কী করলেন?

গিয়ে বললুম, কাজটা ঠিক করছ না হে টিপু। এসব করা ভাল নয়।

এভাবে বললে কি কাজ হয়?

হল না তো! টিপু একটা খিস্তি করে কোমর থেকে একটা ছোরা বের করল। দোধার ছোরা। প্রকাণ্ড ফলাটা একেবারে ঝকঝক করছিল।

সর্বনাশ! পালালেন তো?

না। পালিয়ে যাব কোথায়? যাওয়ার কি জায়গা আছে?

তাহলে কী করলেন?

সে আর বলবেন না। আপনি কি দৈব মানেন?

খুব মানি মশাই, খুব মানি। এই যুগে বেঁচে থাকারই যা সমস্যা, দৈব না মেনে উপায় আছে?

ঠিক তাই, দৈব ছাড়া আর কী বলি বলুন। নিতান্তই টাপুর মায়ের চোখের জল সইতে না পেরে আহাম্মকের মতো টিপুকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সৎপথে ফেরাতে গিয়েছিলুম। কাজটা যে কত বড় ভুল হয়েছিল তা আগে বুঝতে পারিনি।

অতি খাঁটি কথা মশাই। কাজটা করা আপনার মোটেই ঠিক হয়নি। তারপর হলটা কী সেইটে বলুন।

আজ্ঞে কী যে হল তা কি আমি জানি। ছোরা দেখে আর টিপুর রক্ত-জলকরা চাউনিতে আমার তখন শরীরে স্তম্ভন। এত ভয় খেয়ে গেছি যে হাত-পা যেন কাঠ। ভগবানকে জীবনে ডাকিনি কখনও। আসলে ডাকার কথা মনেই থাকে না। সেই অবস্থাতেও মনে পড়ল না। টিপু ব্যাধের মতোই এগিয়ে এল। কিন্তু তারপর কী যে হয়ে গেল, কিছু মাথায় ঢুকল না।

কী হল?

সেইটেই তো বলবার চেষ্টা করছি। কিন্তু বর্ণনা দেওয়ার ভাষাটাও খুঁজে পাওয়া কঠিন। টিপু এগিয়ে এসে ছোরাটা বাগিয়ে ধরে পেটে বা বুকে ঢুকিয়ে দেয় আর কি। ওদের তো মায়া-দয়া নেই। কিন্তু কী যে হল, হঠাৎ টিপু যেন পায়ে পা জড়িয়ে, যেন নিজেকেই নিজে ল্যাং মেরে একটা পুঁটুলির মতো দলা পাকিয়ে পড়ে গেল মাটিতে। একেবারে আমার পায়ের গোড়ায়।

বলেন কী?

দৈব ছাড়া আর কী বলি বলুন। অবিশ্বাসেরও কিছু নেই। নিজের চোখে দেখা।

তারপর?

পড়ে গিয়ে টিপু কেমন যেন ছটফট করতে লাগল, গলায় গোঙানির আওয়াজ। মরতে মরতে বেঁচে গিয়ে আমি যেন কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিলুম। নড়তেও পারছি না। পানের দোকানিটা নেমে এসে টিপুর মুখে-চোখে জলের ঝাপটা দিতে দিতে বলছিল, এর শরীরে কি কিছু আছে? দিনরাত চুল্লু টানছে, পাতা খাচ্ছে। শালা এবার মরবে।

জোর বেঁচে গেছেন তাহলে! দৈব ছাড়া এ আর কিছু নয়।

ঠিকই বলেছেন। তবে কিনা ব্যাপারটা চাউর হল অন্যরকম।

সেটা আবার কী?

আর বলবেন না মশাই। লোকের মুখে মুখে রটে গেল আমিই নাকি টিপুকে মেরে পাট করে দিয়েছি। বুঝুন কাণ্ড। আমার গায়ে না আছে জোর, না আছে মনে সেই সাহস। কিন্তু লোকে তা বুঝলে তো! সে এমন কাণ্ড যে, টিপুর দলের একটা ছেলেও সাহস করে আমার কাছে এগিয়ে এল না। আমিও আর দাঁড়াইনি। তাড়াতাড়ি চলে এসেছি। কিন্তু পরদিন সকাল থেকেই আমাকে নিয়ে পাড়ায় হইহই। এমনকী থানার দারোগা পর্যন্ত এসে আমাকে হিরো বানিয়ে অভিনন্দন জানিয়ে গেলেন। বললেন, আপনার জন্যই টিপুকে ধরা গেল।

তারপর কী হল মশাই?

টাপু বাড়ি ফিরে এল। আমার পা জড়িয়ে ধরে বলল, আপনার জন্যই টিপুর খপ্পর থেকে ছাড়া পেয়েছি, নইলে ওরা আমাকে শেষ করে দিত।

তাহলে আপনি এখন হিরো?

কাকতালীয় ঘটনা আর কাকে বলে! যেভাবে আমাকে হিরো বানানো শুরু হয়েছিল তাতে আমার ভয় হল, এবার টিপুর দলের ছেলেরা না আমার ওপর চড়াও হয়। মানুষের প্রাণের দায়িত্ব কী বলুন। একটা গুলি বা ছুরি ছোরা, নিদেন একখানা আধলা ইটেও কাজ হয়ে যায়।

তা তো ঠিকই। তা সেরকম কিছু হয়েছিল নাকি?

না মশাই। বরং টিপুর এক সাকরেদ এসে দেখা করে মাপটাপ চেয়ে গেল। বলল, টিপুটা ইদানীং বড়ো বাড়াবাড়ি করছিল। আমরা তো তাকত দেখাতে লাইনে নামিনি দাদা, এসেছি রুজি-রোজগার করতে। আর টিপু হতে চায় রবিন হুড।

বাঃ, তাহলে তো আপনার আর কোনো সমস্যাই রইল না।

সমস্যা! সমস্যার কি শেষ আছে? একটা যায় তো আর একটা আসে।

সেটা আবার কীরকম?

আছে মশাই, আছে। হিরো হওয়ার হ্যাপাও বড়ো কম নয়। মিনি মাগনা হিরো বনে গেছি বটে, কিন্তু ফ্যাঁকড়াও আছে।

ঝেড়ে কাশুন না মশাই।

এই ধরুন, আগে কেউ পাড়ায় আমার দিকে ফিরেও চাইত না, আজকাল সবাই তাকায়, পথে বেরোলে জানালায়, বারান্দায় উঁকিঝুঁকি শুরু হয়, নাগরিক কমিটি থেকে আমাকে চেয়ারম্যান করার কথা উঠেছে। এইসব নানা উদ্ভট কাণ্ড। তারপরও গোদের ওপর বিষফোঁড়া আছে।

সেটা কী?

টাপুর মা এসে আমার মাকে ধরেছে, টাপুর দিদি--এই ধরুন বাইশ-তেইশ বছর বয়স হবে--তাকে ছোটো বউমা করে নিতে। বর্ণ-গোত্র সব নাকি ঠিকঠাক আছে। বলেন কী মশাই। একথা আগে বলতে হয়। এ তো দারুণ খবর!

না মশাই, না। মোটেই ভালো খবর নয়। বয়সের তফাতটা লক্ষ করেছেন? তার ওপর আমি তো একরকম বুড়োই। একা-বোকা থেকে থেকে অভ্যাস হয়ে গেছে। এখন কি আর ঝুট ঝামেলা ভালো লাগে?

রিফিউজ করলেন নাকি?

হ্যাঁ, খুব কঠোরভাবেই রিফিউজ করলাম। টাপুর মাকে বললাম, আপনারা মোহের বশে এ প্রস্তাব করেছেন। ভালো করে ভেবে দেখবেন কাজটা ঠিক হবে না।

আপনার চরিত্রটি বেশ দৃঢ়।

না মশাই, একেবারেই না। বরং আমি অতিশয় দুর্বলচিত্ত। ভেবে দেখলাম দুর্বলচিত্ত লোকদের দাম্পত্য জীবনে না যাওয়াই ভাল। তাছাড়া ওরা আমড়াকে আম ভেবে বসে আছে কিনা। আমি তো আসলে হিরো নই, জিরো।

তাহলে ব্যাপারটা ওখানেই মিটে গেল নাকি?

মিটলে তো ল্যাঠা চুকেই যেত।

মেটেনি তাহলে?

না, বললাম না সব ঘটনা থেকেই ফ্যাঁকড়া বেরোয়।

তা এখানে আবার ফ্যাঁকড়া কী বেরোল?

টাপুর দিদি নন্দনাই হল ফ্যাঁকড়া। একদিন সে সোজা আমার ঘরে এসে হাজির। দুই চোখ জলে ভরা, ঠোঁট কাঁপছে।

বাস রে, এ যে উত্তম-সুচিত্রা।

বাইরে থেকে এরকম মনে হয়। আমার যে তখন কী অবস্থা তা বোঝাতে পারব না।

মেয়েটা দেখতে কেমন মশাই?

ভালোই। রং তেমন ফর্সা নয়, কিন্তু মুখে-চোখে শ্রী আছে। পাড়ায় ভালো মেয়ে বলে নামও আছে।

তাহলে পিছোচ্ছেন কেন?

ওই যে বললাম, বুড়ো হয়ে গেছি। এখন কি কেঁচেগণ্ডুষ করা যায়?

তা মেয়েটা বলল কী?

তেমন যে কিছু বলল তা নয়। গলা কাঁপছিল। শুধু বলল, আমি কি খারাপ? তবে কেন আপনি--ব্যস ওই পর্যন্তই। বাক্যটা শেষ অবধি করতে পারেনি।

তা আপনি কী করলেন?

মেয়েদের সঙ্গে কথাবার্তা তো বিশেষ বলিনি কখনও। ঘাবড়ে গিয়েছিলুম।

কিছুই বললেন না?

তেমন কিছু বলতে পেরেছি বলে মনে হয় না। একটু আমতা আমতা করে বললুম, তুমি তো ভালো মেয়ে। তবে কেন আমাকে--ব্যস, বাক্যটা আমিও শেষ করতে পারিনি।

ওঃ, আপনার পেটে পেটে এত? এরকম মাখো-মাখো ব্যাপারখানা এতক্ষণ চেপে রেখেছিলেন? আপনি তো খুনি লোক মশাই।

কী যে বলেন। মাখো-মাখো ব্যাপার মোটেই নয়। নন্দনা এসে ও কথা বলে যাওয়ার পর থেকে আমার ঘুম গেছে, খাওয়া গেছে, দুশ্চিন্তায় আধমরা অবস্থা। আর পেটে ফাঁপা ভাব।

কী যে অসোয়াস্তি।

গ্যাসের মেলা ওষুধ আছে মশাই। ওর জন্য চিন্তা নেই। আগে বলুন, সিদ্ধান্তটা কী নিলেন?

ওই যে বললুম, গ্যাসে এমন কাহিল হয়ে পড়েছি যে আর ওসব নিয়ে এগোতে ভরসা হচ্ছে না। তবে মা ইদানীং দেখছি আদাজল খেয়ে লেগেছে। বড্ড বিপদ যাচ্ছে মশাই।

কীসের বিপদ?

একটা মিথ্যে জিনিসকে সবাই মিলে সত্যি করে তুলছে, এটা ভালো হচ্ছে না।

মিথ্যে বলে মনে হচ্ছে কেন।

মিথ্যে নয়? গুণ্ডাটা নিজেই কেতরে পড়ল আর হিরো বনলাম আমি!

আমার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে, ঘটনাটা তত মিথ্যে নয়। আপনি চেপে যাচ্ছেন।

বলেন কী। আমার কি গুণ্ডার সঙ্গে লড়ার ক্ষমতা আছে?

কিছু বলা যায় না। কখনও কখনও কাপুরুষও ভয়ংকর হয়ে ওঠে। আর আপনি সত্যিকারের কাপুরুষ হলে মাঝরাত্তিরে গিয়ে টিপুর ডেরায় হানা দিতেন না।

ওই যে বললুম কাজটা আহাম্মকি হয়েছিল।

আপনাকে তত আহাম্মক বলে মনে হচ্ছে না। ঘটনাটা বলেই ফেলুন না। আমি তো আর পুলিশের লোক নই।

কী যে বলেন!

বলুন না মশাই, লজ্জা পাচ্ছেন কেন?

আসলে কী জানেন ঘটনাটার সময়ে আমি এমন বিভ্রান্ত অবস্থায় ছিলাম যে সত্যিকারের কী ঘটেছিল তা আমি নিজেও জানি না।

এই তো এবার মাল বেরোচ্ছে। টিপুর মতো গুণ্ডা আপনাকে ছোরা মারতে এসে হঠাৎ কনভালশন হয়ে ঢলে পড়বে এমন ঘটনা ঠিক বিশ্বাসযোগ্য নয়।

ওইটেই মুশকিল। আমার যেটুকু মনে পড়ছে তাই বলেছি। বাকিটা আমার স্মৃতিতে নেই।

তাহলে মশাই, বলতেই হবে, আপনি টিপুর চেয়েও অনেক বেশি ডেনজারাস লোক।

ছিঃ ছিঃ, কী যে বলেন। জীবনে আমি মারপিট করিনি।

প্রয়োজন পড়েনি বলে করেননি। কিন্তু এলিমেন্টটা আপনার ভিতরে ছিলই।

আপনি কি বলতে চান আমার ভিতরে একজন অচেনা আমি আছে?

সকলের ভিতরেই থাকে।

কী জানি মশাই। লোকে বলছেও বটে যে, আমার বিবরণ বিশ্বাসযোগ্য নয়। অনেকেই নাকি দেখেছে আমি টিপুকে পেটাচ্ছি। আর হাসপাতালের ডাক্তাররাও টিপুর ইনজুরির রিপোর্ট দিয়েছে। কিন্তু আমি ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনি যা বলছেন তা যদি সত্যি হয়ে থাকে তবে তো চিন্তার কথা।

কিসের চিন্তা?

এই যে আমার ভিতরে একজন হিংস্র, নিষ্ঠুর, অ্যাগ্রেসিভ লোক লুকিয়ে রয়েছে এ কি চিন্তার কথা নয়। বেশ ভয়েরই ব্যাপার।

তা ভয় পেলে একজন পাহারাদার বসালেই তো হয়।

পাহারাদার? সে আবার কী?

সবচেয়ে ভাল পাহারাদার তো নন্দনাই হতে পারে।

যাঃ, কী যে বলেন। আপনি কি মনে করেন বিয়ে মানুষের কোনো উপকার করে? আমার তো ও কথা ভাবলে পেটে গ্যাস বেড়ে যায়। দেখলেন না কতকগুলো ঢেকুর তুললাম! আজকাল বড্ড বেড়ে গেছে।

আচ্ছা, টিপুর অবস্থা এখন কীরকম?

যতদূর জানি, পুলিশ-পাহারায় হাসপাতালে রাখা হয়েছে তাকে। খুব সিরিয়াস কিছু নয়।

আচ্ছা মশাই টিপুর কি নন্দনার ওপরেও একটা নজর ছিল?

কী করে বুঝলেন মশাই, জানি না। কিন্তু কথাটা মিথ্যে নয়। ছিল।

বুঝতে বেশি মাথা ঘামাতে হয়নি। টাপুকে হাত করার পিছনে হয়তো ওটাই ছিল আসল উদ্দেশ্য।

তাই হবে। নন্দনার মাও ঠারেঠোরে কথাটা আমাকে জানিয়েছেন। নন্দনা নাকি টিপুর ভয়ে কিছুদিন মামার বাড়িতে গিয়ে পালিয়ে ছিল।

তাহলে আপনার কি এখন উচিত নয়, নন্দনাকে এই ভয়ের হাত থেকে মুক্তি দেওয়া?

আমার কী গরজ?

গরজ আছে বইকি। অসহায় অবলা নারীকে রক্ষা করাই তো পুরুষের ধর্ম, টিপু সেরে উঠলে যে নন্দনার আবার বিপদ!

তা নন্দনা আর কাউকে বিয়ে করলেই তো পারে।

সেটা দ্বিচারণা হবে না? তার যে আপনাকে পছন্দ।

দূর! আমি বুড়ো, গ্যাসের রুগি, কম বেতনের অপদার্থ একটা লোক। আমার মধ্যে কী দেখল বলুন তো?

সেটা নন্দনাকে জিজ্ঞেস করছেন না কেন?

করে কী লাভ? যা বলবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। প্রেম তো একটা ইমোশন্যাল একসেস। ওর কোনো জোরালো ভিত নেই।

আপনার কপালে কী আছে জানেন?

কী?

বয়স হলে বিড়বিড় করে কথাকওয়া, উদ্ভট উদ্ভট সব কাণ্ড করা, বাতিক আর বায়ুগ্রস্ত হয়ে পড়া--যা ব্যাচেলারদের হয় আর কি। তাছাড়া দাদারা ভুজুং ভাজুং দিয়ে বাড়ি দখল করবে, হাতের-পাতের যা কিছু হাতিয়ে নেবে। আরও বুড়ো হলে আপনাকে গিয়ে উঠতে

হবে বৃদ্ধাশ্রমে । বউ যেমনই হোক, ঝগড়াঝাঁটি করুক মুখনাড়া দিক, কিন্তু তবু সে পুরুষকে ঠিক সামলে রাখে।

হুম।

কথাটা ঠিক বলেছি?

খুব বেঠিকও বলেননি। ব্যাচেলারদের ওরকমই হয়ে থাকে।

তাহলে?

একটু ভাবি।

ভাবুন কিন্তু বেশি নয়। ভাবতে সময় নিলে হাউসফুল হয়ে যাবে। নন্দনাই কি পড়ে থাকবে ভেবেছেন! আগেরটির বেলায় যা হয়েছিল এর বেলায়ও তাই হবে।

আপনি বড্ড ভয় দেখান তো!

ভয় দেখাচ্ছি না, সৎ পরামর্শ দিচ্ছি। আজকের দিনটা ভাবুন। ভেবে কাল সকালেই নন্দনাকে জানিয়ে দিন যে আপনি তাকেই বিয়ে করবেন।

কাল সকালেই?

কাল সকালেই। কিংবা আজ রাতেই। কিংবা এক্ষুনি গিয়ে চোখ বুজে বলে ফেলুন গে। যান।

আচ্ছা, তাহলে চলি মশাই।

হ্যাঁ হ্যাঁ, একটু পা চালিয়েই যান।

রাজার বাগানে

অতসী নামে যে মেয়েটিকে আমি ভালবাসতে শুরু করেছিলাম--কী কপাল--গত আষাঢ়ে তার বিয়ে হয়ে গেল। আমি যে শহরে থাকি সেটা যথেষ্ট বড়ো নয়। আমোদ ফুর্তির জায়গা খুব কম, এবং দুঃখ-টুঃখ ভুলতে হলে কলকাতার লোকেরা যেমন ইচ্ছে করলে সপ্তাহে একুশটা সিনেমা দেখতে পারে, কিংবা ময়দানে মনোহর দাস তড়াগের পাশের মাঠে মেয়েছেলেদের বাস্কেটবল বা হকি দেখে সময় কাটাতে পারে, বা চিড়িয়াখানায় এবং যাদুঘর দেখে গঙ্গার ঘাটে ঘুরে বা ভালো রেস্টুরেন্টে (পয়সা থাকলে) দেদার খেয়ে, প্রচুর মদ্যপান করে বা এই রকম হাজারটা ব্যাপারে নাক গলিয়ে নাক ঝাড়ার মতোই হৃদয়ের দুঃখ শ্লেষ্মার মতো ঝেড়ে ফেলতে পারে--দুঃখের বিষয়--মফস্বল এই জেলা শহরে সেটি হওয়ার নয়। দুঃখটা তাই বেশ টুঁটি টিপে ধরল আমাকে। এখানে প্রকাশ্য জায়গায় কোনো বয়সের মেয়ের সঙ্গে দুটো কথা বললে ঢি ঢি পড়ে যায়, প্রেম করা মানে কতটা ঝুঁকি নেওয়া তা পরিমাপ করার নয়। অতসীর সঙ্গেও বস্তুত আমার সেরকম মেলামেশা ছিল না, এবং বলতে কী তাকে ভালোবাসার কথা বলার কোনো সুযোগ আমার কখনো হয়নি। আমি যে তাকে ভালোবাসতাম--এ কথাটা তাকে জানানো হয়নি বটে, কিন্তু তাতে ভালোবাসা কিন্তু মিথ্যে হয়ে যায় না এবং গত আষাঢ়ের পর আমার জীবন দুর্বল কুলির পিঠে অত্যন্ত ভারী গাঁটরির মতো হয়ে আছে।

অতসীর বিয়ে হয়ে যাওয়ার আগের দিন পর্যন্ত আমার বিশ্বাস ছিল একটা কিছু ঘটবেই। নিশ্চিত বিয়েটি অনুষ্ঠিত হবে না। কী ঘটবে তার স্পষ্ট কোনো ধারণা না থাকলেও আমি একটি দৈব ঘটনার অপেক্ষা করছিলাম। এবং অন্ধকার ঘরে বসে প্রচণ্ড মানসিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে অতসীর সঙ্গে একটা টেলিপ্যাথি করার চেষ্টাও করা গিয়েছিল। তার অবশ্য দরকার ছিল না। অতসীর বাড়িতে টেলিফোন ছিল, ইচ্ছে করলে পোস্ট অফিস বা কোনো

সরকারি দপ্তরে গিয়ে অতসীকে টেলিফোন করা যেত। কিন্তু তার একটা অসুবিধা। অতসীকে আমি কী বলব? বললেও অবশ্যই অতসী বুঝত না। প্রেমিক পুরুষের কথাবার্তা যেমন অসংলগ্ন হয়ে থাকে, পুরুষের প্রিয় নারীও তেমনি বুদ্ধিমত্তায় এবং ইঙ্গিত গ্রহণে খাটো হয়ে থাকে--এ আমার অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য। তদুপরি অতসীর সঙ্গে সরাসরি কথা বলার পক্ষে আমার প্রেমিক হৃদয় তেমন শক্তসবল ছিল না। কিন্তু টেলিপ্যাথিতে ও-সব ঝামেলা নেই। তদুপরি আধুনিক যন্ত্রপাতির (অর্থাৎ টেলিফোন) চেয়ে আমি এই মানসিক এবং দৈব শক্তিগুলির ওপরেই বেশি আস্থাশীল। দুর্বলপ্রকৃতির লোকেদের এটাই বৈশিষ্ট্য।

টেলিপ্যাথির যোগটা খুব সুচারুভাবেই হল। আমি ডাকলাম--

অতসী।

উমম।

আমি অমর।

জানি।

কী করে জানলে?

আপনার গলা চিনি যে!

কী করে চিনলে?

চেনা যায়। আপনি বুঝবেন না।

তোমাকে আমি একটা কথা বলব।

জানি তো?

জানো?

হুঁ-উ।

কী কথা?

আপনি আমাকে ভালোবাসেন।

না, কথাটা ঠিক তা নয়।

নয়? অতসী অবাক হল।

আমি সামান্য হেসে দৃঢ়স্বরে বললাম, না।

তবে?

এ ঠিক ভালোবাসার কথা নয়।

তবে কী?

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, আমি আসলে তোমাকে বলতে চাইছিলাম যে ভালোবাসা এক ধরনের নীরবতা।

ও

বুঝেছো?

বুঝবো না কেন? এ-সব কথা সবাই বোঝে।

তুমিও কোনোদিন আমাকে কিছু বলোনি।

অতসী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, বলেছি।

কী বলেছো?

নীরবতা, আপনি বোঝেননি?

ইত্যাদি। এইভাবেই আমার টেলিপ্যাথির যোগাযোগটা খুবই সফল হয়েছিল। সংলাপের শেষ দিকে আমরা পরস্পরকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে পরস্পর তা গ্রহণ করেছিলাম।

তবু আষাঢ় মাসে বাংলাদেশের হাজার হাজার বিয়ের মধ্যে আমার জীবনে সবচেয়ে মারাত্মক বিয়েটি বিনা বাধায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। আষাঢ় মাসে কত ঝড়জল হয়, পৃথিবী ভেসে যায়, মানুষের কত জরুরি কাজ আটকে থাকে, কিন্তু অতসীর বিয়ের দিনটি ছিল নির্মেঘ, রাতটি ছিল জ্যোৎস্নাময়ী। সেই রাতে কুচবিহার জেলা-শহরের নির্জন সাগরদিঘির পাড়ে বসে আমার প্রথম হৃদরোগের লক্ষণ দেখা দেয়, মাটিতে শুয়ে থাকার দরুণ শরীর

রসস্থ হয়ে পরবর্তীকালে স্থায়ী অ্যাজমা রোগটির বীজটিও আমি সেই রাতে আহরণ করি। অসফল প্রেম কত মারাত্মক!

অসফল জীবনও তাই। অমর বসু আমার নাম। আমরা বংশানুক্রমেই অসফল। যতদূর জানি আমার ঠাকুরদা, আমার বাবা এবং আমি--কেউ-ই জীবনে কিছু করতে পারিনি, একমাত্র বংশরক্ষা করা ছাড়া। আমার দ্বারা সেই বংশরক্ষা ব্যাপারটিও ঘটবে কি না কে জানে! আমি দেখতে সুন্দর নই, লেখাপড়ায় সাধারণ, বি-এ পাস, খেলাধুলা, গানবাজনা, সাহিত্য-টাহিত্য বা ছবিআঁকা কি অভিনয় করা--কিছুই পারি না। বাবার সম্পত্তি নেই, নিজের আড়াইশ টাকা মাইনের চাকরি আছে মাত্র। উচ্চাশাসম্পন্ন হওয়ার কোনো কারণ আমার নেই। তবু কেন যে কুচবিহারের সবচেয়ে সফল উকিল বিজনবিহারী দত্তের মেয়ে অতসী দত্তের প্রেমে আমি পড়েছিলাম! কিন্তু আমার এই ব্যর্থতা নিয়ে কেউ কখনো মন্তব্য করেনি, বন্ধুরা ঠাট্টা করেনি, শুভাকাঙক্ষীরা সান্ত্বনা দেয়নি। তার কারণ, আমার প্রেমের ব্যাপারটা আমার প্রেমিকার মতোই আর কেউ-ও টের পায়নি কখনো।

কিন্তু হৃদরোগ এবং হাঁপানি গোপন থাকার নয়। কুচবিহার শহরের একটেরে এক জায়গায় চমৎকার একটি বাগান আছে। রাজার আমলের এই পুরোনো বাগানটির মতো সুন্দর এবং নির্জন স্থান উত্তর বাংলাতেও বোধহয় বেশি নেই। গাছপালা, ফুলটুল, পাখি-টাখি এবং কীটপতঙ্গ আমার বড়ো ভালো লাগে। কুচবিহারে একসময়ে খুব জনপ্রিয় ছিল দু'আনা দামের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সিঙাড়া। অফিস থেকে বেরিয়ে ওই সিঙাড়া গোটা দুই খেয়ে এক কাপ চা খেয়ে ওই বাগানে গিয়ে বসে থাকতাম। রোজ সিঙাড়া এবং চা খাওয়ার ফলে অম্বল হত, গ্যাস ঠেলা দিত বুকে। তখন হৃদরোগটির টের পেতাম। অতসীর কথা মনে পড়ত। আমি বসে বসে আমার অসফল জীবন নিয়ে মনে মনে একটা অত্যন্ত সফল উপন্যাস লিখতে শুরু করতাম। লেখা হয়নি যদিও।

বাড়ি থেকে সে সময় আমার বিয়ের চেষ্টা হচ্ছিল। বয়স তেত্রিশ, চেষ্টা না হবেই বা কেন? কিন্তু সে সময়ে আমি টের পেলাম যদিও অতসীর সঙ্গে আমার প্রেমের ঘটনার কথা কেউ কখনো টের পায়নি, তবু আমার যে হাঁপানি আছে এটা কুচবিহার জেলার প্রায় সব

পাত্রীপক্ষই জেনে গেছে। বিয়ের কথা এগোয়। মেয়ে দেখাদেখিও হয়, কিন্তু সব শেষে পাত্রীপক্ষ কী করে যেন আমার হাঁপানির কথা টের পেয়ে পিছিয়ে যায়। হৃদরোগের ব্যাপারটাও হয়তো জানাজানি হয়ে গেছে। আট-দশবার এইভাবে বিয়ের সম্বন্ধ ভণ্ডুল হয়ে গেল। আমি অফিসের পর যথারীতি সিঙাড়া এবং চা খাই, বাগানে গিয়ে বসি, অম্বল আর গ্যাস থেকে বুকে হৃদরোগ জেগে ওঠে, হাঁপানি দেখা দেয়, অতসীর কথা মনে পড়ে। আমার জীবন যে কত অসফল সেই কথা ভাবি।

অতসীর যখন বিয়ে হয়ে যায় তখন আমার বয়স কুড়ি কি একুশ। মানুষ ওই বয়সে জীবন শুরু করে, আমি শেষ করেছি। অতসীর বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর থেকে টানা বারো বছর আমি প্রায় প্রতিদিন বিকেলে গিয়ে ওই বাগানে বসে থেকেছি, আর বুড়ো হয়েছি অল্প অল্প করে।

সেই বাগানে ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা আসত। তাদের সঙ্গে ছিল আমার ভাব। সাত কি আট বছরের একটি মেয়ে ছিল রুমি, ভারি ছিচকাঁদুনে মেয়ে। একটু রোগাভোগা ছিল, শ্যামলা রং। তার দাদু বসত বেঞ্চে, আমারই পাশে। নাতনি খেলে বেড়াত খেলুড়িদের সঙ্গে। দাদু বাজারদর নিয়ে শুরু করতেন, গান্ধী-নেহেরু-সুভাষ বোসের কথা এসে পড়ত, ধর্মটর্মের কথাও উঠত। মাঝেমধ্যে রুমি কাঁদতে কাঁদতে এসে নালিশ করত--ওরা আমাকে খেলায় নিচ্ছে না। কিংবা বলত--ধীরু ওর চাকাটা আমাকে চালাতে দিচ্ছে না। দাদু বিব্রত হতেন। আমি রুমিকে একটা গল্প বলে ভোলাতাম--একটা লোক, বুঝলে, একটা লোক একবার জ্যোৎস্না রাতে বাড়ি ফিরতে ফিরতে চাঁদ দেখে খুব লোভ করল, তারপর দিল এক লাফ, চাঁদটা ধরার জন্য। লাফ দিল তো দিলই, কেবলই শূন্যে উঠে যেতে লাগল, কিছুতেই আর মাটিতে নেমে আসতে পারে না...

মেয়েরা যে কত তাড়াতাড়ি বাড়ে? ওই গল্প শুনতে শুনতেই রুমি বালিকা থেকে কিশোরী হয়ে গেল। সেই বাগানে তার খেলুড়ি বন্ধুরা আর আসত না, দাদুরও ধরল কালব্যামো, বৃদ্ধবয়সের আদি-ব্যাধি। কিশোরী মেয়েটি তবু মাঝে মাঝে আসত। আমি তখন বাগানে নতুন আসা বাচ্চাদের সঙ্গে ভিড়ে গেছি, নতুন বুড়োরা দাদু হয়ে আসছে,

আবার ভাব জমছে, গান্ধী-নেহেরু নেই তো নতুন নেতারা এসে গেছে, ধর্মের কথাও পুরোনো হয় না। আমার সময় কেটে যায়। রুমি ইস্কুলের সবচেয়ে উপরের ক্লাসে উঠে গেছে প্রায়। আমি তখন হোমিওপাথির চর্চা করি, ফলও হয়। রুমি আসে তার দাদুর জন্য ওষুধের কথা বলতে। আমি রোগলক্ষণ মিলিয়ে বসে বসে ওষুধের কথা ভাবি, তারপর বাড়ি ফিরে যাই। পরদিন ওষুধ নিয়ে আসি। রুমির দাদুর আমার ওষুধে দারুণ বিশ্বাস, বলেন--এত অল্পবয়সে এত প্রবীণ মাথা যার, হোমিওপ্যাথি তার না হয়েই যায় না। বুড়ো আর বাচ্চাদের মহলে তখন আমার হোমিওপ্যাথির বেশ নামডাক। কুচবিহারে এতকাল যে-সব হোমিওপ্যাথ করে খাচ্ছিল তারা আমার নিন্দে করতে লাগল। বুঝলাম, এই একটা ব্যাপারে আমার খানিকটা সফলতা আসছে।

অতসীর কথা আমি কখনো কাউকে বলিনি। আমার হৃদরোগ, হাঁপানি, হোমিওপ্যাথি এবং বিয়ে-না হওয়ার মূলে যে একটি প্রেম আছে তা কেউ কোনোদিন টেরও পেল না। জেলাশহর কুচবিহারের রাজার বাগানে বসে আমি বহু বুড়ো আর বাচ্চার হরেক কথা শুনেছি বারো বছর ধরে। কিন্তু কখনো কাউকে নিজের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটির কথা বলতে পারিনি। তা কেবল আধখানা রূপকথার গল্পের মতো চাঁদের জন্য লাফিয়ে-ওঠা শূন্যে-ঝুলে-থাকা একটা মানুষের ভিতর দিয়ে ভাঙা রেকর্ডের মতো বারবার কয়েকজন শুনেছে। রুমি একজন।

দাদু মারা গেলে রুমি খুব কাঁদছিল। ভীষণ। এই কান্না থামানো যায় এমন ওষুধ হোমিওপ্যাথিতে নেই। শ্মশানে যাওয়ার সময়ে তাকে কিছুতেই দাদুর বুক থেকে ছাড়িয়ে আনা যাচ্ছিল না। বালিকা বয়সে যে গল্পটা শুনে রুমি চুপ করত সেই গল্পটা শুনলেও এ কান্না থামার নয়। বুঝে আমি তার দাদুর বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে রুমিকে বললাম--রাজার বাগানে যেও। সেখানে দাদু আসবেন রোজ যেমন আসতেন। রাজার বাগানে কোনো ফুলই ঝরে যায় না, ঘুমিয়ে থাকে, আবার ফোটে। কিছুই হারায় না, সব থাকে।

এ হল তত্ত্বকথা, একটু ঘুরিয়ে বলা। তবু রুমি দাদুকে যেতে দিল শেষ পর্যন্ত। শব বহন করতে করতে ভাবলাম--হায়, মানুষ কত মিথ্যা ও সুন্দর কথা বলে। কথা ভালো, না

নীরবতা?

পরদিন রাজার বাগানে বসে দেখি, ফুল ফুটেছে, ছেলেরা খেলা করছে। বুড়োরা জায়গা নিয়েছে বেঞ্চে, গাছের তলায়, জলের ধারে। জেলাশহরে এখন আর প্রকাশ্যে প্রেম নিন্দনীয় নয়। যুবক-যুবতীরা আসে। দেখি। মনে মনে ভাবি হোমিওপ্যাথির নানা রোগলক্ষণের কথা, নিজের হাঁপানি আর হৃদরোগের কথা, অতসীর কথা। রুমি এসে পাশটিতে বসে। দাদুকে বড় ভালোবাসত। মায়া হয়। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলি, আমার জীবনের কথা তোমাকে একদিন বলব রুমি। একটা ব্যর্থতার ইতিহাস।

রুমি চেয়ে থাকে।

বলি-বলি করেও বলা হয় না। গাছপালার কাছে, শূন্যতার কাছে, নিঃসঙ্গতার কাছেই মাত্র যে কথা বলা যায় তা বাক্যময় মানুষের কাছে বলি কী করে? কিন্তু বলা দরকার। জীবন ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই বলা দরকার। কিন্তু কিছুতেই ঠিক করতে পারি না --বাক্য ভাল, না নীরবতা?

মেয়েরা যে কত তাড়াতাড়ি বড়ো হয়। রুমিকে মাঝে মাঝে নিজের ব্যর্থতার কথা নতুন একটা রূপকথার ভিতর দিয়ে বলতে শুরু করেছিলাম, একটা লোকের ছিল একটা পক্ষীরাজ, বুঝলে, কেবল ছিল একটা পক্ষীরাজ। আর কিছুই তার ছিল না। কেবল পক্ষীরাজে ভর করে উঠে যেতে পারত আকাশে। যেদিন খিদে পেত খুব, খাবার জুটত না, সেদিনই সে শোঁ শোঁ করে পক্ষীরাজ ওড়াতো আকাশে...

এ-গল্পও শেষ হল না। রুমি শাড়ি ধরল। যুবতী হয়ে গেল একদিন। রাজার বাগানের দুটি একটি বুড়োও গেল মরে। কয়েকটি বালক-বালিকা হল কিশোর-কিশোরী। হোমিওপ্যাথিতে আমার হাতযশ বেড়ে যেতে লাগল। রুমি আর গল্প শুনতে চায় না। ধীর গম্ভীর, লাবণ্যময়ী মেয়েটি আসে, ঘুরে বেড়ায় ধীর পায়ে, দূর থেকে আমার দিকে চেয়ে দেখে, কখনো-সখনো একটু হাসে। বুকের ভিতরটা ধক করে ওঠে। খুব বেশি বুড়ো হয়ে যাইনি আমি। বয়স মাত্র তেত্রিশ। রুমির চেয়ে আমি মোটে বারো-তেরো বছরের বড়ো। মনে মনে ভাবি--ওকে বলব? না কি নীরবতাই ভালো? বুকে হাত রেখে হৃদরোগ টের পাই।

শ্বাসে হাঁপানির টান--ক্রনিক রোগ আমার মতো দুঁদে হোমিওপ্যাথের কাছেও হার মানেনি। আছে থাক। একটা জীবন কেটে যাবে।

রুমি তবু আসে রাজার বাগানে। চেয়ে থাকে। হাসে । ভয় পাই। চোখ সরিয়ে নিই। রুমি একদিন কাছে এসে বলে, কোনো গল্পই শেষ হল না আপনার। এবার একটা গল্প বলুন যার শেষ আছে।

অনেকক্ষণ ভেবে বলি, সেই যে চাঁদের জন্য লাফ-দেওয়া লোকটা সে লোকটা কোনোদিন চাঁদে পৌঁছোয়নি। মাটিতেও নামেনি।

জানি তো।

জানো?

হুঁ। সে তো আপনি।

চমকে যাই। ভেবেচিন্তে বলি, মানুষ তার নিজের গল্পের শেষ তো করতে পারে না।

রুমি বোঝে। মাথা নাড়ে। তারপর উঠে যায়।

ক্রমে আমার চারধারে বাচ্চাদের ভীড় জমে দিনকে দিন। বুড়োরা কাছে এসে বসে থাকে। বাড়িতে দুবেলা রুগির হাঁটাহাঁটি। বড়ো ব্যস্ত সময় যায় আজকাল। রুমি ঠিকই আসে রাজার বাগানে। রোজ। দূর থেকে দেখে। মাথা নাড়ে। হাসে।

বাক্য নয়। নীরবতাও নয়। সংকেত পৌঁছোয়। মাথানাড়ি! হাসি অতসীর কথা আজকাল মনে পড়ে না। হাঁপানির টান কমে গেছে অনেক।

হৃদরোগ আর টের পাই না। আমার সবল হৃৎপিণ্ড ঝলকে রক্ত তুলে ছড়িয়ে দেয় মুখময়।

গল্পটা বোধহয় এবার শেষ হবে।

নসিরাম

রামতারণ লোকটা অভদ্র বটে, কিন্তু ত্যাঁদড় নয়, বুঝলি সতু?

সতুর কথা বলার মতো অবস্থা নয়। চকবেড়ের হাটে নফরের তামাকপাতার দোকানের পিছন দিকটার নিরিবিলিতে রোদের দিকে হাঁ করে চোখ বুজে আধশোয়া হয়ে বড়ো বড়ো শ্বাস টানছে। একবার শুধু মাথাটা নেড়ে জানাল, কথাটা ন্যায্য।

মরা কুল গাছটায় থিক থিক করছে শুঁয়োপোকা। কাঁচা নর্দমার পাঁক পচে ফেঁপে উঠেছে। দুপুরের রোদে ঘাঁটা-পড়া নর্দমার কটু একটা গন্ধ ছড়াচ্ছে কখন থেকে। আর কিছু দেখার নেই লক্ষ্মীছাড়া জায়গায়। দুদিকে দুসারি দোকানের পিছন। লোকজনের যাতায়াত নেই, শুধু দোকানিরা মাঝে মাঝে পেচ্ছাপ করতে আসে। মতি সিং-এর শিকলে বাঁধা সাইকেলটার একটা চাকা দেখা যাচ্ছে বেড়ার আড়াল থেকে। যুধিষ্ঠির পালের দোকানের পিছন দিকটা মস্ত একটা মানকচুর গাছ। লালু মিঞার টেলারিং-এর চালে একটা নধর বেড়াল বসে আছে কখন থেকে, নড়ছেও না চড়ছেও না। গদার চায়ের দোকানের পিছন দিকটায় কানা লক্ষ্মীকান্ত এক নাগাড়ে কয়লা ভেঙে যাচ্ছে। এসব আলগা চোখে লক্ষ করতে করতে বাঁ গালে একবার হাত বোলায় নসিরাম। গালে রুক্ষু দাড়ি খড়খড় করছে। আর দাড়ির নিচে এখনো চিনচিনে ব্যথা। রামতারণের থাবড়াটা তার চোয়াল যে খসিয়ে দেয়নি এই যথেষ্ট।

বুঝলি সতু ! নসিরাম গালে হাতখানা চেপে রেখেই বলে, রামতারণ থানাপুলিশও করতে পারত। একেবারে জলের মতো কেস।

রামতারণের থাবড়াগুলো খুব অল্পের ওপর দিয়ে যায়নি। সতু এমনিতেও কিছু রোগাভোগা লোক। ক'দিন আগেও ন্যাবা হয়ে চোখ মুখ সব হলুদচোবা হয়ে গিয়েছিল।

শেষে বৈরাগী মণ্ডল কাঠির মালা করে দেয়। সে ভারি মজার ব্যাপার।

একশ আটখানা কড়প্রমাণ কাঠি সুতোয় বেঁধে চুড়ির মাপের ছোট্ট একখানা মালা ব্রহ্মতালুতে রেখে বলল, হাত দিয়ে চেপে থাকো। সতু তাই থেকেছিল। দেখ না দেখ সেই মালা আপনা থেকেই বড়ো হতে হতে মাথা গলিয়ে গলায় চলে এল। ঘন্টা কয়েকের মধ্যে সেই মালা বেঢপ বেড়ে নেই-কুন্ডলি ছুঁই ছুঁই। সকালে বাসিমুখে চুনের জলে সতুর হাত ধুয়ে দিয়েছিল মণ্ডল। একেবারে হলুদগোলা হয়ে গেল ফটফটে সাদা জলটা। দুপুরের দিকে মালা বেড়ে যখন শরীর গলিয়ে যাওয়ার মতো হল তখন মালা ছাড়ল সতু, দাঁত মাজল, খেল। ন্যাবা সেই বিদেয় হল বটে, কিন্তু শরীরটা এখনো যুতের নেই। রামতারণ ভালো খায় দায়। হোঁৎকাটার এক একটা হাতের ওজনই গোটা সতুর সমান। তার ওপর থাবড়া মারার সময় রামতারণ আবার বাঁহাতে সতুর চুলটাও ধরেছিল মুঠো করে। লেগেছে খুব। সতু এখনো দম ফিরে পায়নি, মাথা ঝিমঝিম করছে। তবু নসিরামের কথাটার একটা জবাব দিল সে। বলল, পুলিশ আর এর বেশি কীই বা করতো ! যা ঝেড়েছ ! ওফ !

এ কথায় নসিরাম একটু লজ্জা পায়। রামতারণ দুজনকেই ঝেড়েছে বটে, কিন্তু তার তেমন লাগেনি। চোয়ালের ব্যথাটা দিন দুই থাকবে হয়তো। তবে তেমন কিছু নয়। চোয়ালের হাড় সরে যায়নি, দাঁত ভাঙেনি। গালের মাংসে দাঁত বসে যাওয়ায় ক'ফোঁটা রক্ত পড়েছিল শুধু। সে কথা বলল না, রোঁয়াহীন একটা শালিখের বাচ্চা কোথা থেকে পড়েছে নর্দমার ধারে। কয়েকটা কাক সেটাকে ঠুকরে ঠুকরে শেষ করল এইমাত্র। মা শালিখটা ধারেকাছে নেই, থাকলে কাককে মজা দেখাত। নসিরাম বুঝতে পারছে রামতারণের পক্ষ নিয়ে কথা বলা তার উচিত নয়। বললে হয়তো সতু ভাববে, মার খেয়ে নসিরামের মাথাটাই গুলিয়ে গেছে।

কিন্তু ঘটনাটা ঠিক ঠিক বিচার করলে রামতারণকে কি দোষ দেওয়া যায়? গাজিপুর থেকে তারা রামতারণের পিছু নিয়েছিল। নেওয়ারই কথা। রামতারণ আদায় উশুল করে ফিরছে। গাজিপুরে গোটা বাজারটাই ওর কিনা। মেলা টাকা। একজন পাইকও সঙ্গে ছিল। লহরার ইসমাইল। তার কোমরে চাকু, হাতে লাঠি।

সতু আর নসিরাম সব খবরই নিয়েছিল। বনবিবিতলায় ইসমাইলকে ছেড়ে দেবে রামতারণ। কারণ ওখানেই ইসমাইলের দু নম্বর বিবি ওলন থাকে, ওলন ভারি আহ্লাদী মেয়েমানুষ। বুকে দয়ামায়া আছে, ধর্মভয় আছে। বড়ো একটা এদিক-সেদিক করে না। তবে ইসমাইল রামতারণের সঙ্গে ভিড়িয়ে দেওয়ার তক্কে আছে। ওলনবিবি দেখতে খারাপ নয়। বালবাচ্চা নেই, শরীরটাও তাই ভাঙেনি।

ইসমাইলকে ছেড়ে রামতারণ বনবিবিতলার বড়ো মাঠে পড়ল। পথও তার বেশি ছিল না! মাইলটাক গেলেই পিরগঞ্জের পাকা সড়ক। ফটফট করছে দুপুরের রোদ। ছাতা মাথায় রামতারণ দুলকি চালে হাঁটছিল। আচমকাই সতু আর নসিরাম চড়াও হল তার ওপর। সতুর হাতে ভোজালি, নসিরামের হাতে দেড় ফুট লম্বা গুপ্তি ছোরা।

রামতারণ ভয় খেয়েছিল কি না বলা শক্ত। তবে একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়েছিল ঠিকই। সতু ভোজালিটা আপসাতে আপসাতে বিকট গলায় বলল, জয়কালী, করালবদনী! একদম চেঁচামেচি করবে না বলে দিচ্ছি। লাশ ফেলে দিবো। এইখানেই লাশ পড়ে থাকবে, কুকুরে শেয়ালে ছিঁড়ে খাবে। মালটা দিয়ে দাও ভালোয় ভালোয়। পাশ থেকে গুপ্তির চোখা ডগাটা রামতারণের ভুঁড়িতে ঠেকিয়ে রেখেছিল নসিরাম। তেমন বেগতিক দেখলে ঢুকিয়ে দেওয়ার কথা। তবে সেটা কথাই। সতুও কোনদিন কারো লাশ ফেলেনি, নসিরাম গুপ্তি উঁচিয়ে দেখায়নি। তেমন জোরালো কলজে তাদের নেই। কিন্তু রামতারণের তো ভয় খাওয়ার কথা, দু-দুটো ঝকঝকে অস্ত্র চোখের সামনে দেখেও শালা ঘাবড়াল না। অ্যাঁ! নসিরাম ঘটনাটা আবার ছবির মতো দেখছিল চোখের সামনে।

সতু চোখ পিটপিট করে দেখছিল নসিরামকে। হঠাৎ অন্তর্যামীর মতো বলে উঠল, 'শালা ভয় খেলে না কেন বলো তো!'

নসিরাম বিরক্ত হয়ে বলল, কাজের সময় বেশি কথা কইতে নেই। যারা বেশি কথা কয় তাদের কেউ ভয় খায় না।

সতু ফিসফিস করে বলল, মালটা ছাড়ছিল না যে!

ওর বাপ ছাড়ত। দুটো খোঁচা খেলেই বাপ বাপ বলে ছাড়ত। ভোজালিটা তোমার হাতে ছিল কী জন্যে!

সতু মিইয়ে গেল। ফের হাঁ করে শ্বাস টানতে লাগল চোখ বুজে দোষটা সতুর ঘাড়ে চাপাল বটে নসিরাম, কিন্তু পুরো দোষটা ওরও নয়। বোধহয় ওর চেহারাটারই দোষ। ল্যাংপ্যাঙে একটা লোক যদি ভোজালি নিয়ে কেরদানি দেখায় তবে কার না ইচ্ছে করে তাকে একটা থাবড়া বসাতে? তার ওপর সতু হঠাৎ রামতারণের কুচ্ছো গাইতে শুরু করল, তেঘরেতে তোমার বাপের একজন রাখা মেয়েমানুষ আছে। সব ফাঁস করে দেবো। ইসমাইল মিঞ্রার দু নম্বর বিবি ওলনের সঙ্গে তোমার আশনাইয়ের কথাও জানি। হপ্তায় দুদিন ওলনের ঘরে তুমি যাও। ট্যাঁ ফোঁ করেছো কি এসব কথা ঢোল সহবৎ হয়ে যাবে। বুঝেছো?

রামতারণ আচমকাই থাবড়াটা কষাল। আর কী থাবড়া বাপ। সতুর মুণ্ডুটা তখনই ধড় ছেড়ে উড়ে গিয়ে আলের ধারে পড়ার কথা। শব্দটাও হল বোমার মতো। সেই শব্দে কেমন অবশ হয়ে গিয়েছিল নসিরাম। হাতের গুপ্তিটার কথা তখন বেবাক ভুল। সেই অবশ অবস্থাতে রামতারণ হঠাৎ ঘুরে তাকেও একটা ওরকম থাবড়া কষাল। মাঠের মধ্যে দিনের আলোয় অন্ধকার দেখতে দেখতে মাটিতে বসে পড়ল নসিরাম। আর রামতারণ তখন একহাতে সতুর চুল ধরে তুলে পটাপট কয়েকটা থাবড়া দিয়ে গেল নাগাড়ে। সতু চেঁচাচ্ছিল, আর মেরো না। ন্যাবা থেকে উঠেছি, শরীর যুতের নয় হে, মরে যাবো।

হোঁৎকা এক কথায় থামল। তারপর ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলায় জিজ্ঞেস করল, তোরা কারা?

সতু মাটিতে পড়ে চষা খেতের এক চাঙর মাটি আঁকড়ে ধরে দম নেওয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছিল। কথা বলার অবস্থা নয়। লুঙ্গি খসে গিয়ে দিগম্বর অবস্থা তার।

নসিরাম টলতে টলতে দাঁড়িয়ে বলল, আজ্ঞে আমরা হচ্ছি--বলে একটু ভাবতে হল। নাম দুটো স্মরণ হচ্ছিল না ঠিক।

রামতারণ ধমক দিল, কারা তোরা?

আমি নসিরাম।

আর ও?

ও তো সতু!

কোন গাঁ?

আমি লোহারগঞ্জ, আর ও কালীতলা।

ঠিকঠাক বলছিস?

বানানোর মতো কথা মাথাতেই আসছে না। ঠিকঠাক না বলে উপায় কী? নসিরাম জবাব না দিয়ে মাথা নাড়ল শুধু।

রামতারণের বোধহয় তাড়া ছিল, দুজনের জন্য যথেষ্ট সময় নষ্ট হয়েছে ভেবে চোখ পাকিয়ে বলল, এই দণ্ডে এই তল্লাট ছেড়ে চলে যাবি। ফের দেখতে পেলে পুঁতে ফেলব। যাঃ যাঃ...

গরু তাড়ানোর মতো তাড়া খেয়ে তারা দুজনে সেই দণ্ডেই মাইলটাক পথ হেঁটে চকবেড়ের খাল পেরিয়ে হাটে এসে সেঁদিয়েছে। ভয়ের চোটে এতক্ষণ গা গতরের ব্যথা তেমন টের পায়নি। এখন পাচ্ছে। তবে গায়ের ব্যথাটা বড়ো কথা নয়। রামতারণ ইচ্ছে করলে পিরগঞ্জের থানায় তাদের জমা করতে পারত। আরো বিপদের কথা, ইসমাইলকে লাগাতে পারত পিছনে, ইসমাইলের জমার ঘরে অন্তত পঁচিশটা খুন লেখা আছে। আরো দুটো বাড়লে ক্ষতি ছিল না।

নফর চেনা লোক। কিন্তু তাদের দেখে খুশি হয়নি মোটেই। দুজনের চেহারা দেখেই বিরস মুখে বলল, কোত্থেকে চোরের ঠেঙানি খেয়ে এসেছো! ভালোয় ভালোয় সরে পড়ো আমি ঝামেলা পছন্দ করি না।

তা চোরের ঠেঙানিও তারা খেয়েছে বৈকি। নফরের দোষ নেই। এই তো মোটে সেদিন শীতলাদলের বাজারে রামহরির দোকানে মাঝরাতে ঢুকেছিল দুজন। সত আগে পিছনে নসিরাম। ঢুকেই সতুটা হেঁচে ফেলল। রামহরির ছেলে দোকানে শোয়। তার হাতের কাছেই টর্চ আর লাঠি। 'কে রে?' বলে লাফিয়ে উঠতেই ভাঙা জানালা গলে পালাল দুজন। কিন্তু

বাজার বলে কথা। চোখের পলকে চৌকিদার দোকানি আর ব্যাপারি মিলে বিশ-পঁচিশ জন জুটে তাড়া করে খালধারে প্রায় ধরে ফেলল দুজনকে, তবে ভাগ্য ভাল সবাই অত জোরে ছুটতে পারে না। আর তারাও প্রাণের ভয়ে দৌড়চ্ছিল। ধরল এসে জনা চারেক। কিল চড় চাপড় গোটা কয়েক পড়ল বটে, কিন্তু দুজনেই বুদ্ধি করে শীতের রাতে খালের বরফগোলা জলে লাফিয়ে পড়ায় অল্পের ওপর দিয়ে বেঁচে যায়। কাজেই নফরের দোষ নেই। তারা যে লোক ভালো নয় একথা সবাই জানে। তবে সুবিধেটা এই যে আজকাল লোক কেউ ভালো নয়। এই যে নফর দিব্যি তামাকপাতার পাইকারি কারবার খুলে বসে আছে। আলটপকা দেখলে মনে হয় ভারি সিধেকারবার। কিন্তু তামাকপাতার আড়াল দিয়ে গুলি, গাঁজা, চরস, ভাং, আফিং-এর যে ফলাও কারবার চলছে তার খোঁজ রাখে কজন? নসিরাম আর সতু সবই জানে তাই চলে যেতে বললেও তারা যায় না। নফরও আর বেশি গাঁইগুঁই করেনি!

বেলাটা পড়ে এল, দোকানের পিছনকার ঘাঁটাপড়া জায়গায় আলোটা বিলিতি বেগুনের রং ধরল। নসিরামের মনে হল, যথেষ্ট জিরেন হয়েছে।

ও সতু! উঠবি?

সতু আধশোয়া হয়ে ছিল এতক্ষণ। এখন দেখা গেল, ন্যাবা মাটির ওপর হাতে মাথা পেতে চোখ বুজে ঘুমোচ্ছে। তা ঘুমোবেই। শরীরটা যুতের নেই। ন্যাবার আলিস্যি আছে। রামতারণের ওই অসুরের মারেও তো কম ধকল যায়নি।

নসিরামের কাছে বিড়ি নেই। থাকলে একটা ধরাত। শরীরটা উশখুশ করছে। সতুর কাছেও নেই, সে জানে। বিড়ি নেই, ম্যাচিস নেই, পয়সা নেই। নসিরাম উঠল। কারণ, বসে থাকার কোনো মানে হয় না। যুধিষ্ঠির পালের দোকানের পিছনে মস্ত মানকচু গাছটা অনেকক্ষণ ধরে তার চোখ টানছে। মাটির ওপরেই কচুর যে মাথাটা উঠে আছে সেটা দেখে মনে হয়, দশ সেরের কম ওজন হবে না। যুধিষ্ঠির কচুগাছের গোড়ায় রোজ এঁটো ভাত, ছাই, গোবর আর কী কী সব ফেলে ফেলে দিব্যি পুরুষ্টু করে তুলেছে জিনিসটিকে।

শীতের শেষ টান। নসিরাম জানে এই হাটে এখনও মানকচু খুব একটা ওঠেনি। অনায়াসে দু তিন টাকায় বিকিয়ে যাবে। টেনে তুলতেও কষ্ট নেই। জল পড়ে পড়ে

জায়গাটা এমনিতেই ভুসভুসে হয়ে আছে।

নসিরাম সাবধানে নর্দমাটা পার হয়ে এগিয়ে গেল। চাল থেকে সেই নট নড়ন চড়ন বেড়ালটা হঠাৎ একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল তাকে।

যুধিষ্ঠিরের দোকনের পিছন দিককার দরজাটা আবজানো। কে খোলা রাখবে বাপ! যা দুর্গন্ধ। কচুটা টেনে তোলার সময় নসিরামের একবার মনে হল, ছিঃ ছিঃ কাজটা ঠিক হচ্ছে না, একটু আগেই বনবিবিতলার মাঠে যার হাতে গুপ্তি ছোরা ছিল এখন সেই কিনা কচু-- তুচ্ছ কচু চুরি করছে। লোকে দেখলে বলবে কী?

অবশ্য দেখছে না কেউ। কানা লক্ষ্মীকান্ত কয়লা ভেঙে উঠে গেছে। দেখছে শুধু বেড়ালটা। লালুমিঞার টেলারিং-এর চাল থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে খুব লক্ষ করছে তাকে আর মিহিন মিয়াঁও আওয়াজ ছাড়ছে। তবে বেড়াল বলে রক্ষে। কুকুর হলে এতক্ষণে ঘাউ ঘাউ করে দুনিয়াকে জানান দিত।

যত সহজে কচুটাকে তোলা যাবে ভেবেছিল নসিরাম, কার্যকালে ততটা সহজ মনে হচ্ছে না। মাটিটা ভুসভুসে পচা মাটি ঠিকই, কচুটাও নড়বড় করছে বটে। কিন্তু গোলমাল অন্য জায়গায়। সেই সকালে দুগাল পান্তা মেরে বেরিয়েছিল নসিরাম। সেই পান্তা কবে তল হয়ে গেছে। অনেকক্ষণ ধরেই পেটটা একেবারে বোমভোলা ফাঁকা। মেহনতও বড়ো কম যায়নি। এখন মাথাটা ঝিম ঝিম করছে, শরীরটা কাহিল লাগছে! ভারী কচুটা খানিক নাড়িয়ে মাটিটা আরো আলগা করে টান দিতে গিয়েই পাঁজরে খিঁচ ধরে দম বন্ধ হয়ে এল। দু হাতে বুকটা চেপে ধরে উবু হয়ে বসে পড়ল সে। হাতখানেক বেরিয়ে আসা কচুটা আবার নিজের গর্তে বসে গেল। লালুমিঞার চাল থেকে বেড়ালটা পায়ে হেঁটে চলে আসছে যুধিষ্ঠিরের দোকানের চালে। খুব চেল্লাচেল্লি করতে লেগেছে হঠাৎ। নসিরাম একটা ঢেলা কুড়িয়ে ছুঁড়ে মারল। তারপরই বুঝল ভুল হয়েছে। ঢেলাটা বেড়ালের গায়ে লাগল কি না কে জানে, তবে যুধিষ্ঠিরের টিনের চালে খটাং করে একটা শব্দ হল।

নসিরাম ফেরত যাবার জন্য উঠতে যাচ্ছিল। কপাল খারাপ। বাঁ পায়ে জোর ঝিঁ ঝিঁ ধরেছে। একেবারে অবশ। উঠতে গিয়েও ফের বসে পড়তে হল। দোকানঘরের পিছনের

দরজাটা খুলে বেরিয়ে এল যুধিষ্ঠির।

এমনিতে দেখলে যুধিষ্ঠিরকে ভয়ের কিছু নেই। রোগাভোগা চেহারা। গলায় কণ্ঠি, কপালে তিলক, গায়ে হাফহাতা গেঞ্জি। কিন্তু চেহারা দেখে বিচার করলে খুবই ভুল হবে। যুধিষ্ঠির দেখা দিয়েই মোলায়েম গলায় জিজ্ঞেস করল, কোন শুয়োরের বাচ্চা রে।

আশ্চর্য, নসিরামের রাগ হল না। আজকাল রাগটাগ কমে যাচ্ছে। সে একটু তেজি গলায় বলার চেষ্টা করল, গালমন্দ করছ কেন?

গলায় তেজ তো ফুটলই না, বরং খোনা স্বর বেরোল। উপোসী পেট থেকে আর কত বড়ো আওয়াজ বেরোবে?

যুধিষ্ঠির তার সাধের কচুটার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে ছিল। মাটি আলগা, কাদায় চোরের পায়ের ছাপ, চোরও বেকায়দায় পড়ে বসে রয়েছে সামনে।

যুধিষ্ঠির কোমরে হাত দিয়ে তেজের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে বলল, গালমন্দ করব না তো কি জামাই-আদার করতে হবে নাকি রে ছ্যাঁচড়া হারামজাদা? ওরে ও পতু, ইদিকে আয়--

পতুর আসা মানে সাড়ে সর্বনাশ। যুধিষ্ঠির রোগাভোগা হলেও তার মেজো ছেলে পতিতপাবন রোগা নয়। গাঁট্টাগোট্টা চেহারা। নসিরামের যা অবস্থা এখন ইঁদুরের লাথি খেলেও সইতে পারবে না। সে তাড়াতাড়ি বলল, তা আমি কী করে জানবো যে কচুটা তোমার!

আমার নয় তো কি তোর বাবার?

নসিরাম উকিল মোক্তারের মতোই বুদ্ধি খাটিয়ে বলল, জমিটা তো আর তোমার নয়। সরকারবাবুদের হাট, তাদের জমি।

তাই নাকি রে শুয়োরের পো? তোর এত আইনের জ্ঞান? ওরে পতু--

ঝিঁঝি ছাড়াতে পায়ে থাবড়া মারতে মারতে উঠে দাঁড়াল নসিরাম। বলল, চেঁচাচ্ছ কেন খামোখা? যেতে বলেছো যাচ্ছি।

কখন তোকে যেতে বললাম রে খানকির ছেলে? ওরে পতু! শুনছিস। শিগগির আয়--

পতু প্রথমটায় শুনতে পায়নি। এবার পেল। বেরিয়ে এসে, বলল, কী হয়েছেটা কী?

এই দ্যাখ। চোর ন'সে আমার কচু লিয়ে পালাচ্ছিল। ধর হারামজাদাকে।

নসিরামের ঝিঁঝি ছেড়েছে। সে আচমকাই লাভ দিয়ে নর্দমাটা পেরিয়ে গেল। নফরের দোকানের দিকে জোরকদমে হাঁটতে হাঁটতে ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, এঃ, ভারি তো কচু! পতু যে রেলের মাল নামায়, তার বেলা। চোর আমি একা, না?

একেবারে বেঁচে যাবে এতটা আশা করেনি নসিরাম। পতুও সমান তেজে নর্দমাটা পেরিয়ে তেড়ে এল। দৌড়তেই নসিরাম গুনে গুনে তিনটে গাঁটটা খেল মাথায়। যেন তিনটে ঝুনো নারকোল ডগা থেকে খসে মাথায় এসে পড়ল। আর কিছু অকথ্য গালাগাল। তবে দোকানে খদ্দেরের ভীড় আছে বলেই বোধ হয় পতু ঝামেলা আর বাড়াল না। তিনটে রামগাঁট্টায় মাথায় তিনটে আলু ফুটিয়ে দিয়ে ফিরে গেল।

ফের চোখে অন্ধকার দেখল নসিরাম। মরা কুলগাছটায় হাতের ভর রেখে অন্ধকারটা ছাড়িয়ে নিল চোখ থেকে। এক রাজ্যের শুঁয়ো লেগে হাতটা চুলকোতে থাকে। তবু অল্পের ওপর দিয়েই গেছে বলতে হবে।

কিন্তু কথাটা সে অন্যায্য বলেনি। যুধিষ্ঠিরের চায়ের দোকান যতই ভালই চলুক, তাদের আসল আয় দোকান থেকে নয়। পতু জংশন স্টেশনে রেল থেকে মাল খালাস করার দু নম্বরী ব্যবসায় বহুদিন হল ভিড়ে গেছে। রেলের পুলিশ নিজেরাই ব্যবসাটা ফেঁদেছে। পতুরা কম দামে মাল নামিয়ে আনে। বেশি দামে বেচে দেয়। ধরা পড়ার ভয়টা নেই।

সতু এতক্ষণে উঠে বসেছে। কান্ডটা বোধ হয় দেখছেও। হাই তুলে বলল, বেশি কথা বলা তোরও দোষ। অত কথা বলতে যাস কেন?

নাসিরাম রাগ করে বলে, খামোখা গালমন্দ করছিল দেখলে না?

নসিরাম রাগ করে পাগল। তোরও দোষ ছিল। চল রওনা দিই। আজ আর কিছু হওয়ার নয়। দিনটাই খারাপ!

বয়সে সতু নসিরামের চেয়ে বছর কয়েকের বড়ো। তার বউ আছে, গোটা চারেক বাচ্চা আছে। নসিরামের ওসব নেই। দুজনেই ভুঁইঞাদের জমিতে চাষ করত। বর্গা রেজিস্ট্রির সময় মাতব্বররা তাদের বাদ দিয়ে অন্য দুজনের নাম বসাল! কিছুতেই টলল না। নতুন বর্গাদার ভুঁইঞাদের নিজস্ব লোক। মাতব্বদের টাকা খাইয়ে ওরাই ওই কাজ করে। সেই থেকে সতু কষ্টে আছে। দুজনেই বুদ্ধি পরামর্শ করে চুরি ছ্যাঁচড়ামির লাইন ধরল বটে, কিন্তু আজ অবধি তেমন সুবিধে হল না।

নসিরাম গোঁ ধরে বসে বলল, তুমি যাও। আমি যাব না।

তবে কি এখেনে বসে বসে মশা তাড়াবি?

তাই তাড়াবো।

তোর বড়ো তেজ। অত তেজ ভালো নয়। আজ আর লোহারগঞ্জ গিয়ে কাজ নেই, কালীতলাতেই চল। একটা চট পেতে দাওয়ায় পড়ে থাকবি।

অভিমান ভরে নসিরাম বলে, তোমার বউ তোমার জন্য বেঁধে রেখেছে, আমার জন্য তো আর রাখেনি। এ কথায় সতু হাসল, বলল, রেঁধে রেখেছে তো মেলা। উনুনে নিজের হাত পা গুঁজে দিয়ে নিজের মুণ্ডুটা সেদ্ধ করে রেখেছে। চল, নুন দিয়ে মেখে তাই খাবি। তাও নুন যদি মুদির পো ধারে দেয়।

নসিরামের অভিমান যায়নি। বলল, তোমার বউয়ের মুণ্ডু তুমি খাওগে।

তোর বড্ড মেজাজ। ঠান্ডা হ তো বাপু। ঠান্ডা মাথায় বসে ভাব। ভাবতে ভাবতে একটা কিছু বেরিয়ে পড়বে।

বিড়ির কী ব্যবস্থা করা যায় বলো তো?

নফরাকে বল না।

নফরা দিতে বসেছে আর কি।

তবে যা, একটু তামাক পাতা নিয়ে আয়। দুজনে বসে চিবুই।

কিন্তু নসিরাম নড়ল না। গোঁ ধরে বসে রইল। চারদিক ঝেঁপে অন্ধকার নামছে। চকবেড়ের হাটে আলো জ্বলে উঠছে একে একে। কুপি, হ্যাজাক, হ্যারিকেন, কারবাইড। আনমনে দৃশ্যটা দেখছিল নসিরাম। ভারি সুন্দর এই অন্ধকারের সঙ্গে আলোর লড়াই। আলো ভালো লাগত যদি পেটের খোঁদলটা এমন হাঁ হাঁ না করত।

সতু একটা কোঁক দিয়ে ধীরে ধীরে উঠল। কোমরের গামছাটা খুলে মাথায় জড়াতে জড়াতে বলল, এখন সাঁঝের পর খুব হিম পড়ে। কালীতলায় যদি না যাস তো লোহারগঞ্জেই যা, ঘরে গিয়ে আজকের রাতটা জিরো।

নসিরাম তবু নড়ল না, তার কেমন একটা ভাব এসেছে। রামতারণ তাকে একটা মোটে থাবড়া দিয়েছিল। সতুর ভাগটা ছিল অনেকটাই বেশি। এখন আবার পতুর গাঁট্টা তিনটে খাওয়ার পর নসিরাম আর সতু প্রায় সমান সমান। তার চেয়ে বড়ো কথা, তিনটে গাঁট্টা তার মাথার ভিতরটা কেমন গুলিয়ে দিয়েছে। চারদিককার এই হাট বাজার, পচা নর্দমার গন্ধ, রৈ-রৈ শব্দ কিছুই যেন তাকে তেমন ছুঁচ্ছে না।

সতু আবার জিজ্ঞেস করল, কী রে যাবি?

না, তুমি যাও।

সতু একটা বড়ো শ্বাস ছেড়ে আবার বসে পড়ল। বলল, তোর হয়েছেটা কী বল তো!

নসিরাম হঠাৎ মুখ তুলে বলল, হবে আবার কী? এতক্ষণে রামতারণের লাশ মাঠের ধারে পড়ে থাকার কথা, তার ওপর মাছি ভন ভন করার কথা। আমাদের দুজনের হাতে দু দুটো অস্ত্র ছিল, তবু তা হল না। লোকটা ভয় পেল না। কেন বলো তো সতু গোঁসাই? এক গোছা টাকা ট্যাঁকে নিয়ে সে দিব্যি ফিরে গিয়ে এতক্ষণে বউয়ের হাত পাখার নিচে বসে বাতাস খাচ্ছে।

হাতপাখার বাতাস খাওয়ার মতো গরম এখনো পড়েনি, কিন্তু সে কথাটা আর সাহস করে বলতে পারল না সতু। গলাটা উদাস রেখে বলল, প্রথম প্রথম ওরকম হয়। ওকে যে মারতে হয়নি সেটা ভালোই হয়েছে। মানুষ মারার অনেক হেপা রে। আমরা তো মারতে চাইনি। টাকাটা চেয়েছিলুম।

আর উলটিয়ে যে ও আমাদের মারল!

তা কী করবি বল। রামতারণ শালা খায় দায় ভাল। বোধ হয় ডন বৈঠকও করে। তোর আমার মতো উপোসী পেট তো আর নয়। আমরাও দু দিন ভরপেট খেয়ে নিলে অত সহজে পারত নাকি! তার ওপর আমার ন্যাবাটা হয়ে...

রাখো তোমার ন্যাবা। নসিরাম খেঁকিয়ে উঠে বলে, আসলে আমরা মরদই নই।

কথাটা অন্যায্য মনে হয় না সতুর। সে চুপ করে থাকে। অনেকক্ষণ বাদে ভয়ে ভয়ে বলে, চল, হাটে একটু ঘুরে দরদস্তুর দেখি।

দেখে কী হবে?

চল না। জিনিসপত্তর দেখলে মনটা অন্যদিকে থাকবে। দরটাও জেনে রাখা ভালো। আমার মুখে থুথু আসছে। একটু তামাক পাতা মুখে না দিলেই নয়।

নসিরাম চোখ পাকিয়ে বলল, কচুটা কি যুধিষ্ঠির শালার বাপের?

সতু উদাস গলায় বলল, তারই বা কী করবি? জোর যার মুলুক তার।

এঃ জোর! আমরা যে আসলে মরদই নই সে কথাটা স্বীকার যাচ্ছো না কেন? যাচ্ছি বাপ, স্বীকার যাচ্ছি।

নসিরাম হঠাৎ একটা ঝাঁকি মেরে উঠে সতুকে দুহাতে নাড়া দিয়ে বলল তাহলে চলো মরদের মতো একটা কিছু করি।

ভয় খেয়ে সতু বলে, কী করবি?

একটা কিছু করি, নইলে কোন লজ্জায় বাড়ি ফিরবো।

নসিরামের মাথায় যে পতুর তিনটে গাঁট্টা তাড়ির মতো কাজ করছে তা জানে না সতু।

তবে তার চোখে মুখে হন্যে ভাবটা দেখে সে বুঝল, নসিরাম নিজের বশে নেই। পাগলার বায়ু চড়েছে। সে নসিরামের গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, চল তো আগে বেরোই। তারপর দেখা যাবে।

দুজনে বেরোবার মুখে একটা আস্ত তামাক পাতা নফরের চোখের সামনেই তুলে নিল নসিরাম। আস্তটা না নিলেও হত। কুঁড়ো কাঁড়া মেলা পড়ে থাকে। তাই দিয়েই চলে যেত। তবু আস্ত পাতাটাই একটা থাক থেকে তুলে নিল নসিরাম। নফর কিছু বলতে যাচ্ছিল। হয়তো মা-বাপ তুলে একটা খিস্তিই দিত। কিন্তু নসিরাম তার চোখের দিকে চেয়ে ছিল। কী জানি কেন, কিছু বলল না নফর।

বাইরে এসে একটা পানের দোকানে দাঁড়িয়ে বলা নেই কওয়া নেই চুনের বাটি থেকে এক থাবলা চুন তুলে নিল নসিরাম। পানের দোকানি হাঁ-হাঁ করে উঠেও শেষ অবধি আর কিছু বলল না।

চুন দিয়ে ডলা খানিকটা তামাক পাতা ঠোঁটের নিচে গুঁজবার পর একটু ধাতস্থ হল দুজন।

নসিরাম খানিক থুথু ফেলে বলল, আমাদের কী নেই বলো তো? কেন আমাদের দিয়ে কাজ হচ্ছে না?

সতু মিইয়ে গিয়ে বলে, আমরা লোক ভালো। ভালো লোকদের দেখলেই চেনা যায় কিনা।

তোমার মাথা। ভালো লোককে ধরে তাহলে ঠেঙায়?

ভাল লোক বলতে ঠিক ভালো লোক নয় বটে। আসলে আহম্মক ঠাওরায়।

তাই বলো। আহম্মক আর ভালো কি এক হল?

অত কথা জানলে তো এতদিন কালীতলা প্রাইমারিতে মাস্টারি করতুম রে। এত কথা কি জানি?

ভুঁইঞারা যখন জমিতে নতুন বর্গা লাগালে তখন আমরা যেমন আহাম্মক ছিলুম আজও তেমনি আহাম্মক আছি বলছো?

সতু মাথা নেড়ে বলে, আছিই তো।

তাহলে মরদও নই?

তাও খানিকটা ঠিক। কারো সঙ্গেই আমরা তেমন এঁটে উঠছি না। তবে রোজ একটু একটু অভ্যেস করলে দেখিস হয়ে উঠব একদিন।

তোমার বয়স কত?

সতু অবাক হয়ে বলে, কত আর। তোর চেয়ে পাঁচ-সাত বছরে বড়ো হবো। তোর কত?

তা জানি না। তবে বেশি নয় খুব একটা, কমও নয়। ভাবছি হয়ে উঠতে আর কদিন লাগবে। ততদিন বুড়ো ধুড়ো হয়ে যাবো না তো দুজনে?

সতু খুব হাসে। গামছার ল্যাজে মুখ মুছে বলে, বুড়ো হওয়া তো ভালো কথা রে। বুড়ো বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকতে হয় তাহলে। গতিক যা দেখছি, ততদিন বেঁচে থাকাটাই তো দায়।

নসিরাম আর একবার থুথু ফেলে বলে, তাইতো বলছিলাম, এসব রয়ে সয়ে হয় না। এসো মরদের মতো একটা কিছু করে ফেলি।

মেটে আলুর দর জিজ্ঞেস করতে একটু দাঁড়িয়েছিল সতু। দোকানি তেরছা একটু চেয়ে দেখল। জবাব দিল না। মাল চেনে । সতুও আর চাপাচাপি করল না। হাঁটতে হাঁটতে বলল, কী বলছিলে?

বলছিলাম অত ভয় খাও কেন? একটা ধুন্ধুমার কিছু লাগিয়ে দিই এসো। যা হোক, একটা রক্তারক্তি কান্ড।

অত উতলা হোস না। রোস ক'দিন।

সেটা আর ক'দিন , ভাল পথ তো আর নেই। খারাপ পথেও ভীড় বাড়ছে। শেষে সেটাও বন্ধ হয়ে যাবে। তখন?

কেন, এই তো সেদিন রতন সিং-এর গোরুটা চুরি করলুম দুজনে।

সে আর ক'টা টাকাই বা দিয়েছে। গো-হাটার লোকটা চোরাই গোরু বলে ধরে ফেলল। দিল মাত্র একশটা টাকা। ভাগাভাগি হয়ে তোমার পঞ্চাশ, আমার পঞ্চাশ। ও তো পিচেশপানা। বড়ো কিছু না করলে বড়ো দাঁও মারা যায় না, বুঝলে!

বুঝেছি রে বাপ, হাড়ে হাড়ে বুঝছি। তুই বড়ো ছটফট করছিস আজ। এমন তো ছিলি না।

আজ রক্তটা কিছু গরম লাগছে।

আয় তেলেভাজা খাই। পেটে কিছু পড়লেই রক্ত ঠান্ডা হবে। আমার কাছে একটা টাকা আছে।

আছে? বলেনি তো এতক্ষণ!

বলার ফাঁক দিলি কই?

যা গেল হুজ্জুত। পরশু ব্রজবিলাসের বাড়ি থেকে দুটো কাঁসার থালা সরিয়েছিলাম। তারই তলানি একটা টাকা পড়ে আছে।

তাহলে তেলেভাজা খেতে চাইছো? অত বাবুগিরি কি আমাদের পোষায়? বরং একটু কুথি কলাই আর নুন কিনে বাড়ি যাও। সেদ্ধ করে ছেলেপুলে বউ নিয়ে খাবে।

বলছিস?

বলছি। খিদেটা আছে থাক। শরীরটা গরম লাগছে। চনমনে লাগছে। পেটটা ঠান্ডা হলে এই ভাবটা মরে যাবে।

সতু আমতা আমতা করে বলল, তোকে আমার এখন একটু ভয় করছে কেন রে নসু?

নসিরাম হাঃ হাঃ করে খানিক হাসল। মাথায় একটু হাত বোলাল সে। তিনটে আলু ফুটিয়ে দিয়েছে পতু শালা! কেন? না একটা কচু নিয়ে বৃত্তান্ত। দুনিয়াটা যে কী ছোটোলোকই হয়ে গেছে বাপ!

চকবেড়ের সরকারদের এই হাট ভারি রমরমে জায়গা। নামে হাট হলেও আসলে পাকা এবং স্থায়ী বাজার। হপ্তায় দুদিন বাজারের গায়েই হাট বসে। আজ সেই হাটবার। মেলা লোকের আনাগোনা। দুজনে পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেউ বিশেষ লক্ষ করছে না তাদের।

সতু বলল, কথাটার জবাব দিলি না?

কোন কথাটার?

তোকে দেখে এখন আমার একটু গা ছমছম করছে কেন?

ওঃ, কী যে ছাতামাথা বলো না! আমি কি ভূত যে গা ছমছম করবে?

ভূত নোস। তবে তোর হাবভাব ভাল লাগছে না রে নসু। কী যে একটা মতলব আঁটছিস মনে মনে!

সে তো আঁটছিই। হাবভাব ভাল করার জন্য এ লাইনে নেমেছি নাকি।

তা বটে। তবে মাথাটা ঠান্ডা রাখিস।

রাখা যাচ্ছে না। মাথা ঠান্ডা থাকে কখনো? হাতে অস্ত্র নিয়ে হামলা করলুম, তাও রামতারণ শালা পুলিশে দিল না। এমন কি ইসমাইলকে পর্যন্ত পিছুতে লাগাল না। তার মানেটা বুঝছো? তার মানে, রামতারণ আমাদের মনিষ্যি বলেই জ্ঞান করেনি। ছিঁচকে চোরকেও লোকে এর বেশি খাতির দেয়। তা জানতে চাইছিলুম, আমাদের কী নেই! কীসের অভাব আছে। লোক ভয় খাচ্ছে না। পাত্তা দিচ্ছে না। রামতারণ এমন কিছু ডাকাবুকো লোকও নয়। গেরস্ত মানুষ, পাইক নিয়ে চলে, মেয়েমানুষ করে, তার ভয় ভীতি থাকার কথা। তারপর ধরো, যুধিষ্ঠিরের পো পতু চোর বলে তিনটে গাঁট্টা আর গালাগালি দিয়ে ছেড়ে দিল। লোক জড়ো করল না, তেমন চেঁচামেচি করল না। তার মানেও কিন্তু ওই। মানুষ বলেই ধরছে না।

তোর মাথাটাই বিগড়ে গেছে আজ।

তা বলতে পারো। নাও তামাকটা একটু ডলো। আর একটু চড়াই।

খিদেটা মরেছে?

মরেছে। আর একবার চড়ালে একদম মরে যাবে।

মাসুদের জর্দার দোকানের সামনে একটা আয়না ঝোলানো। ম' ম' করছে গন্ধ। খৈনী ডলতে আচমকাই সতু আয়নাটার দিকে চেয়ে চমকে গেল। চেক লুঙ্গি, শার্ট আর সোয়েটার পরা একটা ছিপছিপে লোক পিছু ফিরে আয়নার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে বোধহয় মুখের ব্রণ

টিপছিল। হ্যাজাকের আলোয় পরিষ্কার দেখা গেল মুখখানা। ইসমাইল। হাতে টর্চ ছাড়া আপাতত কোনো অস্ত্র দেখা যাচ্ছে না। তবে ওর লুঙ্গি বেল্ট দিয়ে বাঁধা থাকে। সেই বেল্টে ঝোলে চাকুর খাপ। কিন্তু কথা হল, ইসমাইল তাদের খবর রাখে কি না।

খৈনি ডলতে ডলতে থেমে গিয়ে সতু বলল, নসু, ইসমাইল।

প্রথমটায় নসিরাম বুঝতে পারেনি। হাত বাড়িয়ে খানিকটা খৈনী সতুর হাত থেকে তুলে নিয়ে ঠোঁটে গুঁজল। তারপর আচমকা সেও ইসমাইলকে দেখতে পেল।

দেখতে হয়তো পেত না। কিন্তু ইসমাইল আয়নার ভিতর দিয়ে নিজের মুখ দেখার ছল করে আসলে হাটের লোকজনকে চোখে চোখে রাখছিল। তাদের দুজনকে দেখতে পেয়েই ঘুরে দাঁড়াল হঠাৎ। লোকটার সেই হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ানোটা চোখে পড়াতেই ইসমাইলকে দেখতে পায়। লোকটার সেই হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ানোটা চোখে পড়াতেই ইসমাইলকে দেখতে পায় নসিরাম। দেখেই একটা চমক লাগে তার। বুকে একটা চড়াই পাখি কঁকিয়ে ওঠে। বিশেষ করে ইসমাইলের ধরনটাও ভালো ঠেকে না তার চোখে। অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে, চোয়াল শক্ত, ভ্রূ কোঁচকানো, ফর্সা মুখটা একটু রাঙা দেখাচ্ছে।

ইসমাইল তাদের নড়বার সময় দিল না। মাসুদের দোকান থেকে একটা লাফ মেরে রাস্তার মাঝখানে পড়ল।

কি রে শশালা! খুবমস্তান হয়েছিস?

রামতারণ তাহলে খবর দিয়েছে? অ্যাঁ! রামতারণ শালা শেষ অবধি খবর দিয়েছে তাহলে?

সতু কঁকিয়ে উঠে বলল, নসু! দৌড়ো! পালা!

নসিরামেরও বুকের মধ্যে তোলপাড়। তবু সে একটু সত্যিকারের হাসি হেসে বলল, আঃ! দাঁড়াও না। রামতারণ শেষ অবধি তো মনিষ্যির মানটা দিয়েছে না কি?

কী যে বলিস বিপদের সময়! দৌড়ো!

তুমি পালাও।

তুই?

জবাবটা দেওয়ার সময় পায় না সতু। ইসমাইল চট করে এসে বাঁ হাতে একটা রদ্দা মারল সতুর ঘাড়ে। সতু পড়ে গেল।

নসিরাম দেখল, ইসমাইল তার ছুরি বের করেনি। খুব রাগ হল তার। দু-দুটো লোককে শুধু হাতেই মেরে ক্ষান্ত হবে নাকি গুন্ডাটা? সে হাত ছড়িয়ে ইসমাইলের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, ঢ্যামনার মতো হাত চালাচ্ছো কেন?

আশ্চর্য! আশ্চর্য! ইসমাইল দ্বিতীয়বার হাত তুলতে গিয়েও একটু থমকে গেল। গনগনে গলায় বলল, কত বড়ো খুনিয়া হয়েছিস রে শালা রেন্ডির ব্যাটা? জানিস এটা আমার এলাকা।

জানি। কিন্তু আগে অস্ত্র বের করো, তারপর কথা। অত তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কিসের হে! বের কর শালা তোর অস্ত্র।

নিজের গলার স্বরে নসিরাম নিজেই অবাক হয়ে গেল। যেন এক বাঘ এসে এখন সেঁদিয়েছে গলার মধ্যে। খোনা স্বরটা আর পাওয়া যাচ্ছে না তো!

ইসমাইল একটু দ্বিধায় পড়ে গেছে। চারদিকে লোকজনও জড়ো হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। কোমরে জামার তলায় হাত রেখে সে স্থির চেয়ে বলল ফের এই তল্লাটে পা দিয়েছিস তো--

কিন্তু কথাটা শেষ হল না তার। নসিরাম হঠাৎ ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মতো তেড়ে গেল তার দিকে, রেন্ডির পুত আমি না তুইরে? অ্যাঁ! কাঁচা খেয়ে নেবো তোকে, রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবো শালা! আয়, আয় শালা...

কী যে হল তার হদিশ পাওয়া মুশকিল। তবে কেমন যেন ভড়কানো মুখে ইসমাইল পিছু হটতে লাগল

আয় শালা! আয় শালা! বলে এগোতে লাগল নসিরাম। হাতে অস্ত্র নেই। পেটে খোঁদল। গালে রামতারণের থাবড়া এখনো চিন চিন করছে। মাথায় পতুর তোলা তিনটে আলু। তবু

শুধু হাতেই সে হঠাৎ বেড়ালের মতো একটা লাফ মেরে গিয়ে পড়ল ইসমাইলের এক হাতের মধ্যে।

আর পারল না ইসমাইল। বোধহয় জীবনে এই প্রথম সে মুখ ঘুরিয়ে ছুট লাগাল। এক হাট লোকের চোখের সামনে।

নসিরাম নিজেও স্তম্ভিত হয়ে গেল ব্যাপারটা দেখে , সে লক্ষ করল চারপাশে জড়ো হওয়া শয়ে শয়ে লোক তাকে নীরবে দেখছে। তাদের চোখে ভয়।

একটু বেশি রাত করেই ফিরছিল দুজন। সতু আর নসিরাম।

সতু বলল, তোর সঙ্গে যে রাত বিরেতে রোজ ফিরি, কোনোদিন ভয় লাগে না। আজ লাগছে। তোকে আজ ভয় খাচ্ছি কেন রে?

নসিরাম নিজের মাথার তিনটে আলুতে হাত বুলিয়ে বলল, কি জানি কেন, আজ আমার নিজেরই নিজেকে এখন কেমন যেন ভয় ভয় করছে!

আত্মপ্রতিকৃতি

আমার ছেলে অন্তু--মহা শয়তান ছেলে--ছাদ থেকে আমাকে ডাকছিল। চেয়ে আলসে থেকে ঝুঁকে সে বাইরের দিকে বাড়ানো হাত নাচিয়ে বলছে, 'বাবা, বৃষ্টিং পততি। মিটমিটে ডান-এর মতো হাসছিল--খানিকটা ইয়ার্কির ভাব। কখন মেঘ করেছে আমি টের পাইনি। সারা দুপুরে ঝুলবারান্দায় ইজিচেয়ারে শুয়ে থেকে থেকে আমি কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। এখন দেখি সামান্য বৃষ্টি শুরু হয়েছে। নীচু মেঘ। গলির মুখের রাস্তা থেকে কুয়াশার মতো ভাপ উঠে আসছে। অন্তু ঝুঁকে আমাদের দেখছিল। বললাম, 'ওখানে কী করছ তুমি?' তেমনি ঠাট্টার মতো করে বলল, 'ঘুড়ি ওড়াচ্ছি।' সন্দেহ হল ও আমাকে নিয়ে খেলছে। বললাম, 'নেমে এসো।' উত্তর দিল না। তেমনি হাসছিল। অন্তুর ছাদে যাওয়া বারণ। এটা পুরোনো বাড়ি--আলসেগুলো তেমন জোরালো নয়--তা ছাড়া বৃষ্টিতে এখন সবকিছুই খুব পিছল। কিন্তু যেদিকে বারণ অন্তু সব-সময়ে ঠিক সেই দিকে চলে যাবে। আমি দেখছি ওকে ঠেকানো যায় না। প্রায় আপনমনে বললাম, 'তবে থাকো। তোমার জ্বর হবে।' ও এবার শব্দ করে হাসল, 'তুমি ঘুমোচ্ছিলে। আমি দেখলাম তোমার নাল গড়াচ্ছে।' অন্তুর মাথার উপর মেঘ বড় উজ্জ্বল। তাকাতে কষ্ট হচ্ছিল বলে আমি খবরের কাগজে চোখ আড়াল করে ওর দিকে দেখলাম, 'অন্তু নেমে এসো বলছি। কথা কানে যাচ্ছে!' ও গম্ভীর মুখ করে আলসের ধার থেকে মুখ লুকিয়ে বলে, 'আমি ত বলে এসেছি।' আমি চেঁচিয়ে বললাম কাকে! ওর ক্ষীণ কণ্ঠ শোনা যায়, 'তোমাকে।' আমি ইজিচেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠতে গিয়েও থমকে গেলাম। মনে পড়ল না আধোঘুমের ভিতরে আমি ওকে যেতে বলেছিলাম কি না। নিজেকে আমার ঘোর সন্দেহ হয়। হতাশ হয়ে আমি আবার ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বসি। মুহূর্তের মধ্যেই বৃষ্টির জোর বাড়ল। অন্তুর পায়ের শব্দ শোনা গেল--ছাদময় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। অন্তুর জন্য নয়--প্রতিভার কথা ভেবে আমার অস্বস্তি হচ্ছিল। প্রতিভা অফিসে থেকে এসে

যদি শোনে--অন্তু ছাদে গিয়েছিল--ভ্রূ কুঁচকে আমার দিকে তাকাবে, দু'একটা বাঁকা কথা বলতে পারে। কিন্তু রাস্তা থেকে ধোঁয়ার মতো ভাপ ঝুলবারান্দায় উঠে আসছিল, আমার পায়ের কাছে চূর্ণ বৃষ্টির ছাট, জলকণা ও ভারী বাতাস আস্তে আস্তে আমার মাথার ভিতরে জট পাকিয়ে দিল। চোখের পাতায় ঘুমের আঁশ ঝুলে আছে--নাকি বৃষ্টি! চোখ বুজতে মুহূর্তেই ঘুম ও স্বপ্ন আমাকে টেনে নেয়। দেখে প্রবল বৃষ্টির ভেতর অন্তুর মুখ আলসে থেকে ঝুলে আছে। মাথা মুখ ধুয়ে জল পড়ছে। আমি ওর দিকে চেয়ে হাসলাম। মুখ বাড়িয়ে দেখলাম রাস্তায় কেউ নেই, বাড়িগুলোর জানলা বন্ধ। আমি অন্তুর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললাম 'অন্তু, দ্যাখো তো কার্নিসটা কি খুব পিছল?' ও একটু হেসে কার্নিসে হাত বুলিয়ে বলল, 'খুব। কেন?' আমি হাসি ঠাট্টার ভাব বজায় রেখে বলি, 'আমি ছেলেবেলায় কার্নিসের ওপর কত হেঁটেছি। প্রথম প্রথম ভয় করে, কিন্তু আসলে ব্যাপারটা খুব সোজা--' ও তেমনি সকৌতুকে আমাকে দেখছিল। উত্তর দিল না। আমি কোনোক্রমে উত্তেজনা চেপে রেখে বললাম 'তুমি পারো?' ও কথা না বলে মাথা ঝাঁকিয়ে জানাল--পারবে। বললাম 'তোমাকে একটা প্রাইজ দেবো, যদি উঠতে পারো।' অন্তু খুব জোরে হেসে উঠল, 'পাগল! মা টের পেলে--'। আমি খুব হতাশ হলাম। অন্তু জানে আমি প্রতিভাকে একটু ভয় করি। অন্তু এমন অনেক কিছু জানে বলে আমার সন্দেহ হয়। মাঝে মাঝে হঠাৎ সন্দেহ হয় ও ওর নকল হাসির আড়ালে ভ্রূ কুঁচকে ভেবে দেখবার চেষ্টা করছে--ওর মা ও বাবার সম্পর্ক কতখানি আন্তরিক। সন্দেহ হয়--অন্তুকে আমার খুব সন্দেহ হয়। খানিকক্ষণ আমাকে দেখে নিয়ে অন্তু হঠাৎ বলল, 'বাবা, দ্যাখো--' তাকিয়ে দেখি অন্তু হাল্কা শরীরে টপ করে আলসের ওপর উঠল। 'সাবাস--' চাপা গলায় বললাম। ঝাপসা বৃষ্টির মধ্য দিয়েও দেখা গেল অন্তু চার-তলার কার্নিসের ওপর দিয়ে হাঁটছে--টালমাটাল ওর শরীর, দুহাত দুদিকে ছড়িয়ে দেওয়া--মুখে সেই ঠাট্টার হাসি। একেবারে কিনারায় গিয়ে দাঁড়াল ও, একটা পা শূন্যে বাড়িয়ে দিয়ে অন্তু হঠাৎ মুখ ফেরালে। আমি অত বৃষ্টির ভিতরেও ওর অসম্ভব গম্ভীর মুখ দেখতে পাই। ও বলল 'বাবা', একটা হাত আমার দিকে বাড়িয়ে একটা আঙুল তুলে আমাকে নির্দেশ করে বলল, 'তুমি... একটা পাগল...।' সেই মুহূর্তেই হাওয়া এসে ওকে ভাসিয়ে নিতে পারত,

বৃষ্টি ধুয়ে দিতে পারত ওকে। কিন্তু ও নিজেই লাফ দিল। বাইরের দিকে নয়, ছাদে লাফিয়ে পড়ল অন্তু। ওর হাহা হাসির শব্দ সারা ছাদময় ঘুরে বেড়াচ্ছে শুনে আমি হিম হয়ে গেলাম।

অসম্ভব ঘাম ও গরমের ভিতর ঘুম ভাঙতেই টের পাই অন্ধকার হয়ে এল। প্রতিভা অফিস থেকে ফিরেছে, শাড়ি বদলে এখন আঁচল দিয়ে মুখ মুছছে, এক্ষুনি বাথরুমে যাবে। এই সময়ে আমি প্রতিভাকে সবচেয়ে বেশি ভয় করি। এই সময়ে ও খুব শান্তভাবে কথা বলে। স্নান করে ও যথানিয়মে রান্নাঘরে যাবে। বেচারা!

অন্তু কোথায় থাকতে পারে আমি মনে মনে খুঁজে দেখছিলাম। ঝুঁকে দেখলাম রাস্তায় নেই। আমি ঘরে এলাম। প্রতিভা সঙ্গে সঙ্গে খাট ছেড়ে উঠল, তোয়ালে আর সাবান তুলে নিয়ে বাথরুমে চলে গেল। খাটের ওপর ওর ব্যাগ-ট্যাগ ছড়ানো রয়েছে। দেখি অফিস-লাইব্রেরি থেকে ও একটা বাংলা বই এনেছে--উপন্যাস। প্রতিভা বইটই পড়ে না--সময়ও পায় না। এটা আমার জন্য। বেশ মোটা বই--মনে হল হালকা বিষয় নিয়ে লেখা। এমন মোটা ও হালকা বই আমার পছন্দ--অনেকদিন ধরে পড়া যায়, আর মনের ওপর তেমন চাপ পড়ে না। আমি পত্রিকায় রাহাজানি, সুখ-দুঃখ পলিটিক্সের খবর বাদ দিই, সিনেমার পাতা রোজ পড়ি। তেমন বেলেল্লা হালকা ধরনের ছবি হলে আমি মাঝে মাঝে প্রতিভাকে অন্তুকে ফাঁকি দিয়ে চলে যাই। না, ভাবনা-চিন্তা শুরু করে দিতে পারে এমন কোনো কিছুই আমি আর চাই না।

প্রতিভা স্নান সেরে এসে দেয়ালে ঝোলানো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বলে, অন্তুকে তুমি একটু সামলে রেখো। আজকেও ছাদে গিয়েছিল।

কই!

গিয়েছিল। বলল, তুমি যেতে বলেছ। 'আমি ওকে ভিতরের বারান্দায় নীলডাউন করে রেখেছি।

আমি হাসলাম, আমি ছাদে যেতে বলিনি ত!

'কি জানি, বলছিল তো।' প্রতিভা ভ্রূ কোঁচকায় 'হয়ত--তুমি অন্যমনস্ক ছিলে।'

আমি একটু ভেবে দেখবার ভান করি। যেন কিছু একটা মনে পড়বে আমার। নিজেকে আমার ঘোর সন্দেহ হয়।

'আর ফিরে এসে দেখি--' প্রতিভা গালের ওপর একটা ব্রণকে টিপে দিতে দিতে বলল 'ওপরের বারান্দার রেলিঙে দাঁড়িয়ে নিচের তলায় থুথু ফেলছে। ঠিক সান্যালদের চৌবাচ্চার ওপর। ওরা দেখতে পেলে--' প্রতিভা নিস্পৃহভাবে পাউডারের পাফ তুলে নিল।

'অন্তু?'

'তা ছাড়া আবার কে!' বলে বোধ হয় সন্দেহ হওয়াতে ও হঠাৎ আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'তুমি হাসছ?' পরমুহূর্তেই মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে নিজের ছায়ার দিকে তাকাল। চেয়ে চেয়ে দেখি আধ-ভেজা ঘাড়ে গলায় ব্লাউজের ফাঁকে পাউডার ছড়াচ্ছে। হঠাৎ ধীর গলায় কেটে কেটে বলল, 'এ সব স্বভাব ভাল নয়।' ওর ভ্রূ কোঁচকানো। হয়তো চশমা ছাড়া দেখতে ওর অসুবিধে হয়। একজোড়া চশমা প্রতিভার ছিল। ওর চোখ ভালো নয়। কিন্তু চাকরি পাওয়ার পর থেকে ও চশমা পরা ছেড়ে দিয়েছে। আমি ওকে আজকাল তেমন লক্ষ করি না--কে জানে হয়তো, চশমায় ওকে একটু বুড়ো বুড়ো দেখায়।

তা হোক। প্রতিভাকে আমি সুন্দর দেখি--অন্তত এখন দেখছি। ধোয়া মোছা কপালের ওপর এখন ও মনোযোগ দিয়ে সিঁদুরের টিপ বসিয়ে দিচ্ছে। ঘাড়টা নোয়ানো, পিঠ বাঁকা, দুটো চোখ আয়নার ভিতরে জ্বল জ্বল করছে। সিঁথিতে সিঁদুর দিল ও। ওর এই সব ছেলেমানুষি অভ্যাস আমি পছন্দ করি। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে জোর নিশ্বাস ছাড়ল প্রতিভা। একটু হেসে বলল, 'দুপুরে খুব ঘুমিয়েছ তো? চোখমুখ ফুলে গেছে।' উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করে প্রায় একই স্বরে বলল, 'অফিসে আজ ওরা তোমার কথা বলছিল।'

কি রকম?

'এই যেমন, তুমি সোশ্যালে একবার ক্যারিক্যাচার করেছিলে আমায় নিয়ে--আমাকে বলনি।' ও বিছানার ওপর থেকে ওর ছড়ানো ব্যাগট্যাগ কুড়িয়ে নিতে নিতে বলল, 'ক্যারিক্যাচারটা আমায় একবার দেখাবে?'

আমি হেসে বললাম, 'আর কিছু বলে নি?'

'বলছিল।' হাসি সামলে ভ্রূ কোঁচকাল প্রতিভা, 'সে অনেক কথা। সব মনে থাকে?' প্রায় একই রকম অনুচ্চ স্বরে অন্তুকে ডাকল প্রতিভা। '..... ঘরে এসো।'

অন্তু ঘরে আসতেই ওর হাসিটা আমার চোখে পড়ল। দেখে কে বলবে যে, ঘন্টাখানেক ও নীলডাউন হয়ে ছিল! কোনো শারীরিক কষ্টের চিহ্ন ওর চোখে মুখে কোথাও ছিল না। আমার মনে হয় ওকে শাসন-টাসন করে কোনো লাভ নেই। ওর ইস্কুলের মাস্টাররাও পারে নি। ওর বয়স মাত্র দশ--কিন্তু এই বয়সেই অন্যান্য ছেলেকে নষ্ট করে দিচ্ছে সন্দেহে ওকে ইস্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। শুধু প্রতিভার সন্দেহ ছিল যে, স্কুলটাই ওকে নষ্ট করছে। কিন্তু আমার মনে হয় অন্তুর এসবে কিছু আসে যায় না। নিজের ভালমন্দ সে নিজেই বুঝতে শিখেছে।

প্রতিভা অন্তুকে কাছে ডেকে ওর কানে কানে কোনো কথা বলল, তারপর রান্নাঘরের দিকে চলে গেল প্রতিভা। অন্তু আমার দিকে চেয়ে হাসল, 'বৃষ্টি থেমে গেছে বাবা।'

আমি ওর কথার অর্থ বুঝতে না পেরে বললাম, 'হুঁ।'

'মা বলল, তোমাকে নিয়ে একটু বেড়িয়ে আসতে।' ওর হাসিটা একটু বেঁকে গেল--'অত বসে থাকলে তোমার বাত ধরে যাবে।'

কোমরে হাত রেখে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইল। চোখে হাসির কোনো চিহ্ন নেই। তাই মুখের হাসিটা হঠাৎ নকল বলে মনে হয়। বোধ হয় ও সবসময়ে একইরকম হাসে--কিন্তু আমার কাছে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অর্থ দাঁড়িয়ে যায়।

কিছুক্ষণ আমরা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইলাম--চোখে চোখ রেখে। তারপর অন্তু দেওয়ালের হুক-এ ঝোলানো তার শার্ট পেড়ে নিয়ে মাথা গলাতে গলাতে বলল 'দুপুরবেলা আমি ছাদ থেকে ঠিক যেন টেলিফোনের শব্দ পেলাম।' শার্টের বুক চিরে ওর রুক্ষ চুলওয়ালা মাথাটা বেরিয়ে এল--'আর মনে হল তুমি একা কার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলছ।'

আমাদের টেলিফোন নেই। আশেপাশে কোথাও নেই। কিন্তু মনে হয় অন্তু ঠিক বলছে--দুপুরে আমিও টেলিফোন বেজে যাওয়ার শব্দ শুনেছি! ঠিক জানি না--আবছাভাবে মনে

পড়ে আমি হাতের খবরের কাগজটা মুড়ে এক হাতে নিয়ে ঘরে এসে অন্য হাতে অন্যমনস্কের মতো টেলিফোন তুলে কারো সঙ্গে কথা বলেছি!

অন্তু হঠাৎ খিলখিল করে হেসে বলল, 'আজ তুমি আবার পাগলামি করছিলে বাবা।'

'না, অন্তু--' আমি প্রাণপণে দুপুর বেলার কথা মনে করবার চেষ্টা করে বললাম, 'কিন্তু টেলিফোনের শব্দ....?'

'তুমি ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে রেখেছিলে।'

আমার মনে পড়ল না। বললাম, 'মনে পড়ে না তো! বোধ হয় না!'

'তবে মা দিয়ে রেখেছিল। ঠিক তিনটের সময় তোমাকে নতুন ওষুধটা দেওয়ার কথা ছিল। আমি ভুলে গেছি।' শার্টের বোতাম লাগাতে লাগাতে বলল 'তুমি মাকে বলে দেবে নাতো!'

'ঠিক আছে!'

'আমিও বলব না।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে অন্তু--' আমি কথা চাপা দেওয়ার জন্য বলি, 'কিন্তু তুমি চলেছ কোথায়?'

'দোকানে। এলাচ কিনে আনবো।'

আমার ঘোর সন্দেহ হয় অন্তু ঠিক আমার দলে নয়। আবছাভাবে হঠাৎ মনে হয় আমাদের তিনজনের ভিতরে একটা অদৃশ্য জোট বাঁধবার চেষ্টা আছে। ঠিক ধরা-ছোঁয়া যায় না, কিন্তু বোঝা যায়। প্রতিভা আর অন্তু সবসময়েই এক দলে, আমি আলাদা। কিন্তু মাঝে মাঝে ভুল করে মনে হয়, আমি আর অন্তু এক দলে, প্রতিভা আলাদা , কিংবা আমি আর প্রতিভা একদলে, অন্তু আলাদা।

অন্তু বেরিয়ে গেলে আমি আবার বারান্দার ইজিচেয়ারে এসে বসি। একা। এ জায়গাটা বেশ ঠান্ডা। আবছা অন্ধকার। দুপুরবেলা আমি কার সঙ্গে কথা বলেছি--মনে পড়ল না। আমি আবার ভেবে দেখবার চেষ্টা করি।

আজকাল আমি ভাবনা চিন্তা করবার অনেক সময় পাই। ঠিক ন' মাস আগে আমার একটা অসুখ হয়েছিল। তেমন কিছু নয়--কয়েকদিন খুব জ্বর হয়ে সেরে গেল। কিন্তু সেই অসুখটার ভিতরে কোনো কারসাজি ছিল যা আমি এখনো বুঝতে পারি না--কেননা, তারপর একদিন অফিসে গিয়ে দেখি আমাকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে। কেন--আমি ভেবে পেলাম না। কেউ কিছু বলতে পারল না--ইউনিয়ন থেকে কোনো হইচই হল না--ঠিক একমাস পরে আমার চাকরি গেল। আমি তাতে খুব দুঃখিত হইনি। চিঠিতে লেখা ছিল, আমাকে আর কাজের উপযুক্ত বলে বিবেচনা করা হচ্ছে না। সে কথা আমিও স্বীকার করি। বরাবরই আমি চাকরির অনুপযুক্ত ছিলাম--আমি জানি। কতৃর্পক্ষ সেটা এতকাল টের পাননি কেন--এই প্রশ্ন করে ও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার ওপরওয়ালাদের একটা চিঠি দিই--কখনো যার উত্তর পাওয়া যায়নি। আমার চাকরি গেলে সেই একই ফার্মে প্রতিভা চাকরি পেল। কি করে প্রতিভা কান্ডটা করল--নাকি ওপরওয়ালাদের দয়া--তা আমার একদম জানা নেই। আমি জানতে চাইও না। এই জেনে সুখে আছি যে, আমাকে আর চাকরি করতে হচ্ছে না--কোনো কাজ দেওয়া হচ্ছে না আমাকে। এমন সম্মানজনক অবসর-যাপনের জন্য--সত্যি কথা বলি--একটা গোপন ইচ্ছা আমার বরাবর ছিল।

আমাদের ছেলেবেলার কলকাতায় জিওল হালদারকে দেখেছি এই রকম অবসর যাপন করতে। যতদূর মনে হয় জিওল হালদারের চেষ্টা ছিল কি করে বৃক্ষের মতো রাগে ও বিরাগে সমান বিকারহীন থাকা যায়! আমিও ভেবে দেখছি এমনভাবে আত্মপরবোধ লুপ্ত করে দেওয়া যায় কি যখন প্রতিভার জন্যে, অন্তুর জন্য, নিজের জন্য আর কিছুই করবার ইচ্ছে থাকে না! এই রকম বোধ থেকেই কি কেউ কেউ সন্ন্যাস নিয়েছিল--সংসার ছেড়ে গিয়েছিল কেউ কেউ?

জিওল হালদারের লৌকিক নাম ছিল গীতার বাবা। আমাদের ছেলেবেলার সেই গীতাকে একদিন যারা স্কুল থেকে ফেরার পথে চুরি করে গাড়িতে তুলে নিয়ে গিয়েছিল, এক রাত্রির পর তারা পরম বৈরাগ্যের সঙ্গে ফোর্ট উইলিয়মের কাছের মাঠে তাকে ফেলে যায়। এই ঘটনার পর গীতা নিউমোনিয়া হয়ে মারা গেল। গীতা মারা গেলে গীতার বাবা জিওল হালদার এই ব্যাপারে তার কি করণীয় ছিল, কর্তব্য ছিল, তা রাস্তার লোককে ধরে ধরে

জিজ্ঞেস করে বেড়াল। এইভাবে গীতার গল্পটা চারদিকে ছড়িয়ে যায়। তারপর একদিন চাকরি ছেড়ে দিয়ে ঘরে ফিরল জিওল হালদার, শাবল আর কোদাল নিয়ে গম্ভীরভাবে নিজের বাড়ির উঠানে একটা গর্ত খুঁড়ল, তার ওপর লতাপাতার ছাউনি দিল রোদ-জল আটকাবার জন্য, তারপর একদিন সেই গর্তের ভিতরে ঢুকে গেল গীতার বাবা। ছেলেবেলার সেই গুহার অন্ধকার ও রহস্য আমাকে খুব টানত। কিন্তু গুহার ঠিক মুখের কাছেই দাঁড়িয়ে থাকত 'সীতু'--জিওল হালদারের বছর ছয়েকের মেয়ে--আমাদের পথ আটকে বলত 'ভিতরে যাওয়া বারণ'।

কেন?

ফিক করে হেসে বলত, 'বাবা যে ন্যাংটো!

আধপাগল জিওল হালদারের সেই গুহার কাছে আমি মাঝে মাঝে গেছি। কখনো দেখা হয়নি। ওখানটা কেমন? অন্ধকারে জিওল হালদারকে দেখা যেত না--মাঝে মধ্যে তার গলা পাওয়া যেত। আমি জিওল হালদারকে কখনো কখনো জিজ্ঞেস করেছি 'ওখানটা কেমন, ভয় করে না?' উত্তর পাওয়া যেত 'বেশ বাবা, বেশ জায়গা এটা।' 'আপনি কি ধ্যান করছেন?' 'না বাবা, আমি বিকারহীন হওয়ার চেষ্টা করছি। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক সহজ বৃক্ষের মতো প্রাকৃতিক হতে পারে কি না দেখছি। কেননা প্রকৃতি বিকারহীন ও উদাসীন, তার কোথাও এতটুকু আবেগ নেই।' ছেলেবেলায় দেখা সেই গুহা আমাকে এখনো মাঝে মাঝে টেনে ধরে। জিওল হালদারের সেই অন্ধকার ও অবসর কতকাল আমার মাথায় বাসা বেঁধে ছিল। আমি এখনো সেই গুহা খুঁজে পাইনি, না সেই অন্ধকার, না সেই অবসর। এ কি সহজে পাওয়া যায় না।

ঘরের ভিতর থেকে একটা মানুষের ছায়া বারান্দায় আমার পায়ের কাছে পড়ে ছিল। আমি প্রথমটায় লক্ষ করিনি, হঠাৎ চোখ পড়তেই চমকে উঠে দেখি--প্রতিভা। বললাম, 'কী হল?'

'কিছু না।' ও বলল 'আমি শুনছিলাম তুমি আপনমনে কি যেন বলছ।' অদ্ভুতভাবে আমার দিকে তাকাল প্রতিভা।

আমি বাধো বাধো গলায় বললাম, 'কি বলছিলাম?'

'কি জানি। জিওল হালদার না কি যেন!' ও বলল, 'অন্ধকার না অবসর কি যেন বলছিলে।'

আমি হাসলাম। প্রতিভা আমার কাছে এসে বলল, 'আমি বলি কি তুমি অত ভেবো না। বরং মাঝে মাঝে ঘুরে-টুরে এসো।' ও খুব সহৃদয়ভাবে বলল, 'অন্তুকে নিয়ে মাঝে মাঝে পড়াতে বোসো।'

আমি উঠে পড়লাম।

আমি আর অন্তু পাশাপাশি খেতে বসলে প্রতিভা মাঝে মাঝে এটা ওটা আনতে রান্নাঘরে যাচ্ছিল। তারই এক ফাঁকে অন্তু বলল, 'বাবা, আমি টেলিফোনের কথাটা মাকে বলে দিইনি।'

'ঠিক আছে।' আমি সন্তর্পণে বললাম, 'তুমি শুনেছ আমি কার সঙ্গে কথা বলছিলাম?'

'হ্যাঁ-অ্যা!' অন্তু হাসল 'আমি দেখলাম তুমি টেবিল থেকে তোমার ফাউন্টেন পেনটা তুলে নিয়ে ঠিক ফোনের মতো কানের কাছে ধরে রন্টু না কার সঙ্গে যেন কথা বলছিলেহ্ল'

রন্টু! কতকাল এই নামে আমাকে কেউ ডাকে নি! রন্টু! হঠাৎ আনন্দে আমি কানায় কানায় ভরে উঠলাম। এ আমার ডাক নাম। আমার ছেলেবেলার নাম!

অন্তু আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। হঠাৎ বলল, 'আমিও মাঝে মাঝে তোমার মতো টেলিফোনে কথা বলি।'

'কার সঙ্গে!'

অন্তু সকৌতুকে হেসে বলল, 'কারো সঙ্গেই নয়। ওপাশে কাউকে ভেবে নিই। ঠিক তোমার মতো।'

আমি হেসে উঠলাম। অন্তু হেসে উঠল। প্রতিভা দরজায় এসে থমকে দাঁড়াল। পর মুহূর্তে হেসে বলল, 'কি হচ্ছে তোমাদের? এত আনন্দ কীসের!'

অন্তু আমার দিকে তাকাল। আমি তাকালাম ওর দিকে। অন্তু দু'হাত ওপর দিকে ছুঁড়ে বলে উঠল 'উঃ, আমার পেট ভরে গেছে, মা। আমার ঘুম পাচ্ছে।'

আমি খাটের ওপর আলাদা শুই। অন্তু আর প্রতিভা মেঝের বিছানায় আলাদা শোয়। গত ন' মাস এই রকম চলে আসছে। আমি প্রতিভাকে ডাকি না। কাছে ডাকি না। ঘর অন্ধকার হয়ে গেলে আমি নিঃসাড়ে পড়ে থাকি। ঘুমের ভান করি। ঘুম আসে না। আর ঘরের সেই অন্ধকার জুড়ে আমার ছেলেবেলার বান ডেকে যায়। আশ্চর্য! একি প্রত্নতাত্ত্বিক--যা কিছু প্রাচীন যা কিছু মূল্যবান সব সেই ছেলেবেলায়! যতো বুড়ো হচ্ছি আমি তত সেই ছেলেবেলার অর্থ জানছি, আরো জানতে চাইছি! আমি কি বড়ো হয়ে আর নতুন কিছুই শিখিনি, যা কিছু শিখেছিলাম--সব সেই ছেলেবেলায়? তাই মনে হয় আমি মাঝে মাঝে অলীক টেলিফোন বেজে উঠবার শব্দ শুনি। দেয়ালের ভিতরে, কিংবা জানলার শার্সিতে লুকোনো গোপন টেপরেকর্ডার হঠাৎ কথা বলতে শুরু করে। অন্ধকারে বুকের ভিতরে কড় কড় করে টেলিফোন আমাকে ডাক দেয়, 'রন্টু, রন্টু, এই যে--' , আমি পাগলের মতো উঠে বসি, হাত বাড়াই, অদৃশ্য অলীক টেলিফোন তুলে নিই, আমার স্বয়ংক্রিয় ঠোঁট কথা বলে যায় 'এই যে, রন্টু, এই যে--।'

না, আমার প্রতিভাকে প্রয়োজন বলে মনে হয় না। এমন অনেক কিছুকেই প্রয়োজনহীন বলে মনে হয়। মনে পড়ে ছেলেবেলায় আমাদের গলির মুখেই ছিল বুড়ো অল্লুর দর্জির দোকান। সেখানে ছড় ছড় করে চারটে ভাঙা মেশিন চলত। বুড়ো অল্লু বসত মেঝেয় মাদুরের ওপর--নমাজ পড়বার মতো পবিত্র ভঙ্গিতে। উলটো দিকেই ছিল একটা হাজামাজ পুকুর। সেখানে গাড়োয়ান আর গয়লারা তাদের গরু-মোষ চান করাত। 'এই এক ফোঁড়... এই আর এক ফোঁড়।' বুড়ো অল্লু হাত-সেলাই করতে করতে বলত 'দে তো সাজ্জাদ, একটা বিড়ি...।' সাজ্জাদ বিড়িটা অল্লুর ঠোঁটে লাগিয়ে দিলেই অল্লু বলত 'রমজান ধরিয়ে দে...হুল্ল' এই সব কিছুর ফাঁকে ফাঁকে চাঁদির চশমার ওপর দিয়ে অল্লু পুকুরের দিকে তাকিয়ে দেখত। কতদিনের সেই পুকুর! কতদিনের সেই বুড়ো অল্লু! আমরা যেতাম রঙিন কাপড়ের টুকরো কুড়িয়ে আনতে। সুতো ফুরিয়ে যাওয়া কাঠের রিল, ভাঙা ছুঁচ--এই সব খুঁজে দেখতাম। হঠাৎ বুড়ো অল্লু 'ধর... ধর...' বলে চেঁচিয়ে উঠলে আমরা পালাতাম। অল্লু

ফোকলা মুখে হেসে উঠত হঠাৎ। আস্তে আস্তে ক্রমশ সেই রঙিন কাপড়ের টুকরো, কাঠের রীল, ভাঙা ছুঁচ আমার কাছে প্রয়োজনহীন হয়ে গেছে--যেমন সেগুলো প্রয়োজনহীন ছিল বুড়ো অল্লুর কাছে। ভেবে পাই না আমি কখনো এত বড়ো, এত বুড়ো হবো কি যখন সেই রঙিন কাপড়ের টুকরোর মতো, কাঠের রিল ও ভাঙা ছুঁচের মতো সব--সব কিছুকেই--অন্তুকে, প্রতিভাকে, আমার চলে-যাওয়া চাকরিকে প্রয়োজনহীন বলে মনে হবে? ...ভালোবাসার ছিল, ভয়ের ও রহস্যের ছিল আমার ছেলেবেলা। কত তুচ্ছকেই প্রয়োজন ছিল আমার!

অনেক রাতে হঠাৎ তন্দ্রা ভেঙে শুনি এক্কাগাড়ির আওয়াজ। অনেক দূর পর্যন্ত সেই আওয়াজ শোনা গেল নিশুতি রাত চিরে চলেছে। ক্রমশ সেই আওয়াজ আমার মাথার ভিতরে গভীর থেকে গভীরে চলে গেল। প্রতিভা ঠিকই সন্দেহ করে--আমি ঠিক স্বাভাবিক নই। আমিও সন্দেহ করি, বড়ো সন্দেহ করি আমাকে।

অসুখের পর থেকেই আমার ভিতরে কয়েকটা ছোটখাটো ভাঙচুর হয়ে গেছে--আমি টের পাই। ব্যাপারটা আমি প্রথম বুঝতে পারি অসুখের পর একদিন। কাকে যেন চিঠি লিখবার ছিল। পোস্ট অফিসে গিয়ে আমি পোস্টকার্ড কিনলাম, তারপর চিঠি লিখবার জন্য স্ট্যান্ডের ওপর হেলানো বোর্ডের কাছে দাঁড়িয়ে আমি অনেকক্ষণ ধরে চিঠিটা লিখলাম। তখনো সব কিছু ঠিকঠাক স্বাভাবিক ছিল। যতদূর মনে পড়ে আমার ডান হাতে কলমটা ছিল, বাঁ হাতে ছিল পোস্টকার্ড। চিঠিটা পড়তে পড়তে ডাকবাক্সের কাছে এসে মুখ তুলেই সেই ঘোর লাল রঙের ডাকবাক্স, সার্জেন্টদের মতো কালো চুপি পরা, তার নীচে কালো হাঁ-এর মতো গর্ত দেখে--আমি স্পষ্ট টের পেলাম আমার ভিতরে কি একটা গোলমাল হয়ে গেল। আমার একহাতে কলম ছিল, অন্য হাতে পোস্টকার্ড--দু হাতে দুটো জিনিস। কিন্তু আমি কোনটা ডাকবাক্সে ফেলবার জন্য এসেছি কিছুতেই ঠিক করা গেল না। কোনটা কি--এই বাক্সের সঙ্গে কোনটার সম্পর্ক রয়েছে ভেবে না পেয়ে আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। ভাবলাম, অল্প পরেই এই ধোঁয়াটে ভাবটা কেটে যাবে। কিন্তু কাটল না--আমি কলম ও পোস্টকার্ড--দুটো জিনিসের কোনোটাকেই চিনি বলে মনে হল না। ভাবছিলাম কাউকে ডেকে জিজ্ঞেস করা যায় কি না, 'মশাই, দেখুন তো আমার দুহাতে দুটো জিনিস-এর মধ্যে

কোনটা ওই বাক্সে ফেলা উচিত!' কেউ পাছে আমার ওই অবস্থা লক্ষ করে এই ভয়ে আমি লটারি করে--একটা হাত তুলে ডাকবাক্সে জিনিসটা ফেলে দিলাম।

এর ফল আমাকে ভুগতে হয়েছিল। যতদূর মনে পড়ে তারপর অনেকক্ষণ ওই ডাকবাক্সের কাছে দাঁড়িয়ে পিওনের জন্য অপেক্ষা করেছিলাম আমি। চেনা পিওন ছিল, জিজ্ঞেস করল, 'কি করে পড়ল?' আমি বানিয়ে বললাম, 'দুটোই এক হাতে ধরা ছিল, চিঠিটা ফেলতে গিয়ে হাত ফস্কে--' পিওনটা আর কিছু বলল না, ডাকবাক্স খুলে, কলমটা পেয়ে দিয়ে দিল। আমার সেই কালো কলমটা--যেটা আমি মাঝে মাঝে টেলিফোনের মতো ব্যবহার করি--অন্তু দেখেছে।

এ রকম কেন হয়, কেন হচ্ছে? মাঝে মাঝে সব কিছু একাকার হয়ে যায়। কাচের গ্লাস, টেবিল ও দেয়ালের পার্থক্য কিছুক্ষণের জন্য লুপ্ত হয়ে যায়। কোনটা কি, কোনটা কেন--আমি বুঝে উঠি না। বুঝে উঠতে পারি না দামিনী ঝির সঙ্গে প্রতিভার পার্থক্য কোথায়। ভয় হয় ভিড়ের থেকে যদি চিনে বার করতে হয় আমি কিছুতেই প্রতিভাকে, অন্তুকে আলাদা করে বলে দিতে পারব না 'এই আমার বৌ প্রতিভা, এই আমার ছেলে অন্তু।'

এই আমার বৌ প্রতিভা, এই আমার ছেলে অন্তু! আমি অন্ধকারে হেসে উঠি। নিজেকে আমার পাকা ঘুঘুর মতো মনে হয়--সব জানে-শোনে অথচ ভান করে।

পরদিন কি উপলক্ষ্যে যেন ছুটি ছিল। আমি জানতাম না। প্রতিভার গড়িমসি ভাব দেখে বুঝতে পারলাম। আশ্চর্য, আগে সব ছুটির দিন আমার মুখস্থ ছিল। আজ ছুটি কেন--ভেবে পেলাম না।

ছুটির দিনে প্রতিভা ঘরে থাকলে আমি ঘুমোই না, ছোটোখাটো কাজ করি, দাড়ি কামাই, বই পড়ি কিংবা ঘরময় পায়চারি করি। প্রতিভা সাজগোজ করে বেরিয়ে পড়ল। কয়েকটা টুকিটাকি জিনিসপত্র কিনবে, আর সময় পেলে সিনেমায় যেতে পারে--অফিসের কোন বান্ধবীর সঙ্গে সেই রকম কথা হয়ে আছে।

আমি প্রতিভাকে সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে ফিরে আসবার সময় লক্ষ করলাম অন্তু একটা চেয়ারের সঙ্গে লাঠি কাঠি বেঁধে কি একটা তৈরি করছে। আমাকে দেখে বলল, 'বাবা, আমি

টেবিল-ঘড়িটা একবারটি নেবো,' একটু চোরা হাসি হেসে বলল, 'খুব সাবধানে নেবো, ভাঙব না! নেবো?'

আমি ওর তৈরি করা জিনিসটা দেখছিলাম, 'কি এটা!'

'টাইম মেশিন।' অন্তু উত্তর দিল।

'কি হবে এটা দিয়ে?'

ও লঘু ঠাট্টার সুরে বলল, 'এটাতে চড়ে আমি আমার বুড়ো বয়সটা দেখে আসবো।' বলেই ঘরের দিকে দৌড় লাগাল অন্তু। ঘর থেকে চেঁচিয়ে বলল, 'ঘড়িটা নিচ্ছি কিন্তু, বাবাহু'

আমি অন্যমনস্কের মতো বললাম, 'ভেঙো না।' তারপর আস্তে আস্তে ঝুল-বারান্দার ইজিচেয়ারে এসে বসলাম, হাতে প্রতিভার আনা মোটা উপন্যাসটা ছিল। কয়েক পাতা পড়ে দেখা গেল একটা ছেলের সঙ্গে একটা মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না, নানা সামাজিক কারণে এবং দারিদ্র্য ইত্যাদি দুঃখের ভেতর দিয়ে গল্পটা শুরু হয়েছে। আমার ঘুম পেয়ে গেল। আমি যদি ভালোবাসতে চাই কখনো, তবে প্রতিভাকেই ভালবাসার চেষ্টা করে দেখব। যদি দশ মিনিটের জন্যও ভালোবাসতে পারি তবে কেন সেই দশ মিনিটই আমার সারাজীবনের জন্য যথেষ্ট নয়! দশ মিনিট--মাত্র দশ মিনিট কেন যথেষ্ট নয় এই বিষয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করতে করতে একদিন আমরা সবাই বিবাহহীন সমাজে পৌঁছে যাবো। ভার নেই, দায় নেই--সহজিয়া সেই দশ মিনিটের শুদ্ধ ভালোবাসার জন্যে পৃথিবীর সবাই অপেক্ষা করে আছে।

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ ডাক শুনি 'রন্টু, এই যে, বন্টু--'। আপাদমস্তক ভয়ংকর চমকে উঠে ঘুমচোখে চেয়ে দেখি বাচ্চা রন্টু বারান্দার কোণে দাঁড়িয়ে আছে। আমি ধড়ফড় করে উঠবার চেষ্টা করে বলি, 'রন্টু?...কি করে এলে?'

একটা হাত তুলে ও বলল, 'চেয়ে দ্যাখো।'

'কি?'

'টাইম মেশিন।' বলেই খিলখিল করে হেসে উঠল রন্টু। আমি দুহাতে চোখ রগড়ে ঘুম ছাড়িয়ে দেখলাম--অন্তু। অন্তু হাসিমুখে বলল, 'তুমি ভয় পেয়েছিলে, বাবা?'

'না।' আমি হাসলাম, ব্যাপারটা চাপা দেওয়ার জন্য বললাম, 'তোমার মেশিনটা তৈরি হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ--অ্যাঁ।' অন্তু বলল, 'আমি একটা টেলিফোনও তৈরি করেছি। দ্যাখো--' চেয়ে দেখি দুটো দুটো চারটে দেশলাইয়ের খোল, অনেকটা সুতো জড়ানো। অন্তু বলল, 'আজ তোমার সঙ্গে কথা বলব বাবা, তুমি এখানে থাকবে, আমি থাকব ছাদে।'

'বেশ তো।' আমি হেসে বললাম।

'তুমি মাঝে মাঝে রন্টু না কার সঙ্গে কথা বলো। আজ আমি হবো সেই রন্টু--' অন্তু মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, আর তুমি কি হবে বাবা!'

বলতে গিয়েও আমি বললাম না। অন্তু জানে না রন্টু আমারই ডাক নাম। সামলে নিয়ে বললাম, 'আমাকেও রন্টু বলে ডেকো।'

'আচ্ছা! আজ মজা হবে।' তারপর তাড়াহুড়ো করে আমাকে ওর টেলিফোন সম্বন্ধে বুঝিয়ে দিল, 'এখানে একজোড়া টেলিফোন আছে। আমি যেটা দিয়ে কথা বলব তুমি সেটাতে শুনবে, আর তুমি যেটাতে কথা বলবে সেটাতে আমি শুনব। ভুল কোরো না যেন।'

'না।' আমি মাথা নেড়ে জানালাম।

'আমার সুতো কম, ঘরের ভিতর দিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না।' অন্তু সুতো খুলতে খুলতে বলল, 'বরং তুমি এ পাশ দিয়ে আলসের ওপারে খোল দুটো ছুঁড়ে দাও। আমি ছাদে গিয়ে ধরব।'

আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম।

অন্তু ঘরের চৌকাঠে পা দিয়ে আবার পিছু ফিরে বলল, 'ও দুটো ছুঁড়ে দাও বাবা।' বলে চলে গেল। আমি দেশলাইয়ের সুতো-বাঁধা খোল দুটো আলসের ওপারে ছুঁড়ে দিলাম, ঠক করে সে দুটো ছাদের শানের ওপর পড়ল।

অন্তু ঘরের ভিতর দিয়ে ভিতরের বারান্দায় যাবে, তারপর সিঁড়ি ভেঙে ছাদের ওপর উঠবে। আমি ততক্ষণ অপেক্ষা না করে দেশলাইয়ের একটা খোল--যেটা কানে দেওয়ার--সেটা কানে চেপে ধরলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে কার ধীর গম্ভীর গলা ভেসে এল, 'রন্টু এই যে রন্টু--।' খুব ক্লান্ত স্বর--এ তো আমার অন্তু নয়! রোমকূপ শিউরে উঠল, তড়িৎপ্রবাহ বয়ে যেতে লাগল মাথার ভিতর দিয়ে। এ কি রন্টু? না কি অন্তুর এই টেলিফোন আমারই গলার স্বর আমাকে ফেরত দিচ্ছে? পর মুহূর্তেই স্রোতের মতো সেই স্বর আমাকে আক্রমণ করে 'রন্টু, হ্যালো রন্টু--'

আমি কেঁপে উঠি, কাঁপা গলায় বলি 'এই যে এখানে আমি--'

'তুমি সেই পাগল রন্টু তো--প্রতিভা যার বৌ--অন্তু যার ছেলে?'

'আমিই সে। আমি সেই রন্টু। আমি অন্তুর বাবা। প্রতিভার স্বামী।'

'তবে?' প্রশ্ন ভেসে এল।

তবে কি? তবে কি?

তুমি ভেবেছিলে এরা কেউ তোমার নয়? কোনো কিছুতেই তোমার আর প্রয়োজন নেই?

'কিন্তু--' আমি স্খলিত স্বরে ব্যগ্রভাবে বলি, 'এরা ছাড়া কি আমার পরিচয় আমি জানি না।'

'তুমি যা চেয়েছিলে তোমাকে তাই দেওয়া হল--সেই অবসর আর সেই অন্ধকার তুমি পাবে।'

ফোন কেটে গেল।

হতচকিত আমি তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে নিলাম। আরো ধীর, আরো দুঃখী ও শান্ত হয়ে গেলাম আমি।

অন্তু দুড়দাড় করে সিঁড়ি ভেঙে এল 'তুমি আমার কথা শুনতে পাওনি বাবা?'

'পেয়েছি।' আমি ধীর গলায় বলি।

'তবে তুমি কি সব উলটোপালটা বলছিলে! আমার কথার জবাব দিলে না!'

আমি ওকে কাছে টেনে আনলাম। হাত কেঁপে গেল। কিছুই বললাম না আমি। জানি, ওর সঙ্গে কথা বলতে পারি এমন কোনো ভাষা আমার জানা নেই। আমি জানি না, এখন আর আমার কথা কেউ কখনো বুঝবে কি না!

না, আমি আর ফিরে যেতে পারি না।

বুদ্ধিরাম

বুদ্ধিরাম শিশিটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছিল। লেবেলে ছাপা অক্ষর সবই খুব তেজালো। ''ইহা নিয়মিত সেবন করিলে ক্রিমিনাশ, অম্ল পিত্ত ও অজীর্ণতা রোগের নিবারণ অবশ্যম্ভাবী। অতিশয় বলকারক টনিক বিশেষ। স্নায়বিক দুর্বলতা, ধাতুদৌর্বল্য ও অনিদ্রা রোগেরও পরম ঔষধ। বড়ো বড়ো ডাক্তার ও কবিরাজেরা ইহার উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। ...'' ছাপা অক্ষরের প্রতি বুদ্ধিরামের খুব দুর্বলতা। ছাপা অক্ষরে যা বেরোয় তার সবটাই তার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে।

আদুরি অবশ্য অন্য ধাতের। বুদ্ধিরামের সঙ্গে তার মেলে না। বুদ্ধিরাম যা ভাবে, বুদ্ধিরামের যা ইচ্ছে যায় আদুরির ঠিক তার উলটো হয়। বুদ্ধিরাম যদি নরম সরম মানুষ, তো আদুরি হল রণচণ্ডী। বুদ্ধিরাম যদি নাস্তিক, তো আদুরি হল ঘোর আস্তিক। বুদ্ধিরামকে যদি কালো বলতে হয়, তো আদুরিকে ফর্সা হতেই হবে। বিধাতা (যদি কেউ থেকে থাকে) দুজনকে এমন আলাদা মালমশলা দিয়ে গড়েছেন যে আর কহতব্য নয়।

আর সে জন্যই এ জন্মে দুজনের আর মিল হল না। বলা ভালো, হতে হতেও হল না। এখন যদি বুদ্ধিরামের বত্রিশ তেত্রিশ তো আদুরির সাতাশ আঠাশ চলছে। দুজেনের কথাবার্তা নেই, দেখাশোনাও এক রকম কালেভদ্রে, মুখোমুখি যদি বা হয় চোখাচোখি হওয়ার জো নেই। আদুরি আজকাল বুদ্ধিরামের দিকে তাকায়ও না।

কিন্তু বুদ্ধিরাম লোক ভালো। লোকে জানে, সে নিজেও জানে। বুদ্ধিরাম আগাপাশতলা নিজেকে নিরিখ করে দেখেছে। হ্যাঁ, সে লোক খারাপ নয়। মাঝে মাঝে বুদ্ধির দোষে দু-একটা উলটাপাল্টা করে ফেললেও তাকে খারাপ লোক মোটেই বলা যাবে না।

খারাপই যদি হবে সাত মাইল পথ সাইকেলে ঠেঙিয়ে চকবেড়ের হাটে কখনো আসে মন্মথ সেনশর্মার পিত্তর আয়ুর্বেদিক টনিক 'হারবল' কিনতে। মাত্র মাস চারেক আগে প্লুরিসিতে ভুগে উঠল বুদ্ধিরাম। এখনও শরীর তেমন জুতের নয়। কাকের মুখে কথাটা শোনা গিয়েছিল, আদুরির নাকি আজকাল খুব অম্বল হয়। তা এ রকম কত মেয়েরই হয়। কার তাতে মাথাব্যথা। বুদ্ধিরাম মানুষ ভালো বলেই না খোঁজখবর করতে লাগল।

তেজেনের কাছে শুনল। হারবল খেয়ে তার পিসির অম্বলের ব্যথা সেরে গেছে। কথাটা মানিক মণ্ডলের কাছেও শোনা, হ্যাঁ, হারবল জববর ওষুধ বটে, তিন শিশি খেতে না খেতে তার বউ চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। আর একদিন পরিতোষও কথায় কথায় বলেছিল, হারবল একেবারে অম্বলের যম। তবে পাওয়া শক্ত। মন্মথ কবিরাজ সেই শিবপুরের লোক, আশির ওপর বয়স। বেশি পারেও না তৈরি করতে। কয়েক বোতল করে ছাড়ে। দারুণ চাহিদা। চকবেড়ের হাটে একজন লোক নিয়ে আসে বেচতে।

খবর পেয়েই আজ মঙ্গলবারে স্কুলের শেষ দুটো ক্লাস অন্যের ঘাড়ে গছিয়ে সাইকেল মেরে ছুটে এসেছে এত দূর। অশ্বত্থ গাছের গোড়ায় আধবুড়ো খিটখিটে চেহারার একটা লোক। ময়লা চাদর পেতে কয়েকটা বিবর্ণ ধুলোটে শিশি সাজিয়ে বসেছিল। ভারি বিরস মুখ।

বুদ্ধিরাম জিজ্ঞেস করল, হারবল আছে?

লোকটা মুখ তুলে গম্ভীর গলায় বলল, আছে। সতেরো টাকা।

সতেরো টাকা শুনে বুদ্ধিরাম একটু বিচলিত হয়েছিল। দু শিশি কেনার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু কুড়িয়ে বাড়িয়েও পকেট থেকে আঠাশ টাকার বেশি বেরলো না।

আচ্ছা দু শিশি নিলে কনসেশন হয় না?

লোকটা এমন তুচ্ছ তাছিছল্যের চোখে তাকাল যেন মরা ইঁদুর দেখছে। মুখটা অন্য ধারে ফিরিয়ে নিয়ে বলল, পাচ্ছেন যে সেই ঢের। মন্মথ কবরেজের আয়ু ফুরলো বলে। তারপর হারবলও হাওয়া। মাথা খুঁড়ে মরলেও পাওয়া যাবে না।

একটা শিশি কিনে বুদ্ধিরাম বলল, সামনের মঙ্গলবার আবার যদি আসি পাব তো!

বলা যাচ্ছে না।

কথাটা যা-ই হোক সেটা বলার একটা রংঢং আছে তো। লোকটা এমনভাবে 'বলা যাচ্ছে না' বলল যা আঁতে লাগে। মানুষকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করাটাই যেন বাহাদুরি। বেচিস তো বাপু কবরেজি ওষুধ, তাও গাছতলায় বসে, অত দেমাক কিসের!

শিশিটা নিয়ে বুদ্ধিরাম হাটে একটু ঘুরে বেড়াল। চকবেড়ের হাট বেশ বড়ো। বেশ গিজগিজে ভিড়ও হয়েছে। চেনা মুখ নজরে পড়বেই। আশপাশের পাঁচ-সাত গাঁয়ের লোকই তো আসে। বুদ্ধিরামের এখন চেনা কোনো লোকের সঙ্গে জুটতে ভালো লাগছে না। মাঝে মাঝে তার একটু একাবোকা থাকতে বড়ো ভালো লাগে।

জিলিপি ভাজার মিঠে মাতলা গন্ধ আসছে। ভজার দোকানের জিলিপি বিখ্যাত। শুধু জিলিপি বেচেই ভজা সাতপুকুরে ত্রিশ বিঘে ধানজমি, পাকা বাড়ি করে ফেলেছে। কিনেছে তিনটে পাঞ্জাবি গাই। ডিজেল পাম্প সেট আর ট্র্যাক্টরও। ছেঁড়া গেঞ্জি আর হেঁটো ধুতি পরে এমন ভাবখানা করে থাকে যেন তার নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। আজও ভজার সেই বেশ। নারকোলের মালার ফুটো দিয়ে পাকা হাতে খামি ফেলছে ফুটন্ত তেলে। চারটে ছোকরা রসের গামলা থেকে টাটকা জিলিপি শালপাতার ঠোঙায় বেচতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। রাজ্যের মানুষ মাছির মতো ভনভন করছে দোকানের সামনে।

বুদ্ধিরাম কাণ্ডটা দেখল খানিক দাঁড়িয়ে। ডান হাতে বাঁ হাতে পয়সা আসছে জোর। ক্যাশবাক্সটা বন্ধ করার সময় নেই। আর তার ভিতরে টাকা পয়সা এমন গিজগিজ করছে যে, চোখ কচকচ করে। টাকাপয়সার ভাবনা বুদ্ধিরাম বিশেষ ভাবে না বটে, কিন্তু একসঙ্গে অতগুলো টাকা দেখলে বুকের ভিতরটায় যেন কেমন করে।

বুদ্ধিরাম বেঞ্চে একটু জায়গা খুঁজল। ঠাসাঠাসি গাদাগাদি লোক। সকলেই জিলিপিতে মজে আছে। এমন খাচ্ছে যেন এই শেষ খাওয়া। ভোমা ভোমা নীল মাছি ওড়াউড়ি করছে বিস্তর। ভিতরবাগে তিনখানা বেঞ্চের একটা থেকে দুজন উঠে যেতেই বুদ্ধিরাম গিয়ে বসে পড়ল। এখনো আশ্বিনের শেষে তেমন শীতভাব নেই। দুপুরবেলাটায় গরম হয়। উনুনের

তাপ আর কাঠের ধোঁয়ায় চালাঘরের ভিতরটা রীতিমতো তেতে আছে। বুদ্ধিরাম বসেই ঘামতে লাগল।

পাশের লোকটা এখনো জিলিপি পায়নি। বৃথা হাঁকডাক করছে, বলি ও ভজাদা, আধঘন্টা হয়ে গেল হাঁ করে বসে আছি। দেবে তো।

দিচ্ছি বাপু, দিচ্ছি দশখানা তো হাত নয়।

আর আমাদেরই বুঝি মেলা ফালতু সময় আছে হাতে?

এই চড়াটা হলেই দিচ্ছি গো।

লোকটা ফস করে বুদ্ধিরামের হাত থেকে বোতলটা কেড়ে নিয়ে দেখল। তারপর মাতববরের মতো বলল, হারবল? মন্মথ কবরেজের ওষুধ। দূর দূর, কোনো কাজের নয়। তিন শিশি খেয়েছি।

বুদ্ধিরাম তার হাত থেকে বোতলটা ফের নিয়ে বলল, তা বেশ। কাজ হয় না তো হয় না।

লোকটা ভারি কড়া চোখে বুদ্ধিরামকে একটু চেয়ে দেখল। জিলিপি এসে পড়ায় আর কিছু বলতে পারল না। মুখ তো মাত্র একটা, এক সঙ্গে দু কাজ তো করা যায় না। তার ওপর ভজার জিলিপি মুখকে ভারি রসস্থ করে দেয়। কথা বলাই যায় না।

বুদ্ধিরামকে লোকে বলে ভাবের লোক। কথাটা মিথ্যেও নয়। বুদ্ধিরাম বড়ো ভাবতে ভালোবাসে। ভাবতে ভাবতে তার মাথাটা যে তাকে কাঁহা কাঁহা মুলুক নিয়ে যায়, কত আজগুবি জিনিস দেখায় তার কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। বুদ্ধিরাম ভজার জিলিপির দোকানে বসে বসে ভাবতে লাগল, এই যে ভজা বাঁ হাতে ডান হাতে হরির লুটের মতো পয়সা কামাচ্ছে এতে হচ্ছেটা কী?

এত জমিজিরেত, ঘরবাড়ি, বিষয়সম্পত্তি, এসব ছেড়ে একদিন ফুটুস করে চোখ ওলটাতে হবে। তখন ভজার ছেলেরা কেউ জিলিপির প্যাঁচ কষতে আসবে না। ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়ে লাঠালাঠি মারামারি করে ভাগ ভিন্ন হবে। ভজা কি আর তা জানে না। তবু

খেয়ে না খেয়ে মেলায় মেলায় রোদ জল মাথায় করে গিয়ে চালা বেঁধে কেবল জিলিপি খেলিয়ে যাচ্ছে। টাকার নেশায় পেয়েছে লোকটাকে।

বসে থাকতে থাকতে বুদ্ধিরামের পালা এসে গেল অবশেষে। ঠোঙায় আটখানা রসে মাখামাখি গরম জিলিপি। আহা, এইরকম এক ঠোঙা যদি আদুরির হাতেও গরমাগরম পৌঁছে দেওয়া যেত!

প্রথম জিলিপিটা দাঁতে কাটতে গিয়েই টপ টপ করে আসাবধানে দু ফোঁটা রস পড়ে গেল টেরিকটনের পাঞ্জাবিতে। বড়ো সাধের পাঞ্জাবি। ঘি রঙের, গলায় আর পুটে চিকনের কাজ করা। বুদ্ধিরাম রুমালে মুছে নিল রসটা। মনটা খুঁত খুঁত করতে লাগল। এক্কেবারে নতুন পাঞ্জাবি। কাঁচি ধুতির ওপর এটা পরে আদুরির বাড়ির সামনে খুব কয়েকটা চক্কর দিয়েছিল সাইকেলে। আদুরি অবশ্য বেরোয়নি। কিন্তু বুদ্ধিরামের ধারণা যে, আদুরি তাকে আড়াল থেকে ঠিকই দেখে।

জিলিপির দাম দিয়ে বুদ্ধিরাম উঠে পড়ল। সামনেই পানের দোকান। সে পান সিগারেট খায় না। দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে তেড়াবেঁকা আয়নায় নিজেকে একটু দেখে নিল। না, বুদ্ধিরাম দেখতে খারাপ নয়। রংটা যা একটু ময়লা। কিন্তু মুখচোখ বেশ কাটা কাটা। নিজেকে দেখে সে একটু খুশিই হল। রুমাল দিয়ে মুখের ঘামটা মুছে নিল।

একটা দোকানে পঞ্চাশ পয়সার কড়ারে সাইকেল জমা রেখেছিল। সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

চারদিকে উধাও মাঠ ঘাট, ধানখেত। আকাশটা কী বিশাল। বাঁশবনের পেছনে সূর্য একটু ঢলে গেছে। ফুরফুরে হাওয়া।

বুদ্ধিরাম ধানখেতে নেমে পড়ল। চওড়া আল। খানিকদূর গিয়ে রাস্তা।

ধানখেতের ভিতরে নেমে বুদ্ধিরামের মনটা আবার কেমন যেন হয়ে গেল। আদুরি কী ওষুধটা খাবে? এমনিতেই মেয়েরা ওষুধ খেতে চায় না, তার ওপরে বুদ্ধিরামের পাঠানো ওষুধ। আদুরি বোধহয় ছোঁবেও না। এত পরিশ্রম বৃথাই যাবে। তা যাক। বুদ্ধিরামের কাজ বুদ্ধিরাম করেই যাবে।

পুজোয় একটা শাড়ি পাঠিয়েছিল বুদ্ধিরাম। বুদ্ধিরামের বোন রসকলি গিয়ে দিয়ে এসেছিল। হাত বাড়িয়ে নেয়ওনি। বিরস মুখে নাকি জিজ্ঞেস করেছিল, কে পাঠিয়েছে রে?

রসকলি বোকা গোছের মেয়ে। ভয়ে ভয়ে শেখানো কথা বলেছিল, মা পাঠাল।

তোর মা আমাকে শাড়ি পাঠাবে কেন?

তা জানি না। এটা পরে অষ্টমী পুজোয় অঞ্জলি দিও।

শাড়িটা ভালোই। কালু তাঁতির ঘর থেকে কেনা। লাল জমির ওপর ঢাকাই বুটি। শাড়িটার দিকে তাকায়ওনি আদুরি। শুধু দয়া করে বলেছিল, ওখানে কোথাও রেখে যা।

সেই শাড়ি আজ অবধি পরেনি আদুরি। নজরে রেখে দেখেছে বুদ্ধিরাম। খোঁজ খবরও নিয়েছে। শাড়িটা পরেনি। তবে নিয়েছে ফিরিয়ে দেয়নি, এটাই যা লাভ হয়েছি বুদ্ধিরামের। তারপর একদিন হঠাৎ নজরে পড়ল, সেই শাড়িটা পরে রসকলি ঘুরে বেড়াচ্ছে।

শাড়িটা কোথায় পেলি?

ভয়ে ভয়ে রসকলি বলল, আদুরদিদি দিল।

দিল বলেই নিলি?

তা কী করব?

বুদ্ধিরাম আর কিছু বলেনি। রাগটা গিলে ফেলেছিল। মনটা বড্ড উচাটন ছিল কয়েকদিন অপমানে।

দোষঘাট মানুষের কি হয় না?

তখন বুদ্ধিরাম তো আর এই বুদ্ধিরাম ছিল না। আজকের এক গেয়ো স্কুলের মাস্টার বুদ্ধিরামকে দেখে কে বিশ্বাস করবে যে, ইস্কুলে সে ছিল ফার্স্ট বয়। পাশটাও করেছিল জববর, দু দুটো লেটার নিয়ে। বিয়ের কথাটা তখনই ওঠে। বুদ্ধিরাম যখন ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার কেওকেটা হওয়ার স্বপ্ন দেখছে।

বুড়ি ঠাকুমা তখন এতটা বুড়ো হয়নি। একদিন আদুরিকে একেবারে কনে-সাজে সাজিয়ে নিয়ে এসে বলল, দেখ তো ভাই, পছন্দ হয়? হলে দেগে রাখি। পাশ টাশ করে

থিতু হলে মালা-বদল করিয়ে দেবো।

আদুরি অপছন্দের মেয়ে নয়। ফর্সা তো বটেই মুখচোখ রীতিমতো ভালো। কিন্তু গাঁয়ের মেয়ে, নিত্যি দেখাশোনা হয়। যাকে বলে ঘর কা মুরগি, তাই বুদ্ধিরাম ঠোঁট বেঁকিয়ে বলেছিল, ফুঃ, এর চেয়ে গলায় দড়ি দেওয়া ভাল।

কেন রে, মেয়েটা কি খারাপ? দেখ তো কেমন মুখচোখ। কেমন ফর্সা।

সাতজন্ম বিয়ে না করে থাকলেও ও মেয়ে আমার চলবে না। যাও তো ঠাকুমা, সং বন্ধ করো।

একেবারে মুখের ওপর থাবড়া মারা যাকে বলে। আদুরির খুব অপমান হয়েছিল। তার তখন বছর বারো বয়স। এক ছুটে পালিয়ে গেল। আর কোনোদিন এল না। খুব নাকি গড়াগড়ি খেয়ে কেঁদেছিল মেয়েটা। দিন তিনেক ভালো করে খায়দায়নি।

বুদ্ধিরামের তখন এসব দিকে মাথা দেওয়ার সময় নেই। চৌদ্দ মাইল দূরের মহকুমা শহরে কলেজে যেতে হয়। নতুন বন্ধুবান্ধব, নতুন রকমের জীবন। সেখানে কে একটা গেঁয়ো মেয়েকে নিয়ে ভাববার মতো মেজাজটাই তার নেই।

আরও একটা ঘটনা ঘটেছিল। বুদ্ধিরামের সঙ্গে মেলা মেয়েও পড়ত। তাদের একজন ছিল হেনা। দেখতে শুনতে ভালো তো বটেই, তার কথাবার্তা চাউনি টাউনিও ছিল ভারি ভালো। কথাবার্তা বলত টকাস টকাস।

বুদ্ধিরাম ছাত্র ভাল। সুতরাং হেনা তার দিকে একটু ঢলল। বছর দেড়েক হেনার সঙ্গে বেশ মাখামাখি হয়েছিল বুদ্ধিরামের। তবে সেটাকে ভাব ভালোবাসা বলা যাবে কি না তা নিয়ে বুদ্ধিরামের আজও সংশয় আছে।

তবে হেনা আর যা-ই করুক বুদ্ধিরামের লেখাপড়ার বারোটা বাজাল।

কলেজের প্রথম ধাপটা ডিঙোতেই দম বেরিয়ে গেল বুদ্ধিরামের। ডিঙোলো খোঁড়া ঘোড়ার মতো। কিন্তু হেনা দিব্যি ভালো পাশটাশ করে কলকাতায় ডাক্তারি পড়তে চলে গেল।

বুদ্ধিরামের পতনের সেই শুরু। বি এসসি পাশ করল অনার্স ছাড়া। বাবা ডেকে বলল, পড়াশুনোর তো দেখছি তেমন উন্নতি হল না। তা গেঁয়ো ছেলের আর এর বেশি কীই বা হওয়ার কথা!

বুদ্ধিরাম সে-ই গাঁয়ের ছেলে গাঁয়ে ফিরে এল। ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হওয়া আর হল না। পাশের গাঁ বিস্টুপুরের মস্ত ইস্কুলে তখন সায়েন্সের মাস্টার খোঁজা হচ্ছে? বুদ্ধিরামকে তারা লুফে নিল।

বুদ্ধিরামের মনের অবস্থা তখন সাংঘাতিক। রাগে দুঃখে দিনরাত সে ভিতরে ভিতরে জ্বলে আর পোড়ে। লেখাপড়ায় একটা মারকাটারি কিছু করে বিজয়গর্বে গাঁয়ে ফিরে আসবে, এই না সে জানত। আর সে জায়গায় টিকিয়ে টিকিয়ে মোটে বি এসসি! বুদ্ধিরাম কিছুদিন আপনমনে বিড়বিড় করে ঘুরে বেড়াত পাগলের মতো, দাড়ি রাখত, পোশাকআশাকের ঠেক ছিল না। আত্মহত্যা করতে রেল রাস্তায় গিয়েছিল তিনবার। ঠিক শেষ সময়টায় কেমন যেন সাহসে কুলোয়নি।

তারপরই একদিন একটা ঘটনা ঘটল। এমনি দেখতে গেলে কিছুই নয়। কিন্তু তার মধ্যেই বুদ্ধিরামের জীবনটা একটা মোড় ঘুরল। আম বাগানের ভিতর দিয়ে বিশু আর বুদ্ধি জিতেন পাড়ুইয়ের বাড়ি যাচ্ছিল মিটিং করতে। জিতেন সেবার ইউনিয়ন বোর্ডের ইলেকশনে নেমেছে। জিতেনকে জেতানোর খুব তোড়জোড় চলছে। বুদ্ধিরাম তখন যা হোক একটা কিছু নিয়ে মেতে থাকার জন্য ব্যস্ত। জীবনের হাহাকার আর ব্যর্থতা ভুলতে মাথাটাকে কোনো একটা ভূতের জিম্মায় না দিলেই নয়। নইলে জিতেনের ইলেকশন নিয়ে কেনই বা বুদ্ধিরামের মাথাব্যথা হবে!

আমবাগানে শরৎকালের একটা সোনালি রূপালি রোদের চিকরিকাটা আলো-ছায়া। সকালবেলাটায় ভারি পরিষ্কার বাতাস ছিল সেদিন। ঘাসের শিশির সবটা তখনও শুকোয়নি।

উলটোদিক থেকে একটা ছিপছিপে মেয়ে হেঁটে আসছিল। একা, নতমুখী। তার চুল কিছু অগোছালো এলো খোপায় বাঁধা। আঁচলটা ঘুরিয়ে শরীর ঢেকেছে। দেখে কেমন যেন মনটা

ভিজে গেল বুদ্ধিরামের।

কে রে মেয়েটা?

দুর শালা! চিনিস না? ও তো আদুরি।

আদুরি! বুদ্ধিরাম এত অবাক হল যে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থাকল হাঁ হয়ে। এক গাঁয়ে বাস হলেও আদুরির সঙ্গে তার দীর্ঘকাল দেখা হয়নি। কারো দিকে তাকায়ও না বুদ্ধিরাম। সেই আদুরি কি এই আদুরি?

আদুরি মাথা নিচু করে রেখেই তাদের পেরিয়ে চলে গেল। ভ্রূক্ষেপও করল না।

আর সেই ঘটনাটা সারাদিন বুদ্ধিরামের মগজে নতুন একটা ভূত হয়ে ঢুকে গেল।

বাড়ি ফিরেই সে ঠাকুমাকে ধরল, শোনো ঠাকুমা, একটা কথা আছে।

কী কথা?

সে-ই যে আদুরি মনে আছে?

আদুরিকে মনে থাকবে না কেন?

ওকেই বিয়ে করব। বলে দাও।

ঠাকুমা তার মাথায় পিঠে হাত টাত বুলিয়ে বলল, বড্ড দেরি করে ফেললি ভাই, আদুরির তো শুনছি বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। হরিপুরের চন্দ্রনাথ মল্লিকের ছেলে পরেশের সঙ্গে।

বুদ্ধিরাম এমন তাজ্জব কথা যেন জীবনে শোনেনি। আদুরির বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে! তাহলে তো খুব মুশকিল হবে বুদ্ধিরামের।

সেই দিনই সে গোপনে তার দু-একজন বিশ্বস্ত বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শে বসে গেল।

কেষ্ট বলল, বিয়েটা না ভাঙতে পারলে তোর আর আশা নেই। ভাঙতে হলে সবচেয়ে ভালো উপায় হল চন্দ্রনাথ মল্লিককে বেনামা একটা চিঠি লেখা।

তো তাই হল। কেষ্ট নানা ছাঁদে লিখতে পারে। তার সাইন বোর্ডের দোকান আছে। চিঠিটা সেই লিখে দিল।

দিন সাতেক বাদে শোনা গেল, বিয়েটা ভেঙে গেছে।

বুদ্ধিরাম ভেবেছিল, এবার জলের মতো কাজটা হয়ে যাবে। সে গিয়ে ফের ঠাকুমাকে ধরে, শুনছি আদুরির বিয়েটা ভেঙে গেছে। তা আমি রাজি আছি বিয়ে করতে।

ঠাকুমা গেল প্রস্তাব নিয়ে। বুদ্ধিরাম নিশ্চিন্তে ছিল। এরকম প্রস্তাব তো মেয়ের বাড়ির পক্ষে স্বপ্নের অগোচর।

কিন্তু সন্ধেবেলা ফিরে এসে ঠাকুমা বিরস মুখে বলল, মেয়েটার মাথায় ভূত আছে।

কেন গো ঠাকুমা?

মুখের ওপর বলল, ও ছেলেকে বিয়ে করার চেয়ে গলায় দড়ি দেওয়া ভাল।

বুদ্ধিরাম একথায় এমন হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল যে বলার নয়। বলল? এত বুকের পাটা? সেই রাতে বুদ্ধিরাম ঘুমোতে পারল না। কেবল ঘরবার করল, দশবার জল খেল, ঘন ঘন পেচ্ছাব করল। মাথার চুল মুঠো করে ধরে বসে রইল। রাগে ক্ষোভে অপমানে তার মাথাটাই গেল ঘুলিয়ে।

ভোরের দিকে সে একটু ঝিমোলো। ঝিমোতে ঝিমোতে ভাবল, বহোৎ আচ্ছা। এই রকম তেজি মেয়েই তো চাই। গেঁয়ো মেয়েগুলো যেন ভেজানো ন্যাতা। কারো ব্যক্তিত্ব বলে কিছু নেই। আদুরির আছে, এটা তো খুব ভালো খবর।

সকালবেলায় সে একখানা পেল্লায় সাত পৃষ্ঠার চিঠি লিখে ফেলল আদুরিকে। মেলা ভালো ভালো শব্দ লিখল তার মধ্যে। অন্তত গোটা পাঁচেক কোটেশন ছিল। সবশেষে লিখল... 'তোমাকে ছাড়া আমার জীবন বৃথা।'

রসকলির হাত দিয়ে চিঠিটা পাঠিয়ে সে ঘরে পায়চারি করতে লাগল তীব্র উত্তেজনায়। আজ অবধি সে কোনো মেয়েকে প্রেমপত্র লেখেনি। এই প্রথম।

রসকলি ঘন্টাখানেক পর ফিরে এসে বলল, ও দাদা, চিঠিটা যে না পড়েই ছিঁড়ে ফেলল গো।

চুপ। চেঁচাস না। কিছু বলল না?

কী বলবে? শুধু জিজ্ঞেস করল চিঠিটা কে দিয়েছে। তোমার কথা বলতেই খামসুদ্ধু চিঠিটা কুঁচি কুঁচি করে ছিঁড়ে ফেলল।

বোনের কাছে ভারি অপদস্থ হয়ে পড়ল বুদ্ধিরাম। তবে রসকলি হাবাগোবা বলে রক্ষে।

বুদ্ধিরাম বলল, কাউকে কিছু বলিস না। ভালো একটা জামা কিনে দেবো 'খন।

তখন অপমানে লাঞ্ছনায় বুদ্ধিরামের পায়ের তলায় মাটি নেই। সারা দিনটা তার কাটল এক ঘোরের মধ্যে। কিন্তু দুদিন বাদে সে বুঝতে পারল, আদুরি যত কঠিনই হোক তাকে জয় করতে না পারলে জীবনটাই বৃথা। তবে বুদ্ধিরাম আর বোকার মতো চিঠি চাপাটি চালাচালিতে গেল না। আদুরির ধাতটা বুঝবার চেষ্টা করতে লাগল সে।

গাঁয়ের মেয়ে। সুতরাং তাদের বাড়ির সকলের সঙ্গেই আজন্ম চেনাজানা বুদ্ধিরামের। তবে সে দেমাকবশে কারো বাড়িতেই তেমন যেতটেত না। ঘটনার পর দিনকয়েক আদুরিদের বাড়িতে হানা দিতে লাগল সে। আদুরির কাকা জ্যাঠা মিলে মস্ত সংসার। বড়ো গেরস্ত তারা। তিন চারখানা উঠোন, বিশ পঁচিশটা ঘর। সারা দিন ক্যাচম্যাচ লেগেই আছে। বুদ্ধিরাম গিয়ে যে খুব সুবিধে করতে পারল তা নয়। বাইরের ঘরের দাওয়ায় বসে হয়তো কখনো আদুরির কেশো দাদুর সঙ্গে খানিক কথা কয়ে এল। না হয় তো কোনোদিন আদুরির জ্যাঠা হারুবাবুর কিছু উপদেশ শুনে আসতে হল।

চা-বিস্কুটও যে জোটেনি তা নয়। সে গাঁয়ের ভালো ছেলে। খাতির একটু লোকে করেই। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে যাওয়া সেদিকে কিছুই এগোলো না।

কিছুদিন পর সে বুঝল, এভাবে আদুরির কাছে এগোন যাবে না। মহিলা মহলে ঢুকতে হবে। তা তাতেও বাধা ছিল না। আদুরিদের অন্দরমহলেও ঢুকতে সে পারে। আদুরির এক বউদি হঠাৎ মুখ ফসকে বলে ফেলল, হ্যাঁ গো বুদ্ধি ঠাকুরপো, কোনোকালে তো তোমাকে এ বাড়িতে যাতায়াত করতে দেখিনি তোমার মতলবখানা কী খুলে বলো তো! আমার তো বাপু, তোমার মুখচোখ ভালো ঠেকছে না।

এ কথায় আর এক দফা অপমান বোধ করল বুদ্ধিরাম। সে পুরুষ মানুষ, কোন লজ্জায় মা মাসি বউদি শ্রেণির মেয়েদের সঙ্গে বসে গল্প করে?

সুতরাং বুদ্ধিরামকে জাল গোটাতে হল।

তারপরই আবার বিপদ। আদুরির ফের সম্বন্ধ এল। চেহারাখানা ভালো, কিছু লেখাপড়াও জানে, সুতরাং আদুরিকে যে দেখে সে-ই পছন্দ করে যায়।

দ্বিতীয় পাত্রপক্ষকেও বেনামা চিঠি দিতে হল। ভেঙেও গেল বিয়ে। কিন্তু তাতে বুদ্ধিরামের যে কাজ খুব এগোল তাও নয়। বরং উলটে একটা বিপদ দেখা দিল। কেউ যে বেনামা চিঠি দিয়ে আদুরির বিয়ে ভাঙছে এটা বেশ চাউর হয়ে গেল। লোকটা কে তার খোঁজাখুঁজিও শুরু হল। তৃতীয়বার যখন আদুরিকে পছন্দ করে গেল আর এক পাত্রপক্ষ তখন আদুরির বাপ জ্যাঠা পাত্রপক্ষকে বলেই দিল, বেনামা চিঠি যেতে পারে, আমল দেবেন না। কোনো বদমাশ লোক করছে এই কাজ।

খুবই ভয়ে ভয়ে রইল বুদ্ধিরাম। কেষ্ট ভরসা দিয়ে বলল, আরে ঘাবড়াচ্ছিস কেন? এমন কলঙ্কের কথা লিখে দেবো যে, পাত্রপক্ষ আঁতকে উঠবে।

কিন্তু এই তৃতীয়বার বুদ্ধিরাম ধরা পড়ে গেল। আদুরির সাত সাতটা গুন্ডা ভাই একদিন বাদামতলায় চড়াও হল তার ওপর। সতীশটা মহা ষন্ডা। সে-ই সাইকেল থেকে টেনে নামাল বুদ্ধিরামকে।

বলি, তোর ব্যাপারটা কী?

কীসের ব্যাপার?

ন্যাকা! আদুরির বিয়ে ভাঙতে চিঠি দেয় কে?

আমি না।

তুই ছাড়া আর কে দেবে!

আমার কী স্বার্থ?

মেজো বউদি বলছিল তুই নাকি আমাদের বাড়িতে ঘুরঘুর করতিস!

বুদ্ধিরাম বুদ্ধি হারিয়ে ফেলছিল। সত্য গোপন করার অভ্যাস তার নেই। গুছিয়ে মিথ্যে কথা বলা তার আসেও না। সে আমতা আমতা করতে লাগল।

সতীশ অবশ্য মারধর করল না। বলল, যদি আদুরিকে বিয়ে করতে চাস তো সে কথা বললেই হয়। গাঁয়ে তোর মতো ছেলে ক'টা? আর যদি নিতান্তই বদমাইসির জন্য করে থাকিস তাহলে...

বুদ্ধিরাম কেঁদে ফেলেছিল। একটু সামলে নিয়ে বলল, বিয়ে করতে চাই।

শাবাশ বলে খুব পিঠ চাপড়ে দিল সতীশ। বলল, একথাটা ঘুরিয়ে নাক দেখানোর মতো হল। আগে বললেই ব্যবস্থা হয়ে যেত।

কিন্তু ব্যবস্থা হল না। পরদিনই সতীশ এসে তাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বলল, মুশকিল কী হয়েছে জানিস? তোর ওপর আদুরি মহা খাপ্পা। কী করেছিলি বল তো!

সব শুনেটুনে সতীশ বলল, আচ্ছা চুপচাপ থাক। দেখি কী করা যায়।

বলা পর্যন্তই। সতীশ কিছু করতে পারেনি। চিঁড়ে ভেজেনি।

কিন্তু এরপর থেকে আদুরির আর সম্বন্ধ আসত না। এলেও আদুরি বেঁকে বসত।

এ সবই সাত আট বছর আগেকার কথা। এই সাত আট বছরে বুদ্ধিরাম আড়াল থেকে আদুরির উদ্দেশে তার সব অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগ করেছে। প্রতিবার পুজোয় শাড়ি পাঠায়, টুকটাক উপহার পাঠায়, কোনোটাই আদুরি নেয় না। নিলেও ফেলে টেলে দেয় বা অন্য কাউকে দান করে।

কিন্তু বয়স তো বসে নেই। আদুরির বিয়ের বয়স পার হতে চলল। বুদ্ধিরামও ত্রিশ পেরিয়েছে। কোনো দিকেই কিছু এগোল না। আদুরির কপাল বজ্র আঁটুনিতে বন্ধই রইল।

ধানখেতের ভিতর দিয়ে সাইকেল ঠেলে নিয়ে যেতে যেতে এসব কথাই ভাবছিল বুদ্ধিরাম।

বড়ো রাস্তায় উঠে সে সাইকেলে চাপল। পাঞ্জাবির পকেটে ভারী শিশিটা ঝুল খাচ্ছে। কষ্ট করাই সার হল। কোনো মানে হয় না এর।

গাঁয়ে ঢুকবার মুখে বাস রাস্তায় কয়েকটি দোকান। আঁধার হয়ে এসেছে। টেমি জ্বলছে দোকানে দোকানে। মহীনের চায়ের দোকানে দু-চারজন বসে আছে। ষষ্ঠী হাঁক মারল, কে

রে! বুদ্ধি নাকি?

বুদ্ধি নেমে পড়ল। সাইকেলটা স্ট্যান্ডে দাঁড় করিয়ে বসে গেল। একটু ঠান্ডা-ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে এখন। এক ভাঁড় চা হলে হয়।

ষষ্ঠী একটু বেশি কথা কয়। নানা কথা বকবক করে যাচ্ছিল। সে একটু তেলানো মানুষ। যাকে দেখে তাকেই একটু একটু তেল দেওয়া তার স্বভাব। পুরোনো কথার সূত্র ধরে বলল, তোর কত বড়ো হওয়ার কথা ছিল বল তো! গাঁয়ে আজ অবধি তোর মতো বেশি নম্বর পেয়ে কেউ পাশ করেছে? বসন্ত স্যার তো বলতই, বুদ্ধিরামের মতো ছেলে হয় না। যদি লেগে থাকে তো জজ ম্যাজিস্ট্রেট কিছু একটা হয়ে ছাড়বে।

এসবই পুরনো ব্যর্থতার কথা। বুদ্ধিরাম যা খুঁচিয়ে তুলতে চায় না। ধীরে ধীরে তার আঁচ নিবে গেছে। সে গাঁয়ের মাস্টার হয়ে ধীরে ধীরে নিজেকে মাপে ছোট করে ফেলেছে। সয়েও গেছে সব। কিন্তু কেউ খুঁচিয়ে তুললে আজও বুকটা বড়ো উথাল-পাথাল করে।

ষষ্ঠী, চুপ কর, ওসব কথা বলে আর কী হবে!

আমরা যে তোর কথা সব সময়েই বলাবলি করি। চোখের সামনে দেখছি কিনা। কী জিনিস ছিল তোর ভিতরে।

বুদ্ধিরাম ভাঁড়টা ফেলে দিয়ে উঠল। বলল, যাই, ছাত্ররা সব এসে বসে থাকবে।

যা।

বুদ্ধিরাম সাইকেলে চেপে বড়ো রাস্তা থেকে গাঁয়ের পথে ঢুকে পড়ল। অন্ধকার রাস্তায় হাজার হাজার জোনাকি জ্বলছে। তাদের মিটমিটে আলোয় কিছুই প্রতিভাত হয় না। অথচ জ্বলে। লাখো লাখো জ্বলে। তাহলে কী লাভ জ্বলে।

মোট দশ জন ছাত্র তার বাড়িতে এসে পড়ে। মাথা পিছু কুড়ি টাকা করে মাস গেলে দুশো টাকা তার আসার কথা। কিন্তু নগদ টাকা বের করতে গাঁয়ের লোকের গায়ে জ্বর আসে। বাকি বকেয়া পড়ে যায় অনেক। তবু বুদ্ধিরাম সবাইকেই পড়ায়। বেশির ভাগই গবেট। দু-একজন একটু আধটু বোঝে সোঝে।

পড়াতে বসবার আগে পাতুকে ডেকে শিশিটা ধরিয়ে দিয়ে বলল, ও বাড়িতে গিয়ে দিয়ে আয়। তার হাতে দিস।

রসকলির বিয়ে হয়ে গেছে। একটু বয়সকালেই হল। এখন রসকলির জায়গা নিয়েছে বুদ্ধিরামের ভাইঝি পাতু। আদুরি আর বুদ্ধিরামের ব্যাপারটা দুবাড়ির কারো আর অজানা নেই। সুতরাং নাহক লজ্জা পাওয়ারও কোনো মানে হয় না।

হাতমুখ ধুয়ে পড়াতে বসে গেল বুদ্ধিরাম। কিছুক্ষণ আর অন্যদিকে মনটা ছোটাছুটি করল না। ছাত্রদের মুখের দিকে চেয়ে অনেক কিছু ভুলে থাকা যায়।

এই ভুলে থাকাটাই এখন বুদ্ধিরামের কাছে সবচেয়ে বড়ো কথা। যত ভুলে থাকা যায় ততই ভালো। জীবনটা আর কতই বা লম্বা। একদিন আয়ু ফুরোবেই। তখন শান্তি। তখন ভারি শান্তি।

পড়িয়ে যখন উঠল বুদ্ধিরাম তখন বেশ রাত হয়েছে। ছাত্ররা যে যার লণ্ঠন হাতে উঠোন পেরিয়ে চলে যাচ্ছে। বুদ্ধিরাম দাওয়ায় দাঁড়িয়ে দেখল। এরপর তার একা লাগবে। খুব একা।

পাতু ফিরে এসেছে। বারান্দায় ঘুরে ঘুরে কোলের ভাইকে ঘুম পাড়াচ্ছিল।

হাতে দিয়েছিস তো!

হ্যাঁ গো।

কিছু বলল?

না। শিশিটার গায়ে কী লেখা আছে পড়ল। তারপর তাকে রেখে দিল।

ভাতের গন্ধ আসছে। জ্যাঠামশাইয়ের কাশির শব্দ। কে যেন কুয়ো থেকে জল তুলছে ছপাৎ ছপাৎ করে। দুটো কুকুরে ঝগড়া লেগেছে খুব। দাওয়ায় দাঁড়িয়ে বুদ্ধিরাম বাইরের কুয়াশা মাখা জ্যোৎস্নার দিকে আনমনে চেয়ে রইল।

না, বেঁচে থাকাটার কোনো মানেই খুঁজে পায় না সে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে নিজের ঘরে ঢুকল। বাড়ির সবচেয়ে ছোট ঘরখানা তার। ঘরে একখানা চৌকি, একটা টেবিল আর চেয়ার আর একখানা বইয়ের আলমারি।

বুদ্ধিরাম চেয়ারে বসে লণ্ঠনের আলোয় একখানা বইয়ের পাতা খানিকক্ষণ ওলটাল। বইটা কী, কোন বিষয়ের তাও যেন বুঝতে পারছিল না। বইটা রেখে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রইল। গাছের ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্না দেখা যাচ্ছে। জ্যোৎস্নারও কোনো অর্থ হয় না। ঝড়-বৃষ্টি, শীত-গ্রীষ্ম কোনোটারই কোনো অর্থ হয় না। অথচ বেঁচে থাকতে হবে। এ কী জ্বালা রে বাপ?

বউদি এসে খেতে ডাকল বলে বেঁচে গেল বুদ্ধিরাম। খাওয়ারও কোনো অর্থ হয় না। তবু সেটা একটা কাজ। কিছুক্ষণ সময় কাটে। কথাবার্তা হয়, হাসিঠাট্টা হয়। সময়টা কেটে যায়। বুদ্ধিরাম গিয়ে সাগ্রহে খেতে বসল।

খেয়ে এসে বুদ্ধিরাম ফের কিছুক্ষণ বসে রইল চেয়ারে। চেয়ারে বসে বসেই কখন ঘুমিয়ে পড়ল, কে জানে।

পাতু এসে জাগাল, ওঠো সেজকা, বিছানা করে মশারি ফেলে গুঁজে দিয়েছি। শোওগে।

হাই তুলে উঠতে যাচ্ছিল বুদ্ধিরাম, পাতু ফের বল, আজ ও বাড়ির সকলের মন খারাপ। নিবারণদাদুর অবস্থা ভালো নয়। আদুরি পিসির চোখ লাল। খুব কাঁদছিল।

নিবারণ মানে হল আদুরির বাবা। বুদ্ধিরাম খবরটা শুনল মাত্র। মনে আর কোনো বুজকুড়ি কাটল না। কলঘর ঘুরে এসে শুয়ে পড়ল। বাপ যদি মরে তো আদুরির মাথা থেকে ছাদ উড়ে যাবে।

ভাবতে ভাবতে ঘুমোলো বুদ্ধিরাম। আজকাল নির্বোধের মতোই সে ঘুমোতে পারে। মাথাটা আস্তে আস্তে বোকা হয়ে যাচ্ছে তো। বোধবুদ্ধি কমে যাচ্ছে। আজকাল তাই গাঢ় ঘুম হয়।

মাঝরাতে আচমকা চেঁচামেচিতে ঘুমটা ভাঙল। ভাঙতেই সোজা হয়ে বসল বুদ্ধিরাম। চেঁচামেচিটা অনেক দূর থেকে আসছে। আদুরির বাপের কি তবে হয়ে গেল?

উঠবে কি উঠবে না তা ভাবছিল বুদ্ধিরাম। ও বাড়ির সঙ্গে তার সম্পর্ক কীই বা আর? না গেলেও হয়। রাতে একটু শীত পড়েছে। পায়ের কাছে ভাঁজ করা কাঁথা। সেটা গায়ে টেনে নিতেই ভারি একটা ওম আর আরাম হল। বুদ্ধিরাম চোখ বুজল।

ঘুমিয়েই পড়ছিল প্রায় এমন সময় দরজায় ধাক্কা দিয়ে মেজদা বলল, বুদ্ধি, ওঠ। নিবারণ জ্যাঠার হয়ে গেল। একবার যেতে হয়। ও বাড়ি থেকে ডাকতে এসেছে।

বুদ্ধিরাম উঠল। যারা বেশি রাতে মরে তাদের আক্কেল বিবেচনার বড়ো অভাব। বলল, যাচ্ছি।

গামছাখানা কাঁধে ফেলে বেরিয়ে পড়ল বুদ্ধিরাম। গাঁসুদ্ধু জেগে গেছে। আজকাল গাঁয়ে লোকও বেড়েছে খুব। রাস্তায় নামলেই বেশ লোকজন দেখা যায়। এই মাঝরাতেও ঘুম ভেঙে অন্তত জন ত্রিশ চল্লিশ লোক নেমে পড়েছে রাস্তায়, আদুরিদের বাড়ি যাবে বলে।

একটা হাই তুলল বুদ্ধিরাম। শরীরটা এখনো ঘুমজলে অর্ধেক ডুবে আছে। শরীরের যেটুকু জেগে আছে সেটাকেও চালানো যাচ্ছে না।

বাইরের উঠোনেই নিবারণ জ্যাঠাকে তুলসীতলায় শোয়ানো হয়েছে। চেঁচিয়ে এ ওর গলাকে ছাপিয়ে কান্নার কম্পিটিশন চলেছে। কোনো মানে হয় না। জন্মালেই তো মানুষের মধ্যে মৃত্যুর বীজ পোঁতা হয়ে গেল। এভাবেই যেতে হবে। সবাই যায়।

গোটা দশেক লণ্ঠন আর দু-দুটো হ্যাজাক বাতির আলোতেও এই ভিড়ের মধ্যে আদুরিকে দেখতে পেল না বুদ্ধি। আদুরি খুব চাপা স্বভাবের মেয়ে। চেঁচিয়ে কাঁদবে না, জানে বুদ্ধিরাম। আর সে আসায় হয়তো ঘরে গিয়ে সেঁধিয়েছে। মুখ দেখতেও বুঝি ঘেন্না হয় আজকাল।

মাস চারেক আগে প্লুরিসি থেকে উঠেছে বুদ্ধিরাম। বুক থেকে সিরিঞ্জ দিয়ে জল টেনে বের করতে হয়েছিল গামলা গামলা। তার ঠান্ডা লাগানো বারণ। কিন্তু সে কথা বুদ্ধিরাম ছাড়া আর কে-ই বা মনে রেখেছে।

শ্মশানে গেলে স্নান করে আসতে হবে। শেষ রাতের শীতে হিম বাতাস লাগবে শরীরে। ডাক্তার ঠাণ্ডা লাগাতে বারণ করেছিল।

বুদ্ধিরাম একটু হাসল। সে রেলরাস্তায় গলা দিতে গিয়েছিল। মরণকে তার ভয়টয় নেই। একভাবে না একভাবে তো যেতেই হবে।

কান্নাকাটির মধ্যেই কিছু লোক বাঁশ টাশ কাটতে লেগেছে। দড়িদড়া এসে গেছে। বুদ্ধিরাম একটু দূরে দাঁড়িয়ে দেখছে। কিছুই দেখার নেই অবশ্য।

মোড়লদের মধ্যে শলা-পরামর্শ হচ্ছে। সেই দলে বুদ্ধির বাপ জ্যাঠাও আছে। অন্য ধারে গাঁয়ের অল্পবয়সী ছেলেরা কোমরে গামছা বেঁধে তৈরি।

আচমকাই--একেবারে অপ্রত্যাশিত, আদুরিকে দেখতে পেল বুদ্ধিরাম। উত্তরে ঘরের দাওয়ায় তিন-চারজন মহিলা দাঁড়িয়ে ছিল, সেই দলে বুদ্ধির জ্যাঠাইমাও। আদুরি হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সোজা বুদ্ধির দিকে তাকাল। গত দশ বছরে বোধহয় প্রথম।

বুদ্ধি একটু হতবুদ্ধি হয়ে গেল। না, ভুল দেখছে না। হ্যাজাকের আলো স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। বাপের মড়া উঠোনে শোওয়ানো। তবু আদুরি সোজা তার দিকেই চেয়ে আছে। একেবারে নিষ্পলক।

আজ বুদ্ধিরামই চোখ সরিয়ে নিল। তারপর আড়ে আড়ে চাইতে লাগল। মেয়েটার হল কী?

আদুরি তার জ্যাঠাইমার কানে কানে কী যেন বলল। তারপর একটু সরে দাঁড়াল। আঁচলে মুখ চাপা দিয়ে নরম ভঙ্গিতে খুঁটিতে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। তাতে যেন ভারি ফুটে উঠল আদুরি। কী যে দেখাচ্ছে।

জ্যাঠাইমা হাতছানি দিয়ে তাকে ডাকছিল।

বুদ্ধিরাম অগত্যা গিয়ে বলল, কী গো জ্যাঠাইমা?

মড়া ছুঁয়েছিস নাকি?

না। তবে এবার তো ছুঁতে হবেই।

কাজ নেই বাবা। বাড়ি যা। গায়ে গঙ্গাজল আর তুলসীপাতা ছিটিয়ে গিয়ে শুয়ে পড়। তোকে শ্মশানে যেতে হবে না।

কেন?

কেন আবার। ক'দিন আগে কী অসুখটা থেকেই না উঠলি। ঠান্ডা লাগলে আর বাঁচবি নাকি?

আমার কিছু হবে না জ্যাঠাইমা, ভেবো না।

কেন, তোরই বা যেতে হবে কেন? শ্মশানে যাওয়ার কি লোকের অভাব? কত লোক জুটে গেছে। আদুরি মনে করিয়ে দিল, তাই। যা বাবা, ঘরে যা।

আর একবার শুনতে ইচ্ছে করছিল। বলল, কে মনে করিয়ে দিল বললে?

আদুরি অদূরে দাঁড়িয়ে সব শুনতে পাচ্ছে। নড়ল না।

জ্যাঠাইমাও আর তাকে আমল না দিয়ে অন্য মহিলাদের সঙ্গে কথা কইতে লাগল।

বুদ্ধিরাম ধীর পায়ে ছেলে ছোকরাদের দঙ্গলটার কাছে এসে দাঁড়াল।

বুদ্ধিদা, যাবে তো!

যাবো না মানে?

তা গেল বুদ্ধিরাম। মড়া কাঁধে নেচে নেচে গেল। বহুকাল পরে তার এক ধরনের আনন্দ হচ্ছিল আজ। না, প্রতিশোধ নেওয়ার আনন্দ নয়। প্রতিশোধের মধ্যে কোনো আনন্দ নেই। আজ তার আনন্দ হচ্ছিল একটা অন্য কারণে। ঠিক কেন তা সে বলতে পারবে না।

মড়া পুড়ল। বুদ্ধিরাম কষে স্নান করল নদীর পাথুরে ঠান্ডা জলে। দুনিয়ার একজনও অন্তত তার অসুখটার কথা মনে রেখেছে, এখন আর মরতে বাধা কী!

ভেজা গায়ে যখন উঠে এল বুদ্ধিরাম তখন শেষ রাতের হিম বাতাসে সে থরথর করে কাঁপছিল। সবাই কাঁপছে। কিন্তু তার কাঁপুনিটা আলাদা। লোকে বুঝতে পারল না। শুধু বুদ্ধিরামের নিজের ভিতরে যে নানা ভাঙচুর হচ্ছিল তা নিজেই টের পেল সে।

হোঁৎকা সতীশ কাছেই দাঁড়িয়ে গামছা নিংড়োচ্ছিল। হঠাৎ কী খেয়াল হতে বুদ্ধিরামের দিকে ফিরে বলল, হ্যাঁরে বুদ্ধি, তুই যে বড় স্নান করলি?

করব না তো কী?

সতীশ মুখে একটা চুক চুক শব্দ করে বলল, তোর না। কি একটা অসুখ হয়েছিল ক'দিন আগে।

কে বলল তোকে?

সতীশ গামছাটা ফটাস ফটাস করে ঝেড়ে নিয়ে মাথা মুছতে মুছতে বলল, বেরোবার মুখে আদুরি এসে ধরেছিল আমায়। বলল, বটে, রাঙাদা, বুদ্ধিরামের কিন্তু শরীর ভাল নয়। হিমজলে স্নান করলে মরবে। ওকে দেখো।

বুদ্ধিরাম কোনো কথা বলল না। গলার কাছে একটা দলা আটকে আছে। চোখে জল আসছিল।

সতীশ গা মুছতে মুছতে বলল, তোর আক্কেল নেই? কোন বুদ্ধিতে এই সকালে স্নান করলি?

দূর শালা! আজই তো স্নানের দিন। আজ স্নান করব না তো কবে করব?

ট্যাংকি সাফ

ট্যাংকি সাফ করতে ষাট টাকা চেয়েছিল মাগন। চল্লিশ টাকায় রফা হয়েছে।

তো মাগন সেপটিক ট্যাংকির লোহার চাক্কি কোদাল মেরে খুলে বুরবাকের মতো চেয়ে রইল। আই বাপ! হাউস ফুল!

হাউস ফুল না হলে ট্যাংকি সাফ করায় কোন আহম্মক? কিন্তু মুশকিল হল, মাগনের আজ কোনো পার্টনার নেই। কাল হোলি গেছে, আজ রবিবার, মরদরা আজও সব চলাচল জমি ধরে নিয়ে পড়ে আছে। এ বাত ঠিক যে মুর্দার কানে কানে টাকার কথা বললে মুর্দাও গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ে। কিন্তু মাতালরা তো মুর্দা নয়। আর তাদের উঠিয়েও কোনো লাভ নেই। টাকার লোভে কেউ হয়তো গার্দা সাফ করতে এসে ট্যাংকির মধ্যে পড়ে গজব হয়ে যাবে।

প্রথম ট্যাংকিতে ময়লা, দু নম্বরে জল, তিন নম্বরেও জল। তিন নম্বরে পয়লা বালতি মেরে গান্ধা জল তুলে ড্রেনে ঝপাৎ করে ফেলে মাগন আপনমনে বলে--আই বাপ! হাউস ফুল! চালিশ টাকায় তো স্রিফ পাসীনা চলে যাবে। ফিন ভিটামিন উটামিন দিবে কৌন?

বারান্দা থেকে দত্তবাবু দেখছেন, হেঁকে বললেন--কী বলছিস রে ব্যাটা?

মাগন ঝাপাং করে দুসরা বালতি মেরে মুখ তুলে এক গাল হেসে বলে--একটা বাংলা সাবুনের দাম দিবেন তো বড়োবাবু? আর চায় পীনেকো পয়সা! আউর হোলির বকশিশ।

ব্যাটা নাত-জামাই এলেন।

এমন সাফা করে দিব না বড়বাবু। একদম বেডরুম।

বকবক করিস না, হাত চালা। বেলা ভর তোর কাজ দেখতে দাঁড়িয়ে থাকবে কে?

তিন নম্বর বালতি মেরে মাগন বলে, গিয়ে আরাম করুন না, কুছ দেখতে হবে না। কাম পুরা করে পয়সা লিব।

দত্তবাবু স্টেটসম্যানটা খুলে পড়তে গিয়ে দেখলেন প্লাস পাওয়ারের চশমাটা চোখে নেই। চেঁচিয়ে বললেন, মুনমুন, আমার পড়ার চশমাটা দিয়ে যা তো!

বলে কাগজের বড়ো হেডিংগুলো দেখতে লাগলেন। মন দিতে পারলেন না। চল্লিশ টাকার কাজ হচ্ছে সামনে। দু ঘন্টা বড়ো জোর তিন ঘন্টা কাজ করে ব্যাটা চল্লিশ চাক্কি ঝাঁক দিয়ে নিয়ে যাবে। রোজ একটা করে সেপটিক ট্যাংক যদি সাফ করে তবে মাসে কত রোজগার হয়?

ভাবতে গিয়ে ফোঁস করে একটা শ্বাস বেরিয়ে গেল। বারোশো টাকা!

দত্তবাবু খুব জোর হেঁকে বললেন--জোরসে চালা! জোরসে!

ট্যাংকির ভিতরে বক বক করছে জল। গহীন গান্ধা জল। ঝপাঝপ বালতি মারে মাগন আর বলে--চালাচ্ছে বাবা! বহুৎ গান্ধা বাবা, বহুৎ কাদা। চালিশ রুপিয়া স্রিফ পসীনা মে গিয়া বাবা! ভিটামিন দিবে কোন?

২

মুনমুন সাজছে। সময় নেই।

ক'দিন আগেও চুলের গুছির গোড়ায় একটা গারডার বেঁধে বেরিয়ে পড়তে পারত। আজকাল আর তার জো নেই। যাদবপুরের জল এত খারাপ যে গত দু-বছরেই চুল উঠে উঠে এই কটা হয়ে গেছে। এখন মাথায় হাত বোলালেও চুল উঠে আসে, একবার চিরুনি চালিয়ে আনলে উঠে আসা চুলের গোছা দিয়ে দড়ি পাকানো যায়। এখন বব করেছে। তবু চুলের পিছনে খাটতে কম হয় না। শুধু চুল? গায়ের রং মেটে হয়ে গেল। যে দেখে সেই বলে--ইস! কী কালো হয়ে গেছিস! কতবার বলেছে বাবাকে এবার যাদবপুর ছাড়ো আর নয়, এর পর মাথায় টাক পড়বে, গায়ের রং হয়ে যাবে টেলিফোনের মতো। পাত্রপক্ষ দেখতে এলে ভুল করে বলে উঠবে হ্যালো!

সময় নেই। শুধু শাড়িটা পরা বাকি।

ব্লাউজের হুকগুলো লাগিয়ে দিবি লক্ষ্মীটি? বলতে বলতে গিয়ে সে হুস করে চুনুর সামনে পিছু হয়ে উবু হয়ে বসে পড়ে।

চুনুর মুখ দেখে তার মন বোঝা যায় না। দীর্ঘদিন ধরে সে এইটে অভ্যেস করেছে। মুখে একটা ভালমানুষি, আর বড়ো বড়ো চোখে ভাসানো দৃষ্টিতে সে চায় সব সময়ে। দিদিকে আসতে দেখেই চুনু একটা কাগজ লুকিয়ে ফেলল ফ্রকের ঘেরের নিচে।

একক সংগীত তোর ভাল লাগে বাববাঃ! আড়াই ঘন্টা ধরে একই গলার গান শুনতে শুনতে মাথা ধরে যায় না? ...ইস, হুকগুলো সব চেপটে গেছে। লন্ড্রিতে দিয়েছিলি বুঝি ব্লাউজটা? আছড়ে কেচেছে, হুকের মাথাগুলো সব বসে গেছে।

মুনমুন অধৈর্য হয়ে বলে, তাড়াতাড়ি কর না।

করছি তো! হুকগুলো ঘরে ঢুকছে না যে! একটা সেফটিপিন দে, খুঁটে তুলি। মুনমুনের নতুন প্রেমিক এসে দাঁড়িয়ে থাকবে রবীন্দ্রসদনে। মুনমুন খুব ভাল জানে এও বেশিদিন টিকবে না। শেষ পর্যন্ত কে যে পাবে তাকে তা কি এখনই বলা যায়? সতেরো বছর বয়সে কী করে বলবে, আসল লোকটা কে! এখনো কত জন আছে, কত রোমাঞ্চ আছে, কত রহস্য ও ঘটনা! তবু এখনকার মতো এই প্রেমিকটিকেও সে উপেক্ষা করতে পারে না।

সব সময়েই একটু দেরি করে যাওয়া ভালো। তা বলে বেশি দেরিও নয়। তাতে উৎকণ্ঠার বদলে বিরক্তি এসে যায়। মুনমুনের একটা হিসেব আছে। সে হিসেব মতো একটু বেশি দেরিই হয়ে যাচ্ছে।

সে এক ঝটকায় সরে এসে বলে, ছাড় তো! তোর কম্ম নয়।

বলে সে নিজে নিজে ড্রেসিং টেবিলের দিকে পিছু ফিরে হাত পিছনে ঘুরিয়ে টপাটপ হুক লাগিয়ে ফেলে, বলে, কোথায় হুক চেপটে গেছে! আমার হাতে লাগল কী করে? মারবো থাপ্পড়--

চুনু ভাসা চোখে চেয়ে থাকে ভালোমানুষের মতো। যেন জানে না, হুক ঠিক ছিল। বলল সুচিত্রার গান রোজ তো শুনছিস বাবা, রেডিওয়, গ্রামোফোনে, মাইকে। আর কত? ডাল-ভাত হয়ে গেছে।

সুচিত্রা কখনো ডাল-ভাত হয়ে যায় না। আর হলেই কি? তুই রোজ ভাত খাস না? খারাপ লাগে? ভাত না পেলে তো কুরুক্ষেত্র করিস!

হঠাৎ কুঁকড়ে গিয়ে চুনু ফ্রক তুলে নাক চেপে ধরে রুদ্ধস্বরে বলে--এঃ মা! কী গন্ধ

আসছে।

প্রচন্ড সেন্ট মেখেছে মুনমুন। প্রথমে সে পায়নি, এখন পেল গন্ধটা। একটা 'ওয়াক' তুলে দৌড়ে গিয়ে বারান্দায় দরজাটা বন্ধ করে এসে 'উঃ উঃ' করে নাকে আঁচল চাপা দিয়ে বলল, সেপটিক ট্যাংক খুলেছে। শিগগির জানলা বন্ধ কর।

৩

একটা দড়ি দিবেন বড়োবাবু? আব পানি নীচা হয়ে গেল, বালতিতে দড়ি লাগাতে হবে।

ওঃ, দড়ির কথা আগে বলবি তো! দাঁড়া দেখি আছে কি-না!

মাগন একগাল হেসে বলে, বারো আনা পয়সা দিন তো লিয়ে আসি।

পয়সা দিলে পাওয়া যায় সে জানি। চালাকি করিস না। দেখছি দাঁড়া।

দত্তবাবু চেঁচালেন, কোথায় গেলে গো? এ ব্যাটা দড়ি চাইছে। আছে নাকি?

লীলাময়ী রান্নাঘরে নেই। খুঁজতে গিয়ে দত্তবাবু দেখেন, ফাঁকা রান্নাঘরে উনুনের ওপর ডাল ফুটছে। ডালের ফেনা উথলে উনুনের গায়ে পড়ে পড়ে ছ্যাঁক-ক ছ্যাঁক-ক শব্দ উঠছে।

দত্তবাবু ফিরে দাঁড়াতেই অন্যায়ের দৃশ্যটি দেখতে পেলেন।

দত্তবাবু তাঁর শ্বশুরমশাইকে 'বাবা' ডাকেন না বলে লীলাময়ীর বড়ো অভিমান। কিন্তু এ লোককে 'বাবা' ডাকা যায়? দত্তবাবু দেখতে পেলেন, ভিতরের দু ঘরের মাঝখানকার

প্যাসেজে তাঁর রোগা খুনখুনে বুড়ো শ্বশুরমশাই খুব গোপনে একটা গামছায় নাক ঝাড়ছেন।

শ্বশুরমশাইয়ের ভয়ে দত্তবাবু তাঁর পরিষ্কার গামছাখানা সব সময়ে লুকিয়ে রাখেন। কারণ শ্বশুরমশায়ের নিজের দুখানা গামছা থাকা সত্ত্বেও সে গামছায় তিনি নাক ঝাড়েন না বা পায়ের তলা মোছেন না। ও দুটো কাজের জন্য তিনি সব সময়েই অন্যের গামছা চুরি করেন। এখনও করছেন। আরো আছে। নিজের হাওয়াই চপ্পল থাকা সত্ত্বেও পায়খানায় যাওয়ার সময় শ্বশুরমশাই লুকিয়ে জামাইয়ের হাওয়াই দুটো পায়ে দিয়ে যান।

কার না রাগ হয়? কিন্তু মুখোমুখি চোটপাট করে কিছু বলাও যায় না। কুটুম মানুষ।

দত্তবাবু প্যাসেজটার মধ্যে এগিয়ে গিয়ে বললেন, গামছাটা আপনি পেলেন কোথায়?

'বাবা' ডাকেন না বলে যে শ্বশুরমশাই দত্তবাবুকে কম খাতির করেন তা নয়। বরং বেশিই করেন। বাবা ডাকেন না বলেই খাতির করেন। খাতিরের চেয়েও বেশি। ভয় পান।

বুড়ো মানুষটি ভয়ে হাঁ করে আছেন। আড়ষ্ট হাতে জামাইয়ের গামছা। সামলে নিয়ে বললেন, এইখানেই ছিল। সরিয়ে রাখছি। দেখো, তোমার গামছায় যেন কেউ হাত না দেয়। কাউকে হাত দিতে দেবে না। আমিও সবাইকে বারণ করি, অধীরের গামছায় তোমরা কেউ ...

দত্তবাবু মুখটা কুঁচকে সরে এলেন। গামছাটা আজ আর একবার কাচিয়ে নিতে হবে। সরে আসতে আসতেই শুনতে পেলেন, 'হ্যাক' করে থুতু ফেলার শব্দ। পিছনে আর তাকালেন না। তাকালে আর সারাদিন জল খাওয়া হবে না। প্যাসেজেই জলের কুঁজো রাখা। শ্বশুরমশাই সারাদিন বাড়ির সর্বত্র থুতু ফেলছেন। সর্বত্র।

লীলাময়ী নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছেন বাইরের ঘরের দরজার পাশে। একটু গোপনীয়তা ভঙ্গি মাখানো তাঁর শরীরে।

গোপনীয়তাটা বাহুল্যমাত্র। বাইরের ঘর থেকে যে আসছে তা শোনবার জন্য কান পাততে হয় না।

৪

যতটা সুভদ্রাকে ততটা আর কোনো মেয়েমানুষকে ঘেন্না করে না অধীপ। গুয়ের পোকাও কি ওর চেয়ে ভালো নয়?

সুভদ্রা খাটে বসে আছে, সামনের দিকে জোড়া পা ছড়ানো, পিছনে হাতের ভর। মুখ সাদা, চোখ জ্বলছে। বলল, ন্যাকা, জানো না?

তুমি বলতে পারলে? কোনো ভদ্রলোকের মেয়ে বলতে পারে ওকথা?

নিজেরা কী? লোকে শুনলে থুতু দিয়ে যাবে গায়ে। ভদ্রলোকের মেয়ে! আমি ভদ্রলোকের মেয়ে না তো কী, তোমার মতো ইতরের বাচ্চা?

মেয়েমানুষকে মারা ভালো নয় অধীপ জানে। কিন্তু এই মুহূর্তে বুঝতে পারে, মার--মারের মতো এমন নিরাময় আর কিছুতেই নেই। মারই বোধ হয় সবচেয়ে শান্তি। এক পা এগিয়ে সে শরীরে রিম-ঝিম-ঝিম রাগের নাচ শেষ কয়েক মুহূর্তের জন্য সহ্য করে প্রায় রুদ্ধস্বরে বলল, এই বজ্জাত মাগী! মুখ ঘষে দেবো দেয়ালে!

দাও না! দাও! বলে চোখের পলকে উঠে আসে সুভদ্রা। একদম কাছে এসে চিতিয়ে দাঁড়িয়ে বলে, ছোটোলোকের ইতরের গর্ভে যার জন্ম তার কাছে আর কী আশা করব? মারো!

অধীপ কথা বলতে পারে না। কাঁপে। স্ট্রোক হয়ে যাবে! পাগল হয়ে যাবে! ডিভোর্স...

সুভদ্রা ধকধক করতে করতে বলে, ন্যাকা! জানো না, তোমার শরীরে কিসের রক্ত! গুষ্টিসুদ্ধু বদমাইশ তোমরা, জানো না? তোমার ওই আদরের লেংড়ী বোন চুনু কেন আমাকে বিয়ের পরদিনই বলেছিল--এই বৌদি, তুমি কেন আমার দাদার সঙ্গে শোবে!

অধীপের এ কথাটা মাথায় ঢোকে কিন্তু সুভদ্রাই কথাটা বলতে--এটা যেন বিশ্বাস হয় না। তার সমস্ত বিশ্বাসের ভূমি থেকে কে যেন তাকে তুলে ছুঁড়ে দেয় অন্য একটা হীন আর ক্লীব জগতে। সে কাঁপতে কাঁপতে কসাইয়ের গলায় বলে, কেন বলেছিল?

সুভদ্রা সে কথার সরাসরি জবাব না দিয়ে দিগবসনা আক্রোশ প্রায় নেচে উঠে বলে--সহ্য হবে কেন? আদরের দাদার সঙ্গে অন্য কেউ শোয় তাতে বুক জ্বলে যাবে না? ছিঃ ছিঃ! তোমরা লোকসমাজে মুখ দেখাও কী করে?

অধীপ হঠাৎ পাথরের মতো শান্ত হয়ে গেল! খুন করার আগে যেমন মানুষ কখনো কখনো হয়! একটু বাদেই সুভদ্রা তার হাতে খুন হবে, সুতরাং সে নিশ্চিন্ত সিদ্ধান্তের পর ঠান্ডা গলাতেই বলতে পারল--তুমি নর্দমার পোকা।

তা তো বলবেই। নিজেরাই কিনা! শ্বশুর আমাকে ভালোবাসে বলে তোমার মা বলেনি, শ্বশুর বলেই কী, পুরুষ তো! যুবতী বউয়ের সঙ্গে অত মাখামাখি কীসের? তুমিও বলোনি, সুভ, তুমি বাবার সঙ্গে অত মেলামেশা কোর না। বলোনি?

বলেছে। ঠিক কথা, মায়ের কাছে শুনে তারও এক সময়ে বিশ্বাস হয়েছিল, বাবার সঙ্গে সুভদ্রার অত স্নেহের সম্পর্কের মধ্যে কিছু একটা অসঙ্গতি আছে। বলেছে। কিন্তু মানুষের কি ভুল হয় না!

সুভদ্রা ঝোড়ো দ্রুতবেগে বলে, সন্দেহ করনি নিজের বাবাকে? অমন মাতৃভক্তির কপালে কাঁটা। ডাইনি মুখে পোকা পড়ে মরবে, পচে-গলে মরবে।

ঠিক এই সময়ে দুর্গন্ধটা আসে। বহু দিনকার জমানো মল, ময়লা, জলের প্রচন্ড গ্যাস। ঘরটার বাতাস পলকে বিষিয়ে ওঠে। কিন্তু তারা দু-জন গন্ধটাকে টেরই পায় না। কিংবা পেয়েও উপেক্ষা করতে পারে। কিংবা হয়তো তারা ঠিক এই মুহূর্তে দুর্গন্ধটাকে উপভোগই করে।

আশ্চর্যের বিষয়, অধীপ হাসল। অবশ্য এটা হাসি নয়। খুন করার আগে অভ্যস্ত খুনি কখনো সখনো এরকমই হাসে হয়তো।

তারপরেই সে চড়টা মারল। সুভদ্রা যে পাঁচ মাসের পোয়াতি তা মনে রইল না। লক্ষও করল না যে তার দু-বছরের ছেলে দৃশ্যটা দেখছে।

চালা! জোরসে চালা জলদি।

হচ্ছে বাবা, হচ্ছে। পাম্প তো নেহি যে ভটভট করে গার্দা খিঁচে লিবে!

দুনম্বর ট্যাংকিতে ঘপ করে বালতি মারে মাগন। হাউস ফুল।

দত্তবাবু চেঁচিয়ে বলেন--এই ব্যাটা ময়লা ফেলার গর্ত করবি না?

হাঁ হাঁ, গোর্তো হোবে গোর্তো ভী হোবে। এক বোতল শরাবের দাম দিবেন তো বড়োবাবু?

নালিতে ময়লা ফেলবি তো পয়সা কাটবো। নালি আটকালে বাড়িওলা পাঁচকথা শোনাবে। খুব সাবধান।

কোই চিন্তা নাই বড়োবাবু। কাম পুরা করে পয়সা লিব।

প্লাস পাওয়ারের চশমাটা পরেও স্টেটসম্যানের খবরগুলো দেখতো পান না দত্তবাবু। পুরোটাই আবছা, অস্পষ্ট, হিজিবিজি এবং অর্থহীন। তবু মুখের সামনে কাগজটা ধরে রাখেন। মুখোশের মতো।

মুনমুনকে চিঠি দিয়েছিল বাড়িওলার ছেলে মিলন। সেই চিঠি বাড়িওলা রসিকবাবুর হাতে পৌঁছে দিয়েছিলেন দত্তবাবু। সেই থেকে গন্ডগোলের শুরু। রসিকবাবুর স্ত্রী ওপরতলা থেকে পরিষ্কার শুনিয়ে দিলেন--এ হতেই পারে না। নষ্ট মেয়েটার পাল্লায় পড়ে মিলুও গোল্লায় যাচ্ছে। তুলে দাও।

দত্তবাবুর কিছু বলার দরকার হয়নি, লীলাময়ী নীচতলা থেকে গুষ্টি উদ্ধার করলেন ওঁদের। কয়েকদিন দত্তবাবু বুকের প্যালপিটিশনে কষ্ট পেলেন খুব। তাঁর খুব ইচ্ছে করে, যে বাড়িওলার যুবক ছেলে নেই তার বাড়িতে উঠে যান। কিন্তু ইচ্ছে তো আর পক্ষীরাজ নয়!

এক বছর আগেকার এই ঘটনা থেকেই অশান্তি চলছে। রান্না করতে করতে মাঝখানে কলের জল বন্ধ হয়ে যায়। আঁচাতে গিয়ে বেসিনে জল পাওয়া যায় না। লীলাময়ী নিচে থেকে দাপিয়ে চেঁচান। আর দত্তবাবুর ঝি বাসন মেজে কলতলায় ছাই ফেলে এলে ওপর থেকেও দাপানো আর চেঁচানোর শব্দ হয়।

শ্বশুরমশাই বকের মতো পা ফেলে বাথরুমে যাচ্ছেন জল ঘাঁটতে। এ বাড়ির জলকষ্টের মূলে এই লোকটার অবদান বড়ো কম নেই। সারাদিন জল ঘাঁটছে লোকটা। হাঁপানি আছে। সর্দির ধাত আছে। সারা রাতের কাশি আছে। আর সেই সঙ্গে জল ঘাঁটাও আছে। জল ঘাঁটুক, তাতে দত্তবাবুর আপত্তি নেই। তিনি শুধু শ্বশুরমশায়ের পায়ের চপ্পলটা লক্ষ করলেন, দত্তবাবুর চপ্পলের স্ট্র্যাপ নীল রঙের শ্বশুরেরটা খয়েরি।

খয়েরি দেখে দত্তবাবু নিশ্চিন্ত হয়ে আবার স্টেটসম্যানের মুখোশ পরলেন, পরার দরকার ছিল। কারণ, লীলাময়ী আসছেন।

এসে একটা মুখ ছেঁড়া খাম দত্তবাবুর হাতে দিয়ে বললেন--এই সেই চিঠি।

কীসের চিঠি?

বউমার বাক্স থেকে বোধ হয় চুনু নিয়েছিল।

কেন?

অন্যায় করেছে নিয়েছে? হয়তো লোভ সামলাতে পারেনি। এই নিয়েই অধীপের সঙ্গে ওই ঝগড়া।

দত্তবাবু চিঠিটা হাতে নিয়ে বলেন, কবেকার চিঠি?

বিয়ের আগে অধীপ বউমাকে যে-সব চিঠি লিখত তারই একটা। কী দরকার ছিল পুরোনো চিঠি জমিয়ে বুকে করে রাখবার? পুড়িয়ে ফেলা যেত না , ঘরে বয়সের ননদরা রয়েছে, কোলের ছেলেও বড়ো হচ্ছে...

তুমি চিঠিটা পড়েছো?

খুব দৃঢ় গলায় নয়। ঝংকার দিয়ে লীলাময়ী বললেন--পড়ব কেন?

পড়োনি?

ওপর ওপর দেখেছি একটু। কী এমন কথা যার জন্য মাগির আঁতে ঘা পড়ল। ...উঃ, এই দুর্গন্ধের মধ্যে বসে আছো কী করে? তুমি মানুষ না কী?

দত্তবাবু বললেন--পড়ে ভালো করোনি।

কেন? ভালো না করাই কী? তুমিও দেখ না। বলে লীলাময়ী খাম থেকে চিঠিটা খুলে নিয়ে দত্তবাবুর হাতে দিয়ে বলে--পড়েই দেখ।

বউমা কী করছে?

কাঁদছে, ঘরে দরজা দিয়ে।

তুমি যাও।

লীলাময়ী চলে গেলে দত্তবাবু চিঠিটা খোলেন।... অশ্লীল, খুবই অশ্লীল চিঠিটা।

মন থেকে আজ কেমন জোর পাচ্ছেন না। মনের জোরের জন্য খানিকটা নৈতিকতা দরকার। হ্যাঁ, মর্যালিটি তা কি তাঁর আছে?

লীলাময়ী দুর্গন্ধের কথা বলে গেলেন। কিন্তু তিনি দুর্গন্ধ পাচ্ছিলেন না।

৬

ডাক্তারকে খবর দেওয়া ছিল। সদর থেকে তাঁর হাঁক শোনা গেল এইমাত্র--কই বউমা কোথায়!

বাইরের বারান্দাটাই এখন বসার ঘর। অধীপের বিয়ের পরই বাইরের ঘরটার দরকার হল! তখন বারান্দাটা প্লাইউড দিয়ে ঘিরে সোফা সেট পাততে হল।

লীলাময়ী প্রমাদ গুনলেন। বউমাকে দেখতে এসেছে। সর্বনাশ! তার বাঁ গালে অধীপের পাঁচ আঙুলের দাগ ফুটে আছে এখনো, তার ওপর নাগাড়ে কাঁদছে। বাইরের লোকের সামনে বেরোবে না কিছুতেই। যদিও বা বেরোয় ডাক্তার সবই লক্ষ করবে।

উঠে গিয়ে তিনি ঘোমটা টেনে বললেন বসুন।

বেশি বসবার উপায় নেই। চেম্বারে রুগি বসে আছে।

লীলাময়ী নিঃশব্দে গিয়ে দরজায় সামান্য শব্দ করে চাপা গলায় ডাকেন--বউমা! বউমা! ডাক্তারবাবু এসেছেন, দরজা খুলে দাও। ঠিকঠাক হয়ে নাও।

সুভদ্রা পাঁচ মাসের পোয়াতি। বড়ো ছেলে দুই পেরিয়েছে। সে হতে বড়ো কষ্ট গিয়েছিল। অধীপ তাই ঘন ঘন ডাক্তার ডেকে চেক আপ করায়। কিন্তু অধীপটা রাগারাগি করে বেরিয়ে গেছে। অবস্থাটা সামাল দেবেন কীভাবে তা ভাবতে ভাবতে লীলাময়ী গিয়ে চায়ের জল চাপান। চৌধুরি পারিবারিক ডাক্তার তাঁর কাছে তেমন লজ্জা নেই। তবু তো লজ্জা! আজকালকার বউয়েরাও ভারি নির্লজ্জ। কথায় কথায় পরপুরুষ ডাক্তারদের কাছে নিজেদের খুলে দেয়। ডাক্তাররা গোপন জায়গায় হাত দেয়, টিপ দিয়ে দেখে, অসভ্য সব প্রশ্ন করে। মাগো! লীলাময়ী মরে গেলেও পারবেন না। তাঁকে কয়েকবার লেডি ডাক্তাররা দেখেছিল। তাতেই কী লজ্জা!

শচীলাল ডাক্তারের গন্ধ পেয়েছেন। থুতু ফেলার জন্য তাঁর একটা টিনের কৌটো আছে। সেইটে গিয়ে গোপনে বেসিনে ধুচ্ছিলেন। জল ঘাঁটছেন টের পেলে মেয়ে আজকাল বড়ো বকে।

ডাক্তারের সাড়া পেয়ে তাড়াতাড়ি কৌটো রেখে বাইরের বারান্দায় এসে বসেই বললেন--বুঝলেন ডাক্তারবাবু, গত দুবছর যাবৎ আমার পেটের কোনো গোলমাল নেই।

চৌধুরি হেসে বলেন, বাঃ, খুব ভালো।

যা খাই সব হজম হয়। ইটের মতো শক্ত পায়খানা। আপনি আমাকে রোজ সকালে দুটো করে মুরগির ডিম খাওয়ার ব্যবস্থা দিয়ে যান।

সে আমি বুঝব খন। শ্বাসের কষ্টটা কেমন আছে?

এটাই যা একটু কষ্ট দেয়, আর সব ভালো।

লীলাময়ী চা নিয়ে এসে বাবাকে দেখে বড়ো বড়ো চোখে তাকিয়ে বলেন, তোমার আবার কী?

শচীলাল একগাল হেসে চৌধুরিকে বলেন, বুঝলেন ডাক্তারবাবু, লীলা ভাবে আমি পেট খারাপের কথা লুকোই। কাল তাই প্যানের ওপর পায়খানা করে ডেকে দেখালাম। বল না লীলা ডাক্তারবাবুকে কেমন পায়খানা!

চৌধুরি বলেন, আচ্ছা, দেখা যাবে।

লীলাময়ীর মুখ ফেটে পড়ছে রাগে, চাপা গলায় শচীলালকে বলেন, এখন ঘরে যাও তো!

চা করলি?

তুমি এখন খাবে না চা। স্নান করো গে। একেবারে ভাত দেবো।

চালকুমড়ো পাতার পুর করবি না?

লীলাময়ীর হাত পা নিশপিশ করে। গোপনে আবার এসে, বউমার ঘরের দরজা নাড়া দেন--শুনছো বউমা?

ঘরে ছেলেটা কাঁদছে অনেকক্ষণ ধরে। বাপ মায়ের রুদ্রমূর্তি দেখেই শুরু করেছিল। তারপর থেকে ভ্যাবাচ্ছেই।

সুভদ্রার কান্না থেমেছে। গম্ভীর গলায় বলল, ডাক্তার বিদেয় করে দিন গে। আমি দেখাবো না। আর বিরক্ত করবেন না আমাকে।

ভারী অসহায় বোধ করেন লীলাময়ী। কী করবেন? চৌধুরি এসেছেই যখন, রুগি দেখুক আর না দেখুক, ভিজিটের টাকাটা দিতেই হয়। কিন্তু অধীপ ভিজিটের টাকা রেখে যায়নি।

৭

ইসি ট্যাংকিমে আর কুছু নাই বড়োবাবু।

নেই মানে? ইয়ার্কি পেয়েছিস? ডন্ডা মার, মার ডান্ডা। দেখি কতখানি আছে।

মাগন বলে, হাঁ হাঁ দেখে লিন।

ডাণ্ডা মারতেই সেটা ভচাক করে দু-হাত পুরু ময়লায় ডেবে গেল।

ওই তো। এখনো অর্ধেক রয়ে গেছে। চালাকি করার আর জায়গা পাস না? চল্লিশ টাকা কি এমনি এমনি দেবো?

ডান্ডাটা তুলে ময়লার দাগ দেখিয়ে মাগন বলে--বাস এইটুকু তো সব ট্যাংকিতে থাকে। ট্যাংকি কি কখনো পুরা সাফা হয় বড়োবাবু? কুছু তো থেকেই যায়। ই-তো স্রিফ বালু আছে।

বকবক না করে কাজ কর তো।

হাঁ হাঁ কাম তো করছে বড়োবাবু।

দু নম্বর ট্যাংকিতে জলের নিচে ময়লা এখনো থকথক করছে। শক্ত মাল। বালতি মারলে ডোবে না। পা গর্তে ঢুকিয়ে বালতি ডোবায় মাগন। বলে, বহোত পরেসান বাবা। একটা পুরানা জামা দিবেন তো বড়োবাবু? ট্যাংকি বেডরুম বানিয়ে দিব।

লীলাময়ী আসছেন টের পেয়েই দত্তবাবু স্টেটসম্যানের মুখোশটা পরে নিলেন।

কিন্তু লীলাময়ী এলেনই। নাকে চাপা আঁচলের ফাঁক দিয়ে বললেন--চৌধুরী এসেছে। বউমা ডাক্তার দেখাবে না বলছে। কিন্তু ভিজিট তো দিতে হয়। অধীপ টাকা রেখে যায়নি।

বিরক্ত দত্তবাবু বলেন, আমার ব্যাগ থেকে নিয়ে দিয়ে দাও গে। অধীপ এলে চেয়ে রেখো।

চাইবো, কিন্তু সে দেবে কেন? তার বউকে তো আর দেখেনি।

সেই তো ডেকেছে, আমরা তো কল দিইনি। রেসপনসিবিলিটি তার। লীলাময়ী নাকটা ছেড়ে একটু দম নিতে গিয়েই দুর্গন্ধে শিউরে উঠে 'হ্যাক' শব্দ করে আবার নাকে চাপা দিয়ে বলেন--বলছি কী, ভিজিট যখন দিচ্ছিই তখন আর মাগনা ছাড়ি কেন। প্রেসারটা দেখিয়ে নিই। বাবার বুকটাও পরীক্ষা করুক। তুমিও তো পরশুদিন মাথা ঘোরার কথা বলছিলে, দেখিয়ে নেবে নাকি?

ঠিক এই সময়ে ওপর থেকে রসিকবাবুর স্ত্রী চেঁচিয়ে উঠে বলেন--এই জমাদার! নর্দমায় ময়লা ফেলছো যে বড়ো? নালি আটকে যাচ্ছে না?

মাগন মুখ তুলে বলে--নালি টেনে দিব মা। কাম পুরা করে পয়সা লিব।

কেন? গর্ত করতে কী হয়? বলা হয়নি তোমাকে গর্ত খুঁড়তে? টাকা মাগনা আসে?

হাঁ হাঁ, গাড্ডা ভী হোবে।

রসিকবাবুর স্ত্রী বেশ চেঁচিয়ে বলতে থাকেন--ছ-মাস আগে ট্যাংক পরিষ্কার করানো হয়েছে, এর মধ্যেই যে কী করে ভরে যায় তা তো বুঝি না!

কথাটা গায়ে না মাখলেও হয়। কিন্তু লীলাময়ী মাখলেন।

শুনলে?

দত্তবাবু স্টেটসম্যানের মুখোশ পরে ফেলেন। লীলাময়ী মুখটা সিলিং-এর দিকে তুলে কয়েক রাউন্ড গুলি ছোঁড়েন, ময়লা কি শুধু আমাদের একার? ওপরতলায় বুঝি সব দেবতারা থাকেন, তাঁরা কেউ হাগেন মোতেন না? আর জমাদারের টাকার অর্ধেক তো আমাদেরও দিতে হবে। মাগনা কাজ হচ্ছে নাকি?

রসিকবাবুর স্ত্রী নাগাড়ে চালিয়ে যাচ্ছেন। সব কথা বোঝা যায় না। শুধু স্পষ্ট করে শুনিয়ে বললেন--ওই তো ছেলে ধরতে বিবি বেরিয়ে গেলেন। আর দোষ হল কি না আমার মিলনের। গুষ্টিসুদ্ধ তেড়ে এসেছিলেন ঝগড়া করতে। বলি, মেয়ে কোথায় যায়, কার সঙ্গে কি রকম ঢলাঢলি তার খবর রাখছে কে? সে বেলা তো চোখে তুলসীপাতা এঁটে থাকা হয়।

লীলাময়ী এখন আর দুর্গন্ধটা পাচ্ছেন না। নাকের কাপড় কখন খসে গেছে। বড়ো বড়ো চোখে লীলাময়ী স্বামীর দিকে তাকান। মুখে কথা নেই।

দত্তবাবু এমন মুখের ভাবখানা করেন, যেন তাঁর মেয়ে বা তাঁর পরিবার নিয়ে কথা হচ্ছে না। এ যেন অন্য কারো কথা। প্রচন্ড জিদবশত তিনি কাগজে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ-দাঙ্গার খবর পড়তে থাকেন। এক বর্ণও বুঝতে পারেন না।

একবার ভাবলেন ডাক্তার চৌধুরিকে প্রেসারটা দেখিয়ে নেবেন।

৮

চুনুর একটা পা শুকনো কাঠি। একটা হাতও কমজোরি। বড়ো কষ্ট তার হাঁটাচলার। যে তাকে দেখে সে-ই দুঃখ পায়।

আর অন্যের এই দুঃখবোধটা খুব ভালো কাজে লাগাতে শিখে গেছে চুনু।

জানালার কাছে একটা সাইকেল থেমে আছে। সাইকেলের ওপর শিবাজী।

ডলিকে আমি নিজের চোখে দেখেছি পাম্প ছাড়তে। --চুনু খুব ভালো মানুষের মতো বলে।

কিন্তু আমার পিছনের চাকাটায় তো লিক বেরোলো।

লিক? তবে ঠিক সেফটিপিন ফুটিয়ে দিয়েছিল। তুমি তখন মান্তুদের বাড়িতে ক্যারাম খেলছো। খেলছিলে না?

ক্যারাম?

মিথ্যে কথা বোলো না।

শিবাজী হেসে বলল--খেলছিলাম। তুমি ডলিকে বলেছো?

না, মাইরি, কালীর দিব্যি।

তবে বলল কে? ডলি জানল কী করে?

বলবো--সত্যি কথা একটা? কিছু মনে করবে না তো?

বলো না।

মান্তু। ঠিক মান্তুই বলেছে। মান্তু আজকাল ইউনিভারসিটির ঝিলে গিয়ে কার সঙ্গে বসে থাকে জানো? তপন।

সেই বদমাশটা? গেলবারও আমাদের হাতে মার খেয়েছিল! .....এই! তোমার বাবা! বলেই শিবাজী জানলার নিচে ডুব দেয়। পরক্ষণেই তার সাইকেলের ঘন্টি দূরের রাস্তার দমকলের ঘন্টার মতো ঘন ঘন রি রি রিং রি রি রিং বাজতে থাকে।

চুনু আস্তে আস্তে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায়। তার মুখে কোনো অপরাধবোধ নেই। বউদির চিঠি চুরির জন্য মা তাকে বকেনি। আসলে বকতে সাহস পায়নি। বাবাও পাবে না।

দত্তবাবুও জানেন চুনুকে শাসন করার ক্ষমতা তাঁর নেই। কাউকেই শাসন করার ক্ষমতা নেই। এ বাড়ির কেউই তাঁর কথা শোনে না।

এ চিঠিটা চুরি করেছিস?

ঠান্ডার গলায় চুনু বলে--বেশ করেছি। এক-শো বার করব।

এই মেয়ের জন্যই দত্তবাবু আর লীলাময়ী গত পাঁচ বছর এক বিছানায় শুতে পারেন নি। চুনু তখন থেকেই তার মাকে প্রায়ই বলত--লজ্জা করে না তোমরা বুড়ো বয়সে একসঙ্গে শোও? কেন শোবে?

কী লজ্জা! সেই লজ্জায় লীলাময়ী দত্তবাবুকে বলেছিলেন--মেয়ে যখন চায় না তখন থাক না হয়।

দত্তবাবু গম্ভীর হয়ে ছিলেন। কিছু বলেননি। লীলাময়ীই আবার নিজে থেকে বলেন, ও তো জানে ওর সাধ আহ্লাদ মিটবে না। তাই বোধহয় হিংসে।

হবে। কিন্তু সেই আক্রোশটা দত্তবাবুর যায়নি এখনো। দাঁতে দাঁত পিষে বললেন--কী বললি?

তাঁর চেহারাটা কেমন দেখাল কে জানে! হয়তো খুবই ভয়ংকর। দত্তবাবু ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন।

ভয় পায় না, তবে এখন পেল। পিছনে হাত নিয়ে জানলার গ্রিল চেপে ধরে তবু ত্যাড়া ঘাড়ে চুনু বললে--গায়ে হাত দেবে না বলে দিচ্ছি! ইঃ! তেজ দেখাতে এলেন! মুরোদ জানা আছে। কই, বউদিকে তো চোখ রাঙাতে পারো না, যখন মাকে যা তা বলে মুখের ওপর! তোমার উইকনেস জানি। বেশি তেজ দেখাতে এলে সবাইকে চেঁচিয়ে বলব।

দত্তবাবু অবশ হয়ে যান। ঘেমে যান। মুহূর্তের মধ্যে। মারবেন বলে হাত তুলেও ছিলেন। সেই হাত সজোরে নেমে ঝুলে পড়ল ফাঁসির মড়ার মতো।

আস্তে আস্তে ফিরে এসে স্টেটসম্যানের মুখোশ পরলেন।

এই সেদিন অধীপ যখন বিয়ে করবে বলে মাকে গিয়ে ধরেছিল সেদিন লীলাময়ীর কাছে সব শুনে কী রাগটাই না করেছিলেন তিনি। ছেলে তখন সদ্য চাকরিতে ঢুকেছে। ঢুকেই বিয়ে। পার্মানেন্ট হ। মাইনে একটু ভদ্রগোছের হোক। নইলে তো হ্যাপা সামলাতে হবে বাপকেই।

কিন্তু দত্তবাবুর ইচ্ছেয় কিছু তো হয় না এ বাড়িতে। যার যা ইচ্ছে তাই করে। অধীপেরও বিয়ে হল।

নতুন বউকে দেখে ভারি মুগ্ধ হয়ে গেলেন দত্তবাবু। বহুকাল এমন মিষ্টি মুখ দেখেননি। বউভাতের পরদিনই মাথাখানা বুকে টেনে বলেছিলেন--এখন তুমিই সংসারের কর্ত্রী।

আত্মবিস্মৃত হয়ে গিয়েছিলেন। কথাটা বলা ঠিক হয়নি। সেই থেকে সংসারে অশান্তির সূত্রপাত।

মনের মধ্যে পাপ আছে কি?

কে জানে বাবা! কে জানে! তবে পাপের চেয়েও লজ্জা অনেক বেশি।

শ্বশুরমশাই কী একটা পিছনে লুকিয়ে নিয়ে চুপিসাড়ে বাথরুমের দিকে যাচ্ছেন।

উঁকি মারলেন দত্তবাবু। দেখলেন, তাঁর নীল স্ট্র্যাপের হাওয়াই চপ্পলজোড়া।

৯

লীলাময়ি দুটো প্রেসারের বড়ি একসঙ্গে খেলেন। বেড়েছে।

একটা ছিটকিনি খোলার আওয়াজ পেয়েছিলেন যেন একটু আগে। মনের ভুলও হতে পারে। তবে কান খাড়া রাখছেন।

শচীলাল স্নান সেরে এসে নিজেই আসন পেতে জল থালা আর নুন নিয়ে বসে পড়েছেন ভিতরের বারান্দায়। ডাকছেন--লীলা, দিবি নাকি?

ঠিক এই মুহূর্তে লীলাময়ীর রাগ হল না। কদিন আগেও শচীলাল জামাইয়ের সঙ্গে ছাড়া খেতেন না। ভদ্রতাবোধ বরাবরই প্রবল। ইদানীং এই সব হচ্ছে। লীলাময়ী বললেন--বসে

থাকো একটু। যাচ্ছি।

শচীলাল বসে থাকেন। দুর্গন্ধ পাচ্ছেন ঠিকই। গা করছেন না। বড়ো মেয়ে হিরণ্ময়ী বলেছে, নিয়ে যাবে শীগগিরই। হিরণ্ময়ীর অবস্থা ভালো, দুবেলা মাছ হয়, মাঝে মাঝেই পোলোয়া। কতকাল পোলোয়া খান না শচীলাল!

লীলাময়ী টের পান, সুভদ্রা দরজা খুলল। প্যাসেজ দিয়ে নাতিটার পায়ের আওয়াজ ধেয়ে আসছে। কচিগলার ডাক এল--ঠানু। ও ঠানু আমরা যাচ্ছি।

সুভদ্রা গর্জায়--এই! খবরদার যাবি না। গলা টিপে মেরে ফেলব তাহলে।

ছেলেটা ফিরে যায়। একটু কাঁদে কি? লীলাময়ী উঁকি মেরে দেখেন, প্যাসেজ দিয়ে বাথরুমের দিকে গেল সুভদ্রা। ছেলের নড়া শক্ত হাতে ধরা। সাজগোজ সব হয়ে গেছে। যাওয়ার জায়গা বলতে বাপের বাড়ি। তা যাক। বাড়িটা জুড়োবে।

লীলা দিবি? শচীলাল ডাকেন।

এবার রাগেন লীলাময়ী। চাপা গর্জনে বলে--বড়দিরও আক্কেল দেখছি! কবে থেকে বাবাকে নিয়ে যাওয়ার কথা। সব যে যার স্বার্থ দেখছে। এই বুড়োর হ্যাপা যত আমাকেই সামলাতে হবে বরাবার? শরীর আমার বারো মাস খারাপ থাকে। স্বার্থপর, সব স্বার্থপর!

দ্রুত পায়ে বারান্দায় গিয়ে তিনি শচীলালের সামনে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে বলেন, কেন তোমার গুণধর ছেলে বাবাকে নিয়ে কদিন রাখতে পারে না? নাকি তাতে বউয়ের মাথা ধরার ব্যামো বাড়বে?

১০

উঠোনে কোমর পর্যন্ত গর্ত খুঁড়ে ফেলেছে মাগন। ঘামে জবজব করছে। পায়ে কাচের টুকরো ফুটেছে একটা। সেটা নখে টেনে তুলে ফেলল। কাটা জায়গাটা হাত দিয়ে ঘষে রক্ত লেপটে দিল।

কী রে দিন কাবার করবি নাকি?

হচ্ছে বাবা, হচ্ছে। মাগন গর্ত থেকে উঠে এসে এক নম্বর ট্যাংকিতে বালতি নামিয়ে বলে আভি দেখে লিন, সব সাফা।

রসিকবাবুর স্ত্রী ওপর থেকে এবং দত্তবাবু নিচ থেকে একসঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠেন--অনেক ময়লা রয়েছে এখনো!

মাগন হাসে। বলে--ময়লা তো আছে মালিক, কিন্তু উ তো সব শুখা মাল আছে। মালটা শক্তো হয়ে গেছে বড়োবাবু, উঠবে নাহি।

নাম ব্যাটা ট্যাংকে, নেমে কোদাল মেরে চেঁছে তোল। টাকা কি গাছে ফলে?

হাঁ হাঁ বাত তো ঠিক আছে বড়োবাবু। লেকিন পাঁচ রুপেয়া বকশিশ দিয়ে দিবেন। চালিশ টাকার তো পসীনা চলিয়ে যাচ্ছে। ভিটামিন দিবে কৌন?

মাগন ট্যাংকে নামে। গার্দা সব পাথরের মতো বসে গেছে। থকথক করছে পোকা, জল। বহোত গান্ধা।

কোদালে ময়লা চাঁচতে চাঁচতে মাগন আপনমনে বলে--কাম পুরা করে পয়সা লিব মালিক। বহোত গার্দা বাবা, বহোত গান্ধা। সব গার্দা সাফ থোড়াই হোবে বাবা। গার্দা কুছ জরুর থেকে যাবে মালিক। সব গার্দা কখনো সাফা হয় না।

নীলুর দুঃখ

সক্কালবেলাতেই নীলুর বিশ চাক্কি ঝাঁক হয়ে গেল। মাসের একুশ তারিখ। ধারে কাছে কোনো পেমেন্ট নেই। বাবা তিনদিনের জন্য মেয়ের বাড়িতে গেছে বারুইপুর--মহা টিকরমবাজ লোক--সাউথ শিয়ালদায় গাড়িতে তুলে দিয়ে নীলু যখন প্রণাম করল তখন হাসি-হাসি মুখে বুড়ো নতুন সিগারেটের প্যাকেটের সিলোফেন ছিঁড়ছে। তিনদিন মায়ের আওতার বাইরে থাকবে বলে বুঝি ওই প্রসন্নতা--ভেবেছিল নীলু। গাড়ি ছাড়বার পর হঠাৎ খেয়াল হল, তিনদিনের বাজার খরচ রেখে গেছে তো! সেই সন্দেহ কাল সারা বিকেল খচখচ করেছে। আজ সকালেই মশারির মধ্যে আধখানা ঢুকে তাকে ঠেলে তুলল মা--বাজার যাবি না, ও নীলু?

তখনই বোঝা গেল বুড়ো চাক্কি রেখে যায়নি। কাল নাকি টাকা তুলতে রনোকে পাঠিয়েছিল, কিন্তু দস্তখত মেলেনি বলে উইথড্রয়াল ফর্ম ফেরত দিয়েছে পোস্টাপিস। কিন্তু নীলু জানে পুরোটা টিকরমবাজী। বুড়ো আগে ছিল রেলের গার্ড, রিটায়ার করার পর একটা মুদির দোকান দিয়েছিল--অনভিজ্ঞ লোক, তার ওপর দোকান ভেঙে খেতো--ফলে দোকান গেল উঠে। এখন তিন রোজগেরে ছেলের টাকা নিয়ে পোস্ট-অফিসে রাখে আর প্রতি সপ্তাহে খরচ তোলে। প্রতিদিন বাজারের থলি দশমেসে পেটের মতো ফুলে না থাকলে বুড়োর মন ভজে না। মাসের শেষ দিকে টাকা ফুরোলেই টিকরমবাজী শুরু হয়। প্রতি সপ্তাহে যে লোক টাকা তুলছে তার নাকি দস্তখত মেলে না!

নীলু হাসে। সে কখনো বুড়োর ওপর রাগ করে না। বাবা তার দিকে আড়ে আড়ে চায় মাসের শেষ দিকটায়। ঝাঁক দেওয়ার নানা চেষ্টা করে। নীলুর সঙ্গে বাবার একটা লুকোচুরির খেলা চলতে থাকে।

বাঙালের খাওয়া। তার ওপর পুঁটিয়ারির নাড়ুমামা, মামি, ছেলে, ছেলে বৌ--চারটে বাইরের লোক নিমন্ত্রিত, ঘরের লোক বারোজন নীলু নিজে, মা, ছটা ভাই, দুটো ধুমসী বোন, বিধবা মাখনী পিসি, বাবার জ্যাঠাতো ভাই, আইবুড়ো নিবারণ কাকা--বিশ চাক্কির নীচে বাজার নামে?

রবিবার। বাজার নামিয়ে রেখে নীলু একটু পাড়ায় বেরোয়। কদিন ধরেই পোগো ঘুরছে পিছন পিছন। তার কোমরে নানা আকৃতির সাতটা ছুরি! ছুরিগুলো তার মায়ের পুরোনো শাড়ির পাড় ছিঁড়ে তাই দিয়ে জড়িয়ে সযত্নে শার্টের তলায় গুঁজে রাখে পোগো। পাড়ার লোক বলে, পোগো দিনে সাতটা মার্ডার করে। নিতান্ত এলেবেলে লোকও পোগোকে যেতে দেখলে হেঁকে ডাক পাড়ে--কী পোগোবাবু, আজ কটা মার্ডার হল? পোগো হুস হাস করে চলে যায়।

পরশুদিন পোগোর মেজোবৌদি জানালা দিয়ে নীলুকে ডেকে বলেছিল--পোগো যে তোমাকে মার্ডার করতে চায়, নীলু, খবর রাখো?

তাই বটে। নীলুর মনে পড়ল, কয়েকদিন যাবৎ সে অফিসে যাওয়ার সময়ে লক্ষ করেছে পোগো নিঃশব্দে আসছে পিছন পিছন। বাস-স্টপ পর্যন্ত আসে। নীলু কখনো ফিরে তাকালে পোগো ঊর্ধ্বমুখে আকাশ দেখে আর বিড়বিড় করে গাল দেয়।

আজ বিশ চাক্কি ঝাঁক হয়ে যাওয়ায় নীলুর মেজাজ ভাল ছিল না! নবীনের মিষ্টির দোকানের সিঁড়িতে বসে সিগারেট ফুঁকছিল পোগো। নীলুকে দেখেই আকাশে তাকাল। না-দেখার ভান করে কিছুদূর গিয়েই নীলু টের পেল পোগো পিছু নিয়েছে।

নীলু ঘুরে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে পোগো উলটাবাগে ঘুরে হাঁটতে লাগল। এগিয়ে গিয়ে তার পাছায় ডান পায়ের একটা লাথি কষাল নীলু--শালা, বদের হাঁড়ি।

কাঁই শব্দ করে ঘুরে দাঁড়ায় পোগো। জিভ আর প্যালেটের কোনো দোষ আছে পোগোর, এখনো জিভের আড় ভাঙেনি। ছত্রিশ বছরের শরীরে তিন বছর বয়সী মগজ নিয়ে সে ঘুরে বেড়ায়। গরম খেয়ে বলল--খুব ঠাবহান, নীলু, বলে ডিট্টি খুব ঠাবহান!

ফের! কষাবো আর একটা?

পোগো থতিয়ে যায়। শার্টের ভিতরে লুকানো হাতছুরি বের করবার প্রাক্কালের ভঙ্গিতে রেখে বলে--একডিন ফটে ডাবি ঠালা।

নীলু আর একবার ডান পা তুলতেই পোগো পিছিয়ে যায়। বিড়বিড় করতে করতে কারখানার পাশের গলিতে ঢুকে পড়ে।

সেই কবে থেকে মার্ডারের স্বপ্ন দেখে পোগো। সাত-আটখানা ছুরি বিছানায় নিয়ে ঘুমোতে যায়। পাছে নিজের ছুরি ফুটে ও নিজে মরে--সেই ভয়ে ও ঘুমোলে ওর মা এসে হাতড়ে হাতড়ে ছুরিগুলো সরিয়ে নেয়। মার্ডারের বড়ো শখ পোগোর। সারাদিন সে লোককে কত মার্ডারের গল্প করে। কলকাতায় হাঙ্গামা লাগলে ছাদে উঠে দুহাত তুলে লাফায়। মার্ডারের গল্প যখন শোনে তখন নিথর হয়ে যায়।

নীলু গতবার গ্রীষ্মে দার্জিলিং বেড়াতে গিয়ে একটা ভোজালি কিনেছিল। তার সেই শখের ভোজালিটা দিনসাতেক আগে একদিনের জন্য ধার নিয়েছিল পোগো। ফেরত দেওয়ার সময়ে চাপা গলায় বলেছিল--ভয় নেই, ভালো করে ঢুয়ে ডিয়েছি।

কী ধুয়েছিস? জিজ্ঞেস করেছিল নীলু।

অর্থপূর্ণ হেসেছিল পোগো, উত্তর দেয়নি। তোমরা বুঝে নাও কী ধুয়েছি। সেদিনও একটা লাথি কষিয়েছিল নীলু--শালার শয়তানী বুদ্ধি দেখ। ধুয়ে দিয়েছি--কী ধুয়েছিস আবের পোগোর বাচ্চা?

সেই থেকেই বোধহয় নীলুকে মার্ডার করার জন্য ঘুরছে পোগো। তার লিস্টে নীলু ছাড়া আরো অনেকের নাম আছে যাদের সে মার্ডার করতে চায়।

আজ সকালে বৃটিশকে খুঁজছে নীলু। কাল বৃটিশ জিতেছে। দুশো সত্তর কি আশি টাকা। সেই নিয়ে খিচাং হয়ে গেল কাল।

গলির মুখ আটকে খুদে প্যান্ডেল বেঁধে বাচ্চাদের ক্লাবের রজত-জয়ন্তী হচ্ছিল কাল সন্ধেবেলায়। পাড়ার মেয়ে-বৌ, বাচ্চারা ভিড় করেছিল খুব। সেই ফাংশন যখন জমজমাট, তখন বড়ো রাস্তায় ট্যাক্সি থামিয়ে বৃটিশ নামল। টলতে টলতে ঢুকল গলিতে, দু বগলে বাংলার বোতল। সঙ্গে ছটকু। পাড়ায় পা দিয়ে ফাংশনের ভিড় দেখে নিজেকে জাহির করার

জন্য দুহাত ওপরে তুলে হাঁকাড় ছেড়েছিল বৃটিশ--ঈ-ঈ-ঈ-দ কা চাঁ-আ-আ-দ! বগল থেকে দুটো বোতল পড়ে গিয়ে ফট-ফটাস করে ভাঙল। হুড়দৌড় লেগে গিয়েছিল বাচ্চাদের ফাংশনে। পাঁচ বছরের টুমিরানী তখন ডায়াসে দাঁড়িয়ে 'কাঠবেড়ালী, কাঠবেড়ালী, পেয়ারা তুমি খাও...' বলে দুলতে দুলতে থেমে ভ্যাঁ করার জন্য হাঁ করেছিল মাত্র। সেই সময়ে নীলু, জগু, জাপান এসে দুটোকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল হরতুনের চায়ের দোকানে। নীলু বৃটিশের মাথায় জল ঢালে আর জাপান পিছন থেকে হাঁটুর গুঁতো দিয়ে জিজ্ঞেস করে--কত জিতেছিস? প্রথমে বৃটিশ চেঁচিয়ে বলেছিল--আবেব, পঞ্চা-আ-শ হা-জা-আ-র। জাপান আরো দুবার হাঁটু চালাতেই সেটা নেমে দাঁড়াল দু হাজারে। সেটাও বিশ্বাস হল না কারো। পাড়ার বুকি বিশুর কাছ থেকে সবাই জেনেছ, ঈদ কা চাঁদ হট ফেবারিট ছিল। আরো কয়েকবার ঝাঁকাড় খেয়ে সত্যি কথা বলল বৃটিশ--তিনশো মাইরি বলছি--বিশ্বাস কর। পকেট সার্চ করে শ' দুইয়ের মতো পাওয়া গিয়েছিল।

আজ সকালে তাই বৃটিশকে খুঁজছে নীলু। মাসের একুশ তারিখ। বৃটিশের কাছে ত্রিশ টাকা পাওনা। গত শীতে দর্জির দোকান থেকে বৃটিশের টেরিকটনের প্যান্টটা ছাড়িয়ে নিয়েছিল নীলু। এতদিন চায়নি। গতকাল নিয়ে যেতে পারত, কিন্তু মাতালের কাছ থেকে নেওয়া উচিত নয় বলে নেয়নি। আজ দেখা হলে চেয়ে নেবে।

চায়ের দোকানে বৃটিশকে পাওয়া গেল না। ভি. আই. পি. রোডের মাঝখানে যে সবুজ ঘাসের চত্বরে বসে তারা আড্ডা মারে, সেখানেও না। ফুলবাগানের মোড় পর্যন্ত এগিয়ে দেখল নীলু। কোথাও নেই। কাল রাতে নীলু বেশিক্ষণ ছিল না হরতুনের দোকানে। জাপান, জগু ওরা বৃটিশকে ঘিরে বসেছিল। বহুকাল তারা এমন মানুষ দেখেনি যার পকেটে ফালতু দুশো টাকা। জাপান মুখ চোখাচ্ছিল। কে জানে রাতে আবার ওরা ট্যাক্সি ধরে ধর্মতলার দিকে গিয়েছিল কি না! গিয়ে থাকলে ওরা এখনো বিছানা নিয়ে আছে। দুপুর গড়িয়ে উঠবে। বৃটিশের বাড়িতে আজকাল আর খায় না নীলু। বৃটিশের মা আর দাদার সন্দেহ ওকে নষ্ট করেছে নীলুই। নইলে নীলু গিয়ে বৃটিশকে টেনে তুলত বিছানা থেকে, বলত,--না, হকের পয়সা পেয়েছিস, হিস্যা চাই না, আমার হক্কেরটা দিয়ে দে।

নাঃ। আবার ভেবে দেখল নীলু। দুশো টাকা--মাত্র দুশো টাকার আয়ু এ বাজারে কতক্ষণ? কাল যদি ওরা সেকেণ্ড টাইম গিয়ে থাকে ধর্মতলায় তবে বৃটিশের পকেটে এখন হপ্তার খরচও নেই।

মোড়ে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরায় নীলু। ভাবে, বিশ চাক্কি যদি ঝাঁক হয়েই গেল তবে কীভাবে বাড়ির লোকজনের ওপর একটা মৃদু প্রতিশোধ নেওয়া যায়!

অমনি শোভন আর তার বউ বল্লরীর কথা মনে পড়ে গেল তার। শোভন কাজ করে কাস্টমসে। তিনবারে তিনটে বিলিতি টেরিলিনের শার্ট তাকে দিয়েছে শোভন, আর দিয়েছে সস্তায় একটা গ্রুয়েন ঘড়ি। তার ভদ্রলোক বন্ধুদের মধ্যে শোভন একজন--যাকে বাড়িতে ডাকা যায়। কতবার ভেবেছে নীলু শোভন, বল্লরী আর ওদের দুটো কচি মেয়েকে এক দুপুরের জন্য বাড়িতে নিয়ে আসবে, খাইয়ে দেবে ভালো করে। খেয়ালই থাকে না এসব কথা।

মাত্র তিন স্টপ দূরে থাকে শোভন। মাত্র সকাল ন'টা বাজে। আজ ছুটির দিন, বল্লরী নিশ্চয়ই রান্না চাপিয়ে ফেলেনি! উনুনে আঁচ দিয়ে চা-ফা, লুচি-ফুচি হচ্ছে এখনো। দুপুরে খাওয়ার কথা বলার পক্ষে খুব বেশি দেরি বোধহয় হয়নি এখনো।

ছত্রিশ নম্বর বাসটা থামতেই উঠে পড়ল নীলু।

উঠেই বুঝতে পারে। বাসটা দখল করে আছে দশ বারো জন ছেলেছোকরা। পরনে শার্ট পায়জামা, কিংবা সরু প্যান্ট। বয়স ষোলোর এদিক ওদিক। তাদের হাসির শব্দ থুথু ফেলার আগের গলাখাঁকারিির--খ্যা-অ্যা-অ্যা-র মতো শোনাচ্ছিল। লেডিজ সিটে দু-তিনজন মেয়েছেলে বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে। দু-চারজন ভদ্রলোক ঘাড় সটান করে পাথরের মতো সামনের শূন্যতার দিকে চেয়ে আছে। ছোকরারা নিজেদের মধ্যেই চেঁচিয়ে কথা বলছে। উলটাপালটা কথা, গানের কলি। কন্ডাক্টর দুজন দু দরজায় সিঁটিয়ে দাঁড়িয়ে। ভাড়া চাইবার সাহস নেই!

তবু ছোকরাদের একজন দলের পরমেশ নামে আর একজনকে ডেকে বলছে--পরমেশ, আমাদের ভাড়াটা দিলি না?

কত করে?

আমাদের হাফ--টিকিট। পাঁচ পয়সা করে দিয়ে দে।

এই যে কন্ডাক্টরদাদা, পাঁচ পয়সার টিকিট আছে তো! বারোখানা দিন।

পিছনের কন্ডাক্টর রোগা, লম্বা, ফর্সা। না-কামানো কয়েক দিনের দাড়ি থুতনিতে জমে আছে। এবড়োখেবড়ো গজিয়েছে গোঁফ। তাতে তাকে বিষণ্ন দেখায়। সে তবু একটু হাসল ছোকরাদের কথায়। অসহায় হাসিটি।

নীলু বসার জায়গা পায়নি। কন্ডাক্টরের পাশে দাঁড়িয়ে সে বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে ছিল।

বাইরে কোথাও পরিবার পরিকল্পনার হোর্ডিং দেখে জানালার পাশে বসা একটা ছেলে চেঁচিয়ে বলল--লাল ত্রিভুজটা কী বল তো মাইরি!

ট্রাফিক সিগন্যাল, বে, লাল দেখলে থেমে যাবি।

আর নিরোধ! নিরোধটা কী যেন!

রাজার টুপি..রাজার টুপি...

খ্যা-অ্যা-অ্যা-খ্যা-অ্যা-অ্যা...

খ্যা...

পরের স্টপে বাস আসতে তারা হেঁকে বলল--বেঁধে...লেডিজ...

নেমে গেল সবাই। বাসটাকে ফাঁকা নিস্তব্ধ মনে হল এবার। সবাই শরীর শ্লথ করে দিল। একজন চশমা-চোখে যুবা কন্ডাক্টরের দিকে চেয়ে বলল--লাথি দিয়ে নামিয়ে নিতে পারেন না এসব এলিমেন্টকে!

কন্ডাক্টর ম্লান মুখে হাসে।

ঝুঁকে নীলু দেখছিল ছেলেগুলো রাস্তা থেকে বাসের উদ্দেশে টিটকিরি ছুঁড়ে দিচ্ছে। কান কেমন গরম হয়ে যায় তার। লাফিয়ে নেমে পড়তে ইচ্ছে করে। লাঠি ছোরা বোমা যা হোক

অস্ত্র নিয়ে কয়েকটাকে খুন করে আসতে ইচ্ছে করে।

হঠাৎ পোগোর মুখখানা মনে পড়ে নীলুর। জামার আড়ালে ছোরা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে পোগো। স্বপ্ন দেখছে মার্ডারের। তারা সবাই পোগোর পিছনে লাগে, মাঝে মধ্যে লাথি কষায়। তবু কেন যে পোগোর মতোই এক তীব্র মার্ডারের ইচ্ছে জেগে ওঠে নীলুর মধ্যেও মাঝে মাঝে। এত তীব্র সেই হচ্ছে যে আবেগ কমে গেলে শরীরে একটা অবসাদ আসে। তেতো হয়ে যায় মন।

শোভন বাথরুমে। বল্লরী এসে দরজা খুলে চোখ কপালে তুলল--ওমা, আপনার কথাই ভাবছিলাম সকালবেলায়। অনেকদিন বাঁচবেন।

শোভনের বৈঠকখানাটি খুব ছিমছাম, সাজানো। বেতের সোফা, কাচের বুককেস, গ্রুন্ডিগের রেডিগ্রোম, কাঠের টবে মানিপ্ল্যান্ট, দেয়ালে বিদেশি ছবিওলা ক্যালেণ্ডার, মেঝেয় কয়েক কর্পেট। মাঝখানে নীচু টেবিলের ওপর মাখনের মতো রঙের ঝকঝকে অ্যাশ-ট্রে-টার সৌন্দর্যও দেখবার মতন। মেঝের ইংরিজি ছড়ায় বই খুলে বসে ছিল শোভনের চার আর তিন বছর বয়সের মেয়ে মিলি আর জুলি। একটু ইংরিজি কায়দায় থাকতেই ভালোবাসে শোভন। মিলিকে কিন্ডারগার্টেনের বাস এসে নিয়ে যায় রোজ। সে ইংরিজি ছড়া মুখস্থ বলে।

নীলুকে দেখেই মিলি জুলি টপাটপ উঠে দৌড়ে এল।

মিলি বলে--তুমি বলেছিলে ভাত খেলে হাত এঁটো হয়। এঁটো কী?

দুজনকে দু কোলে তুলে নিয়ে ভারি একরকমের সুখবোধ করে নীলু। ওদের গায়ে শৈশবের আশ্চর্য সুগন্ধ।

মিলি জুলি তার চুল, জামার কলার লন্ডভন্ড করতে থাকে। তাদের শরীরের ফাঁক দিয়ে মুখ বের করে নীলু বল্লরীকে বলে--তোমার হাঁড়ি চড়ে গেছে নাকি উনুনে!

এইবার চড়বে। বাজার এলো এইমাত্র।

হাঁড়ি ক্যানসেল করো আজ। বাপ গেছে বারুইপুর। সকালেই বিশ চাক্কি ঝাঁক হয়ে গেল। সেটা পুষিয়ে নিতে হবে তো! তোমার এ দুটো পুঁটলি নিয়ে দুপুরের আগেই চলে যেও আমার গাড্ডায়, ঘুমে লিও সবাই।

বল্লরী ঝেঁঝে ওঠে--কী যে সব অসভ্য কথা শিখেছেন বাজে লোকদের কাছ থেকে। নেমন্তন্নের ওই ভাষা।

বাথরুম থেকে শোভন চেঁচিয়ে বলে--চলে যাস না নীলু , কথা আছে।

যেও কিন্তু। নীলু বল্লরীকে বলে--নইলে আমার প্রেস্টিজ থাকবে না।

বাঃ, আমার যে ডালের জল চড়ানো হয়ে গেছে। এত বেলায় কি নেমন্তন্ন করে মানুষ!

নীলু সেসব কথায় কান দেয় না। মিলি জুলির সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে।

শোভন সকালেই দাড়ি কামিয়েছে। নীল গাল। মেদবহুল শরীরে এঁটে বসেছে ফিনফিনে গেঞ্জি, পরনে পাটভাঙা পায়জামা। গত বছর যৌথ পরিবার থেকে আলাদা হয়ে এল শোভন। বাসা খুঁজে দিয়েছিল নীলুই। চারদিনের নোটিশে। এখন সুখে আছে শোভন। যৌথ পরিবারে থাকার সময়ে এত নিশ্চিন্ত আর তৃপ্ত আর সুখী দেখাতো না তাকে।

পাছে হিংসা হয় সেই ভয়ে চোখ সরিয়ে নেয় নীলু।

নেমন্তন্নের ব্যাপার শুনে শোভন হাসে--আমিও যাবো-যাবো করছিলাম তোর কাছে। এর মধ্যেই চলে যেতাম। ভালোই হল।

এক কাপ চা আর প্লেটে বিস্কুট সাজিয়ে ঘরে আসে বল্লরী।

শোভন হতাশ গলায় বলে--বাঃ, মোটে এক কাপ করলে! ছুটির দিনে এ সময়ে আমারো তো এক কাপ পাওনা।

বল্লরী গম্ভীরভাবে বলে--বাথরুমে যাওয়ার আগেই তো এক কাপ খেয়েছো।

মিষ্টি ঝগড়া করে দুজন। মিলি জুলির গায়ের অদ্ভুত সুগন্ধে ডুবে থেকে শোভন আর বল্লরীর আদর-করা গলার স্বর শোনে নীলু। সম্মোহিত হয়ে যেতে থাকে।

তারপরই হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বলে--চলি রে। তোরা ঠিক সময়ে চলে যাস।

শুনুন শুনুন, আপনার সঙ্গে কথা আছে। বল্লরী তাকে থামায়।

কী কথা?

বলছিলুম না আজ সকালেই ভেবেছি আপনার কথা! তার মানে নালিশ আছে একটা। কারা বলুন তো আমার বাড়ির দেয়ালে রাজনীতির কথা লিখে যায়? তারা কারা? আপনাদেরই তো এলাকা এটা, আপনার জানার কথা!

--কী লিখেছে?

--সে অনেক কথা। ঢোকার সময়ে দেখেননি? বর্ষার পরেই নিজেদের খরচে বাইরেটা রং করালুম। দেখুন গিয়ে, কালো রং দিয়ে ছবি এঁকে লিখে কী করে গেছে শ্রী! তা ছাড়া রাতভর লেখে, গোলমালে আমরা কাল রাতে ঘুমোতে পারিনি।

নীলু উদাসভাবে বলে--বারণ করে দিলেই পারো।

কে বারণ করবে? আপনার বন্ধু ঘুমোতে না পেরে উঠে সিগারেট ধরালো আর ইংরিজিতে আপনমনে গালাগাল দিতে লাগল--ভ্যাগাবন্ডস, মিসফিটস, প্যারাসাইটনস... আরো কত কী! সাহস নেই যে উঠে ছেলেগুলোকে ধমকাবে।

তা তুমি ধমকালে না কেন? নীলু বলে উদাসভাবটা বজায় রেখেই।

বল্লরী হাসল উজ্জ্বলভাবে। বলল--ধমকাইনি নাকি! শেষমেশ আমিই তো উঠলাম। জানলা দিয়ে গলা বাড়িয়ে বললাম--ভাই, আমরা কি রাতে একটু ঘুমোবো না? আপনার বন্ধু তো আমার কান্ড দেখে অস্থির। পিছন থেকে আঁচল টেনে ফিসফিস করে বলছে--চলে এসো, ওরা ভীষণ ইতর, যা তা বলে দেবে। কিন্তু ছেলেগুলো খারাপ না। বেশ ভদ্রলোকের মতো চেহারা। ঠোঁটে সিগারেট জ্বলছে, হাতে কিছু চটি চটি বই, প্যামফলেট। আমার দিকে হাতজোড় করে বলল--বৌদি, আমাদেরও তো ঘুম নেই। এখন তো ঘুমের সময় না এদেশে। বললুম, আমার দেয়ালটা অমন নোংরা হয়ে গেল যে! একটা ছেলে বলল, কে বলল নোংরা! বরং আপনার দেয়ালটা অনেক ইম্পর্ট্যান্ট হল আগের চেয়ে। লোকে এখানে দাঁড়াবে, দেখবে, জ্ঞানলাভ করবে। আমি বুঝলুম খামোখা কথা বলে লাভ নেই। জানালা

বন্ধ করতে যাচ্ছি অমনি একটা মিষ্টি চেহারার ছেলে এগিয়ে এসে বলল, বৌদি, আমাদের একটু চা খাওয়াবেন? আমরা ছজন আছি!

নীলু চমকে উঠে বলে খাওয়ালে না কি?

বল্লরী মাথা হেলিয়ে বলল খাওয়াবো না কেন?

সে কী!

শোভন মাথা নেড়ে বলল--আর বলিস না, ভীষণ ডেয়ারিং এই মহিলাটি। একদিন বিপদে পড়বে।

আহা, ভয়ের কী! এইটুকু-টুকু সব ছেলে, আমার ভাই বাবলুর বয়সী। মিষ্টি কথার্বাতা। তাছাড়া এই শরতের হিমে সারা রাত জেগে বাইরে থাকছে--ওদের জন্য না হয় একটু কষ্ট করলাম!

শোভন হাসে, হাত তুলে বল্লরীকে থামিয়ে বলে--তার মানে তুমিও ওদের দলে।

আহা, আমি কী জানি ওরা কোন দলের? আজকাল হাজারো দল দেয়ালে লেখে। আমি কী করে বুঝবো!

তুমি ঠিকই বুঝেছো। তোমার ভাই বাবলু কোন দলে তা কি আমি জানি না! সেদিন খবরের কাগজে বাবলুর কলেজের ইলেকশনের রেজাল্ট তোমাকে দেখালুম না? তুমি ভাইয়ের দলের সিমপ্যাথাইজার।

অসহায়ভাবে বল্লরী নীলুর দিকে তাকায়, কাঁদো কাঁদো মুখ করে বলে--না, বিশ্বাস করুন। আমি দেখিওনি ওরা কী লিখেছে।

নীলু হাসে--কিন্তু চা তো খাইয়েছো!

হ্যাঁ। সে তো পাঁচ মিনিটের ব্যাপার। গ্যাস জ্বেলে ছ' পেয়ালা চা করতে কতক্ষণ লাগে! ওরা কী খুশি হল! বলল--বৌদি, দরকার পড়লে আমাদের ডাকবেন। যাওয়ার সময়ে পেয়ালাগুলো জল দিয়ে ধুয়ে দিয়ে গেল। ওরা ভালো না?

নীলু শান্তভাবে একটু মুচকি হাসে--কিন্তু তোমার নালিশ ছিল বলছিলে যে! এ তো নালিশ নয়। প্রশংসা।

না, নালিশই। কারণ, আজ সকালে হঠাৎ গোটা দুই বড়ো বড়ো ছেলে এসে হাজির। বলল, আপনাদের দেয়ালে ওসব লেখা কেন? আপনারা কেন এসব অ্যালাউ করেন? আপনার বন্ধু ঘটনাটা বুঝিয়ে বলতে ওরা থমথমে মুখ করে চলে গেল। আপনি ওই ছজনকে যদি চিনতে পারেন তবে বলবেন--ওরা যেন আর আমাদের দেয়ালে না লেখে। লিখলে আমরা বড়ো বিপদে পড়ে যাই। দু দলের মাঝখানে থাকতে ভয় করে আমাদের। বলবেন যদি চিনতে পারেন।

শোভন মাথা নেড়ে বলে--তার চেয়ে নীলু, তুই আমার জন্য আর একটা বাসা দেখ। এই দেয়ালের লেখা নিয়ে ব্যাপার কদ্দুর গড়ায় কে জানে। এর পর বোমা কিংবা পেটো ছুঁড়ে দিয়ে যাবে জানালা দিয়ে, রাস্তায় পেলে আলু টপকাবে। তার ওপর বল্লরী ওদের চা খাইয়েছে--যদি সে ঘটনার সাক্ষীসাবুদ কেউ থেকে থাকে তবে এখানে থাকাটা বেশ রিস্কি এখন।

বল্লরী নীলুর দিকে চেয়ে বলল--বুঝলেন তো! আমাদের কোনো দলের ওপর রাগ নেই। রাতজাগা ছটা ছেলেকে চা খাইয়েছি--সে তো আর দল বুঝে নয়! অন্য দলের হলেও খাওয়াতুম।

বেরিয়ে আসার সময়ে দেয়ালের লেখাটা নীলু একপলক দেখল। তেমন কিছু দেখার নেই। সারা কলকাতায় দেয়াল জুড়ে ছড়িয়ে আছে বিপ্লবের ডাক। নিঃশব্দে।

কয়েকদিন আগে এক সকালবেলায় হরলালের জ্যাঠামশাইকে নীলু দেখেছিল প্রাতঃভ্রমণ সেরে ফেরার পথে লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে আছেন দেওয়ালের সামনে। পড়ছেন লেখা। নীলুকে দেখে ডাক দিলেন তিনি। বললেন--এইসব লেখা দেখছো নীলু? কীরকম স্বার্থপরতার কথা। আমাদের ছেলেবেলায় মানুষকে স্বার্থত্যাগের কথাই শেখানো হত। এখন এরা শেখাচ্ছে স্বার্থসচেতন হতে, হিংস্র হতে--দেখেছো কীরকম উলটো শিক্ষা!

নীলু শুনে হেসেছিল।

উনি গম্ভীর হয়ে বললেন--হেসো না। রামকৃষ্ণদেব যে কামিনীকাঞ্চন সম্বন্ধে সাবধান হতে বলেছিলেন তার মানে বোঝো?

নীলু মাথা নেড়েছিল। না।

উনি বললেন--আমি এতদিনে সেটা বুঝেছি। রামকৃষ্ণদেব আমাদের দুটো অশুভ শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হতে বলেছিলেন। একটা হচ্ছে ফ্রয়েডের প্রতীক কামিনী, মার্ক্সের কাঞ্চন। ও দুই তত্ত্ব পৃথিবীকে ব্যভিচার আর স্বার্থপরতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তোমার কী মনে হয়?

নীলু ভীষণ হেসে ফেলেছিল।

হরলালের জ্যাঠামশাই রেগে গিয়ে দেয়ালে লাঠি ঠুকে বললেন, তবে এর মানে কী? অ্যাঁ! পড়ে দেখ, এ সব ভীষণ স্বার্থপরতার কথা কি না।

তারপর থেকে যতবার সেই কথা মনে পড়েছে ততবার হেসেছে নীলু। একা একা।

বেলা বেড়ে গেছে। বাসায় খবর দেওয়া নেই যে শোভনরা খাবে। খবরটা দেওয়া দরকার। ফুলবাগানের মোড় থেকে নীলু একটা শর্টকাট ধরল। বড়ো রাস্তায় যেখানে গলির মুখ এসে মিশেছে সেখানেই দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সাধন--নীলুর চতুর্থ ভাই। কলেজের শেষ ইয়ারে পড়ে। নীলুকে দেখে সিগারেট লুকোলো। পথ-চলতি অচেনা মানুষের মতো দুজনে দুজনকে চেয়ে দেখল একটু। চোখ সরিয়ে নিল। তাদের দেখে কেউ বুঝবে না যে তারা এক মায়ের পেটে জন্মেছে, একই ছাদের নীচে একই বিছানায় শোয়। নীলু শুধু জানে সাধন তার ভাই। সাধনের আর কিছুই জানে না সে। কোন দল করছে সাধন, কোন পথে যাচ্ছে, কেমন তার চরিত্র--কিছুই জানা নেই নীলুর। কেবল মাঝে মাঝে ভোরবেলা উঠে সে দেখে সাধনের আঙুলে হাতে কিংবা জামায় আলকাতরার দাগ। তখন মনে পড়ে, গভীর রাতে ঘুমোতে এসেছিল সাধন।

এখন কেন জানে না, সাধনের সঙ্গে একটু কথা বলতে ইচ্ছে করছিল নীলুর। সাধন, তুই কেমন আছিস? তোর জামাপ্যান্ট নিয়েছিস তো তুই? অনার্স ছাড়িস নি তো! এরকম কত জিজ্ঞাসা করার আছে।

একটু এগিয়ে গিয়েছিল নীলু। ফিরে আসবে ভেবে ইতস্তত করছিল। মুখ ফিরিয়ে দেখল সাধন তার দিকেই চেয়ে আছে। একদৃষ্টে। হয়তো জিজ্ঞেস করতে চায়--দাদা, ভাল আছিস তো? বড্ড রোগা হয়ে গেছিস, তোর ঘাড়ের নলি দেখা যাচ্ছে রে! কুসুমদির সঙ্গে তোর বিয়ে হল না শেষ পর্যন্ত, না? ওরা বড়লোক, তাই? তুই আলাদা বাসা করতে রাজি হলি না, তাই? না হোক কুসুমদির সঙ্গে তোর বিয়ে--কিন্তু আমরা--ভাইয়েরা তো জানি তোর মন কত বড়ো, বাবার পর তুই কেমন আগলে আছিস আমাদের! আহারে দাদা, রোদে ঘুরিস না, বাড়ি যা। আমার জন্য ভাবিস না--আমি রাতচরা--কিন্তু নষ্ট হচ্ছি না রে, ভয় নেই!

কয়েক পলক নির্জন গলিপথে তারা দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে এরকম নিঃশব্দ কথা বলল। তারপর সামান্য লজ্জা পেয়ে নীলু বাড়ির দিকে হেঁটে যেতে লাগল।

দুপুরে বাড়িতে কাণ্ড হয়ে গেল খুব। নাড়ুমামি কলকল করে কথা বলে, সেই সঙ্গে মা আর ছোট বোনটা। শোভনের দুই মেয়ে কাণ্ড করল আরো বেশি। বাইরের ঘরে শোভন আর নীলু শুয়েছিল--ঘুমোতে পারল না। সাধন ছাড়া অন্য ভাইয়েরা যে যার আগে খেয়ে বন্ধুবান্ধবদের বাড়িতে কি আস্তানায় কেটে পড়েছিল, তবু যজ্ঞিবাড়ির ভিড়ের মতো হয়ে রইল রবিবারের দুপুর।

সবার শেষে খেতে এল সাধন। মিষ্টি মুখের ডৌলটুকু আর গায়ের ফর্সা রং রোদে পুড়ে তেতে কেমন টেনে গেছে। মেঝেতে ছক পেতে বাইরের ঘরেই লুডো খেলছিল বল্লরী, মামি, আর নীলুর দুই বোন। সাধন ঘরে ঢুকতেই নীলু বল্লরীর মুখখানা লক্ষ করল।

যা ভেবেছিল তা হল না। বল্লরী চিনতেও পারল না সাধনকে। মুখ তুলে দেখল একটু, তারপর চালুনির ভিতর ছক্কাটাকে খটাখট পেড়ে দান ফেলল। সাধনও চিনল না।

একটু হতাশ হল নীলু। হয়তো রাতের সেই ছেলেটা সত্যিই সাধন ছিল না, নয়তো এখনকার মানুষ পরস্পরের মুখ বড়ো তাড়াতাড়ি ভুলে যায়।

নীলু গলা উঁচু করে বলল--তোমার মেয়ে দুটো বড়ো কাণ্ড করছে বল্লরী, ওদের নিয়ে যাও।

আঃ, একটু রাখুন না বাবা, আমি প্রায় পৌঁছে গেছি।

রাত্রির শোতে শোভন আর বল্লরী জোর করে টেনে নিয়ে গেল নীলুকে। অনেক দামি টিকিটে বাজে একটা বাংলা ছবি দেখল তারা। তারপর ট্যাক্সিতে ফিরল।

জ্যোৎস্না ফুটেছে খুব। ফুলবাগানের মোড়ে ট্যাক্সি ছেড়ে জ্যোৎস্নায় ধীরে ধীরে হেঁটে বাড়ি ফিরছিল নীলু। রাস্তা ফাঁকা। দুধের মতো জ্যোৎস্নায় ধুয়ে যাচ্ছে চরাচর। দেয়ালে দেয়ালে বিপ্লবের ডাক। নিরপেক্ষ মানুষেরা তারই আড়ালে শুয়ে আছে। দূরে দূরে কোথাও পেটো ফাটবার আওয়াজ ওঠে। মাঝে মধ্যে গলির মুখে মুখে যুদ্ধের ব্যূহ তৈরি করে লড়াই শুরু হয়। সাধন আছে ওই দলে। কে জানে একদিন হয়তো তার নামে একটা শহিদ স্তম্ভ উইঢিবির মতো গজিয়ে উঠবে গলির মুখে।

পাড়া আজ নিস্তব্ধ। তার মানে নীলুর ছোটোলোক বন্ধুরা কেউ আজ মেজাজে নেই। হয়তো বৃটিশ আজ মাল খায়নি, জগু আর জাপান গেছে ঘুমোতে। ভাবতে ভালোই লাগে।

শোভন আর বল্লরীর ভালোবাসার বিয়ে। বড়ো সংসার ছেড়ে এসে সুখে আছে ওরা। কুসুমের বাবা শেষ পর্যন্ত মত করলেন না। এই বিশাল পরিবারে তাঁর আদরের মেয়ে এসে অথই জলে পড়বে। বাসা ছেড়ে যেতে পারল না নীলু। যেতে কষ্ট হয়েছিল। কষ্ট হয়েছিল কুসুমের জন্যও। কোনটা ভালো হত তা সে বুঝলই না। একা হলে ঘুরেফিরে কুসুমের কথা বড়ো মনে পড়ে।

বাবা ফিরবে পরশু। আরো দুদিন তার কিছু চাক্কি ঝাঁক যাবে। হাসি মুখেই মেনে নেবে নীলু। নয়তো রাগই করবে। কিন্তু ঝাঁক হবেই। বাবা ফিরে নীলুর দিকে আড়ে আড়ে অপরাধীর মতো তাকাবে, হাসবে মিটিমিটি। খেলটুকু ভালোই লাগবে নীলুর। সে এই সংসারের জন্য প্রেমিকাকে ত্যাগ করেছে--কুসুমকে--এই চিন্তায় সে কি মাঝে মাঝে নিজেকে মহৎ ভাববে?

একা থাকলে অনেক চিন্তায় টুকরো ঝড়ে-ওড়া কুটোকাটার মতো মাথার ভিতরে চক্কর খায়।

বাড়ির ছায়া থেকে পোগো হঠাৎ নিঃশব্দে পিছু নেয়। মনে মনে হাসে নীলু। তারপর ফিরে বলে--পোগো, কী চাস?

পোগো দূর থেকে বলে--ঠালা, টোকে মার্ডার করব।

ক্লান্ত গলায় নীলু বলে--আয়, করে যা মার্ডার।

পোগো চুপ থাকে একটু, সতর্ক গলায় বলে--মারবি না বল!

বড়ো কষ্ট হয় নীলুর। ধীরে ধীরে পোগোর দিকে এগিয়ে গিয়ে বলে--মারব, না। আয়, একটা সিগারেট খা।

পোগো খুশি হয়ে এগিয়ে আসে।

নিশুত রাতে এক ঘুমন্ত বাড়ির সিঁড়িতে বসে নীলু, পাশে পাগলা পোগো। সিগারেট ধরিয়ে নেয় দুজনে। তারপর--যা নীলু কখনো কাউকে বলতে পারে না--সেই হৃদয়ের দুঃখের গল্প--কুসুমের গল্প--অনর্গল বলে যায় পোগোর কাছে।

পোগো নিবিষ্ট মনে বুঝবার চেষ্টা করে।

পরপুরুষ

করালী গোরু খুঁজতে বেরিয়েছিল। আর তারক বেরিয়েছিল বউ খুঁজতে। কালীপুরের হাটে সাঁঝের বেলায় দুজনে দেখা।

বাঁ চোখে ছানি এসেছে, ভালো ঠাহর হয় না। তবু তারককে চিনতে পেরে করালী বলল, তারক নাকি?

আর বল কেন দাদা। মাগি সকাল থেকে হাওয়া।

ঝগড়া করেছিস?

সে আর কোন দিন না হচ্ছে। আজ আবার বাগান থেকে মস্ত মানকচুটা তুলে নিয়ে বেরিয়েছে। তাই ভাবলুম কচু বেচতে যদি হাটে এসে থাকে।

বাঁধা বউ, ঠিক ফিরে যাবে। আমার তো তা নয়। গোরু বলে কথা, অবোলা জীব। হাটে যদি হাতবদল হয় তো মস্ত লোকসান।

গো-হাটা ঘুরে দেখেছ?

তা আর দেখিনি! পেলুম না।

ভেব না। গোরুও ফিরবে। চলো, পরানের দোকানে বসি।

পরান তাড়ির কলসি সাজিয়ে বসে, একখানা বারকোশে ভাঁড় আর কাচের গেলাস সাজানো। আশেপাশে খদ্দেররা সব উবু হয়ে বসে ঢকাঢক গিলছে। দুজনে সেখানে সেঁটে গেল।

কালীপুরের হাট একখানা হাটের মতো হাটই বটে। দশটা গাঁ যেন ভেঙে পড়ে। জিনিস যেমন সরেস দামও মোলায়েম। এই সন্ধের পরে হ্যাজাক, কারবাইড, টেমি জ্বেলে

বিকিকিনি চলছে রমরম করে। হাটেবাজারে এলে মন ভালো থাকে তারকের। পেটে তাড়ি-টাড়ি গেলে তো আরও তর হয়ে যায়। তবে কিনা বউটা সকালবেলায় পালিয়ে যাওয়ায় আজ সারা দিন হরিমটর গেছে। রান্নাটা আসে না তারকের। ছেলেবেলায় এই কালীপুরের হাটেই এক জ্যোতিষী তার মাকে বলেছিল, বাপু, তোমার ছেলের কিন্তু অগ্নিভয় আছে। আগুন থেকে সাবধানে রেখ। তাই মা তাকে গা ছুঁইয়ে বাক্যি নিয়েছিল, আগুনের কাছে যাবে না। মায়ের কথা ভাবতেই চোখটা জ্বালা করল। মা মরে গিয়ে ইস্তক কিছু ফাঁকা হয়ে গেছে যেন। দুপুরে গড়ানো বেলায় মুকুন্দর দোকানে চারটি মুড়ি-বাতাসা চিবিয়েছিল। এখন খিদেটা চাগাড় মারছে। করালী যেন মনের কথা টের পেয়েই বলল, নন্দকিশোরের মোচার চপ খাবি?

খুব খাব।

পয়সা দিচ্ছি যা নিয়ে আয়।

নন্দকিশোরের মোচার চপের খুব নামডাক। সারা দিনে দোকানে যেন পাকা কাঁঠালে মাছির মতো ভিড়। এখন সন্ধেবেলায় ভিড় একটু পাতলা হয়েছে। সারা দিনে না হোক কয়েক হাজার টাকার মাল বিক্রি করে নন্দকিশোরের হ্যাদানো চেহারা। চারটে কর্মচারীও নেতিয়ে পড়েছে যেন।

নন্দকিশোর মাথা নেড়ে বলল, মোচা কখন ফুরিয়ে গেছে। ফুলুরি হবে। তবে গরম নয়।

আহা একটু গরম করে দিলেই তো হয়।

উনুন ঝিমিয়ে পড়েছে বাপু। এখন আঁচ তুলতে গেলে কয়লা দিতে হবে। শেষ হাটে আর আঁচ তুলে লোকসান দেব নাকি দু'টাকার ফুলুরির জন্য?

তা বটে। তারক এধার-ওধার খুঁজে দেখল। শেষে মুকুন্দ দলুইয়ের দোকানে গরম চপ পেয়ে নিয়ে এল।

খালি পেটে ঢুকে চপ যেন নৃত্য করতে লাগল। তার ওপর তাড়ি গিয়ে যেন গান ধরে ফেলল। ভিতরে যখন নাচগান চলছে তখন তারক বলল, কালীপুরের হাট বড়ো ভাল জায়গা, কী বলো করালীদা!

জিবে একটা মারাত্মক কাঁচালঙ্কার ঘষটানি খেয়ে শিসোচ্ছিল করালী। এক গাল তাড়িতে জলন্ত জিবটা খানিক ভিজিয়ে রেখে ঢোঁক গিলে বলল, সেই কোমরে ঘুনসি-পরা বয়সে বাপের হাত ধরে আসতুম, তখন একরকম ছিল। এখন অন্যরকম।

তারকের বাঁ পাশে একজন দাঁত উঁচু লোক তখন থেকে দু'খানা সস্তা গন্ধ সাবান বাঁ হাতে ধরে বসে আছে। ডান হাতে গেলাসে চুমুক দিচ্ছে আর ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সাবান দু'খানা দেখছে বারবার।

পেটের মধ্যে নৃত্যগীত চলছে, মেজাজটা একটু ঢিলে হয়েছে তারকের। লোকটার দিকে চেয়ে বলল, সাবান বুঝি বউয়ের জন্য?

লোকটা উদাস হয়ে বলল, বউ কোথা? ঘাড়ের ওপর দু-দুটো ধুমসি বোন, মা-বাপ। মুকুন্দ বিশ্বেস সাফ বলে দিয়েছে, আগে পরিবার থেকে আলগা হো, তারপর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেব।

তা আলগা হতে বাধা কী? হলেই হয়। আজকাল সবাই হচ্ছে।

ভয়ও আছে। মুকুন্দ বিশ্বেসের ছেলের সঙ্গে তার ঝগড়া। মেয়ে বিয়ে দিয়েই মুকুন্দ আর তার বউ আমার ঘাড়ে চাপবার মতলব করছে।

ও বাবা! সেও তো গন্ধমাদন।

তাই আর বিয়েটা হয়ে উঠছে না।

কর কী?

ভ্যানরিকশা চালাই। নয়াপুর থেকে কেশব হালদারের মাল নিয়ে এসেছি। হাটের পর ফের মাল নিয়ে ফেরা। আর সাবানের কথা বলছ! সে কি আর শখ করে কেনা! লটারিতে পেলুম।

বাঃ। লটারি মেরেছ, এ তো সুখের কথা।

ছাই। ওই যে লোহার রিং ছুঁড়ে ছুঁড়ে জিনিসের ওপর ফেলতে হয়। রিংয়ের মধ্যিখানে যা পড়বে তা পাবে। ফি বার দু'টাকা করে। তিরিশখানা টাকা গচ্চা গেল। তার মধ্যে একবার

এই সাবান দু'খানা উঠল। যাচাই করে দেখেছি, এ সাবান চার টাকা পঞ্চাশ পয়সায় বিকোয়।

লটারি মানেই তো তাই রে ভাই। তুমিই যদি সব জিতে যাও তা হলে লটারিওয়ালার থাকবে কী? দাঁত-উঁচু লোকটা এক চুমুক খেয়ে বলল, সবারই সব হয়, শুধু এই ভ্যানগাড়িওলারই কিছু হয় না, বুঝলে! মা একখানা ফর্দ ধরিয়ে দিয়েছিল, ট্যাঁকে আছে এখনও। সেসব আর নেওয়া হবে না। ক'টা বাজে বলো তো!

তারকের হাতে ঘড়ি নেই। আন্দাজে বলল, তা ধরো সাতটা সাড়ে-সাতটা হবে।

উরেব্বাস রে! কেশব হালদার মাল গোটাতে লেগেছে। যাই।

করালী শিসোচ্ছিল।

উঠবে নাকি গো করালীদা!

করালী একটা হাই তুলে বলল, গোরুটার কথাই ভাবছিলুম।

কী ভাবলে?

বাঁজা গোরু। পুষতে খরচ আবার বেচতেও মন চায় না। কিনবেই বা কে বল!

তাই বল, বাঁজা গোরু। তা গেছে আপদই গেছে। ভাবনার কী?

আছে রে আছে। আমার ছোটো মেয়ে পদির বড়ো ভাব গোরুটার সঙ্গে।

পাল খাইয়েছ?

কিছু বাকি রাখিনি। আর দুটো গোরু বিয়োয়, দুধও দেয়। এটাই দেয় না।

এত বড়ো হাটে বউ খোঁজা মানে খড়ের গাদায় ছুঁচ খোঁজার শামিল। এসে থাকলেও এত রাত অবধি তো আর হাটের মাটি কামড়ে বসে নেই। বউ যদি রাতে না ফেরে তা হলে রাতেও হরিমটর। তারক ভাবছিল আরও কয়েকখানা চপ সাঁটিয়ে নেবে কি না। তারপর এক ঘটি জল খেয়ে নিলেই হল। কিন্তু পয়সার নেশাটা চৌপাট হয়ে গেলে মুশকিল।

পুরুষমানুষ আর মেয়েমানুষের সম্পর্ক নাকি চিঁড়েতন। আ মোলো। সম্পর্কের আবার চিঁড়েতন, হরতন, ইস্কাপন, রুইতন হয় নাকি? হলেও বাপু, যমুনা কি সেসব বোঝে। তবে কিনা নরেনবাবু ভদ্রলোক, মেলা জানেশোনে। নরেনবাবুর কথা তো আর ফ্যালনা নয়।

একদিন জিজ্ঞেস করেছিল, চিঁড়েতনটা আবার কী, বল তো বাবু?

নরেনবাবু হেসেটেসে বলল, এই ধর তুই আর আমি। আমিও কারও কেউ নই, তুইও কারও কেউ নোস। যেমন জলের মাছ, কে কার মা-বাপ জানে ওরা? তবু তো ডিম ছাড়ছে, বাচ্চা বেয়োচ্ছে। ব্যাপারটা ওরকমই আর কী। চিরন্তন মানে হচ্ছে আদি সম্পর্ক--বুঝলি না?

যমুনা বুঝি-বুঝি করেও স্পষ্ট বুঝতে পারছিল না। তবে এটা ঠাহর হল যে, ওই চিঁড়েতনের মধ্যেই প্যাঁচটা আছে।

প্যাঁচ বুঝতে যমুনার কেন--কোনো মেয়েমানুষেরই দেরি হয় না। যমুনার এই সতেরো বছর বয়স হল। এক বছর হল পুরুষমানুষ ঘাঁটছে। পুরুষটা হল তার বর তারক। একদিন মিটমিট করে হেসে বলেছিল, বাবুর বাড়িতে কাজে যাস, তা কখনও পিঠ-ঠিট চুলকে দিতে বললে দিস। নরেনবাবুর মেলা পয়সা। প্যাঁচ বুঝতে যমুনার দেরি হয় না।

আর একদিন বলল, আহা, বাবুর বউটা বোবা, পিরিতের কথা-টথা কইতে পারে না। পুরুষমানুষ একটু ওসব শুনতে-টুনতে চায়।

প্যাঁচ। যমুনা বুঝতে পারে। চিঁড়েতনটা বুঝতেও তার অসুবিধে হয়নি।

নরেনবাবুর বউ মলয়া বোবা-কালা। তবে সে পয়সাওলা নিতাই রায়ের মেয়ে। নিতাই রায় পঞ্চাশ হাজার টাকায় নরেনবাবুকে কিনেছে। এ কথা সবাই জানে। নগদ ছাড়াও বাড়িঘর ঠিকঠাক করে দেওয়া, মেয়ের নামে জমিজমা লিখে দেওয়া তো আছেই। নরেনবাবুকে তাই আর কিছু করতে হয় না। শুয়ে বসে আড্ডা দিয়ে সময় কাটছিল। তবে বেকার জামাই বলে লোকে টিটকিরি না দেয় সেজন্য ইদানীং নয়নপুরের বাজারে একখানা ওষুধের দোকানও করে দিয়ে নিতাই রায়। গাঁয়ের দোকান, সেখানে ওষুধ ছাড়াও নানা জিনিস রাখতে হয়। তা নরেন হল বাবু মানুষ। সকালের দিকে শ্রীপতি নামে এক কর্মচারী দোকান দেখে, সন্ধেবেলা নরেনবাবু গিয়ে ঘন্টা দুয়েক কাটিয়ে আসে। সেখানে কিছু

ইয়ারবন্ধুও জোটে এসে। শোনা যাচ্ছে, নরেনবাবুর গদাইলস্করি চালে সুবিধে হয়েছে শ্রীপতির। সে দু'হাতে লুটে নিচ্ছে। তারকের তাই ইচ্ছে, শ্রীপতিকে সরিয়ে চাকরিটা সে বাগায়।

সোজাসাপটা ব্যাপার। এতে কোনো প্যাঁচ নেই। মানুষ কত কী চায়, আর চাইবেই তো! নেই বলেই চায়। কিন্তু চাইলেই তো হল না। দিচ্ছে কে? আর তখনই প্যাঁচটা লাগে।

মলয়ার দুটো মেয়ে। একটা সাড়ে তিন বছরের, একটা দু' বছরের। তারা কেউ বোবা-কালা নয়। বড়োটা পাড়ার খেলুড়িদের সঙ্গে খেলতে শিখেছে, আর ছোটোটা সারা বাড়িতে গুটগুট করে হেঁটে বেড়ায়। এ দুটো মেয়ে হচ্ছে মলয়ার জান। যখন আদর করে তখন খ্যাপাটে হয়ে যায়। আর সারা দিনে মাঝে মাঝেই মেয়েদের আঁ আঁ করে ডাকে। মেয়ে দুটো মায়ের ডাক ঠিক বুঝতে পেরে ছুটে আসে। মেয়ে দুটোর দেখাশোনা করত উড়নচণ্ডী পটলি। ছোটো মেয়েটা তখন সবে হামা দেয়। পটলি তাকে বারান্দায় ছেড়ে দিয়ে উঠোনে দিব্যি এক্কা-দোক্কা খেলছিল। মেয়েটা গড়িয়ে পড়ে হাঁ করে এমন টান ধরল যে দম বুঝি ফিরে পায় না। মাথা ফুলে ঢোল। শোনার কথাই নয় মলয়ার। তবু মায়ের মন বলে কথা। কোথা থেকে পাখির মতো উড়ে এসে মেয়ে বুকে তুলে নিল। তারপর সে কী তার ভয়ঙ্কর চোখ আর ভৈরবী মূর্তি। পটলি না পালালে বোধহয় খুনই হয়ে যেত মলয়ার হাতে। বোবাদের রাগ বোধহয় বেশিই হয়। কথা দিয়ে দুরমুস করতে পারে না, গালাগাল দিয়ে বুক হালকা করতে পারে না, তাই ভিতরে ভিতরে পোষা রাগ গুমসে ওঠে।

পটলির জায়গায় এখন যমুনা। মেয়েদের দেখে শোনে, ধান শুকোয়, ঢেঁকি কোটে, গেরস্থ বাড়িতে তো কাজের আকাল নেই। আবার ছুটে গিয়ে ঘরের অকালকুষ্মাণ্ড ওই তারকের জন্যও রেঁধে রেখে আসতে হয়। তা বলে খারাপ ছিল না যমুনা। খাটনিকে তো তার ভয় নেই, চিরকাল গতরে খেটেই বড়োটি হল। কিন্তু ভয়টা অন্য জায়গায়। সে হল ওই মলয়া। বোবা কালা হলে কী হয়, যমুনার বিশ্বাস মলয়া অনেক কিছু টের পায়। শুনতে না পেলেও টের পায়। মাঝে মাঝে কেমন যেন বড়ো বড়ো চোখ করে তার দিকে অপলক চেয়ে থাকে। একটু ভয়-ভয় করে যমুনার।

নরেনবাবু ধীরে ধীরে এগোচ্ছে। একদিন বলল, নারী আর নদীতে কোনো তফাত নেই, বুঝলি। মেয়েছেলে হল বওতা জল, ডুব দিয়ে উঠে পড়। নদী কি তাতে অশুদ্ধ হল? এই যে গঙ্গায় কত পাপীতাপী ডুব দেয়, গঙ্গা কি তাতে ময়লা হয় রে!

আগে যমুনা শুধু শুনত, কিছু বলত না। আজকাল বলে। সে ফস করে বলে ফেলল, তোমার কি কোনো কাজ নেই বাবু? সকালের দিকটায় দোকানে গিয়ে বসলেও তো পার। শ্রীপতি তো শুনি দোকান ফাঁক করে দিচ্ছে।

নরেনবাবু একটা ফুঃ শব্দ করে বলল, দিক না, তাতে আমার কী? দোকান শ্বশুরের, শ্রীপতিও তার লোক। সে বুঝবে। আমার ওতে মাথা গলানোর কী? আমি খাব-দাব ফুর্তি করব। বোবা-কালা বিয়ে করেছি কি মাগনা?

শ্বশুর কি আর চিরকাল থাকবে? দোকান তো তোমারই হবে একদিন।

আমার নয় রে, আমার নয়। দোকান ওই বোবা-কালার নামে। ও আমি চাইও না। দু'টাকার জিনিস চার টাকায় বিক্রি করে পয়সা কামানোর ধাতই আমার নয়। আমাকে কি তাই বুঝলি?

আর একদিন আরও একটু এগোলো নরেনবাবু। কথা নয়, একখানা তাঁতের শাড়ি দিয়ে বলল, কাল সকালে পরে আসিস। তোকে মানাবে। এসে একটু ঘোরাফেরা করিস চোখের সামনে।

খুশি হল তারকও। বলল, বাঃ বাঃ, এই তো কাজ এগোচ্ছে।

তার মানে?

নরেনটা তো ভিতুর ডিম। ভাবছিলুম আর বুঝি এগোবে না।

কী বলতে চাও তুমি বলো তো!

দোষ ধরিসনি। একটু মাখামাখি করলে যদি কাজ হয় তো ভালোই।

তাই যদি হবে তা হলে তো বাজারে গিয়ে নাম লেখালেই পারতুম।

চটিস কেন? পেটের দায় বলে কথা। শ্রীপতি শালা তো শুনছি, কৈলাসপুরে চার কাঠা জমি কিনে ফেলেছে।

তাতে তোমার কী?

জ্বলুনি হয়, বুঝলি, বুকের মাঝখানটায় বড্ড জ্বলুনি হয়। ঘরামির কাজ করে করে হাতে কড়া পড়ে গেল, সুখের মুখ দেখলুম না। প্রথমটায় বাধো-বাধো ঠেকলেও পরে দেখবি ব্যাপারটা কিছুই না। আমিও যা, ওই নরেনবাবুও তা।

তোমার মুখে পোকা পড়বে।

ওরে শোন, ও চাকরির মতো সুখের চাকরি নেই। মালিক চোখ বুজে থাকে, হিসেব চায় না, এমনটা আর কোথায় পাব?

এই টানা-পড়েনের মধ্যে দিন কাটছিল যমুনার। একদিন বিকেলে ভিতরের বারান্দায় বসে মলয়ার চুল বাঁধছিল যমুনা। বেশ চুল মেয়েটার। দেখতেও খারাপ নয় কিছু। মায়াও হয়। খোঁপায় কাঁটা গুঁজে হাত-আয়নাটা মলয়ার হাতে যখন ধরিয়ে দিল তখন হঠাৎ আয়নাটা ফেলে ঘুরে বসল মলয়া। সেই বড়ো বড়ো চোখ। দু-হাতে হঠাৎ যমুনার দু'কাঁধ খিমচে ধরে ঝাঁকায় আর বলে, আঁ আঁ আঁ আঁ আঁ...

ভয়ে আত্মারাম, ডানা ঝাপটাচ্ছিল বুকে। কী জোর মেয়েটার গায়ে!

কী করছ বউদি, কী করছ? আমি তো কিছু করিনি!

মলয়া ঝাঁকানি থামিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে চেয়ে রইল তার চোখের দিকে। তারপর সাপে ব্যাং ধরলে ব্যাং যেমন শব্দ করে তেমনই এক অবোধ শব্দ বেরোতে লাগল তার গলা থেকে। আর দু'চোখে জলের ধারা।

নরেনবাবু পরদিনই বলল, শহরে বেড়াতে যাবি দু'দিনের জন্য? শুধু তুই আর আমি। একটু ফুর্তি করে আসি চল।

ফুঁসে উঠতে পারল না যমুনা। তার কি সেই জোর আছে? জোর হল স্বামীর জোর। তার তো সেখানেই লবডঙ্কা। যমুনা সুতরাং অন্য পন্থা ধরে বলল, তোমার শ্বশুরকে যদি বলে

দিই তা হলে কী হয়?

ও বাবা! এ যে আমার শ্বশুর দেখায়! কেন রে, শ্বশুরের কাছে কি টিকিখানাও বাঁধা রেখেছি? নিতাই রায়ই বা কম কীসে? পটলডাঙায় তার বসন্তকুমারীর ঘরে যাতায়াত। কে না জানে? কী করবে সে আমার? তুই বড্ড বোকা মেয়েছেলে তো!

শোনো বাবু, বউদি কিন্তু সব টের পায়।

সোহাগের কথা আর বলিসনি। টের পায় তো পায়। কী করবে সে?

যমুনার ভাবনা হল। নরেনবাবুর সাহস বড়োই বেড়েছে। এবার তার বিপদ।

শুনে খ্যাঁক করে উঠল তারক, বিপদ আবার কী? তোকে তো কতবার বলেছি, ওতে কিছু হয় না। তোর আমিও রইলুম। কখনও কলঙ্ক রটিয়ে তোকে বিপদে ফেলব না। নরেনবাবুর সঙ্গে আমার পষ্টাপষ্টি কথা হয়ে গেছে।

কী কথা?

সামনের মাসে চাকরিতে জয়েন দেব।

নরেনবাবু অন্য মেয়েমানুষ দেখে নেয় না কেন?

যার যাকে পছন্দ। তোকে চোখে লেগেছে। ও বড়ো সর্বনেশে ব্যাপার! যাকে চোখে লাগে তার জন্য পুরুষমানুষ সব করতে পারে।

আমি কালই বাপের বাড়ি যাচ্ছি। লাথি ঝ্যাঁটা খাই, শুকিয়ে মরি, তাও ভালো। তবু নষ্ট হব না।

বিপদে ফেললি দেখছি। বলি, আমার মতো একটা মনিষ্যিকে যদি তোর সব দিয়ে থাকতে পারিস তবে নরেনবাবু দোষটা কী করল? সে দেখতে আমার চেয়ে ঢের ভালো। ফর্সা, চোখমুখে শ্রী-ছাঁদ আছে। আমি তার পাশে কী বল তো!

তুমি আমার স্বামী।

ওই তো তোর দোষ। স্বামীর মতো স্বামী হলেও না হয় বুঝতুম।

তুমি খারাপ লোক নও। তোমাকে লোভে পেয়েছে।

তোর মাথাটাই বিগড়েছে। আমি খারাপ নই? খুব খারাপ। কেউ আজ অবধি আমাকে ভালো বলেনি। আমি বলছি। ভালো করে ভেবে দেখ। নরেনবাবু তোকে চায়। এমনকী এ কথাও বলছে, সে তোকে বিয়ে করতেও রাজি।

বিয়ে! বলে এমন অবাক হয়ে তাকাল যমুনা যেন ভূত দেখছে।

ভয় পাসনি। তোর একটু ধর্মভয় আছে আমি জানি। আমি সাফ বলে দিয়েছি, বিয়ে-টিয়ে নয় মশাই। আমি বউ ছাড়ছি না। দু-দিন চারদিন বড়ো জোর।

তোমার একটু বাধল না বলতে? নরকে যাবে যে!

সে দেরি আছে। নরকে মেলা লোকই যাবে। কলিকালে কী নরকযাত্রীর অভাব রে! আগে এ জন্মে কিছু জুত করে নিই। নরক তো আছেই কপালে।

যমুনা রাগ করে বলল, দেখ, আমি সাবিত্রী-বেউলো নই, তবে যা বুঝেছি তাই বুঝেছি। আমাকে দিয়ে ও কাজ হবে না।

তুই বোকাও বটে রে! নরেনবাবুর কি মেয়েছেলের অভাব? তোর কত বড়ো ভাগ্য যে এত মেয়েছেলে থাকতে তুই-ই ও শালার চোখে পড়েছিস। আমি বলি, সময় থাকতে এসব ভাঙিয়ে নে। রূপ-যৌবন সব ভাঙিয়ে মা লক্ষ্মীকে ঘরে এনে তোল আগে।

মা-লক্ষ্মী এমন ঘরে লাথি মারতেও আসবে না।

মনটা ঠিক করে ফেলেছিল যমুনা। এখানে থাকলে যে তার পরকাল বলে কিছু থাকবে না তাও বুঝেছে। কিন্তু যায় কোথা? বাপের বাড়ি বলতে তুলসীপোঁতা গাঁয়ে একখানা ঝুপড়ি। এণ্ডি-গেণ্ডি অনেক ভাইবোনের সংসার। তার বাবা দাদ আর হাজার মলম বিক্রি করে, মা বেচে ঘুঁটে।

৩

বাঁশঝাড়ের মধ্যে একটা তোলপাড় হচ্ছিল। ভোঁস ভোঁস শ্বাসের শব্দ, সেই সঙ্গে কে যেন আঁদাড়-পাঁদাড় ভাঙছে।

তারক ভয় খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল, ও কী গো?

করালী চাপা গলায় বলল, চুপ!

কান খাড়া করে শুনছিল করালী। বাঁশবনের মধ্যে দুটো চোখ চকচক করে উঠল হঠাৎ।

আহ্লাদের গলায় করালী বলল, ওরে পাজি মাগি, এখেনে সেঁধিয়ে রয়েছিস! আয় আয় বলছি শিগগির।

বাঁশবনে প্রলয়ের শব্দ তুলে আর ফোঁস ফোঁস করে শ্বাস ফেলতে ফেলতে গোরুটা বেরিয়ে এল। গোরু না হাতি বোঝা ভার। বিশাল চেহারা।

উরেব্বাস রে! এই তোমার গোরু?

গোরুটা করালীর গা ঘেঁষে দাঁড়াল, তার গলা এক হাতে জড়িয়ে ধরে করালী বলল, আহা, বাঁজা বলেই ওর মনে সুখ নেই কিনা। মনের দুঃখে মাঝে মাঝে বনবাসে যায়। ফিরেও আসে। চ' চ' পা চালিয়ে চ'। মেয়েটা এতক্ষণে পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসেছে।

তারক একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, তুমি কপালওলা মানুষ, গোরুটা দিব্যি পেয়ে গেলে। এখন আমার বউ কোথা পাই বলতে পার? আমার কপাল তো আর তোমার মতো নয়।

পাবি পাবি। বাঁধা বউ যাবে কোথায়? মারধর করিস নাকি?

আরে না। সেসব নয়। নরম-সরম আছে, গায়ে হাত তোলার দরকার হয় না। তবে গোঁ আছে খুব। যেটা না বলবে সেটাকে হ্যাঁ করায় কার সাধ্যি।

রথতলার কাছ বরাবর করালী বাঁয়ের রাস্তা ধরল, তারক ডাইনে।

সামনেই মলয়া ফর্মেসি। আলো জ্বলছে। দিব্যি পাকা ঘর। দোকানও বড়োসড়োই। আজ নরেনবাবু নেই। শ্রীপতি একা বসে মাছি তাড়াচ্ছে।

তাকে দেখে শ্রীপতি বিশেষ খুশি হল না। হওয়ার কথাও নয়। মুখটা আঁশটে করে বলল, বাবু নেই।

আসেনি আজ?

না। সকাল থেকেই পাত্তা নেই। বাড়ি থেকেও লোক এসে খুঁজে গেছে।

অ্যাঁ। তবে তো--

শ্রীপতি চেয়ে আছে। বুকটা ধক ধক করছিল তারকের। তাড়ির নেশাটা কেটে যাওয়ার উপক্রম। গেল কোথায় নরেনবাবু?

শ্রীপতি ঠোঁট উল্টে বলল, তা কে জানে। বলে যায়নি কিছু। বাড়ির লোকও খুঁজছে।

দুইয়ে দুইয়ে তবে কি চারই হল? যমুনা আর নরেনবাবু যদি একসঙ্গেই হাওয়া হয়ে থাকে তো শ্রীপতির জায়গায় সামনের মাসে সে-ই জয়েন দেবে।

তারক বসে গেল।

দোকানে বিক্রিবাটা কেমন হে?

বিক্রি কোথায়? ওষুধের স্টকই নেই।

নেই কেন?

ওষুধ কি মাগনা আসবে? টাকাটা দেবে কে?

কেন, নিতাইবাবু দেবে।

দিচ্ছে কোথায়? অন্য সব কারবারে টাকা আটকে আছে। দোকান চলছে নমো নমো করে।

ইয়ে--তা উপরি-টুপরি কেমন?

উপরি। সেটা আবার কী? মাস মাইনেরই দেখা নেই তো উপরি।

তারক মৃদু মৃদু হাসছিল। শ্রীপতি তো আর পাঁঠা নয় যে তার কাছে কবুল করবে।

নরেনবাবু বাড়িতে কিছু বলে যায়নি?

তা কে জানে। ঠসা-বোবা বউ, তাকে বলাও যা না-বলাও তা।

তারক উঠে পড়ল। নাঃ, এত দিনে যমুনার তা হলে সুমতি হয়েছে। নরেনবাবুর সঙ্গেই যদি গিয়ে থাকে--গেছেই--তা হলে তো মার দিয়া কেল্লা। ওষুধের দোকান মানে কাঁচা পয়সা।

ঘরে ফিরে টেমি জ্বেলে বসে বসে খানিক ভাবল তারক। খবর নিয়েছে, শ্রীপতির মাইনে মাসে তিন শ'টাকা। কম কীসের? বসা চাকরি। তার ওপর উপরি তো আছেই।

মনটা বেশ ভালোই লাগছে তারকের। সে টেমি নিবিয়ে শুয়ে পড়ল।

কত রাত হবে কে জানে, হঠাৎ একটা চেঁচামেচি শুনে ঘুম ভাঙল তারকের। কোথা থেকে চেঁচামেচিটা আসছে তা প্রথমে ঠাহর হল না। কারও বিপদ আপদ হল নাকি?

দরজা খুলে বেরিয়ে এল তারক। মনে হল পুরো গাঁ-ই চেঁচাচ্ছে। মেয়ে-পুরুষের গলা শোনা যাচ্ছে।

ডাকাত! ডাকাত!

তারক লাফ দিয়ে উঠোনে নামল। তারপর নরেনবাবুর বাড়ির দিকে ছুটতে লাগল। গণ্ডগোলটা ওখানেই হচ্ছে যেন!

নরেনবাবুদের পুরনো ভাঙা বাড়ি সারিয়ে দালান তুলে দিয়েছে নিতাই রায়। বেশ বড়োসড়ো বাড়ি। উঠোনে ধানের মরাই, টিপকল, পিছনে গোয়াল, ঢেঁকিঘর। বাড়িটা হাতের তেলোর মতোই চেনে তারক।

চেঁচালেও পাড়ার লোক কেউ বেরোয়নি ভয়ে। বাইরের উঠোনে মশাল হাতে কালিঝুলি মাখা একটা লোক দাঁড়িয়ে। হাতে একখানা বড়োসড়ো ছোরা চকচক করছে। আর ভাঙা দরজা দিয়ে আর দু'জন টেনে হিঁচড়ে বাইরে বের করে আনছে নরেনবাবুর বোবা-কালা বউটাকে। বউটার শাড়ি খুলে লম্বা হয়ে ছড়িয়ে গেছে ঘর অবধি। তার মুখে কথা নেই, কেবল আঁ আঁ চিৎকার।

তারক চেঁচিয়ে বলল, ডাকাতি করছ কর, বউটাকে ওরকম করছ কেন হে? অ্যাঁ, ওকে ছেড়ে দাও। বোবা-কালা মানুষ।

উঠোনের ছোরা হাতে লোকটা একবার তার দিকে ফিরে দেখে একটা হাঁক মারল, ভাগ শালা শুয়োরেরর বাচ্চা। পেট ফাঁসিয়ে দেব...

তারক থমকে গেল। হচ্ছেটা কী? ডাকাতি করবি কর। কিন্তু মেয়েছেলেটাকে টেনে বের করছিস কেন? অবোলা মানুষ।

হঠাৎ ঝাঁক করে মাথাটা পরিষ্কার হয়ে গেল তারকের। শালারা ভাড়াটে খুনে নয় তো?

চুলের মুঠি ধরে ছেঁচড়ে সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে আনছে মলয়াকে। একজন খেঁটে মোটা একটা লাঠি দিয়ে পেটাচ্ছে অমানুষিক জোরে। হাড়গোড় ভেঙে যাওয়ার কথা।

আঁ আঁ আঁ আঁ চিৎকারটা চারদিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে সাইরেনের মতো। সেই চিৎকারে মড়া মানুষও শিউরে উঠবে। মশালের আলোয় তারক দেখতে পেল, মলয়ার মুখ দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে।

উঠোনের লোকটা ছোরা হাতে এগিয়ে যাচ্ছিল মলয়ার দিকে।

তারক জন্মে মারদাঙ্গা করেনি। সে ভিতু মানুষ। কিন্তু আজ মাথাটা যেন বড্ড তেতে গেল হঠাৎ। চারদিকে ঢেলা আর ইটের অভাব নেই। পুরনো বাড়ির ভাঙা টুকরো চারদিকে ছড়ানো। তারক একখানি ইটের টুকরো তুলে খানিক দৌড়ে গিয়ে টিপ করে মারল। একটা, দুটো, তিনটে...

মার শালাকে! মার শালাকে... বলে চেঁচাচ্ছিল তারক।

তার পয়লা ইটেই ছোরাওলা মাথা চেপে বসে পড়েছিল। আর ইটগুলো লাগল কি না কে জানে, তবে লোকগুলো ভড়কে ছিটকে গেল এদিক-ওদিক। তারক লাফ দিয়ে গিয়ে উঠোনে ঢুকল।

সামনে একটা খেঁটে লাঠি পড়েছিল। সেইটে তুলে নিল সে। তারপর বসা ডাকাতটা উঠতে যেতেই পাগলের মতো মারতে লাগল তাকে।

কে একজন চেঁচাল, পালা-পালা... লোক আসছে...

ডাকাতের জান বলে কথা। অত পিটুনি খেয়েও লোকটা হঠাৎ উঠে প্রাণভয়ে দৌড় লাগাল। কে কোথায় গেল কে জানে। তবে মেয়েটা বেঁচে গেল এ যাত্রা।

গাঁয়ের লোক বোধহয় তারকের সাহস দেখেই বেরিয়ে এল এতক্ষণে। লহমায় লাঠিসোঁটাধারী পুরুষ আর মেয়েছেলেতে উঠোন ভর্তি। মেয়েদের কারও হাতে বঁটি অবধি। চেঁচামেচিতে কান পাতা দায়।

মলয়াকে ধরে তুলতে হল। বোবা মেয়েটা থরথর করে কাঁপছে, চোখে ভূতুড়ে দৃষ্টি। সোজা হয়ে দাঁড়াতেও পারছে না। তারক পাঁজাকোলে করে তাকে ঘরে এনে শোওয়াল বিছানায়। মেয়ে দুটো চেঁচিয়ে কাঁদছে।

নরেনবাবু কোথায়? নরেনবাবু কি খাটের নীচে নাকি? নাকি পালিয়ে গেছেন? এসব নানা জন জিজ্ঞেস করতে লাগল।

একজন মুনিশ এগিয়ে এসে বলল, বাবু আজ সাতসকালেই একটু শহরে গেছেন। আজ ফিরবেন না।

তারকের গা জ্বালা করছিল হঠাৎ। নরেনশালাই মলয়াকে খুন করতে লোক লাগায়নি তো! শালার যে যমুনার ওপর দারুণ লোভ। তারকের কাছে বিয়ের প্রস্তাব অবধি দিয়ে রেখেছে।

মাথাটা বড্ড গরম হচ্ছিল তারকের। সবাই এসে পিঠ চাপড়ে তার বীরত্বের প্রশংসা করছিল আর ততই তারকের গায়ের রোঁয়া দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল রাগে। ব্যাপারটা তার কাছে পরিষ্কার। ডাকাতি নয়, ডাকাতরা অকারণে খুন করে না। এরা খুন করতেই এসেছিল।

তপন হালদারের ছেলে মিতুল মোটরবাইকে করে কালীপুর থেকে মন্মথ ডাক্তারকে নিয়ে এল। গাঁয়ের হোমিওপ্যাথ জগন্নাথ কী সব ওষুধ খাইয়ে দিয়েছিল মলয়াকে। যাই হোক বউটার চোট তেমন মাত্রাছাড়া নয়। মন্মথ ডাক্তার দেখেটেখে বলল, হাড়-টাড় ভাঙেনি। তবে ভোগান্তি আছে।

তারক ভিড়ের বাইরে উঠোনের এক ধারে এসে দাঁড়িয়ে ওপরে চেয়ে আকাশটা দেখল। সে অমানুষ ঠিকই, কিন্তু তার চেয়েও ঢের অমানুষ তো পৃথিবীতে আছে দেখা যাচ্ছে।

কালীপুর থানা থেকে পুলিশও এসে পড়ল জিপে করে। জবানবন্দি দিতে দিতে রাত প্রায় ভোর। তারপর তারক বাড়িমুখো রওনা হল। মনটা খারাপ লাগছে। বউটা এঁটো হয়ে পড়ল!

বাঁশঝাড় পেরোনোর সময় কে যেন বলে উঠল, আমি তো জানতুম তুমি খারাপ লোক নও।

তারক হাঁ।

কে? কে?

আমি।

অন্ধকারেও কি আর চিনতে ভুল হয়?

তুই! তুই নরেনবাবুর সঙ্গে যাসনি?

তোমার কি মুখে কিছু আটকায় না? তার আগে গলায় দড়ি দেব।

তা হলে কোথায় ছিলি?

কোথায় আবার। বউদি লুকিয়ে রেখেছিল নতুন গোয়ালঘরে। ডাকাত যখন পড়ল তখন বেরিয়ে এসে কাণ্ড দেখে খড়ের গাদার পিছনে লুকিয়ে পড়ি। তুমি না এলে আজ কী যে হত!

নরেনবাবু তা হলে কার সঙ্গে গেল?

তার আমি কী জানি! নিয়ে যেতে চেয়েছিল বলেই তো পালিয়েছিলুম।

ও শালা মহা হারামি। একবার ভেবেছিলুম পুলিশকে বলে দিই, খুনটা ও শালাই করাচ্ছিল।

না না, ওসব বলার দরকার নেই। আমাদের তো গাঁয়েই থাকতে হবে। আমরা গরিব মানুষ।

হুঁ।

আর আমাকে বেচতে চাইবে না তো!

তারক একটু হাসল। তারপর হাত বাড়িয়ে যমুনার একটা হাত ধরে বলল, সেই তারকটা ভেগে গেছে। এখন যে-তারকের হাত ধরে হাঁটছিস সেটা একটা পরপুরুষ।

তারকের হাতে একটা জোর চিমটি কাটল যমুনা।

সাঁঝের বেলা

সুষনি শাক তুলতে গিয়ে খেতে সাপ দেখেছিল মেজ বউ। 'সাপ সাপ' বলে ধেয়ে আসছিল, বেড়ায় আঁচল আটকে ধড়াস করে পড়ল। পেটে ছ'মাসের বাচ্চা। তাই নিজের ব্যথা ভুলে পেট চেপে কোন সর্বনাশের কথা ভেবে কেঁদে উঠল চেঁচিয়ে।

রোদভরা উঠোনে শান্ত সকালে নরম শরীর বলের মতো গুটিয়ে বসে আছে সাদা কালো কয়েকটা বেড়াল। টিপকলের ধারে বসে বাসন মাজছিল ঝি সুধা। তাকে ঘিরে ওপর নীচে 'খা খা' করে ডাকছে কাক। বড়ো পাজি কাক এখানে, লাফিয়ে এসে খোঁপায় ঠোক্কর দেয় সুধার। আশ থেকে পাশ থেকে এঁটো কাঁটা নির্ভয়ে খেয়ে যায়, কখনো বা সাবানের টুকরো, চামচ, ঠাকুরের খুদে প্রসাদের থালা গেলাস মুখে করে নিয়ে যায়। এ বাড়ি ও বাড়ি ফেলে দিয়ে আসে। বাসন মাজতে বসে সুধার তাই বড়ো জ্বালাতন। বসে বসে সে কাকের গুষ্টির উদ্ধার করছিল--কেলেভূত, নোংরাখেকো, গুখেকো গুলোন, মর মর! ভগবানের ছিষ্টি বটে বাবা, যেমন ছিরি তেমনি স্বভাব! রোসো, কাল থেকে এঁটো কাঁটায় ইঁদুর মারা বিষ না মিশিয়ে দিই তো--তা কাকেরা শোনে না। কাটা ঘুড়ির মতো নেমে আসে। সুধার মুখের দিকে চেয়ে 'খা' বলে ডাকে, লাফিয়ে সরে যায়, আবার চেয়ে ডাকে 'খা'।

বাঙ্গালীয়া দুধ দিতে এসেছে। নোংরা ধুতি, গায়ে একটা নতুন সাদা ফতুয়া, কাঁধে নোংরা গামছা। অদ্ভুত দেখায় তাকে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে গোঁফ চুমরাচ্ছিল। দুধের ডেকচি এখনো মাজা হয়নি। ঝামেলা। একবার ডেকে বলছিল--এহ্ সুধারানি, বর্ত্তন ভৈল? কেতো সময় লাগে তুমার--হাঁ? শুনে সুধা ঝামড়ে উঠেছিল--থামতো তুই খোট্টা খালভরা কোথাকার! আমি মরছি বটে নিজের জ্বালায়। বাঙ্গালীয়া একটু হেসে খৈনির থুক ফেলে বলে--কৌয়া তো খুব দিক করে তুমাকে? একঠো বন্দু মূলাও না।

বড়ো বউ চায়ের কেটলি আঁচল চেপে নামিয়ে কৌটো খুলে দেখে চাপাতা নেই। কুমুকে ফের পড়া থেকে তুলে দোকানে পাঠাতে হবে, একটু আগে একবার দোকানে গিয়ে পাউরুটি আর ছোটো খোকার রসগোল্লা এনে দিয়েছে। মেজাজটা বিগড়ে গেল বড়ো বউয়ের। জানালা দিয়ে ধমক দিল সে--ও সুধা, কেবল বক বক করলে কি হাত চলে? বাঙ্গালীয়া কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছে। ওর তো আর বাড়ির গাহেক আছে না কি?

এই যে বড়ো বউয়ের মেজাজ বিগড়ালে এর জের সারাদিন চলবে। একে তাকে ওকে সারাদিন বকতেই থাকবে যতক্ষণ না আবার তার বর বিষ্ণুচরণের মেজাজ বিগড়োয়। বিষ্ণুচরণ ধৈর্য হারালে বড়ো বউকে পেটায়। মেজো হরিচরণ আবার তেমন নয়। যতক্ষণ বাড়িতে থাকে ততক্ষণ বউকে দেখে। উঠোনে হয়তো কাপড় মেলে মেজো বউ কলধারে একটু রুমাল গেঞ্জি কাচতে যায়, কি চুল শুকোয় তখন হরিচরণ জানালার পর্দার ফাঁক দিয়ে কি কপাটের আড়ালে লুকিয়ে বউকে দেখে। কখনো কখনো আবার কোকিলস্বরে আড়াল থেকে বলে--কু--উ। সেই শুনে আবার বড়ো বউয়ের বুক জ্বলে! বলে--এমন মাগিমার্কা ব্যাটাছেলে দেখিনি বাপু জন্মে। হরিচরণ আবার সেটা টের পায়, ডেকে বলে--বৌদি গো, বউ আমার খাবে দাবে বসে থাকবে, শুধু তুলবে পাড়বে বিছানা।

যতীন এখন বুড়ো হয়েছে। হোমিওপ্যাথির ফোঁটা ফেলতে হাত কেঁপে যায়, এক ফোঁটার জায়গায় দু ফোঁটা তিন ফোঁটা পড়ে গিয়ে ওষুধ নষ্ট। লোকে বলে--যতীন ডাক্তারের হাতের জোর নষ্ট হয়ে গেছে ছোটো ছেলেটা মরার পর থেকে , ছোটো ছেলে ব্রহ্মচরণ অবশ্য বাপের সু-পুত্র ছিল না। দা কুড়ুল দিয়ে বাপ ভাইদের কাটতে উঠত প্রায়ই বাড়ির মধ্যে। মুখে আনতে নেই এমন মুখখারাপ করে গাল দিত! এ হল মেজাজের বাড়ি। সকলেই মেজাজওয়ালা মানুষ। ব্রহ্মচরণ আবার তার মধ্যেই ছিল নুনের ছিটে। সে মরায় এ বাড়ির লোক বেঁচেছে। মরল কীভাবে কে জানে! নিরুদ্দেশ বলে রা উঠেছিল, তারপর একদিন ঝিলে তার শরীর ভেসে উঠল। সারা গায়ে ছোরার গর্ত! কোনো কিনারা হয়নি, কিনারা করার আগ্রহও নেই কারো। কেবল বুড়ো যতীন ডাক্তার আজকাল ঝাপসা দেখে, হাত কাঁপে, রাতে ঘুমোতে পারে না, উঠে উঠে বাইরে যায়, বিড়ি টানে, কাশে।

অভ্যাস মতো যতীন ডাক্তার তার বাইরের ঘরে ওষুধের বাক্স নিয়ে বসেছে। রুগিপত্র বড়ো একটা হয় না। দুচারজন গল্পবাজ বুড়ো এসে বসে আড্ডা দিতে। আর আসে দীন দরিদ্র দশ পয়সা দু'আনার বাকির খদ্দের কয়েকজন। সকালে একবাটি বার্লি গিলে যতীন ডাক্তার ডিসপেন্সারিতে বসে আছে। সামনে প্রায় ত্রিশবছরের পুরোনো টেবিল তার ওপর ত্রিশ বছরের পুরোনো ব্লটিং পেপার পাতা চিঠিগেঁথে রাখার স্ট্যান্ড, পিচবোর্ডের বাক্স, পুরিয়ার কাগজ রাখার কৌটো, আঠার শিশি, ওষুধের খুদে চামচ--এই সব রাখা। মাছি বসছে উড়ে উড়ে। যতীন ডাক্তার ঘোলাটে চোখে খোলা দরজা দিয়ে বাইরে চেয়ে বসে ছিল। ঘরের সামনেই একটা সুরকির রাস্তা, রাস্তার ধারে একটা বাবলা গাছ। বালির এ অঞ্চলে বাবলা গাছ বড়ো একটা দেখা যায় না। তবু কী করে বালি-দুর্গাপুরে একটা বাবলা গাছ হয়েছে। হলদেটে ছোটো ছেটো তুলির মতো ফুল ফোটে! বাবলার কচি পাতা চিবিয়ে বা রস করে খেলে পেটের ভারি উপকার, বাবলা গাছের ওপাশে আবার বাড়ির এক সার, তার ওপাশে রেলের লাইন। বর্ধমান কর্ড টিপ টিপ করে মাটি কাঁপছে, দূরে মালগাড়ির হাক্লান্ত ঘরঘরে শব্দ উঠেছে। পৃথিবীতে আর কিছু দেখার বড়ো একটা নেই। ফাঁকা ঘরে মাছি উড়ে উড়ে বসছে, নাকের ডগায়, ভুরুতে জ্বালাতন করে খাচ্ছে একটা মাছি। যতবার উড়িয়ে দেয় ততবার এসে ঠিক ওইখানটায় বসে। মাছির বড় জিদ। আজ সকালে কেউ আসেনি। বড়ো ফাঁকা একা লাগছে। কমললতা ওই রাস্তাটা দিয়েই ফিরবে একটু বাদে। ঘরের দরজার বাইরে দাঁড়িয়েই আজকাল জিজ্ঞেস করে যায়--কেমন আছো ডাক্তারবাবু।

যতীন ডাক্তার আজকাল আর উত্তর দিতে পারে না। কমললতার মুখের দিকে চেয়ে চোখে জল এসে যায়। বউ মরেছিল সেই কবে, তার মুখখানা মনেও পড়ে না আর। তিনটে নাবালক ছেলে নিয়ে কী যে বিপদে পড়েছিল তখন। সে সময়ে রুগির ভিড় থাকতে হামেহাল। বড়োবাজারের শেঠেদের দোকান থেকে ওষুধ এনে তা থেকে আবার ওষুধ তৈরি করা। এরারুটের গুঁড়ো বানানো, পুরিয়া করা--অনেক কাজ! ছেলেগুলো ধুলোয় পড়ে কাঁদত। সে সময়ে কমললতা যৌবনের গরবিনি। ঝিগিরি করত বটে, কিন্তু হাঁটাচলায় ভারি একটা মোহ সৃষ্টি করে যেত। যতীন ডাক্তারের বাড়ি ঠিকে কাজ করত, একদিন বলল--ও বাবু তোমার ছেলেদের একদিন ঠিক শেয়ালে নে যাবে। যতীন ডাক্তারের তখন শেষ

যৌবন। কমললতার দুটো হাত ধরে ফেলে বলল--আমার ছেলেগুলো তুই নিয়ে যা কমল। তাতে অবশ্য কমল রাজি হয়নি। তবে একটা বন্দোবস্ত করে ফেললে সে। নিজের একটা অপছন্দের বর ছিল বটে কমললতার, সে উদো মানুষটা ইটখোলার কুলিগিরি, জুট মিলের চাকরি এসব করে টরে অবশেষে সাধু হয়ে গিয়েছিল। লোকে বলে--কমললতার কাম দমন করার মতো পৌরুষ ছিল না বলেই সে নাকি লম্বা দিয়েছিল। তবে আসত মাঝে মাঝে। বাইরে থেকে--'ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ' বলে চেঁচিয়ে জানান দিত। দরকার মতো এক আধ রাত কাটিয়ে যেত বউয়ের সঙ্গে। আর তখন কমললতা বরকে যা-নয়-তাই বলে গুষ্টি উদ্ধার করে দিত। ত্রিশূল ভাঙত, দাড়ি ছিঁড়ত, কমণ্ডলু আছড়ে টোল ধরিয়ে দিত। কিন্তু তবু লোকটা সাধুগিরি থেকে মাঝে মাঝে কী এক নেশায় মাস দু'মাস বাদে এসে হাজির হত ঠিকই। সেই অপছন্দের লোকটাকে যেমন পাত্তা দিত না সে, তেমন আর কোনো পুরুষকেও দিত না। কিন্তু যতীন ডাক্তার তাকে কাবু করে ফেলে। তিনটে ফুলের মতো ছেলে ধুলোয় গড়ায়। কবে এসে হুলো বেড়াল গলার নলি কেটে রেখে যায়, দেখবে কে? ডাক্তারের বিয়ে করারও ফুরসৎ নেই আর একটা। আর দেবেই বা কে? কমললতা তাই একদিন ঠিকে থেকে স্থায়ী ঝি হয়ে গেল এ বাড়ির। প্রথম প্রথম আলাদা ঘরে ছেলেদের নিয়ে শুত সে। তারপর ব্যবস্থা পালটাল। ডাক্তারের সঙ্গে বিছানাটা এক হয়ে গেল একদা। লোকে কু বলত। কিন্তু বলা কথায় কী আসে যায়। কোনো অনুষ্ঠান ছাড়াই কমললতা হয়ে গেল ডাক্তারের বউ! অবশ্য বউয়ের মতো থাকত না। ঝিগিরিই করত বরাবর! ছেলেরা নাম ধরে ডাকত, তুই তোকারি করত।

বিশ পঁচিশ বছর কেটে গেছে। এই সংসারের সঙ্গে জান লড়িয়ে দিয়েছিল সে। ছেলে মানুষ করা, সংসার সামলানো, ডাক্তারির সাহায্য। সব। ঝিয়ের মতো থাকত, কিন্তু তার কথাতেই চলত সংসার। ডাক্তার সোনাদানা, শাড়ি কাপড় দিয়েছে ঢেলে, কখনো কুকথা বলেনি, আদর করেছে খুব। শরীর উস্কালে রাত জেগে বসে থেকেছে। সাধু অবশ্য এ সংসারেও হানা দিয়েছিল। সে কী চোটপাট হম্বিতম্বি, পুলিশের ভয় দেখানো! কিছু চেলা-চামুণ্ডা নিয়ে এসে হামলারও চেষ্টা করেছিল। ডাক্তার ভয় খেয়ে গিয়েছিল। কমললতা ভয় খায়নি। শুধু একবার দু চোখ মেলে খর দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে ছিল সাধুর দিকে। তাইতেই

সাধুর বুক চুপসে যায়। আসত বটে তার পরেও, তবে ভিক্ষে বা সিধে নিয়ে যেত, আর কিছু চাইত না।

কমললতা ভেবেছিল, এরকমই দিন যাবে। এখটা জীবন আর ক'দিনের। মানুষ তো টুকুস করে মরে যায়। কিন্তু দিন যায়নি। ছেলেরা বড়ো হয়ে বুঝতে শিখে আপত্তি শুরু করে। এরকম সম্পর্ক নিয়ে বাপের থাকা চলবে না। সম্মান থাকে না। ঝঞ্ঝাটের শুরু তখন থেকেই। সেটা চরমে ওঠে বড়ো ছেলের বিয়ের পর। বড়ো বউ বিয়ের পর এ বাড়িতে ঢুকেই যেন সাপ দেখল। এক বছর ঘুরতে না ঘুরতেই বলতে থাকে, আমার বাবা বলেছে, এখানে রাখবে না। এ হচ্ছে নিশ্চরিত্র জায়গা, নরক। স্বামীর ঘর করার সুখের চাইতে বাড়িতে থাকার দুঃখেও সোয়ায়স্তি আছে। হরিচরণ আর বিষ্ণুচরণও খেপে গেল হঠাৎ। এক ব্রহ্মচরণ মা বলে ডাকত তাকে, সে বুক দিয়ে ঠেকাত। কিন্তু হাউড়ে ছেলে, বাইরে দাঙ্গাবাজি করে বেড়ায়, ঘরে থাকে কতক্ষণ? ডাক্তারও বুড়োবয়সে ছেলেদের সঙ্গে এঁটে ওঠে না। তবু ব্রহ্মচরণ বেঁচে থাকা অব্দি ছিল কমললতা! তারপর বেরিয়ে যেতে হল। ইটখোলার দিকে আবার ঘর নিয়েছে সে। বুড়োবয়সে সে এখন পাঁচবাড়ি ঠিকে ঝির কাজ করে খায়। একটা ছোট্ট বোনপোকে এনে রেখেছে, সেই দেখাশোনা করে।

মায়া তো যায় না। রোজ তাই বাইরে থেকে একবার কি দুবার খোঁজ নিয়ে যায় সে ডাক্তারের।

সারাদিন ওইটুকুরই অপেক্ষায় থাকে ডাক্তার। এই একা ফাঁকা বিশ্ব সংসারে ওই কমললতা ছাড়া আর কেউ বন্ধু নেই।

মাছিটা উড়ে উড়ে এসে ভ্রূতে বসছে। সুড়সুড়ি পায়ে নাক বেয়ে নেমে আসে। উড়িয়ে দেয় ডাক্তার। আবার টক করে এসে নাকের ডগায় বসে। নড়ে চড়ে হাঁটে। সকাল বেলাটা কেমন আঁধার আঁধার মতো লাগে। নিঃশব্দ ঘরে শ্বাস পড়ে শ্বাস ওঠে। ভগবান।

হরিচরণ মাড়োয়ারি ফার্মে কাজ করে। সকালে যেতে হয়। দেরি হয়ে গিয়েছিল। এই সময়টায় মেজবউ নারায়ণী কখনো কাছে যদি থাকে। ঠিক পালিয়ে বেড়াবে। নিজেকে দুর্লভ করার ওই হচ্ছে তার কলাকৌশল। পুরুষমানুষকে জ্বালাতন করে না খেলে আর

মেয়েছেলের কাজ হয় না? দুবার তিনবার 'ক-উ ক-উ' ডাক ডাকল সে। এই ডাকে দুটো কাজ হয়। বউকে জানান দেওয়া হয়, আবার বড়ো বউকে জ্বালানোও হয়। ডালশুখো আর কাঁচা পেঁয়াজ-লঙ্কা দিয়ে ফ্যান্সা ভাত খেয়ে টকচা ঢেঁকুর তুলে হরিচরণ বিরক্ত হয়ে বসে থাকে। মুখখানা না দেখে বেরোই কী করে। দিনটাই খারাপ হয়ে যাবে। কুমু আর রাখু দাদার দুই ছেলেমেয়ে হল্লা চিল্লা করছে পাশের ঘরে। বিরক্ত। মেজাজ খারাপ থাকলে শব্দ সহ্য হয় না। 'অ্যা-ই' বলে একটা ধমক দিল এঘর থেকে--লেখাপড়া ফেলে হচ্চেটা কী? শব্দটা বন্ধ হলে আবার একটা 'কু-উ' ডাক ছাড়ে সে।দভ্র"

বড়ো বউ বোধহয় শুনতে পায়। খেঁকিয়ে ওঠে সুধাকে, তোমার আক্কেল দেখে মরে যাই। ইস্টলের বাসন কেউ ছাই দিয়ে মাজে? দেখ তো দাগ ধরে গেল কেমন?

হরিচরণ একটু হাসে। বড়ো বউয়ের মেজাজ ভাল নেই। ডালশুখোটা আজ মেখেছিল নারায়ণী! একটু হিঙের গুঁড়ো দিয়ে তেলে উলটেপালটে বাসি ডালটার দিব্যি তার করেছিল। বড়ো বউ খাওয়ার সময়ে জিজ্ঞেস করল--কেমন ডাল শুখো খাচ্ছো গো, মেজদা?

বেশ।

তার আর কথা কি! কথাতেই বলে--বৌ রেঁধেছে মুলো, খেলে লাগে তুলো তুলো।

আসলে নারায়ণী নিজের হাতে বরের ডালশুখো করেছে বলে রাগ। হিন্দ মোটরের মেকানিক বিষ্ণুচরণ যখন সাঁঝের ঘোরে এসে আজ পেটাবে তখন কেঁদে কেটে রাগ পড়বে।

কিন্তু বৌটা যে কোথায় গেল?

মেজ বৌ শাকের খেতে সাপ দেখেছিল। সুষনি শাক অযত্নে হয়ে আছে। এ সময়টায় জিভের স্বাদের কোনো ঠিক থাকে না। ফোটা ভাতের গন্ধে বমি আসে, আবার চামড়া পোড়া গন্ধ পেলে বুক ভরে দম নিতে ইচ্ছে করে। এই এই শীত আসি-আসি শরৎকালটা বড্ড ভালো! আকাশ কেমন নীলাম্বরী হয়ে আছে। গাছপালার রং ধোয়ামোছা ঝকঝকে! রোদ এখন ওস লাগে।

শীত রোদে নিশ্চিন্তে দক্ষিণের বাগানে সুষনি শাক তুলছিল মেজবউ, লোকটা এখন বেরোবে। ফুঁসছে। তবু এখন কাছে যাবে না সে। অত বউমুখো, মেনিমুখো কেন যে লোকটা! বড্ড লজ্জা করে নারায়ণীর। বিয়ের পর যেমন তেমন ছিল, কিন্তু পেটে বাচ্চা আসার পর এখন চক্ষুলজ্জা বলে বস্তু নেই। দিনরাত পারলে হামলায়।

এইসব ভাবতে ভাবতে ঘাসজমি, আগাছার মধ্যে সুষনির পাতা ডাঁটা টুকুস টুকুস করে ছিঁড়ছিল। মাঝে মাঝে চোখ তুলে দেখছিল চারিধারে। অনেকখানি দূর পর্যন্ত দেখা যায়। আকাশ যেমন নীল। গাছ যেমন সবুজ। দুটো চারটে ঘুড়ি উড়ছে আকাশে ওই উঁচুতে চিল। ছাতারে উড়ে যায় একটা। কালচে একটা কুবো পাখি কালকাসুন্দের ডালে হাঁটছে। 'বুক বুক বুক বুক' করে একটা মন খারাপ-করা ডাক ডাকছিল একটু আগেই।

একটা টসটসে ডগা ছিঁড়তে হাত বাড়িয়েই মেজো বউ ঘাসের মধ্যে চকরাবকরা দেখতে পায়। প্রথমটায় যেন গা নড়ে না, পা চলে না। সারা গায়ে শিরশিরানি। রোঁয়া দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। লকলকে শরীরটা এঁকেবেঁকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। লম্বা ঘাসে হারিয়ে আবার জেগে উঠছে।

সাপ ! সাপ ! বলে চেঁচিয়ে বাগানের ফটক পার হতে গিয়ে আঁচল আটকে পড়ে গেল মেজ বউ! পড়ে কিছু টের পায় না। কোনো ব্যথা না, জ্বালা না। কেবল বুকটা হাহাকারে ভরে দিয়ে যায় এক আতঙ্ক। ছ'মাসের বাচ্চা যে পেটে! কী হবে ভগবান!

কেঁদে ওঠে মেজোবউ।

বড়ো বউ স্তম্ভিত হয়ে যায়। নড়ে না। দাঁড়িয়ে আবার থরথর করে বসে পড়তে থাকে ভীতু, বউ-সর্বস্ব হরিচরণ। কলতলায় একটা বাসন আছড়ে ছুটে আসে সুধা। আর আসে কমু রাখু।

বাঙ্গালীয়া দুধ দিয়ে ফিরে যাচ্ছিল। বালতিটা রেখে এসে প্রথম ধরে নারায়ণীকে। বলে ক্যা হুয়া? সাপ কাটা হ্যায় কিয়া!

বাঙ্গালীয়ার বেশি বুদ্ধি নেই। সে মেজো বউকে ছুঁয়েই বুঝতে পারে, রূপের আগুনে তার হাত পুড়ে গেল বুঝি। কী ফর্সা, কী নরম, কী সুন্দর! এরকমই হয় বটে বাবুদের বাড়ির

মেয়েরা। নাকি বাঙালি বলেই নরম। নরম শনিচারি কিছু কম নয়। কিন্তু এ তো তুলো। তার ওপর নাক মুখ চোখ আর ফর্সা রঙের কী বাহার।

মেজো বউ তার হাত ছাড়িয়ে নিল। বোকার মতো দাঁড়িয়েই থাকে তবু বাঙ্গালীয়া। খাসজমিতে যেন পুজোর ফুল কে একরাশ ঢেলে গিয়ে গেছে! বউটিকে কতবার দেখেছে সে। ছোঁয়নি। ছোঁয়ার পর সে যেন সব আলাদা রকম দেখে। হাতটা মেখে আছে নরম স্পর্শ।

হরিচরণ আসে। বড় বউ এসে ধরে তোলে নারায়ণীকে। সুধা এসে মাজাটা এর মধ্যেই একটু ডলে দেয়, বলে--ভালো কর, ভালো কর, ভালো কর ভগবান।

আশপাশ বাড়ি থেকে দু চারজন এসে জুটে যায়।

সাপের দাঁতের দাগ অবশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না।

ডাক্তার রাস্তার দিকে চেয়েছিল অপলক। মাছিটা বড়ো জ্বালাচ্ছে। ভোরবেলাটা কেন আঁধার আঁধার লাগছে আজ? ডাক্তার একটা চীৎকার শুনতে পায়, 'সাপ সাপ'! চেয়ারে শরীরটা বাঁ ধার থেকে ডান ধারে মুচড়ে বসে ডাক্তার। পা দুটো তুলে হাঁটু জড়ো করে বুকের কাছে। বাতাসে একটু শীতভাব। সময়টা ভালো না। কে চেঁচাল 'ডাক্তার ডাক্তার' বলে? না, ডাক্তার বলে নয়, 'সাপ সাপ' বলে। মেয়েছেলের গলা। কমল নয় তো!

মাথাটা ভাল লাগে না ডাক্তারের।

পেছনে জোর পায়ে শব্দ উঠে যেন। ডাক্তার ভয় খায় নাতি রাখুকে। মিষ্টি ওষুধের লোভে প্রায়ই এসে চুরি করে শিশিকে শিশি ফাঁক করে দেয়। অ্যাকেসিসের মাদার টিংচার একবার শিশিসুদ্ধ খেতে গিয়েছিল।

ডাক্তার পিছুফিরে দেখে। বেড়ালটা হুশ হুশ করে শব্দ করে। বেড়ালটা সবজে চোখ মেলে তার দিকে চায়। ক্ষীণ একটা শব্দ করে। কমল এদের পালত পুষত। দুটো কমলের সঙ্গে গেছে, আর দুটো রয়ে গেছে। কেউ পালে না, পোষে না, আদর করে না। এরা এমনি থাকে।

বাবা! --একটা বুকফাটা চিৎকার করে কে ঘরে ঢোকে।

ডাক্তার চমকে ওঠে। মাথার মধ্যে একটা আলো যেন ঝলসে উঠেই নিভে যায়। মাছিটা ঠিক বসে আছে ভ্রূর মাঝখানে। নড়ছে হাঁটছে।

--বাবা, শিগগির আসুন।

ডাক্তার বিরক্ত হয়ে মুখ ফেরায়--কে?

আমি হরি।

ও! চেঁচিও না।

চেঁচাব না কী। আপনার বৌমার কী হয়েছে দেখে যান।

তোমরা দেখ গে।

হরিচরণ স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে থাকে। তারপর এই চরিত্রহীন অপদার্থ নাম ডোবানো বুড়োটার প্রতি তীব্র হিংস্র একটা আক্রোশ বোধ করে সে। দুহাতে যতীনের কাঁধ ধরে একটা ঝাঁকুনি দেয় সে।

কী বলছেন?

ওঃ! যতীন নাড়া খেয়ে ভারী ভয় পেয়ে যায়। মাথার মধ্যে লাল আলো নিভে একটা সাদা আলো জ্বালে। আবার সাদাটাও নিভে যায়।

শিগগির আসুন।

কোথায়?

আপনার বৌমাকে সাপে কামড়েছে।

ভিতরে একটা হুলস্থুলের শব্দ হচ্ছে! সেই শব্দ থেকেই বডবউ গলা তুলে বলে--সাপে কামড়াল কোথায়! কামড়ায়নি! পড়ে গেছে বাপু।

হরিচরণ বাবাকে একটা খোঁচা দেয়--পড়ে গেছে। বাচ্চাটা নষ্ট হতে পারে। আসুন।

পড়ে গেছে! যতীন বড়ো বড়ো চোখ করে চারদিকে চায়। শালার মাছিটা। ঠিক বসে আছে এখন নাকের ডগায়। ছাড়ছে না। যতীন বলে--কী করব!

একটু দেখুন।

ডাক্তার ডাকো।

ডাকতে পাঠিয়েছি। সে তো দু মাইল দূর থেকে আসতে যেতে তিন ঘন্টা। তার মধ্যে কিছু যদি হয়ে যায়।

ডাক্তার ভাবে ওষুধের নাম কিছুই মনেই পড়ে না। অনেক ভেবে বলে--থুজা টু হানড্রেড।

কী বলছেন?

উঁহু। ডানদিকে ব্যথা তো? লাইকোপোডিয়াম দেওয়াই ঠিক হবে।

ডানদিকে না কোনদিকে কে জানে। আপনি আসুন।

ছেলের দিকে ভীত চোখে চেয়ে থাকে ডাক্তার। বলে--আমি কিছু জানি না বাপু, আমার কিছু মনে পড়ছে না।

তার হাত ধরে একটা হেঁচকা টান দিয়ে হরিচরণ বলে-- তা বলে একবার চোখে এসে দেখবেন না। আপনারই তো ছেলের বউ।

বিড়বিড় করে ডাক্তার বলে--ছেলে না ইয়ে। তোমরা আমার কেউ না। বলতে বলতেও ডাক্তার সঙ্গে সঙ্গে যায়। হ্যাঁচকা টানে বুকের বাঁ দিকে একটা খিঁচ ব্যথা ওঠে। মাথাটা দুটো টাল খায় আলোটা দপ করে জ্বলে ফুস করে নিভে যায়।

ভিতরের ঘরে লোকজন জুটেছে মন্দ নয়। মেজো বউ শুয়ে আছে খাটে। কোঁকাচ্ছে। শ্বাসকষ্টের কোঁকানি, চোখের তারা স্থির। মুখে গাঁজলার মতো কষ গড়াচ্ছে। বিড়বিড় করে যতীন ডাক্তার বলে--নাক্স ভমিকা টু হানড্রেড! শিগগির। হরিচরণ ছুটে যাচ্ছিল ডিসেপেনসারিতে ওষুধ আনতে।

ডাক্তার মাথা নেড়ে বলে--না। ভুল।

তবে?

সালফার থার্টি।

কী সব বলছেন?

ভুলে যাই যে বাবা।

হরিচরণ কি করবে ভেবে পায় না। হাঁ করে চেয়ে থাকে অপদার্থ বাপের দিকে। যতীন ডাক্তার বিড়বিড় করে বলে, পুত্র আর মূত্র একই পথ দিয়ে আসে। বুঝলে? পুত্র যদি পুত্রের কাজ না করে তো সে মূত্র। না কী?

কথাটা অবশ্য হরিচরণের কানে যায় না। কিন্তু সে লক্ষ করে এই দুঃসময়েও তার বাবা বিড়বিড় করে বকছে। এরকম কখনো করত না তো বুড়ো। পেগলে গেল নাকি!

বাঙ্গালীয়া বাঁহাতে খৈনির গুঁড়োর ওপর ডান হাতে একটা আনন্দিত চাপড় মারে। কনুইয়ের ভাঁজ থেকে দুধের খালি বালতি ঝুলছে, মনে অনেক আশ্চর্য আলো এসে পড়েছে আজ। ভারী অন্যমনস্ক সে। একটা দেশওয়ালি গান গুনগুন করে গায় সে। হাতে একটা নরম স্পর্শ লেগে আছে এখনও।

কমললতার সঙ্গে দেখা।

ক্যায়া হো কমলদিদি।

ও বাড়িতে কী হয়েছে রে বাঙ্গালু?

সাপু কাটা নেহি। গিরে পড়ল।

কে?

বহুজি। যান না, দেখিয়ে আসেন।

বিপদে বারণ নেই। কমললতা তাই এদিক ওদিক একটু দেখে নেয়। ভয় করে। পঁচিশ বছর কাটিয়েও ভয়। তবু সে ঢুকে পড়ে।

কী হয়েছে?

বলে সে সোজা ঘরে ঢুকে যায়। কেউ কিছু বলে না, বারণ করে না। সাহস পেয়ে কমললতা বিছানার কাছে উপুড় হয়ে দেখে নারায়ণীকে। মুখটা তুলে বলে--বড়োবউমা একটু গরম জল করো, আর মালসায় একটু আগুন। এ কিছু না। ঠিক হয়ে যাবে।

কেউ কিছু বুদ্ধি খুঁজে পাচ্ছিল না। কমললতার কথায় যেন বিশ্বাস খুঁজে পায় সবাই। বড়বউ ধেয়ে যায় রান্না ঘরে। চোখের জল মুছে, উনুন থেকে হাঁড়ি নামিয়ে জল চাপায়।

কমললতা সাহস পেয়ে মেজো বউয়ের মাথা কোলে নিয়ে বসে হাওয়া করে। বহুকাল বাদে নিজের হারানো জায়গাটা যেন পেয়ে গেছে কমললতা। হরিচরণকে ডেকে বলে--তোর বাপের ঘর থেকে অ্যালকোহল দশ ফোঁটা একটু গরম দুধে দিয়ে নিয়ে আয়।

হরিচরণ কমললতার দিকে এক পলক চায়। চোখে কি ফোটে কে জানে! তারপর বাপের ঘরের দিকে চায়!

যতীন ডাক্তার খাটের বাজু ধরে দাঁড়িয়ে চেয়েছিল। মেজো বউয়ের দিকে নয়। মেজো বউ বা পৃথিবী আর কিছুর কোনো অস্তিত্বই তো নেই। সে চেয়েছিল কমললতার দিকে। কাম কবে মরে গেছে, যৌবনের প্রেম বলতে কিছু নেই এখন। কিন্তু বুক জুড়ে আছে সহবাস। সে বিড়বিড় করে ডাকে--কমল, কমল, কমল বড়ো একা ফাঁকা জগৎ। থাকো। এখানেই কেন থাকো না! থাকো।

কমললতা যতীনের দিকে চায়। বুড়োটার চোখ ঘোলাটে লাগে যে? বিড়বিড় করে কী বকছে। আহা, ওরা কি আর যত্ন করে?

সন্ধের দিকেই ঠিক হয়ে যায় মেজো বউ। ডাক্তার দেখে গেছে। বলছে, গাইনির ডাক্তার দেখাতে। তবে ভয় নেই। বিকেলের দিকে মেজো বউ ওঠা-হাঁটাও করল খানিক। চুল বাঁধল, হাসল। হরিচরণ গেছে কলকাতা থেকে বউয়ের জন্য বলকারী ওষুধ আনতে।

সারাদিন কমললতা আজ এ বাড়িতে রয়ে গেল। মেজো বউয়ের কাছেই রইল বেশিক্ষণ। যতীন ডাক্তার ডিসপেন্সারিতেই আগাগোড়া বসে আছে আজ। ভাত খেতে বসে অর্ধেক খেয়ে উঠে গেল দুপুরে। শরীরটা খারাপ না কি! কমললতার বুকের মধ্যে কেমন করে। তিন-চার দিন আগে খবর এসেছে, সাধু মানুষটা মরেছে কুলটির হাসপাতালে।

একটু কেঁদেছিল কমল। কান্নাটা মেয়েদের রোগ, নইলে সে মানুষের জন্য কান্নাই কি, দুঃখই কি! কমললতা ভালোবাসা যা পেয়েছে তা এই যতীন ডাক্তারের কাছে। কাছে যাবে সে উপায় নেই। কে কী বলে! বাড়ি থেকে বেরই করে দিল হয়তো। এ বাড়ির বাতাসে শ্বাস না নিয়ে বুক মরুভূমি হয়ে থাকে। সাধুটা মরে গেল! ডাক্তারও কেমন যেন করছে। তাই এ বাড়ি ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছিল না আজ। মেজোবৌয়ের সেবার নাম করে সারাটা দিন থেকেছে। বড়ো বউ ডেকে দুমুঠো খাইয়েছে দুপুরে। সে কথা ভাবতেই মনটা ভালো লাগে।

সন্ধের পর একটু ফাঁক পেয়েই কমললতা বুড়োমানুষটার ঘরে আসে। ডিসপেন্সারি থেকে উঠে এসে কখন বিছানায় শুয়েছে। লন্ঠনের আলোয় কমললতার মুখের দিকে চাইল। বলল--মাছিটা কেবল বসছে।

কোথায় মাছি?

কপালে। সকাল থেকে উড়ে উড়ে বসছে!

কমললতা কপালটা দেখে। বলে--নেই তো।

আছে।

কমললতা যতীন ডাক্তারের মুখখানা দেখে ভালো করে। চোখ ঘোলা আর লালচে। শ্বাস গরম। কপালে হাত চেপে ধরলে বোঝা যায়, শিরার মধ্যে রক্ত লাফাচ্ছে।

কমল বলে--আমি কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।

তুমি থাকো।

থাকার জো কী? বিষ্ণুচরণ এলেই তাড়াবে।

না। তুমি থাকো।

আচ্ছা। শরীরটা কি খারাপ।

না। বড়ো একা লাগে।

একা কেন? সবাই রয়েছে।

কেউ নেই।

কমললতার চোখে জল আসে। গাল বেয়ে নামে। নাকে সর্দি টানার শব্দ হয়। একটা গাঢ় শ্বাস ফেলে সে। সংসার বড়ো মায়াহীন।

ডাক্তার দেখে কমললতা চাঁদকে লন্ঠনের মতো ধরে আলো দেখাচ্ছে। ডাক্তার ওঠে। বলে--দাঁড়াও ওষুধ বানাচ্ছি।

বানাও।

এ ওষুধে দুজনের সব সেরে যাবে, বুঝলে কমল?

জানি। তুমি ধন্বন্তরী।

ডাক্তার জ্যোৎস্নার লন্ঠনে কমললতার সঙ্গে পথ চিনে বাগানে যায়। ফুল তুলে আনে। চুপিচুপি ডিসপেনসারিতে ঢোকে দুজন। ডাক্তার একটা ঝিনুকে ফুল টিপে মধু ফেলে ক ফোঁটা। একটু জ্যোৎস্না মেশায়। একটু চোখের জল তার সঙ্গে। আর দুফোঁটা অ্যাকসিস।

অমৃত। ঝিনুকটা তুলে ডাক্তার বলে।

জানি।

দুজনে খাই, এসো।

স্বপ্নটা ভেঙে যায়। ডাক্তার জাগে। কেউ কোথাও নেই। মাথার মধ্যে তীব্র যন্ত্রণা সব বোধ গুলিয়ে দেয়।

যতীন ওঠে। তারপর শূন্য ডিসপেনসারিতে গিয়ে ঢোকে। অন্ধকার। খোলা জানলা দিয়ে দুধের মতো জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে ঘর।

আধছায়ায় যতীন ডাক্তার উলটোদিকের চেয়ারটায় গিয়ে বসে। তারপর নিজের বসা শূন্য চেয়ারটার দিকে চেয়ে বলে--ডাক্তারবাবু, আমার বড়ো অসুখ। বড়ো অসুখ।

হরিচরণ তখন বউকে জড়িয়ে আষ্টে-পৃষ্টে হাতে পায়ে বেঁধে রেখেছে। নারায়ণী ঘুমের মধ্যে ঠেলা দিয়ে বলে--আঃ, দম আটকে মারবে নাকি বাপু?

হরিচরণ ঘুমচোখ বলে--তুমি যা দুষ্টু হয়েছো।

উঃ সরো বাপু। গরম লাগছে।

হরিচরণ বলে--তোমার জন্যে সবসময়ে ভয়ে ভয়ে থাকি।

নারায়ণী পাশ ফিরে বলে--ইঃ।

তখন হামলে তাকে আদর করতে থাকে হরিচরণ। বাধা মানে না।

বিষ্ণুচরণ বৌয়ের গা-ঘেঁষা ভাব পছন্দ করে না। লাইনের ওধারে তার আবার মেয়েছেলে রাখা আছে। এক কাতে শুয়ে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। কাঁচা ঘুমটা ভাঙিয়ে বউ বলল--কমল কিন্তু অনেক সেবা টেবা করেছে।

করুগগে। আর ঢুকতে দিও না।

মায়া পড়ে গেছে তোমাদের ওপর।

হুঁ। শেষমেশ বাড়ির অংশ চাইবে। তাছাড়া কলঙ্ক। আপদ যখন বিদেয় হয়েছে, আর না।

কোলে পিঠে করেছে তোমাদের।

খুব দরদ যে!

বলছিলাম মাঝে মধ্যে আসে যদি আসুক।

--উহুঁ। ফের যদি ঢুকতে দাও তো তোমার কপালে কষ্ট আছে।

--কিন্তু ওকে ছাড়া বুড়োমানুষটা যে থাকতে পারে না।

বিষ্ণুচরণ ঝাঁকি মেরে ওঠে--পারে না! অ্যাঁঃ। এই বুড়ো বয়সেও রস আছে নাকি?

ভয় খেয়ে বড়ো বউ চুপ করে যায়।

ডিসপেনসারি থেকে উঠে নিজের ঘরে আসে যতীন। আবার ডিসপেনসারিতে যায়। তারপর বেভুল হয়ে এ-ঘর ও-ঘর ঘুরতে থাকে হারানো শিশুর মতো। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে একটু কাঁদে। মাছিটা উড়ে উড়ে বসছে ভ্রূতে, নাকে, কপালে সুড়সুড়ি পায়ে হাঁটছে, যতীন ডাক্তার চারধারে পৃথিবীর রহস্যটা গুলিয়ে ফেলতে থাকে। চাঁদের আলো, গাছপালা,

ঘরদোর--সবকিছুই অবোধ চোখে দেখে। বিড়বিড় করে বলতে থাকে--কমললতা মা, মা গো, কমলমা, মাছিটা তাড়িয়ে দাও...মাছিটা তাড়িয়ে দাও...মা...

ভেলা

বিশ শো পঁচাত্তর সালের ফেব্রুয়ারি মাসের এক সকালে আচমকা কোকিলের ডাক শোনা গেল।

ধরিত্রী তার দুশো তলার ওপরকার ফ্ল্যাটের ঘরদোর পরিষ্কার করছিল। তার হাতে একটা টর্চের মতো ছোটো যন্ত্র। সুইচ টিপলে যন্ত্র থেকে একটা অত্যন্ত ফিকে বেগুনি প্রায় অদৃশ্য রশ্মি বেরিয়ে আসে। সেই রশ্মি চারদিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ফেললেই ঘর পরিষ্কার হয়ে যায়, জীবাণু থাকে না। ঘর জীবাণুমুক্ত করার পর দেয়ালে একটা সুইচ টিপল ধরিত্রী। কোনো শব্দ হল না, কিন্তু ছাদের গায়ে লাগানো মৌচাকের মতো একটা যন্ত্র জীবন্ত হয়ে উঠল ঠিকই। দুশো তলার ওপরে বদ্ধ ফ্ল্যাটে কোনো ধুলোবালি নেই। তবু ওই যন্ত্রটা তার প্রবল বায়বীয় প্রশ্বাসে ঘরের যাবতীয় সূক্ষ্ম ধুলোময়লা টেনে নিতে লাগল।

এইসব ঘরের কাজ শেষ করে ধরিত্রী তাদের খাওয়ার ঘরে এল। খাওয়ার ঘরের উত্তরদিকে দুটো দরজা। একটা দরজা ধরিত্রী হাত দিয়ে ছোঁয়ামাত্র সরে গেল দেয়ালের মধ্যে। ওপাশে অবিরল একটা কনভেয়ার বেল্ট বয়ে যাচ্ছে। খুব ধীর তার গতি। তার ওপর থরে থরে খাবার সাজানো। যা খুশি তুলে নেওয়া যায়। একরাশ ডিম চলে গেল, এক ঢিবি মাখন, কিছু আপেল--একটার পর একটা। ধরিত্রী খুব বিরক্তির সঙ্গে চেয়ে রইল। অন্তহীন খাবার বয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কোনোটাই তার ছুঁতে ইচ্ছে করল না। দরজাটা বন্ধ করে সে দ্বিতীয় দরজাটা খুলল। দরজার ওপাশে অগাধ শূন্যতা, দুশো তলার ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত একটা ভারী বাতাস থম ধরে আছে। ধরিত্রী একটু ঝুঁকে চারদিকে তাকাল। জলে যেমন নৌকো ভাসে তেমনি বাতাসে ইতস্তত কিছু ভেলা ভেসে বেড়াচ্ছে। সেই বাতাসি ভেলার একটা খুব কাছ দিয়েই ভেসে যাচ্ছিল, তাতে এক বুড়ো হালের মতো একটা যন্ত্রের

হাতল ধরে বসে আছে। লোকটা একবার ধরিত্রীর দিকে উদাস চোখে তাকাল। ধরিত্রী তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে।

লোকটা হাতলটায় সামান্য চাপ দিতেই ভেলাটা মুখ ঘুরিয়ে ভেসে এল ধরিত্রীর দিকে। ব্যাটারিচালিত ভেলাটায় কোনো শব্দ নেই। নিঃশব্দে স্থির হয়ে হালকা ধাতুর তৈরি সাদা গোল লাইফ বেল্টের মতো দেখতে যানটি দরজার গায়ে লেগে রইল।

বুড়ো লোকটা কথা বলল না, ধরিত্রীর দিকে চেয়ে একটু হাসল মাত্র। খুব নিরাবেগ হাসি। ধরিত্রী বলল--আমার কিছু ফুল দরকার। আসল ফুল।

লোকটা মাথা নাড়াল। তারপর একটু ভারী গলায় বলল--কোন ঋতুর ফুল?

ধরিত্রী একটু ভ্রূ কুঁচকে বলল, এটা তো বসন্তকাল।

লোকটা মাথা নাড়ল--হ্যাঁ।

তাহলে বসন্তের ফুল। কিন্তু আসল ফুল, সিন্থেটিক নয়।

লোকটা হাসল। মাথা নাড়ল। বলল--আমি আসল ফুল জানি। আমি তো উনিশশো পঁচাত্তরের লোক।

ধরিত্রী সামান্য কৌতূহলের সঙ্গে বলল--তাই নাকি! তাহলে তো বেশ পুরোনো হয়েছেন।

হ্যাঁ। লোকটা মাথা নেড়ে বলে, আমার চারবার মৃত্যু হয়েছে। আমার হৃদযন্ত্র, চোখ, ফুসফুস আর লিভার সব ট্রান্সপ্ল্যান্ট করা। মেডিক্যাল বোর্ড থেকে নোটিশ দিয়েছে, আমার ব্রেনটাও এবার ট্রান্সপ্ল্যান্ট করতে হবে। যদি সেটা করতে হয় তবে আমার সব শৈশবস্মৃতি চলে যাবে। আশি নব্বই বছর আগেকার কোনো কিছুই মনে থাকবে না। এমন কি আমার আত্মপরিচয় পর্যন্ত পালটে যাবে। আমি নতুন মানুষ হয়ে যাবো।

ধরিত্রী একটু দুঃখিত হল। লোকটা ভাবপ্রবণ, তাই পুরোনো কথা সব ধরে রাখতে চায়। বলল--উপায় কী বলুন।

লোকটা মাথা নাড়ল, বলল--না, উপায় নেই। কিন্তু তখন আর আসল ফুল কাকে বলে তা বুঝতেই পারব না হয়তো। এক ঘন্টার মধ্যেই ফুল পেয়ে যাবেন।

লোকটা হাতলটা বুকের কাছে ধরে চাপ দিল। ভেলাটা উল্কার মতো ছিটকে বাতাসে মিলিয়ে গেল। ধরিত্রী ঝুঁকে লোকটার গতিপথ লক্ষ করতে গিয়ে টাল সামলাতে পারল না। দরজায় কোনো চৌকাঠ বা হাতল নেই যে ধরবে। ভারসাম্য হারিয়ে পিছলে দরজার বাইরে শূন্যতায় পড়ে গেল। কিন্তু ভয়ের কিছু ছিল না। এখানে ভারী কৃত্রিম বাতাসে আর কমিয়ে রাখা মাধ্যাকর্ষণে কেউ খুব জোরে পড়ে না। ধরিত্রীও পড়ল না। মাত্র তার ফ্ল্যাট থেকে দুতলা পর্যন্ত নিচে ধীরে ধীরে পড়ে গিয়েছিল সে। একটা বাতাসি ভেলা ছুটে এসে তাকে কোলে তুলে নিল। এ ভেলায় একজন যুবক রয়েছে। সে একটু হেসে বলল, কি হয়েছিল?

ধরিত্রী হেসে বলল, হঠাৎ।

যুবকটি মাথা নাড়ল। বুঝেছে।

ভেলাগুলো চমৎকার লাইফ বেল্টের মতো দেখতে হলেও মাঝখানটা ফাঁকা নয়, সেখানে একটা বাটির মতো আধার লাগানো। আর চমৎকার নরম কুশনের তৈর বসবার জায়গা। ধরিত্রী বসল। ভেলাটা ধীরে ধীরে তার ফ্ল্যাটের দরজায় তুলে দিল তাকে। আর তখনই ধরিত্রী কোকিলের ডাক শুনতে পেল। একটা দুটো কোকিল ডাকছে। ধরিত্রী আকাশের দিকে তাকাল। সূর্য দেখা যাচ্ছে, আকাশের নীল প্রতিভাত। কিন্তু সবই দেখা যাচ্ছে একটা অতি স্বচ্ছ ফাইবার গ্লাসের ডোম-এর ভিতর দিয়ে। শহরের সিকি মাইল উঁচুতে ফাইবার গ্লাসের ঢাকনিটা রয়েছে। তাই বাইরের আবহাওয়া কিছুতেই বোঝা যায় না। ঝড় বৃষ্টি টের পাওয়া যায় না। অবশ্য তবু চাঁদ সূর্য তারা দেখা যায়। সবই পরিস্রুত হয়ে আসে। কোনো ক্ষতিকারক মহাজাগতিক রশ্মি এখানে প্রবেশ করতে পারে না, কোনো চৌম্বক ঝড় অলক্ষ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে না। সব বড়ো শহরই ওই ফাইবার গ্লাসের ঢাকনি দিয়ে ঢাকা।

তবু শীত বসন্ত সবই টের পাওয়া যায়। একাটা পরোক্ষ আবহনিয়ন্ত্রক যন্ত্র দিয়ে শহরের আবহাওয়া যথাসাধ্য প্রাকৃতিক রাখা হয়। এমনকী বর্ষায় কখনো কখনো বৃষ্টিপাতও

করানো হয়ে থাকে।

কোকিলের ডাক শুনে একটু অন্যমনস্ক হয়েছিল ধরিত্রী। ভেলা থেকে নামতে গিয়েও একটু থমকে রইল সে। একটা কোকিল উড়ে এসে ভেলার ওপর বসেছে। ধরিত্রী হাত বাড়ালেই ছুঁতে পারে। কোকিলটা মুখ তুলে তাকে বধির করে দিয়ে ডাকতে লাগল। ধরিত্রী পাখিটার দিকে চেয়ে হাসে। পলিথিন আর কৃত্রিম পশম দিয়ে তৈরি এই সব পাখির পেটে যন্ত্র, বুকে ব্যাটারি, মুখে খুদে স্পিকার বসানো। রিমোট কন্ট্রোল বা পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের সাহায্যে এই সব পাখিকে ওড়ানো হয়, ডাকানো হয়। কারণ, অধিকাংশ পাখির প্রজাতিই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। তবু মানুষকে প্রাকৃতিক স্পর্শ থেকে বঞ্চিত না রাখার জন্যই এই সব ব্যবস্থা। নীচের দিকে তাকালে দেখা যায় চমৎকার রাস্তাঘাটের পাশে গাছের সারি। পার্কে সবুজ ঘাস। ওখানে যে কিছু আসল গাছ নেই তা নয়। কিন্তু মাধ্যাকর্ষণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য শহরের যে ভিত তৈরি করতে হয়েছে তাতে গাছ জন্মানো দুষ্কর। তাই শতকরা নব্বই ভাগ গাছই কৃত্রিম। রবার পলিথিন বা ফাইবার গ্লাসের তৈরি। ঘাসও কৃত্রিম। তবু এক যান্ত্রিক কৌশলে ওই সব কৃত্রিম গাছে চমৎকার সব কৃত্রিম মরশুমি ফুল হয়। ফল ফলে। হুবহু আসলের মতো। সেই সব ফুল গন্ধময়, ফল সুস্বাদু। শহরে বসন্তকাল এল।

ভেলা ছেড়ে ধরিত্রী উঠে এল ঘরে। দরজা বন্ধ করে চলে এল শোওয়ার ঘর পার হয়ে তাদের বসবার ঘরে। সেখানে চল্লিশ বছর বয়স্ক বিপুল নামে ব্যক্তিটি বসে আছে। তার মাথায় একটা হেডফোনের মতো যন্ত্র লাগানো। না, যন্ত্রটা কানে লাগাতে হয় না। একটা স্প্রিংয়ে ছোট্ট একটা পিন লাগানো, সেটা ডান কানের ওপরে মাথায় আলতোভাবে স্পর্শ করে থাকে। আর ওই পিনটা পৃথিবীর যাবতীয় খবরের তরঙ্গ মাথার ভিতরে নিঃশব্দে সঞ্চার করে দিতে থাকে। যন্ত্রটার আসল নাম ইনফর্মেশন পিন, সংক্ষেপে ইন পিন। খবরের কাগজ পড়ে বা রেডিও শুনে সময় নষ্ট করার দরকার নেই। চোখ এবং কানকে অন্য কাজে ব্যস্ত রেখেও নিঃশব্দে এবং বিনা আয়াসে, প্রায় অজান্তে মস্তিষ্কের কোষে সব খবর জমা হয়ে যায়। ইন পিন হচ্ছে ইন্দ্রিয়মুক্তির যন্ত্র। চোখ কানকে মুক্ত রেখেই সব জানা যায়।

ধরিত্রীকে দেখে বিপুল যন্ত্রটা খুলে রাখল।

ধরিত্রী মৃদু গলায় বলল, আমি কিছু আসল ফুল আনতে ভেলা পাঠিয়েছি।

বিপুল কিছু অন্যমনস্ক ছিল, বলল, আসল ফুল! কেন?

বাঃ, আজ যে পনেরোই ফেব্রুয়ারি। আজ যে আমাদের--

এইটুকু বলল ধরিত্রী, আর বলল না। বিপুল বুঝল। ভ্রূ কুঁচকে একটু চেয়ে রইল ধরিত্রীর দিকে। তার চোখে মুখে সব সময়ে একটা নিস্তব্ধ উত্তেজিত ভাব। বিপুল ক্ষণকাল চুপ করে থেকে বলে--ধরিত্রী ভেলাওলাকে বলোনি তো যে আজ আমাদের বিবাহবার্ষিকী।

ভয়ার্ত ধরিত্রী বলল, না না। তাই কি বলতে পারি! তারপর ধরিত্রী একটু চুপ করে থেকে বলে, অবশ্য লোকটা আসল ফুল চাই শুনে একটু অবাক হয়েছিল। কিন্তু ভয় নেই, এ লোকটার উনিশ শো পঁচাত্তর সালে জন্ম। শরীরের অনেকগুলো ট্রান্সপ্ল্যান্টেশন। এ লোকটা সন্দেহ করলেও ক্ষতিকর কিছু বলে বেড়াবে না। ও তো মানুষের বিয়ে দেখেছে এককালে। ওর মা বাবারও বিয়ে হয়েছিল। হয়তো ওর নিজেরও।

বিপুল উত্তর দিল না। উঠে জানালার কাছে এল। জানলা প্রায় সব সময়েই খোলা থাকে। একটা দূরবিন তুলে বিপুল নিচেটা দেখতে লাগল। পার্কে কিছু নগ্ন নারী পুরুষ এখানে সেখানে বসে আছে। কাছেই বাচ্চারা খেলছে। একটি রমণী কেবলমাত্র একজোড়া স্কেটিং জুতোর মতো জুতো পায়ে চলে যাচ্ছে। ফুটপাথ চলন্ত। রমণীটি তবু সেই চলন্ত ফুটপাথের ওপর দিয়ে আরো জোরে যাচ্ছে। জুতো জোড়া ইলেকট্রনিক শক্তিতে চলে। রমণীটি হাসছে, চিৎকার করে পথচারীদের কি যেন বলছে। কি বলছে তা অবশ্য বিপুল জানে। ও বলছে, শরীর নেবে? শরীর! পার্কের কাছে এক প্রৌঢ় সেই রমণীটিকে ধরে পার্কের মধ্যে নিয়ে গেল। বিপুল দূরবিন রেখে ঘরের মধ্যে সরে এল।

উনিশ শো নিরানব্বই সালে এই যৌন-বিপ্লবের শুরু। প্রাচীনপন্থীরা এই মুক্তমিলনে বাধা দিতে চেয়েছিল। প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে চলেছিল লড়াই। বিবাহের সঙ্গে বিবাহহীনতার। তারপর একখানা রাষ্ট্রযন্ত্র বিশ শো উনপঞ্চাশ সালে বিবাহ নিষিদ্ধ করলেন। পবিত্র যৌন-বিপ্লব স্বীকৃতি পেল ইতিহাসে। শুধু তাই নয়, নরনারীর দীর্ঘকালীন একসঙ্গে বসবাসও

কার্যত নিষিদ্ধ। কোনোখানে নর বা নারীর মধ্যে দখলদারি প্রবৃত্তি দেখলে তাকে শাস্তিদানের আওতায় আনারও চেষ্টা চলছে।

বিপুল বলল--আমরা দশ বছর একসঙ্গে আছি, না ধরিত্রী?

হ্যাঁ।

বিপুল একটা ছোট্ট বোতাম টিপল। বসবার ঘর আর শোওয়ার ঘরের মাঝখানের অস্বচ্ছ কাচের পাতলা দেয়ালটা নিঃশব্দে মিলিয়ে গেল মেঝের মধ্যে। ফলে দুই ঘর মিলে একটা বিশাল হলঘরের সৃষ্টি হল। বিপুল পায়চারি করতে লাগল। একবার থেমে বসবার ঘরের দেয়ালে একটা চৌখুপির মধ্যে বসানো ট্যাপ থেকে এক পাত্র গরম সবুজ চা ভরে নিল পেয়ালায়। খানিকটা খেল, বাকিটা মেঝেয় ফেলে দিল। ধরিত্রী প্রশ্বাস-যন্ত্রটা চালু করে দিতেই মেঝের তরলটুকু মিলিয়ে গেল। পায়চারি করতে করতে বিপুল বলে, তুমি যখন খাওয়ার ঘরে গিয়েছিলে তখন এনকোয়ারি কমিশন থেকে একটা ফোন এসেছিল। ওরা জানতে চাইছে, আমার এই ফ্ল্যাটে একজন মহিলা দশ বছর যাবৎ বাস করছে কেন। এটা প্রচণ্ড বেআইনি। উপরন্তু ওরা যে পবিত্র যৌন-বিপ্লবের মাধ্যমে যৌনমুক্তি এনেছে সে আদর্শ এর ফলে ব্যাহত হচ্ছে। ওদের নির্দেশ, আমরা যেন অবিলম্বে ভিন্ন হয়ে যাই।

ধরিত্রীর মুখ বিষণ্ন হয়ে গেল। সে বলল, তুমি ওদের বলোনি তো যে তুমি যৌন-বিপ্লবকে যৌনদাঙ্গা বলে আড়ালে বলে বেড়াও!

বিপুল ভ্রূ কুঁচকে বলে--না। তবে ওরা হয়তো কিছু গন্ধ পেয়েছে। ওরা আরো লক্ষ করেছে যে, তুমি আর আমি সব সময়েই জামা-কাপড় পরে বেরোই। ওরা এটাকেও ভালো চোখে দেখছে না। সম্ভবত ওরা শিগগিরই আসবে আমাদের প্রকৃত সর্ম্পক জানতে।

ধরিত্রী চুপ করে রইল।

জানলায় টোকা পড়তেই দুজনে ভয়ংকর চমকে ওঠে। তাকায়। খোলা জানালার বাইরে সাদা গোল ভেলাটা ভাসছে। এক বোঝা রজনীগন্ধা বুকে করে সেই বুড়ো লোকটা দাঁড়িয়ে হাসছে। ওরা তাকাতেই লোকটা ভেলা থেকে জানলায় পা রেখে ঘরের মধ্যে নেমে এল। ধরিত্রীর হাতে ফুলের গোছা দিয়ে বলল--আসল ফুল।

ধরিত্রী ফুলগুলো বুকে চেপে রইল। তারপর উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে থাকল বিপুলের দিকে। বিপুল চিন্তিতভাবে ফুলগুলো দেখছিল।

বুড়ো দুজনের দিকে পর্যায়ক্রমে তাকিয়ে দেখছিল। হঠাৎ একটু হেসে বলল, কোনো বিপদ?

বিপুল মাথা নেড়ে বলে-- আমরা দশ বছর একসঙ্গে আছি। তাই এনকোয়ারি কমিশন আসবে।

খুব খারাপ।

বলে বুড়ো চিন্তিতভাবে মাথা চুলকালো। তারপর বিপুল আর ধরিত্রীর ঘরদোর ঘুরে ফিরে দেখল একটু। কোনো খাটপালঙ্ক নেই। চেয়ার টেবিল বা আসবাবও নেই বললেই হয়। দেয়ালের গায়ে গায়ে কিছু বোতাম ছাড়া কোনো যন্ত্রপাতি দেখা যায় না। অবশ্য বোতাম টিপলেই প্যানেলের ভিতর থেকে সব রকম যন্ত্রপাতি বেরিয়ে আসে। আসবাবপত্রও। বসবার ঘরের এক কোণে কিছু কৃত্রিম ফুল সাজিয়ে রাখা। সে ফুল বাসি হয় না, তাতে চিরস্থায়ী গন্ধ। এমন কি সেই ফুলের আশেপাশে খুদে ব্যাটারিচালিত গোটাকয়েক মৌমাছি আর একটা ফরমায়েশি সাদা প্রজাপতি অনবরত ঘুরে বেড়াচ্ছে। এগুলো ফুলের সঙ্গেই পাওয়া যায়। ওই সব কলের কীটপতঙ্গের আয়ু দীর্ঘ। ব্যাটারি ফুরোলে আবার চার্জ করে নেওয়া যায়। বুড়ো এই সব দেখছিল। হঠাৎ বলল--আমি জানি আপনারা স্বামী স্ত্রী।

বিপুল বলল, চুপ। বোলো না।

ধরিত্রী খুব জোরে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, বলবেই তো। আমি তোমার স্ত্রী, তুমি আমার স্বামী। দশ বছর আগে আমাদের বিয়ে হয়েছিল। আজ আমাদের বিবাহবার্ষিকী।

বাইরে একটা কোকিল ডাকল। যন্ত্রের কোকিল। বুড়ো দুজনের দিকে তাকাল। তারপর দুজনের মাঝখানের শূন্যতার দিকে চেয়ে বলল, আমার মাথাটা একশো বছরের পুরোনো। খুব ধোঁয়াটে। তবু বলি দশ বছর আগে বিয়ে বেআইনি ছিল। মন্ত্র নেই, পুরুত নেই, রেজিস্ট্রার নেই, তবে আপনাদের বিয়ে হয়েছিল কীভাবে?

হয়নি। বিপুল বলে।

হয়েছিল। ধরিত্রী চেঁচিয়ে বলল, আমরা ফুলের মালাবদল করেছিলাম, আর তুমি কয়েকটা সংস্কৃত মন্ত্র বলেছিলে, যেগুলোর অর্থ আমি বুঝিনি। কিন্তু তবু সেটা বিয়েই।

ধরিত্রী!

বিতর্ক শুনে বুড়ো মাথা চুলকোয়। বিড়বিড় করে বলে, আমার হৃদযন্ত্র নতুন, ফুসফুস নতুন, কিন্তু মাথাটা পুরোনো। বড্ড ধোঁয়াটে। কিছু বুঝতে পারছি না। তবে এভাবেও বিয়ে হতে পারে। আগে হত।

এখন হয় না। বিপুল বলল।

ধরিত্রী কথা বলতে পারল না। কিন্তু ফুলগুলি বুকে চেপে রইল। বিপুল তার দিকে চেয়ে বলল ধরিত্রী, আমাদের কিছুই লুকিয়ে রাখা যাবে না। তার চেয়ে তুমি চলে যাও।

বুড়ো মাথা চুলকোচ্ছিল। বিড়বিড় করে বলল, আরো হয়তো পাঁচশ বছর এরা আমাকে বাঁচিয়ে রাখবে। বার বার শরীরের যন্ত্র বদলে দেবে। আমি সব ভুলে যাবো। অন্য মানুষ, ফের অন্য মানুষ হয়ে বেঁচে থাকতে হবে। ভীষণ মুশকিল।

বুড়োর কথা কেউ শুনছিল না। বিপুল চেয়ে আছে ধরিত্রীর দিকে, ধরিত্রী বিপুলের দিকে।

জানলার বাইরে একলা লাল রঙের ভেলা এসে থেমেছে। ভেলার গায়ে লেখা--অনুসন্ধান। ভেলা থেকে চারজন লোক জানলা টপকে ভিতরে এল। এনকোয়ারি কমিশন।

বুড়ো সেই চারজনকে দেখে সরে এল জানলার কাছে। একটু কষ্টে নিজের ছোটো সাদা ভেলাটায় চড়ে বসল। তারপর ভেসে যেতে লাগল। মাথাটা বড্ড ধোঁয়াটে। অনেক কালের কথা জমে পাথর হয়ে আছে। শিগগিরই এই মাথাটা তার থাকবে না। একদম অন্য রকম হয়ে যাবে। বুড়ো ভাবল--আমাকে কোথাও চলে যেতেই হবে। এরা আমাকে কেবলই বাঁচিয়ে রাখবে, যতদিন এদের খুশি। কিন্তু মরাটাও যে ভয়ঙ্কর দরকার তা এরা কবে বুঝবে?

সেই রাতে বুড়ো এখটা চমৎকার স্বপ্ন দেখল। তার বাবা রাস্তা সমান করার রোলার চালাত। ঘট-ঘটাং করে প্রচণ্ড শব্দে সেই রোলারটা পুরোনো পৃথিবীর রাস্তাঘাট সমান করত। বুড়ো দেখল, সেই রোলারটায় সে আবার চড়েছে। প্রচণ্ড শব্দে সে রোলারটা চলছে। সামনে শূন্য প্রান্তর, মাঝখানে অফুরান মুক্তির মতো রাস্তা। পিছনে তাড়া করে আসছে বাতাসি ভেলা, রকেট. সন্ধানী আলো, মৃত্যুরশ্মি। বুড়ো ডাকল--বাবা! রোলার চালাতে চালাতে বাবা একবার পিছু ফিরে চেয়ে বললেন--ভয় নেই! আমরা ওদের ছাড়িয়ে যাবো।

বুড়ো একটু হাসল, তারপর নিশ্চিন্তে চোখ বুজল।

হাওয়া বদলের চিঠি

বুধুয়াকে তোমার মনে আছে কি না জানি না। মনে না থাকার কথা নয়, বছরখানেক আগে সে আমাদের কলকাতার বাসায় চাকরি করত। গোলগাল গাল, গোপাল গোপাল চেহারা, মাত্র দুমাস চাকরি করেছিল আমাদের বাসায়, শেষে, মায়ের জন্য মন কেমন করছে বলে কেঁদে-কেটে চলে গেল। যে দুমাস ছিল তাইতেই বড়ো ভালো লেগেছিল বুধুয়াকে, তুমি ওকে অকর্মা মনে করতে বটে, কিন্তু আমি ওকে পুষ্যি নিতেও রাজি ছিলুম। তুমি ভুলে গেছ কি? কাল হঠাৎ সেই বুধুয়া এসে হাজির। এখানে দেওঘরের কাছাকাছিই যে ওর বাড়ি তা আমার মনেও ছিল না, হঠাৎ দেখে চিনতেও পারিনি, এখন ওর বাড়ের বয়স--তাই মাথায় একটু লম্বা হয়েছে, একটু রোগাও, শুধু মুখের মিষ্টি হাসিটুকু এখনো কি করে যেন শুদ্ধ রেখেছে। আমি যে এসেছি তা জানত না, একদিন বিকেলে যখন বেড়াচ্ছিলুম তখন নাকি দেখেছে আমাকে। তখন ভয়ে এসে কথা বলেনি , খোঁজখবর নিয়ে তবে বাসায় এসেছে। বুদ্ধি দেখ, একবারে শুধুহাতে আসেনি, বৈদ্যনাথের পূজা দিয়ে প্রসাদী প্যাঁড়া এনেছে কিছু আর শালপাতার ঠোঙায় এনেছে ওর মায়ের হাতের তৈরি করা করমচার আচার। জিজ্ঞেস করলুম, প্যাঁড়া আনলি যদি তবে প্রসাদি আনলি কেন? অনেকক্ষণ লাজুক মুখে হেসে মাথা নীচু করে যা বলল তার অর্থ দাঁড়ায় যে এমনি আনলে যদি আমি না নিতে চাই সেই ভয়ে প্রসাদ করে এনেছে--প্রসাদ তো আর ফিরিয়ে দিতে পারব না। কেমন মাথা খেলিয়েছে দেখেছ? শমীক আর খুকু কেমন আছে জানতে চাইল। যখন জিজ্ঞেস করল দেওঘরে কেন এসেছি, তখন একটু মুশকিলে পড়লুম--কি জবাব দিই! তখন ও নিজেই বলল যে আমার চাকর হরিয়ার কাছে নাকি শুনেছে যে আমার অসুখ। আমি ওকে বোঝালুম যে সে তেমন কিছু নয়, একদিন অফিস যেতে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলুম রাস্তায়, তাই দেখেশুনে ডাক্তার বলেছে একটু ঘুরে আসতে, ও চুপ করে শুনল তারপর ব্যথিত মুখে বসে রইল।

তখন আমিই ওকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নানা কথা জিজ্ঞেস করলুম। সিনেমা হলের কাছে পান-সিগারেটের দোকান দিয়েছে--দোকান ভালো চলে, আর শহরের একটু দূরেই ওর গ্রাম--সেখানে ক্ষেতী-গৃহস্থী দেখাশোনা করে ওর মা আর ভাই। খুব লাজুক মুখে জানাল যে কলকাতায় আমাদের বাসায় থাকবার সময় যে বলেছিল বিয়ে করেনি--সেটা মিথ্যে কথা। বিয়ে করেছে দশ বছর বয়সে, এখন পনেরো--কিন্তু এখনো গাওনা হয়নি। আরো নানা কথা বলল, বারান্দায় মেঝের ওপর আমার পায়ের কাছটিতে বসে, আমি ইজিচেয়ারে আধশোয়া হয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিলুম। অধিকাংশই ওপর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা, বারবার বলল বুড়ো হলে ও কোনো আশ্রমটাশ্রমে গিয়ে থাকবে, সংসারে নাকি ওর খুব একটা স্পৃহা নেই। ওর চেহারার মধ্যে এমন একটা সরল সত্য-নিষ্ঠার ছাপ আছে যে কথাগুলোকে হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তুমি সঙ্গে আসোনি কেন সে কথাও জিজ্ঞেস করল, আরও বলল, আমার কোনো কাজকর্ম করে দেবার দরকার থাকলে ও করে দেবে। এ সময়ে বাজার করে হরিয়া ফিরে এলে, তখন আমাকে ছেড়ে দুজনে দেশওয়ালি ভাষায় নিজেদের মধ্যে খানিক গল্প করল। যাওয়ার সময় বলে গেল যে ওর গ্রামে একজন গুণী লোক আছে যে ঝাড়ফুঁক করে, টোটকা ওষুধ দেয়। অনেকের রোগ সে নাকি সারিয়েছে। যদি আমার আপত্তি না থাকে তবে সে একবার সেই গুণীকে ডেকে এনে দেখাবে। আমি হেসে বললুম, আনিস লোকটাকে আলাপ করে দেখবো। রোগ কিছু নেই, তবু এখানে এসে নতুন ধরনের লোকের সঙ্গে আলাপ করতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু বুধুয়ার বোধহয় ধারণা আমার অসুখটা শক্ত ধরনের তাই সে যাওয়ার সময় মাথা ঝাঁকিয়ে বারবার ভরসা দিয়ে বলে গেল যে অনেক শক্ত রোগ সেই গুণী সারিয়েছে।

বুধুয়া চলে গেলে অনেকক্ষণ একা একা বসে ভাবলুম। বুধুয়ার ধারণা যে ভুল তা মনে হচ্ছিল না। কখনো বলিনি তোমাকে, যেদিন অফিসে যেতে গিয়ে বাসের মধ্যে মাথা ঘুরে পড়ে গেলুম সেদিনটায় প্রথমে মনে হয়েছিল নিশ্চিত এটা করোনারির অ্যাটাক। জ্ঞান ফিরে এলে মনে হয়েছিল আমি হয়তো তিন চারদিন বা আরো বেশি অজ্ঞান হয়ে ছিলুম। ক্রমে বুঝতে পারলুম যে এটা ব্লাডপ্রেসার, এবং মাত্র ঘন্টা দেড়েক আমি অজ্ঞান অবস্থায় ছিলুম তখন আমার ভয় কেটে যাওয়া উচিত ছিল। ডাক্তারও অভয় দিচ্ছিল--আমার বয়স মাত্র

তেতাল্লিশ, স্বাস্থ্য ভাল--ভয় কী? এখনো একটা জীবন সামনে পড়ে আছে। কিন্তু কেন জানি না ওর পর থেকেই মনের মধ্যে একটা ভয় ঢুকে গেল। আগে তো কখনো এরকম ঘটনা ঘটেনি--রাস্তায়, ট্রামে-বাসে সব লোক দিব্যি চলাফেরা করছে, মাঝখান থেকে হঠাৎ আমিই অজ্ঞান হয়ে গেলাম কেন? এইসব ভেবে ভেবে কয়েকদিন নিজেকে খুব দুর্বল আর অসহায় মনে হতে লাগল। এতকাল কখনো খুব গুরুত্ব দিয়ে বয়স হয়ে যাওয়ার কথা ভাবিনি। এবার ভাবতে লাগলুম। ভেবে দেখলুম দুটোর কোনোটাকেই তো আমি এড়াতে পারব না! কলকাতায় হাঁপ ধরে গেল। মনে হল বহুকাল কলকাতার বাইরে যাইনি, এতদিন একজায়গায় থেকে মনটা নিস্তেজ, আর নানা বাজে ভাবনার বাসা হয়ে উঠেছে। তাই তোমাকে একদিন বলেছিলাম--চলো বাইরে কোথাও থেকে দুচারদিন বেড়িয়ে আসি। তুমি অবাক হয়ে বললে--ও মা। ভূতের মুখে রামনাম। এতদিন তো উলটো গেয়েছ। শুনে একটু অপ্রস্তুত হয়েছিলুম। বাস্তবিক অফিসে আমার ছুটি জমে জমে পচে গেল, বেড়িয়ে আসা দূরের কথা, একদিন ছুটি নিয়ে বসে থাকতেও ইচ্ছে হয়নি। বেড়াতেই বা কোথায় যাবো। কিন্তু কলকাতা কয়েকদিনেই অসহ্য হয়ে গেল। দু একদিন শমীক আর খুকুকে স্কুল থেকে ছুটি করিয়ে নিয়ে গড়ের মাঠে গিয়ে হুড়োহুড়ি ছুটোছুটি করলুম, জাদুঘর, চিড়িয়াখানা, দক্ষিণেশ্বর নিয়ে গেলুম--ওরাও বাবার কাণ্ডকারখানা দেখে অবাক। কিন্তু এভাবেও আমার বিষণ্ণতা কাটল না। মনে হল দূরে কোথাও যাওয়া একান্ত দরকার, আর যেতে হবে একলা। একলা হলেই নিজের মনটাকে সুবিধে মতো পাওয়া যাবে, তখন দেখা যাবে তার কোথায় কোন কাঁটাটা বিঁধে আছে। শুধু তোমাকে নিয়ে আসা যায় না, তাহলে শমীক আর খুকুকে কে দেখবে? ওদের নিয়ে এলে আবার স্কুল কামাই হয়। একা আসতে প্রথমটায় খারাপ লাগছিল, এখানে এসে কয়েকদিন ভীষণ মন খারাপ লাগল--আগের চিঠিতে সেসব জানাইনি। এমনকি তিনদিন পর একদিন ফিরে যাওয়ার জন্য সব বাঁধাছাঁদা করে ট্রেনে পর্যন্ত উঠে পড়েছিলুম। মধুপুরে ট্রেন থামতে মনে হল বড্ড নাটকীয় হয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা--তা ছাড়া সন্দেহ হল কলকাতায় গেলেই সেই বিশ্রী ভাবনাগুলো আবার ঘাড়ে চেপে বসবে। মধুপুরেই নেমে পড়া গেল, কিন্তু দেওঘরেও ফিরতে ইচ্ছে হল না, ওখান না থেকে হরিয়াকে দেওঘরে ফেরত পাঠিয়ে আমি বেরিয়ে পড়লুম। সাতদিন ধরে নানা জায়গায়

ঘুরে বেড়িয়েছি। কোনো লক্ষ্য স্থির ছিল না, সহযাত্রীদের কাছে যে জায়গার নাম শুনেছি সে জায়গারই টিকিট কেটেছি পরদিন। ভালো করে খাওয়া হয়নি, শোয়া হয়নি, গালে দাড়ি বেড়ে গেছে, শরীর পথের ধকলে দুর্বল তবু ওই সাতদিনে মনের জড়তা কেটে গেল, তাজা লাগল নিজেকে, দেওঘর ফিরেছি দিন চারেক হল। এখন আর খারাপ লাগছিল না। তোমাদের কথা খুব একটা মনে পড়ছিল না।

শুধু বুধুয়া এসে মনটা খারাপ করে দিয়ে গেল। সেই যে ওকে কবে একটু ভালোবেসেছিলুম, ও আসায় সেই ভালোবাসার জায়গায় আবার হাত পড়ে গেল। কাল থেকে আবার তোমাদের কথা তাই ভীষণ মনে পড়ছে। বুধুয়া না এলে এটা হত না। বুধুয়ার সঙ্গে এ ব্যাপারটার সম্পর্ক হয়তো তুমি ঠিক বুঝতে পারছ না! আমিও পারছি না, কেবল মনে হচ্ছে--কী রকম অস্পষ্ট একটা যোগাযোগ হয়েছিল।

আজ তোমাকে কোনো চিঠি লিখবার কথা ছিল না। এই তো তিনদিন হয় তোমাকে চিঠি লিখেছি, এখনও জবাব দাওনি, কিংবা হয়তো তোমার চিঠিও এখন মাঝপথে। তবু লিখতে বসেছি, মনে হচ্ছে তোমাকে কি একটু বিষয় যেন জানাবার আছে, যা রহস্যময় যা অস্পষ্ট। ভয় পেও না--এ তেমন কিছু নয়। আজ বিকেল থেকে মনটা ডানা মেলেছে, উড়ছে, কোনো-ঠাঁই ছুঁতে চাইছে না। বিকেলে আকাশ ঘনঘোর করে এল, বেড়াতে গিয়েছিলুম, মেঘ দেখে বৃষ্টি আসবার আগেই ঘরে ফিরে এলুম, তারপর ইজিচেয়ারে রোজকার মতো না বসে দরজার চৌকাঠের পাশটিতে বসে রইলুম চুপ করে। বৃষ্টি এল। ঘন মেঘের স্নিগ্ধ ছায়া পড়েছে চারধারে, বর্ষার ব্যাং ডাকছে, ঝরঝর জলের শব্দ হয়ে যেতে লাগল। আর কোনো শব্দ নেই। সামনে বাগানে ফুলগাছগুলো, পাতাবাহারের গাছগুলো অঝোর জলধারায় ভিজে যাচ্ছিল। আমার ছোট্ট বাগানটায় বৃষ্টির সে কী মাতামাতি! জলে, মাটিতে, ঘাসে, গাছের পাতায়, ফুলে কেমন যেন একধরনের গভীর ভালোবাসার খেলা চলছিল। দেখতে দেখতে কেমন করে যেন বাগানের গাছপালা, ফুল, লতা-পাতার মতো আমিও আকন্ঠ পান করছিলুম সেই বৃষ্টির জীবনীশক্তি। মন ভরে যাচ্ছিল। ঠিক হয়তো বোঝাতে পারব না, কিন্তু সেই অবিরাম জলধারার দিকে চেয়ে থেকে মনে হচ্ছিল আমার হয়তো উদ্ভিদের মতোই শাখা, কাণ্ড বা শিকড় গোছের কোনো গোপন প্রত্যঙ্গ আছে যা দিয়ে আমি বৃষ্টি থেকে সেই

জীবনীশক্তি আহরণ করেছিলুম। ক্রমে রাত হয়ে এলে যখন আর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না তখন ঘরে এসে এইমাত্র বসলুম ছোট বাতিটি জ্বালিয়ে তোমাকে চিঠি লিখব বলে।

এখনো জলের ঝরে পড়বার শব্দ, ব্যাঙের অবিরাম ডাক শুনতে পাচ্ছি। তুমি হয়তো ঠিক বুঝতে চাইবে না, কিন্তু এখানে আসবার পর যতবার রাত্রিতে বৃষ্টির শব্দ শুনেছি আমি, ততবার মনে হয়েছে যে আমার একটা পূর্বজন্ম ছিল। কিছুতেই বিশ্বাস হতে চায় না যে এজন্মেই আমার শুরু ও শেষ। রহস্যের কথা যে বলেছিলুম তা এই। বোধহয় এইসব অনুভূতির কোনো মূল্য নেই। না থাক, তবু আমার কাছে আজ বৃষ্টি যে প্রিয়, ঘাস ফুল মাটি যে প্রিয়, তার কারণ হয়ে থাক এই রহস্যময় অনুভূতিগুলি। আমি কখনো এ রহস্যের অবসান চাইব না।

দেখ, বৃষ্টি এসেছে বলেই আমার বাগানের গাছগুলোর ওরকম আনন্দ, তারা বাহু মেলে শিকড় ছেঁড়া কাঁপনে কাঁপছে। এই যে ব্যাঙের ডাক, জলের শব্দ শুনছি তাতেও কেমন এক আনন্দের সুর লেগেছে। মনে হয় আবহমান কাল থেকে আমাদের এই বৃক্ষলতাগুল্ম, ওই আপাততুচ্ছ ব্যাংগুলো এই বৃষ্টিকে পৃথিবীতে ডেকে আনছে। তাই বৃষ্টির ভিতরে কেমন একটা ভালোবাসার গন্ধ হয়েছে। এ না হলে ও হয় না, ও না হলে এ হয় না, ভেবে দেখলে, আমরা সবাই যেন এরকম কটা টানক্ষেত্রের মধ্যে রয়েছি।

লিখতে লিখতে মনে হচ্ছে চিঠিটার সুর কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেল। এভাবে কেউ বউকে চিঠি লেখে? কী করে জানব। বরাবর তুমি আমার হাতের কাছেই ছিলে, চিঠি লিখবার দরকার হয়নি তো কখনো। মনে হচ্ছে চিঠির শেষে এবার ঘর-সংসারের কথা কিছু লেখা দরকার। তুমি কেমন আছ আমাকে ছেড়ে তা জানতে ইচ্ছে করছে। শমীক আর খুকু বরাবর আমাকে একটু গম্ভীর বলে জানে, বড়ো একটা কাছে ঘেঁষে না। ভাবছি এবার ফিরে গিয়ে ওদের সঙ্গে একটু বেশি করে মিশব। কী বল?

তোমার একজোড়া চিঠি পেলুম আজ। দ্বিতীয়টা এক্সপ্রেসে এসে প্রথমটাকে ধরেছে। বুঝতে পারছি আমার চিঠি পেয়ে একটু অস্থির হয়েছ। আরও বোঝা যাচ্ছে যে আমার শরীরের জন্য তোমার উৎকন্ঠা তেমন নেই, যতটা আমার মানসিক অবস্থার জন্য আছে।

সন্দেহ হচ্ছে কি যে আমার মাথায় কেমন যেন একটু......? সন্দেহ মাঝে মাঝে আমারও হয়। এতকাল সেই বাসে মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত আমার কাছে সবটাই ছিল একটা খেলার মাঠের মতো--যেখানে দাঁড়িয়ে আমি স্পষ্ট দিনের আলোয় আমার প্রতিপক্ষ সব খেলোয়াড়কেই দেখতে পাচ্ছি, সহযোগীদেরও চিনে নিচ্ছি। কিন্তু জ্ঞান ফিরে আসবার পর থেকে দেখছি দিনের আলোয় সেই মাঠ যতটা স্পষ্ট মনে হয়েছিল এখন আর ততটা নয়। সেই মাঠে যেন এক নিস্তেজ শেষবেলার আলো পড়েছে, বহুদূর--প্রায় সীমারেখাহীন হয়ে বিস্তৃত হয়েছে সেই মাঠ, দূরে দূরে চেহারা নিয়ে কারা যেন দাঁড়িয়ে আছে--তাদের চেনা যাচ্ছে না। সব কেমন যেন পালটে গেল।

তুমি ঠাট্টার ছলে প্রশ্ন করেছ আমি কবি হয়ে যাচ্ছি কি না। তুমি তো গোঁড়া ঈশ্বরবিশ্বাসী, তুমি কি বিশ্বাস কর না যে ঈশ্বর সবকিছুর এবং এমন কি নিজেরও সৃষ্টিকর্তা? তাঁর চেয়ে বেশি কল্পনাপ্রবণ প্রকাশক্ষমতা আর কার থাকতে পারে, তাঁর চেয়ে বড়ো কবি কে? আর যেহেতু তাঁর সেই আনন্দময় কবিসত্তা থেকে আমাদের আত্মা সৃষ্টির হয়েছে বলে আমাদের জনমত রয়েছে, সেই হেতু আমাদের সকলেরই কিছু পরিমাণে কবি হওয়া বাধ্যতামূলক। কোন মানুষ, কোন বৃক্ষ, কোন পশু কবি নয়? আমার মাঝে মাঝে মনে হয় কী জানো? আমি যে ইজিচেয়ারে শুয়ে নানা কথা ভাবলুম আমার সেই সব চিন্তাভাবনার ঢেউ ইজিচেয়ারটা ধরে রেখে ছিল--ঠিক টেপরেকর্ডারেরের মতো। অন্য কেউ যখন এসে সেই ইজিচেয়ারে বসবে তখন ইজিচেয়ারটা সেই ঢেউগুলি বিকিরণ করবে তার বোধ ও বুদ্ধির ভিতর। চমকে উঠো না ইজিচেয়োরাটাকে ওরকম ভাবতে যদি অস্বস্তি হয় তবে সে জায়গায় বাতাস, মাটি, জল কিংবা শূন্যতা ভেবে নিতে পার। যেমন হোক এই ধরনের কোনো মাধ্যমের ভিতর দিয়ে যদি আমার গভীর ও গোপন ভাবনাচিন্তা ও বোধ অন্যের ভিতরে সঞ্চারিত হত যদি আমাদের আবেগ অনুভুতিগুলি এভাবে ভাষায় প্রকাশ করতে না হত তবে আমরা কাউকে কবি বলতুম না, বুঝতুম যে এক ভয়ঙ্কর, উন্মত্ত ও দুর্বার কল্পনাশক্তি থেকে আমাদের সব কিছুর সৃষ্টি হয়েছে বলে আমরা সকলেই কিছু কিছু কবি। কাল রাত্রেও অনিদ্রা পেয়ে বসেছিল, মাঝে মাঝে ওইটাই বড়ো যন্ত্রণা দেয়। কেমন পিপাসা, ভয়, উৎকণ্ঠার এক সংমিশ্রণে শুয়ে ছিলুম গভীর রাত অবধি। তখন বৃষ্টি থেমে জ্যোৎস্না ফুটেছে বাইরে শুনলুম

কুকুর কাঁদছে চাঁদের দিকে চেয়ে থেকে। শিউরে উঠে একবার হরিয়াকে ডাকতে গেলুম, কিন্তু ডাকা হল না। চোখ বুজে আমি শুনতে পেলুম কুকুরের সেই কান্নার সাথে ডানা ঝাপটানোর প্রাণপণ শব্দ উঠছে। অনেকক্ষণ চোখ বুজে রইলুম--বোধ হল সবটাই মনের ভুল--কেউ কাঁদছে না, কেউই উড়ে যেতে চাইছে না। তারপর ক্রমে আস্তে আস্তে বুঝতে পারছিলুম অকারণ চোখের জলে চোখ ভরে আসছে। যেন আমি আর ঘরে নেই, নিশিরাতের পরি আমাকে উড়িয়ে এনেছে, শুইয়ে দিয়ে গেছে শিশিরে ভেজা মাঠের ওপর ম্লান জ্যোৎস্নার ভিতরে। চোখ চেয়ে দেখব দুটো সাদা হাঁস মলিন জ্যোৎস্নাকে গায়ে মেখে নিয়ে উড়ে যাচ্ছে পৃথিবীর সীমারেখা ছেড়ে দূর-নক্ষত্র-মণ্ডলীর দিকে, কিংবা আরো দূরে, যার কোনো সীমারেখা নেই, এমন সমুদ্রের সন্ধানে তারা চলেছে--আর কখনো ফিরে আসবে না। হাঁসের ঘর ভেঙে রক্তমাখা মুখে, গায়ের পালক ঝেড়ে কুকুরটা তাই এসেছে মাঠে দূরতম সেইসব হাঁসের সন্ধানে, তারপর চাঁদও শূন্যতা দেখে কাঁদছে। আমার চোখের ওপর গভীর স্বপ্নের সেই খেলা চলল অনেকক্ষণ।

জানি এ চিঠি পেলে তুমি হয়তো আরও অস্থির হয়ে পড়বে। কিন্তু আর তোমার মতো বিশ্বস্ত কেউ নেই যাকে এসব লেখা যায়। সবকিছুই ভাগ করে নেওয়ার কথা ছিল আমাদের, তাই আমিও চাই আমার অস্থিরতার এইটুকু তোমার ভিতরে সঞ্চারিত হোক।

আজ সকালে চিঠিটা শেষ করিনি, ভেবেছিলাম বিকেলে করব। তাই করছি। আজ বিকেলে বুধুয়া এসেছিল তার সেই গুণীকে নিয়ে। গুণীকে যেমন কল্পনা করেছিলুম তেমন নয়, অর্থাৎ তার একহাতে ঝাঁটা অন্যহাতে সর্ষেপোড়া নেই এবং চোখ রক্তবর্ণও নয়। নিরীহ ভালমানুষের মতো চেহারা, কথাবার্তায় মনে হয় বেশ কিছুটা লেখাপড়া শিখেছে। বয়সও তার অল্প, বোধ হয় তিরিশ। 'আপনি' না 'তুমি' কোনটা বলব তা নিয়ে একটু গোলে পড়লুম, শেষে 'আপনিই' বলতে লাগলুম। সে একসময়ে অনেকক্ষণ আমার দিকে চেয়ে থেকে বলল, আপনার অসুখটা তো মনের।

বললুম, কি করে বুঝলেন?

হেসে বলল, বোঝা যায়। আপনার চোখ সে কথাই বলছে। তারপর আবার খানিক চেয়ে থেকে বলল, আপনার ছেলেমেয়ে দুটি এবং আপনার স্ত্রী আপনাকে খুবই ভালোবাসে, কিন্তু আমার মনে হয় তারা আপনার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারে না।

বোঝো কাণ্ড। তোমরা তো নিশ্চিন্তে আছ, কিন্তু এদিকে তোমাদের মনের কথা ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। একটু চমকে উঠেছিলুম, তবু হাসিমুখে জিজ্ঞেস করি--আমার দুই ছেলেমেয়ে আর একটি স্ত্রী কী করে বুঝলেন? মন্ত্রবলে নাকি?

আবার হাসল--না, বুধুয়া বলছিল আমাকে।

মনে মনেই হো-হো করে হাসলাম। এরা কি তোমাকে বন্ধ্যা মনে করে? বুধুয়া চলে আসার পরও তো এক বছর কেটে গেছে, এর মধ্যে যদি আর একটি হত সে কি হিসেবের বাইরে থাকত। নাঃ, পৃথিবীতে হঠযোগ, মন্ত্র-তন্ত্র এসব কিছুই নেই দেখছি। না থাকলে তো আমারই মুশকিল, কেননা আমাকে অবিলম্বে এই ধরনের একটা আশ্রয় পেতেই হবে, নইলে সেই পুরোনো ভাবনা, চিন্তাগুলো আবার এসে কামড়ে ধরবে।

গুণী বলল--বুধুয়া আপনার কথা সবই বলেছে আমাকে। ও আপনাকে খুব ভালোবাসে। বুধুয়া লজ্জায় মুখ লুকোলো, আমি একটু হাসলুম, কিছু বললুম না। গুণী খানিকক্ষণ আবার চেয়ে থেকে শান্ত গলায় বলল--মনের যে অশান্তি রয়েছে তা সাধারণত কামনা বাসনা থেকে আসে। আপনি বড়ো বেশি চান।

মিথ্যে বলব না, এসব পুরোনো কথায় একটু বিরক্ত হয়েছিলুম, বললুম--কামনা-বাসনা ছাড়া মানুষ হয় না।

সে তেমনি শান্ত গলায় বলল, কিন্তু আপনি চান আরও বেশি। আপনি সুখের চেয়েও বেশি কিছু চান, সে হল শক্তি শান্তি সন্তোষ। এটাই পাওয়া সবচেয়ে কঠিন, এ চাওয়াই সবচেয়ে বড়ো চাওয়া।

তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলুম।

সে বলল, আপনি ঈশ্বরে মন দিন। তাঁর দয়া পেলে সব ঠিক হয়ে যাবে। তিনি দয়া করেন।

হেসে বলি, ঈশ্বরের দয়াকে বিশ্বাস কী করে করব? ঈশ্বরে বিশ্বাস নেই যে।

সে কিছুক্ষণ ভেবে বলল, আপনার প্রিয়জন আছেন জানি, কিন্তু আপনি তাঁদের কতটা ভালবাসেন? তাঁদের জন্য প্রাণ দিতে পারেন?

একটু হকচকিয়ে গিয়ে থমকে একটু ভেবে বললুম--বোধহয় পারি। তোমাদের তিনজনের মুখ ভেবে 'পারি' বলতে ভালোই লাগছিল--যেন সত্যিই পারি।

লোকটা একবার একটু ধোঁয়াটে ভাবে বলল, ভালো করে ভেবে দেখবেন। যদি সত্যিই পারেন, এবং ভালোবাসার জন্যেই পারেন তবে আপনি সব অশান্তি কাটিয়ে উঠবেন।

এরপর ওরা চলে গেল। সাইকোথেরাপির এই গ্রাম্য চেষ্টা দেখে খুব হাসলুম নিজেই।

এবার চিঠি শেষ করি। খুকুকে বোলো ওর কাঁচা হাতের লেখা চিঠিটা পেয়েছি। কিন্তু ওর ভাষাটাও তোমার বলে মনে হল, সে লিখেছে--'বাপি, তুমি অত ভেবো না।' তুমি ওদের কিছু বোলো না, দোহাই, ওরা যা চায় তাই লিখুক। আমি ওদের মনটাকে স্পষ্ট ধরতে চাই।

ধারোয়া নদীর ধার তুমি তো দেখনি। কী সুন্দর। উপত্যকার মতো বহুদুর পর্যন্ত ঢালু হয়ে নেমে গেছে। মাটি শুকনো, গেরুয়া রঙের। কোথাও মাটি রক্তের মতো লাল। মস্ত পাথরের চাঁই মাটিতে গাঁথা। বিকেলের দিকটায় অসহ্য নির্জনতা। হাঁটছি তো হাঁটছিই। শেষবেলার আলোয় আমার মস্ত ছায়াটা কত দীর্ঘ হয়ে হারিয়ে যাচ্ছে। ছায়াটার পিছু পিছু হাঁটছিলাম। যদি আমার ছায়াটার কোনো ইচ্ছাশক্তি থেকে থাকে, যদি থাকে নিজস্ব সত্তা তো নিয়ে যাক আমায় যেখানে তার খুশি। এও এক খেলা। ছায়াটা সব বন্ধুরতা অবলীলায় পার হয়। মস্ত পাথরের চাঙড়, গর্ত, গাছপালা কিছুই তাকে বাধা দিতে পারে না। শরীরী আমার পক্ষে তো তা সম্ভব নয়। শরীরটা যে মস্ত বাধা।

এলোপাথাড়ি হাঁটতে হাঁটতে হাঁফ ধরে গেল। নদীর ধার পর্যন্ত পৌঁছোতে সন্ধে লেগে গেল প্রায়। নদীর ধারে চুপটি করে বসে রইলাম। একটুখানি আলো আর বাকি আছে মাত্র। খুব একটুখানি। চারধারের গাছপালা, মাঠ, নদীর জল তৃষ্ণার্তের মতো সেই শেষ আলোটুকু শুষে নিচ্ছে। দেখতে দেখতে পৃথিবীকে বড্ড অনিত্য বলে মনে হয়। দিনটা যে গেল, এইভাবে রোজ যায়। থাকেনা তো। একটা স্থির সূর্য যদি কেউ আকাশে লাগিয়ে রাখত তবে

কি আমাদের দিন যেত না? বয়স বাড়ত না। যেমন ছিলাম সবাই, তেমনি চিরকাল থেকে যেতাম। ওই যে গতিময় ধারোয়ার জল বয়ে যাচ্ছে, ওর মধ্যেও সেই অনিত্যতার কথা। বয়ে যাচ্ছে, চলে যাচ্ছে। আজ যে এক কোষ জল বয়ে যাচ্ছে, ওর মধ্যেও সেই অনিত্যতার কথা। বয়ে যাচ্ছে, চলে যাচ্ছে। আজ যে এক কোষ জল বয়ে গেল, সে গেল চিরকালের মতোই। ধারোয়া বেয়ে সে আর কোনোদিনই যাবে না এক গতিপথে।

মনটা খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু অস্থিরতা ছিল না। প্রকাণ্ড আকাশের তলায়। ধারোয়ার মস্ত উপত্যকায় বসে থেকে একরকমের মহৎ বিষণ্নতা টের পাচ্ছিলাম। চলে যাওয়াটাই অমোঘ।

নদীর ধার ধরে একটা লোক উঠে এল। ঝোপে কী যেন খুঁজছে। কোনো বুনো লতাপাতা হবে। তার গায়ে একটা হাফহাতা পাঞ্জাবি, পরনে ধুতি, বেশ তেজস্বী চেহারা। দেহাতিই হবে।

এই ভেবে লোকটাকে ডেকে বললুম, ক্যা ঢুঁড় রহে হৈ জী?

লোকটা এক পলক তাকিয়ে একটু হাসল। কাছে এসে বলল, আপনাকে দেখেছি এখানে কয়েকদিন। বাঙালি তো?

বললুম, আজ্ঞে। আপনি এখানেই থাকেন?

বহুদিন হয়ে গেল। ছেচল্লিশ সালের পর থেকেই।

বসল। অনেকক্ষণ দু পক্ষের পরিচয় হল। বেশ লোকটা। পঞ্চাশের ওপর বয়স, কিন্তু সেটা উনি না বললে কিছুতেই বুঝতে পারতুম না, একদম ছেলেমানুষি চেহারা। চাউনিতে এখনো বেশ একটা জীবনীশক্তি। কথায় কথায় বললেন--বয়েস কমানোর ওষুধ জানি না। সারাদিন খাটি, ঘুরি, ঘুমোই মাত্র চারঘন্টা। আহার, নিরামিষ ডালভাত স্বপাকে।

লোকটা ধার্মিক। তাঁর ইষ্টদেবের আশ্রমে থাকেন। তাঁর কাজে জীবন উৎসর্গ করেছেন। একসময়ে মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, নিজের গাড়িটাড়ি ছিল, লম্বা বেতন পেতেন। সব ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছেন, কোনা ক্ষোভ নেই।

জিজ্ঞেস করলুম, ঘর সংসারের কথা ভাবেন না? চলে কীসে?

উনি বললেন, সংসারের সবাই তো এখানেই, ভাবব কেন? ভাবছ তুমি চলবে কীসে, ভাববার তুমি কে? ভাববার যিনি, ভাবছেন তিনি, ভাবো তুমি তাঁকে। এই ছোট্ট ছড়াটা বলে হাসলেন।

রাত হয়ে গিয়েছিল, উনি অন্ধকার রাস্তায় আমাকে বাসা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেলেন, আমি ডেকে একটু বসালাম। উনি চা খান না, অন্যের বাড়িতে আহার্য গ্রহণ করেন না। কী দিয়ে আপ্যায়ন করি। ভারী কাঠখোট্টা খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে, এ লোকটা।

যাওয়ার আগে লোকটা হঠাৎ বলল, কোনো অসুবিধে নেই তো?

না, না। বেশ আছি।

লোকটা চারদিক ঘুরে ঘুরে ঘরদোর দেখল। বলল, আপনি মশাই ঘোরতর স্ত্রৈণ লোক তো, স্ত্রীকে ছেড়ে একা এখানে এসেছেন কেন?

প্রশ্নটা চেপে গিয়ে বললাম, কী করে বুঝলেন যে আমি স্ত্রৈণ?

ঘরদোরের অবস্থা দেখে, ছাড়া জামাকাপড় গুছিয়ে রাখার অভ্যাস নেই, বিছানায় ঢাকনা দেননি, গেঞ্জি কাচা নয়। লক্ষণ দেখলে চেনা যায়। বোধহয় আপনি একটু ভাবুক মানুষও। বলে তিনি ভারী চকচকে চোখে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। আবার ছড়া বললেন--অর্জনে পটু, সাশ্রয়ী কাজে, সুন্দরে সমাপন, এই দেখেই বুঝবি রে তার যোগ্যতা কেমন।

বেশ লাগল লোকটাকে, এখানে আসার পর থেকে কেমন একটি দুটি সহজ দার্শনিকের সঙ্গে আলাপ হচ্ছে। শিখছি। কলকাতায় এরকম মানুষ বড়ো একটা পাই না।

আমার পালে মৃত্যুর হাওয়া লেগেছে। তরতর করে ভাঁটিয়ে যাচ্ছে নৌকো। কাল বিকেলে একটা মৃত্যু দেখলুম।

আমার উঠোনের ধারে একটু বারান্দা আছে। তার কোলে একটা তারাফুলের মরা ঝোপ। একটা মাকড়সা জাল ফেঁদে বসে থাকে, রোজ দেখি। পোকামাকড় পড়লেই জাল নড়ে ওঠে। মাকড়সাটা জলের কাঁপুনি টের পায়। তারপর নির্ভুল লম্বা লম্বা আটটা পায়ে

দুলে দুলে হেঁটে এসে পোকা ধরে। বিকেলে ওই বারান্দায় বসে মাকড়সার জালটা দেখছিলুম। হরিয়া একবাটি মুড়ি তেল দিয়ে মেখে দিয়ে গেছে, বসে খাচ্ছি। হঠাৎ ভাবলুম, মাকড়সাটাকে নিয়ে একটু খেলা করি। একটা মুড়ির দানা তার জালে ছুঁড়ে দিলুম, মুড়িটা আঠালো জালে পড়ে আটকে গেল। কাঁপুনি টের পেল মাকড়সা একটু চুপ করে থেকে লম্বা পায়ে ধীরে হেঁটে এল। শুঁকল, দেখল। তারপর একটা লাথি মেরে মুড়ির দানাটা ফেলে দিল জাল থেকে। আবার ফিরে গেল জালের মাঝখানটিতে, ধৈর্য ধরে বসে রইল জেলেদের মতো। আবার মুড়ি ছুঁড়ে মারলুম। আবার উঠে এল। দেখল, শুঁকল, লাথি মেরে মুড়ি ফেলে দিয়ে জালটাকে পরিষ্কার করে চলে গেল। বার বার এই কাণ্ড। বেশ খেলাটা। মাকড়সারা যে মুড়ি টুড়ি খায় না তা বুঝতে পারলুম কাল, খায় না কেন বলো তো?

সে যাকগে, অনেকক্ষণ ধরে মাকড়সার জালে মুড়ি ছুঁড়বার খেলা খেলে ক্লান্ত লাগছিল। হঠাৎ ইচ্ছে হল দেখি, রক্তমাংসের গন্ধ পেলে খায় কি না। উঠোনের একধারে বিশাল হিংস্র চেহারার পিঁপড়ে দেখেছি। তাদের মস্ত মাথা, মিশমিশে কালো। তখনো দু একটা ঘোরাফেরা করছিল উঠোনে। রান্নাঘর থেকে চিমটে এনে তাদের একটাকে ধরে জালে ছেড়ে দিলুম। মুড়ি খাওয়া শেষ হয়ে গেছে, বেড়াতে যাবো, তাই আর ফলাফলের অপেক্ষা করিনি। ফিরে এসে দেখি মস্ত পিঁপড়েটা জালের কেন্দ্রে মাকড়সাটার খুব কাছেই মরে আটকে আছে। শরীরটা অর্ধেক খাওয়া।

মনটা সেই থেকে খারাপ। কেবলই ভাবছি, এ পাপ আমাকে কি স্পর্শ করবে?

পালে মৃত্যুর হাওয়া লেগেছে, নৌকা ভাঁটিয়ে যাচ্ছে। উজানেরও হাওয়া আছে, বাইলে উজানেও যাওয়া যায়। আমি পারছি না। এবার চিঠিতে লিখেছো আমাকে ফিরে যেতে। ভুলে যাও কেন যে আমি হাওয়া বদল করতে এসেছি। এখনো হাওয়া বদল শেষ হয়নি তো। মৃত্যুর হাওয়ার বদলে জীবনের হাওয়া লাগুক।

আজ ঘুম পাচ্ছে। এ চিঠিটা আবার কাল শেষ করব।

ঘুম থেকে উঠেই দেখি কী সুন্দর ভোরের আলোটি। দিন আসছে, তারই আবাহনে আকাশ-মর্ত্য জুড়ে কী মহা আয়োজন। আকাশে মেঘ ছিল না, ধুলো-ধোঁয়া ছিল না,

গাছাগাছালি শান্ত, বাতাস মৃদু। রাতে একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছিলাম। আমি যেন পিঁপড়েদের জগতে চলে যাচ্ছি। লক্ষ পিঁপড়ে আমাকে বহন করে যাচ্ছে। স্বপ্ন? কিন্তু ভোরে ঘুম ভাঙলে কুটুস একটা কামড়ে। উঠে দেখলুম। পিঁপড়ে নয়, বড্ড ছারপোকা।

বেশ লাগছিল ভোরটা। কী বলব, এত সুন্দর দৃশ্যটা একা দেখছি। মনটা খাঁ-খাঁ করছে। কাকে যেন ডেকে দেখালে ভালো হত। আমরা একা কিছু উপভোগ করতে পারি না। ভালো লাগে না। বেঁচে থাকতে গেলে একজন প্রিয় মানুষ চাই। সে কি তুমি? বুঝতে পারি না। কিন্তু কাউকে বড্ড দরকার এক বুক কথা জমে আছে।

মাকড়সার ক্ষুধা কী ভয়ংকর। আজ দেখি, আধ-খাওয়া পিঁপড়েটার দেহাবশেষ নেই। মনটা বড়ো অস্থির লাগছে, কী করলুম। এই নিষ্ঠুরতা কি আমাকে মানায়।

দুপুরে জানালার পাশে জারুল গাছের ছায়া কোলে করে বসে আছি। কী একা, কী গভীর চারদিক। মনে হচ্ছে, আমার কে আছে। আমার কে আছে।

কোল জুড়ে জারুলের ছায়া, জীবনে যা কিছু জড়ো করেছি দুহাতে, সবই আঁকড়ে ধরে আছি, সেসব কি ছায়ার মতো?

অথচ পৃথিবী কী গভীর। কত কোটি বছরের জীবনযাপনের সব চিহ্ন নিয়ে বয়ে যাচ্ছে। বাতাসে তার প্রাচীনতার ঘ্রাণ। সব প্রাচীন সময়, সব প্রাচীন বাতাস আজো রয়ে গেছে। আমার চারধারে। এসব থেকেই জন্মেছি, এসবেই লয় পাবো। কোলে জারুলের ছায়া পড়ে, আলো দোলে। কিছুই ক্ষণিক নয়। সব কিছুই জন্মেছিল পৃথিবীর সঙ্গে।

জলে চোখ ভেসে গেল। স্মৃতিভ্রংশের মতো বসে থাকি। কোথা থেকেই বা এসেছি। ফিরে যাবোই বা কোথায়।

সেই হাফহাতা পাঞ্জাবি পরা মানুষটা আসবে। উৎকণ্ঠ অপেক্ষা করছি। আমরা দুজনে উপত্যকা পেরিয়ে যাবো। ওদিকে একটা ঘাসজমি, তারপর গাছগাছালি। যাবো। ফিরব কি? কে জানে?

ভেবো না। পৃথিবীতে কেউই খুব জরুরি নয়। যে যতই জরুরি ভাবুক নিজেকে, বা প্রিয়জনকে, তবু দেখো, তাকে ছাড়াও চলে যায়। কিছু অসুবিধে নেই। ছুটি দেবে? একবার

দেখি হাওয়াটা পালটাতে পারি কি না।

আমাকে দেখুন

দয়া করে আমাকে একবার দেখুন। এই যে আমি এখানে। একটু আগে আমি বাসের পা-দানিতে ঠেলে ঠুলে উঠলাম, তারপর নিরেট জমাট ভিড়ের ভিতরে আমি এ-বগল সে-বগলের তলা দিয়ে, এর ওর পায়ের ফোঁকর দিয়ে ঠিক ইঁদুরের মতো একটা গর্ত কেটে কেটে এতদূর চলে এসেছি। বাসের রডগুলো বড়ো উঁচুতে -- আমি বেঁটে মানুষ-- অতদূর নাগাল পাই না। আমি সিটের পিছন দিক ধরে দাঁড়াই তারপর গা ছেড়ে দিই! বাসের ঝাঁকুনিতে যখন আমি দোল খাই আশেপাশের মানুষের গায়ে ভর দিয়ে টাল সামলাই, তখন আমার আশেপাশের লোক কেউ খুব একটা রাগ করে না। কারণ আমার ওজন এত কম যে, কারো গায়ে ঢলে পড়লেও সে আমার ভার বা ধাক্কা টেরই পায় না। হ্যাঁ, এখন আমি বাসের পিছন দিকটায় একটা সিট চেপে ধরে দাঁড়িয়ে আছি। আমার দুধারে পাহাড়ের মতো উঁচু উঁচু সব মানুষ। তারা আমাকে এত ঢেকে আছে যে, বোধহয় আমাকে দেখাই যাচ্ছে না। কিংবা দেখলেও লক্ষ করছে না কেউ। ওইটাই মুশকিল। আমাকে অনেকেই দেখে কিন্তু লক্ষ করে না। এখন আমি যার পাশে দাঁড়িয়ে আছি, কিংবা যার মুখোমুখি তারা আমাকে হয়তো দেখছে, কিন্তু নির্লিপ্তভাবে। যেন আমি না থাকলেও কোনো ক্ষতি বা লাভ ছিল না। তার কারণ বোধহয় এই যে, আমার চেহারায় এমন কিছু নেই, যাতে আমাকে আলাদা করে চেনা যায়। হ্যাঁ মশাই, আমি মাত্র পাঁচ ফুট দুই ইঞ্চি লম্বা, রোগাই, তবে খুব রোগা নয় যেটা চোখে লাগে, কালোই তবে খুব কালো নয় যে, আর একবার তাকিয়ে দেখবে কেউ। চল্লিশ বছরের পর আমার মাথা ক্রমে ফাঁকা হয়ে চুল পাতলা হয়ে এসেছে অথচ টাকও পড়েনি-- টেকো মানুষকেও কেউ কেউ দেখে। তার ওপর আমার মুখখানা-- সেটা না খুব কুচ্ছিত না সুন্দর--আমার নাক থ্যাবড়া নয় চোখাও নয়, চোখ বড়োও নয় আবার কুতকুতেও নয়। কাজেই এই যে এখন ভিড়ের মধ্যে আমি দাঁড়িয়ে আছি--দুধারে

উঁচু উঁচু মানুষ--এই ভিড়ের মধ্যে কেউ কি আমাকে দেখছেন? দেখছেন না। কিংবা দেখলেও লক্ষ করছেন না--আমি জানি।

আমার বিয়ের পর একটা খুব মর্মান্তিক মজার ঘটনা ঘটেছিল। বউভাতের দুই একদিন পর আমি আমার বউকে নিয়ে একটু বাজার করতে বেরিয়েছিলাম। আর কয়েকদিন পরই দ্বিরাগমনে শ্বশুরবাড়ি যাবো সেই কারণেই কিছু নমস্কারির কাপড় চোপড় কেনা দরকার ছিল। রাস্তায় বেরিয়ে আমি আমার বউকে জিজ্ঞেস করলাম, 'নিউ মার্কেটে যাবে?' আমার যা অবস্থা তাতে নিউ মার্কেটে বাজার করার কোনো অর্থ হয় না, বরাবর আমার বাসার কাছে কাটরায় সস্তায় কাপড়-চোপড় কিনি। তবু যে আমি এই কথা বলেছিলাম, তার এক নম্বর কারণ ছিল যে, আমার বউটি ছিল মফস্বলের মেয়ে, নিউ মার্কেট দেখে নি, আর দুই নম্বর কারণ হল আমার শ্বশুরবাড়ির দিকটা আমাদের তুলনায় বেশ একটু পয়সাওয়ালা। আমি নিউ মার্কেটের কথা বললাম যাতে আমার নতুন বউটি খুশি হবে, আর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা যখন শুনবে, কাপড়-চোপড় নিউ মার্কেট থেকে কেনা, তখন তাদের ভ্রূ একটু উর্ধ্বগামী হবে। কিন্তু ওই নিউ মার্কেটের প্রস্তাবটাই একটা মারাত্মক ভুল হয়েছিল। কারণ ওখানে না গেলে ঘটনাটা বোধহয় ঘটতই না। ব্যাপারটা হয়েছিল কি নিউ মার্কেটে ঢোকার পর ঝলমলে দোকানপশার দেখে আমার বউ মুগ্ধ হয়ে গেল। যে-কোনো দোকানের সামনেই দাঁড়ায়, তারপর শো-কেসে চোখ রেখে এক-পা এক-পা করে হাঁটে। আমার দিকে তাকাতেও ভুলে গেল। তখন আমার নতুন বউ, কাজেই আমার অভিমান হওয়া স্বাভাবিক। আমি তাকে এটা ওটা দেখিয়ে একটু মাতব্বরির চেষ্টা করলাম বটে, কিন্তু সে বিশেষ কোনো জিনিসের দিকে মনোযোগ না দিয়ে সব কিছুই দেখতে লাগল। অভিমানটা একটু প্রবল হতেই এক সময়ে আমি ইচ্ছে করেই হাঁটার গতি খুব কমিয়ে দিলাম, কিন্তু বউ সেটা লক্ষ না করে নিজের মনে হেঁটে যেতে লাগল। তাই দেখে এক সময়ে আমি একদম থেমে গেলাম। কিন্তু বউ হাঁটতে লাগল। দোকান-পশারের দিকে তার বিহ্বল চোখ, আর গার্ড অফ অনার দেওয়ার সময়ে সোলজাররা যেমন হাঁটে তেমনি তার হাঁটার ভঙ্গি। আমি দূর থেকে দেখতে লাগলাম আমার বউ সেই ঝলমলে আলোর মধ্যে লোকজনের ভিড় ঠেলে হেঁটে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে সে কথাও বলেছিল বটে আমি তার সঙ্গেই আছি ভেবে, কিন্তু সত্যিই আমি

আছি কি না তা সে লক্ষ করল না। এইভাবে বেশ কিছুদূর এগিয়ে যাওয়ার পর সে কী একটা জিনিস দেখে খুব উত্তেজিতভাবে আমাকে দেখানোর জন্য মুখ ফিরিয়ে আমাকে খুঁজতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। চারদিকে চেয়ে আকুল হয়ে খুঁজতে লাগল আমাকে। তখনই মজা করার একটা লোভ আমি আর সামলাতে পারলাম না। নিউ মার্কেটে যে গোলকধাঁধার মতো গলিগুলো আছে তার মধ্যে যেটা আমার সামনে ছিল আমি তার মধ্যে ঢুকে গেলাম। এবার মফস্বলের মেয়েটা খুঁজুক আমাকে। যেমন সে আমাকে লক্ষ করছিল না, তেমন বুঝুক মজা। আমি আপনমনে হাসলাম, আর উঁকি মেরে দেখলাম আমার বউটা কান্নামুখে চারিদিকে চাইতে চাইতে ফিরে আসছে দ্রুত পায়ে। আমার কষ্ট একটু হল ওর মুখ দেখে, তবু আর একটু খেলিয়ে ধরা দেবো বলে আমি গলির মধ্যে ঢুকে গেলাম। আর ও দিশেহারার মতো এদিক ওদিক অনেকবার হাঁটল, এ গলি সে গলিতে খুঁজতে লাগল আমাকে। আমি ওকে চোখে চোখেই রাখছিলাম। এক সময়ে বুঝতে পারলাম যে, আমাকে না পেলে ও কেঁদেই ফেলবে--এমন করুণ হয়ে গেছে ওর মুখশ্রী। চোখ দুটোও ছলছলে আর লাল হয়ে গিয়েছিল। তাই একসময় ও যে গলিটাতে হেঁটে যাচ্ছিল, আমি পা চালিয়ে অন্য পথে গিয়ে সে গলিটার উলটোদিক দিয়ে ঢুকলাম। তারপর হাসি-হাসি মুখ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। বিপরীত দিক থেকে ও হেঁটে এল, ঠিক মুখোমুখি দেখা হল আমাদের, এমনকী ও আমার এক ফুট দূরত্বের ভিতর দিয়ে হেঁটে গেল তবু আমাকে চিনতে পারল না। খুব অবাক হলাম আমি--ও কি আমাকে দেখেনি। আবার অন্যপথে তাড়াতাড়ি গিয়ে অন্য এক গলিতে একটা কাঁচের বাসনের দোকানের সামনে কড়া আলোয় দাঁড়ালাম। ঠিক তেমনি ও উলটোদিক থেকে হেঁটে এল, চারদিকের লোকজনকে লক্ষ করল, আমার চোখে ওর চোখ পড়ল, কিন্তু আবার আমাকে পেরিয়ে গেল ও, এমন কি পেরিয়ে গিয়ে একবার পিছু ফিরেও দেখল না। এরকম কয়েকবার আমাদের দেখা হয়--কখনো বইয়ের দোকানের সামনে, কখনো ফলের দোকান কিংবা পুতুলের দোকানের সারিতে। কিন্তু ও আমাকে কোনো বারই চিনতে পারল না। উদভ্রান্তভাবে আমাকে খুঁজতে খুঁজতে আমাকেই পেরিয়ে গেল। তখন আমি ভাবলাম মফস্বলের এই মেয়েটা খুব ঘড়েল, আমি ইচ্ছে করে লুকিয়ে ছিলাম বুঝতে পেরে এখন ইচ্ছে করেই চিনতে চাইছে না। কিন্তু ওর মুখের করুণ এবং

ক্রমে করুণতর অবস্থা দেখে সে কথাটা সত্যি বলে মনে হচ্ছিল না। তবু আমি অবশেষে একটা ঘড়ির দোকানের সামনে ওর রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে গেলাম। বললাম--এই যে। ও ভীষণ চমকে গিয়ে অবাক হয়ে আমাকে দেখল। বেশ কিছুক্ষণ দেখে-টেখে তারপর ভীষণ জোর শ্বাস ফেলে কেঁপে হেসে বলল--তুমি। তুমি। কোথায় ছিলে তুমি। আমি কতক্ষণ তোমাকে খুঁজছি। আশ্চর্য এই যে, তখন আমার মনে হল ও সত্যি কথাই বলছে। বাসায় ফেরার সময়ে ওকে আমি বললাম যে, ওর সঙ্গে ওই লুকোচুরি খেলার সময় আমি বার বার ওকে ধরার সুযোগ দিয়েছি, ওর সামনেই দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি। ও প্রথমটায় বিশ্বাস করল না কিন্তু আমি বার বার বলাতে ও খুব অবাক হয়ে বলল--সত্যি। তাহলে তুমি আর কখনো লুকিও না। এরকম করাটা বিপজ্জনক।

বেঁধে ভাই কণ্ডাক্টর, এইখানেই আমি নেবে যাবো... দেখি দাদা... দেখবেন ভাই আমার চশমাটা সামলে.... ওই দেখুন, কেউ আমার কথা শুনল না। আমি নামার আগেই কণ্ডাক্টর বাস ছাড়ার ঘন্টি দিয়ে দিল, গেট আটকে ধুমসো মতো লোকটা অনড় হয়েই রইল আর হাওয়াই শার্ট পরা ছোকরাটা কনুইয়ের গুঁতোয় চশমাটা দিলে বেঁকিয়ে। তাই বলছিলাম যে, কেউই আমাকে লক্ষ করে না, বাসে-ট্রামে না, রাস্তায় ঘাটে না।

আজকের দিনটা বেশ ভালোই। ফুরফুরে হাওয়া আর রোদ দিয়ে মাখামাখি একটা আদুরে আদুরে গা-ঘেঁষা দিন। শরৎকাল বলে গরমটা খুবই নিস্তেজ। এখন এই রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে আমার বেশ ভালোই লাগছে। ওই তো একটু দূরেই একটা ক্রসিং আর তার পরেই আমার অফিস। এই দেখ আমি ক্রসিংটার কাছে এসে রাস্তা পেরোবার জন্য পা বাড়াতেই ট্রাফিক পুলিস হাত নামিয়ে নিল, আমার পার হওয়ার রাস্তাটা আটকে এখন চলন্ত গাড়ি আর গাড়ি। কেন ভাই ট্রাফিক পুলিস, আমি যে রাস্তা পেরোচ্ছি তা কি দেখতে পাওনি? আর একটু হাতখানা তুলে রাখলে কি হাতখানা ভেরে যেত?

যে লিফটে দাঁড়িয়ে আমি দোতলায় উঠছি এই লিফটটাই বোধ হয় একশো বছরের পুরোনো। এর চারদিকে কালো লোহার গ্রিল--ঠিক একখানা খোলামেলা খাঁচার মতো, মাঝে মাঝে একটু কাঁপে, আর খুব ধীরে ধীরে ওঠে। গত তেরো বছর ধরে আমি এই লিফট

বেয়ে উঠছি, এই তেরো বছর ধরে আমাকে সপ্তাহে ছদিন লিফটম্যান রামস্বরূপ আভোগী ওপরে তুলছে। কী বলো ভাই রামস্বরূপ, তুমি তো আমাকে বেশ ছোটোটিই দেখেছিলে--যখন আমার বয়স ছাবিবশ কি সাতশ, যখন আমার ভালো করে বুড়োটে ছাপ পড়েনি মুখে। এখন বলো তো আমার নামটা কী। যদি সত্যিই জিজ্ঞেস করি তাহলে এক্ষুনি রামস্বরূপ হাঁ হাঁ করে হেসে উঠে বলবে--আরে জরুর, আপনি তো অরবিন্দবাবু। কিন্তু মোটেই তা নয়। কোনোকালেই আমি অরবিন্দ ছিলাম না। আমি চিরকাল--সেই ছেলেবেলা থেকেই অরিন্দম বসু।

আমার চাকরি ব্যাঙ্কে। দোতলায় আমার অফিস। আগে আমি অন্যান্য ডিপার্টমেন্টে ছিলাম, গত দশ বছর ধরে আমি বসছি ক্যাশ-এ। আমি খুব চটপট টাকা গুনতে পারি, হিসেবেও আমি খুব পাকা, তাই ক্যাশ থেকে আমাকে অন্য কোথাও দেওয়া হয় না। হলেও আবার ফিরিয়ে আনা হয়। দশ বছর ধরে আমি খুবই দক্ষতার সঙ্গে ক্যাশের কাজ করছি। কখনও পেমেন্টে, কখনো রিসিভিঙে। পেমেন্টেই বেশি, কারণ ওখানেই সবচেয়ে সতর্ক লোকের দরকার হয়। একটা তারের খাঁচার মধ্যে আমি বসি, আমার বুকের কাছে থাকে অনেক খোপওলা একটা ড্রয়ার। আর কোনটায় কত টাকা নোট তার কোনটায় কোন খুচরো পয়সা রয়েছে, তা আমি নির্ভুলভাবে চোখবুজে বলে দিতে পারি। পেমেন্টের সময়ে আমি ড্রয়ার খুলে গুনে টাকা বের করি, তারপর ড্রয়ার বন্ধ করি, তারপর আবার গুনি, আবার..... তারপর টাকা দিয়ে পরের পেমেন্টের জন্য হাত বাড়াই, টোকেন নিয়ে আবার ড্রয়ার খুলি, টাকা বের করে গুনে ... তারপর একইভাবে চলতে থাকে। সামনের ঘুলঘুলিটা দিয়ে যারা আমাকে দেখে তাদের সম্ভবত খুবই ক্লান্তিকর লাগে আমার ব্যবহার--ইস লোকটা কী একঘেয়েভাবে কাজ করছে --কী একঘেয়ে। ঘুলঘুলি দিয়ে তারা আমাকে দেখে, কিন্তু মনে রাখে না। রামবাবু আমাদের পুরোনো বড়ো খদ্দের--প্রকাণ্ড কারখানা আছে, এজেন্টও তাকে খাতির করে। খুব খুঁতখুঁতে লোক, বেশির ভাগ সময়েই লোক না পাঠিয়ে নিজেই এসে চেক ভাঙিয়ে নিয়ে যান। আমি কতবার তাঁকে পেমেন্ট দিয়েছি, তিনি ঘুলঘুলি দিয়ে প্রসন্ন হাসিমুখে ধন্যবাদ দিয়েছেন। একবার আমার বড়ো শালা কলকাতায় বেড়াতে এসে অনেক টাকা উড়িয়েছিল। সেবার সে আমাকে নিয়ে যায় পার্ক স্ট্রিটের বড়ো একটা

রেস্তরাঁয়। সেখানে গিয়ে দেখি রামবাবু। একা বসে আছেন, হাতে সাদা স্বচ্ছ জিন, খুব স্বপ্নালু চোখ। সত্যি বলতে কী আমি ভাগ্যোন্নতির কথা বড়ো একটা ভাবি না। অন্তত সে কারণে রামবাবুর সঙ্গে দেখা করার কথা আমার মনেই হয়নি। আমি পুরোনো চেনা লোক দেখে এগিয়ে গিয়েছিলাম। রামবাবু ভ্রূ তুলে বললেন--কোথায় দেখেছি বলুন তো। মনেই পড়ছে না। তখন আমার শালার সামনে ভীষণ লজ্জা করছিল আমার। লোকটা যদি সত্যিই চিনতে না পারে, যদি সত্যিই তেমন অহংকারী হয়ে থাকে লোকটা--তবে আমার বেইজ্জতি হয়ে যাবে। তখন আমি মরিয়া হয়ে আমার ব্যাঙ্কের নাম বললাম, বললাম যে আমি ক্যাশ এ... সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার জিন-এর মতোই স্বচ্ছ হয়ে গেল তাঁর মুখ, প্রসন্ন হেসে বললেন--চিনেছি । কী জানেন, ঐ ঘুলঘুলি আর ওই খাঁচা ওর মধ্যে দেখতে দেখতেই অভ্যস্ত হয়ে গেছি, তাই হঠাৎ এ জায়গায়... বুঝলেন না। আসল কথা হল এ পারসপেকটিভ--ওটা ছাড়া মানুষের আর আছেটা কী যে, তাকে চেনা যাবে? ওই খাঁচার মধ্যে ঘুলঘুলির ভিতর দিয়ে যেমন আপনি তেমনি দেখুন এই কোট-প্যান্ট টাই আর টাক মাথা--এর মধ্যে দিয়ে আমি। এসব থেকে যদি আলাদা করে নেন, তবে দেখবেন আপনি আর আমি--আমাদের কোনো সত্যিকারের পরিচয়ই নেই। এই দেখুন না, একটু আগেই আমি পারসপেকটিভের কথাই ভাবছিলাম। ছেলেবেলায় আমরা থাকতাম রেলকলোনিতে। আমার বাবার ছিল টালিক্লার্কের চাকরি। কাটিহারে আমাদের রেল কোয়ার্টারে প্রায়ই পাশের বাড়ি থেকে একটি মেয়ে আসত, তার সৎ মা বলে বাসায় আদর ছিল না। আমাদের বাসায় রান্নাঘরে উনুনের ধারে আমার মায়ের পাশটিতে সে এসে মাঝে মাঝে বসত। জড়োসড়ো হয়ে ছেঁড়া ফ্রকে হাঁটু ঢেকে পরোটা বেলে দিত, কখনো আমার কাঁদুনে ছোট বোনটাকে কোলে করে ঘুরে ঘুরে ঘুম পাড়াতো। মা আমাকে বলত-- ওর সঙ্গে তোর বিয়ে দেবো। সেই শুনে সেই মেয়েটাকে আমি ভালো করে দেখতাম--আর কী যে নেশা লেগে যেত। কী করুণ কৃশ খড়িওঠা মুখখানা--আর কী তিরতিরে সুন্দর। যেন পৃথিবীতে বেশিদিন থাকবে বলে ও আসেনি। রামবাবু এটুকু বলেই দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন, আর আমি ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞেস করলাম--তারপর কী হল, সে কী মরে গেল? রামবাবু মাথা নাড়লেন--না, না, মরবে কেন। তাকে আমি বিয়ে করেছি বড়ো হয়ে। সে এখনো আমার বউ। ইয়া পেল্লায় মোটা হয়ে গেছে,

বদমেজাজি, আমাকে খুব শাসনে রাখে। কিন্তু যখন দেখি ফ্রিজ খুলছে, গয়না হাঁটকাচ্ছে, চাকরদের বকছে কিংবা সোফারকে বলছে গাড়ি বের করতে, তখন কিছুতেই বিশ্বাস হয় না যে, এ সেই। সেই বেলি--যার অসুখের সময় মা দুটো কমলালেবু দিয়ে এসেছিল বলে এক গাল হেসেছিল। আজ দেখুন, খুব ঝগড়া করে বেরিয়েছি ওর সঙ্গে। মনটা খিঁচড়ে ছিল--সেই ভালোবাসা কোথায় উবে গেছে এখন। কিন্তু এখানে নির্জনে বসে সেই পুরোনো দিন, উনুনের ধারে বসে থাকা, ছেঁড়া ফ্রকে হাঁটু ঢেকে ওর বসার ভঙ্গি মনে পড়ে গেল। মনে পড়ল আমার মায়ের মুখ--সে মুখ বড়ো মায়ামমতায় ওর বসার দীন ভঙ্গিটুকু চেয়ে দেখছে। অমনি আবার এখন ভালোবাসায় আমার মন ভরে উঠেছে। বাসায় ফিরে গিয়েই এখন ওর রাগ ভাঙাবো। বুঝলেন না...বলে রামবাবু সেই সাদা স্বচ্ছ জিন মুখে নিয়ে হাসলেন, বললেন--ওই যে ঘুলঘুলিটা--যেটার ভিতর দিয়ে আপনাকে দেখি সেটাই আসল--ওই ঘুলঘুলিটা...

এই যে তেইশ চবিবশ বছর বয়সের ছেলেটা এখন পেমেন্টের জন্য দাঁড়িয়ে আছে, পিতলের টোকেনটা ঠুকঠুক করে অন্যমনস্কভাবে ঠুকছে কাউন্টারের কাঠে, ও আমাকে চেনে। ওর বাবার আছে পুরোনো গাড়ি কেনাবেচার ব্যবসা। আগে ওর বাবা আসত, আজকাল ও আসছে ব্যাঙ্কে। মাঝে মধ্যে চোখে চোখ পড়লে আমি হেসে জিজ্ঞেস করি--কী, বাবা ভালো তো। ও খুশি হয়ে ঘাড় কাত করে বলে--হ্যাঁ--। কিন্তু আমার সন্দেহ হয় যে, একদিন যদি হঠাৎ করে এখান থেকে আমাকে সরিয়ে নেওয়া হয়, এবং মোটামুটি সাধারণ চেহারার কোনো লোককে বসিয়ে দেওয়া হয় ও জায়গায়, তবে ও বুঝতেই পারবে না তফাতটা। তখনো ও অন্যমনস্কভাবে পিতলের টোকেনটা ঠুকবে কাঠের কাউন্টারে, অন্যমনস্কভাবে চেয়ে থাকবে, চোখে চোখ পড়লে সেই নতুন লোকটার দিকে চেয়ে পরিচিতের মতো একটু হাসবে। ভুলটা ধরা পড়তে একটু সময় লাগবে ওর। কারণ, ও তো সত্যি কখনো আমাকে দেখে না। ও হয়তো ওর নতুন প্রেমিকাটির কথা ভাবছে এখন, ভাবছে শিগগিরই ও একটা স্কুটার কিনবে। ও ঘাড় ফিরিয়ে রিসেপসনের মেয়েটির দিকে কয়েক পলক তাকাল, তারপর ঘড়ি দেখল। একবার টোকেনটার নম্বর দেখে নিল, ঘুলঘুলির ভিতর দিয়ে দেখল আমার দুখানা হাত ক্লান্তিকরভাবে মোটা একগোছা টাকা

গুনছে। ও আমার মুখটা একপলক দেখেই চোখটা ফিরিয়ে নিল। কিন্তু আমি জানি যে, ও আমাকে দেখল না। আর পনেরো মিনিট পরেই দুটো বাজবে। তখন আমি ক্যাশ বন্ধ করে নীচে যাবো টিফিন করতে। তখন যদি ও আমাকে রাস্তায় দেখতে পায়, আমি ফুটপাথের দোকানে দাঁড়িয়ে থিন অ্যারারুট আর ভাঁড়ের চা খাচ্ছি, তখন কি আমাকে চিনবে ও।

কলা কত করে হে? চল্লিশ পয়সা জোড়া--বলো কী? হ্যাঁ, হ্যাঁ, মর্তমান যে তা আমি জানি, মর্তমান কি আমি চিনি না? ওই সুন্দর হলুদ রং, মসৃণ গা, প্রকাণ্ড চেহারা--মর্তমান দেখলেই চেনা যায়। তা আজ অবশ্য আমার কলা খাওয়ার তারিখ নয়। গতকালই তো খেয়েছি। আমি দুদিন পর পর কলা খাই। দাও একটা। না, না, ওই একটাই--এই যে কুড়ি পয়সা ভাই। আহা বেশ কলা। চমৎকার। খাওয়া হয়ে যাওয়ার পরও আমি অনেকক্ষণ খোসাটা হাতের মুঠোয় ধরে রইলাম স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে। দশ-পনেরো মিনিট একটু এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ালাম। কলার খোসাটা আমার হাতেই ধরা। আমার চারপাশেই নিরুত্তেজভাবে লোকজন হেঁটে যাচ্ছে। খুবই নির্বিকার তাদের মুখচোখ। এরা কখনো যুদ্ধবিগ্রহ করেনি, দেশ বা জাতির জন্য প্রাণ দিতে হয়নি এদের, এমন কি খুব কঠিন কোনো কাজও এরা সমাধা করেনি সবাই মিলে। জাতটা মরে আসেছে আস্তে আস্তে, অন্তর্ভাবনায় মগ্ন হয়ে হাঁটছে, চলছে--একে অন্যের সম্পর্কে নিস্পৃহ থেকে। এদের সময়ের জ্ঞান নেই--উনিশশো ঊনসত্তর বলতে এরা একটা সংখ্যা মাত্র বোঝে, দু'হাজার বছরের ইতিহাস বোঝে না। এদের কাছে 'টেলিপ্যাথি' কিংবা 'ক্রীক রো' যেমন শব্দ, 'ভারতবর্ষও ঠিক তেমনি একটা শব্দ।

দয়া করে আমাকে দেখুন। এই যে আমি--অরিন্দম বসু--অরিন্দম বসু--এই যে না লম্বা না রোগা--না ফর্সা একজন লোক। আমি টেলিপ্যাথি নই, ক্রীক রো নই, ভারতবর্ষও নই--ওই শব্দগুলোর সঙ্গে অরিন্দম বসু--এই শব্দটার একটু তফাত আছে, কিন্তু তা কি আপনি কখনো ধরতে পারবেন?

যাক গে সে সব কথা। মাঝে মাঝে আমারও সন্দেহ হয়--আমি কি সত্যিই আছি? না কি, নেই? ব্যাঙ্কের ওই ঘুলঘুলি দিয়ে লোকে হাত এগিয়ে টাকা গুনে নেয়, কেউ কেউ মৃদু হেসে

ধন্যবাদ দিয়ে যায়। কিন্তু লোক বদল হলেও তারা অবিকল ওইভাবে হাত বাড়িয়ে টাকা গুনে নেবে আর কেউ কেউ ধন্যবাদ দিয়ে যাবে, খেয়ালই করবে না ঘুলঘুলির ওপাশে এক বিশাল পরিবর্তন ঘটে গেছে। সেই নিউ মার্কেটের ঘটনাটার কথাই ধরুন না--আমার বউ হেঁটে হেঁটে আমাকে খুঁজছে--আমাকে সামনে দেখে, চোখে চোখ রেখেও পেরিয়ে যাচ্ছে আমাকে, ভাবছে--কী আশ্চর্য, লোকটা গেল কোথায়।

খুব যত্নের সঙ্গে কলার খোসাটা আমি ফুটপাথের মাঝখানে রেখে দিলাম। উদাসীন মশাইরা যদি এর ওপরে কেউ পা দেন তাহলে পিছলে পড়ে যেতে যেতে আপনি হঠাৎ চমকে উঠে আপনার সংবিৎ ফিরে পাবেন। যদি খুব বেশি চোট না পান আপনি, যদি পড়ো-পড়ো হয়েও সামলে যান, তাহলে দেখবেন আপনার মস্ত লাভ হবে। আপনি চারপাশে চেয়ে দেখবেন--কোথায় কোন রাস্তা দিয়ে আপনি হাঁটছেন তা মনে পড়ে যাবে--দুর্ঘটনা গুরুতর হলে আপনার হাত-পা কিংবা মাথা ভাঙতে পারত ভেবে আপনি খুব সতর্ক হয়ে যাবেন আপনার বিপজ্জনক চারপাশটার সম্বন্ধে--হয়তো আপনার ভিতরকার ঘুমন্ত আমিটা জেগে উঠবে ভাববে 'বেঁচে থাকা কত ভাল'--তখন হয়তো মানুষের সম্বন্ধে আপনি আর একটু সচেতন হয়ে উঠবেন-- এবং বলা যায় না আপনার হয়তো এ কথাও মনে পড়ে যেতে পারে যে, আজ হচ্ছে উনিশশো উনসত্তর সালের ষোলোই জুলাই-- আপনার বিয়ের তারিখ, যেটা আপনি একদম ভুলে গিয়েছিলেন--এবং এই সালে আপনার বয়স চল্লিশ পার হল। তখন মশাই ভেবে দেখবেন এই যুদ্ধ এবং বিপ্লবহীন ভারতবর্ষে একটি নিস্তেজ দুপুরে রাস্তায় কলার খোসা ফেলে রেখে আমি আপনার খুব অপকার করিনি।

আপনি কি এখন চাঁদের কথা ভাবছেন আর তিনজন দুঃসাহসী মানুষের কথা। ভাববেন না মশাই ওসব ভাববেন না। কী কাজ আমাদের ওসব ভেবে। খামোকা মানুষ ওতে ভয়ংকর উত্তেজিত হয়ে পড়ে আর তারপর ভীষণ অবসাদ আসে এক সময়ে। ওদের খুব ভালো যন্ত্র আছে, ওরা ঠিক চাঁদে নেমে যাবে, তারপর আবার ঠিকঠাক ফিরেও আসবে। কিন্তু সেটা ভেবে আপনি অযথা উত্তেজিত এবং অন্যমনস্ক হবেন না। রাস্তা দেখে চলুন। রাজভবনের সামনে বাঁকটা ঘুরতেই দেখুন কী সুন্দর খোলা প্রকাণ্ড ময়দান, উদোম আকাশ। কাছাকাছি যে সব মানুষগুলো হাঁটছে তাদের দেখে নিন, চিনে রাখুন যত দূর

সম্ভব অন্যের মুখ--যেন যে কোনো জায়গায় দেখা হলে আবার চিনতে পারেন। এই সুন্দর বিকেলে ময়দানের কাছাকাছি আমি আপনার পাশেই হাঁটছি--আমাকে দেখুন। এই তো আমি আমার অফিস থেকে বেরিয়েছি। একটু আগেই বেরিয়েছি আজ, খেলা দেখতে যাবো বলে। মনে হচ্ছে আপনিও ওইদিকে--না?

দেখুন কী আহাম্মক ছেলেটা--অফসাইডে দাঁড়িয়ে সুন্দর চান্সটা নষ্ট করে দিল। আর মাত্র দশ মিনিট আছে, এখনো গোল হয়নি। আর ওই ছেলেটা--হায়, ঈশ্বর কে ওকে ওই লাল সোনালি জার্সি পরিয়েছে। ওকে বের করে দিক মাঠ থেকে। দিন তো মশাই আপনারা চোস্ত গালাগালিতে ওর ভূত ভাগিয়ে। আমার জিভে আবার খারাপ কথাগুলো আসে না। কিন্তু দেখুন, রাগে আমারও হাত-পা কাঁপছে। আজ সকাল থেকেই চাঁদ আর তিনজন দুঃসাহসী মানুষের কথা ভেবে ভেবে আমার নার্ভগুলো অসাড় হয়ে আছে। তার ওপর দেখুন এই ফালতু টিমটা আমার দলের কাছ থেকে নিয়ে নিচ্ছে এক পয়েন্ট। একটা পয়েন্ট--কী সাংঘাতিক। ওদিকে আর আট কি ন' মিনিট সময় আছে মাত্র। কী বলেন দাদা, গোল হবে? কী করে হবে। খুদে টিমটার সব খোলোয়াড় পিছিয়ে এসে দেয়াল তৈরি করছে গোলের সামনে। আর এরা খেলছে দেখুন, কে বলবে যে গোল দেওয়ার ইচ্ছে আছে? ওই যে ছেলেটা--অফসাইডে দাঁড়িয়ে দিনের সবচেয়ে সহজ চান্সটাকে মাটি করে দিল--আমার ইচ্ছে করছে ওর সামনে গিয়ে বলি--এই আমাকে দেখ, আমি অরিন্দম বসু, এই টিমটাকে আমি ছেলেবেলা থেকে সাপোর্ট করে আসছি। জিতলে ঠাকুরকে ভোগ দিয়েছি, হারলে সুইসাইডের কথা ভেবেছি। তা বাপু তুমি কি বোঝো সে সব? তুমি তো জানই না যে, আমি--এই ভিড়ের মধ্যে বিশেষ একজন--কী রকম দুঃখ নিয়ে ছলছলে চোখে ঘড়ি দেখছি। অবশ্য তাতে কার কী যায় আসে। আমি কাঁদি কিংবা হাসি--কিংবা যাই করি-কেউ তো আর আমাকে দেখছে না।

না মশাই গোল হল না। রেফারি ওই লম্বা টানা বাঁশি বাজিয়ে দিল। খেলা শেষ। এখন দয়া করে আমাকে একবার দেখুন কী রকম অবসাদগ্রস্ত আমি, কাঁধ ভেঙে আসছে। দেখুন আমার টিমটাকে আমি কত ভালোবাসি, কিন্তু তাতে টিমের কিছু যায় আসে না। ওরা চেনেই না আমাকে। অথচ আমি প্রতিটি হারজিতের পর কত হেসেছি-লাফিয়েছি-কেঁদেছি-চাপড়

দিয়েছি অচেনা লোকের পিঠ। খামোকা । তাতে কারো কিছু এসে যায় না। এই যে আমি সকাল থেকে চাঁদ আর তিনজন মানুষের কথা ভেবে চিন্তান্বিত-- ভালো করে ভাত থেকে পারি না উত্তেজনায়--এতেই বা কার কী এসে যায়।

দয়া করে আমাকে একবার দেখুন। না, আমি জানি, আপনি লিগ টেবিলে আপনার টিমের অবস্থান ভেবে বিব্রত। তার ওপর চাঁদ আর সেই তিনজন মানুষের কথাও ভাবতে হচ্ছে আপনাকে। কত কিছু ঘটে যাচ্ছে পৃথিবীতে। সাড়ে ঊনত্রিশ ফুট লং জাম্প দিচ্ছে, মানুষ, গুলিতে মারা যাচ্ছে প্রেসিডেন্ট, ভোটে হেরে যাচ্ছে আপনার দল, বিপ্লব আসতে বড়ো দেরি করছে। তাই, আমি--অরিন্দম বসু, ব্যাঙ্কের ক্যাশ ক্লার্ক--আপনার এত কাছে থাকা সত্ত্বেও আপনি আমাকে দেখতে পাচ্ছে না।

ওই যে দোতলার বারান্দায় রেলিঙের ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে আমার চার বছর বয়সের ছোটো ছেলেটা--হাপু। বড়ো দুরন্ত ছেলে। সকাল থেকে বায়না ধরেছে--রথের মেলায় যাবো বাবা, তুমি তাড়াতাড়ি ফিরো। ওই যে এখন দাঁড়িয়ে আছে আমার জন্য। ঝাঁকড়া চুলের নীচে জ্বলজ্বল করছে দুখানা চোখ, আমি এত দূর থেকে দেখতে পাচ্ছি।

আমি সিঁড়িতে পা দিয়েছি মাত্র, ও ওপর থেকে দুড়দাড় করে নেমে এল--ওর মা ওপর থেকে চেঁটাচ্ছে--হাপু-উ কোথায় গেলি, ও হাপু--উ--উ। এক গাল হেসে হাপু ঝাঁপিয়ে পড়ল প্রায়--কত দেরি করলে বাবা, যাবে না? হ্যাঁ মশাই বাইরে থেকে ফিরে এলে--এই আপনজনের মধ্যে আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। কচি ছেলেটাকে আমি কোলে তুলে নিলাম। ওর গায়ে মিষ্টি একটা ঘামের গন্ধ, শীতের রোদের মতো কবোষ্ণ ওর নরম গা। মুখ ডুবিয়ে দিলে মনে হয় একটা অদৃশ্য স্নান করে নিচ্ছি যেন। বললাম--যাবো বাবা, বড়ো খিদে পেয়েছে, একটু বিশ্রাম করে খেয়ে নিই।

যতক্ষণ আমি বিশ্রাম করলাম ততক্ষণ হাপু আমার গায়ের সঙ্গে লেগে রইল, উত্তেজনায় বলল, শিগগির করো। ওর মা ধমক দিতেই বড়ো মায়ায় বললাম, আহা, বোকো না, ছেলেমানুষ। আসলে ওর ওই নেই-আঁকড়ে ভাবটুকু বড়ো ভালো লাগে আমার।

বড়ো দুরন্ত ছেলে। মেলায় পা দিয়েই হাত ছাড়িয়ে ছুটে যেতে চায়। বললাম--ওরকম করে না। হাপু, হাত ধরে থাকো, আমার হাত ধরেই তুমি ঠিক মতো মেলা দেখতে পাবে। ও কেবল এদিক-ওদিক তাকায় তারপর ভীষণ জোরে চীৎকার করে জিজ্ঞেস করে--ওটা কি বাবা। আর ওটা। আর ওইখানে। আমি ওকে দেখিয়ে দিই--ওটা নাগরদোলা। ওইটা সার্কাসর তাঁবু। আর ওটা মৃত্যুকূপ।

আস্ত একটা পাঁপর ভাজা হাতে নাগরদোলায় উঠে গেল হাপু। ওই যে দেখা যাচ্ছে তাকে--আকাশের কাছাকাছি উঠে হি হি করে হেসে হাত নাড়ছে--সাঁই করে নেমে আসছে আবার--আবার উঠে যাচ্ছে--সারাক্ষণ আমার দিকে চেয়ে হাসছে হাপু। দেখে মন ভরে যায়।

মৃত্যুকূপের উঁচু প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ওকে দেখালাম দেয়াল বেয়ে ভীষণ শব্দে ঘুরে ঘুরে উঠে নেমে যাচ্ছে তীব্রবেগে মোটর সাইকেল। ও আমাকে আঁকড়ে ধরে থেকে দেখল।

তারপর আধঘন্টার সার্কাস দেখলাম দু'জন। দুই মাথাওলা মানুষ, সিংগিং ডল, আট ফুট লম্বা লোক। হাপুর কথাবার্তা থেমে গেল। ঝলমল করতে লাগল চোখ।

বাইরে এনে ওকে ছেড়ে দিলাম। আমার পাশে পাশে ও হাঁটতে লাগল। ওর হাতে ধরা হাতটা ঘেমে গিয়েছিল বলে আমি ওর হাত ছেড়ে দিলাম।

ওই তো ও এগিয়ে যাচ্ছে আমার হাত ছেড়ে। দোকানে সাজান একগাদা হুইশল দেখছে ঝুঁকে, আবার এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ায় আর একটা দোকানে যেখানে এরোপ্লেনের দৌড় হচ্ছে। তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে ও, এয়ার গান আর রংচঙে বল দেখতে দেখতে আস্তে আস্তে পা ফেলছে...ক্রমে ভিড়ের মধ্যে চলে যাচ্ছে হাপু...আমি তখন আমার টিমটার কথা ভাবছিলাম--খামোকা একটা পয়েন্ট নষ্ট হয়ে গেল আজ। চাঁদের দিকে চলেছে তিনজন মানুষ--ওরা কি পৌঁছুতে পারবে?

হঠাৎ খেয়াল হল, হাপুকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও। ভিড়ের মধ্যে এক সেকেন্ড আগেও ওর নীল রঙের শার্টটা আমি দেখেছি। তক্ষুনি সেটা টুপ করে আড়াল হয়ে গেল।

হাপু--উ বলে ডাক দিয়ে আমি ছুটে গেলাম...

হ্যাঁ মশাই, আপনারা কেউ দেখেছেন নীল জামা পরা চার বছর বয়সের একটা ছেলেকে? তার নাম হাপু, বড়ো দুরন্ত ছেলে। দেখেননি? ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, জুলজুলে দুটো দুষ্টু চোখ... না, না ওই পুতুলের দোকানের সামনে যে দাঁড়িয়ে আছে সে নয়--যদিও অনেকটা একইরকম দেখতে। না, তার চেহারার কোনো বিশেষ কিছু চিহ্ন আমার মনে পড়ছে না--খুবই সাধারণ চেহারা অনেকটা আমার মতোই। কেবল বলতে পারি যে, তার বয়স চার বছর। আর গায়ে নীল জামা। তা নীল জামা পরা অনেক ছেলে এখানে রয়েছে, চার বছর বয়সেরও অনেক। না মশাই, আমার পক্ষে ঠিকঠাক বলা সম্ভব নয় এত--এই হাজার হাজার ছেলেমেয়ের মধ্যে ঠিক কোন জন--ঠিক কোন জন আমার হাপু--আর বোধহয় হাপুর পক্ষেও বলা সম্ভব নয় এত জনের মধ্যে কোন জন--ঠিক কোন জন--বুঝলেন না, ওর মাও একবার ঠিক করতে পারেনি--। যদি হাপুকে দেখতে পান তবে ওকে একবার দয়া করে বলে দেবেন যে, এই আমি--এই আমিই ওর বাবা। এই আমাকে একটু দেখে রাখুন দয়া করে--কাইগুলি, ভুলে যাবেন না--

বোধন ও বিসর্জন

এরেই কয় ভুষ্টিনাশ। বোঝলা না হরগোপাল?

আইজ্ঞা বোঝলাম।

তোমারে কতবার কইলাম, হরগোপাল, একখান ছৈওলা নৌকা লইও। তা তুমি আলনা একখান চিতই পিঠা। আরে বাবা ভাদ্র মাস হইল গিয়া এ ট্রেচারস মানথ। অখন দ্যাখলা তো, ভুষ্টিনাশ কারে কয়। গিলা করা পাঞ্জাবি গেল তেনাইয়া, ধুতিখান গামছার সমান, মোচে একটু আতর দিয়া দিছিল বড়ো, ভুরভুরাইয়া গন্ধ ছাড়তে আছিল, হেই গন্ধখানও গেল ধুইয়া।

আইজ্ঞা মাত্র পাঁচ মিনিটের লিগা বৃষ্টিটা তো না হইলেও পারত মন্মথবাবু? আমারই কপাল। ছাতিখানও যদি আনতেন। ওই দ্যাখেন মেঘখান অখন কেমন পাল তুইল্যা ভাইস্যা উইড়া গেল গিয়া। রৌদ্রও কেমন ফিকফিক করত্যাছে।

না করব ক্যান? তাগো তো আর ভুষ্টিনাশ হয় নাই। শোনো হরগোপাল, এই অবস্থায় পাত্রী দেখতে যাওন যায় না। নৌকা ফিরাও।

কন কি মন্মথবাবু। তারা যে পালকি লইয়া ঘাটে বইস্যা আছে।

হরগোপাল, তুমি একখান ধোকড়। এই বেশে যদি ঘাটে লামি তারা কি আর আমাগো লগে কাম করব? এমন আহাম্মক মাইনসের লগে কোন বলদে কাম করে?

একটা কথা কমু মন্মথবাবু?

কও।

কই কি, রৌদ্র যখন উঠছে আর বাতাসও যখন দিত্যাছে, তখন চাইপ্যা বইস্যা থাকেন, গায়ের কাপড় গায়েই শুকাইয়া যাইব অনে। অখনও এক ঘন্টার পাড়ি, চিন্তা নাই।

কিন্তু শুকাইলেই তো হইব না হে, গিলা পামু কই? কোচার কুঁচি পামু কই?

আগে তো শুকাইতে দ্যান, পরে দেখা যাইব। ওয়ার্ড ইজ ওয়ার্ড।

কইলা?

কইলাম।

তা হইলে থাকলাম বইস্যা। মাজার কাপড় কিন্তু শুকাইব না, এই কইয়া রাখলাম।

আইজ্ঞা সব কি আর এক লগে হয়? ছৈওলা নৌকাও কি আর খুঁজি নাই। গন্ধর্ব আর রহিম শেখ বড়ো গাঙে গেছে, ফটিকরে ধরছিলাম, কিন্তুতার আইজ ম্যালেরিয়া। ভাবলাম সওয়া ঘন্টার পথ, উদলা নৌকাতেই মাইরা দিমু। বিধি বাম।

বিধি বাম যখন বোঝলা তখন আর যাইয়া হইবোটা কী? বিধি এই বিয়া চায় না, বোঝলা? তাই এমন আতকা বৃষ্টি আইস্যা চুবাইয়া দিয়া গেল। কী হে বড়ো মাঝি, মুখে পিঠা দিয়া বইস্যা আছ নাকি? কথা কও না যে বড়ো।

বড়ো মাঝি ঝুমরু মিঞা একটু লাজুক হাসি হেসে বলল, কী আর কমু বড়বাবু। বইস্যা বইস্যা কাণ্ডটা দ্যাখলাম। খোদার মর্জি, মাইনসে কী করবে কন। গামছা নিবেন? আছে কিন্তু।

দোহাই মিঞা, আর গামছা দেখাইও না। অখন ভাল কইর্যা বইঠা বাও।

তামুক খাইবেন কর্তা? নূতন হুকা আছে।

খাই না হে মাঝি। বিলাত যাওনের আগে খাইতাম। অখন সিগারেট খাই। তামুকের কথাটা মনে করাইয়া ভালো করলা না। পকেটে এক প্যাকেট সিগারেট আছিল, হেইগুলিরও বোধহয় ভুষ্টিনাশ হইল।

হরগোপাল শশব্যস্তে বলে ওঠে, ফালাইয়া দেন। পকেটে থাকলে পাঞ্জাবিটার বারোটা বাজাইব।

বারোটার কি কিছু বাকি আছে নাকি মনে কর?

মন্মথবাবু পকেট থেকে বার করলেন প্যাকেটটা।

ফালাইয়া দেন মন্মথবাবু।

আরে না। জোর বইচ্যা গেছে।

কন কী? মন্মথবাবু দেশলাইটা নেড়ে বললেন, এইটা বাচে নাই। ভিজা অ্যাক্কেবারে শ্যাষ। বড়ো মাঝি, দেশলাই আছে নাকি হে?

আইজ্ঞা আছে।

বলে শশব্যস্তে পাটাতনের কাঠ তুলে সে একটা দেশলাই বের করে দেয়।

মন্মথবাবু সিগারেট ধরিয়ে বলেন, হরগোপাল, খাইবা নাকি একটা?

আইজ্ঞা না। ধুয়ার নেশাটা ধরি নাই।

ধরলে পারতা। গাও গরম করতে কামে দেয়।

হরগোপাল মৃদু মৃদু হেসে বলে, গাও বেশি গরম করন কি ভাল মন্মথবাবু? আমার আর গাও গরম করনের কাম নাই।

বিয়াশাদি করলা না বইলাই তোমার পেসিমিস্টিক অ্যাটিচুড দেখতাছি। কোন বুদ্ধিতে যে সংসারধর্ম করলা না কে জানে।

কাইট্যা তো যাইতাছে।

কাটবো না হে কাটবো না। বয়স তো মোটে ত্রিশ-বত্রিশ। লম্বা আয়ু পইড়া আছে। বুঝবা ঠেলা। বউ কেমন জান? বাফার, থাফার বুঝলা। সংসারের নানা ঝঞ্ঝাট, বুদ্ধিবিনাশ, বলদামি সামাল দেয়। ব্যাচেলারগো তো সকলেই এক্সপ্লয়েট করে, বউ থাকলে পারে না।

বোঝলাম।

কই আর বোঝলা।

বেশি বুইঝ্যা কামটা কী কন দেখি মন্মথবাবু। হগল জিনিসই কি বোঝোনের ব্যাপার? বিয়া না করলে যে বুড়া বয়সে কপালে কষ্ট আছে এইটা বেঝোনের লিগ্যা আপনার মতো বিলাত গিয়া ব্যারিস্টারি পাস করনের দরকার নাই।

কিন্তু নিজের বইনখানরে তো আমার কপালে গছাইতে ছাড় নাই হে হরগোপাল। তখন তো ঘ্যানঘ্যানাইয়া প্যানপ্যানাইয়া মাথাটাই খারাপ কইরা দিছিলা। যে নিজে বিয়া করে না হ্যায় অন্যের বিয়ার লিগ্যা উইঠ্যা-পইড়া লাগে ক্যান?

হরগোপাল একটু হাসল। বলল, আমি তো অ্যান্টি ম্যারেজ না। ব্যাচেলরশিপ যে ভালো জিনিস হেই কথাও কইয়া বেড়াই না। বিয়া যে করি নাই এইটা আমার একটা পারসোনাল টেস্ট কইতে পারেন। সংসারে বড়ো ঝুটঝঞ্ঝাট।

হরগোপাল, তুমি কি মাইয়ালোকরে ভয় পাও?

হরগোপাল মৃদু হেসে লজ্জার গলায় বলে, তা একটু পাই মন্মথবাবু। মিছা কথা কইয়া লাভ কী?

মন্মথবাবু দূরের দিকে চেয়ে শরতের শেষ বেলার আলোর সঙ্গে নদীর জলের খেলাটা দেখছিলেন। সেই খেলায় আকাশের ঘন নীল ছায়াটিরও কিছু যোগ আছে। ব্যস্ত ব্যারিস্টার প্রকৃতি অবলোকন করার বিশেষ সময় পান না। আজ ভারি অন্যরকম লাগছে। একটা শ্বাস মোচন করে বললেন, তোমার দিদির কাছে একখান বৃত্তান্ত শুনছিলাম। কমু?

হরগোপাল তটস্থ হল। শঙ্কিত গলায় বলল, কী শুনছেন?

কইতে একটু বাধক হইতাছে। সেনসিটিভ ম্যাটার। শুনছি তুমি নাকি লাবণ্য নামে একটা মাইয়ারে পছন্দ করতা।

হরগোপাল আচমকা সাদা হয়ে গেল। মাথা নত করে মুখ লুকোলো সে। তারপর বলল, ছাইড়্যা দ্যান মন্মথবাবু। ওই কথায় আর কাম কী?

মন্মথবাবু সমবেদনার গলায় বললেন, না হে, আমি বেশি গভীরে যাইতে চাই না। শুধু জানতে চাই, কথাটা সত্য নাকি?

হরগোপাল খুব মৃদু স্বরে বলল, হ।

স্যাড কেস হে, স্যাড কেস। শুনছি জাতে কাটে কোনো গণ্ডগোল নাই, বর্ণ গোত্র হগল ব্যাপারেই মিল আছিল। দোষের মইধ্যে মাইয়াডা গরিব ঘরের। কিন্তু বাদ সাধল তোমার বাবার দাবিদাওয়া--সত্য নাকি?

হরগোপাল একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, যাইতে দ্যান। ইট ইজ এ ম্যাটার অফ পাস্ট।

আমার কি মনে হয় জান হরগোপাল? আমার শ্রদ্ধেয় শ্বশুরমশাই ইজ নট এ গ্রিডি ম্যান। তিনি বিয়াটা ঘটাইতে দিতে চান নাই বইলাই দাবিদাওয়া তুইল্যা কাটাইয়া দিছেন। ঠিক কইছি?

আমারে জিগাইয়েন না মন্মথবাবু। আমি কইতে পারুম না।

আরে বাপু, তোমার অত ভাইঙা পড়নের কী আছে? লজ্জাই বা পাইতাছ ক্যান? পাস্ট ইজ পাস্ট।

হরগোপাল ডানধারে চেয়েছিল। একটা ছাল ছাড়ানো গরুর লাশ ভেসে যাচ্ছে জলে। তার ওপর একটা শকুন বসা। সে দেখছিল, কিন্তু দৃশ্যটা তাকে স্পর্শ করল না। তখন লাবণ্যর বয়স ছিল চোদ্দো। এখন বাইশ তেইশ, দুটো ছেলেমেয়ের মা। তার স্বামী ঢাকার উকিল। লাবণ্য নিশ্চয়ই আর তার কথা ভাবে না। ভাববেই বা কেন?

হঠাৎ মন্মথবাবু প্রসঙ্গ পালটে বললেন, ফিরতে তো রাইত হইয়া যাইব হে হরগোপাল। অন্ধকারে নৌকায় ফিরতে তো বিপদের কথা।

না, বিপদ কীসের। যাইত্যাছি উজানে, ফিরুম ভাটিতে, আধা ঘন্টার বেশি লাগব না। জ্যোৎস্না রাইত, আইজ চতুর্দশী, বিলাতে আর কইলকাতায় থাইক্যা তো তিথিনক্ষত্র ভুইল্যাই গেছেন।

মন্মথবাবু লজ্জা পেয়ে বললেন, ঠিকই কইছ। ওই সব আইজকাইল মনেই থাকে না।

মন্মথবাবু আরও একটা সিগারেট ধরালেন। এই সব অঞ্চল তিনি এক সময়ে ভালোই চিনতেন। কিন্তু দীর্ঘ অনুপস্থিতি খানিকটা অচেনার পর্দা টেনেছে। শরতের ভরা নদীর ওপর

শেষবেলার আলোয় যে সৌন্দর্যটি রচিত হয়ে আছে তা উপভোগ করতে একটা বাধা হচ্ছে তাঁর। ছেলের জন্য পাত্রী দেখতে যাচ্ছেন--সে উদ্বেগ তো আছেই। আর আছে কলকাতায় ফেলে আসা নানা অসমাপ্ত কাজের জন্য, মামলা-মোকদ্দমার জন্য একটা তটস্থ ভাব। মন যে মানুষের কতবড়ো শত্রু। ছেলে অমিতাভ তাঁরই জুনিয়র। এম এ এবং ল পাস করে বাপের কাছে কাজ শিখছে। ব্যারিস্টারি পড়তে সেও বিলেতে যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়ে আছে। বিয়েটা তার আগেই দেওয়া দরকার। মন্মথবাবুর বাবা শচীন্দ্রনাথও মেমসাহেবদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য ছেলেকে বিয়ের টিকা দিয়ে দিয়েছিলেন। কাজটা মন্দ করেননি। সেই ট্র্যাডিশন মন্মথবাবুও বজায় রাখতে চান। ব্যাচেলারদের পক্ষে বিলেত ভালো জায়গা নয়।

মাঝি ঝুমরু মিঞা হঠাৎ হাঁক মারল, ওই ঘাট দেখা যায় কর্তা।

মন্মথবাবু তটস্থ হয়ে বললেন, আইয়া পড়লাম নাকি হে হরগোপাল?

আইজ্ঞা।

মাজার কাপড় কিন্তু অখনও শুকায় নাই।

উপর উপর শুকাইলেই চলব।

যা কও। অখন সংক্ষেপে পাত্রীপক্ষের কথা একটু কইয়া লও তো হরগোপাল। একটু হোমওয়ার্ক থাকন ভালো।

আইজ্ঞা এইটা লইয়া তো চাইরাটা পাত্রী দ্যাখলেন। ঘাবড়াইয়েন না। পাত্রীপক্ষ পুরানো জমিদারবংশ। তবে অখন পড়তি, যতদূর খবর পাইছি, বংশমর্যাদা আছে, পাত্রীর এক জ্যাঠা আই সি এস আছিল। অখন বাইচ্যা নাই। পাত্রীর বাপ ভালো সেতারি, গানবাজনার চল আছে পরিবারে।

পাত্রী কেমন?

ঘটকমশায় তো কইছিল খুব সুন্দরী। তবে ঘটকগো কথা তো বুঝতেই পারেন। বাড়াইয়া কয়।

ঘাট সত্যিই দেখা যাচ্ছিল। কাঠের পাটাতনওয়ালা ঘাট। জলকাদা মাড়াবার সম্ভাবনা নেই। ঝুমরু বৈঠা ফেলে লগি তুলে নিয়ে দক্ষ হাতে সামান্য উজিয়ে গিয়ে ঘাটের দিকে নৌকা ফেরাল। পাটাতনের গায়ে মাখনের মতো নরম ঘষায় নৌকো লাগিয়ে দিল মাঝি।

একটু ওপরের দিকে কন্যাকর্তারা অপেক্ষা করছিলেন। নৌকো লাগতেই হুড়হুড় করে নেমে এলেন তাঁরা। দুজন বয়স্ক মানুষ আর দুজন সুশ্রী যুবক।

হরগোপাল চাপা স্বরে বলল, পাত্রীর খুড়া মধুসূদনবাবুরে চিন্যা রাখেন। ওই যে মাথায় টাক। মোহনবাগানে খেলত।

তুমি চিন নাকি?

তিনি। মধু চৌধুরি ফেমাস লোক। হগলেই চিনে।

কন্যাকর্তারা হাতজোড় করে বললেন, আসেন। আসেন। কী সৌভাগ্য। কী সৌভাগ্য।

তাঁরাই হাত বাড়িয়ে দু'জনকে পাটাতনের ওপর তুললেন।

মধুসূদন বিনয়বচনে বললেন, আসেন ব্যারিস্টার সাহেব, কত বড়ো একজন মাইনসের পাও পড়ল আমাগো গ্রামে।

মন্মথ হাসলেন, বড়ো মানুষ আর কেমনে? মক্কেলগো মাথায় কাঠাল ভাইঙ্গা খাই। আমারে কি আর বড়োমানুষ কওন যায়? আসো হে হরগোপাল।

দীর্ঘকায় ও সুপুরুষ হরগোপাল তার পোর্টম্যান্টো হাতে নিয়ে ভগিনীপতির পিছু পিছু এগোল। তার মনটা আজ খারাপ। শরতের এই সুন্দর বিকেলে লাবণ্যর প্রসঙ্গটা তো না উঠলেই পারত।

পালকিতে উঠতে একটু ইতস্তত করছিলেন মন্মথবাবু। বললেন, জীবনে পালকিতে উঠি নাই। ইজ ইট সেফ?

মধুসূদন শশব্যস্তে বললেন, খুব সেফ। ওঠেন।

আপনাগো বাড়ি কতদূর?

আইজ্ঞা কাছেই। পোয়া মাইল।

তা হইলে পালকি থাউক। হাইট্যাই যাই চলেন। কথা কইতে কইতে যাওন যাইব অনে।

এই নিয়ে একটু ঠেলাঠেলি, উপরোধ হল। তবে পাত্রীপক্ষ মন্মথকে একটু বিশেষ সমীহের চোখে দেখছে, বিলেত ফেরত ব্যারিস্টার বলে কথা। শেষ অবধি মন্মথনাথের কথাই থাকল।

রাস্তাটা অতি মনোরম। সুরকির পথ। দু'ধারে নিবিড় গাছপালা। ফাঁকে ফাঁকে পল্লিচিত্র দেখা যাচ্ছে। অভিনব কিছু নয়। তবু মন্মথনাথের মনটা প্রসন্ন হল। তিনি হঠাৎ আসা বৃষ্টিতে ভেজার ঘটনাটা বললেন। বিলেতের কথাও একটু হল। অমিতাভর কথাও একটু।

হরগোপাল একটু চুপ মেরে গেছে। একটু পিছিয়ে হাঁটছে সে। তার কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে না তেমন।

রাস্তা সামান্যই। একটু বাদেই মস্ত বাগান ঘেরা পুরোনো বাড়িটা দেখা গেল। দু'মহলা বাড়ি। এক সময়ে চাকচিক্য ছিল। এখন নেই। সারাইয়ের অভাবে বাইরের দেয়ালে নোনা ধরেছে, চাপড়া খসে পড়েছে, জানালা দরজাও কিছু ভগ্নদশায়।

বাইরের মস্ত সিঁড়িতে কন্যাপক্ষের বিস্তর মানুষ অপেক্ষা করছিলেন। তাঁদের দেখেই সকলে শশব্যস্তে নেমে এলেন।

মস্ত বৈঠকখানায় নীচু তক্তাপোশে ফর্সা চাদর পাতা। ফুলদানিতে ফুল। গোলাপজলের গন্ধ। বসতে না-বসতেই চাকর রুপোর ট্রেতে রুপোর গ্লাসে শরবত নিয়ে এল।

আপ্যায়ন প্রায় ত্রুটিহীন।

পাশে বসা হরগোপালকে মন্মথ চাপা স্বরে বললেন, একটু তাড়াতাড়ি করতে কও। ফিরতে দেরি হইলে আবার কোন ভজভট্ট বাধে তার ঠিক কী?

ক্যান, জ্যোৎস্না রাত্রে নদীর দৃশ্য দেখবেন না?

তাও তো কথা। তবু তাড়াতাড়ি করতে কও। তোমার দিদি বইয়া থাকব।

এলাহি মিষ্টিমুখের আয়োজন। মন্মথনাথ মিষ্টি ভালবাসেন। খেলেনও কয়েকটা।

হরগোপাল খাইলা না?

আইজ্ঞা না।

ক্যান খাইলা না? ভালো জাতের মিষ্টি।

জানি। তবে ডাক্তারি মতে মিষ্টি নিকৃষ্ট খাদ্য।

ওঃ, আমি তো ভুইলাই যাই যে তুমি একজন এম বি ডাক্তার।

আমিই ভুইল্যা যাই তো আপনের আর দোষ কী?

জলযোগের পর একটু বিরতি। পাত্রীর বাবা মহেন্দ্রনাথ ভারী ভালোমানুষ গোছের লোক। মুখে একটা ভোলানাথ-ভোলানাথ ভাব আছে। সুরের জগতেই বাস, বাস্তব পৃথিবীর তেমন খোঁজখবর রাখেন না। ফরাসডাঙার ধুতি আর গরদের পাঞ্জাবি পরে আজ যথাকর্তব্য করতে হচ্ছে বটে, কিন্তু অস্বস্তিটা তাঁর মুখে ফুটে আছে। হাতজোড় করে বললেন, আমার মেয়েকে আনি?

আনুন। দেরি করা ঠিক হবে না।

দু'জন ঘোমটা দেওয়া মহিলা দু'দিক দিয়ে ধরে যাকে আনল তাকে দেখে মন্মথনাথ প্রথম দর্শনেই মুগ্ধ হয়ে গেলেন। এলো চুলের ঝাঁপি কোমর অবধি নেমেছে। বড়ো বড়ো দুখানা চোখ, ঢলঢলে মুখ আর নাতিদীর্ঘ শরীরের মেয়েটিকে পরমাসুন্দরীই বলা যেত যদি গায়ের রংটা আরও একটু ফর্সা হত। মেয়ে কালো নয়, তবে গৌরবর্ণাও বলা যাবে না। মেয়ে কী ভাবে দেখতে হয়, কী প্রশ্ন করতে হয় তা মন্মথনাথ জানেন না। তিনি মুগ্ধতার কয়েক মুহূর্ত পার করে হরগোপালকে চাপা গলায় বলেন, কেমন দেখ?

আমি অখনও দেখি নাই।

কও কী?

আপনে তো জানেন আমি মাইয়ালোকের দিকে চাই না।

হ, হ, জানি। কিন্তু তুমি একটা ইমপসিবল মানুষ। আমি অখন কী করুম কইবা তো।

আপনে ব্যারিস্টার মানুষ, আপনেরে কী শিখামু? যা খুশি জিগান। এই দ্যাশে পাত্রীপক্ষ হইল অধমর্ণ, তারা অপমান গায়ে মাখে না। জিগান।

তোমারে লইয়া আর পারি না।

আপনের পছন্দ হইছে?

মন্দ না হে।

তবে দু-চাইর কথা জিগাইয়া ছাইড়া দ্যান। মাইয়াটা বোধহয় ঘামতাছে।

মন্মথনাথ দণ্ডায়মানা মেয়েটির দিকে ফের চাইলেন। একটা বিশেষ জায়াগায় মেয়েটিকে দাঁড় করানো হয়েছে। জানালা দিয়ে আসছে বিখ্যাত কনে-দেখা-আলো। রূপে যেন ভাসিয়ে দিচ্ছে ঘরখানা।

মন্মথনাথ গলাখাঁকারি দিয়ে বললেন, তোমার নাম কী মা?

মিষ্টি গলায় জবাব এল, অলকা।

বাঃ, সুন্দর নাম। লেখাপড়া কর নাকি?

ক্লাস সেভেনে পড়ি?

বাঃ বেশ। গান গাও নাকি?

গাই।

মহেন্দ্রনাথ বলে উঠলেন আমিই শিখাই অরে। গান শুনবেন?

মন্মথনাথ ডাইনে বাঁয়ে মাথা নেড়ে বলেন, আরে না। গানের আমি বুঝিটা কী? অখন আস গিয়া মা, আমার যা দ্যাখনের দেখছি।

দুদিকে দুই ঘোমটা টানা রহস্যময়ী মহিলার মাঝখানে--যেন বাহিত হয়ে--ধীর পায়ে মেয়েটি অন্দরমহলে চলে গেল। মন্মথনাথ হাঁফ ছাড়লেন। তিনি বিলেতফেরত মানুষ, এরকমভাবে মেয়ে দেখার অভ্যাস নেই। এর আগে তিনটে মেয়ে দেখা হয়েছে, তবে সে সব ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গী ছিলেন স্ত্রী। শরীর খারাপ বলে এ যাত্রায় তিনি আসেননি। এলে মন্মথনাথের এত অস্বস্তি হত না।

হাঁফ ছাড়ল হরগোপালও। মুখ তুলে চারদিকে তাকাতে পারল এতক্ষণে।

চাপা গলায় মন্মথ বললেন, এদের কী কমু হে হরগোপাল?

পছন্দ হইয়া থাকলে হেইটাই কইয়া দেন।

মন্মথনাথ মহেন্দ্রনাথের দিকে চেয়ে বললেন, মাইয়া তো পছন্দেরই। আমার আপত্তি নাই। তবে আমার স্ত্রী একবার দেখব। হেইটাই ফাইন্যাল।

প্রাক্তন খেলোয়াড় মধুসূদন আচমকাই বলে বসলেন, আইজ্ঞা। এইবার দাবিদাওয়ার কথাটা যদি কন। মাইয়া পছন্দ হইলে পাটিপত্র তো করতে হইব।

মন্মথনাথ অকূল পাথারে পড়লেন। কারণ তাঁর শ্যালক হরগোপাল ঘোরতর পণবিরোধী লোক। সে বলেই দিয়েছে যে, দেনা-পাওনার ব্যাপার থাকলে সে এই বিয়েতে উপস্থিত থাকবে না। ও দিকে মন্মথনাথের স্ত্রী সবিতা জেদ ধরেছেন, আর কিছু না হোক, ছেলের বিলেতে যাওয়ার ভাড়াটা ওদের দিতেই হবে। মন্মথনাথের বিলেত যাওয়ার খরচ তাঁর শ্বশুরমশাই দিয়েছিলেন।

মন্মথনাথ চাপা গলায় বললেন, হরগোপাল, তোমার দিদি যে একখান কথা কইয়া যাইতে কইছে, কমু নাকি?

কী কথা মন্মথনাথবাবু?

পণটন না। পোলাটার বিলাত যাওনের তো একটা মোটা খরচা আছে। হেইটা যদি চাওন যায়?

হরগোপাল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, পোলা আপনের, বিয়া আপনি দিত্যাছেন, আমারে জিগান ক্যান।

তুমি যে মরালিস্ট।

আমার কথা বাদ দেন। যা কওনের কইয়া লন। আর দেরি করা ঠিক না।

তোমার আপত্তি নাই তো।

আমার আপত্তি শুইন্যা তো জগৎসংসার চলে না।

মন্মথনাথ দ্বিধায় পড়লেন। সবিতা পরিষ্কার বলে দিয়েছেন, বিলেত যাওয়ার খরচ

চাই-ই। দানসামগ্রীর কথাও আছে। তবে সেটা সবিতাই বলবেন।

মন্মথনাথ একটু ব্যারিস্টারি বুদ্ধি প্রয়োগ করে বললেন, আপনারা কী দিবেন?

মধুসূদন বললেন, আইজ্ঞা আমরা আর কী দিতে পারি কন? তবে পাত্রীর ঠাকুমা আর দিদিমা কিছু সোনাদানা দিব। ষাইট সত্তর ভরি ধইরা রাখেন। খাটপালঙ্ক তো আছেই। নগদ যদি চান--

মন্মথনাথ চোখ বুজে বললেন, ভালো কথা। এর উপরে আর চাওনের মইধ্যে থাকে আমার পোলার বিলাত যাওনের খরচটা। হেইটা যদি--

মধুসূদন আর মহেন্দ্রনাথ পরস্পরের দিকে একটু তাকাতাকি করে নিলেন। মধুসূদন বললেন, আমাগো আপত্তি নাই। কথা কি একরকম পাকা বইলাই ধইরা লমু?

মন্মথনাথ উদার হাস্যে বললেন, আমরা হইলাম ঢাকের বাঁয়া। হেড অফিস হইল পোলার মা। তবে মাইয়া যা দেইখ্যা গেলাম তাইনেরও অপছন্দ হইব না। পরশু তরশুর মইধ্যেই তাইন আইস্যা দেইখ্যা যাইবেন।

হরগোপাল নীরবে মাথা নীচু করে বসে ছিল। পরাজয়টা সে টের পাচ্ছে। গভীরভাবেই পাচ্ছে। কিন্তু ছেলে তার নয়। তার অধিকার নেই বাধা দেওয়ার। সে বড়জোর নিজেকে সরিয়ে নিতে পারে।

মন্মথনাথ কিন্তু খুশি। মেয়ে পছন্দ হয়েছে, দাবিদাওয়ার ব্যাপারে বাধা হয়নি। শুধু হরগোপালের জন্য মনটা একটু খচখচ করছে বটে। এই মর্যালিস্ট শালাটি খুশি হল না। হয়তো বিয়েতেও উপস্থিত থাকবে না। কিন্তু সব দিক কি আর সব সময়ে রক্ষা করা চলে?

মন্মথনাথ উঠবেন বলে চৌকি থেকে পাম্পশুর দিকে পা বাড়িয়েছেন, ঠিক এই সময়ে অন্দরমহল থেকে একটি দাসী গোছের মেয়েমানুষ ব্যস্তসমস্ত পায়ে এসে মধু বাবুর কানে কানে কিছু বলল। গোপনেই বলা। তবু কথাটা দু'জনেই আবছা শুনতে পেলেন। ভিতরবাড়িতে কে যেন মূর্ছা গেছে।

মধুসূদন অবশ্য বুদ্ধিমান লোক। কোনো চাঞ্চল্য প্রকাশ করলেন না। মহেন্দ্রনাথও স্থির। শুধু তাই নয়, মধুসূদন এবং আরও কয়েকজন মিলে তাঁদের ঘাট অবধি পৌঁছে দিয়ে গেলেন।

নৌকা যখন ছাড়ছে তখন সন্ধের মুখে দিগন্তে চাঁদ উঠল। জ্যোৎস্নায় নদী যেন রূপকথায় নিয়ে চলল।

ঘাটে তখনও পাত্রীপক্ষ দাঁড়িয়ে। নৌকা একটু তফাত হতেই মন্মথ উদ্বেগের গলায় বললেন, মাইয়ার কী মৃগী আছে নাকি হে?

কইতে পারি না?

কথাটা শুনছ?

শুনছি।

টেনশনে ফালাইয়া দিল। মাইয়ালোকটা আইয়া কার কথা কইল কও তো। মনে হয় মাইয়ার কথাই। হইতে পারে।

মৃগী মানে তো ডেনজারাস জিনিস। যখন তখন মুখ ভ্যাটকাইয়া পইড়া থাকব। না হে, ভাল কইরা খোঁজ না লইয়া এই সম্বন্ধ তো করন যায় না।

আইজ্ঞা।

তুমি বরং ঘটকরে পাঠাইয়া না কইরাই দাও। আমি ভাল বুঝত্যাছি না।

আইজ্ঞা।

হরগোপালের খুব নিরুত্তাপ লাগছিল। চারদিকে এমন জ্যোৎস্না, এত অপার্থিব সৌন্দর্য যে মনে হয়, মানুষের আর কী চাই? ভগবানের এত ঐশ্বর্য চারদিকে ছড়ানো, মানুষ আর কীই বা চাইতে পারে?

ফেরার সময়টায় কথাবার্তা প্রায় হলই না। মন্মথবাবু একটু গুম হয়ে আছেন। হরগোপাল বড়ই অনমনা। অলকার যে মৃগী নেই তা হরগোপাল জানে। কিন্তু সেই জানাটা মন্মথবাবুকে জানানো যায় না। অলকা কেন অজ্ঞান হয়ে গেছে তা হরগোপাল না জানলেও

আন্দাজ করতে পারে। আজ অঝোরধারার জ্যোৎস্না, এই নদী, এই মুক্ত পৃথিবী তার হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে।

মাস দুয়েক আগেকার কথা। তাকে এক সকালবেলায় মধুসূদন 'কল' দিতে এসেছিলেন। বললেন, আমার ভাস্তির বড়ো অসুখ। একবার চলেন।

হরগোপাল মিষ্টি হেসে বলল, অন্য ডাক্তার দেখান গিয়া।

মধুসূদন অবাক হয়ে বললেন, ক্যান, আপনে যাইবেন না?

আইজ্ঞা না। আমি মাইয়ালোক রুগি দেখি না।

কন কি ডাক্তারবাবু? এইরকম তো শুনি নাই।

আইজ্ঞা মাপ করবেন।

মশয়, রুগি ইজ রুগি। তার আবার মাইয়ালোক পুরুষলোক বাছবিচার কীসের? আপনে তো আইচ্ছা লোক দেখত্যাছি। ব্রহ্মচারী নাকি মশয়?

তাও কইতে পারেন।

মধুসূদন কিছুক্ষণ হাঁ করে চেয়ে থাকলেন তার দিকে। তারপর নরম হয়ে বললেন, দেখেন হরগোপালবাবু, আমার ভাস্তিটার কঠিন অসুখ। মেলা ডাক্তার দেখাইছি, কাম হয় নাই। আপনে এই এলাকার বড়ো ডাক্তার। রুগি যদি চিকিৎসাবিভ্রাটে মরে তবে আপনের পাপ হইব।

বেশ কিছুক্ষণ কথার পিঠে কথা। আকচাআকচি। তারপর একটা শর্তে রাজি হল হরগোপাল। রুগির মুখ দেখবেন না। রুগি ছোঁবে বটে তবে সার্জিক্যাল গ্লাভস হাতে পরে।

এই অদ্ভুত প্রস্তাবে মধূসূদনের বাড়ির লোক হতবাক। তবে তারা হরগোপালের শর্ত মেনেছিল। অলকার বিছানার এক পাশে পর্দা টেনে তাকে আড়াল করা হয়েছিল। হরগোপাল নাড়ি দেখল এবং স্টেথসকোপ লাগাল সার্জিকাল গ্লাভস পরা হাতে। জিবের রং কেমন তা মায়ের কাছে জেনে নিল। হরগোপাল বিচক্ষণ ডাক্তার। তার চিকিৎসায় আরোগ্যলাভ করতে অলকার দেরি হয়নি। কিন্তু বিপদটা হয়েছিল তার ওই নারী বিষয়ক

ছুঁৎমার্গ থেকেই। এমনিতে হয়তো কিছুই হত না, কিন্তু ওই যে তার ভয়ংকর শুচিবায়ু এবং ব্রহ্মচর্য ওইটেই অলকাকে পেড়ে ফেলেছিল বোধহয়।

মাত্র ষোলো বছরের মেয়েদের পছন্দ অপছন্দ তৈরি হওয়ার কথা নয়। পছন্দের কথা প্রকাশ করা তো আরও সাঙঘাতিক ব্যাপার। তবু অলকা তার সখীদের মারফত এবং খুড়তুতো জ্যেঠতুতো বোনেদের মাধ্যমে খবরটা পৌঁছে দিয়েছিল অভিভাবকদের কানে। কারও অমত হয়নি। কিন্তু যে-মানুষ নারীমুখ দর্শন করে না তাকে বিয়েতে রাজি করানো কি সোজা কথা?

মধুসূদন ক'দিন পরেই আবার এক সকালে তার চেম্বারে হানা দিলেন। ধানাইপানাই নানা কথা। তার পর এক ফাঁকে তাঁর ভাইঝির কথাটা তুললেন। ভাইঝির জন্য একটি ভালো পাত্র চাই বলে কথাটা পাড়লেন। একখানা ফটোও ধরিয়ে দিলেন হাতে। নারীমুখ না দেখলেও হরগোপাল মেয়েদের ফটোর দিকে তাকাতে তেমন আপত্তি করে না। ফুটফুটে মুখখানা কিন্তু প্রথমেই একটা ধাক্কা দিয়েছিল হরগোপালকে। সচরাচর এত সুশ্রী কমনীয় মুখাবয়ব দেখা যায় না। এ মেয়ের যে সুপাত্রের অভাব হবে না তা সে একঝলক ফটোটা দেখেই বুঝেছিল। বলেছিল, ঠিক আছে, দেখুম। সুপাত্রের সন্ধান পাইলে জানামু।

আশ্বাস পেয়েও মধুসূদন বসে রইলেন। তারপর খুব সন্তর্পণে কথাটা তুললেন।

হরগোপাল অবাক হল না। কারণ সে অতীব সুপুরুষ, ধনীপুত্র এবং কৃতী ডাক্তার বলে মেয়েদের দিক থেকে এরকম আগ্রহ এর আগেও বহুবার প্রকাশ পেয়েছে। সে শুধু সংক্ষেপে বলেছিল, ভাস্তিরে বুঝাইয়া কইয়েন যে এইটা সম্ভব না।

ফের কিছুক্ষণ অনুনয়বিনয়, বোঝানোর চেষ্টা। ব্যর্থমনোরথ হয়ে মধুসূদন ফিরে গেলেন বটে, কিন্তু বিপদ দেখা দিল অন্য দিক দিয়ে। যে-ধাক্কাটা ফটো দেখে হরগোপালের বুকে লেগেছিল সেটাই নানা বিভঙ্গে বার বার তার বুকের মধ্যে তরঙ্গ তুলতে লাগল। ফটোটা বারকয়েক গোপনে পাপকার্য করার মতো মন দিয়ে দেখল সে। বুকে ধড়ধড়ানির মতো একটা ব্যাপার হতে লাগল।

সবচেয়ে বড়ো কথা, ব্যাপারটা প্রশমিত হল না। লাবণ্যকে নিয়ে চিন্তা করলে যেমনটা হত এটা তার চেয়েও খানিকটা বেশিই। এটা টের পাওয়ার পর থেকেই হরগোপাল এত ভয় পেয়ে গেল যে তার মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড়।

ও দিকে মধুসূদনের আনাগোনার বিরাম নেই। তিনি নানাভাবে তাকে ভজানোর চেষ্টা করেন। আর কেবল বলেন, ভাইব্যা দ্যাখেন হরগোপালবাবু, ভাইব্যা দ্যাখেন। আমার ভাস্তিটার অবস্থা দেখলে আপনার চোখে জল আইব। বড়ো ভালো মাইয়া। আপনের ভিতরে যে কী দেখছে হে-ই জানে।

গত দু'মাস হরগোপাল শান্তিতে নেই। মাত্র কয়েকদিন আগে দিদি আর ভগিনীপতিকে আনিয়েছে সে। তাঁরা ছেলের জন্য কলকাতা এবং অন্যত্র পাত্রী দেখছিলেন। হরগোপালের চিঠি পেয়ে এসেছেন। বিয়েটা একবার হয়ে গেলেই যে অশান্তিটা মন থেকে চলে যাবে এতে হরগোপালের সন্দেহ ছিল না।

কিন্তু বোকা মেয়েটা বাধ সাধল। ভালোয় ভালোয় প্রথম দফাটা কাটিয়ে দেওয়া গিয়েছিল ঠিকই। কিন্তু মেয়েটা অজ্ঞান হওয়ায় তার দাসীটা এসে বৈঠকখানায় খবরটা দেওয়ায় সবই ভণ্ডুল হয়ে যায় বুঝি।

ওহে হরগোপাল।

কন।

মুখে যে পিঠালি দিয়া বইস্যা আছ.। কিছু কও।

কী কমু?

কিছু একটা কও। আইজকার দিনটা হরিষে বিষাদে গেল।

ক্যান?

মাইয়াটা দেইখ্যা বড়ো পছন্দ হইছিল হে। তোমার দিদিরও হইত। কিন্তু মৃগী রোগই পথ আটকাইল।

আইজ্ঞা।

হরগোপাল ফের চুপ মারল। বিয়েটা ভণ্ডুল হয়ে যাওয়ায় তার মনটা কি খুব খারাপ? হ্যাঁ, একটু খারাপ বই কি। আবার যেন বুকটা একটা হালকাও লাগে। কেন লাগে কে জানে। হরগোপালও হরিষে বিষাদে চেয়ে জ্যোৎস্নায় বিধৌত চরাচরের দৃশ্য দেখছিল। পৃথিবীর রহস্য সে বোঝে না, নিজের ভিতরকার রহস্যকেও সে চেনে না।

হরগোপাল।

কন।

অখন হঠাৎ মনে পড়ল। তুমি মাইয়াটার দিকে চাও নাই ঠিকই, মাইয়াটা কিন্তু তোমার দিকে চাইয়া আছিল।

ঠিক এই সময়ে ঝুমরু মাঝি হাঁক দিল, ঘাট আইয়া পড়ছে কর্তা।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে টলটলায়মান নৌকায় উঠে দাঁড়াল হরগোপাল। তারপর বলল, আইচ্ছা মন্মথবাবু, একটা প্রতিমার বিসর্জন না হইলে আর একখানা প্রতিমার বোধন হয় নাকি?

না হে হরগোপাল, তা ক্যামনে হয়?

নৌকায় বইস্যা হেই কথাটাই ভাবতাছিলাম।

মন্মথবাবুর নড়া ধরে ঘাটে তুলে আনল হরগোপাল। মন্মথবাবু একটু হাঁফ ধরা গলায় বললেন, তা হইলে কথাখান ভাবলা?

ভাবলাম।

বুদ্ধিমান ব্যারিস্টার মৃদু হেসে বললেন, পুরানা প্রতিমা রাইখ্যা কাম কী? বিসর্জন দিয়া ফালাও।

দিতে হইবে না। বিসর্জন হইয়াই গেছে।

বাইচ্যা গেলা হে হরগোপাল, বাইচ্যা গেলা।

বাঁচলাম না মরলাম হেইটা কইতে পারি না।

দুইজনে গাঁয়ের রাস্তায় জ্যোৎস্নার আলোয় হাঁটতে লাগলেন।

ত্রয়ী

১. সুপারম্যান

সুপারম্যানের সঙ্গে আমার দেখা এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে। বলছি।

পাপড়িকে বলা যায় আমার প্রেমিকা। সাদামাটা বাংলায় এর চেয়ে জুৎসই শব্দ খুঁজে পাওয়া মুশকিল। পাপড়ি যথারীতি একটু বোকা এবং ইংলিশ মিডিয়ম। প্রেমিকার সঙ্গে আঠার মতো লেগে আছে প্রেম কথাটি। অর্থাৎ লায়লা-মজনু, রোমিও-জুলিয়েট বা রাধা-কৃষ্ণ। পাপড়ি এবং আমার সম্পর্ক অবশ্যই তেমন নয়। আমরা দু'জনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং ইংরেজিতে যাকে বলে ওয়েল উইশার। আমাদের বিয়ে কোনো দিন হতেও পারে, না-ও হতে পারে। হলে যে আমরা দারুণ খুশি হব তা নয়, না হলে যে ভীষণ দুঃখ পাব এমনটিও মনে করার কারণ নেই।

আপাতত পাপড়ি একটু সমস্যায়। ওর মা আর বাবার মধ্যে ডির্ভোসের মামলা চলছে। ওর বাবা ইতিমধ্যে এক পঞ্জাবি মহিলার সঙ্গে দিল্লিতে বসবাস করছেন। ওর মা প্রাণপণে বর খুঁজে বেড়াচ্ছেন। পাপড়ির মাকে আমি পাত্র নির্বাচনে যথেষ্ট সাহায্য করার চেষ্টা করে যাচ্ছি। কাজটা সহজ নয়। বয়স, মেচেতা বা মেদ কোনওটাই বড় বাধা নয়। কথা হল, ঝাড়াই বাছাইয়ের পর যে দুটি পাত্র ঠিক করা গেছে তাদের মধ্যে কোনজন? রাম জালান, না সোমনাথ বসু?

সেদিন রাত প্রায় সাড়ে দশটা অবধি পাপড়িদের সাততলার ফ্ল্যাটে আমি, পাপড়ি আর পাপড়ির মা একটা ফাইন্যাল ডিসিশনে আসার চেষ্টা করছিলাম।

পাপড়ি বলল, দেখো মা, রাম সব দিক দিয়েই ফিট। ব্যাচেলর, ওয়েল কানেকটেড, ডিগনিফায়েড অ্যাণ্ড এভরিথিং। কিন্তু আমার ওপর ওর একটু উইকনেস আছে। বয়সে তোমার চেয়ে ঢের ছোটো। তুমি যদি ওকে নজরে নজরে রাখতে না পারো তা হলে এনি নাইট হি মাইট বি ল্যান্ডিং ইন মাই বেড।

পাপড়ির মা বললেন, সোমনাথের যে ছেলে নিয়ে প্রবলেম। একটা পাগল ছেলে বাড়িতে থাকলে দেয়ার উইল বি নো কমফোর্ট।

বস্তুত সোমনাথ বসুকেই পাত্র হিসেবে আমার আর পাপড়ির কিছু বেশি পছন্দ। তবে বাধা ওই ছেলেটা। বেশ লম্বা চওড়া চেহারার চব্বিশ পঁচিশ বছরের ছেলে। কিন্তু তার রোগ হল, সারাদিন চুপচাপ বসে থাকে। নড়াচড়া কম করে, কথা বলেই না, শুধু চারদিকে চেয়ে একটা সন্দিহান তীক্ষ্ণ নজরে সব কিছু দেখে যায়। সোমনাথ এই ছেলে নিয়ে উদবিগ্ন, তটস্থ, স্বস্তিহীন। নইলে বিপত্নীক, বড়ো কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর, স্বাস্থ্যবান ও সুপুরুষ এই ব্যক্তিটি সম্পর্কে দ্বিধান্বিত হওয়ার কারণ ছিল না।

রাত সাড়ে দশটা অবধি সিদ্ধান্তে আসতে না পারায় আমরা তিনজনেই বেশ গরম হয়ে গেলাম। পাপড়ির মা একটা চমৎকার ককটেল করে দিলেন। সেটা খেয়ে যখন আমি বিদায় নিলাম তখন পাপড়ি সিঁড়ির মুখ অবধি এগিয়ে দিতে এসে বলল, জন, তুমি কিছু করতে পারো না?

কী করার কথা বলছ?

সোমনাথকেই আমি নতুন বাবা হিসেবে চাই।

আমিও চাই।

পাপড়ি চোখ বড়ো করে বলল, তোমার নতুন বাবা হিসেবে?

ওর বোকামি দেখে বিরক্ত হয়ে বললাম, আরে না। তোমার নতুন বাবা হিসেবে।

কিন্তু হবে কী করে? বলে পাপড়ি প্রায় ঠোঁট ফুলিয়ে কেঁদে ফেলে আর কি।

আমি ওর হাতটা ধরে বললাম, মেনে নাও।

কী মেনে নেব?

সোমনাথের ছেলেটাকে।

মেনে নেওয়াটা আবার কীরকম?

লেট হিম বি দেয়ার।

মা যে পাগলদের ভীষণ ভয় পায়।

অর্থাৎ সমস্যাটা যেখানে ছিল সেখানেই রয়ে যাচ্ছে। এক চুল নড়ছে না। দিন তিনেক বাদে আবার যখন সিটিং বসল তখন সুষমা দেবী, অর্থাৎ পাপড়ির মা পরিষ্কার বললেন, দেখো জন, দেখো পাপড়ি, আমার কিন্তু বয়স হয়ে যাচ্ছে। এরপর খুব দেরি হয়ে যাবে।

পাপড়ি আমার দিকে চাইল, আমি পাপড়ির দিকে।

সুষমা বললেন, আমি জানি তোমরা সোমনাথকেই আমার হাজব্যাণ্ড হিসেবে চাও। বেশ ভালো কথা। সেক্ষেত্রে তোমাদের কিছু কনস্ট্রাকটিভ কাজ করতে হবে। কিডন্যাপ দ্যাট বয় অ্যাণ্ড রিমুভ হিম টু এ মেন্টাল হোম।

আমরা দু'জনেই সমস্বরে বলে উঠলাম, কিডন্যাপ। সে কী?

সুষমা বিরক্তির গলায় বললেন, এ মাইনর সিন। এমনকি রিস্কি কাজও নয়। ওয়াটগঞ্জে ডাক্তার সানি সেনগুপ্তর একটা পাকা এস্টাব্লিশমেন্ট আছে। অল ফাইভ স্টার অ্যারেঞ্জমেন্টস। ইটস আ মেন্টাল হোম ফর একস্ট্রিমলি রিচ পিপল।

পাপড়ি খুব ঘাবড়ে যাচ্ছিল বটে, কিন্তু আমি আইডিয়াটা নাড়াচাড়া করে দেখলাম, প্রস্তাবটার মধ্যে মাল আছে। ফেলে দেওয়ার মতো নয়।

সুষমা দেবী বললেন, আমাকে সুখী দেখার জন্য তোমরা এটুকু নিশ্চয়ই করতে পারো। মে বি দি বয় উইল পুল আউট অফ দ্যা স্টুপর ইন এ গুড মেন্টাল হোম। সোমনাথটা বোকা আর অবসেসড বলে ছেলেটাকে ওরকম আগলে রেখেছে।

আমি বললাম, দ্যাটস ওকে। কিন্তু ছেলে নিরুদ্দেশ হলে সোমনাথ খেপে যাবে না। হি ইজ অ্যান একস্ট্রিমলি স্টাবোর্ন ম্যান।

সুষমা বললেন, তুমি ভীষণ বোকা জন মাই ডারলিং। সোমনাথ খেপে যাবে তো ঠিকই। কিন্তু তারপর কি করবে? হি উইল সার্চ এভরিহোয়্যার, হি উইল গো টু পুলিশ, হি উইল ইনসার্ট অ্যান অ্যাড ইন নিউজপেপারস। দেন হোয়াট? যখন কিছুতেই কিছু হবে না তখন ওয়ান ডে হি উইল কাম টু মি উইথ টিয়ারস ইন হিজ আইজ। তখন আমি ওকে কাছে টেনে নিয়ে সব জ্বালা যন্ত্রণা ভুলিয়ে দেব। শুধু ভালোবাসা দিয়ে। বুঝলে?

সুষমা এমনভাবে বিবরণটা দিচ্ছিলেন যেন সব ব্যাপারটা তিনি প্রত্যক্ষ করছেন। তাঁর মুখ উজ্জ্বল, চোখ স্বপ্নাতুর। ওর ওপর আমার খুব একটা শ্রদ্ধা হল। ভদ্রমহিলা বুদ্ধিমতী, দূরদর্শী।

একটু গলা খাঁকারি দিয়ে আমি বললাম, দ্যাটস ও কে। কিন্তু অত বড়ো একটা ছেলেকে কিডন্যাপ করা খুব সহজ কাজ নয়। ছেলেটা বেশ শক্তপোক্ত চেহারারও। রেজিস্ট্যান্স দেবে।

সুষমা বললেন, রাফ হ্যান্ডলিং আমি পছন্দ করি না। তবে ছেলেটার দুটো অবসেশন আছে। হাই পাওয়ার মোটর বাইক অ্যাণ্ড বিউটিফুল গার্লস।

সুষমা এইটুকু বলে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার আর পাপড়ির দিকে তাকালেন। আমার একটি হোন্ডা মোটরবাইক আছে, আর বলাই বাহুল্য পাপড়ি সুন্দরী। সুতরাং সোমনাথ বসুর পাগল ছেলেকে গুম করার দায়িত্ব নিঃশব্দে আমাদের ওপরেই বর্তাল। আমাদের মধ্যে একটু অনিচ্ছে হয়তো দেখা দিয়েছিল কিন্তু সুষমা চোখ এবং ব্যক্তিত্ব দিয়ে সেটাকে শাসন করে দিলেন।

পরদিন বেলা দশটা নাগাদ আমি আমার হোন্ডার পিছনে পাপড়িকে চাপিয়ে নিয়ে গিয়ে সোমনাথের বাড়ির সামনে নামিয়ে দিই। সোমনাথ অফিসে গেছে। বাড়িতে ছেলেটা একা। চারদিকে রোদ ঝলমল করছে এবং শীতকাল। নির্জনতাই যথেষ্ট। উপরন্তু পাগলের ভয়ে সোমনাথের বাড়িতে কাজের লোক থাকে না বলে বাড়িতেও পরিবেশ খুব জনহীন। উঁকি ঝুঁকি দেওয়ার কেউ নেই।

কিন্তু মুশকিল হল পাপড়িকে নিয়ে। তার মুখ সাদা এবং শুকনো। চোখে ভয়। মিনমিনে গলায় বলল, জন, আমিও যে পাগলদের ভীষণ ভয় পাই।

আমি ঠোঁট কামড়ে একটু ভেবে বললাম, সেল্ফ স্যাক্রিফাইস করা ছাড়া আমি তো আর অন্য কিছু ভেবে পাচ্ছি না।

তুমি কি যথেষ্ট কাছাকাছি থাকবে?

চেষ্টা করব। বিপদে পড়লে চেঁচিও। কিন্তু চেঁচামেচি করার জন্য তুমি আসোনি। এসেছ ছেলেটার সঙ্গে একটু ইয়ে করতে। মনে রেখো।

পাপড়ি বিপন্ন গলায় বলে, আমি যে কোনো পাগলের সঙ্গে কখনও প্রেম করিনি জন। এক্সপেরিয়েন্স নেই।

অভিজ্ঞতাটা তা হলে আর বাকি থাকে কেন। হয়ে যাক।

পাপড়ি অগত্যা দ্বিধাজড়িত পায়ে এগিয়ে গেল। আমি বাইরে অপেক্ষা করতে লাগলাম, উৎকর্ণ এবং কিছুটা উদবিগ্ন হয়ে।

ঘন্টাখানেক বাদে যখন পাপড়ি বেরিয়ে এল তখন তাকে দেখে কে বলবে এ সেই পাপড়ি। আমি বিস্ময়ে কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলাম না। পাপড়ি সুন্দরী, কিন্তু এখন তার মুখ চোখ সমেত সমস্ত শরীর যেন এক অদ্ভুত আলোয় ঝলমল করছে। দুই চোখ স্বপ্নাতুর। মুখে এক সম্মোহিতের ভাসমান হাসি। আর যখন তাকে স্পর্শ করলাম তখন স্পষ্ট টের পেলাম তার সমস্ত শরীরে একটা কাঁপুনি--না, কাঁপুনি নয়--একটা ঝংকার রিনরিন করছে।

পাপড়ি আমার চোখে এক আনমনা চোখ রেখে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা জন, পাগলদের কি আলাদা কোনো ল্যাংগুয়েজ থাকে?

সবসময়ে নয়। তবে কারও কারও থাকে। কেন?

পিঙ্কুর আছে, জানো? ওর কথার একটি বর্ণও আমি বুঝতে পারিনি। কিন্তু তবু আমাদের মধ্যে একটা অদ্ভুত কমিউনিকেশন হয়ে গেল। আর কী দুষ্টু জানো? প্রথমদিনেই..মা গো....

বলেই কাচ-ভাঙা হাসি হাসতে হাসতে শতখান হয়ে পড়ছিল পাপড়ি। আমি হোন্ডায় একটা লাথি মারলাম। সেটা ঘেউ ঘেউ করে গর্জে উঠল।

পরদিন সোমনাথের বাড়ির সামনে আমার হোন্ডা থামতে না থামতে পাপড়ি হালকা পায়ে লাফিয়ে নেমে একখানা রঙিন প্রজাপতির মতো উড়ে ভিতরে চলে গেল। আমার দিকে ফিরেও চাইল না। পৃথিবীতে আত্মত্যাগের মহান সব ঘটনার কথা ভাবতে ভাবতে আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম।

সোমনাথের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে তিন ঘন্টার ওপর সময় নিল পাপড়ি। আমি আমার হোন্ডার সিটে বসে বার দুই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। একবার একজন বুড়ি ও আর একবার এক পুলিশ আমাকে সজাগ করে দিয়ে নাগরিক দায়দায়িত্ব সম্পর্কে খানিকটা অবহিত করে যায়।

আজ পিঙ্কু পাপড়ির শরীরে নানবিধ রহস্যময় সুইচ অন করে বিচিত্র সব আলো জ্বেলে দিয়েছে। আমার তো মনে হচ্ছিল, পাপড়ি যেন দেয়ালির রাতের এক বাড়ি। সার সার পিদিম জ্বলছে, তারাবাতি ফুলকি ছড়াচ্ছে এবং সলতের আগুন ধরানো একটা বিকট বোমা অপেক্ষা করছে বিস্ফোরণের জন্য।

পাপড়ি আজ খুব ঘন ঘন শ্বাস ছাড়ছিল, নিচ্ছিল। আমার পিছনে বসে ও শ্বাসের শব্দের মতোই ফিসফিস করে বলল, বিজন ডারলিং, আজ তোমাকে এমন একটা কথা বলব যা শুনে তুমি চমকে উঠবে।

সাংঘাতিক উত্তেজনার কিছু না ঘটলে পাপড়ি আমাকে সহজে বিজন বলে ডাকে না। বিজন নামটা ভ্যাতভ্যাতে, ন্যাতানো, বি বাদ দিলেই নামটা পাঁচ হাজার মাইলের দুরত্ব রচনা করে।

যাই হোক, আমি একটু ভয়ে ভয়ে বললাম, কী কথা?

পিঙ্কু কিন্তু মানুষ নয়।

চলন্ত হোন্ডা গোঁত্তা খেয়ে একটা ট্যাক্সির পিছনে গিয়ে গুঁতো দিচ্ছিল আর কি, অতি কষ্টে সামলে নিলাম। হেসে বললাম, তবে কি রোবোট?

পাপড়ি ভেজা গলায় বলে, ও যে আসলে কী তা আমি এখনও জানি না। তবে ওর আই কিউ ঢের ঢের উঁচুতে।

পাগল নয় বলছ?

পাগল তো বটেই।

তা কী করে হয়?

পাগল না হলে--বলে কী ভেবে চুপ করে গেল পাপড়ি।

আমি বললাম, ডাক্তার সেনের ফাইভ স্টার মেন্টাল হোমে ওকে পাচার করতে আর দেরি করা উচিত নয় পাপড়ি।

পাপড়ি শ্বাসের শব্দ তুলে বলল, কাল।

পরদিন যখন আমরা সোমনাথের বাড়ি গিয়ে হাজির হলাম তখন অবাক হয়ে দেখি, সোমনাথের তথাকথিত পাগলু-বোকা-আখাম্বা ছেলেটি কাঁধে একটা ঝুলন্ত ব্যাগ নিয়ে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। চোখে তীক্ষ্ণ ও সন্দিগ্ধ একটা দৃষ্টি। মোটরবাইক থামাতে না থামাতেই আমাদের অবাক করে দিয়ে ও টপ করে পাপড়ির পিছনে সিটে উঠে বসে পড়ল।

আমি একটু একটু বুরবক বনে গেলাম। এ রকম কথা ছিল কি না তা আমার জানা নেই। নীচু স্বরে পাপড়িকে জিজ্ঞেস করলাম, ও কি জানত যে ওকে আমরা নিয়ে যেতে আসছি।

না। এরকম কথা হয়নি।

তা হলে? চুপ করো। ওর আই কিউ অনেক বেশি। ও সব টের পায়।

আমার গাটা কেমন ছমছম করতে পাগল। প্রকাশ্য দিবালোকে এবং আব্রুহীন মোটরবাইকে বসেও। অন্য সময়ে মোটরবাইকের পিছনে পাপড়ি আমার গায়ের সঙ্গে লেপটে থাকে, কোমর জড়িয়ে ধরে আলতো হাতে। আজ আমি টের পাচ্ছিলাম, পাপড়ি আমাকে জড়িয়ে তো ধরেইনি, এমনকি আমাকে স্পর্শও করছে না। তিনজনে যাচ্ছি, বেশ চাপাচাপি হওয়ার কথা। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, ওরা দু'জন যে পিছনে আছে তা টেরও পাচ্ছি

না, পিছু ফিরে দেখতে আমার সাহস হল না। আমি শুধু ঝুঁকে পড়ে মোটরবাইকের সবটুকু শক্তি নিংড়ে দিতে লাগলাম গতিতে। চারপাশে ঘূর্ণি ঝড় তুলে ছুটছে হোন্ডা। ভীষণ শব্দে গজরাচ্ছে মেশিন। কানের পাশে ফেটে যাচ্ছে ঝোড়ো হাওয়া। ওয়াটগঞ্জ কি এখনও অনেক দূর?

জন। জন। আরও জোরে। আরও জোরে। পিছন থেকে কাতর স্বরে বলে উঠল পাপড়ি।

কেন বলল? কী হচ্ছে পিছনে? আমি পিছু ফিরে না তাকিয়েই মাথা নেড়ে বললাম, আর স্পিড তোলার উপায় নেই পাপড়ি। আমরা ওয়াটগঞ্জে প্রায় পৌঁছে গেছি।

পাপড়ি কান্নার ফোঁপানির মতো শব্দ তুলে চেঁচিয়ে বলল, আমরা কোনো দিন ওয়াটগঞ্জে পৌঁছাতে পারব না জন।

কথাটা শুনে আমার ভয় করল। বড়ো ভয় করল। তবু আমি আরও ঝুঁকে পড়লাম। মিশে যেতে লাগলাম মেশিনের সঙ্গে।

বলতে নেই, মোটরবাইক আমি ভালোই চালাই। বিশেষ করে নিজস্ব এই হোন্ডা বাইকটির সঙ্গে আমার সমঝোতা চমৎকার। তবু ঘটনাটা ঘটল আদি গঙ্গার পোল পেরোনোর পর।

যে যে কারণে দুর্ঘটনা ঘটে তার কোনোটাই দায়ী নয়। তবু যে কী করে ঘটে গেল সেটাই বিস্ময়ের। আমার শুধু মনে হল, কোনো বৃহত্তর ইচ্ছাশক্তি, কোনো অতিমস্তিষ্ক খুব হিসেব নিকেশ করে ছোট্ট একটা টাল খাইয়ে দিল ভারসাম্যে, একটু দোল, একটু ভয়, আত্মবিশ্বাসে এক সেকেণ্ডের দ্বিধা। মোটরবাইকটা খুব অসহায়ভাবে আকাশে উঠল। তারপর স্তূপাকার হয়ে ভীষণ শব্দে ঝরে পড়ল আমাদের ধবংসস্তূপ।

সেই ধবংসস্তূপে ভাঙা দুটি ডল পুতুলের মতো পড়ে রইলাম আমি আর পাপড়ি। দুটি গাড়ল, বুদ্ধু, আহাম্মক মানুষ ও মেয়েমানুষ। কিছুই করার নেই আমাদের। শুয়ে, ঘাড় গুঁজে নিজেদের ক্ষত ও বেদনার জন্য শোক অনুভব করতে করতে আমরা দেখলাম, ছেলেটা নিষ্কলুষ সেই ধবংসস্তূপে উঠে দাঁড়িয়েছে। ক্ষত নেই, দাগ নেই। কাঁধে ব্যাগ। চোখে সেই

সন্দিহান তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। একবারও আমাদের দিকে ফিরে তাকাল না। একটা দীর্ঘ পদক্ষেপে ধীরে ধীরে ফিরে যেতে লাগল, যে পথ ধরে আমরা এসেছি সেই পথে।

২. ভূতের গল্প

বাথরুম থেকে আমার নতুন বউ চেঁচিয়ে উঠল, ভূত। ভূত।

আমি দৌড়ে গেলাম, কী হয়েছে?

আমার বউ চোখ বড়ো বড়ো করে বলল, ভূত।

কী রকম ভূত?

জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দাঁত বের করে হাসছিল। খোঁনা সুরে বলল, নতুন বিয়ে বুঝি? বেশ বেশ। মজা বুঝবে।

আমি একটু চিন্তিত হয়ে বললাম, আর কিছু বলেনি তো।

বলেছে।

কী বলেছে?

আমার বউ মাথা নেড়ে বলল, সেটা তোমাকে বলা যাবে না।

আমার বুকটা একটু কেঁপে উঠল। ভূতকে আমি ভয় পাই নানা কারণে। সবচেয়ে বড়ো কারণটা হল, ভূত আমাদের নানা গুপ্ত কথা জানে। আমার মতো ছা-পোষা লোকেরও গোপন করার মতো কিছু কথা আছে, ঠিক জানি না ছা-পোষা লোকদেরই গুপ্ত কথা বেশি থাকে কি না। যেমন, আমি ছ'শো বিয়াল্লিশ টাকা পঁচিশ পয়সা মাইনে পাই। বিয়ের আগে আমার হবু শ্বশুর মশাই খুব কুন্ঠিতভাবে কথাটা তুললেন, তা বাবাজি কি হাজার খানেকের মতো পাচ্ছ আজকাল? আমি কিন্তু তখন খুব বিনয়ের সঙ্গে বলেছিলাম, আজ্ঞে ওরকমই, আমার নতুন বউও তাই জানে। আর একটা ব্যাপার হল, পটল। ভারী গেছো মেয়ে। অন্তত তেরোবার সে বিভিন্ন পুরুষের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল। কারও সঙ্গেই তিনদিনের বেশি টিকতে পারেনি। ত্রয়োদশতম ব্যক্তিটি ছিলাম আমি। পটলের সঙ্গে পালানোর মতো বুকের

পাটা আমার ছিল না। বলতে গেলে সে-ই আমাকে নিয়ে পালায়। ব্যাণ্ডেল অবধি পৌঁছে আমি বিস্তর কান্নাকাটি করতে থাকায় পটল আমাকে ফিরিয়ে এনে দিয়েছিল। একটা অসভ্য গালাগালও দিয়েছিল বটে, কিন্তু সে কথা থাক। কথাটা হল গোপন কথা আমার মতো লোকেরও কিছু আছে। আর ভূতেরা সবজান্তা। কাজেই আমি একটু দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলাম। ভূতটা আমার বউকে কী এমন বলেছে যা আমার জানা বারণ?

রাত্রিবেলা খেতে বসে আমি আমার নতুন বউকে বললাম, বাড়িটা যখন ভুতুড়ে তখন ছেড়ে দিলে কেমন হয়?

বউ একটু কূট চোখে আমার দিকে চেয়ে বলল, ভালোই হয়। তবে কয়েকটা দিন যাক। ভূতটার কাছে আমার কয়েকটা কথা জানার আছে।

শুনে আমার বুকটা কেঁপে উঠল। গলাটা আটকে এল। কিছু বলতে পারলাম না। এমনকি বউয়ের চোখে চোখ রাখতেও কেমন অস্বস্তি হচ্ছিল।

বউ ঘুমোনোর পর নিশুত-রাতে আমি ভূতটাকে পাকড়াও করতে উঠলাম। ভূত সম্ভবত ঘুষ খায় না, ভয় খায় না এবং সহজে পোষও মানে না। তাদের ব্ল্যাকমেল করাও বোধহয় সম্ভব নয়। তা ছাড়া আমার মতো ছোটোখাটো লোককে পাত্তা দেওয়ারও কোনো কারণ নেই। তবু আমাকে তো চেষ্টা করতেই হবে।

অন্ধকার বাথরুমে দাঁড়িয়ে আমি জানলার দিকে চেয়ে ফিস ফিস করে বললাম, ওহে, অ-মশাই, শুনছেন।

হিঃ হিঃ করে একটা রক্ত-জলকরা হাসি শোনা গেল। জানলায় ভেসে উঠল একটা অতিকায় খচ্চর ও ধূর্ত ভূতের মুখ। সে মুখের বর্ণনা দিতে যাওয়া বৃথা। ভূতেরা যেমন হয় তেমনই। গোল গোল চোখ, বড়ো বড়ো দাঁত, কাঠ-কয়লার মতো চামড়ার রং।

মাথা চুলকে আমি বিনীতভাবেই বললাম, আমার বউকে আপনি কি কোনো ইনফর্মেশন দিয়েছেন?

ভূতটা হিঃ হিঃ করে হেসে বলল, তাতে ক্ষতি কী? তোমাকেও দু'একটা দিই তোমার বউ সম্পর্কে।

আমি অবাক হয়ে বলি, আমার বউ সম্পর্কে আপনি কিছু জানেন?

খুব জানি। এই তো গত বছর বিজয়া দশমীর দিন বলাইদের ছাদে বলাই ওকে...। তা ছাড়া বিদ্যুতের সঙ্গে সেবার মধুপুরে গিয়ে...। আরও আছে শুনবে?

আমার কান বেশ গরম হয়ে উঠল। মাথা নেড়ে বললাম, একদিনে বেশি সইতে পারব না। আস্তে আস্তে হবে।

আবার সেই হিঃ হিঃ হাসি, আরে বাবা কলির তো সবে সন্ধে। আরব্য রজনীর মতো হাজার এক রাত কেটে যাবে তবু তোমার বউয়ের কেচ্ছা ফুরোবে না। তবে বউয়ের বি-এ সার্টিফিকেটখানা একবার দেখতে চেয়ো।

আমি তাড়াতাড়ি চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিলাম। মাথাটা কেমন করছিল। বউয়ের পাশে এসে যখন ফের শুলাম তখন গা-টা রীতিমতো রি রি করছে।

পরদিন সকালেই আমাদের ঝগড়া লাগল। বলতে গেলে বিয়ের পর সেটাই আমাদের প্রথম ঝগড়া। তবে ঝগড়াটা বেশিদূর গড়াল না। আমার বউ পটলের কথা তুলতেই আমি বলাই এবং বিদ্যুতের কথা তুললাম। বউ আমার মাইনের কথা তুলতেই আমি ওর বি-এ সার্টিফিকেট দেখতে চাইলাম।

অবশেষে হাল ছেড়ে দিয়ে আমার বউ কাঁদতে বসল। আমি গুম হয়ে রইলাম। আমরা দু'জনেই হেরেছি, না হয় দু'জনেই জিতেছি। কিন্তু কোনটা তা বুঝতে পারছিলাম না। আড়াল থেকে ভূতটা হেসে উঠল, হিঁঃ হিঁঃ।

আবার একদিন রান্নাঘর থেকে আমার বউয়ের চিৎকার এল, ভূত। ভূত।

দৌড়ে গেলাম, কী হয়েছে?

তোমার যে বাহান্ন টাকা মাইনে বেড়েছে তা আমাকে বলোনি তো।

একটু মাথা চুলকে বললাম, আমার শখের রনসন লাইটারটা যে গোপনে তুমি তোমার ভাইকে দিয়েছ তাও তো তুমি আমাকে বলোনি। বরং খুঁজে না পাওয়ায় তুমি বলেছিলে নিশ্চয়ই লাইটারটা পকেটমার হয়েছে।

বউ অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। আমিও ওর দিকে। আড়ালে শোনা গেল, হিঁঃ হিঁঃ।

কিছুদিনের মধ্যেই আমরা পরস্পর সম্পর্কে বিস্তর তথ্য জেনে গেলাম। পরস্পরের পরিবার সম্পর্কেও। বলা বাহুল্য এর ফলে আমাদের মধ্যে রোজই ঝগড়া লাগতে লাগল। এবং কোনো গোপন তথ্য ফাঁস করতেই আমরা আর বাকি রাখলাম না। আমাদের দাম্পত্য জীবন একটা অশরীরী হিঃ হিঃ হাসিতে ভরে যেতে লাগল।

তবে বলতেই হবে যে, ভূতটি ছিল ভারি নিরপেক্ষ। পক্ষপাতশূন্য ভাবেই সে দু'জনকে দু'জন সম্পর্কে জানাত। কারও দিকে টানত না।

একদিন সে আমার বউকে চুপিচুপি বলল, কী গো ভালমানুষের মেয়ে, বড় যে দিনের পর দিন হেঁসেল ঠেলেই চলেছ। কর্তাটি দিব্যি গায়ে ফুঁ দিয়ে মোচ তাইয়ে অফিস আর বাড়ি মাকু মারছে। তা তোমার কি এভাবেই চলবে? তার অফিস আছে, আড্ডা আছে, তোমার কী আছে বলো। এবার ধরে পড়ো, তোমাকে নিয়ে গিয়ে কোথাও বেড়িয়ে টেড়িয়ে আসুক। সিনেমা বায়োস্কোপেও তো যাও না। আর রূপটান, শাড়ি গয়না এসেন্স এসবও কি লাগে না তোমার?

এর পরই সে আমাকে কানে কানে বলল, রোজ ওই ট্যালট্যালে ঝোল আর ভাত খেয়ে খেয়ে অরুচি হয় না তোমার? কোথায় গেল মায়ের হাতের সেই মোচার ঘন্ট, পোলাও, মুড়িঘন্ট, নিমঝোল? বউ যা রাঁধে তাই সোনা হেন মুখ করে খাও, ও কেমন ধারা? পুরুষ হবে পুরুষের মতো। হুকুম করবে, তামিল হবে। বিয়ের শালটা রিপু করতে পারে, ঘরদোর চকচকে ঝকঝকে রাখতে পারে, ডালের বড়ি দিতে পারে, কত কী করার আছে মেয়েদের। করছে কী?

তাই বলছিলাম, ভূতটি ভারি নিরেপক্ষ।

যাই হোক এরকম ভাবে বেশি দিন চলে না। ভূতের ষড়যন্ত্রে আমার ও বউয়ের মধ্যে সম্পর্কটা এমনই ঘোরাল হয়ে উঠল যে, আমরা পরস্পরকে রীতিমতো এড়িয়ে চলতে

লাগলাম। কেউ কাউকে একদম সইতে পারি না। একদিন বউ বলল, ভূতটা দিন দিন খুব পেয়ে বসছে।

আমি সায় দিয়ে বললাম, ব্যাটাকে আর পাত্তা দেওয়াটা ঠিক হবে না।

তা হলে কী করবে? বাড়ি ছাড়বে?

ছাড়তে তো অরাজি নই। কিন্তু বাড়ি পাওয়া কি সোজা? ভাড়ার রেটও দ্বিগুণ বেড়েছে।

এরকম কথাবার্তা বলতে বলতে আমি আমার বউয়ের বাঁ গালে কালো জড়ুলটার সৌন্দর্য লক্ষ করলাম। আমরা বউও মুগ্ধ দৃষ্টিতে আমার লম্বা নাকটার দিকে চেয়ে ছিল।

অনেক দিন বাদে সেই রাত্রে বিভ্রমবশে দু'জনে একটু ঘনিষ্ঠ হওয়ামাত্র আড়াল থেকে একটা গলা খাঁকারির আওয়াজ এল। খোনা গলায় ভূতটা বলে উঠল, দেখছি কিন্তু।

বউ ছিটকে সরে গেল। আমিও ঠাণ্ডা মেরে গেলাম। কিন্তু দু'জনেই বুঝলাম, এভাবে পারা যায় না।

খুবই সংকোচের সঙ্গে বাড়িওয়ালাকে কথাটা বললাম, দেখুন ইয়ে....এ বাড়িতে বোধহয় একজন ইয়ে আছেন। তা সেটাকে যদি তাড়ানোর একটা ব্যবস্থা করা যায়....

বাড়িওলা তেড়িয়া হয়ে বললেন, পছন্দ না হলে বাড়ি ছেড়ে দিন না মশাই, আমার তিনশো টাকার অফার আছে। আর ভূতের কথা বলছেন তো। ও আমার সেজোকাকার ভূত। বড়ো ভালোবাসতেন আমায়। ওঁকে তাড়ানোর কথা মুখেও আনবেন না।

মুখ চুন করে ফিরে আসতে হল। বউকে বললাম, এভাবে হবে না। শোনো, এরপর থেকে ভূতটা গায়ে পড়ে কিছু বলতে এলে পাত্তা দিয়ো না।

তুমিও পাত্তা দিয়ো না।

দিন সাতেক আমরা ভূতটার কোনো কথাই তেমন গ্রাহ্য করলাম না। বলা বাহুল্য, গ্রাহ্য করার মতো অনেক কথাই কিন্তু ভূতটা বলেছিল সাতদিনে। অনেক ন্যায্য কথাই। তবু আমরা না শোনার ভান করে রইলাম। এমনকী একদিন তিন মাস খরার পর আমি আর আমার বউ পরস্পরকে একটুখানি চুমুও খেয়ে ফেললাম। অবশ্য একথাও ঠিক যে, চুমু

খাওয়াটা আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না, বরং বলা ভালো একটা অসৎ শক্তির বিরুদ্ধে ওটা ছিল আমাদের বাঁচার লড়াই।

ঠোঁট থেকে ঠোঁট ভাল করে সরাইনি তখনও, হিংসুটে ভূতটা ফঁত করে আমাদের দু'জনের মুখের ওপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে উঠল, ওটা কী হল শুনি। ঘেন্না করল না তোমাদের? লজ্জা হল না?

বলতে কী আমাদের একটু ঘেন্না আর লজ্জা হতে লাগল। একটু সরেও গেলাম দু'জনে। যথেষ্ট রুক্ষ করে তুলতে গিয়েও খুব করুণ শোনাল আমার গলা, কী করব বলুন, আমাদেরও বাঁচতে হবে।

বাঁচার জন্য চুমু খেতে হয় জন্মে শুনিনি বাবা। যাও গিয়ে মুখ-টুখ ভাল করে ধুয়ে ফেলো। তারপর মাঝখানে পাশবালিশ রেখে দু'জনে দু'জনের দু'দিকে পিঠ ফিরিয়ে শুয়ে থাকো।

আমরা পরস্পরের দিকে তাকালাম। খুবই অসহায় লাগল। ভূতটা ভূত হলেও আসলে বাড়িওয়ালার সেজোকাকা। অর্থাৎ শ্রদ্ধেয় বড়োমানুষ। তার চোখের সামনে ঢলাঢলি করাই বা যায় কী করে?

আমরা মুখ ধুয়ে এলাম। মাঝখানে পাশবালিশ রেখে পরস্পরের দিকে পিঠ ফিরিয়ে শুলামও। কিন্তু শোওয়ার আগে বউয়ের জড়ুলটার দিকে নজর গেল। ভারি টানছে জড়ুলটা? বউও দেখি আমার লম্বা নাকটার দিকে বিহ্বল হয়ে চেয়ে আছে।

পরদিন আর সত্যিই পারা গেল না। দোষ আমাদের নয়, বউয়ের জড়ুল আর আমার লম্বা নাকের। বলতে কী, পাশবালিশ অতিক্রম করায় পাপ আমাদের নয়, তাদের।

কিন্তু দৈববাণীর মতো বাড়িওয়ালার সেজোকাকার ভূত বারংবার সাবধান করতে লাগল, ওরে ও কাজ করিসনি। ওসব কি ভাল? ছিঃ ছিঃ, তোরা না ভদ্রলোকের ছেলেমেয়ে? ওরে শোন, বউয়ের সঙ্গে আমারও মাঝে মাঝে ওরকম ভাব ভালোবাসা হত। তবু আমি দুবার সন্নিসি হই, তিনবার সুইসাইড করতে যাই, একবার মাথা খারাপ হয়। শেষ দিকে মদ গাঁজা ধরে ভ্যাবলা হয়ে গিয়েছিলাম। ...অ্যাই, খবরদার বলছি, ওসব করবি তো কাল এ

ঘর থেকে জোড়া লাশ বেরোবে। একেবারে শেষ করে ফেলব।... তোদের পায়ে পড়ি, করিস না ওরকম তা হলে কিন্তু আমাকে সুইসাইড করতে হবে...হিঁ হিঁ, কী ঘেন্না...ওরে ...ওফ...

ভূতের গলার স্বর ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে এল। তারপর আর শোনা গেল না।

আমি আর বউ পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে কান খাড়া করে রইলাম।

ভূতটা যে মরেছে মাসচারেক বাদে সে বিষয়ে আর আমাদের সন্দেহ রইল না। আমার বউয়ের পেটে সেই ভূত এখন ভবিষ্যৎ হয়ে নড়াচড়া করছে।

৩. এখন ক'টা বাজে?

এক যন্ত্রণাময় মৃত্যুর পর আমি অন্য এক জগতে চোখ মেললাম।

আলো আধাঁরিতে পথ ভালো দেখা যাচ্ছিল না। তবে আমার বাঁ ধারে একটা অন্তহীন কাঁটা তারের বেড়া চলেছে। মাঝে মাঝে শক্ত খুঁটি। নজরদারও আছে বলে শুনেছি।

আমি বাঁ ধারে মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখছিলাম। ওদিকটায় গাছপালার আভাস দেখা যায়। এ ধারে কিছু নেই। একদম কিছু নেই। ন্যাড়া, এবড়ো খেবড়ো জমি আর তারওপর দিয়ে একটা পায়ে-হাঁটা পথ।

একটু দূরে টাওয়ার। খুব উঁচু। অনেক সিঁড়ি। ফুরোতেই চায় না, একটার পর একটা ধাপ। আমার হাঁফ ধরছে না। উঠছি তো উঠছিই।

ওপর থেকে চটপটে পায়ে একটা ছেলে নেমে আসছিল। থমকে দাঁড়িয়ে বললাম, কোথায় যাচ্ছ?

একজনকে সি অফ করে আসছি। আপনি ওপরে যান, ওখানে অনেকেই আছে।

ছেলেটা নেমে গেল। আমি একটু ভাবতে ভাবতে উঠতে লাগলাম। ছেলেটাকে চিনি না তো, তবু এমনভাবে কথা বললাম যেন কত কালের চেনা। কাকে সি অফ করতে গেল? কোথায়?

ক'টা বাজে তা জানতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু লক্ষ করলাম, আমার হাতে ঘড়ি নেই। যে ছেলেটা নেমে গেল তার কবজিও ফাঁকা।

একটা চাতালে উঠে এলাম। বেশ উঁচু। এখান থেকে নীচেটা ধূ ধূ রহস্যের এক গভীর কুয়োর মতো ভয়াবহ। এত উঁচুতেও দু'জন লোক--মাঝবয়সি--রেলিঙের ওপর পাশাপাশি বসে তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে।

হাঁপাইনি, নিশ্বাস নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। তবু আমি দু'দণ্ড দাঁড়াই।

একজন লোক অন্যজনকে জিজ্ঞেস করে, সময় জিনিসটা কী বল তো?

একটা ধারণা, বোগাস।

দূর বোকা।

তা হলে?

সময় হল গতি। ছোটো থেকে একটা মানুষ যে বড়ো হয় সেটা তার হয়ে ওঠার গতি। মানুষ সেটা বোঝে না। দিন থেকে যে রাত সেটাও গতি। সূর্যের, পৃথিবীর, তলিয়ে ভাবলে বোঝা যায়।

আমার ইচ্ছে করছিল জিজ্ঞেস করি, ক'টা বাজে?

ওরা হয়তো জবাব দিত না। দু'জনেই নিবিষ্ট হয়ে চেয়ে আছে কুয়াশার মতো আবরণের দিকে। চারদিকেই ওই আবরণ। কী যেন আছে আবরণের আড়ালে। নাকি কিছুই নেই?

একটু ভয় ভয় করল আমার। আমি ফের উঠতে লাগলাম।

একটা সাদা খরগোশ মুখ তুলে তাকাল। মুখে সবুজ কচি ঘাস। নীচু হয়ে তাকে একটু আদর করলাম। সে গ্রাহ্য করল না। সরেও গেল না, ভয়ও পেল না। ঘাস খেয়ে যেতে লাগল।

অনেক ওপরে আর একজন কে যেন উঠছে। তার পায়ের শব্দ শুনছি। সে কে তা জানবার আগ্রহ বোধ করলাম না। আমার শুধু জানতে ইচ্ছে করছিল, এখন ক'টা বাজে।

উঠছি, উঠছি, উঠছি। একজন যুবতী আচমকা পাশ কাটিয়ে ওপরে উঠে যেতে হরিণ-পায়ে একটু থমকায়। তারপর তাকায়।

এলেন?

আসারই তো কথা ছিল। তাই না?

যুবতীটি হাসল। মাথা নেড়ে সায় দিল। বলল, যাই?

তাড়া আছে নাকি?

না, না। আমি তো বরাবরই এরকম। একটু তাড়াতাড়ি সিঁড়ি ভাঙতে ভালবাসি।

কত সিঁড়ি, তাই না?

হ্যাঁ, কত সিঁড়ি।

আচ্ছা এখন...

বলতে গিয়েও আমি সতর্ক হই। 'কটা বাজে' কথাটা আর উচ্চারণ করি না। যাক গে, জেনে নিলেই হবে। তাড়া নেই।

যুবতী উঠে যায়।

একজন মিস্ত্রি সিঁড়ি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে উবু হয়ে বসে। পরনে খাকি হাফ প্যান্ট কি? গায়ে শার্ট? না, আমার চোখের ভুল।

একটু দাঁড়াই। দেখি। লোকটা উবু হয়ে বসে সিঁড়ির খুঁটিনাটি দেখছে। হাতে মেরামতির যন্ত্র।

কী দেখছেন?

দেখছি কোথাও ভেঙেছে কি না।

পেলেন কিছু?

লোকটা মাথা নেড়ে বলে, না, শালারা ভালোই বানায়।

কোথায়ও ভাঙেনি? ফাটেনি?

না। কতকালের সিঁড়ি, তবু কী মজবুত।

কতকালের...?

বলেই আমি জিব কাটি। অনেকটা 'কটা বাজে' গোছের প্রশ্ন। আজকাল মিস্ত্রিদের হাতে ঘড়ি থাকে। এ লোকটার হাতে নেই।

উঠছি। উঠছি। বেশ লাগছে। গরম নেই, শীত নেই। আলোর সঙ্গে অন্ধকার অবিরল মিলে মিশে যাচ্ছে চারদিকে।

কাকু।

মায়ের কোলে একটা ছেলে। রেলিঙের পাশে দাঁড়ানো তার মায়ের কোল থেকে আমার দিকে চেয়ে হাত নাড়ছে।

একটু হাসলাম। হাত নাড়লাম।

ওপরে যাচ্ছ কাকু?

যাচ্ছি।

আমার বাপিকে দেখলে বোলো...।

বলব।

কী বলব তা জিজ্ঞেস করলাম না, জানি, জানি কিন্তু কী করে জানি?

উঠছি। হাঁফ ধরছে না। ক্লান্তি নেই। তবু একটু দাঁড়াই। উঠতেই তো হবে। উঠতে উঠতে যতদূর দেখা যায়।

কিন্তু দেখার কিছু নেই। ম্লান গোধুলি, সিঁড়ি, না শীত না গ্রীষ্ম।

মোটা একজন মানুষ ওপর থেকে নামছে।

কী খবর?

এই তো, আপনি?

ভালো ভালো। যান, ওপরে যান।

আপনি নীচে নামছেন বুঝি?

নামি একটু। নামাও যা, ওঠাও তাই। একই তো।

লোকটা একটু হাসল। লক্ষ করলাম, তার হাতে ঘড়ি নেই।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। ক'টা বাজে তা আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে।

আমি কি দু ধাপ নামব? নামাও যা, ওঠাও তো তাই?

তবু আমি উঠছি। উঠছি। উঠছি। কোথাও যাচ্ছি কি? যাচ্ছি বোধ হয়।

একটা রুমাল কে ফেলে গেছে সিঁড়িতে? আমি নীচু হই। হাত বাড়াই। সবুজ রুমালের এক কোণে হলুদ সুতোয় লেখা 'এস'। চোখে জল আসে। হাতটা গুটিয়ে নিই। জানি, রুমালে সুগন্ধ আছে, আছে আমন্ত্রণ। তবু নিই না। নিতে নেই। দেওয়ারও তো কিছু থাকতে পারে না এখানে। উঠতে উঠতে একবার পিছু ফিরে চাই। সিঁড়িতে পড়ে আছে সবুজ রুমাল। বহুকাল ধরে পড়ে আছে আমার জন্যই। যাক।

আমি উঠছি। উঠছি। মাঝে মাঝে শুধু জানতে ইচ্ছে করে, এখন ক'টা বাজে। এখন ক'টা বাজে।

হলে হয়

আজ অবধি গায়ে একটা পিরান উঠল না হাঁদুর। বগলকাটা গেঞ্জি, তেমন তেজালো শীত পড়লে এক্রাম আলির দেওয়া খদ্দরের চাদরখানা--এই অবধি হাঁদুর দৌড়। দেমাকের সঙ্গে বোতাম এঁটে একখানা জামা গায়ে ঘুরে বেড়াতে পারলে বেশ হত।

নরেনটা ভারি ফচকে। বলেছিল, বিয়ে করার সময় পরিস, তখন শ্বশুরই দেবে নিজের গরজে।

তা বউ একটা হলে হত হাঁদুর। ঘোমটার ভিতর থেকে টালুক টুলুক চেয়ে চেয়ে দেখবে তাকে, ফিচিক ফিচিক হাসবে, সে ভারি মজা। হ্যাঁ, তা বউ একটা হলে হয় তার।

পিরান বা বউ বলেও কথা নয়। ওরকম আরও অনেক কিছুর কথাই মনে হয় হাঁদুর। এই যেমন পায়ে একজোড়া চটি হলে বেশ হয়। তারপর এই বাদলার দিনে একটা ছাতা হলে হয়। জল খাওয়ার একখানা পেতলের ঘটি হলে হয়।

ব্রজ তার সেলাইমেশিনে পায়জামাটা খড়খড় করে টেনে যাচ্ছিল আর হাঁ করে দেখছিল হাঁদু। ইববাস, কী আজব কলই যে বানিয়েছে সাহেবরা। পায়ে একটা পাটাতন নাড়াও আর হাতে সেলাই টেনে যাও। ছুঁচখানা যেন একেবারে মুষলধারে পড়ছে। একাই একশোখানা হয়ে। দেখতে দেখতে মুগ্ধ হাঁদু মুখের ঝোল টানল। শুধু মেশিন বলেও কথা নয়, ব্রজর মতো কারিগরই বা কটা আছে। লুঙ্গি পাজামা পিরান ব্লাউজ ফটাফট কাচিতে কেটে মেশিনে জুড়ে ফিট করে দিচ্ছে। হাতে জাদু, পায়ে জাদু।

সেলাই থামিয়ে ব্রজ একটা বিড়ি ধরাচ্ছিল। হাঁদুর দিকে চেয়ে বলল, হবে নাকি একটা?

হাঁদু যে খায় না তা নয়। মাগনা পেলে সে সবই খায়। বিড়ি কিন্তু খারাপ জিনিসও নয়। খেলে শরীরটা বেশ চনমনে হয়। তবে কিনা ব্রজর মতো ওস্তাদ লোকের সামনে এই যে

বসে আছে এটুকুই ঢের, এর ওপর আবার বিড়ি খাওয়াটা বড্ড আস্পদ্দা হয়ে যাবে। তাই হাঁদু লজ্জার হাসি হেসে বলল, না না থাক।

ব্রজও চাপাচাপি করল না। বিড়ির আজকাল দাম বেড়েছে। পায়জামাটা ভাঁজ করে সরিয়ে রাখল সে। পিছনের খুঁটিতে হেলান দিয়ে মেশিনে হাঁটু ঠেকিয়ে আরাম করে বসল।

দর্জিঘর বলতে তেমন কিছু বাহারি ব্যাপার নয়। দুটো দিক হাঁ হাঁ করছে খোলা আর দু'দিকে বাঁশের বেড়া, মাথায় টিন। চালাঘরই। তলায় কাঠের পাটাতন। তাও তেমন মজবুত নয়। পাটাতনের নীচেই পলতাবেড়ের খাল। দু-এক জায়গায় পাটাতন ফাঁক হয়ে আছে, তলায় জল দেখা যাচ্ছে। পচা জলের একটা আঁশটে গন্ধও সব সময়ে ঘুলিয়ে উঠছে বাতাসে। সামনে পলতাবেড়ের বাজার। বাজার বলতে তেমন জমজমাট কিছু নয়। মুঠোভর জায়গায় দশ বারোটা টিনের চালা। কিছি গেরস্ত খোলা জায়গায় শাকপাতা নিয়ে হা-পিত্যেশ করে বসে আছে। সকালের দিকে কিছু লোকজন হয়েছিল। এখন ফাঁকা।

ব্রজ ধীরে সুস্থে বিড়িটা শেষ করে পাজামাটা একটা পুরোনো খবরের কাগজে মুড়ে হাঁদুর হাতে দিয়ে বলল, এক্রামদাকে বলিস একবার আসতে।

হাঁদু মাথা নেড়ে উঠে পড়ল।

নতুন পাজামার গন্ধটা যে কী সুন্দর সে যে না গন্ধটা নাক দিয়ে টেনেছে সে বুঝতে পারবে না। নতুন জিনিসের ফাঁটই আলাদা। হাঁদুর কপালে নতুন বড়ো জোটে না। এর ওর তার ছেঁড়া ন্যাতা ফেলে-দেওয়া জিনিসই বরাবর পায় সে। যে ছাপা লুঙ্গিখানা সে এখন পরে আছে এটা অবধি ধীরেন সাঁপুইয়ের ছাড়া জিনিস। বেঘোরে ধীরেন মোলো, আর তার বউ জিনিসপত্র কিছু বিলি করে দিল। হাঁদু পেল লুঙ্গিখানা।

কথা হল, ধীরেন যখন চরণগঙ্গার হাটের কাছে খুন হয় তখন এই লুঙ্গিখানা তার পরনে ছিল। হাঁদুর চোখের সামনেই হল কিনা কাণ্ডখানা। ধীরেনের ঘর হাট থেকে বেশি দূরেও নয়। মাইলটাক হবে। গোটা দশ বারো কুমড়ো বস্তায় ভরে হাঁদুর মাথায় চাপিয়ে হাটে গিয়েছিল ধীরেন। কপালটা ভালই। চরণগঙ্গার হাটে সেই কুমড়ো পটাপট বিকিয়ে গেল। যেন কুমড়োর জন্য সেদিন হামলে পড়েছিল লোকে। ধীরেনের ট্যাঁকে পয়সা এসে গেল

দেখ-না-দেখ। তাই দিয়ে ধীরেন কিছু কেনাকাটা করল। বস্তাটা বেশ ভারীই ঠেকছিল হাঁদুর ফেরার সময়।

হাট ছেড়ে পোয়াটাক পথ আসতেই ধানখেতের মধ্যে পড়ল তারা। বেশ ফলন হয়েছে। বর্ষাটা ভালোই গেছে এবার। মাঠ একেবারে ছয়লাপ। লক্ষ্মী ঢেউ খেলে যাচ্ছেন। মনের আনন্দে হাঁদুর গান গাইতে ইচ্ছে যাচ্ছিল। কিন্তু ধীরেন সাঁপুই গোমড়ামুখো লোক, দাপ খাপের লোকও বটে। তাই সাহস পাচ্ছিল না।

কালীতলার কাছ বরাবর মন্দিরের দিকটায় কিছু ঝুববুস চেহারার গাছের জড়াজড়ি। জায়গাটা বেশ আঁধারমতো। হঠাৎ সেখান থেকে চারটে লোক বেরিয়ে এল। দু'জনের হাতে দু'খানা হেঁসো। একজনের হাতে বাঁকা হাতলের একখানা লাঠি। চার নম্বর লোকটার হাতে অস্ত্র ছিল না বটে, কিন্তু লোকটা নিজেই এক পেল্লায় বিভীষণ। ভয়ের কথা হল, চারজনকেই হাঁদু চেনে। হেলে, পটল, গণেশ আর গদাধর। গদাধর আবার মস্ত হোমিওপ্যাথ ডাক্তার। বেশ নাম ডাক। ধীরেনের জ্ঞাতি।

লোক চারটেকে দেখেই ধীরেন সাঁপুই হঠাৎ একটা গোঁত খেয়ে দৌড়তে শুরু করল, লুঙ্গি পরার অসুবিধে এইটেই, দৌড়ানো যায় না। তার ওপর আলের পথ। ধীরেনের শরীরটাও থলথলে গণেশমার্কা।

চারটে লোক তাড়াহুড়ো করল না। তবে খেতেয় নেমে আড়াআড়ি একটু চোটে হেঁটে ধীরেনের একেবারে মুখোমুখি এসে গেল।

তারপর যা কাণ্ডখানা হল তা আর বলার নয়। বাঁকা লাঠি হাতে লোকটা ধীরেনের দু'পায়ের ফাঁকে লাঠিটা ঢুকিয়ে দিতেই দড়াম করে পড়ল ধীরেন। দুটো হেঁসো পড়ন্ত রোদে একটু ঝলক তুলে নেমে এল ধীরেনের ওপর। পেট আর গলা ফাঁক হয়ে গেল চোখের পলকে। একটু দূরে পাথর হয়ে গিয়ে হাঁদু শুধু দেখল, ধানখেতের মধ্যে একটা জায়গায় বড়ো ছটফট করছে গাছগুলো, বড্ড ছটফট করছে।

তাকে দেখেই গদাধরই একটা হাঁক মারল, কে রে ওটা?

পটল বলল, ওটা ধীরেনের স্যাঙাৎ। সাক্ষী রাখার দরকার কী?

বস্তাটা গড়িয়ে গেল ঘাড় থেকে। আর হাঁদু টের পেল যে, সে ছুটছে। ধানখেতে নেমে লাফিয়ে লাফিয়ে হরিণের মতো ছুটছে সে। বাঁই বাঁই শব্দ উঠেছিল বাতাসে। জীবনে ওরকম আর কখনও ছোটেনি।

এক দমে একেবারে ধীরেনের বাড়ি গিয়ে উঠেছিল সে। মুখে বাক্যি সরছে না তখন, বুকে হাতির পা পড়ছে, গলা বুক শুকিয়ে কাঠ।

সেই থেকে ঘটনাটার সাক্ষী হয়ে আছে হাঁদু। তবে পুলিশ এসে যখন তাকে মেলা কথা জিজ্ঞেস করেছিল তখন সে বিশেষ ভেঙে বলেনি। চারজন যে কে তাও চেপে গেছে। তবে গদাধরের সঙ্গে জোতজমি নিয়ে ধীরেনের কাজিয়া বহু দিনের পুরোনো। সবাই জানে।

সেই ঘটনার স্মৃতি এই লুঙ্গি। মাদ্রাজি তাঁতের খয়েরি রংয়ের জিনিসটা বেশ মজবুত। ধীরেনের গলা আর পেট থেকে চোঁয়ানো রক্তে একেবারে অন্য রং ধরেছিল। ফেলে দিতে পারত ধীরেনের বউ। না ফেলে কেচেকুচে পরিষ্কার করে একদিন তার হাতে দিয়ে বলল, তুই-ই পরিস।

না চাইলে কেউ বড়ো একটা দেয় না। চাইলেই যে দেয় এমন নয়। তবু চাইলে কখনও সখনও জোটে, না চাইলে একদম নয়। এই লুঙ্গিটা হাঁদু চেয়ে নেয়নি। এমনিই পেয়েছে। হাঁদু চাইতে পারে না কখনও। বড়ো লজ্জা করে। তাই পায়ও সে খুব কম। এই ধীরেন সাঁপুইয়ের বউ। এও তেমন দেনেওয়ালা নয়। দিনরাত খাটাত তবু পান্তার সঙ্গে তেঁতুলটা দিতে হাত কুঁকড়ে যেত মাগির।

ধীরেন মরার পর বকেয়া কয়েকটা টাকাও ঠেকাল না ধীরেনের বউ। এই লুঙ্গিখানা দিয়েই একরকম ঘাড়ধাক্কা দিলে। একখানা আধুলি ঠেকিয়েছিল শুধু রাহাখরচ বাবদ। নাকি কান্না কেঁদে বলল, আমার তো সর্বস্ব চলে গেল, অনাথা বেধবা, আমারই কেমন করে চলবে তোরা বল। ছ'টা বাচ্চা সারাদিন খেতে চায়। এইসব ধানাই পানাই।

ধীরেনও খচ্চর ছিল সন্দেহ নেই। তবে পাওনাগণ্ডা দিয়ে ফেলত। বউটা ধীরেনের ওপর এক কাঠি। যে কটা কাজের লোক ছিল প্রায় সবাইকেই ধীরেনের পুরোনো ধুতি, জামা, চটি এইসব এক দফা করে দিয়ে তাড়াল।

হাঁদুর মুশকিল হল ভালো জিনিস পেয়েও তার লাভ নেই। তার একখানা ঘড়েল বাপ আর দুটো গুণ্ডা দাদা আছে। ভালো জিনিস দেখলেই তারা কেড়ে নেয়। তার মেজদা ভাদু এই লুঙ্গিখানার ওপরেও নজর দিয়েছিল। ধীরেন এই লুঙ্গি পরে খুন হয়েছে জেনে আর নেয়নি।

এক্রাম আলির বাড়িতে এখন গোরু রাখে হাঁদু। তাতে কিছু সুবিধে হয়নি। বউ মরার পর সে একরকম ফকিরগোছের হয়ে গেছে। ছেলেপুলেদের দিয়ে থুয়ে এখন একরকম ঝাড়া হাত পা। গোরুও প্রায় সবই বেচে দিয়েছে. একটা বকনা বাছুর মাত্র আছে। সেটাও শোনা যাচ্ছে বেচে দেবে। তারপর হজ করতে মক্কা যাবে। হাঁদুকে আর বেশি দিন দরকার হবে না তার।

শীতটা যে এবার জোর পড়বে তা এখন থেকেই টের পায় হাঁদু। জলঝড়টাও বেশ গেল এ বছর। কার্তিকের মাঝামাঝি থেকেই উত্তুরে হাওয়া দিচ্ছে টেনে। আর এই শীতেই যত কষ্ট। রোদ যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ সব ঠিক আছে। সাঁঝটি যেই লাগল অমনি শীতবুড়ি এসে ধরল জাপটে। তার তো ঘরটর জোটে না। বড়োজোর এক্রামের দাওয়া, না হয় গাঁয়ের চণ্ডীমণ্ডপের চাতাল। তার নিজের গাঁ মাইল সাতেক উত্তরে। মোট তিনখানা ভাঙা ঘর। তার দুটোতে দুই দাদা বউ সাপটে পড়ে থাকে। আর একখানায় চিল্লামিল্লি করে নিজেদের গুঁজে রাখে বুড়ো বাপ, তার দ্বিতীয় বিয়ের বউ আর দু'পক্ষের কিছু অপোগণ্ড। ভারি হাড়হাভাতে সব। সকাল হতেই বেরিয়ে পড়ল ধান্ধায়। কেউ গিয়ে খালে গামছা দিয়ে মাছ ধরার ফিকির করছে। কোনোটা গিয়ে পুকুরের গেঁড়িগুগলি তুলছে। একজন গেল শাকপাতা আনতে। কেউ বা গেল কার ঘটিটা বাটিটা হাতিয়ে আনা যায় তাই দেখতে । হাঁদুর দুই দাদাই মহা ফেরেববাজ। জনমজুর খাটে, চাষে খাটে, মাছ ধরে, নৌকো বায়, হাটে মহাজনের শাগরেদি করে। যখন যেমন। তবে তারা লোক ভালো নয়। পাঁচটা টাকার গন্ধ পেলে খুন খারাপিও করতে পারে। তার ওপর দুজনেরই নেশাভাঙের ব্যাপার আছে। হাঁদুর বাপও তাই ছিল। এখন বুড়ো বয়সে বসে বসে ছেলেদের মুন্ডুপাত করে।

হাঁদু আড়াআড়ি একটা ধানজমি পার হচ্ছিল। দূর থেকে রফিকভাই ডাকল, ওরে হাঁদু।

রফিকভাই এক্রাম আলির বড়ো ছেলে। গাঁয়ের মাতব্বর গোছের লোক। হাতে ছাতা, পরনে ঢোলা পায়জামা আর গায়ে একখানা মোটা কাপড়ের পাঞ্জাবি। মদনার দোকানের সামনে গাছের তলায় দাঁড়িয়ে কাদের সঙ্গে যেন কথা বলছে। হাতছানি দিয়ে তাকে ডাকল।

হাঁদু রাস্তার বাঁধ বেয়ে উঠে এল ওপরে ।

কী বলছ গো?

তোর সঙ্গে একটা কথা আছে। বাড়ির দিকে হাঁটতে থাক, আমি সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছি।

যেমন কথা তেমনি কাজ। পথে উঠলে একটু ঘোরা পড়ে যায়। মাঠ দিয়ে হাঁটলে কোনাকুনি একটু তাড়াতাড়ি হত। হাঁটতে হাঁটতে হাঁদু সাইকেলের কথা ভাবছিল। তার নেই। কিন্তু একখানা হলে হত। দুটো চাকার ওপর বনবন করে কী দৌড়টাই লাগায় বাবা যন্ত্রটা। যত দেখে তত হাঁদু অবাক মানে। এসবই সাহেবদের কল, হাঁদু শুনেছে। রাঙামতো দেখতে এক আজব জীব তারা। যত আজব যন্ত্রপাতি তারাই বানায়। সেলাইয়ের মেশিন, আটাচাক্কি, সাইকেল।

সাইকেল হলে হাঁদু যা ফাঁটে ঘুড়ে বেড়াত তা আর বলার নয়। সাঁ করে ধেয়ে এসে গোবিন্দর চায়ের দোকানের সামনে ঘ্যাস করে থেমে বেঞ্চে পা রেখে দাঁড়িয়ে পড়ত। গমগমে গলায় হাঁক মারত, গোবিন, চা দে। ওঃ, কী কাণ্ডটাই যে হত তা হলে।

দেখ-না-দেখ রফিকের সাইকেলটা এসে দাঁড়াল পাশে। হাঁদু পাশ-চোখে সাইকেলটা দেখছিল। আঃ, কী বাহারি জিনিসখানা। দু'খানা চাকা সুদর্শন চক্রের মতো ঘুরছে।

এই বুরবক, সেদিন কাদের দেখেছিলি বল তো। নাম কী?

হাঁদু অবাক হয়ে বলল, কাদের?

ধীরেনের খুনের সময় তুই তো কাছেই ছিলি।

হাঁদু মাথা চুলকে বলল, মনে নেই।

চারটে লোক ছিল তো?

হ্যাঁ চারটেই হবে।

তাদের মধ্যে কাউকে চিনতে পারিসনি সত্যি? না কি ভয়ে মিছে কথা বলছিস?

চিনিনি।

রফিক একটু চাপা গলায় বলল, পুলিশের কাছে কিছু কবুল করেছিস?

না তো।

তবু পালা। এ জায়গা ছেড়ে দূরে কোথাও চলে যা। তোর খুব বিপদ।

হাঁদু আঁতকে উঠে বলল, কেন রফিকভাই?

তোর খোঁজ হচ্ছে।

কে খুঁজছে আমাকে?

ওই চার খুনের সাঙ্গোপাঙ্গরা। তুই একমাত্র সাক্ষী। তুই নিকেশ হলে ওদের আর পায় কে?

কিন্তু আমি তো কিছু বলিনি।

বলিসনি, কিন্তু বলতে কতক্ষণ? পুলিশ কি এমনিতে চুপ করে আছে ভেবেছিস? খুনিদের টাকা খেয়ে ঝিম মেরে আছে মাত্র। কিন্তু ধীরেনের এক খুড়শ্বশুর উকিল, পলিটিক্স করে। খুব খাতির। ধীরেনের বউ গিয়ে তাকে ধরাকরা করায় সে এখন কলকাঠি নেড়েছে। পুলিশ এবার গা-ঝাড়া দিয়ে উঠবে। তোর পেট থেকে কথা টেনে বের করতে তাদের এক মিনিটও লাগবে না। খুনিরা এখন সেই ভয়টাই পাচ্ছে। তোর মুখ বন্ধ না করলেই নয়।

হাঁদু দাঁড়িয়ে গেল, তবে?

রফিক চারদিকটা একবার নজর করে নিয়ে বলল, আমাদের বাড়িতে পটল এসেছিল সকালে।

পটল? ও বাবা।

তাই বলছিলুম, পালা।

হাঁদু একবার ভয়ে ভয়ে চারদিক দেখে নিল।

কোথা যাব রফিক ভাই?

চেনা জায়গায় গিয়ে হাজির হোসনি বোকার মতো। দূরে কোথাও গিয়ে ঘাপটি মেরে থাক।

হাঁদু পায়জামাটা রফিকের সাইকেলের হ্যাণ্ডেলে ঝুলিয়ে দিয়ে বলল, এক্রাম চাচাকে দেবেন।

হাঁদু আর একবার চারদিকটা দেখে নিয়ে মাঠে নেমে পড়ল। কিন্তু কোন দিকে যাবে তা বুঝতে পারল না।

রফিক একটু গলা তুলে বলল, ওরে পয়সাটয়সা কিছু আছে?

হাঁদু মাথা নাড়ল। নেই।

রফিকের দিক থেকে একটা দু'টাকার লাল নোট উত্তুরে বাতাসে উড়ে এল। প্রজাপতির মতো ছোটাছুটি করল কিছুক্ষণ। হাঁদু ধরে ফেলল।

২

চকমকি যখন লোকটাকে লেবুবন থেকে বেরিয়ে তাদের ঘরে যেতে দেখেছিল তখনই বুঝতে পেরেছিল যে, তার বাপটা বাঁচবে না।

নামিনাথের জ্বরটা সারছিল না কিছুতেই। মাসেকের ওপর হয়ে গেল। বাড়ির লোক তাকে বাদের খাতায় ধরে রেখেছে। গাঁয়ের ডাক্তার চরণ ঘোষ খারাপ নয়। জ্বরটর ভালই সারায়। চরণ ডাক্তার দেখেটেখে বলেছিল, পাথুরি হয়েছে মনে হয়। অস্ত্র করা দরকার। শহরে নিতে হবে।

নামিনাথ লোকটা কৃপণ। শহরে গিয়ে অস্ত্র করিয়ে ভাল হওয়া মানে রক্ত জল করা টাকায় এক মস্ত থাবা মারা। তার চেয়ে মরা ঢের ভাল। দুদিন আগে আর পরে।

তবে নামিনাথ গরিবও বটে। কৃপণরা বেশির ভাগই টাকাওলা হয়, গরিবরা বড়ো একটা কৃপণ হয় না। নামিনাথ দুই-ই।

গা গঞ্জে মানুষের যা কিছু রোজগার তা বেশির ভাগই জমি থেকে। খেতি গেরস্থি থেকে। পৈতৃক সম্পত্তি ভাগাভাগির পর নামিনাথ আর তার তিন ভাইয়ের ভাগে মাথাপিছু যা পড়ল তা ভদ্রলোকের পাতে দেওয়ার মতো নয়। জমিজোত হাঁড়ি সবই ভাগ হয়ে যাওয়ায় একখানা ফলাও সংসার একেবারে চুপসে গেল। তবে নামিনাথের মতো অবস্থা আর দুই ভাইয়ের নয়। মেজোজন চরণগঙ্গার মাস্টার। ছোটটি তেহাটার গুরুপদ দাসের ঘরজামাই হয়ে তার কারবার দেখছে। ভালোই আছে তারা। নামিনাথই শুধু আঁটি চুষছে আর দিনরাত কাগজে কলমে নানা হিসেব কষে দেখছে, কীভাবে চালানো যায়। কত কমে আর কত ভালোভাবে। বিড়ি খেত, সেটা ছাড়ল। জুতো পরা ছাড়ল। খাওয়া কমাল।

নামিনাথের তিন ছেলে আর এক মেয়ে। চকমকি বড়ো, তার বয়স ষোলো সতেরো। তিন ছেলে ছোট। পেট অনেকগুলোই বলতে হবে। তারা যে খুব ভালো খেত পরত তা নয়। তবে ভাগাভাগির আগে পর্যন্ত নামিনাথ তার ভাইদের জমির ফসল খানিকটা করে নিজের ভাগে হাতিয়ে নিতে পারত। ভাইরা বাইরে থাকে, অত নিকেশ নিতে হাজির থাকত না। কিন্তু ভাগের পর যে যার নিজের অংশ বেচে দিয়ে আপদ চুকিয়ে গেছে। ফলে অবস্থা ঝপাত করে পড়ে যাওয়ায় ছেলেমেয়ে বউয়ের দুর্দশা এখন শতগুণ। ভাতের সঙ্গে শুধু সেদ্ধ। জামা একখানার বেশি দু'খানা কারওরই নেই। চুলে তেল জোটে না।

তার ওপর নামিনাথের অসুখটাও বেঁধে বসল এসময়ে।

সন্ধেবেলা চকমকি তিনটে হাঁসকে তাড়িয়ে এনে সবে মাচার তলায় ঢুকিয়েছে এমন সময় দেখল নামিনাথের ঘরের পিছনে আঁধার লেবুঝোপের ভিতর থেকে একটা কালো লম্বা লোক বেরিয়ে এসে ধীর পায়ে ঘরে গিয়ে ঢুকল।

চকমকি দেরি করেনি। 'বাবা' বলে হাঁক দিয়েই দৌড়ে গেছে ঘরে। হ্যারিকেনটা নিবু নিবু করে জ্বালা। সেটা উসকে নেবার আগেই দেখল, লোকটা যেন একটা পাতলা ছায়ার মতো ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে নামিনাথের বিছানার পাশে।

বাতি উসকে চকমকি ভাল করে দেখল, কেউ নেই। কেউ নেই। চৌকির তলা, ঘরের আনাচ কানাচ সব জায়গায় দেখল। কেউ নেই। নামিনাথ একা বেঘোরে পড়ে আছে।

দুর্দৈব। দেখ এখন কী হয়। আমি একটা খবর দিতে এলুম।

কী খবর কাকা?

স্বামীনাথ আজ আসবে। আমার সঙ্গে চকবেড়েয় কাল দেখা। খবরটা দিতে বলল।

কাকা আসছে, সেটা কোনো ভরসার কথা নয় চকমকির কাছে। কাকা তাদের দু'চোখে দেখতে পারে না। নামিনাথের অসুখের খবর পেয়েই আসছে নাকি? কিন্তু চকমকি যতদূর জানে, বড়ো কাকা সেরকম মানুষ নয়। তেএঁটে পাজি লোক। কোনোকালে সম্পর্ক রাখেনি। সম্পত্তির বখরা নিতে এসে কী সাংঘাতিক হম্বিতম্বি। নামিনাথকে এই মারে কী সেই মারে। চকমকি ভালই জানে যে, তার বাবা কিছু সাধুপুরুষ নয়। কিন্তু মানুষটা নিরীহ, মিনমিনে, দুর্বল। কৃপণদের প্রকৃতি দুর্বলই হয়ে থাকে। ভাইদের তর্জনে গর্জনে আরও মিইয়ে কেমনধারা যেন হয়ে গিয়েছিল। মুখে বাক্য সরে না। কেবল চোর-চোর টালুমালু চোখে চারদিকে চায় আর বিড়বিড় করে কী যেন আপনমনে বকে।

লোকটার অমন অসহায় অবস্থা দেখে ঘরজামাই কাকার তবু মনটা যেন নরম হয়েছিল, কিন্তু বড়ো কাকার যেন রোখ কিছুতেই কমতে চায় না। চকমকি তখনই বুঝে গিয়েছিল এই মাস্টার মানুষটির ভিতরে দয়ামায়া বড্ড কম। যে ক'দিন এ বাড়িতে ছিল কেবলই বউদি আর ভাইপো ভাইঝিদের ধমক টমক চোটপাট করে হুকুমের ওপর রেখেছে। লোকটার চেহারার মধ্যেও একটা কর্কশ ভাব আছে।

খবরটা ভাল নয়।

কানুকাকার সাইকেলটা চলে যেতেই চকমকি ফিরে এসে ঘরের কাজে মন দিল। মনটা আড় হয়ে রইল।

লেবুঝোপের ভিতর থেকে যে ছায়ামূর্তিকে বেরিয়ে আসতে চকমকি আর লাবণ্য দেখেছে তার কথাও এই সাতসকালে মনে পড়ল তার। বাবাটা কি মরে যাবে? বিনা চিকিৎসায়, অনাদরে? সংসারে কি একটা অমঙ্গলের ছায়া নেমে আসছে।

ভাইগুলোকে ঘুম থেকে তুলে পুকুরঘাট ঘুরিয়ে নিয়ে এল চকমকি। চাট্টি করে মুড়ি দিল বেতের ছোট্ট ধামায়। তারপর পড়তে বসাল। পড়াটা নামমাত্র। ছেঁড়াখোঁড়া বইখাতা আর ভাঙা শ্লেট নিয়ে হাঁ করে বসে থাকে তিনজনে। কে শেখাবে তাদের? স্কুলে যায় আসে বটে, কিন্তু কেউ তাগিদ দেয় না বলে পড়েও না, শেখেও না। দিনকে দিন ছোটোলোক হয়ে যাচ্ছে।

এ বাড়ির রান্না এখন ভারি সরল। প্রথমে এক বাটি শটি তৈরি হয় রুগির জন্য। তারপর ফ্যানভাত বসে যায়। বাগান থেকে যা পায় তুলে আনে চকমকি। উচ্ছে, বেগুন, লাউ বা কুমড়ো। ভাতে ফেলে দিলেই হয়। ফ্যানাভাত আর নুন--এই তাদের খাবার।

রান্না বসাতে না বসাতেই লাবণ্য উঠে এল। রোগা জীর্ণ চেহারা। রুগির চেয়েও যারা রুগির সেবা করে তাদের দুর্গতি বেশি। নামিনাথ আজকাল বিছানা থেকে উঠতে পারে না বললেই হয়। পায়খানা পেচ্ছাপটাও ঘরেই করতে হয়। সেসব পরিষ্কার করে লাবণ্য। সারা রাত রুগির পাশে বসে থাকতে হয়। নামিনাথ বড়ো অশৈরণ, শরীরের কষ্ট একদম সহ্য করতে পারে না। হ্যাপা সামলে সকালবেলায় লাবণ্য বড়ো কাহিল থাকে।

চকমকি মাকে লক্ষ করল ভালো করে। লাবণ্য স্নান করে এসে যখন রান্নাঘরের বারান্দায় চায়ের গেলাস হাতে বসল তখন সে খবরটা দিল, মা, আজ বড়ো কাকা আসছে। কানুখুড়ো খবর দিয়ে গেল।

লাবণ্য ক্লান্ত চোখে মেয়ের দিকে চেয়ে বলল, কেন আসছে?

কে জানে।

লাবণ্য একটু চুপ করে থেকে বলল, ঘরে তো কিছু তেমন নেই, কী খাওয়াব? আমরা যা খাই তা তো কারও পাতে ধরে দেওয়া যায় না।

কে এসেছিল তা চকমকি জানে। ওরা এসময়ে আনাগোনা করে। দেখে যায়, আর কতক্ষণ আয়ু।

নামিনাথের বউ লাবণ্য মেয়ের কাছে সব শুনে গুম মেরে রইল কিছুক্ষণ। তারপর জলভরা চোখে বলল ঠিক দেখেছিস?

ঠিক মা। একটুও বানিয়ে বলছি না।

লাবণ্য আঁচলটা ভালো করে গায়ে জড়িয়ে শরীরের একটা শীতভাব আটকানোর চেষ্টা করে বলল, আমিও দেখেছি।

কবে মা?

কাল। রান্নাঘর থেকে শুনছিলুম কুকুরটা ভীষণ ডাকছে। রাত বেশি নয়, সবে সাঁঝ পেরিয়েছে। কে এল দেখতে রান্নাঘর থেকে বেরিয়েই দেখলুম, একটা লোক ওর ঘরে ঢুকছে। বললাম, কে ওখানে, কেউ জবাব দিল না। একটু বাদে এসে দেখি, ঘর ফাঁকা। তোরা সব তখন বাতাসিদের বাড়ি শনি পুজোয় গেছিস।

চকমকি তার বাবাকে যে ভীষণ ভালোবাসে এমন নয়। তার বাপের অনেক গণ্ডগোল। অলস কৃপণ ঝগড়াটে তিরিক্ষি মেজাজের লোক। কাছে ঘেঁষলেই কেমন যেন খ্যাঁক করে উঠতে চায়। কারও বেশি খাওয়া পছন্দ করে না, একটুখানি বাবুগিরি সয় না। চকমকির এই তো সবে সাজের বয়স। তবু একটু পাউডার কিনে দেবে না, একখানা বাড়তি শাড়ি ব্লাউজ তার নেই, আলতা জোটে না। শুধু দু'বেলা দুটো ভাত। এর বেশি তারা আর কিছু আশা করে না।

তবু লোকটা তার বাপ। যেমনই হোক, বাপ। নামিনাথ মরলে তারা পড়বে অগাধ জলে।

কিন্তু চকমকি জানে, নামিনাথ আর বাঁচবে না। পেটে পাথর হলে কেউ কি বাঁচে? যমদূত আনাগোনা শুরু করেছে।

তাদের বাড়িটার চারদিকে মেলা অবান্তর গাছ হয়েছে। কে কাটবে? সকালে ঘরের সামনের দাওয়ায় বসে উদাস চোখে দেখছিল চকমকি। আগাছার জঙ্গল।

সকালের দিকটায় অনেক কাজ থাকে। কিন্তু চকমকির আজ আর কোনো কাজে মন লাগছে না। অথচ ওঠা দরকার। তার মা সারা রাতই প্রায় জেগে বসে থাকে তার বাবার পাশে। সকালের দিকে একটু তন্দ্রামতো হয় তার। এ সময়ে মা উঠে সংসারের ঝামেলা পোহাতে পারে না।

উঠোন ঘর সব ঝাটপাট দিতে হবে। লেপাপোঁছা আছে। ভাইগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে প্রাতঃকৃত্য করানোর পর পড়তে বসাতে হবে। রুগির পথ্য করা, রান্না, সবই পড়ে আছে।

তবু চকমকি বসে রইল চুপচাপ। সে কেবল ভাবছে, নামিনাথ মরে গেলে কী হবে। কী হবে তা বলা শক্ত, কিন্তু কী হবে না তা সে ভালোই জানে। একটা হল, তার বিয়ে। নামিনাথ মরে গেলে তার আর বিয়ে হবে না সহজে।

কে একজন বাইরে থেকে ডাকল, নামিনাথদা, ও নামিনাথদা।

চকমকি চমকে উঠল। কানুকাকার গলা।

উঠে এগিয়ে গিয়ে চকমকি বলল, বাবার বড় অসুখ।

কানুকাকা একখানা সাইকেলে বসে। বলল, সে তো জানি। আজ আছে কেমন?

জ্বর কমছে না।

তাই তো রে। ভাবালে বড্ড। ডাক্তার কী বলছে?

অস্ত্র করতে হবে।

চকমকি চুপ করে রইল।

লাবণ্য চা শেষ করে উঠল। বলল, তুই সামলে থাক সব। আমি একটু ঘুরে আসছি। হাঁসের ঘরে দেখিস তো ডিম আছে বোধহয়। বের করে রাখ। শালপাতাও তুলে রাখিস চারটি।

ঘটি, বাটি, গেলাস যাহোক একটা কিছু আঁচলের তলায় লুকিয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল লাবণ্য।

বাপের জন্য শটিফুড জ্বাল দিয়ে নিয়ে গেল চকমকি।

বাবা।

নামিনাথ জ্বরে বেহুঁশ হয়ে বিড়বিড় করে বলছিল, ওই আসছে। ওই আসছে।

ভয়ে দিগবিদিগজ্ঞানশূন্য হয়ে যখন মাঠ ভেঙে পালাতে লাগল হাঁদু, তখনই আসলে তার এতকালের আকাট মাথাখানা হঠাৎ খুলে যেতে লাগল। কারণ হঠাৎ তার মাথায় একেবারে বজ্রাঘাতের মতো এসে পড়ল একটা বুদ্ধির কথা। তার মনে হল সে নিজে যাদের ভয়ে পালাচ্ছে তারাও কিন্তু ভয়ই খাচ্ছে তাকে। ভয় খাচ্ছে বলেই নিকেশ করতে বেরিয়ে পড়েছে।

পলতাবেড়ের খালের ধারে যখন পৌঁছল তখন মাথায় আস্ত একখানা ডাব এসে পড়ল হঠাৎ। না, সত্যিকারের ডাব নয়। আর একটা বুদ্ধির কথা। খুনিয়ারা তো তার মুখ বন্ধই করতে চাইছে। তা সেটা দু'ভাবেই হতে পারে। নিকেশ করেও হয়, আবার ঘুষ দিয়েও হয়।

আজ অবধি হাঁদুর জামা-জুতো জুটল না, বউ না, ছাতা না, কিছু না। খুনিয়াদের কাছ থেকে কিছু কষে নিতে পারলে হত। তবে কিনা গদাধর, হেলে, পটল আর গণেশ চরণগঙ্গা থেকে শুরু করে বিশ-ত্রিশ মাইল চক্করে সব এলাকাই মুঠোয় রেখেছে। নইলে এক্রামের বাড়ি চড়াও হতে পারত না।

দর্জিঘরের সামনের দিককার ঝাঁপ ফেলে ব্রজ একটা লুঙ্গি সেলাই করছিল খড়খড় করে।

ব্রজদা। বড্ড বিপদ।

ব্রজ মুখ তুলে চেয়ে বলল, কীসের বিপদ?

হাঁদু ধীরেনের লুঙ্গির একখানা কোনা তুলে মুখের ঘাম মুছে বলল, আমার একটা লুকোনোর জায়গা দরকার। নইলে মেরে ফেলবে।

ব্রজ সেলাই থামিয়ে বিড়ি ধরিয়ে সবটা শুনল বসে বসে। কুঁজো থেকে নিজের হাতে জল গড়িয়ে খাওয়াল হাঁদুকে। তিন নম্বর বিড়িতে হাঁদুর কথা শেষ হল। পাঁচ নম্বর বিড়ি অবধি চুপচাপ বসে ভাবল ব্রজ।

তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তোর এদিকেও বিপদ, ওদিকেও বিপদ। ওরা এখন খ্যাপা কুকুরের মতো হন্যে হয়ে খুঁজছে তোকে। দর কষাকষির কথাই ওঠে না। হেঁসো দিয়ে গলা নামিয়ে দেবে।

তা হলে?

তোর দরকার এখন একজন মাতব্বরগোছের লোক। নইলে পেরে উঠবি না। মাতব্বর যদি কাউকে পাস তো বেঁচে গেলি। সে তোকে আড়ালে রেখে খুনিয়াদের সঙ্গে কথা বলবে। এখন টাকাপয়সা খেঁচবার কথা ভাবিসনি। আগে গর্দানখানা বাঁচা।

একজন মাতব্বর জুটিয়ে দাও না।

ব্রজ সাত নম্বর বিড়ি খরচ করে তারপর স্বামীনাথের ঠিকানা দিলে। একখানা হাতচিঠিও দিল সঙ্গে। বলল, এই ঘরেই লুকিয়ে থাক বিকেল অবধি। পাটাতনের ওই কাঠখানা আলগা আছে, কেউ হুড়ো দিলে ওটা তুলে খালের জলে নেমে পড়িস। দুটো মুড়ি তেলেভাজা দিয়ে যাচ্ছি, চিবিয়ে বেঞ্চখানায় শুয়ে থাক। আমি বাড়ি চললুম। আর একটা কথা। যার কাছ পাঠাচ্ছি সে কিন্তু লোক সুবিধের নয়। অতি ঘড়েল।

শীতের বেলা পট করে ফুরিয়ে যখন চারদিকে লেপাপোঁছা আঁধার হল তখনই সাঁত করে ব্রজর দোকান থেকে বেরিয়ে খালের ধারে নেমে পড়ল হাঁদু।

চরণগঙ্গা তার চেনা জায়গা। তবে চেনা পথে গেলে বিপদ আছে ভেবে হাঁদু মাঠঘাট ভেঙে হাঁটা দিল।

ইকবালপুর পিরের দরগার কাছাকাছি একটু জিরোতে বসেছিল গাছতলায়। তখনই হঠাৎ ঘটনাটা ঘটল। ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয়।

একটু দূরে দরগার বাতি জ্বলছে। লোকজনও দেখা যাচ্ছে দু-চারজন। একটু তফাতে একখানা অশ্বত্থ গাছের তলায় থুপ করে ঠ্যাং ছড়িয়ে বসে হাঁফ ছাড়তে ছাড়তে অভ্যাসমতো লুঙ্গিটা তুলে যখন মুখের ঘেমো ভাবটা মুছছে তখনই হঠাৎ ধীরেন তার কানে কানে বলল, তুই বড়ো ভালো ছেলে...

তড়াক করে লাফিয়ে উঠল হাঁদু। 'ভূত। ভুত' বলে চেঁচিয়ে ফেলত আর একটু হলে। কিন্তু সামলে গেল সময়মতো।

তারপর বাকি রাস্তাটা সে আর কোথাও দাঁড়ায়নি।

স্বামীনাথ লোকটা যে সুবিধের নয়, তা তার দিকে একবার চোখ ফেললেই বোঝা যায়। চোখদুটো ভারি ধূর্ত। মুখখানা দেখলে মনে হয়, রসকস সব কেউ নিংড়ে নিয়েছে।

ব্রজর চিঠিখানা গোমড়া মুখ করে পড়ল, আর ততক্ষণ হাঁদুকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখল, ঘরে ঢুকতে দিল না।

ঘরে ঢুকেই যে স্বস্তি হল তা নয়। শুরু হল জেরা। নাম, বাপের নাম দিয়ে শুরু। তারপর নানা খতেন। লোকটা যে ঘোরতর বিষয়ী তা ঘর দেখলেই বোঝা যায়। ঘরের দুটো দেয়াল জুড়ে ছাদ পর্যন্ত পেটমোটা বস্তা সাজিয়ে রাখা। চৌকির তলাতেও তাই। বাড়িখানা বেশ বড়োসড়ো। অবস্থাপন্ন চেহারা। গাঁয়ের মাস্টারের অবস্থা এত ভালো হওয়ার কথা নয়।

লোকটা যে বিষয়ী তার আরও প্রমাণ, হাঁদু খুনের সাক্ষী জেনেও তাড়াল না। সব শুনেটুনে ভাবতে লাগল। বিষয়ী লোকেরা দুনিয়ার সব ঘটনা থেকেই দাঁও মেরে নিতে পারে।

অবশেষে ভরসার কথা বেরলো মুখ দিয়ে, ধীরেন সাঁপুইকে আমি ভালোই চিনতাম। অমন পাজি লোক দুটো হয় না। মরেছে আপদ গেছে। তবে আইন বলে কথা আছে। তা খুনেদের যে তুমি ভালো করেই চেনো সে কথা হলফ করে বলতে পারবে তো সময়কালে?

আজ্ঞে দরকার হলে পারব।

তুমিই একমাত্র সাক্ষী কিনা। তোমার ওপর অনেকটাই নির্ভর।

আজ্ঞে জানি।

তা আগে পুলিশে সেকথা বলনি কেন?

ভয়ে।

এখন ভয় নেই?

আজ্ঞে এখন আরও বেশি ভয়। কিন্তু খুনিয়াদের ধরিয়ে না দিলে তারা যে আমাকেই নিকেশ করবে। তবে টাকাপয়সা দিয়ে যদি বন্দোবস্ত করতে চায় তা হলে...

স্বামীনাথ মাথা নেড়ে বলল, ও লাইনে সুবিধে হবে না। ধীরেনের খুড়শ্বশুর মস্ত মানুষ। এম এল এ। সে এতকাল গা করেনি, জামাইকে বোধহয় পছন্দও করত না। কিন্তু এবার সে গা-ঝাড়া দিয়ে নেমেছে। খুনিয়ারা ধরা পড়বেই। তার সাক্ষী না থাকলে মামলাটা ফেঁসে যেতে পারে এইজন্যই খুনিয়ারা তোমাকে খুঁজছে।

আজ্ঞে জানি।

স্বামীনাথ আবার ভাবতে বসল। তারপর বলল, আপাতত গা-ঢাকা দিয়ে থাকো। আরও ভেবে দেখি।

স্বামীনাথের বাড়িতে দু'রাত্তির থাকতে হল হাঁদুকে।

প্রথম রাত্রেই ঘটনাটা আবার ঘটল। হাঁদুর একটি বই দুটি লুঙ্গি নেই। সেই ধীরেনের লুঙ্গিখানা। মাঝরাত্তিরে লুঙ্গিখানা যেন ধীরেনের গলায় কথা কয়ে উঠল, নেমকহারামি করিস না রে হাঁদু। তুই বড়ো ভালো ছেলে ছিলি...

হাঁদু ভারি ভয় খেয়ে গেল।

দ্বিতীয় রাত্রে ফের ধীরেনের গলা, সামলে-সুমলে চলিস বাপু, তোর সময়টা মন্দও বটে, ভালোও বটে। মন্দ থেকেই ভালো বের করে নিতে হয়...

হাঁদুর ভিরমি খাওয়ার জোগাড়। দ্বিতীয় রাত না পোহাতেই আঁধারে আঁধারে দুজনে বেরিয়ে পড়ল। স্বামীনাথ আর সে। স্বামীনাথের এক দাদার বাড়ি আছে কাছেপিঠে। এক গাঁয়ে। জায়গাটা নিরাপদ। মাইল পাঁচেক হেঁটে তারপর বাস ধরে এবং ফের মাইলটাক হেঁটে যখন বাড়িটায় পৌঁছল হাঁদু আর স্বামীনাথ তখন দুপুর।

মানুষের খিদে তেষ্টা আছে, হাঁদুর নেই। মানুষের শীত গ্রীষ্ম আছে, হাঁদুর নেই। মানুষের সুখ দুঃখ আছে, হঁদুর নেই। হাঁদুর এমনি আরও অনেক কিছুই নেই। থাকলে বেশ হত। না থেকেও চলে যাচ্ছে।

হাঁদুকে দাওয়ায় বসিয়ে রেখে স্বামীনাথ ভিতরবাড়িতে ঢুকে সেই যে জমে রইল আর ঘন্টাটাকের মধ্যে বেরোল না। এর মধ্যে একটা ছুকরি মেয়ে কলসি কাঁখে বাড়ি ঢুকতে

ঢুকতে তাকে বেশ খর চোখে দেখে গেল। তিনটে বাচ্চা ছেলে অনেকবার ঘুরে ফিরে পরখ করে গেল তাকে। হাঁদুর অবশ্য তাতে কিছু যায় আসে না। দাওয়ায় বসে বসে সে দেয়ালে ঠেস দিয়ে ঢুলতে লাগল।

অনেকক্ষণ বাদে ছুকরি মেয়েটা এসে ডাকল, এই যে, ওঠো তো, পুকুরে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ো নাও। ভাত বাড়া হচ্ছে।

এই কথায় হাঁদুর খিদের কথা মনে পড়ল, হাত মুখ ধোয়ার কথা মনে পড়ল। রওনা হওয়ার আগে স্বামীনাথ দুধমুড়ি খেয়ে এসেছে। তাকে কিছু দেয়নি।

উঠোন ডিঙিয়ে পুকুরঘাটে যাওয়ার সময় হাঁদু চারদিকে চেয়ে বুঝে ফেলল, এরা বড়ো গরিব। বাড়িটার কেমন হাড়হাভাতে চেহারা। পুকুরের দিকে যেতে বড়ো বড়ো কচুপাতা গায়ে লাগছিল হাঁদুর। আগাছা জন্মেছে খুব। একটা কুলগাছ শুঁয়োপোকায় ছেয়ে আছে। বোঝা যায় দেখাশোনার লোক নেই এ বাড়িতে।

যখন পুকুরে নেমে জল ছুঁয়েছে তখনই স্নান করার ইচ্ছেটা মনের মধ্যে চাগাড় দিল। শরীরটা তেতে আছে। ধুলোও খেয়েছে খুব। কিন্তু পরনের একখানা বাড়তি ট্যানাও নেই, গামছাও দূরস্থান। গায়ের চাদরখানা অবশ্য পরে নেওয়া যায়, গেঞ্জিখানা দিয়ে গামছার কাজ চলে যেতে পারে।

দোনামোনা করে নেমেই পড়ল জলে হাঁদু। কী ঠাণ্ডা, কী মিষ্টি জল। অনেকক্ষণ স্নান করল, কয়েকবার সাঁতারে এপার-ওপার করল পুকুরটা। তারপর গেঞ্জিটা ধুয়ে গা মুছল, চাদরটা লুঙ্গি করে পড়ল।

খেতে বসে ভারি আশ্চর্য হয়ে গেল হাঁদু। এরা ভাত দিয়েছে একটা কাঁসার কানা-উচু থালায়। গরম ভাত, একথাবা শাক। ভাতে ধোঁয়া উঠছে। এরকমটায় অভ্যাস নেই হাঁদুর। জন্মে সে কলাইকরা বা অ্যালুমিনিয়ামের থালা ছাড়া খায়নি। থালার সামনে আবার একখানা আসন পাতা। এক গেলাস জল। সামনে সেই ছুকরি মেয়েটা ডালের বাটি আর ঝোলের একখানা বোকনো মতো নিয়ে বসে আছে। পরিবেশন করবে।

ভারি লজ্জায় পড়ল হাঁদু। লজ্জায় লজ্জায় খেতে খেতে বলল, স্বামীনাথবাবু কি চলে গেছেন?

না, খেয়ে উঠে বিশ্রাম করছে। বিকেলে যাবে। তুমি ওঁকে চেনো?

হাঁদু মাথা নেড়ে বলল, পরশুই আলাপ। আগে চিনতাম না।

শুনলাম তুমি নাকি এখন এ বাড়িতেই কিছুদিন থাকবে। তা তোমার জিনিস কোথায়?

জিনিস, বলে হাঁদু একগাল হাসল, না জিনিস নেই। আমার কিছু লাগে না।

বহুকাল পরে বড়ো ভালো খেল হাঁদু। তেমন কিছু নয়, শাক ডাল আর একখানা ঝোল। কিন্তু ভারি যত্ন করে দিল। এমনকী খাওয়ার পর এঁটো বাসনটাও নিজেই নিতে গিয়েছিল মেয়েটা। হাঁদু জিব কেটে প্রায় কেড়ে নিয়ে মেজে এনেছে ঘাট থেকে।

বাড়িটা বড়ো ভালো লেগে গেল হাঁদুর। দুপুরটা সে দাওয়ায় বসে বসে অনেক ভাবল। ভাবতে ভাবতে একটু ঢুলুনি এসেছিল। হঠাৎ ধীরেন খুব কাছ থেকে ফিসফিস করে বলল, তোর হয়ে গেল। বেঁচে গেলি রে ব্যাটা...

ভারি চমকে উঠল হাঁদু। ইতিউতি চাইল। ধীরেনের গরম শ্বাসটা যেন এখনও কানে লেগে আছে।

বেলা থাকতে থাকতেই বেরিয়ে পড়ল স্বামীনাথ। যাওয়ার আগে ধূর্ত চোখদুটো মিটমিট করতে করতে হাঁদুকে বলল, তোমরাও সদগোপ, আমরাও সদগোপ। এ বাড়িতে আপনজনের মতোই থাকো। বেশি বার-টার হয়ো না। গা-ঢাকা দিয়ে থাকো। সময় হলে আমি খবর পাঠাব। আর মুখ বন্ধ রাখবে। স্পিকটি নট।

হাঁদু দু'দিন আগে যেমন হাঁদারাম ছিল তেমনটা যেন আর নেই। সেই যে ভয় খেয়ে মাঠ ভেঙে দৌড় লাগিয়েছিল তখনই কেন কে জানে তার মাথায় নানা চিত্তির-বিচিত্তির বুদ্ধির ঝিকিমিকি খেলছে। স্বামীনাথের দিকে চেয়ে তার মনে হল, এ লোকটাকে বিশ্বাস করার চেয়ে গোখরো সাপের সঙ্গে ঘর করাও ভালো।

বেলা পড়বার আগেই উঠে হাঁদু জিজ্ঞেস করে খুঁজে পেতে কোদাল আর দা বের করল। উঠোনের আশপাশের আগাছা সাফ করে ফেলল লহমায়। দুটো বেশ বড়োসড়ো কচু তুলে আনল জঙ্গল থেকে। উঠোন দাওয়া ঝাঁটপাট দিল।

সে টের পাচ্ছিল, এ বাড়িতে এক রুগির এখন-তখন অবস্থা। গিন্নিমা আর মেয়েটার মুখ শুকনো, বাচ্চাগুলোরও মুখে হাসিখুশি নেই। কাজ করতে করতেই এসব লক্ষ করল হাঁদু।

মেয়েটা এক ফাঁকে এসে তাকে বলল, কাকা তোমাকে এখানে রেখে গেল কেন বলো তো।

কাঁচুমাচু হয়ে হাঁদু বলল, আমার বড়ো বিপদ কিনা।

মেয়েটা অকপট চোখে তার দিকে চেয়ে বলল, তোমার বিপদ তা কাকা কী করবে?

হাঁদু মাথা চুলকে বলল, শুনেছি মুরুব্বি লোক। ক্ষমতা আছে।

মেয়েটা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর বলল, তোমাকে দেখে মনে হয় বেশ সোজা সরল মানুষ।

আজ্ঞে আমি চোর-টোর নই, কোনো দোষঘাটও করিনি। খেটে খাই। দোষের মধ্যে একটা খুন স্বচক্ষে দেখে ফেলেছিলুম।

খুন বলে মেয়েটা অবাক হয়ে চাইল।

হাঁদু লুকোছাপা করল না কিছু, সব বলে দিল।

মেয়েদের চোখ ছলছল করতে লাগল। শুনে। বলল, ইস, খুব মুশকিলে পড়েছ তো?

আজ্ঞে ভীষণ মুশকিল।

আমাদেরও বড়ো বিপদ। বাবা বোধহয়...। কী যে হবে।

হাঁদুরও চোখ ছলছল করতে লাগল শুনে। দু'জনেই দু'জনের দিকে চেয়ে থাকল একটুক্ষণ। দুজন অচেনা যুবক যুবতীর পরস্পরের দিকে চেয়ে থাকার মধ্যে যে লজ্জা আছে তাদের হচ্ছিল না। কারণ, তাদের তো সেরকম তাকানো নয়। দুজনেই বড় দুঃখী।

সন্ধে পার হওয়ার পর দাওয়ায় বসে হাঁদু গুনগুন করে গান গাইছিল। গুটে গুটে তিনটে ছেলে ঘরে লম্ফ জ্বেলে পড়তে বসেছে। গিন্নিমা রান্নাঘরে। মেয়েটা রুগির কাছে।

ঠিক এই সময়ে মেয়েটা চেঁচাল, মা...ওমা...

হাঁদু উঠে গেল।

কী হয়েছে?

লম্ফের আলোয় দেখল, মেয়েটার চোখ বড়ো বড়ো, ঘন শ্বাস পড়ছে। ঘ্যাসঘ্যাসে ভয়-খাওয়া গলায় বলল, আবার এসেছিল।

কে এসেছিল?

রোজ যে আসে লেবু ঝোঁপ থেকে।

লাবণ্যও মেয়ের ডাক শুনে এসে দাঁড়িয়েছে দরজায়। চোখের দৃষ্টি কেমনধারা।

নামিনাথ ঘোর হয়ে পড়ে আছে। মাঝে মাঝে 'অঃ অঃ' একটা শব্দ বেরোচ্ছে মুখ দিয়ে।

৪

তিন দিন এ বাড়িতে কেটে গেছে হাঁদুর। আর তিন দিনেই হাঁদুর মনে হতে লেগেছে এ বাড়ি তার নিজের বাড়ি। একটুও পরপর লাগছে না এদের। সবচেয়ে বড়ো কথা, যেদিন এ বাড়িতে এল তার পরদিন রাত না পোহাতেই জীবনে প্রথম পিরান পেয়ে গেল হাঁদু। লাবণ্য তোরঙ্গ হাঁটকে নামিনাথের একটা পুরোনো জামা বের করে দিল। বলল, বড্ড শীত পড়েছে, এটা গায়ে দিও।

পিরান পর্যন্তই থেমে থাকেনি ব্যাপারটা, জুতো অবধি গড়িয়েছে। নামিনাথেরই পুরনো একজোড়া ক্ষয়া জুতো ছিল। নামিনাথ জুতো পরা ছেড়ে দিয়েছে বলে পড়েই ছিল। হাঁদুকে দিয়ে দিল লাবণ্য।

হাঁদু অবশ্য গায়ে গতরে খেটে শোধ দিচ্ছে। হিসেব কষে সে বুঝল, নামিনাথ লোকটা এক নম্বরের কুঁড়ে। নইলে বাড়ির হাতায় যে বাগানখানা রয়েছে তাতে চাষ দিলেও

সারাবছর সবজির অভাব হবে না। লাউ কুমড়ো তো মেলাই করা যায়। চাষের জমির যা হিসেব পেল তা নিজে লাঙ্গল চষলে হেসে-খেলে বছরের ধান ঘরে উঠে আসে। যদি অবশ্য আকাল না পড়ে।

হাঁদু প্রথমটায় বাগানের পিছনে লেগে গেল। আগাছা নিড়িয়ে মাটি কুপিয়ে চৌরস করে ফেলতে লাগল। মুঠোর মধ্যে কোদাল যেন চিতাবাঘের শক্তি ধরে। তার গা দগদগ করে ঘামে। শরীর গরম হয়ে ফেটে পড়তে চায়।

লেবুঝোপটা খুব ভালো করে নিড়িয়ে সে তকতকে করে দিয়েছে। কিছু ঝুপসিগাছের বাড়তি ডালপালা কেটে ফেলায় দিব্যি রোদ আর হাওয়ার আনাগোনা শুরু হয়েছে। .

বলতে কি এখন আর লাবণ্য বা চকমকি লেবুঝোপের ছায়াটাকে দেখছে না। হাঁদু আসার পর ওই একবারই দেখা গিয়েছিল। এদিকে কে জানে কেন ধীরেনেরও ফিসফাস বন্ধ। নামিনাথ ধুঁকছে বটে, কিন্তু টিকেও আছে।

জমি কোপাতে কোপাতে একেবারে পশ্চিমধারে কলাঝোপের কাছ বরাবর চলে গিয়েছিল হাঁদু। বাগানখানা মস্ত বড়ো। কলাঝোপের কাছ থেকে চাইলে বাড়িটা গাছপালার আড়ালে আর দেখাই যায় না।

কাঁধ দুটো ধরে গিয়েছিল বলে হাঁদু কোদাল ছেড়ে কলাঝোপের দিকে একটু সরে দাঁড়াল। আর দাঁড়াল বলেই দেখল।

যা দেখল তাতে তার রক্ত জল হয়ে যাওয়ারই কথা।

একটু দূরে একটা শিবমন্দির আছে। পূর্ব-দক্ষিণ কোনাকুনি। বটগাছের নীচে সকাল-বিকাল ওখানে গাঁয়ের লোকদের একটু জটলা হয়। দুপুরে একদম ফাঁকা। সেই বটতলায় দুজন লোক দাঁড়িয়ে। স্বামীনাথকে চিনতে কষ্ট হয় না। অন্যজনও খুব চেনা হাঁদুর। গদাধর। স্বামীনাথ এ বাড়ির দিকে আঙুল তুলে কী যেন দেখাচ্ছে গদাধরকে।

কলাঝোপের ছায়ায় দাঁড়িয়ে হাঁদু দৃশ্যটা বেশ স্থির হয়েই দেখল। লক্ষ করল, স্বামীনাথ আর এদিক পানে এগোল না। ফিরে চলল পায়ে হেঁটে। একটু বেশ জোরেই হাঁটছে।

হাঁদুর বুদ্ধি অনেক পাকা হয়েছে। মাথা এখন তার বেশ সাফ। স্বামীনাথ যে গদাধরের সঙ্গে একটা বন্দোবস্তে এসেছে তাতে তার আর সন্দেহ নেই। তবে কিনা মানুষের ওপর রাগ করে লাভ নেই। মানুষ এরকমও হয়। ভালোর ভালো খুব ভাল যেমন আছে, তেমনি এরকমও আছে। সবরকম না হলে কি ভগবানের চিড়িয়াখানা ভরভরাট হয়।

ধীরেন যে তার কানে কানে বলেছিল, মন্দ থেকেই ভালোটা বের করে নিতে হয় সে কথাটাও চড়াক করে খেলে গেল মাথায়।

গদাধর ইতিউতি চেয়ে ধীর পায়ে এগিয়ে আসতে লাগল। মুখ-চোখ বেশ বিভ্রান্ত। একটা মরিয়া ভাব। ফাঁসির দড়ি চোখের সামনে ঝুলছে তো দিন-রাত।

কিন্তু গদাধরকে আর কষ্ট দিতে ইচ্ছে করল না হাঁদুর। সে বাগানের বেড়াটা টপকে গেল এক লাফে। তারপর শুখা খালের খাঁড়িতে নেমে বেড়ালের মতো এগিয়ে গেল।

গদাধর চারদিকে চেয়ে একটু বেকুবের মতো মুখে সদরে গিয়ে দাঁড়িয়ে উঁকি-ঝুঁকি মারছে।

পিছন থেকে হাঁদু এগিয়ে গেল চোরের পায়ে। তারপর যে লাফটা মারল তা হনুমান দেখলেও লজ্জা পেত।

গদাধর মাথা ঘোরানোর সময় পেল না। গদাম করে পড়ে গেল মাটিতে। হাঁদু দেখল, গদাধরের মুঠোয় তখনও একটা ভোজালির বাঁট ধরা। ছাড়েনি।

হাঁদু ভোজালিটা তুলে জঙ্গলের দিকে ছুড়ে দিয়ে গদাধরকে গর্দান ধরে দাঁড় করিয়ে দুটো ঝাঁকুনি দিল। দিয়ে নিজেই অবাক হল সে। ক'দিন আগেও গদাধরকে দেখলে সে নেংটি ইঁদুরের মতো পালাত নিশ্চয়।

গদাধর একটু হাপসে গিয়েছিল। বলল, ছাড় বলছি। জানে মেরে দেব।

মারতেই তো এসেছিলে। এখন তোমাকে পুঁতে ফেললে কেমন হয়?

বলেই কোকসায় একটা হাঁটুর গুঁতো বসাল হাঁদু।

গদাধর কোঁক করে উঠল।

হাঁদু বলল, মারব না। তোমার বিপক্ষে সাক্ষীও দেব না। কিন্তু আমার একটা কাজ করে দিয়ে জন্মের মতো বিদেয় হবে। কথা দাও।

কী কাজ?

একজনের পাথুরি হয়েছে। ভালো করে দিতে হবে। তুমি মেলা ওষুধ জানো।

গদাধর কথাটা বিশ্বাস করল না বোধহয়। হাঁদুর দিকে চেয়ে বলল, সাক্ষী দিবি না বিশ্বাস করি কী করে?

হাঁদুর কী দায় সাক্ষী দেওয়ার? আমি মিছে কথা বলি না।

মায়ের নামে কিরে কাটতে পারবি?

পারব।

গদাধর নরম হল। বোধহয় দ্বিতীয় খুনটা করার খুব ইচ্ছে তারও ছিল না। ধুতির খুঁটে মুখটা মুছে বলল, কাজটা করে ফেলেছি, এখন আর ঝুলিয়ে কিই বা করতিস। চল তোর রুগি দেখি।

স্বামীনাথ কত টাকা খেয়েছে?

দু'শো। সে টাকা উশুল হয়ে যাবে। চল।

গদাধর রুগি দেখল। খুব মন দিয়েই দেখল। তারপর কাগজে ওষুধের নাম লিখে দিয়ে বলল, ভালো হয়ে যাবে। পাথুরি বটে তবে তেমন ঘোরালো হয়নি। নেমে যাবে।

হাঁদুর পিরান হল, জুতো হল। বউও হয়-হয়।

কয়েকজন ক্লান্ত ভাঁড়

প্রথমে ভূপতি ঢুকল। তারপর অনিমেষ। সব শেষ সুকুমার।

ভূপতির হাত সামান্য কাঁপছিল, যেন এই ঘরে ও প্রথম আসছে। ইন্টারভিউ দেওয়ার মতো উত্তেজনা। মুখের হাসিটা ছিলই। সেটাকেই শেষ অবলম্বন করে চৌকাঠ পেরোতে গিয়ে শব্দ করে হাসল ভূপতি।

অনিমেষ পর্দাটিকে অনেকটা সরিয়ে দিল যেন ওটা যে এ ঘরের আব্রু সেটা তার মনে হয়নি। ভ্রূ কুঁচকে নিজের মুখে কয়েকটা ভাবনা চিন্তার রেখা ফুটিয়ে তুলল। ওর মনে হল ওকে দেখেই সবাই হেসে ফেলবে।

সুকুমার সবচেয়ে আস্তে ঢুকল, যেন ওর ঢোকাটা কেউ মনোযোগ দিয়ে দেখছে। খুব মেপে মেপে পা ফেলল আর যতদূর সম্ভব শিরদাঁড়াকে টান রাখল। জানে দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরলে ওকে সুন্দর দেখায়।

তিনজনের কেউ আগে কেউ পেছনে দাঁড়াল। প্রত্যেকেরই নিজের দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে মনোযোগ।

ঘরটা ছোটো, নিখুঁত চৌকোণা। কেউ যেন খুব সাবধানে মেপে একটা সাদা পাথর খুঁজে ঘরটা তৈরি করেছে। তিনটে জানলা দিয়ে বিকেলের আলো আসছে--ঘরটা এত ছোট যে মনে হয় এত আলোর দরকার ছিল না। পাতলা মিহি সাদা গোলাপি রঙের পর্দা জানলায়। নতুন কেনা টেবিলের ওপর কিছু বই উপহারের দোয়াতদানি, বাসি ফুল এলোমেলো, নতুন খাটের ওপর নতুন বিছানার চাদর, পাটভাঙা শাড়ি, শার্ট, সিল্কের পাঞ্জাবি এলেমেলো। একটা ছোটো আলমারি আয়না দেওয়া। মেঝেতে খোলা ট্রাঙ্ক, পাশে খবরের কাগজ বিছিয়ে কেউ থাক করে করে লাল, হলদে এবং মিশ্রিত অদ্ভুত রঙের অনেকগুলো শাড়ি

সাজিয়ে রেখেছে। যেন শাড়িগুলো গোনা হচ্ছিল, তাদের পায়ের শব্দ পেয়ে কেউ উঠে গেছে।

এসে ডিস্টার্ব করা গেল। ভূপতি বলল। সে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আয়নায় নিজের মুখ দেখতে পাচ্ছিল। অনিমেষ নিজের কাঁধ দেখছিল। সুকুমার জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল যেন কেউ না ডাকলে মুখ ফেরাবে না।

ওরা বোধ হয় বেরোত। অনিমেষ বলল।

বাঃ, আমাদের আসতে বলা হয়েছিল যে--সুকুমার মুখ না ফিরিয়ে ফিসফিস করে বলে।

ভূপতি হাসে। অনিমেষ খাটের কাছে এগিয়ে গিয়ে পাটভাঙা নতুন শাড়িটা সরিয়ে দিয়ে বসবে কি না ভাবতে ভাবতে দাঁড়িয়ে থাকে। ওকে চিন্তিত প্রবীণের মতো দেখায়। যেন এই ঘরের কোনো জিনিসপত্র বা বিষয়বস্তুর ওপর তার সমর্থন নেই।

ভূপতি এই ঘরের অবস্থা দেখে মনে মনে যুক্তিবিজ্ঞানসম্মত কয়েকটি সিদ্ধান্তে আসতে চেষ্টা করে। সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ঘরটাকে দেখে। নতুন চুনের গন্ধ পায়। কোরা কাপড়ের গন্ধ। ইউ-ডি-কোলোন। জানালা দরজায় বার্নিশ।

ওঃ খুব হাঁটা হয়েছে। অনিমেষ বলে।

তোর জন্যই তো। সুকুমার গলায় ঝাঁজ নিয়ে অনিমেষের দিকে তাকায়--আমরা একঘন্টা আগে বেরিয়েছি। তখন ট্রামে বাসে ভিড় ছিল না।

তোদের কি, সরকারি অফিসে কাজ করলে অফিসে ঢুকবার আগেই বেরোনো যায়।

প্লিজ, ভূপতি বলে। সুকুমার আবার মুখ ফিরিয়ে জানালার বাইরে তাকায়।

কদি'ন হল বলতে পারিস? ভূপতি থুতনির দাড়ি চুলকোলো।

কীসের? সুকুমার মুখ ফেরায়।

ওদের বিয়ে।

ওঃ। সুকুমারকে নিরুৎসুক দেখায়।

অনিমেষ মনে মনে হিসেব করে।

একমাস বোধহয়।

কী হয়েছে। সুকুমার লাল হয়।

যাঃ বাবা, তোর সবতাতেই লজ্জা। ভূপতি বলে, একটু আওয়াজ দে। নইলে কখন বেরোবে ঠিক কী?

ভেতরের দরজার পর্দা সরিয়ে রজত ঢুকল। ঢুকতে ঢুকতেই চেঁচিয়ে বলল, --এই যে, এসে হাজির তোরা, সুকু, গৌরীপ্রসন্ন অ্যান্ড দি ওল্ডম্যান! বাট ইউ আর লেট পলস। চারটেয় সময় দেওয়া ছিল যে! এখন সাড়ে পাঁচ।

সুকুমার ভূপতির পাশে দাঁড়াল। ভূপতি বলল, বেশ লোক!

অনিমেষ পকেট থেকে রুমাল বের করে বলল, লুক হিয়ার, ইয়ংম্যান, নাউ ওয়াচ হোয়াট ইউ সে। আমরা মেহনত করে খাই--

রজত জোরে হাসল। মসৃণভাবে কামানো গাল, ফর্সা পায়জামা আর গেঞ্জিতে ওকে খুব তাজা দেখায়। হাতে নতুন ঘড়ি। বলল, সরি।

রজত দ্রুত হাতে খাটের ওপর থেকে জামাকাপড়গুলো সরিয়ে দিয়ে জায়গা করে দিল। বলল, বোস।

অনিমেষ খাটের রেলিঙে হেলান দিল। ওর পায়ের কাছে সুকুমার পা ঝুলিয়ে বসল, ও পাশের বেঞ্চিতে ভূপতি হেলান দিয়ে বসল। রজত টেবিল থেকে বই নামালো মেঝেতে। তারপর টেবিলটা খাটের কাছে টেনে নিয়ে তার ওপর হাঁটু তুলে বসল।

তারপর? রজত বলল।

দেখতে এলাম। অনিমেষ গম্ভীর থাকবার চেষ্টা করে।

রজত হাসল। সুকুমার নীচের ঠোঁট কামড়াল। সিগারেটের প্যাকেট বের করল ভূপতি।

নো নো। ভূপতি সিগারেট ঠোঁটে চেপে সাহেবি কায়দায় বলল।

দেখতে এলাম। অনিমেষ তেমনি গম্ভীরভাবে বলে।

কী? রজত বলে।

পাখিটা আর কি ছটফট করে? উড়িবার জন্য আর কি ডানা ঝাপটায়? নড়িতে চড়িতে পায়ের শিকলটা কি ঠুন ঠুন করিয়া বাজে? উইথ ডিউ রেসপেক্ট টু দি পোয়েট, সেটা কি আদৌ শিকল? অনিমেষ থামে।

আসল কথা তোমার এক্সপিরিয়েন্সটা বল। ভূপতি ধোঁয়া ছাড়ল মেঝেতে সিগারেটের ছাই ঝেড়ে।

ইয়ার্কি করিস না, এটা কফি হাউস নয়! সুকুমার খুব ঠাণ্ডা গলায় বলল।

অনিমেষ সোজা হয়ে রজতের দিকে তাকাল। রজত হাসছিল। অনিমেষ ফাঁপা গলায় বলল, এসো রজত আমরা অ্যালায়েন্স করি। আমরা ব্যাচেলরদের সঙ্গে কোনো করুণ ব্যবহার করব না। পুওর সোলস দে ডোন্ট ডিজার্ভ ইট।

ভূপতি অবিচলভাবে বলল, সুকুমারের সেখানে হার্ট থাকা উচিত সেখানে একটি ভগবদগীতা আছে। সেই গীতাই ওকে খেলো।

--গীতা? আই সি? অনিমেষ ভ্রূ কোঁচকাল।

সুকুমার নিজের রাগ চাপা দিয়ে হাসতে চাইল। মুখ তুলে তিনজনের দিকে তাকাল। ভূপতি নির্বিকার। অনিমেষ যেন চিন্তিত। রজত হাসছে। সুকুমার লাল হয়ে হাসে।

রজত কোমরের ভাঁজ থেকে ক্যাপস্ট্যানের প্যাকেট বের করে একটা নিয়ে প্যাকেটটা তিনজনের দিকে বাড়িয়ে দেয়। অনিমেষ আর সুকুমার একটা করে সিগারেট নেয়। ভূপতি বলে 'থ্যাঙ্কস'।

রজত সিগারেট ধরিয়ে বলল, আসলে কি জানিস ছাপা-বাঁধাই মন্দ নয়, প্রচ্ছদপটও ভালো, তবে--

বাজে উপমা। অশ্লীল। সুকুমার বলল খুব আস্তে। ভূপতি উদাস গলায় বলল, বলে ফেল। তবে--

তবে আগের লাভার-টাভার আছে কি না জানতে হলে পুরো উপন্যাসটা পড়তে হয়। সেটা সময়সাপেক্ষ। রজত ধোঁয়া ছেড়ে অনিমেষের দিকে তাকায়।

আগে কহ আর! অনিমেষ বলে।

রজত হাসে, ওল্ডম্যান, তুমি রোমান্টিক নও সুকুমারের মতো। সুকুমার অভিজ্ঞ নয় তোমার মতো। ও এখনো ছেলেমানুষ--

হুঁ, আমাদের দায়িত্ব--অনিমেষ বলে।

ভূপতি চুপ করে ধোঁয়া ছাড়ে। সুকুমার বলল--ক্যারি অন।

রজত সুকুমারের দিকে তাকায়, তোমাকে নষ্ট করতে চাই না।

তোমরা ওকে অপমান করছ। ভূপতি বলে কোনোদিকে না তাকিয়ে সুকুমার হয়ে থাকাটাই ওর ধর্ম, যেমন জলের ধর্ম তারল্য তেমনি শিশুর ধর্ম সারল্য। বিবাহিত হলে ওর ধর্ম পালটাবে, যেমন জল জমে বরফ হয় শিশু পক্ক হলে অনিমেষ কিংবা ভূপতি হয়।

ওঃ, অনিমেষ ধোঁয়া ছাড়ে, শিশু এবং বৃদ্ধদের সামনে লজ্জা করতে নেই।

সুকুমার কথা বলল না। সন্তর্পণে সিগারেটের ছাই মেঝেতে ঝেড়ে পা দোলাতে লাগল। অনিমেষ পা ছড়িয়ে শরীরটাকে ছেড়ে দিল যেন এটা ওর নিজের ঘর। রজত টেবিলের থেকে পা নামিয়ে চটিতে ঢোকাল। দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল,--বৃদ্ধদের কথায় একটা ঘটনা মনে পড়ল। গোলদিঘিতে বিকেলবেলায় এক বুড়ো আর এক বুড়োকে নিজের দেশি ভাষায় বলছিল--'বয়সকালে আমরাও দুই চাইরটা মাইয়া নষ্ট করছি, কিন্তু রায়মশায়, এখনও যখন দেখি বয়সের মাইয়াগুলা বুকটান কইর্যা রাস্তা দিয়া হাঁটে তখনও ইচ্ছা করে যে--'

অনিমেষ সোজা হয়ে বসে দ্রুত প্রশ্ন করে, কী ইচ্ছে করে?

রজত হাসল, প্লিজ, আর এগোতে পারব না। সুকুকে কনসিডার কর।

সুকুমার হাসি চেপে গম্ভীর থাকতে চাইল। ভূপতি অবহেলায় একটু হাসল। অনিমেষ চিন্তিতভাবে গালে হাত দিল।

সুকুমার খুব আস্তে প্রায় নিশ্বাসের সঙ্গে রজতকে বলে, তোকে দেখে মনে হচ্ছে না যে তুই সদ্য বিবাহিত!

আ হা, আমি সদ্য বিবাহিত! রজত প্রথমে অনিমেষ তারপর ভূপতির দিকে তাকায়। হাসে হি হি করে।

সদ্য বিবাহিত! অ্যাঁ?--অনিমেষ, হাত ঘষে সিনেমার কোনো ভিলেনকে নকল করে হাসল।

ভূপতি গম্ভীরভাবে সুকুমারের দিকে তাকায়, প্রিয় সাহিত্যিক, তোমার মন তোমার লেখনীর অনুধর্ম নয়। তুমি ভাবো এক লেখো অন্য।

কলমের আব্রু ঘোচাও, কবি। রজত হাসে।

অনিমেষ হাতের ছোটো হয়ে আসা সিগারেটের দিকে তাকিয়ে বলে, সেই কারণেই পৃথিবীর কোনো জিনিসকে আমি ঘেন্না করি। যেমন কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, প্রেমিক, রজনীগন্ধা এবং বিলিতি কুকুর।

যাঃ ভালো লাগে না। সুকুমার ঠোঁট বেঁকায়।

ভূপতি আর অনিমেষ দুজনে দুজনের দিকে তাকাল।

তুই কবি। অনিমেষ বলে।

তুই সাহিত্যিক। ভূপতি বলে।

তুই শিল্পী।

তুই প্রেমিক।

তুই রজনীগন্ধা।

তুই...

ভূপতি হঠাৎ থামে। অনিমেষের পা নাচানো বন্ধ হয়। রজত দু'হাত শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে হাই তুলে বলে--টা-য়া-র্ড।

ওঃ। সুকুমার দূরের জানালা দিয়ে আকাশে তাকায়।

কথাটা হচ্ছে কাওয়ার্ডস ডাই মেনি টাইমস বিফোর--ভূপতি একটু থামে। তারপর উদাস গলায় বলে--দেয়ার ডেথ। অর্থাৎ বিবাহিত হওয়ার আগেই আমরা মনে মনে বহু বিবাহ করে থাকি। মনের হারেম কখনো শূন্য থাকে না, কবি। সেদিক দিয়ে আমরা কুলীন।

রজত খাটের তলা থেকে একটা গ্যাটাপার্চারের কালো অ্যাশট্রে বের করে সিগারেট ফেলে বলে--স্বাধীন ব্যক্তিরা কখনো অ্যাশট্রেতে সিগারেট ফেলে না এখন অভ্যেস করতে হচ্ছে। তার মানে--

ওঃ জমেছে। ভূপতি বলে। রজত বলল, তার মানে জমছে। আমি জমে যাচ্ছি।

সুকুমার অ্যাশট্রেটার জন্য হাত বাড়ায়।

কেমন জমছে বল। অনিমেষ কৃত্রিম সুরে বলে।

সুপার। রজত হাসল,--ও ছেলেবেলা থেকেই উত্তরপ্রদেশে। সে জন্যে কথায় একটু টান আছে, তাতে আবহাওয়াটা আরো মিষ্টি হয়।

যথা--? ভূপতি সুর টানে।

যেমন পড়ে গেল-কে বলে গিরে গেল, 'বাসন'-কে বলে 'বর্তন', তুমি দুষ্টু না-বলে বলে 'তুমি দুষ্টু হচ্ছ'।

অনিমেষ বুকে হাত চেপে চাপা চীৎকার করল,--উঃ তোকে চাক্কু মারছে।

রজত হাসে। সুকুমার মাথা উঠায় না। ভূপতি আর একটা সিগারেট ধরায়।

রজত সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, রেডি হয়ে নে। ডাকছি।

রজত ভেতরের দরজার কাছে গিয়ে পর্দাটা ছুঁয়ে ফিরে তাকাল। হেসে বলল, অন ইওর মার্ক। রেডি। সুকু, স্মাইল প্লিজ, একটু চোখ তুলে তাকিও, মেয়েদের দিকে না তাকানো মানে ইনসাল্ট। তারপর অনিমেষকে বলল,--ওল্ডম্যান, তুমি সব দেখবে জানি কিন্তু কথা শুনে হেসো না।

সুকু হইতে সাবধান। ভূপতি বলে।

রজত হাসল, আমি ওকে বলে রেখেছি যারা আসছে তাদের মধ্যে একজন সাহিত্যিক আছে। সেই শুনে ও ভয় পেয়েছিল। সাহিত্যিকরা নাকি ক্যামেরার চোখের মতন, ফাঁকি দেওয়া যায় না। সে জন্যেই মেয়েরা সাহিত্যিকদের ভয় পায়।

সুকু, তোমার কেস খারাপ। অনিমেষ মাথা নাড়ল।

বাঃ, তাতে মার কী? সুকুমার মাথা তুলে বলে, আমি সাহিত্যিক নই, বিলিতি কুকুরও না। কেউ যদি বানিয়ে বলে--

তুমি সাহিত্যিক নও? অনিমেষ প্রশ্ন করে।

আমি মনে করি না। সুকুমার ঝাঁঝালো গলায় বলে।

রজত দরজার কাছ থেকে বলে, তোরা কতক্ষণ চালাবি? আবহাওয়া অনুকূল না হলে আমি সাহস পাচ্ছি না। প্লিজ--

আমরা একযোগে সুকুমারকে ক্ষমা করছি। অনিমেষ হাসে। ওর মুখে রাগের চিহ্ন নেই।

সুকুমার বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে। ওর ঠোঁট দুটো সাদা আর অল্প কাঁপছে।

তুই রেগেছিস। অনিমেষ বলে। সুকুমার উত্তর দেয় না।

রজত পর্দা সরিয়ে ভেতরে যায়। পর্দার ওপাশ থেকে ওর গলা শোনা যায়, অন ইওর মার্ক, ফেলাজ। রেডি।

বিচিত্র রঙ্গমঞ্চ। ভূপতি উত্তর দিল।

একটা সিগারেট খা। অনিমেষ পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে সুকুমারের দিকে এগিয়ে দিল। সুকুমার সিগারেট নিয়ে হাসল, বলল, ধন্যবাদ। কিন্তু খাবো না, নট বিফোর লেডিজ।

বিচিত্র রঙ্গমঞ্চ। ভূপতি আবার বলল।

অনিমেষ সুকুমারের হাত থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা ফেরত নিয়ে বলল--ভূপতি, অস্ত্র সংবরণ কর। ওকে রাগিও না। এই সিচুয়েশনে ওর নার্ভ ফেল করলে কেলেঙ্কারি। কে শান্ত থাকতে দাও। শান্ত হয়ে ও কোনো সুন্দর মেয়েমানুষের কথা ভাবুক।

আঃ কি হচ্ছে! ভূপতি উঠে সোজা হয়ে পা নামিয়ে বলল। বলল, ইড আর আউট টু-ডে। বিনা মদেই মাতাল।

অনিমেষের মুখটা বোকা হয়ে গেল। ও সোজা হয়ে বসে পা নামালো, কী করব? উঠে দাঁড়িয়ে বাও করব না হাতজোড় করে--

ফুঃ ভূপতি বলে, তুমি বাও করবে, আমি কুর্নিশ, আর সুকু অর্ধেক উঠে এবং অর্ধেক ব'সে ঘরেও নহে পারেও নহে গোছের মুখ আর মিষ্টি হেসে বলবে ন-ম-স্কা-র।

ভূপতি চুপ করল। অনিমেষ একটু হাসল। সুকুমারের কথা বলল না। পাশাপাশি পা ঝুলিয়ে চুপ করে রইল।

ঘরের কোথাও ঘড়ি ছিল না। কিন্তু সুকুমারের মনে হল কানের কাছে অবিশ্রান্তভাবে প্রতিটি সেকেন্ড টিপ টিপ করে কলের জলের মতো বয়ে যাচ্ছে। নিজের হাতঘড়িটা কানের কাছে তুলে খুব ক্ষীণ শব্দ শুনল। ভাবল প্রতিটি সেকেণ্ডই প্রয়োজনীয় নয়। কয়েকটি সেকেন্ড মূল্যবান কখনো কিছু ঘটলে। বাদবাকি সময় প্রতীক্ষাশূন্য, ঘটনাবিরল, অর্থহীন। এই ঘরে এমন কিছু নেই যাতে মনোযোগ দেওয়া যায়। তবে এই ঘরের ভেতরই খুব অস্পষ্ট মৃদু লয়ে কি যেন একটা বদলে যাচ্ছে কার যেন একটা রূপান্তর--

রজত ভেতরে যাওয়ার পর পাঁচ মিনিট হয়েছে। ভূপতির মনে হল রজত বহুক্ষণ গত। যেন চেষ্টা করলেও রজতের মুখটা মনে আসবে না। তবু সময় স্থির হয়ে আছে। অনড়, অচল, নিষ্ঠুর। কেউ এলেও কিছু না, কেউ গেলেও কিছু না। আসলে কিছুতেই কিছু না--

সাতটা সতেরোতে একটা ট্রেন তারপর সাড়ে আটটায়। ভাবল অনিমেষ। কব্জি উলটে ঘড়ি দেখল। এখন ছ'টা। পদ্মপাতায় পা ফেলে ফেলে আসবার মতো আস্তে আস্তে রজতের বউ আসবে। আস্তে কথা বলবে অনেকক্ষণ সময় নিয়ে। অনেকক্ষণ সময়ে চায়ের পেয়ালার চামচ নাড়বে আর নিজের হাতের নতুন সোনার চুড়ির শব্দ শুনবে ঠুন ঠুন। ঘড়ি দেখতে ভালো লাগে না। কেমন যেন মন-খারাপ হয়। তবু সাড়ে আটটায় একটা ট্রেন, তারপর কখন কে জানে--

রজতটা দেরি করছে। অনিমেষ বলে।

আমাদের শুধু শুধুই আসা। আসলে--ভূপতি থামে।

আঃ, আস্তে, পায়ের শব্দ--সুকুমার বলল।

পর্দা সরিয়ে রজত ঘরে ঢুকল--এই যে! ওঃ! অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি। তারপর রজত পেছন ফিরে দরজার দিকে তাকিয়ে অন্তরালবর্তী কাউকে বলল, বুলা, এরা আমার বন্ধু, এসো।

একটা মোমের আলোর মতো নরম হলুদ হাত নীল পর্দাটাকে সরিয়ে দিল। সোনার চুড়ির শব্দ হল ঠুং করে। চাবির শব্দ। প্রথমে ফুলের গন্ধের মতো একটা কোনো গন্ধ ঘরের বাতাসে ছড়িয়ে গেল। তারপর বুলা এসে দাঁড়াল ঘরের মাঝখানে। পরনে হলুদ শাড়ি হলুদ ব্লাউজ।

রজত বুলার দিকে তাকাল তারপর তিনজনের দিকে। তারপর আবার বুলার দিকে তাকাল। শেষ পর্যন্ত তিনজনের দিকে তাকিয়ে বোকার মতো হেসে বলল,--এই হচ্ছে বুলা। আমার--

অনিমেষ উঠে দাঁড়াতে গিয়ে আবার বসল। ওর পায়ের চটির শব্দ হল। হাতজোড় করে বলল--নমস্কার।

ভূপতি দেখল বুলা ওকে দেখছে না। বুলা কোনো দিকেই তাকিয়ে নেই। ভূপতি একটা হাত সেলামের ভঙ্গিতে মাথার কাছে তুলল তারপর কী ভেবে সেই হাতটা দিয়েই কপালটা চুলকোলো।

সুকুমার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করল। মুখে কিছু বলল না। বসল।

রজত নাটকীয় ভঙ্গিতে সামনের দিকে ঝুঁকে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল,--ইনি অনিমেষ সেন।

বুলা বলল,--নমস্কার।

ইনি সুকুমার চট্টোপাধ্যায়।

নমস্কার। বুলা বলল।

ইনি ভূপতি রায়চৌধুরী।

বুলা বলল,--নমস্কার।

আর আমি অধম শ্রী--

বুলা বলল--থাক--চিনি--

বুলা মিষ্টি হাসল। যেন ও সকলের চেয়ে আলাদা। বলল, ওর কাছে আপনাদের কথা শুনেছি। আপনাদের প্রায় চিনি।

বুলার গলায় এতটুকু জড়তা নেই, কথার টান পরিষ্কার, তবে ও 'র' কে 'ড়' উচ্চারণ করে সুকুমার লক্ষ করল। ওর গায়ের রং লালচে আভা মেশানো হলুদ। সম্ভবত ও হলুদ মেখে চান করে। হাতে মেহেদি পাতার অস্পষ্ট রং। আঙুল সুঠাম হাতের আঙুলের মতো সদৃশ--সম্ভবত কত্থক নাচের যে-কোনো মুদ্রা অনায়াসে আঙুলের ঢেউ তুলতে পারে--এমন লীলায়িত,--হাড়, বোঝা যায় না। ওর মুখ গোল, চোখ টানা, চোখের তারা একটু চঞ্চল কালো, সপ্রতিভ। কপাল ছোটো, মাথায় চুল টান করে বাঁধা। শাড়ির রং পুজোর সময়ে গ্রামে দেখা কোনো মেয়েকে মনে করিয়ে দেয়।

বুলা রজতের কাছ থেকে আলাদা হয়ে একটু দূরে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে। ওকে রজতের চেয়ে লম্বা বলে মনে হল ভূপতির। সম্ভবত আলাদা করে দেখেছে বলেই এমন মনে হল। পাশাপাশি দাঁড়ালে ও রজতের কান ছাড়িয়ে যাবে না। ওর দেহকে প্রায় লতার মতো বলা যায়--পেলব এবং ভারাক্রান্ত। মেয়েদের দেহের যে যে জায়গাগুলো উঁচু কিংবা নীচু বা সমতল হওয়া ভালো--ওর দেহও ঠিক তেমনভাবেই ভালো। পাতলা শাড়ির আড়াল থেকে ওর পরিমিত স্তন কিংবা কোমর কিংবা বাহুমূলের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। ভূপতি মাথা নামিয়ে একটা অচেনা গন্ধ পেল। কোনো ফুলের।

পদ্মের পাপড়ির মতো পাতলা পায়ের পাতা মেঝের সঙ্গে মিশে আছে, আঙুরের মতো টুসটুসে ছোটো আঙুল যেন চুলের মতো সরু কাঠি দিয়ে পায়ের সঙ্গে লাগানো। পাতলা কোমল মাংস বিস্তৃত হয়ে আছে, যেন হাঁটলে শব্দ হবে না--মেঝেতে কান রাখলেও শোনা যাবে না কেউ হেঁটে যাচ্ছে। অনিমেষ ধবনি, কয়েকটা কথার অংশ একটু শব্দ তরঙ্গ

শুনেছিল। বুলার গলায় কোনো কৃত্রিম সুর নেই,--যেন ও কখনো অভিনয় করেনি। ওর দাঁত সুন্দর।

আমাদের সময় হয় না। নইলে পরিচয়টা আগেই সেরে নেওয়া যেতো। ভূপতি বলল।

বিয়ের সময়ে আপনাকে দেখেছি। কিন্তু--অনিমেষ কথা শেষ করল না!

বুলা হাসল, বলল, বিয়ের সময়ে ভারি জবরজং দেখায়। আমি এমনিতে অত শাড়ি গয়না পরি না। কেমন যেন চেনা যায় না--

সুকুমার একদৃষ্টে দেয়াল দেখছিল। ওর মুখটা কোনো অহঙ্কারি ছেলের মতো যাকে সম্প্রতি অপমান করা হয়েছে।

বউ আর কনেতে, অনেক তফাত। কোন ছদ্মবেশটা ভালো কে জানে! রজত জোরে নিশ্বাস ফেলে বলে।

আঃ হা--বুলা ঘুরে দাঁড়াতে গিয়ে গতি না থামিয়েই বলল।

তোমরা জাদুকরি। রজত হতাশ হয়ে বসে।

বুলা হাসল। তিনজনের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনারা একটু বসুন। আমি চা নিয়ে আসছি এক্ষুনি, দেরি হবে না--

বুলা দরজার কাছে গেল।

রজত ডাকল, শোনো। বুলা ফিরে তাকায়। রজত আঙুল দিয়ে সুকুমারকে দেখাল, আমার সাহিত্যিক বন্ধু। সুকুমার এবং লাজুক। তোমাকে বলেছিলাম--

ও! বুলা হাসল যেন এর আগে ও উত্তরপ্রদেশে কোনো সাহিত্যিককে দেখে নি। ভ্রূ কোঁচকালো যেন ও এর আগে সুকুমারের কথা শুনেছে কি না মনে করতে পারল না।

তুমি ওর সঙ্গে ভাব জমাও। হয়তো ও কোনোদিন তোমাকে নিয়ে একটু কিছু লিখবে নিদেন চার লাইনের কবিতা কিংবা রবিবারের গল্প--

সুকুমার প্রথমে হাসল, তারপর অন্য সবাই।

বুলা হাসতে হাসতেই পর্দার ওপাশে চলে গেল।

সুকুমার বলল, ইডিয়ট।

রজত হাসল, ও অত সিরিয়াস নয় তোর মতো। ঘাবড়াচ্ছিস কেন?

স্টুপিড। সুকুমার বলল।

আঃ ননসেন্স। কেমন লাগল বল। রজত হাসল। তারপর গম্ভীর হয়ে কোমরের ভাঁজ থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে তাকাল।

ইড আর এ লাকি ডগ। অনিমেষ হাত বাড়াল, কংগ্র্যাচুলেশনস।

থ্যাঙ্কস। রজত স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলে।

কংগ্র্যাচুলেশনস--ভূপতি অন্য কোনো কথা খুঁজে না পেয়ে বলে।

তোর--? রজত সুকুমারের দিকে তাকায়।

সুকুমার ঠোঁট চেপে হাসে। বলে, নির্জন দ্বীপে নির্বাসিতা করুণ কোনো মহিলার মতো। কোনো পুরুষের সাধ্য নেই তাকে স্পর্শ করে।

অ্যাঁ? মস্ত বড়ো হাঁ করল অনিমেষ।

দি বেস্ট কমপ্লিমেন্ট। থ্যাঙ্কস--রজত জোরে শ্বাস টেনে হাসতে হাসতে হাত বাড়াল,--ওকে বলব।

কবি, আমরা পরাভূত। ভূপতি বলে। তারপর হাসতে থাকে।

ইউ উইন দি রেস। অশোকবনে সীতার ইমেজ--ভাবা যায় না। অনিমেষ জোরে হাসে। সুকুমার মুখ নামায়।

তিন জনের হাসির শব্দ।

তারপর বুলা মাত্র একবার এই ঘরে এল। চা নিয়ে, সঙ্গে খাবারের প্লেট হাতে বাচ্চা চাকর। কয়েকটি মামুলি কথা, কিছু ওজর-আপত্তি। এবং তারপর একসময়ে ওরা তিনজনে

উঠে দাঁড়াল। ভূপতি হাচজোড় করে বলল,--আজ চলি বৌদি, আর কোনো সময়ে আবার দেখা হবে।

আজ গৃহিণীপনা দেখে গেলাম। আমরা অতিথিরা তুষ্ট। অনিমেষ কপালে হাত ছোঁয়াল।

সুকুমার হাতজোড় করে বলল, আমি সত্যিই লিখি না। ওরা বানিয়ে বলে--

তাতো বলেই। আমি আপনাকে বিশ্বাস করি। বুলা হাসতে হাসতে বলল, যেন কোনো বাচ্চা ছেলেকে ভোলাচ্ছে! ওর গলা চতুর শোনালো।

অনিমেষ রজতের দিকে তাকাল--দেখছো রজত। কপালে কত অপবাদ লেখা আছে।

রজত বেরোবে বলে ইতিমধ্যেই তৈরি হয়ে নিচ্ছিল। প্যান্টের শেষ বোতামটা আটকানো আছে কি না দেখে নিয়ে বলল, দেখছি। সুকুর দিন--

ওরা দরজার কাছে এগিয়ে একবার ঘাড় ফেরালো।

আবার আসবেন।

আসবো নিশ্চয়ই। বাঃ--

আসবো-সময় পেলে--

মনে থাকে যেন--

দেখবেন রজত তো দূরের কেউ না--

আচ্ছা, দেখব কেমন--

এরপর তাড়াতে চাইবেন কিন্তু--

ইস। দেখা যাক।

আজ যাই--

চলি--

দেখবেন, সিঁড়িটা যা অন্ধকার--

যেতে পারব--

সাবধানে যেও--

হুঁ--

চলি--

আচ্ছা--

চললাম--

আ-চ্ছা।

পর্দা সরানোর শব্দ। জুতোর শব্দ। সিঁড়িতে।

ওরা চারজন রাস্তায় এসে দাঁড়াল।

কোথায় যাওয়া যায়? রজত বলল।

কফি হাউস। সুকুমার খুব আস্তে বলল।

ওঃ--অনিমেষ ঠোঁট ওলটাল--সেই ছবি আঁকা, সেই কবিতা লেখা, সেই নতুন রীতির গল্প--

সেই কাফকা-কামু-জয়েস-মান-রিল্কে। ভূপতি বলে--

সেই বোদলেয়ার-এলুয়ার-লোরকা-পাউন্ড--

সেই গগ্যাঁ-গয়্যা-গঁগ-সেজাঁ-পিকাসো--

এবং রবীন্দ্রনাথ--

এবং সিগারেটের ধোঁয়া, কয়েকটি শুকনো ছেলে, কিছু বাসি মেয়ে--

হরিবল।

তবে কোথায় যাওয়া যায়? রজত আবার প্রশ্ন করল। সুকুমার দাঁত দিয়ে নোখ কাটতে কাটতে বলল--কফি হাউসে এখন ভীড় নেই।

দূর। ভূপতি বলে।

শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। একটু তাজা হওয়া দরকার। অনিমেষ বলে।

আমারও গলাটা খুশখুশ--কেমন ব্যথা। ক'দিন রাত জেগে,--রজত গলায় হাত দিয়ে বলল।

হুঁ, সন্ধেটা মাটি না করে--ভূপতি রজতের দিকে তাকাল তারপর সুকুমারের দিকে।

তবে যাওয়া যাক। সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ না এসপ্ল্যানেড--রজত বলে।

কিন্তু সুকু--ভূপতি প্রশ্ন করে!

তোমরা যাও। আমি ওর মধ্যে নেই। সুকুমার এক পা পিছু হটল।

পাগল, রজত হাত বাড়িয়ে সুকুমারের জামাটা ধরল, ছুকুও সঙ্গে যাবে। ও লাইম জুস খাবে--আমরা খাবো জিন উইথ ফ্রেস লাইম--কেমন জুঁইফুলের গন্ধ,--বিয়ার দিয়ে শুরু করলে কেমন হয়?

নট ব্যাড আইডিয়া--অনিমেষ বলল,--আমার ট্রেন সাড়ে আটটায়। বেশি খাবো না, বউ মুখে গন্ধটন্ধ পেলে--

বউ একটা আমরাও আছে, অত ঘাবড়ায় না--ভূপতি বলে।

সে সব কথা থাক, এখন কোথায় যাওয়া যায়? রজত সুকুমারের জামাটা ধরে থেকেই বলে।

যেটা কাছে হয়। তাড়াতাড়ি অনিমেষ বলে।

কিন্তু সুকু? ভূপতি বলে।

এবং সুকু? অনিমেষ বলে।

সুকু যাবে। রজত হাসল,--ওকে পাকানো দরকার।

পাকাতে হলে ওর বিয়ে দাও। মদ খেলে ছেলেরা পাকে না। ভূপতি বলে গম্ভীরভাবে।

হুঁ ওর বিয়ে দাও। ওর দরকার--অনিমেষ বলে।

হুঁ বয়স যাওয়ার আগেই বিয়ে দাও। ভূপতি বলে।

কেন না, অনিমেষ বলে, বৃদ্ধ বয়সে বিবাহে বিবিধ বাধা।

সকলে জোরে হাসল। তারপর চলতে লাগল। সুকুমারের একটা হাত রজতের হাতে, অন্যটা ধরল অনিমেষ। ভূপতি ওদের পেছনে।

ঘরের ভেতর ঘর। ছোট্ট পার্টিশান দেয়া। কাঠের দেওয়াল বার্নিশ না করা, পুরোনো রং! গোপন নির্জন। টেবিল ঘিরে চারটে চেয়ার। ঠিক চারটে চেয়ার, যেন কথা ছিল ওরা চারজনেই আসবে। বেশি না, কম না। যেন কথা দেওয়া ছিল যে আমরা আসব, সুকুমার ভাবল--চারজনের জন্য চারটে চেয়ার আর একটা ছোটো টেবিল, দাগ ধরা নোংরা সাদা টেবিলক্লথ যার ওপর আমার হাত এবং হাতের ওপর কখন মুখ রাখব--তারা অপেক্ষা করছিল। সব টেবিলকে ঘিরে চারটে চেয়ার থাকে না--চেয়ারের সংখ্যা কখনো বাড়ে কমে। কিন্তু সাধারণত চারটে চেয়ারই থাকে যেন কারো তিনজনের বেশি সঙ্গি থাকা ভাল নয়। যদি আসতে চাও তিনজনকে নিয়ে এসো, যে-কোনো তিনজন কিন্তু তিনজন। বেশি না, কম না।

চেয়ারের শব্দ হল। ওরা বসল। পর্দা সরিয়ে একজন বেয়ারার মুখ উঁকি দিল। ওর মুখটা কালো, নির্বিকার এবং বৈশিষ্ট্যহীন। একটু যান্ত্রিক হাসি ঠোঁটে।

জী সাব? বেয়ারা বলল।

দুটো বিয়ার--বেশ ঠাণ্ডা দেখে। চারটে গ্লাস রজত বলে।

আউর? বেয়ারা প্রশ্ন করে। রজত বিয়ারের নাম বলল!

পরে আরো বলছি। রজত বসে। বেয়ারা চলে গেল। পর্দাটা আবার নিভাঁজ!

চারদিকে পার্টিশানের ওপাশে বিচিত্র শব্দ হচ্ছে। কখনো হাসির টুকরো, কথার বা কাচের শব্দ। এ ঘরটা নিঃশব্দ। ভূপতি রুমাল বের করে মুখ মুছল। অনিমেষ টেবিলের ওপর আঙুল দিয়ে বাজাল, সুকুমারের হাত ওর কোলে, রজত চুপচাপ মেনুটার দিকে চোখ রাখে।

আমি কিন্তু খাব না। সুকুমার বলে।

ওঃ, ওকটু--প্লিজ, আমার বউ-এর স্বাস্থ্য পান করব--রজত হাসল।

তোর ভাবনা কী,--অনিমেষ বলল সুকুমারকে, তুই তো মেস-এ থাকিস। কাউকে কৈফিয়ত দিতে হবে না।

আর তোর তো নতুন কিংবা পুরনো কোনো বউ নেই,--ভূপতি বলে, তোর চিন্তা কী?

কিন্তু,--সুকুমারকে চিন্তিত দেখায়, লজ্জা কিংবা ভয় করছে। কেমন অপরাধবোধ--

কেন? রজত প্রশ্ন করে।

বেয়ারাটার মুখটা আমার চেনা-চেনা। ঠিক আমার জ্যাঠামশাইয়ের মতো মুখ কেমন যেন লাগে। অস্বস্তি--

ভূপতি আর অনিমেষ শব্দ করে হাসে। অনিমেষ হাসি চাপতে কুঁকড়ে যায়। রজত স্থির থাকে।

এ রকম হয়, রজত বলে--ওটা কোনো পাপ নয়।

আঃ জ্যাঠামশাই--ভূপতি বলে!

দ্যাটস এ প্রবলেম--অনিমেষ হাসে।

আঃ, জ্যাঠামশাই মদ সার্ভ করছে,--এ সুপারফিসিয়াল ইমেজ। ভূপতি চোখ বন্ধ করে বলল।

বেয়ারা ঘরে ঢুকল। চারটে গ্লাস রেখে বিয়ার ভাগ করে দিল। দুটো প্লেটে চাকচাক করে কাটা শসা, পেঁয়াজ আস্ত পাঁপড় ভাজা।

খুব ফেনা--সুকুমার বলে।

বেশ ঠাণ্ডা। খা--রজত বলে।

আঃ--চুমুক দিয়ে অনিমেষ বলে।

এই সময়ে সুকুর একটা কবিতা শুনলে বেশ লাগত। ভূপতি সিগারেট ধরিয়ে বলে।

বেশ, তাই হোক,--রজত হাসে।

জমবে। হুঁ--অনিমেষ ঠোঁটের কাছে গ্লাশ তোলে।

দুর--সুকুমার বিয়ারের রঙটার দিকে চোখ রাখে।

প্লিজ, ...ভূপতি বলে, তোর সেই কবিতাটা--

কোনটা?

যেটা রজতের বউকে শোনাবি বলে লিখেছিলি। তোর পকেটে ছিল তুই লজ্জা পাবি বলে আমি চেপে গেছি। ভূপতি আন্তরিকভাবে চাপা সুরে বলে।

ওঃ! অনিমেষ বলে।

বোঝা গেল রজত হাসল, বেশ এবার পড়ো, পড়তেই হবে।

সুকুমার ভূপতি পাশাপাশি! মুখোমুখি রজত অনিমেষ দাঁড়িয়ে উঠে সুকুমারের পকেটের দিকে হাত বাড়িয়ে বলে, বের করো।

সুকুমার চেয়ারসুদ্ধু পেছনে হেলল,--যা এটা কবিতা পড়ার জায়গা নয়, কে কখন উঁকি মারবে।

বয়ে গেল--রজত ঠোঁট ওলটায়।

পড়তেই হবে,--অনিমেষ বলে, আমাদের দাবি--

মানতে হবে,--ভূপতি হাসল। হেসে সুকুমারের কাঁধে হাত রাখল।

পকেট থেকে নিঃশব্দে একটা ভাঁজ কাগজ বের করল সুকুমার। ভাঁজ খুলে তিনজনের দিকে তাকাল। হাসল।

না, বসে বসে চলবে না,--অনিমেষ বলে,--উঠে দাঁড়াও।

যাঃ এটা নাটক করবার জায়গা নয় সুকুমার বলল।

আঃ এটা পরেশনাথের মন্দিরও নয়। মদের দোকানের লোকেরা ন্যাংটো মেয়ের নাচও দেখে। অনিমেষ বলে।

লজ্জা কি? দাঁড়া না--রজত হাই তোলে।

দাঁড়া। কিছু হবে না--ভূপতি হাসে।

সুকুমার উঠে দাঁড়ায়।

অ্যাটেনশন প্লিজ। সুকু, জ্যাঠামশাই উঁকি মারলে ঘাবড়ে যেওনা ,--অনিমেষ বলল।

সুকুমারের মুখটা সম্পূর্ণ লাল। ও তিনজনের দিকে তাকায়। অল্প আলোয় তিনজনের মুখ ঝাপসা-ঝাপসা ওয়াশ-এর ছবির মতন। সুকুমার একটু কেশে বলল--কবিতার নাম 'বন্ধুরা প্রবীণ হলে'।

তিনজন টেবিলের ওপর ঝুঁকল।

সুকুমার পড়ল,--বন্ধুরা প্রবীণ হল,

বন্ধুপত্নী হল চৌকিদার,

সাতটায় বাড়ি ফিরে চলো,

না হলে ঘরের বন্ধ দ্বার।

অনিমেষ টেবিলে হাত চাপড়ে বলল,--ই-উ-নিক।

ওকে পড়তে দে--ভূপতি সিগারেটে টান দেয়। রজত চুপ।

সুকুমার পড়ল,--এতদিন কাফে রেস্তরাঁয়।

ভ্রমর করিত গুঞ্জন--

যে স্বর্গ-স্বপ্ন-সুষমায়...

অনিমেষ অস্ফুট করে বলল--যে স্বর্গ-স্বপ্ন-সুষমায়।

রজত চোখ বুজে হেলান দিয়ে হাসল--চমৎকার! সে স্বর্গ-স্বপ্ন-সুষমায়। আবার পড়, কবি।

সুকুমার পড়ল,--যে স্বর্গ-স্বপ্ন-সুষমায়--

সে স্বর্গ এখন গৃহকোণ!

যে স্বর্গ-স্বপ্ন সুষমায়... এখন গৃহকোণ অনিমেষ আবৃত্তি করে হাসতে হাসতে বলল--তুলনা নেই--

আস্তে। রজত বলে পড়তে দাও।

সুকুমার হাতের কাগজ থেকে চোখ ওঠাল। পর্দা সরিয়ে বেয়ারা উঁকি দিল। বলল, আউর কুছ, সাব?

ওঃ, রজত সোজা হয়ে বসে বলল, চারটে ড্রাই জিন আর ফ্রেশ লাইম।

বেয়ারা চলে গেল।

--পড়। ভুপতি বলে।

সুকুমার পড়ল--

বালিশের ওয়াড়ে নাম লিখে।

বন্ধুপত্নী অবসর পেলে,

বন্ধুর পুঁজির নিরিখে

অসামান্য প্রেম দেন ঢেলে।

আঃ, তুমি একজন পেসিমিস্ট কবি। অনিমেষ চোখ বুজে বলে।

পড়তে দাও। রজত বলে।

সুকুমার পড়ল,--বন্ধু তাতেই খুশি হয়ে

দুই হাতে পেয়ে যান চাঁদ।

কবি, ইউ আর ক্রু□য়েল। দাউ স্ট্রিকেথ এ ড্যাগার ইন মি--

আঃ ক্লান্ত কোরোনা--ভূপতি বলে।

তারপর? রজত প্রশ্ন করে।

সুকমার পড়ল, বন্ধুরা প্রবীণ ঘুঘু সব,

বন্ধুপত্নী ঘুঘুধরা ফাঁদ।

সুকুমার প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে বসল। ওর মুখটা লাল।

কংগ্র্যাচুলেশসন--অনিমেষ সুকুমারের দিকে হাত বাড়ায়। সুকুমার একহাত দিয়ে ওর হাত ধরল, অন্য হাতে বিয়ারের গ্লাসটা তুলে নিঃশেষ করল।

হুঁ--রজত তেমনি চোখ বুজে হেলান দিয়ে বলে--তোর আর একটা কবিতার লাইন মনে পড়ছে। 'চরিত্রগুণ মানিব্যাগে থাকে, জীবনটা অতি বাহ্য। মাথার খোঁপাটি খোঁপার মালাটি সবই তো চিতায় দাহ্য।' রজত একটু হাসে।

এ হ্যান্ডসাম পোয়েট। ভূপতি বলে।

ওঃ--অনিমেষ বলে।

কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না। ভূপতি রজতের দিকে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করল,--তুমি সুকুমারের কবিতার স্টেটমেন্ট বিশ্বাস কর? তোমার মুখ থেকে শোনা যাক--যেটা সত্যি কথা--যা রিয়্যাল--

ওয়েল--রজত হাসল।

না, বল। ইউ হ্যাভ টু সে--ভূপতি উত্তেজিতভাবে বলল।

বেয়ারা পর্দা সরিয়ে এল। করিডোরের উজ্জ্বল আলোর একটু আভাস ঘরে ঢুকল। চারটে গ্লাস সাজিয়ে রেখে বেয়ারা বেরিয়ে গেল। চারটে গ্লাস, প্লেটের ওপর কাটা লেবুর টুকরো, চামচ, জুঁই ফুলের গন্ধ।

তুমি আনরিয়্যাল--ভূপতি সুকুমারকে বলল।

একটু আগে দাঁড়িয়ে কবিতা পড়ার জন্য সুকুমার লজ্জিত ছিল। এখন মুখ তুলল--বলল, রিয়্যালিটি অনেকটা নগ্নতার মতো অশ্লীল। আমি ইমাজিনেশন দিয়ে তাকে এড়িয়ে যাই--

কত আর পালাবে? ভূপতি প্রশ্ন করে।

হুঁ, মনের দিক দিয়ে তোমার ন্যাংটো হওয়া দরকার। অনিমেষ বলে!

কমপ্লিটলি নেকেড। ভূপতি রজতের দিকে তাকায়।

বেশ,--সুকুমার বলে, রজতকে বলতে দাও।

রজত জোরে হাসল, নেভার বিন ইন সাচ এ জ্যাম বিফোর।

--অর্থাৎ? অনিমেষ প্রশ্ন করে।

আমি অত ভাবি না--রজত সিগারেট ধরিয়ে বলে। ওর কথা অল্প এড়িয়ে যাচ্ছে।

সুকু কবিতা লিখে আমাদের--অর্থাৎ আমরা যারা বিবাহোত্তর জীবনে প্রেম-বিবর্জিত এবং যারা অসামান্য প্রেমের জন্য উদ্বাহু বামন এবং যারা কোনো মহিলার, এটুকু বলে অনিমেষ হিহি করে হাসল যেন ওর ইতিমধ্যেই নেশা হয়েছে, তারপর সামনে ঝুঁকে চাপা স্বরে বলল, যারা কোনো মহিলার নগ্নতায় অভিজ্ঞ, তাদের গাল দিয়েছে। নাউ প্লিজ ডিফেন্ড। বস্তুত ও খোঁপা, খোঁপার মালা এবং চিতার সংযোগে কি বোঝাতে চায় জানি না।

আমি নিজের অভিজ্ঞতাকে জানি,--রজত অস্বাভাবিকভাবে হেসে বলল, সেটা কিছুটা রিয়্যাল কিছুটা আনরিয়্যাল। যদি শুনতে চাও--

অফকোর্স শুনব। বল--ভূপতি গ্লাস তুলে চুমুক দেয়।

বলব, তোমাদের কাছে বলব--রজত মাতালের মতো হাসল,--ওল্ডম্যান, ছেলেবেলা থেকেই আমার নগ্নতার সাধ। যা অনেকের কাছে বলা যায় না, ভেবেছিলাম তা বুলার কাছে বলা যায় না। যা বলতে চাই তাই সাজিয়ে বলা হয়ে যায়--

ওটাই স্বাভাবিক,--, সুকুমার ভীত গলায় বলল গ্লাসের দিকে তাকিয়ে,--কিন্তু আমি আর শুনতে চাই না, আমরা মূল প্রসঙ্গ থেকে দূরে--

আঃ,--অনিমেষ প্রায় ধমক দিল,--রজতকে বলতে দাও।

রজতকে বলতে দাও,--ভূপতি মাথা নাড়ল, আমরা ওল্ড ফসিল। ওর নিউ ব্লাড।

রজত শুরু করল। প্রথমে আড়ষ্ট। আস্তে আস্তে বলল... হুঁ, তারপর মনে হল আমি একজন ভিলেন। তদুপরি অন্ধকার আমাকে সাহস দিচ্ছিল। কিন্তু ওর চোখ দুটো আধ-বোজা চোখ দুটো বাতি জ্বেলে দেখতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু লজ্জা--সেটা প্রথম দিন। তোমরা জানো...কী গভীর ঘন শ্বাস যেন স্পর্শ করা যায়...

আঃ, প্লিজ প্লিজ--সুকুমার হাত বাড়িয়ে রজতকে ছুঁল।

রজত হাসল। তারপর গ্লাসে চুমুক দিয়ে ভাবল আড়ষ্টতা কেটে যাচ্ছে। গ্লাসটা নিঃশেষ করে রজত বুলার দেহের কয়েকটি বিচিত্র কারুকার্যের উপমা দিল।

রজত? সুকুমার বলল। রজত ওর হাত সরিয়ে দেয়।

আমাকে ন্যাংটো হতে দাও--রজত হাসল।

ওরা ভেবেছিল রজত থামবে। ভূপতি আর অনিমেষ বোকার মতো হাসল।

রজত বেছে বেছে কয়েকটি অশ্লীল শব্দ জিভে তুলে আনল। রজত বলতে লাগল এমনভাবে যেন বুলা ওর কেউ নয়।

সুকুমারের দুটো কান ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক শুনতে পেল। ওর চোখের সামনে বুলার ছবিটাকে যেন দু'হাতে নাড়া দিল রজত। সুকুমার ভাবল ওর যেন নেশা হয়েছে। রজত থামল না--

সুকুমার উত্তেজিত হয়ে বলল,--প্লিজ--প্লিজ, আমাকে একা হতে দাও, অনি--ভূপতি--প্লিজ--

ইউ মাস্ট স্টপ। অনিমেষকে কেমন গভীর দেখাল।

--ইউ আর আউট--আউট টু-ডে। ভূপতি চেয়ারের শব্দ করে উঠে দাঁড়িয়ে রজতের কাঁধে হাত রাখে, বি সিরিয়াস, আমরা--

রজত হাসল,--আঃ--

না, আর নয়--অনিমেষ বলল,--আর শুনতে চাইনা।

বেয়ারা উঁকি দিল। বলল--সা'ব?

ড্রিঙ্কস,--রজত হাসল, চারটে হুইস্কি কিংবা রাম--

বেয়ারা মাথা নাড়াল,--দশটার পর ড্রিঙ্কস বন্ধ--

ওঃ--রজত মার-খাওয়া বোকা ছেলের মতো অসহায়ভাবে তাকাল।

কিছু চাই না,--সুকুমার বেয়ারাটাকে--যার মুখ ওর জ্যাঠামশাইয়ের মতো, তাকে বলল।

বেয়ারা পর্দা নামালো, চলে গেল।

আমরা এবার যাবো,--অনিমেষের মুখ চিন্তিত দেখায় যেন কোনো আকস্মিক আঘাতে নেশা কেটে যাওয়ার পর ও এখন ট্রেনের কথা ভাবছে!

তার মানে--তা'হলে,--রজত সম্পূর্ণ মাতালের মতো হেসে বলল। তারপর উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল।

তা হলে? ভূপতি প্রশ্ন করে।

রজত উঠে দাঁড়িয়ে এমন বোকার মতো হাসল যে মনে হল তাকে কেউ অন্যায়ভাবে অপমান করেছে। হাসিটা মুখে রেখে বলল,--তাহলে স্বীকার করতে হবে সুকুমারের কবিতাটা মন্দ হয়নি, আর--

সুকুমার আর অনিমেষ উঠে দাঁড়িয়ে কী করতে হবে ভেবে না পেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

রজত আবার বোকার মতো হাসল, সোজা হয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করে টাল খেতে খেতে বলল, আর তার মানে, আমাদের কারুর নিষ্পাপ নগ্ন মন নেই। নিষ্পাপ এবং নগ্ন--নেই--নেই--

বলতে বলতে ও দাঁড়াবার জন্য টেবিলের ওপর হাতের ভর দিয়ে ভারসাম্য রাখতে চেষ্টা করে আবার বসে পড়ল। বলল, তা হলে সুকুমারের কবিতাটা মন্দ হয়নি--। ও ক্লান্তভাবে হেলান দিল। ওরা তিনজন দাঁড়িয়ে ওকে দেখতে থাকে যেন ওরা খুব অবাক হয়েছে।

রজতের মনে হল, কেউ ধরে না নিয়ে গেলে ওর পক্ষে বাড়ি যাওয়া অসম্ভব।

এক দুই

আচ্ছা, আপনার কী মনে হয় ভগবান আসলে দু-জন আছেন?

কেন বলুন তো!

আমার ইদানীং কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে ভগবান আসলে দু-জন আছেন। একজন বড়োলোকের ভগবান, আর একজন গরিবের ভগবান। আরও কি মনে হয় জানেন, গরিবের ভগবানও বেশ গরিব।

এরকম মনে হওয়ার তো একটা কারণ থাকবে, নাকি?

না, সে রকম লজিক্যাল কারণ কিছু নেই। মনে হল, তাই বললাম। এই গতকালকের কথাই ধরুন। মাসের শেষ বলে পুঁইচচ্চড়ি আর ডাল হয়েছে। তা খেতে বসে মনে হল, একটু লেবু আর লঙ্কা হলে বেশ হত। তাই ভগবানকে খুব কষে ডাকতে লাগলাম। কারণ, ঘরে লেবু বা লঙ্কা কোনোটাই ছিল না। তা ডাকতে ডাকতে যখন আর্ধেক ভাত সাবাড় করে ফেলেছি ঠিক সেই সময়ে আমাদের পাশের ঘোষবাড়ির বউটি কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা এনে বলল, তাদের গাছে সূর্যমুখী লঙ্কা হয়েছে, তার শাশুড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে। ওই লঙ্কার জোরে বাকি ভাতটা খেয়ে উঠলাম। লক্ষ করবেন ভগবান অর্ধেকটা দিলেন, কিন্তু বাকি অর্ধেক দিলেন না।

আপনার কী ধারণা বড়লোকের ভগবান বেশি সার্ভিস দেন?

সেরকমই মনে হয়। নব চাটুজ্যের কথাই ধরুন না। বিশাল কারবার। নিউ আলিপুরে প্যালেসের মতো বাড়ি, গ্যারেজে খানচারেক গাড়ি। টাকায় লুটোপুটি খাচ্ছেন। তা এই তো সেদিন কোন কনজিউমার প্রোডাক্টের স্লোগান প্রতিযোগিতায় হেলাফেলায় একটা স্লোগান লিখে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। মাস দেড়েক বাদে সেই কোম্পানির লোক একখানা ঝকঝকে

মার্সিডিজ বেঞ্চ গাড়ি নিয়ে এসে হাজির। উনি স্লোগান কমপিটিশনে ফার্স্ট হয়ে প্রাইজ পেয়েছেন। শুনলাম সেটার দাম নাকি সতেরো লাখ টাকা। ভগবান যদি একজন হতেন তাহলে এরকমটা হতে পারত কি?

খুবই শক্ত প্রশ্ন। ভগবান সম্পর্কে আমি প্রায় কিছুই জানি না।

আরে সে তো আমিও জানি না। আপনার কি ধারণা আমি ভগবান বিষয়ে বিশেষজ্ঞ? শাস্ত্রটাস্ত্র, বেদ-বেদান্ত, পুরাণ-উপনিষদ, গীতাটিতা আমি কিচ্ছু পড়িনি। তবে ভগবান মানি খুব।

আপনি দু-জন ভগবানের কথা বললেন। কিন্তু হিন্দুদের তো শুনি তেত্রিশ কোটি দেব-দেবী

আহা, ওসব হচ্ছে একজনেরই নানা রকম প্রতীক, বুঝলেন না? কখনো ঘেঁটু, কখনো শীতলা, কখনো শিব, কখনো বিষ্ণু। খুব কমপ্লিকেটেড ব্যাপার। তাই আমি ধর্মের মধ্যে বিশেষ মাথা গলাই না। তবে মন্দিরটন্দির দেখলে একটা নমো ঠুকে যাই।

আপনার আন্তরিকতা বেশ সহজ সরল, তাই না?

যা বলেছেন। জটিলতা ব্যাপারটা আমার সহ্য হয় না। আমি শুধু জানি, ওপরে একজন কেউ আছেন। আজকাল মাঝে মাঝে মনে হয়, একজনের জায়গায় দু-জনও হতে পারেন।

ওপর বলতে আপনি ঠিক কোন জায়গাটা মিন করছেন?

কেন, ওপর বলতে ওপরটাই মিন করছি।

যদি আকাশ মিন করে থাকেন তাহলে আপনার জানা উচিত যে আকাশ হল মহাশূন্য। আর মহাশূন্যে ওপর-নীচ, পূর্ব-পশ্চিম কিছু নেই। মহাশূন্য সম্পূর্ণ দিগ্বিদিকশূন্য।

আহা, আবার আপনি জট পাকিয়ে তুললেন। আমি তো অত ভেবেটেবে বলিনি। লোকে যা বলে তাই বললাম। সামওয়ান ইজ আপ দেয়ার।

তাহলে অবশ্য কথা নেই। বেশি জানতে গেলে অনেক সময়ে বিশ্বাসটাই ভেঙে যায়।

হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক তাই। আমাদের মহাশূন্য নিয়ে মাথা ঘামানোর কী দরকার মশাই, আমরা তো আর মহাশূন্যে মর্নিংওয়াক করতে যাচ্ছি না। আমরা যেমন ওপর আর নীচ দেখছি সেরকমটাই তো ভালো।

যার কাছে যেমন। না জানারও নিশ্চয়ই কিছু উপকারিতা আছে।

ঠিক বলেছেন। বেশি জানতে গেলে নানা রকম ভজঘট্ট বাঁধে। এই ধরুন, বউকে নিয়ে দিব্যি সুখে-দুঃখে সংসার করছেন, হঠাৎ যদি জানতে পারেন, বিয়ের আগে বউয়ের একটা কেলেঙ্কারি বা অ্যাফেয়ার ছিল তাহলে কি সংসারটা তেতো হয়ে যাবে না?

খুবই ঠিক। আপনি কি সংসারী মানুষ?

বিয়ের কথা বলছেন? না ও ব্যাপারটা আর হয়ে উঠল না। তার জন্য দায়ী হল অর্থনৈতিক অবস্থা। আমি একজন ব্যবসায়ীর কর্মচারী। বুঝতেই পারছেন, এসব কোম্পানি কর্মচারীদের কীভাবেই ট্রিট করে। উদয়াস্ত খেটে চার হাজার টাকা হাতে পাই। ঘাড়ে বুড়ো বাবা-মা, একটা বোন, পড়ুয়া ভাই। বাড়িওলা জল বন্ধ করে দিয়েছে, গুণ্ডা লাগাবে বলে শাসাচ্ছে। একেবারে যাচ্ছেতাই অবস্থায় বত্রিশ বছর বয়সেই যেন বার্ধক্য এসে গেছে। বিয়ের শখও নেই। মেয়েদের দেখলে আজকাল ভারি জড়সড় হয়ে পড়ি, হীনম্মন্যতায় ভুগি।

অর্থনৈতিক অবস্থা কবেই বা ভালো বলুন। দেশজোড়া দারিদ্র্য। তাতেও তো বিয়ে হচ্ছে, সন্তান জন্মাচ্ছে।

ওসব দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজ। আমি বিয়েপাগল নই। এই বেশ আছি। দারিদ্র্য থাকলেও তাতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। শখ-আহ্লাদ বলতে কিছু নেই। ভাতের পাতে একটা দুটো ব্যঞ্জন হলেই হল। মা-বাবা, ভাই-বোনেরা সবাই আমার প্রতি সিমপ্যাথেটিক। কিন্তু বউ এলেই যে আমার নানা অযোগ্যতা, অকর্মণ্যতা, ডিসকোয়ালিফিকেশনগুলো দেখতে পাবে এবং আমাকে গঞ্জনা দেবে।

বিয়ের ওসব সাইড এফেক্ট তো আছেই। ওসব জেনেশুনেই লোকে বিয়ে করছে তো!

যে করছে সে করুক। আমি ওর মধ্যে নেই।

আচ্ছা, এই যে আপনি বললেন, বউ এলে যে আপনার অযোগ্যতা, অকর্মণ্যতা, ডিসকোয়ালিফিকেশনগুলো দেখতে পাবে, তার মানে কি? আপনার ডিসকোয়ালিফিকেশনগুলো কি বউ ছাড়া আর কেউ দেখতে পাচ্ছে না?

পাচ্ছে বইকি, কিন্তু তার জন্য তারা আমার ওপর চড়াও হচ্ছে না, হামলা করছে না। বউ পরের বাড়ির মেয়ে, তার স্বার্থ আমার ওপর নির্ভরশীল, সে ছাড়বে কেন? আমার এক বন্ধু তো বউয়ের গঞ্জনা শুনতে শুনতে ভ্যাবলা মতো হয়ে গিয়ে শেষে ঢাকুরিয়া স্টেশনের কাছে রেললাইনে গলা দিয়ে...ওঃ, সে কথা মনে করলেই ভয় হয় মশাই। আমার কী মনে হয় জানেন, দুর্বলচিত্ত মানুষদের বিয়ে না করাই উচিত। শরীরের প্রয়োজনে বরং প্রস কোয়ার্টারে যাক, বিয়ে করার রিস্ক না নেওয়াই ভালো।

দুর্বলচিত্ত মানুষের সংখ্যাই তো বেশি। সারা পৃথিবীর অ্যাসেসমেন্ট করলে দেখবেন, দুনিয়ার নাইনটি পারসেন্ট মানুষ দুর্বলচিত্ত।

তা হতে পারে। অন্যের খবরে আমার দরকার কি বলুন। আমি যে দুর্বলচিত্ত সেটাই আমার কাছে বেশি ইম্পর্ট্যান্ট।

ওঃ হ্যাঁ, আপনি তো আবার বেশি জানতে চান না।

দুর মশাই, জেনে হবেটা কী? জানলে যদি জ্বালা বাড়ে তাহলে লাভটা কী? ওই ভয়ে তো আমি খবরের কাগজও পড়ি না। কাগজ রাখার পয়সা নেই বটে, কিন্তু আমাদের ম্যানেজারের টেবিলে খবরের কাগজ থাকে। আমি কখনো তাকাইও না।

তার মানে কি পৃথিবী সম্পর্কে আপনার কোনো আগ্রহই নেই? রাজনীতি, খেলাধূলা, সিনেমা, যুদ্ধবিগ্রহ, আর্ট কালচার?

ছিল, ছিল। বছর দশ পনেরো আগেও ওসবে ইন্টারেস্ট ছিল। তারপর দেখলাম, দুনিয়াটা তার নিজের মতো চলেছে, আমি মাধ্যাকর্ষণের ফলে তার গায়ে ছারপোকার মতো সেঁটে আছি মাত্র। টিকে থাকা ছাড়া আমার কোনো ধর্ম নেই, কর্মও নেই। দুনিয়াকে জানার চেষ্টা করা বৃ-থা। সায়েন্টিস্টরা চেষ্টা করছে, দার্শনিকরা করছে, জ্ঞানী পণ্ডিতরা করছে। কিন্তু লাভ হচ্ছে অষ্টরম্ভা। দুনিয়াকে জানা ও বোঝা অত সহজ নয়। তাই আমি ওসব চেষ্টাই

করি না। সকাল নটায় বেরোই, হিসেব বুঝিয়ে বাড়ি ফিরতে রাত দশটা। হপ্তায় এই একদিন ছুটি।

ছুটির দিনে কী করেন?

সকালে বাজার, তারপর জামাকাপড় কাচা, দুপুরে একটু ঘুম। বিকেলে এই একটা দিন এসে এই পার্কটায় একটু বসে থাকি।

আর কোনো এন্টারটেনমেন্ট নেই আপনার? সিনেমা থিয়েটার?

দুরদুর, ওসব বানানো কৃত্রিম জিনিস দেখে মনেকে বিভ্রান্ত করার মানেই হয় না। গত দশ বছর আমি সিনেমা দেখিনি, বিশ্বাস করবেন?

করলাম। তা পার্কে বসে থাকাটাই এন্টারটেনমেন্ট আপনার?

বসে থাকি, আর ভাবি।

কী ভাবেন?

আমার ভাবনার কোনো মাথামুণ্ডু নেই। ব্রেন পাওয়ার কম তো, তাই চিন্তার জগতে কোনো শৃঙ্খলাও থাকে না। বসে বসে যা মাথায় আসে তাই ভাবি।

কোনও মহিলার কথা?

ওঃ, আপনি ওই একটা দিকেই আমাকে গোত করতে চান তো? তা মশাই, সত্যি কথা বলতে কি, এক-আধজন মহিলার কথাও যে মনে আসে না তা নয়।

কোনো বিশেষ মহিলার কথা কী?

তাও বলতে পারেন। আমি যতই অপদার্থ হই, আমারও যৌবন ডাকাডাকি করেছে এক সময়ে। তা ওই কাঁচা বয়সে কখনও সখনও এক আধজন মেয়েকে ভারি পছন্দও হয়েছিল।

তাহলে রোমান্স হয়েছিল?

রোমান্স কথাটা ভারি বাবু কথা। এত ভালো ব্যাপার কি আমাদের মতো অপদার্থের কপালে হয়? তখন কসবায় একটা খোলার ঘরে থাকতাম। এ চাকরিটা তখনও পাইনি।

বাবা ছিল প্রাইভেট বাসের কন্ডাকটর। অবস্থা অনুমান করে নিন। তা সেই সময়ে আমি কলেজে পড়ি। যাতায়াতের পথে একটা গোলাপি রঙের বাড়ির একতলার জানলায় একটা ফুটফুটে মেয়েকে প্রায়ই দেখতে পেতাম। কোঁকড়া চুল ছিল মাথায়, বেশ ফরসা, মুখখানা যেন নরুনে চেঁছে যত্নে বানানো। মেয়েটা ড্যাবড্যাব করে চেয়ে থাকত।

তার বয়স কত ছিল?

তেরো চোদ্দ হবে।

তারপর?

যাতায়াতের পথে রোজই চোখে পড়ত। একটু লাজুক ছিলাম বলে ওই একবার তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিতাম। তবে এইভাবে চলল, আর আমার ভিতরে নানা রকম কেমিক্যাল চেঞ্জ ঘটতে লাগল। প্রেমে পড়লে যা হয় আর কি।

আপনি কি বিজ্ঞানের ছাত্র?

কেন বলুন তো? কী করে বুঝলেন?

কেমিক্যাল চেঞ্জের কথা বললেন কিনা।

সায়েন্স পড়েছি বটে, কিন্তু তাতে কোনো সম্ভাবনা তৈরি হয়নি আমার জীবনে। পাসকোর্সে বি এস-সি পাস করেছিলাম। পয়সার অভাবে ফিজিক্সে অনার্স কন্টিনিউ করতে পারিনি।

অনার্স ছিল, তার মানে সম্ভাবনা তো ছিলই!

পয়সার অভাব আমাদের দেশে সব রকম মেধাকেই গলা টিপে মেরে দেয়, বুঝলেন?

হ্যাঁ। কথাটা খুবই সত্য। কিন্তু সেই মেয়েটার কথা শেষ করুন।

শেষ না করলেও হয়। তবে হ্যাঁ, তার প্রতি আমার দুর্বলতা জন্ম নিয়েছিল। আর আমার যাওয়া-আসার সময় সর্বদাই সে জানলায় থাকত, এটাও একটা পয়েন্ট, অর্থাৎ তারও আমার প্রতি আগ্রহ ছিল, তাই না?

তাই তো মনে হচ্ছে! পরিচয় হল কী করে?

পরিচয়ে বাধা ছিল। একে আমি লাজুক, গরিবের ছেলে, টিউশানি করে কলেজে পড়ি। আর ওই মেয়েটি বড়লোক না হলেও আমাদের চেয়ে অন্তত তিন চার ধাপ ওপরের সমাজের লোক। বামন হয়ে চাঁদে হাত বাড়ানোর মতো ব্যাপার। তবে মেয়েটি যে আমার জন্যই অপেক্ষা করত তাতে সন্দেহ ছিল না আমার। বেশ কিছুদিন চোখাচোখি খেলার পর সে আমাকে দেখে একটু হাসতও।

বটে!

হ্যাঁ মশাই। আমিও মনে মনে বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম। জীবনে ওটাই আমার প্রথম ও একমাত্র প্রেম কিনা।

বুঝেছি। বলুন।

বোধহয় মাস দুয়েক এরকম চলার পর একদিন হঠাৎ দেখলাম, জানালায় মেয়েটির পাশে একজন ফরসা বয়স্কা মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন। যত দূর মনে হল মেয়েটির মা।

এই রে!

হ্যাঁ, আমিও খুব চমকে গিয়েছিলাম, ভয়ও পেয়েছিলাম। মিতুর মাকে দেখে আমি সেদিন প্রায় ছুটে পালাই।

মেয়েটির নাম বুঝি মিতু?

হ্যাঁ।

তারপর?

দিন দুই বাদে একদিন কলেজ থেকে ফেরার সময় দেখি সেই ভদ্রমহিলা তাঁদের গ্রিলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে দেখে ডাকলেন, এই ছেলে, শোনো!

ও বাবা!

হ্যাঁ, আমি তো ভয়ে কুঁকড়ে গেলাম। উনি বললেন, ভয় পেও না, ভিতরে এসো। কথা আছে। আমি ভাবলাম, ভিতরে নিয়ে গিয়ে বোধহয় লোক ডেকে ধোলাই দেবেন। তবু

ভদ্রতার খাতিরে না গিয়েও পারলাম না। ভদ্রমহিলা আমাকে যত্ন করে বসালেন, পাখা ছেড়ে দিলেন। তারপর আমার বাড়ির খোঁজখবর নিতে লাগলেন।

বাঃ, এ তো গ্রিন সিগন্যাল।

হ্যাঁ। গ্রিন সিগন্যালই। আমিও অকপটে তাঁকে সব বলে দিলাম। উনিও দেখলাম, আমাদের সব খবরই রাখেন। বেশ কিছুক্ষণ নানা কথা বলার পর হঠাৎ বলে বসলেন, তুমি কি আমার মেয়েকে বিয়ে করতে চাও? আমি তো প্রস্তাব শুনে হাঁ। কী বলব ভেবেই পাচ্ছিলাম না। বুকের মধ্যে উথালপাথাল। উনি তখন খুব করুণ মুখ করে বললেন, বিয়ে করতে চাইলে আমাদের আপত্তি নেই। তোমার অবস্থা জেনেও বিয়ে দেব। তবে আমার মেয়ে কিন্তু পঙ্গু।

পঙ্গু? এঃ হেঃ, কীরকম পঙ্গু?

কোমরের তলা থেকে পা অবধি সমস্ত নীচের অংশটাই ছিল আনডেভেলপড। হাঁটাচলার ক্ষমতাই ছিল না মেয়েটার। তাই ওকে জানালার পাশে একটা চেয়ারে বসিয়ে রাখা হত। বসে বসে মিতু বাইরের জগৎ দেখত--যে জগতে যাওয়ার ক্ষমতাই ছিল না তার। কিন্তু কোমর থেকে মুখ পর্যন্ত সম্পূর্ণ স্বাভাবিক--যে কোনো মেয়েকে টেক্কা দেওয়ার মতো।

আপনি কি করলেন? পিছিয়ে গেলেন?

না। সে বয়সটা তো বিবেচনা বা স্থিরবুদ্ধির বয়স নয়। ভাবলাম, পঙ্গু তো কী হয়েছে। ওকে নিয়েই জীবন কাটিয়ে দেব। বাড়িতে এসে বললামও সে কথা। মায়ের তো মাথায় হাত। বাবা বাক্যহারা।

আর মিতু? তার মতামত নেননি?

সেখানেই তো গোল বাঁধল।

কীসের গোল?

কথা কইবার চেষ্টা করতে গিয়ে বুঝলাম, অমন সুন্দর মেয়েটাকে ভগবান অনেক দিক দিয়ে মেরে রেখেছেন। মিতুর বুদ্ধিটাও তেমন ডেভেলপ করেনি।

জড়বুদ্ধি নাকি?

অনেকটাই। স্পষ্ট কথা বলতে পারত না। ভ্যাবলা।

তবে তো ব্যাপারটা কেঁচে গেল!

হ্যাঁ। ওই যে আপনাকে দু'নম্বর ভগবানের কথা বলছিলাম, কেন বলছিলাম বুঝতে পারছেন তো! গরিবের ভগবান হয় নিজেই গরিব, নইলে হাড়কেপ্পন। লঙ্কা আর লেবু চাইলে লঙ্কাটা হয়তো দেন, লেবুটা টেনে রাখেন।

ভগবানের ওপর যখন আপনার এতই রাগ তখন তাকে ঝেড়ে ফেললেই তো হয়।

ভগবান আমাদের মতো কিছু লোকের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছেন। ঝেড়ে ফেললেই তিনি যাবেন কেন? আচ্ছা, আপনি কি নাস্তিক নাকি?

আস্তিক নাস্তিক কিছুই নই। ও নিয়ে কিছু ভাবিনি কখনো। দরকারও হয়নি।

তার মানে আপনার জীবনটা বেশ স্মুথ। কোনো সমস্যাই নেই. তাই না? হয়তো ভালো চাকরি করেন, মেলা টাকার মালিক, কলকাতায় নিজ বাটী, ঘাড়ে গন্ধমাদন কোনো দায়িত্ব নেই। ঠিক কি না!

তাই যদি হত তাহলে সন্ধেবেলা এসে একা একা এই নেড়া পার্কে বসে থাকতাম নাকি? এটাকে পার্ক বললে পার্ক কথাটারই অপমান হয়। দেখছেন গোটা মাঠটায় কেমন টাক-পড়া ভাব। গাছপালার নামগন্ধ নেই!

হ্যাঁ, পার্কটার কোনো সৌন্দর্য নেই বটে। তাছাড়া উত্তর দিকের ওই ভ্যাটটা থেকে খুব দুর্গন্ধও আসছে।

গত দশ দিনে ময়লা নেয়নি। কালও দেখেছি, মরা বেড়াল পড়ে আছে পাশে। গন্ধ তো হবেই । আর পার্কটার ওই কোণে আজ সকালেই দুটো ডেডবডি পাওয়া গেছে। একটা মেয়ে আর একটা ছেলের। দুজনেরই গলার নালি কাটা।

বলেন কী? কিছু টের পাইনি তো!

এই পার্কটা আজকাল অ্যান্টিসোশ্যালদের আড্ডা, তা জানেন তো! প্রকাশ্যেই মদ, গাঁজা, সেক্স, জুয়া সবই চলে। আজকাল ওদের ভয়ে কোনও ভদ্রলোক আর এ পার্কে আসে না। আজ দেখুন, পার্ক পুরো ফাঁকা। কেন জানেন? ডেডবড়ি পাওয়ার পর পুলিশ অ্যাকশন হয়েছে সারাদিন। এখনও পেট্রল চলছে। বদমাশরা ভেগেছে বলেই পার্কটা এত ফাঁকা।

তা বটে, পার্কে তো আসি সপ্তাহে একদিন। দেখি, কিছু ছেলে-ছোকরা অন্ধকারে কেমন সন্দেহজনক আচরণ করছে। তবে তাতে আমার আর কী বলুন। আমি একটু কোনার দিকে বেছে নিয়ে ঘাসে বসে থাকি চুপ করে। আমাকে কেউ গ্রাহ্য করে না। যারা খুন হল তারা কারা বলুন তো?

কে জানে! ড্রাগ পেডলার হতে পারে। চোরা চালানদার হলেই বা কি। মোট কথা, খুব ক্লিন লোক নয়। কম হলেও আপনার তবু একটা চার হাজার টাকা বেতনের চাকরি আছে। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থায় আপনার পজিশন কিন্তু বেশ ভালো। এই যারা খারাপ কাজটাজ করে বেড়ায় তাদের চার হাজার টাকার চাকরি জুটলে অনেকেই হয়তো খারাপ কাজ করত না। কী বলেন?

কে জানে মশাই, দেশ, সমাজ, বেকার সমস্যা এসব নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। ঘামিয়ে কিছু হয়ও না। আমি শুধু একবগ্গা আমার আয় আর ব্যয়ের ব্যাপারটা প্রাণপণে মেলানোর চেষ্টা করি। আমাদের আয়ের সঙ্গে আমাদের ব্যয়ের কোনোদিন বন্ধুত্ব হয় না, জানেন? সবসময়ে এই ব্যয় ব্যাটা এগিয়ে থাকে। দুটোয় কোনোদিন বনিবনা হল না।

আচ্ছা, সেটা তো দেশের লাখো লোকের সমস্যা। কিন্তু অবস্থাটা পালটে দিতে ইচ্ছে হয় না?

পালটে দেব? আমার কোন দায় বলুন তো! দেশে কোটি কোটি লোক থাকতে আমারই বা হঠাৎ দেশের অবস্থা পালটানোর ইচ্ছে হবে কেন? আপনার হয় নাকি?

হয়। খুব হয়। তবে পন্থাটা ভেবে পাই না।

ঝুটমুট ভেবে শরীরপাত করার দরকারটা কী? ওসব আমার আপনার কম্মো নয়। আমি তো ধরেই নিয়েছি যা করার ভগবানই করবেন।

আপনি কিন্তু হতাশাবাদী।

না মশাই, না। হতাশাবাদী হল আশাটাশা ছেড়ে দিয়েছে যে, আমার তো ওসব আশাটাশা ছিল না কিছু, আমি তো আপনাকে বলেইছি, আমি হলাম বাস কন্ডাক্টরের ছেলে। বাপ খেয়ে-না-খেয়ে ছেলেকে মানুষ করার জন্য বি এস-সি অবধি পড়িয়েছিল। মানুষ হওয়া অবশ্য হয়নি। কিন্তু তার জন্য আমার কোনো হা-হুতাসও নেই। যা আছি, যেটুকু পাচ্ছি তাই নিয়েই আমাকে থাকতে হবে। বিপ্লবটিপ্লব করার কথা কখনো ভাবিনি। আর বিপ্লবও তো আর এক রকমের নয়। নানা পার্টি নানা বিপ্লবের কথা বলে। তাতেই বুঝে গেছি, কারও এখনও মনস্থির হয়নি।

হাল ছেড়ে দিচ্ছেন?

সেটাই বুদ্ধিমানের কাজ। যদিও নিজেকে আমি মোটেই বুদ্ধিমান ভাবি না।

আপনার গল্পটা কিন্তু এখনও শেষ হয়নি।

কোন গল্পটা?

ওই যে মিতুর সঙ্গে আপনার প্রেমের গল্প।

প্রেমের গল্পের দু-রকম পরিণতি থাকে। হয় মিলনান্তক, নয় বিয়োগান্তক, তাই না?

হ্যাঁ, আপনারটা কীভাবে শেষ হল?

আমারটা ঠিক মিলন বা বিয়োগ কোনোটাই হল না। কেমন যেন নষ্ট দুধের মতো কেটে গেল, আমি নিজেকে তখন প্রশ্ন করেছিলাম, বাপু, প্রেমেই যদি পড়ে থাকো, তাহলে সেই প্রেমের এমন জোর নেই যে মেয়েটার শরীর আর মনের খামতিগুলো উপেক্ষা করতে পার? এ আবার কেমন প্রেম? কিন্তু কি জানেন, ভিতর থেকে কোনো সাড়াই এল না। আর সেই যে প্রেম কেঁচে গেল আর কখনো পেকে উঠল না।

মিতুর কোনো খবর রাখেন না?

না, খবর রেখে হবেটাই বা কি বলুন। ও পাড়া ছেড়ে চলে আসার পর আর সম্পর্কও নেই। তবে মাঝে মাঝে একটু-আধটু মনে পড়ে আর কি। আচ্ছা আপনি কি এ পাড়ার

বাসিন্দা?

তা বলতে পারেন। কাছেপিঠেই আমার আস্তানা।

এই পার্কে প্রায়ই আসেন বুঝি?

না, তবে যাতায়াতের পথে পার্কটা নজরে পড়ে। আজ পার্কটা ফাঁকা দেখে একটু বসবার লোভ হল।

বেশ করেছেন। আপনার সঙ্গে বেশ আলাপও হয়ে গেল আমার। আজকাল কারও সঙ্গেই যেচে আলাপটালাপ করা হয় না। মনে হয় চেনা-জানা বাড়িয়ে হবেটা কি?

মানুষের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় থাকাটা কি ভালো নয়?

আমার কী মনে হয় জানেন? মানুষ জীবনের বেশির ভাগ সময়টাই কাটিয়ে দেয় নানা রকম অর্থহীন, উদ্দেশ্যহীন কাজে। তার মধ্যে একটা হল এই লোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়। দেখা হলে দেঁতো হাসি হেসে কুশল প্রশ্ন বা খেজুর করা, ওতে কি লাভ বলুন, কিছুটা সময় ফালতু কাটানো ছাড়া আর কি?

আপনি বুঝি কম কথার মানুষ?

তা নয়। কেউ কথাটথা কইলে আমার বরং বেশ অহংকার হয়। ভাবি, লোকটা পাত্তা দিচ্ছে। আমিও তাকে খুশি করারই চেষ্টা করে থাকি। এসব আমি করি বটে, কিন্তু কাজটা যে অর্থহীন সেটাও ভুলতে পারি না।

চেনাজানা থাকলে দায়ে দফায় মানুষের সাহায্যও তো পাওয়া যায়।

হ্যাঁ, সেইরকম কিছু হয় বটে। কিন্তু চেনাজানাদের কাছ থেকে আমরা কখনো তেমন কোনো উপকার পাইনি। অবশ্য উলটোটাও সত্যি। আমরাও কারও তেমন কোনো উপকার করিনি। মানুষের উপকার করার জন্যও কিছু যোগ্যতার দরকার হয়। আমার সে যোগ্যতা নেই।

আপনি আপনার বাইরের জগৎটাকে নিয়ে ভাবেন না তো!

না। ওই যে বললাম, ভেবে সময় নষ্ট।

বই পড়েন?

পাগল! ওসব বাতিক আমার নেই।

চাকরিটা আপনার কেমন লাগে?

খারাপ কি? মালিকের বিল্ডিং মেটেরিয়ালের বিরাট ব্যবসা। সিমেন্ট, বালি, স্টোন চিপস, রড, চুন, ইট, সুরকি নিয়ে এলাহি ব্যাপার। রোজ পঞ্চাশ ষাট লরি বোঝাই হয়ে সাপ্লাই যাচ্ছে চারদিকে। যাকে বলে কর্মযজ্ঞ।

আপনার কাজটা কী?

সব কিছু নলেজে রাখা।

শুধু নলেজে রাখা? আর কিছু নয়?

ওটাই তো হাড়ভাঙা খাটুনি। সারাদিন গোটা পাঁচেক গোডাউনে চক্কর মেরে বেড়াতে হয়। কোন অর্ডারে কত মাল যাচ্ছে তার হিসেব রাখতে হয়। একশোটা কৈফিয়ত দিতে হয়।

আপনি কি ম্যানেজার?

অনেকটা সেরকমই শোনায় বটে। ম্যানেজারের ইজ্জত অবশ্য নেই, তবে খাটনি আর ঝুঁকিটা আছে।

মালিকের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক তাহলে ভালোই?

না, ভালো বললে ভুল হবে। তবে হুকুম তামিল করি বলে মালিকরা আমাকে নিয়ে ঝামেলা পোয়ায় না। আর তাই, আমাকে তারা লক্ষও করে না।

মানুষের ওপর নজর দেওয়ার ফুরসত তাদের কই? তাদের নজর তো আগম নির্গমের ওপর। কত মাল বেরোচ্ছে, কত টাকা ঢুকছে।

এতে আপনার বিদ্রোহ করতে ইচ্ছে হয় না?

বিদ্রোহ কীসের? মাসের শেষে যে চার হাজার টাকা দিচ্ছে! ওটাই তো জোঁকের মুখে নুন। আপনি কি পলিটিকস করেন?

না তো!

তবে কি ইউনিয়ন-টিউনিয়ন?

না না, ওসব নয়।

আমাদের কারবারে অবশ্য ইউনিয়ন নেই। কারও চাকরিই পাকা নয়, ইউনিয়ন করবে কোন সাহসে বলুন!

আপনার কি মনে হয় না একটা ইউনিয়ন থাকলে ভাল হত?

না, হয় না। ইউনিয়ন যেখানে আছে সেখানেই বা ভালোটা কী হচ্ছে বলুন?

ইউনিয়ন বেশি পেশি প্রদর্শন করলে মালিক লক আউট করে দিচ্ছে, না হয় তো কারখানা বা ব্যবসা তুলে নিয়ে যাচ্ছে।

তাহলে কি আপনি আত্মবিক্রয় করে দিয়ে বসে আছেন?

যথার্থ বলেছেন। আমরা কে না আত্মবিক্রয় করতে বসে আছি বলুন। মানুষ তো নিজেকে সবসময় আরও বেশি সেলেবল কমোডিটি করে তোলার জন্যই নানা ভাবে নিজেকে ঘষামাজা করছে তাই নয় কি?

অনেকটা তাই বটে।

সবটাই তাই। আমরা কে কতটা কার কাছে বিক্রয়যোগ্য বা ক্রয়যোগ্য সেটাই আসল কথা। দুঃখের বিষয় হল শাহরুখ খান চার কোটিতে বিকোয়, আমি চার হাজারে।

সেই দুঃখেই কি মাঝে মাঝে আপনার ভিতর থেকে একজন ঘাতক বেরিয়ে আসতে চায়?

না মশাই, না। ঘাতকটাতক আমার মধ্যে নেই। আমার মতো লোকেরা বড়ো জোর নিজেকে মারতে পারে। আত্মঘাতী একটা প্রবণতা আমার মধ্যে এক সময়ে ছিল। কিন্তু সেটাও আজকাল ঘুমিয়ে পড়েছে। আচ্ছা, আপনি তো আমার নামটাও জিজ্ঞেস করেননি।

অবশ্য নাম জেনে হবেটাই বা কি। রাম বা হরি, রমেশ বা যতীন যা হোক একটা হলেই হল। আমাদের তো আর নামের মহিমা নেই, কী বলেন?

আপনার নামটা আমি জানি।

বলেন নি মশাই? নাম জানেন! কী করে জানলেন?

পুলিশের রেকর্ডে আপনার নাম আছে।

হাঃ হাঃ, কী যে বলেন মশাই। পুলিশের রেকর্ডে আমার নাম! আমি কি জাতে উঠে গেলাম নাকি? হাঃ হাঃ! না মশাই, আপনি একটা মস্ত ভুল করে ফেলেছেন।

অন্য কারও সঙ্গে গুলিয়ে ফেলছেন আমায়।

সেটাও সম্ভব।

আজ্ঞে সেটাই ঘটনা। কিন্তু পুলিশের রেকর্ডের কথা আপনি কী করে জানলেন? আপনি কি পুলিশের লোক?

পেট চালানোর জন্য কিছু তো করতেই হবে। পুলিশের চাকরিটাই জুটেছিল কপালে।

ও বাবা, আমি তা হলে এতক্ষণ একজন জবরদস্ত পুলিশ অফিসারের সঙ্গে বসে খেজুর-আলাপ করে যাচ্ছিলাম! কী সৌভাগ্য! বলতে কি আপনিই আমার জীবনে প্রথম পুলিশ-বন্ধু। অবশ্য বন্ধু বললে যদি আপনি অপমান বোধ না করেন।

না, অপমান বোধ করব কেন?

আচ্ছা, পুলিশের রেকর্ডে আমার কী নাম আছে তা বলবেন?

মনোরঞ্জন রায়। সঞ্জীব সবরওয়াল--অর্থাৎ আপনার এমপ্লয়ার আপনাকে মনো বলে ডাকে।

ও বাবা! আপনি সবরওয়ালের নামও জানেন দেখছি! কী আশ্চর্য! আপনার ইনফর্মেশন তো একেবারে ঠিক! আমার নাম মনোরঞ্জন রায়, আমার মালিক সঞ্জীব সবরওয়াল আমাকে মনো বলে ডাকে। সবই তো মিলে যাচ্ছে! কিন্তু পুলিশের রেকর্ডে আমার নাম উঠল কেন বলুন তো! ক্রিমিন্যাল হিসেবে নাকি?

না। তবে একজন অত্যন্ত সন্দেহজনক এবং রহস্যময় মানুষ হিসেবে।

মশাই, আপনি আমার মাথা ফের গুলিয়ে দিলেন। আমার মতো একজন ডিসকোয়ালিফায়েড লোকের জীবনে সন্দেহজনক বা রহস্যময় কী থাকতে পারে বলুন তো!

সেটাই তো লাখ টাকার প্রশ্ন।

লাখ টাকার প্রশ্ন! কিচ্ছু বুঝতে পারলাম না। আমি নিজের সম্পর্কে আপনাকে যা বলেছি তা কি সবই মিথ্যে? আষাঢ়ে গল্প?

না। বরং আপনি নিজের সম্পর্কে অত্যন্ত সত্যি কথাই বলেছেন। আপনি নিজেকে যেমন বর্ণনা করেছেন আপনি ঠিক সেরকমই।

তবে?

আপনি একজন টোটালি ফ্র্যাস্ট্রেটেড, হতাশাবাদী উচ্চাশাহীন, আত্মবিশ্বাসহীন মানুষ। দুর্বলচিত্ত, দ্বিধাগ্রস্ত, ভিতু সবই ঠিক।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি ওরকমই তো!

অন্তত এক বছর আগে অবধি ওরকমই ছিলেন। আপনার একটা গুণ আছে। আপনি খুব প্রভুভক্ত মানুষ। সবরওয়াল আপনার কাছে ঈশ্বরতুল্য। এটা অন্যদের চোখে গুণ না হয়ে দোষ বলেও গণ্য হতে পারে। কিন্তু আপনার স্থির বিশ্বাস, সবরওয়ালের ওপরেই আপনার অস্তিত্ব নির্ভরশীল। আপনার আরও বিশ্বাস যে, পৃথিবীতে একমাত্র সবরওয়াল ছাড়া আর কেউ আপনাকে চাকরি দেবে না। আর তার ফলে প্রভুভক্ত হয়ে ওঠাটা আপনার অবশ্যম্ভাবীই ছিল।

হ্যাঁ, কথাটা খুব ভুল নয় সবরওয়াল আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

আর সেই জন্যই সবরওয়ালকে বাঁচিয়ে রাখাটাও আপনার প্রয়োজন। তাই না?

সে তো ঠিকই।

যিশু দাস নামে কাউকে আপনার মনে পড়ে কি?

যিশু দাস! ও বাবা, সে তো বিরাট গুণ্ডা ছিল!

হ্যাঁ, তোলাবাজ মস্তান। এলাকার টেরর। সবরওয়াল তাকে নিয়মিত তোলাও দিত। ব্যবসায়ীদের ওসব হিসেবের মধ্যেই ধরা থাকে। কাজেই কোনো গোলমাল ছিল না। কিন্তু মুশকিল হয়েছিল যিশু দাসের হঠাৎ ইচ্ছে হয়েছিল বম্বের একজন বিশেষ নায়িকাকে নিয়ে একটা হিন্দি ফিল্ম প্রোডিউস করবে। ওটাই নাকি ছিল তার জীবনের স্বপ্ন। সেই জন্য তার প্রচুর টাকার দরকার হয়ে পড়ে। আর সেজন্যই সে সবরওয়ালের কাছে পঞ্চাশ লাখ টাকা দাবি করে বসে। না হলে খুনের হুমকি দিতে থাকে। তার ফলে সবরওয়াল ভয় খেয়ে কারবার গুটিয়ে ফেলার কথা ভাবতে শুরু করে। ঝানু ব্যবসায়ীরা জানে টাকাটা দিলে এরপর দাবি আরও বাড়তে থাকবে। ঘটনাটা আপনার মনে আছে কি?

খুব আছে মশাই, খুব আছে। আমরা ভয়ে শুকিয়ে গিয়েছিলাম।

হ্যাঁ, সবরওয়ালের বিপদ ঘটলে আপনারও অস্তিত্বের সংকট। তবে যাই হোক, একদিন যিশু দাস হঠাৎ বেপাত্তা হয়ে যায়। তার পরিবার এবং গ্যাং তন্ন তন্ন করে তাকে খুঁজেছে, হিল্লিদিল্লিতেও খোঁজ করা হয়েছে, কোথাও তার সন্ধান পাওয়া যায়নি। খুন হয়ে থাকলে লাশটা তো পাওয়া যাবে। তাও পাওয়া যায়নি।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, সবই জানি। অনেকে বলে যিশুর হঠাৎ মতির পরিবর্তন হয় এবং সে সাধু হয়ে কোথাও চলে গেছে।

আমাদের ধারণা আর একটু প্র্যাকটিক্যাল। তদন্তে জানা যায় যিশু দাসকে শেষবার দেখা গেছে সবরওয়ালের গোডাউনের কম্পাউন্ডে ঢুকতে। তারপর থেকেই সে বেপাত্তা। সন্ধের পর সে সবরওয়ালের গোডাউনের যায়। তারপর থেকেই তাকে আর দেখা যায়নি। তখন গোডাউনে প্রায় কোনো কর্মচারীই ছিল না। শুধু সবরওয়াল আর আপনি। গেটে অবশ্য দুজন দারোয়ান ছিল।

তা হবে হয়তো! আপনি কি বিশেষ কিছু ইঙ্গিত করছেন?

হ্যাঁ। আমার নিজস্ব ধারণা, যিশু দাস সবরওয়ালের গোডাউনেই খুন হয়ে যায়। সবরওয়াল কোনো ভাড়াটে গুণ্ডা আনায়নি বা তার কাছে কোনো অস্ত্রশস্ত্রও ছিল না।

সবরওয়ালের কাছ থেকে যিশু বিদায় নেয় রাত আটটার কিছু পরে। যিশু সেদিন আলটিমেটাম দেওয়ায় সবরওয়াল খুবই অসুস্থ হয়ে পড়ে। সে পুলিশকেও ফোন করেছিল তার প্রোটেকশনের জন্য। সে নিজের অফিসঘরেই অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। অ্যাম্বুলেন্সে করে তাকে এক নার্সিং হোমে নিয়ে যাওয়া হয়।

ঘটনাটা আমার খুব মনে আছে। ওঃ কী টেনশনই গেছে। কিন্তু খুনের কথা কী যেন বলছিলেন?

বলছিলাম, আমার নিজস্ব রিকনস্ট্রাকশন অফ ইভেন্ট অনুযায়ী, যিশু দাস খুন হয় এবং তা হয় সবরওয়ালের গোডাউনের বিশাল চত্বরেরই কোথাও।

বলেন কী ! এ তো সাংঘাতিক কথা!

না, খুব সাংঘাতিক কিছু নয়। একজন টোটালি ফ্রাস্ট্রেটেড লোক যখন নিজের অস্তিত্বের সমূহ সংকট দেখতে পায় তখন তার ভিতরে ঘুমন্ত ঘাতক জেগে উঠতেই পারে।

কী যে বলেন স্যার, কিছুই বুঝতে পারছি না।

একটা লোককে মেরে ফেলা খুব কঠিন কাজ নয়, যদি হাতে কোনো মারাত্মক অস্ত্র থাকে, যদি ভিকটিম অপ্রস্তুত থাকে এবং যদি খুব স্ট্রং মোটিভেশন থাকে, ঠিক কি না মনোবাবু?

আজ্ঞে, খুবই ঠিক স্যার। আপনি পুলিশ অফিসার, কত জানেন।

তদন্তকারী পুলিশেরা কিন্তু কোনো সূত্রই পায়নি। এমনকি এটা মার্ডার কেস না অ্যাবডাকশন না নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া তারা আজও জানে না। কেসটার চার্জে আমি ছিলাম না। তবে শুনেছি। যিশু যেসব ঠেক থেকে তোলা আদায় করত তার সব কটা আমি একে একে গিয়ে দেখেছি। সবচেয়ে লাইকলি স্পট বলে আমার মনে হয়েছে সবরওয়ালের গোডাউনের বিরাট চত্বর। আমি কখনো আপনাকে জেরা করিনি বা মুখোমুখিও হইনি। শুধু আড়াল থেকে দুদিন আপনাকে একটু ওয়াচ করেছি। আপনাকে সবসময়ে শশব্যস্ত, টেনশনে ভোগা নিরীহ লোক বলেই আমার মনে হয়েছে।

হ্যাঁ স্যার, আমিও তো তাই বলতে চাইছি।

কিন্তু আপনার চোখে সেই গ্লিন্টটা আছে।

সেটা কী জিনিস স্যার!

গ্লিন্টকে বাংলায় ঠিক কী বলে তা জানি না। একটা ঝলকানির মতো। একটা ঝিলিক। ঠিক বোঝানো যাবে না। অ্যান্ড দেয়ার ওয়াজ দ্যাট গ্লিন্ট ইন ইওর আইজ। খুনি চিনতে আমার ভুল হয় না মনোবাবু।

হাসব না কাঁদব তা বুঝতে পারছি না স্যার।

প্রবলেম হল যিশুর ডেডবডিটা নিয়ে। খুন হয়ে থাকলে তার লাশ যাবে কোথায়। আমি একদিন সকালে, যখন কেউ কাজে আসেনি, জায়গাটা তন্ন তন্ন করে দেখি। উত্তর-পশ্চিম দিকে একটা ন্যাচারাল ডিচ আছে। পাঁচ ছ' ফুট ডায়ামিটারের একটা ডিচ। চারদিকে প্রচুর আগাছা থাকায় গর্তটা চোখেই পড়ে না। টর্চ ফেলে দেখি, বেশ গভীর। অন্তত আট দশ ফুট নীচে ডিচের তলায় কয়েকটা সিমেন্টের চাঙড়। জলে ভিজলে সিমেন্ট জমে যায়, আর সময়টা ছিল বর্ষাকাল। আমার অনুমান ডিচের মধ্যে একটা ডেডবডি ফেলে ওপরে কয়েক বস্তা সিমেন্ট ঢেলে দিলে কাজটা এগিয়ে থাকে। সিমেন্টের ওপর অবশ্য যথেষ্ট রাবিশও ফেলা হয়েছে।

হ্যাঁ স্যার, গোডাউনে মাঝে মাঝে এক-আধটা সিমেন্টের বস্তা জমে যায়। সেগুলো ডিচের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়।

হ্যাঁ, তা আমি জানি। ওই চাঙড়গুলোর মধ্যে যদি যিশুর খণ্ডবিখণ্ড অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো পাওয়া যায় তাহলে আমি অবাক হব না। তবে আমি চাঙড়গুলো ভেঙে দেখিনি। সবই আমার অনুমান।

স্যার, কেন যে ওসব ভয়ংকর অনুমান করছেন কে জানে। যিশু মস্ত গুণ্ডা, সে যদি খুন হয়েও থাকে তবে সেটা তার সমকক্ষ লোকই করেছে।

আপনি যিশুর সমকক্ষ নন?

পাগল! কী যে বলেন স্যার!

নরম্যালি, যিশু যদি বাঘ তো আপনি ইঁদুর। কিন্তু যখন অস্তিত্বের সংকট দেখা দেয়, প্রভুভক্ত যখন প্রভুর বিপদের গন্ধ পায় তখন বিশেষ সিচুয়েশন অর্ডার অফ পারসোনালিটিজ উলটে যেতে পারে। তখন বাঘ হয়ে যায় ইঁদুর, ইঁদুর বাঘের জায়গা নেয়।

স্যার, আপনার কথা শুনে বড্ড ভয় পাচ্ছি।

কেন, ভয়টা কীসের?

আপনি যা সব বললেন সেগুলো কি ভয়ের কথা নয়? একটা নেংটি ইঁদুর হঠাৎ হালুম-বাঘা হয়ে উঠলে সে নিজেই যে ভয় খেয়ে যাবে। না মশাই, না, আপনি আমার ভিতরে ভুল জিনিস দেখেছেন। আমি ওরকম নই।

সেটা আমিও জানি। আপনি ওরকম নন।

আজ সকালেই তো বাজারে পাতিলেবু কিনতে গিয়ে একটু দরাদরি করছিলাম, লেবুওয়ালা এমন রক্ত-জল-করা চোখে চাইল যে আমি পালানোর পথ পাই না।

হ্যাঁ, আপনি ওরকমও বটে। খুব ভীতু, ঝঞ্ঝাটবিরোধী, এসকেপিস্ট।

তাহলেই বুঝুন, আপনি আমাকে ভুল অ্যাসেস করছেন কি না।

না, তাও করছি না। খুনের কিনারা করার দায়িত্ব আমাকে কেউ দেয়নি। যিশু দাস মোট বাইশটা খুন করেছে বলে পুলিশের হিসেব আছে। বেঁচে থাকলে সে আরও বাইশটা খুন করত। সুতরাং তার লোপাট হওয়া নিয়ে পুলিশের তেমন মাথাব্যথাও নেই। তবে হাঁ, সে বেঁচে থাকলে পুলিশ তার কাছ থেকে কমিশন পেত। সেইটেই যা লস। কিন্তু আমার ইন্টারেস্ট অন্য জায়গায়। সেটা আপনি।

কী যে বলেন স্যার, এ যে অবিশ্বাস্য! তবে বিশ্বাস করতে খুব ইচ্ছে হচ্ছে। জীবনে আমাকে কেউ এত ইম্পর্ট্যান্স দেয়নি।

তারা ভুল করেছে। আপনার ইম্পর্ট্যান্স এতটাই বেশি যে, আমি অনেক খোঁজখবর নিয়ে, আপনার ডেলি রুটিন চেক করে তবে এই পার্কে ঠিক আপনার পাশে এসে বসে আছি।

আমার ভারি গুমোর হচ্ছে স্যার, বুকটা ফুলে উঠছে অহংকারে।

আপনি যিশুকে মারার জন্য কি লোহার রড় ব্যবহার করেছিলেন মনোবাবু?

আপনি যে কেন আমাকে বারবার ঠেলে খুনখারাপির মধ্যে নিয়ে যাচ্ছেন বুঝতে পারছি না। তবে আমি স্বীকার করি লোহার রড একটি মারাত্মক জিনিস।

স্বীকার করেন?

হ্যাঁ, আমাদের কারখানায় একজন লেবারের বাঁ চোখের ভিতর দিয়ে একবার একটা রড ঢুকে গিয়েছিল তার মাথার মধ্যে, তক্ষুনি মারা যায়। ঘটনাটা ভাবলে এখনও শিউরে উঠি।

যিশুকে কি ওভাবেই মারা হয়েছিল মনোরঞ্জনবাবু? চোখের ভিতরে রড ঢুকিয়ে?

কী করে জানব স্যার? ওসব যে বীভৎস ব্যাপার।

আর তার ডেডবডিটা? সিমেন্টের মধ্যে ঢুকিয়ে, জল ছিটিয়ে হুইলব্যারোতে নিয়ে গিয়ে ডিচের মধ্যে ফেলে দিয়েছিলেন?

মা গো! আপনি যে কীরকম সব ভয়ংকর কথা বলেন! আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।

বাঁচার জন্য মানুষ তো সব কিছু করতে পারে। তাই না?

তা অস্বীকার করছি না স্যার। তবে আমি বলতে চাই, আপনি ভুল লোককে সন্দেহ করছেন। আমি সে নই।

আমি তা স্বীকার করি। এই যে মনোরঞ্জন আমার পাশে এখন বসে আছে সে খুনি নয়, মারকুট্টা নয়, ভয়ংকর নয়। কিন্তু এই মনোরঞ্জনের মধ্যে আরও একজন মনোরঞ্জন সেই দিন জেগে উঠেছিল, তাকে আমিও চিনি না, আপনিও চেনেন না। তার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই স্যার।

জানি। কিন্তু সে যখন একবার জেগেছে তখন প্রয়োজন দেখা দিলেই সে কিন্তু আবার জাগবে।

সেটা তো ভয়ের ব্যাপার স্যার।

হ্যাঁ, আপনাকে সেই মনোরঞ্জন সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দিতেই আমার আসা। পুলিশ আপনাকে ধরতে পারবে না, আপনার ফাঁসি বা জেলও হবে না, কিন্তু আমি তবু বলছি, আপনি বিপন্ন। ওই ভয়ংকর মনোরঞ্জন কিন্তু আপনাকে সহজে রেহাই দেবে না।

চলে যাচ্ছেন স্যার?

হ্যাঁ।

যাবেন না স্যার, আর একটু বসুন।

কেন?

একা থাকতে আমার বড়ো ভয় করছে স্যার। দয়া করে অন্তত আমাকে বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে যান।

কাকে ভয় পাচ্ছেন মনোরঞ্জনবাবু?

আজ্ঞে, মনোরঞ্জনকে।

যতীনবাবুর চাকর

যতীনবাবু পানুকে খুব ভালো করে চেনেন না, এ কথা ঠিক। যতীনবাবুর দোষ নেই, তাঁর মেলা লোকলস্কর, মেলাই মুনিশ, দারোয়ান, চাকরবাকর। এর মধ্যে পানু কোনজন তা তাঁর না জানার হক আছে। তবে কি না যতীনবাবুর দুটো কুকুর, সাতটা গাই, গোটা সাতেক ছাগল, পঞ্চান্নটা হাঁস, সত্তরটা মুরগি, সতেরোটা খরগোশ, সাতটা পোষা পাখি আর যতীনবাবুর প্রায় একশো বছর বয়সি দিদিমা কুসুম দাসী পানুকে ভালই চেনে। তবে তারা আরও অনেককে চেনে, আবার পানুকেও চেনে।

পানু যদি বলে, 'আমি যতীনবাবুর চাকর' তা হলে কথাটা মিথ্যেও হয় না, আবার সত্যিও হয় না। মাস গেলে পানু যে আশিটা টাকা মাইনে পায় তা যতীনবাবুর তহবিল থেকেই আসে। দু'বেলা পানু যে পাহাড়প্রমাণ ভাত পেটের মধ্যে সাঁদ করায় তাও বটে যতীনবাবুরই ভাত। তবু সত্যি কথা বলতে গেলে বলতে হয়, পানু হল গে চাকরের চাকর। যতীনবাবু তাকে চেনেন না, তার মাথার ওপর ছড়িও ঘোরান না। তাকে হুকুম তামিল করতে হয় সত্যরামের। সত্যরাম এ বাড়ির যত চাকরবাকর আর কাজের লোকের ছড়িদার। সত্যরামের যা দাপট তা কহতব্য নয়। সত্যরামও বটে যতীনবাবুর এক চাকরই, কিন্তু সে কথা মনে আনাও পাপ। সে এখন যতীনবাবুর মেলা মেলা টাকা রোজ ছানাঘাঁটা করে, কাকে রাখবে কাকে ফেলবে তাও সে-ই ঠিক করে, সে-ই বাজার সরকার, খাজাঞ্চি, আরও বা কত কী। পানু শুধু জানে, যতীনবাবু নন, তার মাথার ওপর সত্যরাম। তার মরাবাঁচা সত্যরামের হাতে। সুতরাং সে হল গে যতীনবাবুর চাকরের চাকর।

এ বাড়িতে পানু ঢুকেছিল ছুঁচ হয়ে। তবে ছুঁচই রয়ে গেছে, ফাল আর হওয়া হয়নি। সেই ছুঁচ হয়ে ঢোকাটাও এক বৃত্তান্ত। পানু তখনও তো চাকর হয়নি। বাপবেঁচে। গরিব বটে, তবু

পাপু খাটত পিটত, পানু আলায় বালায় ঘুরে দিব্যি হেসেখেলে ছিল। পানুর তখন বয়সের জোয়ারে চেহারাখানাও এমন পাকিয়ে দড়কচা মেরে যায়নি। ভারি মিঠে করে বাঁশি বাজাতে পারত। ইচ্ছে ছিল, যাত্রা পার্টিতে ভিড়ে যাবে। গুণীর খুব কদর যাত্রার দলে। সেই সময়ে সে পড়ল গন্ধবাবুর খপ্পরে। সে আর এক বৃত্তান্ত। গন্ধবাবুর মেয়ে হল পারুল। গেছো মেয়েছেলে যাকে বলে। জামা ছেড়ে শাড়ি ধরার বয়সের ফাঁকেই দু'-দু'বার দুটো ছোঁড়ার সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে ফের ফেরত আসে। কোনো কোনো মেয়ে থাকে এরকম, যাকে শেষ অবধি সামলে ওঠা যায় না। স্বজাত স্বঘরের একটি যেমন তেমন পাত্র তখন গন্ধবাবুর খুব দরকার। নইলে মানসম্মান থাকে না।

তা গন্ধবাবুর মানইজ্জত বড়ো কমও তো নয়। উনি ছিলেন যতীনবাবুর তেলকলের ম্যানেজার। গোঁসাইগঞ্জের হাটে গন্ধবাবু পাকড়াও করলেন পানুকে। দু'চার কথার পরই ধাঁ করে কাজের কথা পেড়ে ফেললেন। বেশ হেঁকেই বললেন, পারুলকে যদি বিয়ে করো তবে আখের গুছিয়ে দেবো। চাই কি আজই কাজে লেগে যেতে পারো।

গায়ে খুব গন্ধ মাখতেন বলে লোকটার ওই নাম। আসল নাম রাখাল টাখাল কিছু হবে। তবে গন্ধবাবু বললে দশখানা গাঁয়ের লোক চেনে। বাড়ি এসে যখন পানু তার বাপকে কথাটা বলল তখন বাবা লাফিয়ে উঠে বলল, আরিববাস, এ তো লটারি জিতেছিস। কালই গিয়ে কাজে লেগে যা। মেয়েটার একটু বদনাম আছে বটে, তা বিয়ের পর দু'চার ঘা দিলেই সারবে খন।

পানু অগত্যা কাজে লেগে পড়ল। তেলকলের কাজ গতরের খাটুনি। তবে হবু শ্বশুর মাথার ওপর ছিল বলে, ভরসাও ছিল। দিন ফিরবে।

কিন্তু ফ্যাসাদটা বাঁধাল পারুলই। চোত মাসে কাজে লেগেছিল পানু আর জ্যৈষ্ঠে পারুল ফের পালাল। এবার গেল এক ঠিকাদারের সঙ্গে। গিয়ে যে কোন গাড্ডায় পড়ল কে জানে, আর ফিরল না।

গন্ধবাবু তারপর থেকেই পানুর ওপর বিগড়ে গেলেন। না, তা বলে তাড়িয়ে দিলেন না। তবে আগের মতো 'এসো, বোসো'-ও আর করলেন না। পানু চাকরি করে, গন্ধবাবু

ম্যানেজারি করেন, কারও সঙ্গে কারও আর অন্য কোনো সম্পর্ক থাকল না।

সেই সময়ে যতীনবাবুর বাড়িতে কাজের লোকের টান পড়ায় সত্যরাম এসে তেলকল থেকে কয়েকজনকে ধরে নিয়ে গেল। সেই কয়েকজনের মধ্যে পানু একজন। গন্ধবাবু ফিরেও তাকালেন না।

পানুর একটু দুঃখ হয়েছিল বইকি। পারুলের জন্য তাকে দেগে রাখা হয়েছিল বটে, কিন্তু গন্ধবাবুর আরও তো মেয়ে ছিল। পারুলের ছোটো বকুল, তার ছোটো টগর। কিন্তু তাদের কোনো গণ্ডগোল নেই। কই তাদের একজনের সঙ্গেও তো বিয়েটা লাগতে পারত পানুর। গন্ধবাবু সে-দিক দিয়ে গেলেন না।

গন্ধবাবু আর বেঁচে নেই। তার পরিবার কোথায় কী রকম আছেটাছে তাও জানে না পানু। তার সে সময় নেই। যতীনবাবুর বাড়িতে পাহাড়প্রমাণ কাজ। সত্যরাম আবার কারও বসে থাকা পছন্দ করে না।

যতীনবাবুর দুটো মহল। একটা অন্দর আর একটা বার। অন্দরমহলে যারা যাতায়াত করে তারা সত্যরামের পেয়ারের লোক। পানুর কপালে সত্যরামের নেকনজর জোটেনি। সে বাইরের লোক। বাইরে থেকে ভিতরটা কিছুই দেখা যায় না। তবে আন্দাজ করা যায়। মোটা মোটা দেয়াল, চিক-মেলা বারান্দা, পর্দা ফেলা জানালার ওই যে বিশাল তিনতলা অন্দরমহল ও হল রাজার পুরী। ওখানে নরম বিছানা, আতরের সুবাস, পায়েস রসগোল্লার ছড়াছড়ি। আর সোনাদানা টাকাপয়সার পাহাড়।

এই বাইরের মহল আর অন্দরমহলের মাঝামাঝি একখানা একটেরে দালান আছে। আগে ঠাকুর-দালানই ছিল, এখন নতুন ঠাকুর-দালান হয়েছে দক্ষিণ দিকে। এই দালানের একখানা ঘরে যতীনবাবুর দিদিমা থাকে। তিন কুলে কেউ আর নেই বলে বুড়ি যতীনবাবুর কাছে এসে পড়েছিল কোনো কালে। যতীনবাবু ফেলেননি, আবার তেমন মাথায় করেও রাখেননি। গরিব আত্মীয় বড়ো বালাই। তার ওপর বুড়ি তাঁর আপন দিদিমাও নয়, মায়ের মাসি।

খুনখুনে বুড়ি কুসুম দাসী একদিন পানুকে হাতছানি দিয়ে ডেকে বলল, দিবি দাদা, একখানা ডাব পেড়ে?

পানু তখন নতুন। কিছু জানে না। কোথা থেকে ডাব পেড়ে দেবে তাও বুঝতে পারছে না। হাঁ করে চেয়ে রইল।

বুড়ি বলল, আমি যতীনের দিদিমা, যা, ওই পুবের ঘরের পিছনে যে গাছগুলো আছে সেখান থেকে একটা পেড়ে আন। আজ একাদশী।

যতীনবাবুর দিদিমা! পানুর চোখ বড়ো বড়ো হয়ে গেল। তক্ষুনি গিয়ে তরতরিয়ে গাছে উঠে একটার জায়গায় চারটে পেড়ে আনল।

কুসুম দাসী খুব খুশি। কত আশীর্বাদ করল। ফলে আজ পানুর রাজাগজা হওয়ার কথা। সে তো হয়ইনি সে, তার ওপর ডাব পাড়ার জন্য সত্যরাম এই মারে কি সেই মারে।

তবে সে যা-ই হোক, সেই থেকে বুড়ির সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গেল পানুর। যতীনবাবুর দিদিমার অবস্থা যে তার চেয়ে খুব বেশি ভাল নয় তা বুঝতে পানুর দেরি হয়নি। তবে বুড়ি মানুষ ভালো। দ'য়ে পড়লে মানুষের স্বভাব ভালো হয়ে পড়ে তারা ভারি নরম নরম হয় আর লোকেদের ভক্তিমান্যি করতে শুরু করে, এ পানু অনেক দেখেছে। যতীনবাবুর দিদিমাও সেই হিসেবেই ভালো। পানুকে খুব ডাকখোঁজ করে, এটা সেটা জোগাড় করে দিতে বলে, আর লোভও দেখায়, 'তোর বে হোক, আমার এক ছড়া তিন ভরির মটরদানা হার আছে, তোর বউকে দেবো।'

পানু হাসে। মটরদানা হারখানা আর দিদিমাকে হাতছাড়া করতে হবে না ইহজন্মে। পারুল সটকে পড়ার পর থেকেই পানু জানে, এই ঢনঢনে কপালে বে আর নেই।

খড় কুঁচোতে বসে, কিংবা চুন আর বালি দিয়ে ঝামায় ঘষে কুয়োপাড়ের শ্যাওলা তুলতে তুলতে, কিংবা পুকুরধারে পাটায় বাবুদের পেল্লায় পেল্লায় মশারি কাচতে কাচতে জীবনটার ওপর যেমন ঘেন্না আসে, তেমনি আবার শিউলি ফুটলে, নলেনগুড় জ্বালের গন্ধ বেরোলে বা কোকিল আচমকা ডেকে উঠলে মনটা ভারি খুশি-খুশি হয়ে ওঠে। জীবনটায় আর একটা খুশির তুফান লাগতে পারত যদি সত্যরাম তার ওপর খুশি থাকত। কিন্তু সেটাই কিছুতেই

হয়ে উঠল না। এক একজন থাকে, বেশ আছে দোষঘাট কিছু করেনি, তবু তার ওপর কেউই যেন খুশি হয় না। তাকে দেখলেই মুখ বেজার করে ফেলে। পানুরও হয়েছে তাই।

পানুর বাপ মারা গেল এই তো সেদিন। খবর পেয়ে পানুর তেমন কিছু বুক-তোলপাড় হল না। গরিবদের তেমন আঠা থাকে না কিনা। বাপের সঙ্গে পানুরও বহুকাল ছাড়কাট হয়ে গেছে। তবু খবর পেলে যেতে হয়, তাই গেল। গিয়ে দেখল, দেড় বিঘে জমি আর খোড়ো ঘরসমেত বাস্তুটা জুড়ে থাবা গেড়ে আছে তার ছোটো ভাই কানু। রাগী কুকুর যেম লোক দেখলেই গরগর করতে থাকে, তেমনি তাকে দেখেও কানু কেমন যেন গরগর করতে থাকল। বুঝি ভেবেছিল পানু বাপের সম্পত্তির ভাগ চাইবে। চাওয়ার কথা মনেই হয়নি পানুর। সে বড়োলোকের চাকর, নজর একটু উঁচু হয়েছে। দেড় বিঘে জমি আর নড়বড়ে খোড়ো ঘরের ভাগ চাইবার মতো ছোটো নজর তার আর নেই। সে কথা কানুকে বুঝিয়েও বলল সে, তবু কানু গরগরানিটা থামাল না। বউ ছেলে মেয়ে নিয়ে তার বেশ ফাঁদানো সংসার। এখানে ভাগিদার জুটলে তার বিপদ। সে তো আর সুখে নেই। তবে ছোঁড়াটা বরাবরই খারাপ ছিল। মদ টদ খায়। জুয়া খেলে, বউকে ধরে পেটায়, বাপকে ঝাড় দিত মাঝে মাঝে।

পানু ফিরে আসার পর সত্যরাম একদিন তাকে পা দাবাতে ডেকে পাঠাল। সত্যরামের পা দাবানো এক মস্ত সম্মানের ব্যাপার। যে-সে সত্যরামের পায়ে হাত ছোঁয়াতে পারে না। যারা পারে তাদের নির্ঘাৎ দশ বিশ টাকা বেতন বেড়ে যায়। আর তারা নেক-নজরেও থাকে।

পানুর ভারি আহ্লাদ হয়েছিল সত্যরামের ডাক পেয়ে। কিন্তু পা দাবাবে কি, হাত ছোঁয়াতে না ছোঁয়াতেই সত্যরাম ককিয়ে উঠে বলল, ওরে থাম থাম, কী লোহার হাত রে বাবা। কড়া পড়ে যে এক্কেবারে শিরীষ-কাগজ বানিয়েছিস। আমার নরম শরীর, ওই কেঠো হাত চলবে না।

তা কথাটা বটে সত্যি। পানুর হাত আর হাত নেই। থাবা হয়ে গেছে। মনের দুঃখে সে সত্যরামের ঘর থেকে ফিরে এল। কপালটা খুলি-খুলি করেও খুলল না। সত্যরামের চাকর

বটে, কিন্তু বড়ো চাকর, সর ননি দুধ ঘি খেয়ে আর গতর না খাটিয়ে সে ইদানীং ভারি নাদুসনুদুস হয়েছে। মুখখানায় আহ্লাদী ভাব। তিন আঙুলে তিনখানা সোনার আংটি। এমন এঁটে বসে গেছে যে, স্যাকরা ডেকে না খোলালে আর খুলবে না। তার পা দাবাতে গেলে পানুকে সাতদিন হাত দু'খানা তেলে ভিজিয়ে নরম করে নিতে হবে।

এই সব নানা কথা নিয়ে ভাবে পানু। আর কাজ করে। আর খায়। আর ঘুমোয়। ভাবে।

ওদিকে যতীনবাবুর কারবার বাড়ছে, টাকা বাড়ছে, লোক বাড়ছে। ক্রমে ক্রমে চারদিকটা বেশ ফলাও হয়ে উঠেছে। দু'খানা গাড়ি কিনলেন যতীনবাবু। বারবাড়ির উঠোনে একখানা দোতলা তুলে ফেললেন। পঞ্জাব থেকে দুটো বিশাল গাই এল।

কিন্তু পানু যে কে সে-ই। তবে এ কথাও ঠিক, যতীনবাবুর উন্নতি যত হয় ততই পানু খুশি হতে থাকে। শত হলেও মনিব তো। যতীনবাবুর রংখানা দিন দিন ফর্সা হয়েছে, চোখ দু'খানা থেকে দু'বাটি মধুর মতো মুখ থিকথিক করছে। মুখখানা সর্বদা যেন হাসি-হাসি ভাব। আগে একজন পাইক সর্বদা ঘুরত। আজকাল দুজন। দু'নম্বর পাইকটার চেহারা কাবলিওলাদের হার মানায়। যেমন লম্বা, তেমনি চওড়া তেমনি বিশাল বুকখানা। আর চোখ দু'খানায় দোফলা ছুরির ধার। যত টাকা বাড়ছে যতীনবাবুর ততই শত্রু বাড়ছে। তাই বাড়ছে পাইক। নতুন পাইকটার হাতে একটা দোনলা বন্দুকও থাকে। দেখে ভারি ভক্তিশ্রদ্ধা হল পানুর।

দুপুরবেলা বারবাড়ির বারান্দায় তারা ছ'জন বাইরের চাকর খেতে বসেছে। সত্যরামের পেয়ারের লোকদের জন্য ভিতরের দরদালানে ভিন্ন ব্যবস্থা। তা হোক, পানুর কোনো দুঃখ নেই। যতীনবাবুর বাড়িতে ভাতটা নিয়ে হিসেব কষা হয় না। যত পার খাও। ভাতটা বেশ চেপেই নেই সকলে। ভাতের মাথায় একটা গর্ত করতে হয়, তাতে বড়ো হাতা দিয়ে হড়হড় করে ডাল ঢেলে দিয়ে যায় হরিহর। একটু ঘ্যাঁট মতো থাকে সঙ্গে। পরে চুনো বা ছোটো মাছের একখানা ঝোল। বাড়িতে ভোজ হলে অবশ্য তাদেরও কপাল ফেরে। আর যতীনবাবুর বাড়িতে ভোজ লেগেই আছে।

খেতে বসে আজ নলিনীকান্ত পানুর কানে কানে বলল, নতুন পাইকটার বৃত্তান্ত শুনেছ! সাতখানা খুন পানু শুনে ভিমরি খাওয়ার জোগাড়, বলিস কী?

নোনাপুকুরের বটকেষ্ট কাপালিকের কাছে গিয়ে গা-ঢাকা দিয়ে ছিল। পুলিশ গিয়ে ধরে। বটকেষ্টর খুব ভক্ত হল যতীনবাবু। তার কথায় ওঠে বসে। বটকেষ্ট যতীনবাবুকে হুকুম দিল পুলিশের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে ছাড়িয়ে এনে পাইকের চাকরিতে বহাল করতে। যতীনবাবুও কাঁচাখেকো খুনিটাকে এনে রেখেছে। রোজ দুটো করে মুরগি, ডজন ডজন ডিম ওড়াচ্ছে আর বন্দুক নিয়ে গোঁফ মুচড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভগবান বলে কিছু নেই, বুঝলে?

পানু মাথা নেড়ে বলল, সে আমি অনেক আগেই বুঝেছি।

বলাই দাঁতের ফাঁক থেকে একটা মাছের কাঁটা বের করার চেষ্টা করতে করতে বলল, তবে দীনু পাইক আসায় সত্যরামের বাজার খারাপ। কর্তাবাবু দীনুকে চোখে হারাচ্ছেন আজকাল।

কথা সকলের মনে ধরল। তারা কেউ সত্যরামের পেয়ারের লোক নয়। সত্যরামকে তারা কখনও ঘাঁটায় না এবং মুখে যথেষ্ট খাতির দেখায়। নইলে সত্যরাম যেদিন খুশি ঘাড় ধরে যে-কাউকে চাকরি থেকে তাড়িয়ে দিতে পারে। দিয়েছেও কতককে। তবে তারা ছ'জন যে টিকে আছে তার কারণ, তারা কাজের লোক, প্রাণপণে খাটে।

পানু মাথা নেড়ে বলল, কথাটা বড়ো ভয়ের হল।

বলাই বলল, কেন ভয়ের কী? দিক না বন্দুকটা সত্যরামের ইয়েতে ঢুকিয়ে। আমি তো হরির লুট দেব।

পানু লেবুপাতা ডলে শেষ কয়েকটা গরাস গপাগপ মুখে চালান দেওয়ার ফাঁকে বলল, সত্যরামের কিছু হলে দীনু পাইক যদি আমাদের মাথার ওপর বসে তা হলে তো দিনেদুপুরে হাতে মাথা কাটবে।

ফটিক গতকালই সত্যরামের হাতে জুতোপেটা হয়েছে হাট থেকে তামাক আনেনি বলে। সে বলল আগে তো সত্যরামের ব্যবস্থা হোক পরে দীনুকে নিয়ে ভাবা যাবে।

কেষ্ট এতক্ষণ কিছু বলেনি। একটা মস্ত লঙ্কা নুনে মেখে একটু একটু করে খেয়ে শিসোচ্ছিল। লঙ্কায় আর একখানা চাটন দিয়ে বলল, খবর তো রাখো না। দীনু পাইক এমনি আসেনি। খবর হয়েছে এ বাড়িতে ডাকাত পড়বে। এত টাকা, ডাকাত না পড়ে পারে!

পাঁচুর সঙ্গে শ্রীপতি এতক্ষণ নীচু গলায় দাক্ষী নামে নতুন ঝিকে নিয়ে রসের কথা বলছিল। দাক্ষীর বয়স কাঁচা, দেখতেও ভালো। পাঁচু আর শ্রীপতিরও বয়স কম। দাক্ষী অন্দরমহলের ঝি। বাইরে বড়ো একটা আসে না। তবে দোতলার জানালা বা বারান্দায় দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে বেপর্দা হাঁ করে বাইরের দিকে চেয়ে থাকে। পাঁচুর সঙ্গে কয়েকবার কথা হয়েছে। মেয়েটার ভাইয়ের বড়ো অসুখ। টি. বি। সারাক্ষণ ভাইটার কথা ভাবে। পাঁচু বলল, কিছু টাকা জমলে ভাবছি ওকে দেব।

শ্রীপতি মুখখানা উদাস করে বলল, ও টাকায় কী হবে? ক'টাকাই বা তুই পাস? ও টাকা তো সাগরে শিশির। এত মজে যাস না বাপ। সত্যরাম টের পেলে ছাল ছাড়িয়ে নেবে।

সবাই যে যার থালা নিয়ে গিয়ে পুকুরধারে মাজতে বসল।

খেয়ে উঠে পানু একটু চিন্তিতভাবে ঘরে এল। দীনু পাইককে নিয়ে তার কেন যেন খুব চিন্তা হচ্ছে।

যদিও কোনো দিন কথাবার্তা হয়নি বা এমন কী চোখাচোখিও ভালো করে নয় এবং তার নামও যদিও তিনি জানেন না তবু যতীনবাবুর প্রতি একটা দুর্বলতা আছে পানুর। শত হলেও মনিব। খুব ইচ্ছে হয় পানুর, একদিন গিয়ে যতীনবাবুকে বলে, আজ্ঞে আমি আপনার চাকর, আমার নাম পানু।

যতীনবাবু হয়তো ভারি অবাক হয়ে বললেন, ও তাই নাকি? বা! বেশ, বেশ।

ওইটুকুই যথেষ্ট। পানু আর বেশি কিছু চায় না। যতীনবাবু কেমন লোক তা জানে না পানু। কেমন আর হবেন, ভালোই হবেন বোধ হয়। ভগবান যাঁকে এমন ঢেলে দেন, লক্ষ্মী যাঁর ঘরে এমন উথালপাথাল তিনি কি আর খারাপ লোক? তা এই যতীনবাবুর জন্য পানুর

এখন একটু চিন্তা হচ্ছে। দীনু পাইকের মতো খুনে লোককে নিয়ে ঘোরাফেরা কি ঠিক হচ্ছে কর্তাবাবুর?

বটকেষ্ট কাপালিকের নাম হল গে কালিকানন্দ। তার সাধন-নামে কেউ অবশ্য তাকে ডাকে না। সবাই তার পুরোনো নামই বজায় রেখেছে। লোকে বলে, সে তার একটা বউকে কুয়োয় ফেলে মেরেছে, আর এখন তার সাধনপীঠ। খুব রবরবা। লোক যে সুবিধের নয় ঠিকই, কিন্তু পানু এও জানে, লোক ভালো হলে কাপালিকদের চলে না। দুনিয়ার আর সব লোকের প্রতি পানুর যে মনোভাব, বটকেষ্টর প্রতিও তাই। মনোভাবটা ভয়ের। এ বাড়িতে যখন আসে তখন তার জন্য খাসি কাটা হয়, দিশি মদের বোতল আসে আর বাড়িটা কেমন ছমছম করতে থাকে। করবেই। বটকেষ্টর সঙ্গে দেড়শো ভূত সব সময়ে ঘুরে বেড়ায়। ভূতের গায়ের বোঁটকা গন্ধে বাড়ি একেবারে ম ম করতে থাকে। যতীনবাবু বিশ্বাস করেন, তাঁর যে অবস্থার এত উন্নতি তা ওই বটকেষ্টর জন্য।

তা হবে। পানু অতশত জানে না। কী থেকে কী হয় তা সে কি জানে। বটকেষ্টর ভূতেদেরও সে খুব ভক্তিমান্যি করে এবং ভয় খায়।

খাওয়ার পর তবু উবু হয়ে বসে কুয়োতলার শ্যাওলা ঘষে তুলছিল পানু। শীতকাল। রোদ পশ্চিমে হেলেছে।

সেই রোদে একটা ছায়া পড়ল তার গায়ে।

পানু মুখ তুলে যা দেখল তাতে ফের ভিরমি খাওয়ার জোগাড়। সামনে দীনু পাইক দাঁড়িয়ে। বুকের মধ্যে কেমন একটা গুড়গুড় শব্দ উঠল। হাত পা সব ঠাণ্ডা মেরে যেতে লাগল।

দীনু খুব ঠাণ্ডা গলায় বলল, অ্যাই, তুই গোবরার কানু মণ্ডলের ভাই না?

পানু ভারি চমকে গেল। সে গোবরা গাঁয়ের কানু মণ্ডলের ভাই বটে, কিন্তু সে কথা বেশি লোক জানে না। জানার কথাও নয়। দীনু পাইকের মতো মস্ত লোকের কানে যে কথাটা গেছে এইতেই সে অবাক। পানু ভারি বিগলিত হয়ে বলল, আজ্ঞে।

তোর নাম পানু?

যে আজ্ঞে।

পানু লক্ষ করল, দীনু পাইকের পরনে একটা ফর্সা পায়জামা, গায়ে খয়েরি রঙের পাঞ্জাবি, তার ওপর জহর কোট। আড়েদিঘে আলিসান লোকটা বোধ হয় খালি হাতে মোষের ঘাড় ভেঙে দিতে পারে। দীনু পাইক তার বাঘা গলায় গরগর শব্দ তুলে বলল, সেদিন গোবরায় গিয়ে কানু মণ্ডলকে ভয় দেখিয়ে এসেছিস?

পানুর এক গাল মাছি। কানুকে কেন, সে তো মশা মাছিকেও ভয় দেখানোর এলেম রাখে না। সবেগে মাথা নেড়ে বলল, আজ্ঞে না।

লোকটা কিছুক্ষণ খুনিয়া চোখে তার দিকে চেয়ে থেকে বলল, কানু মণ্ডল আমার ইয়র। বুঝেছিস কথাটা?

যে আজ্ঞে।

ওর জমিবাড়ির ওপর তোর কোনো হক নেই। আছে?

পানু সভয়ে মাথা নেড়ে বলল, ভাগ তো চাইনি।

আলবাৎ চেয়েছিস।

আজ্ঞে না।

লোকটা আবার কিছুক্ষণ রক্ত-জল-করা চোখে তাকে ঠাণ্ডা করে দিয়ে বলল, তা ভালো কথা। সাতদিনের মধ্যে গোবরায় গিয়ে কাগজে সইসাবুদ টিপছাপ দিয়ে আসবি।

খুব ভয়ে ভয়ে পানু জিজ্ঞেস করল, কীসের কাগজপত্র আজ্ঞে?

তোর অত খতেনে কী দরকার? যা বলছি তা-ই করবি। বেশি ট্যাঁ ফোঁ করলে বিপদ আছে।

লম্বা লম্বা পা ফেলে চোখের পলকে দীনু পাইক হাওয়া হয়ে গেল।

পানু তার ভেজা হাতে কপালটা মুছল। দোতলার জানালা থেকে দাক্ষী নামে নতুন ঝিটা তাকে হাঁ করে দেখছে। দেখেছে আরও অনেকেই। দীনু পাইক চলে যাওয়ার পরই পাঁচু, শ্রীপতি, বলাই এসে জুটল।

কী ব্যাপার গো পানুদাদা, দীনু পাইক তোমার ওপর তম্বি করে গেল কেন?

পানু কী আর বলবে, ঘন ঘন মাথা নেড়ে বলল, আমি কিছু করিনি, ভাগ টাগও চাইনি।

কীসের ভাগ? কী করোনি?

পানু মাথা নেড়ে বলল, সে অনেক কথা রে ভাই। তবে আমিও ব্যাপারটা ভাল বুঝছি না।

সবাই মিলে ব্যাপারটা নিয়ে কিছুক্ষণ তুমুল কথাবার্তা হল। পাঁচু বলল, ও যা বলছে তাই করো গো পানুদা। পৈতৃক প্রাণটার দাম অনেক বেশি।

পানু শুধু বলল, হুঁ।

রাত্রিবেলা পানু ভালো করে খেতে পারল না। এত তেষ্টা পাচ্ছিল যে ঘটি-ঘটি জল খেয়ে খিদের বারোটা বেজে গেল। রাত্রিবেলা ঘুমও হল না ভালো। ঘন ঘন পেচ্ছাপ চেপে যেতে লাগল। দীনু পাইক যে কানুর বন্ধু তা কে জানত। আর কানুই বা কেন দীনুকে তার পেছনে লাগাল তাও বুঝে ওঠা ভার।

শুয়ে শুয়ে অনেকক্ষণ ভাবল পানু। মাথাটা গরম হয়ে গেল।

সকালবেলায় যতীনবাবু তার পাইক বরকন্দাজ নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। পানু সে সময়ে পুকুরধারে চাদর কাচছে। এমন সময় সত্যরামের পেয়ারের লোক মুকুন্দ এসে বলল, ওরে তোর তলব হয়েছে।

সত্যরাম তার ঘরে নরম সাদা বিছানায় বসা। দেয়ালে হরেক ক্যালেন্ডার। একখানা পেল্লায় লোহার আলমারি। ইস্তক টেবিল চেয়ার। কে বলবে চাকরের ঘর। তা সে যত বড়ো চাকরই হোক।

তবে কিনা পরিষ্কার ঘরখানা যেমন হাসছে, সত্যরামের মুখে কিন্তু তেমন হাসি-হাসি ভাব নেই। ভারি বেজায় মুখ। তাকে দেখে ভ্রূ কুঁচকে বলল, কী রে, ওই ডাকাতটার সঙ্গে কী কথা হচ্ছিল? ষড় করছিস নাকি?

পানু আগাপাশতলা অবাক হয়ে বলল, ষড়? কীসের ষড়? গুণ্ডাটা যে আমাকে শাসাচ্ছিল।

শাসাচ্ছিল? কেন রে আহাম্মক, করেছিসটা কী?

সেইটেই তো ভাবছি। ভেবে ভেবে কিছু ঠিক পাচ্ছি না।

খোলসা করে বল।

খোলসা করেই বা বলি কি! কপালটাই আজ্ঞে আমার খারাপ।

দীনু পাইক তো আর যাকে তাকে শাসায় না। তার কাছে তুই তো পিঁপড়ে। কিছু গুরুচরণ করে থাকলে ঝেড়ে কেশে ফ্যাল।

পানু উবু হয়ে বসল। তারপর খানিক ভাবল। পারুল না সটকালে আজ তার তেলকলটার ম্যানেজার হওয়ার কথা। গন্ধবাবু সেরকমই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। সত্যরাম বা দীনু পাইক কেউই তাকে পেত না। স্বয়ং যতীনবাবুর সঙ্গে সে রোজ মুখোমুখি কথা বলতে পারত। কত বড়ো সম্মান।

চোখে জল আসছিল পানুর। মায়ের পেটের ভাই হয়ে কানু কিনা বিনা দোষে পেছনে গুণ্ডা লাগাল।

সত্যরাম তার দিকে চোখা নজরে চেয়ে থেকে বলল, দ্যাখ, তোদের কিন্তু আমিই এক রকম বাঁচিয়ে বর্তিয়ে রেখেছি। দোবেলা খেতে জুটছে, ট্যাঁক গরম-করা পয়সা জুটছে, এবং আরাম। সাতটা গাঁয়ে ঘুরে দেখে আয় আর কেউ আছে কি না। তোদের মতো মনিষ্যির পক্ষে কি এটা কম হল?

তা আজ্ঞে ঠিক।

তাই বলছি, ওই ডাকাতটার সঙ্গে ষড় করে আমার পিছনে লাগার মতলব যদি থেকে থাকে তাহলে কিন্তু আখেরে ভাল হবে না। বেশি কথা কি, কালকেই সকালে বাবুরে বলে ঘাড় ধাক্কা দেবো।

পানু মাথা নেড়ে বলল, আজ্ঞে আমি যথার্থই পিঁপড়ে। দীনু পাইক আমার সঙ্গে ষড় করার লোক নয়। তবে আমার ভাই কানুর সঙ্গে ওর ভাব আছে। বোধ হয় মদ বা জুয়ার

আড্ডায় ভাব হয়েছিল। তাই আমাকে শাসাচ্ছিল বাপের সম্পত্তি যা আছে সব যেন লেখাপড়া করে কানুকে ছেড়ে দিয়ে আসি।

তোরও আবার বাপের সম্পত্তি আছে নাকি? এ যে গোরুর গাড়ির হেডলাইটের বৃত্তান্ত। তা কত কী আছে?

শুনলে হাসবেন। দেড় বিঘে জমি আর দুটো খোড়ো ঘর।

শুনে কিন্তু সত্যরাম হাসল না। বলল, তা তুই কী বললি ডাকাতটাকে?

কী আর বলব! রাজি হতে হল!

সত্যরাম কথাটা বোধহয় মনে মনে ওজন করে দেখল। তারপর বলল, তোর বাড়ি তো গোবরায়!

আজ্ঞে, মাইল তিনেক হবে উত্তর দিকে।

চিনি।

আজ্ঞে সবাই চেনে। গোবরার বেগুন খুব নামকরা।

সত্যরাম খিঁচিয়ে উঠে বলল, বেগুনটাই চিনলে! আর কিছু দেখলে না!

কী দেখব আজ্ঞে?

দেখোনি খেত খামারের ওপর দিয়ে আমিনবাবুরা শেকল টেনে মাপজোক করছে।

তা দেখেছি বটে।

আহাম্মক কোথাকার! ওখানে বিরাট কারখানা হবে। জমির দাম হু হু বাড়ছে। চাষের জমি সব গাপ করে বড়ো বড়ো বাড়ি হবে।

পানুর গালে হাত, আজ্ঞে তা তো জানতুম না। কানু বলেওনি।

দেড় বিঘেতে কত কাঠা হয় জানিস?

তা জানি।

এক এক কাঠার দাম যদি ঠেলে দশ হাজারে ওঠে তবে কানুর ট্যাঁকে কত আসবে তার আন্দাজ আছে?

পানুর চোখ কপালে, উরে বাবা?

সাধে কি আর দেড় বিঘের জন্য দীনু পাইক তোকে শাসায়?

গুহ্য কথা আছে না। যতীনবাবু থলিভর্তি টাকা নিয়ে রোজ গোবরায় আনাগোনা করছেন। আজও গেলেন একটু আগে। গোবরায় জমি এখন সোনা।

পানুর মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করছিল। কথা সরছিল না।

সত্যরাম করুণার স্বরে বলল, যা, কাজ করগে যা। ভেবেচিন্তে একটা কিছু মাথায় এলে বলবখন তোকে।

দীনু পাইক যে মোটে সাতদিন সময় দিয়েছে। কাগজপত্র সব তৈরি। গিয়ে টিপছাপটা দিলেও হয়।

সত্যরাম উদার গলায় বলল, জাতসাপে ধরলে তো আর বাঁচন নেই রে। টিপছাপ দিতে হলে দিবি। তবে একেবারে ফাঁকিতে পড়তে যাবি কেন? দু'চার হাজার চেয়ে বসবি।

যদি মারে?

মরবি তো বটেই। তোর আবার ওয়ারিশও নেই যে, তুই মরলে কেউ দাবিদার দাঁড়াবে। নাঃ, তোর কপালাই খারাপ দেখছি।

পানু উঠল। সত্যরামের মুখচোখে দুশ্চিন্তার ছাপটা তার ভালো লাগছে না।

সত্যরামের যেমনই হোক, পানুর মতো লোকের পুঁটিমাছের পরান তো ওরই হাতের তেলোয় দাপাচ্ছে। মারলে ওই মারবে, রাখলে ওই রাখবে। কিন্তু ওরও যদি বাঁচন মরণের সমস্যা দেখা দেয় তো ঘোর বিপদের কথা।

পানু পুকুরপাড়ে গিয়ে আজ খুব গতর নেড়ে কাপড় কাচল। কাজে মন থাকলে, শরীর ব্যস্ত থাকলে দুশ্চিন্তা একটু কম হয়।

বিকেলের দিকটায় সত্যরামের একটু ছুটি হয়। ঘন্টাটাক একটু নিজের মনে থাকতে পারে সাঁঝবেলাটায়। সত্যরাম এ সময়ে সিদ্ধি খায় আর শাগরেদদের নিয়ে ঘরে বসে কুটকাচালি করে।

পানু চাদরটা জড়িয়ে বাঁশবন পার হয়ে কালীবাড়ির দিকে যাচ্ছিল। আরতিটা দেখে আসবে। আর ওই সঙ্গে মায়ের কাছে একটু মানসিকও করে আসবে। সাতে নেই পাঁচে নেই মা, তবে কেন আজ আমার এমন বিপদ।

আনমনা ছিল, তাই লোকটাকে দেখতে পায়নি পানু।

দাদা!

পানুর পিলে কেঁপে গেল। দু'বার 'আঁ আঁ' করল মুখ দিয়ে। পথ আটকে কানু দাঁড়িয়ে।

দাদা, ভয় পেলে নাকি? আরে আমি কানু।

পানুর শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। বলল, ক্কী? ক্কী? ক্কী চাস তুই?

তোমার সঙ্গে কথা আছে। আড়ালে চল।

পানু মাথা নেড়ে বলল, ও বাবা, আড়ালে আমি যাচ্ছি না।

কানু অবাক হয়ে বলল, এত ভয় পাচ্ছ কেন? আমি কি বাঘ না ভাল্লুক?

পানু দু'পা পিছিয়ে বলল, আমি চললুম। যা বলার চিঠি লিখে জানাস।

কানু বেকুবের মতো দাদার দিকে চেয়ে বলল, কী হয়েছে তোমার বলো তো! আমি যে ভীষণ বিপদে পড়ে তোমার কাছে এলুম।

কী বিপদ?

দীনু গুণ্ডা যে আমাকে ভিটেছাড়া করতে চাইছে।

অ্যাঁ। তা সে তোর পেয়ারের লোক, তা--

কী যে বলো দাদা, তার ঠিক নেই। কে কার পেয়ারের লোক? গোবরায় বলে কী সব কলকারখানা হবে টবে, সেই শুনে সবাই জমির দাম বাড়িয়ে বসে আছে। সেই কবে জুয়া

খেলতে গিয়ে পঞ্চাশটা টাকা ধার নিয়েছিলুম সেই সুবাদে দীনু শালা গিয়ে নানারকম গাইতে লাগল। তোমার মনিবেরও সাঁট আছে এর মধ্যে।

দীনু কী বলছে?

বলছে, হাজারটা টাকা নগদ দিচ্ছি ভিটেমাটি ছেড়ে চলে যা। নইলে ঘরে আগুন দিয়ে বেগুনপোড়া করে ছাড়ব। সব তোমাকে বলা যায় না, শালা দীনু আমার কিছু গুপ্ত কথাও জানে। আমার বড়ো খারাপ সময় পড়েছে।

পানু আতঙ্কিত হয়ে বলল, তা আমার কাছে কেন? আমি কী করব?

বলছিলুম কি এ সময়টায় তুমি যদি তোমার ভাগেরটা না ছাড়ো তাহলে দীনু শালা মুশকিলে পড়বে।

ও বাবা, সাতদিন সময় দিয়েছে। তার মধ্যে লেখাপড়া করে না দিলে ঘাড় নামিয়ে দেবে।

বলো কী, তোমাকেই ধরেছিল এর মধ্যে? তুমি যে আমার দাদা তা তো তার জানার কথা নয়।

পানু বলল, জেনেছে। তাছাড়া আমাকে তো বলল আমি গিয়ে নাকি তোকে ভাগের জন্য ভয় দেখিয়েছি।

কানু মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। বলল, সববনাশ। আমার ভরসা তো ছিলে তুমি। এখন তুমিও যদি লিখে দাও তাহলে তো দীনু শালা আমার ঘাড় ধরে আদায় করে নেবে। তোমার কথা গেয়ে একটু ভজঘট পাকানোর তালে ছিলুম যে।

পানু একটু ভাবল। তারপর হালছাড়া গলায় বলল, তা আর কী করা যাবে! প্রাণটা তো আগে। শুনেছি গুণ্ডাটা মেলা খুনখাবারি করেছে।

তা করেছে।

ওরকম লোকের সঙ্গে কি লাগা ভালো?

কানু এ কথাটার জবাব দিল না। উবু হয়ে বসে চাদরের খুঁটে চোখ মুছল। বেশ কাহিল দেখাচ্ছিল তাকে। গরগরানিটাও আর নেই। দায় পড়লে মানুষের স্বভাব ভালো হয়ে পড়ে। কানুকেও কেমন যেন ভালোমানুষের মতো দেখাচ্ছে। কেঁদেকেটে চোখ লাল করে ফেলল কানু। তারপর মুখ তুলে ধরা গলায় বলল, মায়ের দিব্যি কেটে বলছি দাদা, যদি দীনু গুণ্ডাকে ঠেকাতে পারো তবে জমি বেচে যা পাবো অর্ধেক তোমার। এখনই সাত হাজার করে কাঠায় দর উঠছে। আমাদের জমির পাশ দিয়ে বড়ো রাস্তা হচ্ছে বলে দর আরও বেশি।

সত্যরাম বলছিল কাঠা নাকি দশ হাজার।

আর ছ'মাস পরে তাই হবে। যদি ততদিন ধরে রাখা যায়।

পানু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে গেল।

বাশবনের ভিতরে কুয়াশা আর অন্ধকারে একটু শব্দ উঠল। কে যেন সাবধানী পায়ে আসছে বা যাচ্ছে। বাশপাতায় খড়মড় শব্দ উঠছে।

কানু সপাৎ করে উঠে দাঁড়াল।

পানু বলল, কে?

কানু সভয়ে বলল, কে গো দাদা?

পানু মাথা নেড়ে বলল, বুঝতে পারছি না। আবছা মনে হল একটা মেয়েছেলে। দাঁড়া, দেখছি।

আমি আর দাঁড়াব না। ফিরতে দেরি হয়ে যাবে। তার ওপর দীনু শালা দেখতে পেলে বিপদ ঘটাবে। কাল পরশু একবার আসবখন।

কানু চলে গেল।

পানু বাঁশবনের ভিতরে একটু চেয়ে রইল। মরা আলোর ঝুঁঝকো মায়ার ভিতর সে একটা খয়েরি ডুরে শাড়ির আভাস দেখেছে। মেয়েছেলেটা দৌড়ে বেশি দূর যায়নি। কথা শুনছিল আড়ি পেতে। কথা যে শেষ হয়েছে তা জানে না। ফের আসবে।

পানু সন্তর্পণে এগোল। মস্ত একটা শিমুল গাছ আছে ভিতরবাগে। তার যতদূর ধারণা, ওখানে গা-ঢাকা দিয়েছে।

পানু তাড়াহুড়ো করল না। বরং বেশ গুনগুন করে রামপ্রসাদী ভাঁজতে ভাঁজতে শুঁড়িপথটা ধরে দুলকি চালে এগোল। শিমুল গাছটার ডান ধারে বরাবর হয়ে আচমকা গোঁত্তা মেরে ঢুকে গেল বাঁশবনে। তারপর একদম মুখোমুখি।

মেয়েটা নড়ারও সময় পেলে না। একটু হাঁফাচ্ছিল।

তুমি! অ্যাঁ! তুমি তো দাক্ষী!

বছর সতেরো আঠেরোর মেয়েটা সভয়ে চেয়ে রইল পানুর দিকে।

এখানে কী করছিলে শুনি।

দাক্ষী হাঁফসানো গলায় বলে, কী করব, নিজের ইচ্ছেয় এসেছি নাকি?

তবে?

তোমরা সবাই যাকে ভয় খাও সেই দীনুই তো ধরে এনেছে আমাকে।

ধরে এনেছে মানে?

মানে চুলের মুঠি ধরেই একরকম টেনে বের করে এনেছে। আমার বাবার পেটে লাথি মেরেছিল। কী জানি কেমন আছে বাপটা। ভাইয়ের টি. বি. বলে বাবা টাকা নিয়েছিল। ধার। শোধ হয়নি।

বটে! তা এখানে কী করছিলে?

রাক্ষসটা যে আমাকে এ বাড়িতে রেখেছে চারদিকে নজর রাখার জন্য। কোথায় টাকাপয়সা গয়নাগাঁটি, কে কেমন এই সব খবর নিতে। আজ সকালে ডেকে পাঠিয়ে তোমার ওপর নজর রাখতে বলল।

কেন? কেন?

তোমার কাছে কেউ আসে কি না, কী কথা হয় সব খবর দিতে বলেছে। নইলে তো বুঝতেই পারছ।

পানু ভয়ে এবং শীতে কাঁপছিল। রীতিমতো হি-হি কাঁপুনি। কাঁপা গলাতেই বলল, বড্ড শীত করছে।

আমারও।

তা তোমাকে ধরে এনে ও কী করতে চায়?

মেয়েটা করুণ গলায় বলল, এখনও খারাপ কিছু করেনি। তবে কপালে যা আছে হবে। খারাপই হবে। হয়তো নিজে কিছুদিন কাছে রাখবে, তারপর গোহাটার গোরুর মতো বেচে দেবে। বাজারের মেয়ে হওয়া ছাড়া ভগবান আর আমার কপালে কী লিখেছেন?

ও বাবা!

শোনো। সাঁপুই গাঁ চেনো?

চিনি। কাছেই।

সেখানে গোপাল দাসের বাড়ি। আমার বাবা। কেমন আছে আমার বাপটার একটু খবর এনে দেবে? পেটে লাথিটা লেগে বড়ো কাতরাচ্ছিল।

রাতে দেখবখন চেষ্টা করে।

যদি এনে দাও খবরটা তা হলে আজকের কথা আমি গুণ্ডাটাকে বলব না। বুঝলে?

বুঝেছি।

কানুর মতো এ মেয়েটাও কাঁদল। বড়ো বড়ো চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়ছিল। কাঁদতে কাঁদতে ধরা গলায় বলল, আমি তো গেছিই, নিজের জন্য আর ভাবছি না। বাপটা ভাইটার যে কী হবে।

পানু মৃদুস্বরে বলল, হিম পড়ছে। ঘরে যাও। বেশিক্ষণ বাইরে থাকলে লোকে নানারকম সন্দেহ করতে পারে। যাও।

যাচ্ছি।

মেয়েটা চলে গেলে বাঁশবনে স্তব্ধ দাঁড়িয়ে রইল পানু। হাতপায়ের কাঁপুনি কমেছে, কিন্তু ভয়টা তার শরীরকে একেবারে কাঠ করে রেখেছে। কিছুক্ষণ পানু নড়তে পারল না।

বাঁশবনের ভিতর দিয়ে কারা আসছে। টর্চ জ্বলছে মাঝে মাঝে। কথা কইছে। যতীনবাবু হবে না। যতীনবাবু তো গেছেন হাওয়াগাড়ি চেপে। তাইতেই ফিরবেন। পানু কয়েক পা এগোল। তারপর দাঁড়িয়ে গেল। যতীনবাবুই। সঙ্গে বিভীষণ দীনু পাইক এবং আরও ক'জন। জমিজমা বিষয় আশয়ের কথাই হচ্ছে।

পানু আর এগোল না। দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল। অনেকক্ষণ ভাবল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ফিরে এল ঘরে।

ঘটনাটা ঘটল একটু বেশি রাতে। খেতে যাবে বলে ছয় চাকর তৈরি হচ্ছে। পাঁচু গাড়ু নিয়ে মাঠে গেছে। শ্রীপতি রান্নাঘর সেরে এসে হাতমুখ ধুচ্ছে। কেষ্ট টেমির আলোয় গোপালভাঁড় পড়ে শোনাচ্ছে সবাইকে। বেশ ফুর্তির ভাব।

হঠাৎ দীনু এসে ঘরে ঢুকল। বিশাল চেহারাখানা যেন ঘর ভরে দাঁড়াল।

পানুর দিকে রক্ত-জল-করা চোখে একটুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, কে এসেছিল তোর কাছে?

পানু থতমত খেয়ে বলল, কই!

জিব টেনে বের করে দেব। কে এসেছিল?

পানুর মাথাটা টাল খেল। দাক্ষীই কি বলে দিল শেষে? কথা দিয়েছিল, বলবে না।

পানু মাটির দিকে চেয়ে বলল, কানু!

বটে! কী পরামর্শ হল ভাইয়ের সঙ্গে?

হঠাৎ পানু একটু হাসল, বলল, দু'ভাইয়ে ঠিক করলুম জমিটা আমরা হাতছাড়া করছি না।

বটে! বলে একটা বাঘা গর্জন ছাড়ল দীনু।

পানু চমকাল না। উঠে দাঁড়াল। দাক্ষী কথা রাখেনি। সেইটে তার বড়ো মনে বাজছে। খিদেটা পেট থেকে খাঁ খাঁ করে উঠে আসছে বুকে। মনে পড়ছে, পারুল তাকে বিয়ে করবে না বলে সটকে পড়েছিল কার সঙ্গে। সব মিলেমিশে আজ পানুর মাথাটা বড়ো গোলমাল।

সে একেবারে সমানে সমানে দীনুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল, তুমি বড়ো বেচাল লোক হে। বড় পাপী। খুন করো, মেয়েমানুষকে ধরে আনো, লোকের জমিজমা কেড়ে নাও...

কথাটা শেষ হল না। দীনু একখানা থাপ্পড় তুলল। একেবারে আকাশসমান উঁচু।

পানু যতীনবাবুর বাড়ির বড়ো বড়ো মশারি আর কাপড় কাচে, খড় কুঁচোয়, ঘন্টার পর ঘন্টা কলপাড়ের শ্যাওলা তোলে, জন্মের শোধ ভাতের পাহাড় সাঁদ করায় ভিতরে। তার পা পাকিয়ে দড়ির মতো হয়ে গেছে ঠিকই। কিন্তু ভারি পোক্ত শরীর। শীতে গ্রীষ্মে রোদে জলে একেবারে সই। কোদাল কুড়ুলে তার চমৎকার হাত। মাঝারি মাপের পাটের দড়ি কতবার দায়ের অভাবে টেনে ছিঁড়েছে।

দীনুর চড়টা নামবার আগেই থাবড়াটা পানু কষাল।

সে এমন থাবড়া যা আর কহতব্য নয়।

দীনু পাইক চড়টা নামিয়ে নিরীহভাবে নিজের গালে হাত বোলাতে লাগল অবাক হয়ে। মুখে কথা নেই, এত অবাক।

পানু সমানে সমানে দাঁড়িয়েই রইল। বলল, আমরা বাবুর পেয়ারের চাকর নই, বুঝলে? খেটে খাই। আমাদের প্রাণের ভয় থাকলে চলে না।

দীনু দাঁতে দাঁত ঘষটাল। তারপর পটাং করে গায়ের গরম চাদরখানা খুলে ফেলে দিয়ে দুটো মুগুরের মতো হাত বাড়িয়ে চেপে ধরল পানুকে।

তারপর কী থেকে যে কী হল পানু তা বলতে পারবে না। কিন্তু লড়াইটা বেশিক্ষণ চলেনি। এক সময়ে সে দেখল, দেখে খুবই অবাক হল যে, সে অর্থাৎ পানু, দীনু পাইককে উপুড় করে ফেলে তার চুলের ঝুঁটি ধরে মাথাটা চৌকাঠে ঠুকছে আর বলছে, মর, মর, মরে যা।

শ্রীপতি পাঁচুরা এসে না ছাড়ালে দীনুকে মরতেই হত।

তবে মরার চেয়ে খুব কম হল না। দীনুকে গো-গাড়িতে তিন মাইল দূরের হাসপাতালে পাঠাতে হল রাত্রেই।

চাকরি যাবে। জেলও খাটতে হবে। সবই জানে পানু। ঘরে বসে সে বুটের শব্দের জন্য অপেক্ষা করছিল। তার চারদিকে পাঁচজন বাইরের চাকর। মুখ গম্ভীর, কথা নেই।

ঠিক এই সময়ে সত্যরামকে সঙ্গে নিয়ে যতীনবাবু ঘরে এসে ঢুকলেন।

তটস্থ হয়ে সকলে উঠে দাঁড়াল।

যতীনবাবুর মুখখানা গম্ভীর। সকলের দিকে একে একে চেয়ে দেখে সত্যরামকে জিজ্ঞেস করলেন, এদের মধ্যে কোনজন?

আজ্ঞে এই যে। বলে সত্যরাম তাড়াতাড়ি পানুকে দেখিয়ে দিল।

যতীনবাবু কাশ্মীরি শালের ভিতর থেকে তাঁর ডান হাতখানা বের করলেন, ঘরে হ্যারিকেনের আলো, তবে সে আলোতেও হিরের আংটি ঝিকিয়ে উঠল। আর কী ফর্সা হাত। সেই হাতে নিজের থুঁতনিটা খামোখা একটু চুলকোলেন যতীনবাবু। তারপর বললেন, ও। তারপর চারদিকটায় ঘুম-ঘুম চোখে একটু তাকিয়ে নিয়ে সত্যরামের দিকে চেয়ে বললেন, এ ঘরটায় একটা বিশ্রী গন্ধ। তাই না?

সত্যরাম বিনয়ের গলায় বলল, আছে। ছোটলোকদের ঘর তো--

যতীনবাবু তাঁর হিরের ঝলকানি তুলে এবার গলা চুলকোলেন। তারপর বললেন, আজ বড়ো ঠাণ্ডা, তাই না সত্যরাম?

আজ্ঞে, বেজায়।

যতীনবাবু যেন কথা খুঁজে পাচ্ছেন না এমনভাবে চারদিকে চাইতে লাগলেন। ঘরখানাই যেন দেখছেন। সামনে ছ'জন বশংবদ চাকর বাক্যহারা হয়ে দাঁড়িয়ে।

যতীনবাবু এবার জিজ্ঞেস করলেন, সত্যরাম, ওর নাম কী?

আজ্ঞে, পানু। এমনিতে খারাপ নয়। কাজ ভালোই করে। বিশ্বাসী।

কতদিন আমার কাজ করছে?

আজ্ঞে তা বছর পাঁচেক হবে বোধহয়?

যতীনবাবু একটু কাশলেন। এই সব হীন চাকরদের সঙ্গে তিনি কখনও কথা বলেননি। কীভাবে বলবেন তা বোধহয় ভেবে পাচ্ছিলেন না। তাই অসহায়ের মতো সত্যরামের দিকে চেয়ে বললেন, ওর কি আমাকে কিছু বলার আছে সত্যরাম? ও কথা বলছে না কেন?

সত্যরাম শশব্যস্তে বলল। বলবে আবার কী আজ্ঞে? কথাটথা তো বিশেষ বলতে শেখেনি। ভদ্রলোকদের সঙ্গে কথা বলতে ভয় খায়। ওরে ও পানু, বাবুকে কিছু বলবি?

পানু মাথা নাড়ল। তার কিছু বলার নেই।

ও কত মাইনে পায় সত্যরাম?

আজ্ঞে, আশি টাকা। এ বাজারে কম নয়। খাওয়া মেলা। হরেদরে পাঁচ সাত শোই পড়ে যায় আজ্ঞে।

যতীনবাবু গলা খাঁকারি দিয়ে ঘরের চালের দিকে চেয়ে বললেন, পুলিশ অবশ্য আসবে। ও পুলিশকে কী বলবে সত্যরাম?

সত্যরাম শশব্যস্তে পানুর দিকে চেয়ে বলল, ওরে ও ডাকাত, বাবুর কথাটা কানে গেছে না কি?

পানু মাথা নাড়ল। গেছে।

একটা কিছু বলবি তো!

পানু মেঝের দিকে চেয়ে রইল। কথা বলল না।

যতীনবাবু একটা হাই তোলবার চেষ্টা করলেন। পারলেন না। বাতাসটা কান দিয়ে বেরিয়ে গেল। তিনি কানের ফুটোয় আঙুল দিয়ে একটু নাড়া দিলেন। তারপর পানুর দিকে চেয়ে বললেন, আমার বড়ো বিপদ হে।

পানুর সঙ্গে মনিবের এই প্রথম চোখাচোখি। পানুর অবশ্য ভয়ডর কেটে গেছে। ভক্তিমান্যির ভাবটাও আর নেই। তবে যতীনবাবুর ভয়টা কীসের তা সে ভালো বুঝতে

পারল না।

যতীনবাবু তাঁর নাকের ডগাটা চেপে ধরলেন একটু। তারপর বললেন, পুলিশ অনেক কথা জানতে চাইবে বাপু। দীনু যে আমার চাকর ছিল সে কথাটা ওদের বলা ঠিক হবে না। ওর নামে হুলিয়া আছে। তা, ইয়ে, আমি বলছিলুম কি, তোমাকে আমি আমার পাইক করে নিচ্ছি। তিনশো টাকা--কী বলিস রে সত্যরাম, তিনশো কি কম হচ্ছে?

আজ্ঞে না।

আর অন্য সবাইকেও বিশটাকা করে বাড়িয়ে দিস।

যে আজ্ঞে।

যতীনবাবু পানুর দিকে চেয়ে বললেন, তোমাকে আমি দেখব। তুমিও একটু আমাকে দেখো। পুলিশ জিজ্ঞেস করলে বোলো, দীনুকে এ বাড়িতে কখনো দেখনি। ও ডাকাতি করতে ঢুকেছিল, তুমি রুখেছ। মনে থাকবে কথাটা।

পানু জবাব দিল না। চেয়ে রইল।

যতীনবাবু আঙুলের হিরের ঝলমলানি তুলে কপাল থেকে একটা মশা তাড়ালেন। কাহিল গলায় বললেন, বটকেষ্ট বলেছিল, দীনুর হাতে কবচ আছে, যমেও নাকি ওর সঙ্গে এঁটে ওঠে না। তা দেখছি তুমি যমের ওপর দিয়ে যাও। আমিও একটু শক্তপোক্ত লোক খুঁজছি। সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। টাকাপয়সা নিয়ে চলাফেরার বড়ো বিপদ আজকাল।

জীবনে প্রথম মনিবের সঙ্গে কথা বলল পানু। কিন্তু যেমনটি বলার কথা তেমনটি তার মুখ দিয়ে বেরোল না। পেট থেকে যে আপনা আপনিই বেরিয়ে এল, আজ্ঞে, বাবুমশাই, চাকর হয়ে আর থাকা চলে না।

যতীনবাবু ভারি অবাক। কেন?

আজ্ঞে, চাকর হয়ে থাকলে নিজেকে ঠিকমতো চেনা যায় না কিনা।

যতীনবাবু একটু অপ্রস্তুত। হিরেসুদ্ধ হাতটা শালে চাপা দিয়ে বললেন, তোমার বোধহয় খুব অযত্ন হয়েছে এ বাড়িতে?

আজ্ঞে, তাতে ভালোই হয়েছে। ভগবান ভালোই করেন। তবে আমার আর চাকর হয়ে থাকতে ইচ্ছে যাচ্ছে না। আমি বাড়ি যাব।

যতীনবাবুর ফর্সা মুখটা একটু লাল হল। সত্যরামের দিকে চেয়ে বললেন, ওকে পাঁচশো করেই দিস রে সত্যরাম। আর চাকরের মতো নয়, বাড়ির ছেলের মতোই থাকবে।

যে আজ্ঞে।

পানু একটু হাসল, তারপর চাকরের পক্ষে বেমানান গলায় বলল, আজ্ঞে না বাবুমশাই। আপনার অনেক নুন খেয়েছি। পুলিশকে যা বলার বলবখন। ও নিয়ে ভাববেন না। আমার কিছু টাকা জমেছে। দেশে গিয়ে ঘর তুলব। দু'ভাইয়ে থাকব।

যতীনবাবুর হিরে আবার চমকাল। উনি হাঁটু চুলকোলেন।

পানু বলল, টাকাপয়সা নয় বাবুমশাই, তবে একটা জিনিস চাই। দাক্ষী যদি রাজি থাকে তবে ওকে নিয়ে যাব। বে করব।

যতীনবাবু অবাক হয়ে সত্যরামের দিকে তাকালেন, দাক্ষী কে?

নতুন একটা ঝি আজ্ঞে। ভারি কাঁদুনে। সারাদিন কাঁদে।

যতীনবাবু ভ্রূ কুঁচকে বললেন, একে বিয়ে করতে রাজি হবে?

খুব হবে আজ্ঞে। ওর বাপ রাজি হবে।

ভোরবেলা কুয়াশায় মাখা খেতের ভিতর দিয়ে আগুপিছু দুটি প্রাণী এগিয়ে চলেছে। দু'জনেরই বগলে পুঁটুলি।

মাঝে মাঝে ফিরে চাইছিল পানু। ছুঁড়িটা পিছিয়ে পড়ছে বারবার।

দাক্ষী চোখ নামিয়ে নিচ্ছিল লজ্জায়। মরণ! গুণ্ডাটা তাকাচ্ছে দেখ, যেন গিলে খাবে।

দু'জনেরই আজ মনে হচ্ছে, আকাশটা কত বড়ো! পৃথিবীটা কী বিশাল! আর বেঁচে থাকাটা কত ভালো!

সবুজ বিড়াল

সবুজ বেড়ালটা যখন লাফিয়ে জানালার তাকে নেমে এসে দুই জ্বলন্ত চোখে আমার দিকে তাকাল, ঠিক তখনই মিলি দরজা খুলে ঘরে আসে।

কোনটা আমার নিয়তি তা আমি সঠিক জানি না। কিন্তু আমার সারা শরীরে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিদ্যুৎ-তরঙ্গ বয়ে যেতে লাগল।

মিলি দরজার চৌকাঠে থমকে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল জানালার দিকে। সবুজ বেড়াল। হ্যাঁ, সবুজ বেড়ালের কথা সে জানে।

বেড়ালটা অবশ্য মিলিকে লক্ষ ও করছিল না। তার তো মিলির সঙ্গে প্রয়োজন নেই। সে চেয়ে আছে আমার দিকে। বিশাল এক শূন্যতার পরপার থেকে তার যাত্রা কেবলই আমাকে লক্ষ করে। কেবলই আমাকে, অনন্ত আকাশ পাড়ি দিয়ে সে আজ পৌঁছে গেছে আমার জানালায়।

এরকমই কথা ছিল। তবু খুব ধীরে ধীরে মিলি তার মুখ ফেরাল আমার দিকে। তার দুই চোখের দৃষ্টি যেন মাঝ-দরিয়ার স্রোতের ভিতরে মাল্লাহীন টালমাটাল নৌকো।

মিলি পৃথিবীর মেয়ে। তাকে আমার কিছু বলার নেই। নিজের লম্বা চুলের মধ্যে আঙুল দিয়ে আমি আমার ফাইবার অ্যানটেনা ক্রিয়াশীল করে তুলি। তারপর সবুজ বেড়ালের চোখের দিকে তাকাই।

একরাশ ঝোড়ো শব্দ এসে ধাক্কা দেয় আমার অ্যানটেনায়। এক অদ্ভুত গমগমে যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর জিজ্ঞেস করতে থাকে, তুমি ভালো আছো? কোনো জীবাণু তোমাকে আক্রমণ করেনি তো। খাদ্যে কোনো বিষক্রিয়া? তেজস্ক্রিয়তা? জলের বিষ? যুদ্ধ? প্রেম?

আমি আমার আংটিশুদ্ধ আঙুলটা মুখের কাছে তুলে আনি। মৃদুস্বরে বলি, আমি ভালো আছি। সুস্থ ও সবল। দ্বিধাহীন।

চমৎকার। আমরা জানতাম তুমি যথেষ্ট সহনশীল। কোনো কাজ বাকি রয়ে যায়নি তো।

না।

চারশো মাইল ওপরে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে মহাকাশযান। সংকেত পাঠানো মাত্র আমাদের আবরণরশ্মি তোমাকে ঢেকে ফেলবে। চৌম্বক রশ্মি টেনে আনবে মহাকাশযানে। তার আগে তোমার স্পেসস্যুট পরে নিতে ভুলো না।

ভুলব না।

আমি আংটিটা সরিয়ে নিই। মিলির দিকে তাকাই। মিলি রোগা, কালো। মোটেই সুন্দর নয়। শুধু তার চোখ দুখানা বড়ো গভীর। আমি গভীর চোখের কোনো মর্ম জানি না। নীহারিকা পুঞ্জের ভিন্ন এক পরিমণ্ডলে যে গ্রহে আমার বাস সেখানে এরকম কোনো চোখ নেই। তবে দেবীর মতো সুন্দরীরা আছে।

আমি হাসিমুখে মিলির দিকে দুহাত বাড়িয়ে ডাকলাম, মিলি।

রোজকার মতো মিলি এগিয়ে এল না। দুই অস্থির চোখ আমার দিকে নিবদ্ধ রেখে বলল, তোমার সেই সবুজ বেড়াল?

আমি মাথা নাড়লাম।

মিলির হাতে একটা সেলাই। কিছু দিন যাবৎ সে আমার জন্য একটা সোয়েটার বুনছে। নীল রঙ। মাঝে মাঝে কিছুটা বোনা হয়ে গেলে সে সেটা আমার শরীরের সঙ্গে লাগিয়ে মাপ নিয়ে যায়। অসমাপ্ত সেই সোয়েটার কাঁটা সমেত খসে পড়ে গেল মেঝেয়।

দৃশ্যটা তথ্য হিসেবে চমৎকার। এই গ্রহের মানুষদের প্রতিক্রিয়া কত দ্রুত কত সহজ ও নাটকীয়। আমাদের গ্রহে এরকম কখনো দেখা যায় না। দৃশ্যটা দেখে আমি বিদ্যুৎ বেগে আমার মাছের আঁশের মতো পাতলা রেকর্ডারটা আমার রগের পাশে চেপে ধরি। আমার চোখে দেখা, কানে শোনা, আমার প্রতিটি ক্রিয়া ও প্রক্রিয়া এই ছোট্ট রেকর্ডারের পরতে

পরতে নথিভুক্ত হতে থাকে। আমাকে কোনো নোট নিতে হয় না, কিছু মনে রাখতে হয় না। সরাসরি আমার মস্তিষ্কের স্পন্দন থেকে রেকর্ডার তার যাবতীয় তথ্য নিয়ে নেয়।

মিলি দু হাতে মুখ ঢেকে ফোঁপাতে লাগল। আমি নানান ঘটনায় মিলিকে কয়েকবারই কাঁদতে দেখেছি। তার যখন মন খারাপ হয়, যখন কেউ অপমান করে বা তার অভিমান হয় তখন সে কাঁদে।পৃথিবীর অভিধানে কান্না, অভিমান ও অপমান শব্দগুলির অর্থ আমি খুঁজে দেখেছি। কিন্তু কিছুই বোধগম্য হয়নি। গত এক বছর ধরে আমি মিলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করেছি। সে যখন ঘুমিয়েছে তখন তার শরীরে ইনফর্মেশন পিন লাগিয়ে আমি সরাসরি তার অভ্যন্তর থেকে সব কথা টেনে বের করেছি। রাতের পর রাত জেগে বিশ্লেষণ করেছি। অনেক কিছুই দুর্বোধ্য রয়ে গেছে। মিলি ভালোবাসা নামক অদ্ভুত এক শব্দ ব্যবহার করে। শব্দটা সম্পর্কে আমার গ্রহের বৈজ্ঞানিকরাও আমাকে সচেতন করে দিয়েছিলেন। ব্যাপারটা কীরকম তা আমি এখনও স্পষ্ট বুঝিনি। একজন মানুষকে ছাড়া একজন মহিলার জীবন বৃথা বলে মনে হবে এ কেমন কথা। কিংবা সেই মহিলাকে দেখলে সেই পুরুষটির হৃৎপিন্ড দ্রুততর চলবে, রক্তস্রোত উদ্দাম হবে, ওটাই বা কোন নিয়ম? আমাদের এরকম কোনো অভিজ্ঞতা নেই।

আমি আড়ষ্ট গলায় জিজ্ঞেস করি, মিলি কাঁদছো কেন?

মিলি তার সজল তীব্র দুখানা চোখে আমার দিকে চেয়ে বলে, কেন জানো না?

আমার তো একদিন চলে যাওয়ার কথা মিলি।

কেন চলে যাবে? কেন আমরা একসঙ্গে থাকতে পারব না আর? তুমি আমার স্বামী নও? আমি নয় তোমার বউ?

এ সবই সত্য। মিলির মতানুসারে বাস্তবিকই আমি ওর স্বামী। পৃথিবীর এক মানবীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করার নির্দেশ ছিল আমার ওপর। আমি সেই নির্দেশ বিশ্বস্ততার সঙ্গে পালন করার চেষ্টা করেছি। পরিচয় হওয়ার কিছুদিন পরই মিলি আমাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কি বিয়ে করবে না আমাকে?

বিয়ে জিনিসটা কী তা আমি তাকে জিজ্ঞেস করি। সে খুব হাসতে থাকে এবং অবশেষে যা বলে তা শুনে আমি অবাক। নারী ও পুরুষের অবাধ সম্পর্ক এরা জানে না। এরা তাতে নানা গ্রন্থি সংস্কার ও মন্ত্র আরোপ করতে ভালোবাসে। ভারি ছেলেমানুষি সব প্রক্রিয়া। কিন্তু মিলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা অর্জন করার জন্য আমি সেই প্রক্রিয়া স্বীকার করে নিই। হ্যাঁ, পৃথিবীর নিয়ম অনুসারে ও আমার স্ত্রী আমি ওর স্বামী কিন্তু মহাকাশে তো এ নিয়ম নেই, আমি স্বস্তির শ্বাস ফেলি।

মিলি আস্তে আস্তে এগিয়ে আসে আমার কাছে। আমার অ্যানটেনায় মৃদু নানা শব্দ এসে আঘাত করতে থাকে চারশো মাইল ওপরে মহাকাশে আমাদের আকাশি খেয়ায় চলছে নানা আয়োজন। একটু পরেই শুরু হবে কাউন্ট-ডাউন। তার আগে আমাকে পরে নিতে হবে মাধ্যাকর্ষণ নিরোধ জুতো স্পেস-স্যুট। খুব বেশি সময় হাতে নেই।

মিলিকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে আমি এই গ্রহে শেখা কিছু কথা বলে যেতে থাকি। সবই ভালোবাসার কথা। যদিও আমি এসব কথার অর্থ জানি না তবু আউড়ে যেতে আমার অসুবিধা হয় না। রেকর্ডার সবই নথিভুক্ত করে নিচ্ছে। মিলির চোখের জলে কী ধরনের কতটা রাসায়নিক মিশে আছে, কান্নার সময় ওর হৃৎপিণ্ডের গতি, রক্তচাপ, মস্তিষ্ক কোষের প্রসারণ ও শরীরের অন্যান্য প্রক্রিয়া।

সবুজ বেড়ালটা জানালার তাকে একটু সরে বসে। আমার চোখের দিকে জ্বলজ্বলে চোখে চেয়ে থাকে। তার শরীরে একটা যান্ত্রিক ঢেউ।

মিলি আমার বুকে দু-হাতের ছোটো মুঠিতে কিল মারতে মারতে রুদ্ধ গলায় জিজ্ঞেস করে, কতদূরে চলে যাবে তুমি, কত দূরে।

খুব বেশি দূরে নয় মিলি।

তবু তো কয়েক হাজার আলোকবর্ষ।

আমি হাসলাম। আলোকবর্ষ দিয়ে দূরত্ব মাপবার প্রাচীন রীতি এখনও এই গ্রহে প্রচলিত। এরা জানে না বিপুল প্রসারণশীল এই মহাকাশে আলোকবর্ষ অত্যন্ত ছোটো মাপকাঠি।

ওর পিঠে হাত বুলিয়ে আমি বলি, দূরত্বটা কোনো সমস্যা নয় মিলি?

আর ফিরবে না? কোনোদিন না?

ফিরতেও পারি। হয়তো তখন পৃথিবীর কয়েক হাজার বছর কেটে যাবে।

কয়েক হাজার। আমি তো তখন থাকব না।

মানুষ থাকবে মিলি।

কিন্তু আমি! আমি তো তোমাকে দেখতে পাবো না আর।

আমি একটু বিরক্ত হয়ে বলি, কয়েক হাজার বছর বেঁচে থাকা কিছু শক্ত নয় মিলি। তোমরা যে কেন পারো না।

মিলি অসহায় মুখ তুলে বলে, আমরা যে বুড়ো হই, মরে যাই।

কথাটা সত্য। এই গ্রহে মানুষের আয়ু বড়ো ক্ষণস্থায়ী। আমাদের গ্রহে যেমন মানুষের প্রায় অফুরন্ত আয়ু ও যৌবন, এখানে তেমন নয়। আমাদের গ্রহে একটি ফুল ফুটলে একশো বছর ফুটে থাকে, এখানে ভোর না হতেই ঝরে যায়।

মিলি তার মুখখানা আকুল ভাবে তুলে থাকে আমার মুখের দিকে। ফিসফিস করে বলে, দেবদূত, স্বামী, প্রিয়তম, আমাকে কয়েক হাজার বছরের আয়ু দাও। আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব।

এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। পৃথিবীর এই মানবী শুধুমাত্র তার নির্দিষ্ট পুরুষটিকে ফিরে পাওয়ার জন্য কয়েক হাজার--মাত্র কয়েক হাজার বছরের আয়ু চায়।

আমি পৃথিবীর নিয়ম অনুসারে মিলির মুখ চুম্বন করি। ভয় নেই। আমার ঠোঁটে লাগানো আছে অতি মসৃণ জীবাণুনাশক। আমি যথাসম্ভব গদ গদ স্বরে বলি তোমাদের গ্রহটি কিছু কম সুন্দর নয় মিলি। চমৎকার পুরুষেরা আছেন। তুমি একা বোধ করবে না বেশিদিন।

মিলি আকুল হাতে আমাকে এত জোরে চেপে ধরে যে, আমার যান্ত্রিক হৃৎপিণ্ড টুং করে একটা বিপদ সংকেত জানায়।

সবুজ বেড়ালটা তার থাবার দিকে চেয়ে আছে। আমি জানি ওই থাবায় একটি ছোট্ট ডিজিটাল যন্ত্রে মহাকাশে গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান ধরা পড়ছে। ধরা পড়ছে আকাশি খেয়ার গতি ও প্রকৃতি।

সময় নেই। আর সময় নেই।

মিলি মুখ তুলে বলে, আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাও। আমি তোমাকে ছাড়া কী আর বাঁচব?

আমাদের এরকম কোনো সমস্যা নেই। আমরা একে আর একজনকে ছাড়া দিব্যি বেঁচে থাকতে পারি। কিন্তু সে কথা বলা যায় না। বললে মিলি দুঃখ পাবে।

দুঃখ, এই পার্থিব শব্দটাও আমার নতুন শেখা। কিন্তু লক্ষ করেছি পৃথিবীর মানুষ খুব বোকার মতো দুঃখ পায় এবং কখনোসখনো গাড়লের মতো সুখও বোধ করে।

আমি গাঢ় স্বরে মিলিকে বলি, মিলি পৃথিবী থেকে কাউকে নিয়ে যাওয়ার নিয়ম নেই। আমাদের গ্রহের পরিবেশ অন্য রকম।

কীরকম, যেখানে তুমি থাকতে পারো সেখানে আমি পারব না?

না মিলি, তোমাদের তুলনায় সে অনেক নিষ্ঠুর জায়গা।

সবুজ বেড়ালের চোখে নীল সংকেত এল। কাউন্ট-ডাউন শুরু হতে আর কয়েক সেকেন্ড মাত্র বাকি।

মিলিকে ছেড়ে আমি দ্রুত আমার জুতো আর স্পেসস্যুট পরতে থাকি। মিলি মেঝেয় পড়ে কাঁদে। বীজাণুতে ভরা, নোংরা, গন্ধময় যুদ্ধ ও ভয়ে ভারাক্রান্ত এই ছোটো গ্রহটিতে আমার প্রবাস শেষ হয়ে এল। স্বর্গের মতো পবিত্র ও সুন্দর আমার জননী গ্রহে আমি ফিরে যাচ্ছি।

সবুজ বেড়ালটা আমার দিকে তাকাল। ডান পা তুলে নিজের গলা আঁটা বকলশে একটা সুইচ টিপে দিল সে। তার চোখ থেকে অদৃশ্য এক রশ্মি এসে আমাকে ঘিরে ধরল।

আমি ধীর দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়ে জানালার বাইরে আমার শরীর ভাসিয়ে দিই। বহু দূর থেকে এক চৌম্বক রশ্মি আমাকে বিদ্ধ করে তারপর টেনে নিতে থাকে।

দুঃখ বা বিষাদ, প্রসন্নতা বা ক্ষোভ কিছুই আমি বোধ করি না।

মহাকাশযানে এক তদন্তকারী অফিসার আমাকে নানা প্রশ্ন করছিলেন।

পৃথিবীর কিছুই তোমাকে স্পর্শ করেনি তাহলে?

না।

ধুলো বা জীবাণু?

না।

তেজস্ক্রিয়তা?

না।

অফিসার মৃদু একটু হাসলেন। বললেন, প্রেম নামে একটা ছোঁয়াচে মানসিকতা আছে এইসব প্রাচীন গ্রহে। জানো?

শুনেছি।

তোমাকে স্পর্শ করে না?

আমি চুপ করে থাকি। তারপর মাথা নাড়ি।

না, আমাকে তেমন কিছু স্পর্শ করে না। তবে আমার আবার ফিরে যাওয়ার একটা ইচ্ছে হচ্ছে। খুব ইচ্ছে হচ্ছে, গিয়ে দেখে আসি, একজন মানবী আমার জন্য, শুধু আমার জন্য, শুধু আমার বিরহে কাঁদছে আর কাঁদছে।

অফিসার উচ্চকণ্ঠে হাসলেন।

আমার কিন্তু হাসি পেল না।

শিবুচরণের সমস্যা

ট্রামরাস্তা পার হওয়ার জন্য শিবুচরণ ফুটপাথের ধারে দাঁড়িয়েছিল। আকাশে শরতকালের হালকা মেঘের দিকে এক পলক তাকাল, ডানধারের ল্যাম্পপোস্টের গায়ে চৌকো বাক্সে সিনেমার পোস্টার, উলটোদিকে একটা পানের দোকানে আঁকাবাঁকা আয়না--এ সবকিছুর ওপর তার চোখ ঘুরে ঘুরে যাচ্ছিল। বিকেল। চারিদিকে অফিস ফেরত রাগী আর বিরক্ত মানুষের ভিড়। চলন্ত ট্রাম-বাসের ফাঁকে একটা সময়ের ফোকর পেয়ে রাস্তা পেরোতে পা বাড়াতে যায় শিবুচরণ আর ঠিক সেই সময়ে তার নাকের ডগা ভয়ংকর চুলকে ওঠে। বে-খেয়ালে রাস্তা পার হতে হতেই সে নাক চুলকোবার জন্য হাত তোলে, তারপরই তার খেয়াল হয়--আরে! দুপাশ থেকে দুটো ট্রাম আসছে তবু শিবুচরণ সেইখানেই থমকে দাঁড়িয়ে মনে মনে নিজেকে ধমক মারে খবরদার শিবুচরণ! খবরদার শিবুচরণ! খবরদার! ট্রামের ঘন্টি পাগলা ঘন্টির মতো বেজে ওঠে, নাকের দু-ইঞ্চি দূর থেকে হাত সরিয়ে নেয় শিবুচরণ, তারপর হন্তদন্ত হয়ে রাস্তা পার হয়ে বাসস্টপে এসে দাঁড়ায়। হাঁপাতে থাকে। অল্পের জন্য বেঁচে গেছে সে, খুব অল্পের জন্য। দুখানা হাত সে পাশাপাশি চোখের সামনে ধরে--স্বাভাবিক দুখানা হাত। কালো চামড়া হাতের তেলোর রং কালচে, মোটা আর বাঁকা আঙুল খেয়ে যাওয়া নখ। যেমন ছিল তেমনই এখনও হুবহু আছে তার হাত দুখানা, তবু শিবুচরণ জানে দেখতে একরকম হলেও তার হাত দুখানা আর সেরকম নেই। আজ সকালেও সে গা চুলকেছে, তার বাচ্চা ছেলেটার মুখের লালা আঙুল দিয়ে মুছেছে, ভাত মেখে খেয়েছে, চোখ কচলেছে। তবু সে হাতে আর এ হাতে এখন অনেক তফাত।

বাস আসছে, ঝুলন্ত লোকজন। স্টপের লোকেরা চনমনে, উচাটন। শিবুচরণ সন্তর্পণে তার বাঁ হাতখানা জামার পকেটে রেখে দিল। ডান হাতখানা বাড়াল বাস-এর হ্যান্ডেলের জন্য।

প্রবল ভিড়। শিবুচরণ বাইরে ঝুলছিল, একটা পা মাত্র পা-দানিতে এক হাতে হ্যান্ডেল ধরা। হাওয়া বাতাস গায়ে লাগে শিবুচরণের, ঝুলতে ঝুলতেও ঘুম পেয়ে যায় তার। থুতনিতে একটা মাছি এসে বার বার বসছে কি? না, এত হাওয়ায় মাছি কোথায়! তবু সুড়সুড়ির মতো কি একটা যেন টের পায় শিবুচরণ, বাঁ হাত তুলে এনে বাঁকা নখে চুলকোতে যায় আবার বে-খেয়ালে। সঙ্গে সঙ্গে যাত্রার বিবেকের মতো মন ধমক মারে, খবরদার শিবুচরণ! খবরদার! চমকে হাত সরায় শিবুচরণ, পকেটে না রেখে হাতখানাকে যথাসম্ভব দূরে রাখবার জন্য মেলে দেয় বাইরের দিকে। একটুর জন্য সেই হাতখানার চড় খেতে খেতে বেঁচে যায় একটা কনস্টেবল। বেকুবের মতো আবার হাতখানা পকেটেই রাখে সে।

বাস এগোয়। দুটো একটা করে লোক নামে। ঠেলে ঠুলে ঢুকে যায় শিবুচরণ, ভীড়ের মধ্যে ইঁদুরের মতো গর্ত খুঁড়ে এগোয়। গরম। লোকজনের শ্বাস গায়ে লাগে। শিবুচরণ উঁকি মেরে লোকের টিকিট দেখবার চেষ্টা করে। যতদূর দেখে, যারা বসে আছে তাদের মধ্যে ত্রিশ পয়সার টিকিটওয়ালা অল্প পাল্লার যাত্রী নেই কেউ। সেই জগুবাজার, ভবানীপুর, কালীঘাটের আগে নড়বে না কেউ।

রড ধরে দাঁড়াতে একটু কষ্ট হয় তার। সে বেঁটে। ঠিকমতো রড ধরে দাঁড়ালে তার পা বাসের মেঝেয় পৌঁছায় না, তাই সে কাত হয়ে একটা সিট-এর পিছনের দিকটায় হাত রাখল। পায়ের পাতা প্রসারিত করে কোনোক্রমে মেঝেয় রাখল পা। সামনে বসে থাকা লোকটা ঘাড় ঘুরিয়ে শিবুচরণের এই কসরত দেখতে দেখতে হঠাৎ বলে, আরে! শিবুদা না!

গরমে, ঘামে, লোকের শ্বাস প্রশ্বাসে শিবুচরণের কেমন সব ধোঁয়াটে লাগছিল, সে ফ্যাল ফ্যাল করে লোকটার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে চিনতে পারে বল্টু!

লোকটা এক গাল হাসে, অ্যাই, ঠিক! বছর চারেক দেখা নাই, কোথায় থাক তুমি!

বাস ঝাঁকুনি খেলে শিবুচরণের শরীর রড ধরে অল্প দুলে ওঠে। তাই দেখে বল্টু বলে, রড ছেড়ে দাও না, তুমি বেঁটে সেঁটে মানুষ, অতদূর হাত যায় কি! ছেড়ে দাও, পড়বে না, পড়ার জায়গা নেই।

বল্টু বড়ো জোরে কথা বলে, শিবুচরণ লজ্জা পেয়ে রড ছেড়ে দেয়। দু চারজন লোক তাকে ভিড়ের মধ্যে উঁকি ঝুঁকি মেরে দেখছে।

বল্টু উঠি উঠি ভাব দেখায়, তুমি বরং বোসো শিবুদা, আমি দাঁড়িয়ে যাই একটু।

শিবুচরণ সঙ্গে সঙ্গে বল্টুর কাঁধ চেপে ধরে তাকে আবার বসিয়ে দেয়, দূর দূর, এ তো রোজকার ব্যাপার। বল্টুর কাঁধে হাত রাখতেই হঠাৎ শিবুচরণের আবার নিজের হাতের কথা খেয়াল হয়। চট করে হাতটা সরিয়ে নিয়ে একবার তাকিয়ে দেখে।

বল্টু জিজ্ঞেস করে, কোথায় কাজ করছ তুমি! শুনেছিলাম বইয়ের দোকানের কাজ ছেড়ে দিয়েছো।

শিবুচরণ গম্ভীর হয়ে বলে, বইয়ের দোকানের পর আরও কতো কি করলুম তিনবছরে। দুমাস এ্যাপ্রেন্টিস থাকলুম এক কারখানায় ভালো লাগল না। সিনেমা হলে কিছুদিন ছিলুম গেটকীপারে, তারপর নিজের একটা ব্যবসাও খুলেছিলুম, মার খেয়ে গেল।

বল্টু চোখ বড়ো করে বলে, বটে! তা এখন?

আবার ভীষণ নাক চুলকে ওঠে তার, শিবুচরণ গম্ভীর ভাবে জবাব দেয়, মাস দেড়েক হল এক ওষুধের দোকানে ঢুকেছি। ডাক্তারবাবু বড়ো ভালোবাসেন আমায়, বলেছেন কম্পাউন্ডারি শিখিয়ে দেবেন। কিন্তু... বলে সে থেমে যায়। ভিড়ের ধাক্কায় বল্টুর সিট-এর কাছ থেকে একটু সরে যায় শিবুচরণ, আবার ঠেলেঠুলে ফিরে আসে। শিবুচরণ গলা নামিয়ে বলে, আমার ডাক্তারবাবু একটু পাগলা আছে, বুঝলি বল্টু। নিজেই নানা রকম ওষুধ-বিষুধ তৈরি করে, ল্যাবরেটরি আছে নিজের। খুব নাম ডাক। আমার কাজ সেই ল্যাবরেটরিতে।

বল্টু শিবুচরণের কথায় মাথা নাড়ে, গুণী লোকের সঙ্গে আছো।

নাক চুলকে ওঠে আবার, চনমন করে শিবুচরণ বে-খেয়ালে পাশে দাঁড়ানো আধবুড়ো লোকটার পিঠের ওপর একবার নাকটা ঘষবার চেষ্টা দেখে। সুবিধে হয় না, এক ধাক্কায় মুখটা ভদ্রলোকের পিঠে ধেবড়ে পড়ে।

বল্টু দেখে শুনে বলে, দাঁড়িয়ে তোমার সুবিধে হচ্ছে না শিবুদা, ঘুড়ির মতো লাট খাচ্ছ। বরং বোসো আমার জায়গায়, আমি একটু দাঁড়িয়ে যাই।

শিবুচরণ বাধা দেয় আবার, ও কিছু না, তুই যাবি কদ্দুর? পশ্চিম পুঁটিয়ারিতেই আছিস তো এখনও।

বল্টু হাসে, যাবো আর কোথায়।

বল্টুর পাশের ছিমছাম চেহারা ভদ্রলোক উঠি উঠি করলেন, শিবুচরণ, জ্বলজ্বলে চোখে চেয়ে রইল! হ্যাঁ উঠলেনও, বাস বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম ছাড়াতেই উঠলেন ভদ্রলোক, শিবুচরণ মহা সোরগোল তুলে জনা দুয়েককে ধাক্কা মেরে বসে পড়ে হাসল। ভ্রূর ওপরটা চুলকে নিতে গিয়ে থেমে যায় শিবুচরণ। মনের সেই ধমক শুনতে পায়, অ্যাই শিবুচরণ। হাসি নিস্তেজ হয়ে আসে। বলে, বুঝলি বল্টু এমন একখানা কাণ্ড হল আজ।

বল্টু জানালার দিকে সরে বসেছে, পিছনে ঘাড় ঘুরিয়ে কি দেখছিল, শিবুচরণের কথা না শুনে বলল, শিবুদা, বাড়িখানা দেখেছো। পনেরো তলা হয়ে এল। আমি রোজ গুনে যাচ্ছি। আঠারো তলা হয়ে গেলে যা কাণ্ড হবে একখানা।

শিবুচরণ সকলের চোখ এড়িয়ে একবার চট করে নিজের হাত দুখানা দেখে নেয়। বল্টু চোখ ফেরাতেই বলে, আজ যা কাণ্ড হল না রে বল্টু।

বল্টু ভ্রূ একটু তুলে বলে, তুমি কিন্তু একটু বুড়োটে মেরে গেছো শিবুদা।

শিবুচরণ হাসে, তা বয়সও... বলতে বলতে শিবুচরণ টের পায় গোটা চারেক মশার হুল যেন ফুটেছে নাকের ডগায়। চুলবুল করে ওঠে নাক, অস্থির হয়ে শিবুচরণ জামার হাতায় নাক ঘসে। বল্টু চেয়ে দেখে, হল কী!

শিবুচরণ করুণ চোখে চায়--বলবে নাকি একবার নাকটা একটু চুলকে দিতে!

শিবুচরণ আড়চোখে নিজের শক্ত হাত দুখানার দিকে চায়। বিপজ্জনক দুখানা হাত এত কাছাকাছি দেখতেও তার ভয় করে।

বল্টু বলে, ছটফট করছ কেন? নামবে তো সেই আনোয়ার শার মোড়ে--তার ঢের দেরি। তুমি কি আগেই নামবে কোথাও কাছেপিঠে?

মাথা নাড়ে আর বলে--না, সে নামবে না। বাস জগুবাজার ছাড়িয়ে যাচ্ছে, একটা স্টপে ধরল না, বাইরে ভিতরে কিছু লোক হই হই করে ওঠে। বল্টুর মন সেই দিকে।

শিবুচরণ হঠাৎ গলা নামিয়ে বল্টুর কানের কাছে বলে, বল্টু, একবার চুপি চুপি আমার নাকের ডগাটা চুলকে দিবি?

বল্টু আঁতকে ওঠে প্রায়, অ্যাঁ! শিবুচরণ কাতর চোখে চেয়ে বলে, অনেকক্ষণ চুলকোচ্ছে রে শালা, হাত নোয়াতে পারছি না।

বল্টু অস্বস্তিতে নড়ে চড়ে বসে, ব্যাপার কি শিবুদা, এতকাল পরে দেখা, দুচারটে ভালোমন্দ কথা হবে, তুমি কিনা বলছ নাক চুলকে দিতে।

বড়ো লজ্জা পায় শিবুচরণ, বল্টুটার দোষ ওই চেঁচিয়ে কথা বলা। বল্টু থামে না, তোমার দুখানা দিব্যি হাত রয়েছে, বাসের হ্যান্ডেল ধরে উঠেছো, রড ধরে ঝুল খেলে একটু আগেও, নুলো নও, প্যারালাইজ নও...,

কনুই দিয়ে বল্টুকে ছোটো একটা গুঁতো মারে শিবুচরণ, চুপ মার বল্টু! কিন্তু বল্টুর চোখের দিকে চেয়ে শিবুচরণ স্পষ্টই বুঝতে পারে যে বল্টু খুবই সন্দেহের চোখে তাকে দেখছে। ম্লান হাসে শিবুচরণ, বুঝলি বল্টু, আমার পাগলা ডাক্তার আজ একটা শিশি ভেঙে ফেলেছিল, আমাকে ডেকে বলল, শিবুচরণ মেঝেটা পরিষ্কার করো। শিশির মধ্যে কি ছিল জানি না, দেখলাম সাদা পাউডারের মতো গুঁড়ো। পরিষ্কার করার সময় ডাক্তারবাবু ভ্রূ কুঁচকে বলল, শিবুচরণ, খুব সাবধান! হাত ভালো করে ধুয়ে ফেল, এ মারাত্মক বিষ, এক আউন্সে লাখ দুয়েক লোক মারা যায়, সমুদ্রের জলে মিশিয়ে দিলে দু মাসে সমস্ত সমুদ্র....বুঝলি কিনা এরকম আরও অনেক কিছু বলে গেল ডাক্তারবাবু, ভাঙা কাচ আর গুঁড়োগুলো লোহার একটা বাক্সে তালাচাবি দিয়ে রেখে দিল। আমার হাতে সেই গুঁড়া লেগেছিল কি না কে জানে, কিন্তু তখন থেকেই কেন বড়ো অস্বস্তি হচ্ছে তাই। কে জানে

নখের ফাঁকে, কি চামড়ার সঙ্গে কোথায় একটু লেগে আছে। গা চুলকোতে পারি না, বিড়ি খেতে পারি না।

বল্টু এত বড়ো বড়ো চোখ করে শুনল, তারপর একটু ভেবে বলে, তা হলে হাত দুটো সাবধানেই রাখো শিবুদা। বলতে বলতে বল্টু জানালার আরো ধার ঘেঁষে জড়োসড়ো হয়ে যায়। তার মুখে কেমন একটা ফ্যাকাসে ভাব। তাদের ওপর ঝুঁকে রড ধরে যে আধুবুড়ো লোকটা দাঁড়িয়ে ছিল তার কাঁচা পাকা গোঁফ নড়ে ওঠে, ভিড়ের মধ্যেই লোকটা একটু ঠেলাঠেলি করে সরে যাওয়ার চেষ্টা করে।

শিবুচরণ বোঝে যে সে গলা নামিয়ে কথা বললেও লোকটা তাদের ওপর ঝুঁকে পড়ে সব শুনে নিয়েছে।

বল্টু গলা পরিষ্কার করে বলে, তৈরি হও শিবুদা, সামনেই তোমার স্টপ।

শিবুচরণ অবাক হয়, এই তো সবে রেলব্রিজ পেরোলুম, স্টপের এখনও দেরি আছে।

বল্টু বিজ্ঞের মতো হাসে, দেরি আর কি, যা ভিড়, ঠেলেঠুলে দরজায় পৌঁছুতেই তিনটে স্টপ বেরিয়ে যাবে।

শিবুচরণ তার চুলবুলে নাক জামার হাতায় ঘষে, শালার নাকটা....।

বল্টু লাজুক মুখে বলে, তোমার নাক চুলকে দিতুম শিবুদা, কিন্তু মাইরি, ভিড়ে এত লোকজনের সামনে বড়ো লজ্জা লাগছে।

শিবুচরণ মাথা নাড়ে--ঠিক। সে জানে ঠিক। ভাবতে ভাবতে উঠে পড়ে শিবুচরণ, চলি রে বল্টু, একদিন আসিস বাসায়, বাঁচি কি মরি দেখে যাস।

বল্টুর গলা শোনা যায়, আচ্ছা।

আনোয়ার শা রোডের মোড়ে নামে শিবুচরণ। তার বাসা হরিপদ দত্ত লেন-এ, মিনিট দশেকের হাঁটাপথ। রাস্তাটুকু প্রতিদিন হেঁটে যেতে দুটো বিড়ি লাগে শিবুচরণের। অভ্যাসবশত এক্রামের দোকানের সামনে এসে দাঁড়ায় সে। ঢেউ খেলানো আয়নার নিজের থ্যাবড়া মুখ দেখে। এক্রামও রোজকার মতো শিবুচরণকে দেখে বিড়ির বান্ডিলের দিকে

হাত বাড়ায়। শিবুচরণ মাথা নামিয়ে এক্রামের প্রায় কানে কানে বলে, ভাই রে, আজ বিড়ি লাগবে না। আজ আর একটা কাজ করতে হবে তোকে। এক্রাম বাঁকা চোখে চেয়ে সাবধানী গলায় বলে, তুমি শালা বাকি বকেয়ার কথা ছাড়া আর কি বলবে! ঝামেলায় জড়িওনা ভাই--, তাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে শিবুচরণ তার নাকখানা এগিয়ে দিয়ে করুণ গলায় বলে, ভাই নাকটা একটু চুলকে দিবি?

এক্রাম ঝট করে মুখ সরিয়ে নেয়। মাল খাসনি তো! গভীর সন্দেহের চোখে তাকিয়ে বলে, তোর হল কি শিবু! তোর নাক আমি চুলকোবো! শালা, এক্রাম পরের নাক চুলকে বেড়ায় নাকি! সাহস বটে তোর।

শিবুচরণ কাতরে বলে, রাগ করিসনি ভাই, দুহাতে বিষ মাখা, কিচ্ছুটি করবার জো নেই। বিড়ি খেতে পারছি না, মাথা ধোঁয়াটে লাগছে। আর জুটেছে এক নাকের চুলকোনি আজ, মরে যাচ্ছি। শরীরের কত জায়গা যে চুলকোতে ইচ্ছে করছে এক সঙ্গে!

এক্রাম বিড়ি বাঁধতে বলল, বাড়ি যা, বাড়ি যা। বউকে গিয়ে বল চুলকে দেবে গা গতর। যার যা কাজ।

ধুতির খুঁট তুলে শিবুচরণ সাবধানে নাক চেপে ধরে ডলা দেয়। নাকের নরম হাড় ককিয়ে ওঠে, চোখে জল এসে যায়। তার জ্যাঠামশায়ের হাতে ছিল ওই চুলকোনি। হাতে চুলকে পারা যেত না, তাই জ্যাঠামশাই প্রায়ই আঙুলে নারকোলের দড়ি জড়িয়ে হাত মুঠো করত। তাতে না কি ভারি আরাম। হাঁটতে হাঁটতে শিবুচরণ হাত দুখানা আবার চোখের সামনে ধরে। লাইজলে কার্বলিক সাবানে ভালো করে ধুয়েছে হাত। তবু বলা যায় না। এ হাত আর কখনো কি কোনো কাজে লাগাতে পারবে শিবুচরণ।

ডাক্তারবাবু মুখে কিছু বলেননি বটে, কিন্তু শিবুচরণ তো ওঁর মুখের ভাবখানা দেখেছে। বড়ো গম্ভীর, বড়ো চিন্তিত মুখে তাকিয়ে ডাক্তারবাবু বিড়বিড় করছিলেন, বড়ো মারাত্মক বিষ শিবুচরণ বড়ো মারাত্মক বিষ। মানবসমাজ ধবংস হয়ে যেতে পারে ওটুকুতে। আমি নিজে তৈরি করেছি এ বিষ, এখন কোথায় লুকোই। পাগালা ডাক্তার ঘরের চারদিকে পায়চারি করে বলেছিল, মেঝে ধুয়োনা, জলের সঙ্গে গড়িয়ে কোথায় গিয়ে পড়বে। আমি

মোটা চট কি কার্পেট দিয়ে মেঝেটা ঢেকে দেওয়ার বন্দোবস্ত করছি, নীচে থাকবে লিনোলিয়াম। বুঝলে শিবুচরণ, এ বিষের অ্যান্ডিডোট বের না করা পর্যন্ত আমার শান্তি নেই।

অতশত বোঝেনি শিবুচরণ, সে শুধু বুঝেছে না জেনে শুনে সে এক মহাবিপদের কাজ করে ফেলেছে আজকে। বুঝে শরীর হিম হয়ে গেছে তার। এখনও তার হাত দুখানা বেশ জোরালো। কালচে এই হাত দুখানায় কত কাজই করেছে শিবুচরণ, এখনও কত কাজ করা বাকি। তবু সে বুঝতে পারে বিপজ্জনক এ হাত দুখানা এত কাছাকাছি থাকায় সে কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছে না এখন।

বাড়ির কাছাকাছি আসতে শিবুচরণের গায়ে হাওয়া লাগে। জল মাটির আঁশটে গন্ধওলা হাওয়া। তার মাটির উঠোন, গাছগাছালির ছায়ায় ঢাকা, পুকুরপাড় পুকুরপাড় একটা ভাব আছে তার ঘরদোরে। সদর বলতে একটা আগড় দেওয়া, উঠোন ঘেরা পুরোনো বাঁশের বেড়া। শিবুচরণ আগর ঠেলে উঠোনে ঢোকে, দরজার শেকল নাড়া দেয়। ভিতরে আক্রোশে লেজ আছড়ায় একটা বাঘিনী তার বউ বিভাবতী। বিভার গলা শোনা যায়, ওই এল।

দরজা খুলতে কিন্তু বিভার হাসিমুখই দেখতে পায় শিবু, কোলে তাদের আড়াই বছরের ছেলে পান্তু। ভারি আদুরে ছেলে, ল্যাপাপোঁচা মুখ। হাসলে বড় আহ্লাদে দেখায়, বাপকে দেখে ছেলে হামলে পড়ে বিভার কোল থেকে। পান্তু সোনা, পান্তু সোনা বলে শিবুচরণ ছেলেকে জাপটে ধরতে চায়, আর সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত শরীরে ঝিলিক নিয়ে একটা গলার স্বর ধমকে ওঠে, অ্যাই। শিবুচরণ চট করে হাত সরিয়ে নেয়, বিভার কোল থেকে টাল খেয়ে পান্তু ঝুঁকে পড়েই যাচ্ছিল, কোনক্রমে সামলে নিল বিভা। দু হাত দু বগলে চেপে কাতরকণ্ঠে নিজেকেই বলে শিবুচরণ, খবরদার যদি ছুঁয়েছো! খবরদার! হ্যাঁ, এখন তো আর হেলায় ফেলায় তাসপাশা খেলছে না শিবুচরণ, কিংবা বাসের হ্যান্ডেলও ধরছে না। ছেলেকে আদর করার হাত আলাদা, যেমন আলাদা বিড়ি খাওয়ার কি গা চুলকোনোর হাত। হাতেরও যে কি বিচিত্র চরিত্র আছে শিবুচরণ এই প্রথম টের পায়। বলতে কি জীবনে আলাদা করে নিজের হাত দুখানাকে এই প্রথম লক্ষ করে শিবুচরণ।

বিভা শিবুচরণের কাণ্ড দেখে দু-পা পিছিয়ে গিয়েছিল, প্রায় চেঁচিয়ে বলল, ও কী হচ্ছে? আর একটু হলে ছেলেটিকে যে ফেলে দিতে!

শিবুচরণ বিভার গলা শুনে আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়, ধীরে ধীরে বিভার পাশ দিয়ে ঘরে ঢোকে, বলে, দাও দেখি সাবানখানা, হাতটা ধুই।

বিভার তবু চোখ ছোটো হয় না, বড়ো বড়ো চোখে সে শিবুচরণকে দেখে, হল কি তোমার! খুনটুন করে আসোনি তো! যদিও বিভা জানে রাস্তায় চেঁচামেচি শুনলে ঘরে শিবুচরণ ঘেমে ওঠে। শিবুচরণ কথার উত্তর না দিয়ে বলে, হাতটা আগে ধুই, তারপর বলছি।

শিবুচরণ সন্তর্পণে জামাকাপড় ছাড়ে, ঘরের জিনিসপত্রের ছোঁয়া থেকে হাতকে বাঁচিয়ে রাখে, ছাড়া জামাকাপড় পুঁটলি করে বাইরের দাওয়ায় রাখে।

বিভা সারাক্ষণ শিবুচরণকে দেখছিল ঘরের দরজায় ছেলে কোলে দাঁড়িয়ে। বলল, বারান্দায় জামাকাপড় রাখছ যে! শিবুচরণ উত্তর দেয় না। দড়ি থেকে গামছা টেনে নেয়, তুলে নেয় বারান্দায় রাখা প্ল্যাস্টিকের সোপ-কেসটা। পুকুর পাড়ে যাবে, হঠাৎ আবার নাকের ডগা চুলবুলিয়ে ওঠে। সইতে পারে না শিবুচরণ, এক ঝটকায় দাওয়ায় উঠে বিভার দিকে নাকটা বাড়িয়ে দেয়, বিভা পিছু হাঁটতে গিয়ে চৌকাঠে হোঁচট খায়, ও মাগো! শিবুচরণ বিভাকে ধরবার জন্য হাত দুটো বাড়িয়েও আবার টেনে নেয়। বিভা টাল সামলে নিলে শিবুচরণ ম্লান মুখে বলল, খারাপ মতলব ছিল না। বিশ্বাস কর, নাকটা বড় চুলকোচ্ছে। একটু চুলকে দেবে?

কিছুক্ষণ কথাই বলতে পারে না বিভা, তার ঠোঁট দুটো থরথর করে কাঁপে, পান্তু বাপকে কাছাকাছি দেখে আবার হামলে পড়ার চেষ্টা করে। নাকের যন্ত্রণায় অস্থির শিবুচরণ ঘরের বেড়ায় নাকটা একবার চেপে ধরে, চড়াক করে একটা কঞ্চির ডগা বসে যায়। দু হাত মুঠো করে শিবুচরণ ফিসফিস করে বলে, দু হাতে আজ আমার মারাত্মক বিষ, বিভা, কিছু করবার জো নেই। শালার কি গেরোতে যে পড়লুম আজকে। বলতে বলতে পুকুরপাড়ে রওনা দেয় শিবুচরণ।

কিন্তু হাত ধোওয়া হল না। টলটলে কালো জলের কাছাকাছি হাত নিয়েও আবার টেনে আনে শিবুচরণ। শ তিনেক লোকের কথা, বাচ্চা আর বউ-ঝির কথা মনে পড়ে। নিজের সন্দেহজনক হাতটি তাই জলে দেয় না শিবুচরণ, আবার ঘরে ফিরে আসে। বিভাকে বলে, হাতে জল ঢেলে দাও। এখানেই হাত ধুই। পুকুরের জল বিষিয়ে দিয়েছিলুম আর একটু হলে।

বিভা এবার ধাতস্থ হয়েছে অনেকটা, কথা বলে না সে, শিবুচরণের হাতে জল ঢেলে দেয়। শিবুচরণ দেখে হাত-ধোয়া সাবানজল গড়িয়ে গেলে শিউলি গাছটার গোড়ায়, জিভ কাটে সে, ওই যা! গেল গাছটা।

চমকে উঠেছিল বিভা, বলল কী? শিবুচরণ মাথা নাড়ে তিন বচ্ছর ঠাকুর পুজোর ফুল দিয়েছে। এবার বেটি মরবে। এ যা বিষ না বিভা, এক আউন্সে পৃথিবী সাবাড় হয়ে যেতে পারে। সমুদ্রে ঢেলে দাও তো দুমাসে সমস্ত সমুদ্র...

পান্তু দাওয়ায় বসে কেঁদে ওঠে, বিভা ঘটি রেখে ছোটে। শিবুচরণ চেঁচিয়ে বলল, আমার জামাকাপড়ে হাত দিওনা। গামছা আর সাবান ছুঁয়োনা। খুব সাবধান!

হাত পা ধুয়ে এসে ঘরে বসেছে শিবুচরণ। সামনে বসে বিভা রুটিতে তরকারি ভরে পাটিসাপটার মতো পাকিয়ে শিবুচরণের মুখে তুলে দিচ্ছিল। মহা আনন্দেই আজ খাচ্ছিল শিবুচরণ দুহাত সাবধানে কোলের ওপর জড়ো করে রেখে। থালার পাশে হাত পেতে বসে আছে পান্তু, অবাক চোখে বাবার খাওয়া দেখছে।

বিভা বলল, তা অমন বিষ যখন, তখন হাত দিতে যাওয়া কেন?

শিবুচরণ মাথা নাড়ে, আগে কি জানতুম! ডাক্তারবাবু ভুলো ভোলা পাগল মানুষ তাঁরও অতটা খেয়াল হয়নি।

বিভা জলের গ্লাস শিবচরণের মুখে তুলে ধরে বলে, কি জানি বাপু, আমার বিশ্বাস হচ্ছে না! চালাকি করছ না তো! ওরকম বিষ থাকতে পারে বুঝি, এইটুকুতে সব মানুষ মরে যাবে!

শিবুচরণ ঢেকুর তুলে বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়ে, পারেই ত! অ্যাটম বোমার সাইজ জানো? এইটুকু বলে হাতে হাঁসের ডিমের সাইজ দেখায় শিবুচরণ। গোঁফে জল লেগে

আছে। হাতের উলটো পিঠ দিয়ে মুছতে যেতেই বিভা তার হাত চেপে ধরে, দাঁড়াও, তারপর নিজের আঁচলে তার মুখ মুছে দেয়। হাসে শিবুচরণ, সেই ছেলেবেলায় মা ভাতের দলা খাওয়াতো, আর এই খেলুম তোমার হাতে। বেশ ছেলেমানুষ লাগছে আজ নিজেকে। নাকটা আবার একটু চুলকে দাও তো!

বিভা লাজুক হেসে তার নাক চুলকে দেয়। আরামে চোখ বোজে শিবুচরণ।

ফোটন

ফোটনকে পাবলিক খুব পেঁদিয়েছে আজ। এখন ওই যে লাইনের ধারে মরকুটে কদম গাছটার তলায় পড়ে আছে ফেলে দেওয়া জিনিসের মতো। লুঙ্গিখানা গিঁট মেরে পরেছিল, তাই এখনও লেগে আছে কোমরে। গেঞ্জি ফর্দাফাঁই হয়ে উঠে গেছে, হাওয়াই শার্ট বেপাত্তা। গোছা গোছা চুল ছিঁড়ে নিয়ে গেছে মাথা থেকে। মুখ যেন একশো বোলতার হুলে ফুলে ফেঁপে বেলুন। চোখ বোজা, নাক কাটা, ঠোঁট থ্যাঁতলানো। রক্ত জমে গেছে, এখন আর হড়হড় করে নাক-মুখ দিয়ে পড়ছে না। দু-চারটে মাছি উড়ছে ধুলো আর রক্তমাখা মুখের কাছে। হাড়গোড় ভেঙে থাকলেও এখন তা বোঝবার উপায় নেই। তবে না-ভাঙাই সম্ভব। ফোটনের হাড় তো পাকা।

ফোটনের আশপাশ দিয়েই লোকজন যাতায়াত করছে বাজারে, স্টেশনে। তাকাচ্ছে। ফের দেখি না দেখি না ভাব করে চলে যাচ্ছে।

জগদীশ ঘোষ মান্য খদ্দের। তাঁর কোঁকড়া চুলে শ্রদ্ধার সঙ্গে কাঁচি চালাতে চালাতে পপুলার সেলুনের শ্বেতিওয়ালা জগন কণ্ঠহরিকে উদ্দেশ্য করে বলল, এইবেলা একটা রিকশা ডেকে তুলে নিয়ে যাও। পুলিশ এসে আর পারবে না।

কণ্ঠহরি সেলুনের এক বর্গফুট ঘুলঘুলিটার ভিতর দিয়ে ফোটনের দিকে চেয়ে ছিল। শুকনো ঠোঁটটা জিব দিয়ে ভিজানোর বৃথা চেষ্টা করে বলল, যাই। কিন্তু পাহারা আছে যে।

কে পাহারা!

চারটে ছেলে ঝোপড়ার ওদিকটায় দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে অনেকক্ষণ ধরে।

কিছু বলবে না। লাশটা নিয়ে আর করবে কী বলো!

লাশ কথাটায় কলজেটা ব্যাঙের মতো একটা লাফ মারে কণ্ঠহরির। পাবলিকের কাছে ফোটন যাই হোক, তার তো ছেলে। সারাদিন খবর ছিল না, অনেক খুঁজে খুঁজে খবর নিয়ে তবে এখানে এসে সন্ধান পাওয়া গেছে।

কণ্ঠহরি কষ্টেসৃষ্টে উঠে পড়ল। কোমরটায় বাতের ব্যথা বহুকাল ধরে বাঘের থাবা মেরে বসে আছে। নড়েও না চড়েও না। চরণগঙ্গার গোঁসাই বলেছিল, চীনে বিছে লাগালে সেরে যাবে। তা চীনে বিছের এখন জোগাড় নেই। ডাক্তার বদ্যি সব ফেল মেরে গেল। উবু হয়ে কাজ করতে পারে না, ভার তুলতে পারে না। বড়ো কষ্ট। বসার পর উঠলে কিছুক্ষণ কুঁজো মেরে থাকতে হয়। বড্ড টাটায় তখন। একটু হাঁটাহাঁটি করলে তারপর কোমর সরল হয়।

চারপাশটা দেখে নিয়ে কণ্ঠহরি গিয়ে কাছটিতে দাঁড়ায়। না, শ্বাস আছে এখনও। বুক ওঠানামা করছে। ঝোপড়ার ওদিকটায় চার ছোকরা একটু তফাত হয়েছে। কণ্ঠহরি একটা চলন্ত রিকশাকে হাত তুলে থামাল। রিকশাওয়ালা সন্দিহান চোখে তার চেহারাটা দেখে নিয়ে থেমে গেল।

কণ্ঠহরি ফের চার চোখে চারপাশটা দেখে নিল। বেশি সোরগোল না করে মালটা তুলে ফেলতে হবে। নীচু হয়ে ফোটনের দুবগলের তলায় হাত দিয়ে খানিক তুলে করুণ চোখে রিকশাওয়ালার দিকে চেয়ে কণ্ঠহরি বলে, একটু হাত লাগাবি বাবা? বুড়ো মানুষ আমি, একা পেরে উঠব না।

পকেটমার আছে নাকি ছোকরাটা?

কণ্ঠহরি মাথা নেড়ে বলে, ওসব নয়। আর হলেই বা তোর কী? তোকে ঠিক পয়সা দেবো। ধর বাবা একটু।

রিকশাওয়ালা নেমে এগিয়ে এল। কিন্তু সে ফোটনকে ধরবার আগেই ঝোপড়ার ওপাশ থেকে চারটে ছোকরা ভূতের মতো বাতাস খুঁড়ে সামনে দাঁড়াল, এই যে দাদু, বডি তুলছেন যে বড়। কার পারমিশান নিয়েছেন?

কণ্ঠহরি ঢোঁক গিলে বলল, আমার ছেলে।

ওসব জানি। আপনি ফোটনের বাপ না পিসে তা জেনে আমাদের লাভ নেই। বডি তুলবে পুলিশ। থানায় খবর গেছে।

কণ্ঠহরির হাত কাঁপছে। ফোটনকে ছাড়তে পারছে না। কোমরটা টাটাচ্ছে বেদম। বলল, পুলিশ আর কী করবে বাবারা, নিয়ে আরও মারবে।

তা সে ফালতু মস্তানি করতে গেলে ঝাড় তো খেতেই হয় দাদু। বডিটা ছেড়ে দিন। ও মাল এখন আমাদের।

ছেড়ে দিতেই ফোটন আবার গদাম করে মাটিতে পড়ে গেল। কণ্ঠহরি মাজাটা ডলতে ডলতে ককিয়ে উঠল, অরে বাবাঃ.....ওঃ.....

একটা চাকর একটু মোলায়েম গলায় বলল, আইন ইজ আইন। বুঝলেন দাদু? পেঁদিয়েছে পাবলিক, আর পাবলিক মানেই হচ্ছে ভোটার, মানে সরকার। বডি তুলতে হলে তুলবে পুলিশ, মানে পাবলিক সারভেন্ট। আপনার আমার কিছু করার নেই। কে হন যেন আপনি?

কণ্ঠহরি বিকৃত মুখ করে বলল, বাবা। অনেক পাপ করেছি তো, তাই।

ছোকরাটা আকাশের দিকে চেয়ে গলা চুলকোতে চুলকোতে বলল, সেন্টিমেন্টে খোঁচা মেরে দিলেন দাদু? বাপ-ছেলে রিলেশন বলছেন, ঠিক তো!

ফোটনের বাপ হওয়া এমন কিছু গৌরবের নয় যে, লোক মিথ্যে করে বাপ সাজবে। কণ্ঠহরি সে কথায় না গিয়ে বলল, বাপই বটে।

কিন্তু আমাদেরও তো রেসপনসিবিলিটি আছে দাদু। বলাইদা--আমাদের লিডার বলে গেছে খবরদার বডি কাউকে ছুঁতে দিবি না, পুলিশের লোক এলে রিলিজ করবি।

বুঝেছি বাবা। অনেকক্ষণ হয়ে গেল, তাই বলছিলাম--

আমরা বলি কি কিছু মাল খসান, বডি তুলে নিয়ে যান, কেউ কিছু বলবে না।

বুঝেছি। কত?

পঁচিশ।

আমার কাছে অত নেই।

কত আছে?

পাঁচ।

সার্চ করলে যদি বেশি বেরোয়?

কণ্ঠহরি ককিয়ে উঠে বলে, দশ।

খুব চিপ হয়ে যাচ্ছে না?

আর নেই বাবা।

ছোকরাটা রিকশাওয়ালাকে একটা ধমক দিল, তোল না শালা গিদধড়, তুলে লে। উঠে পড়ুন দাদু, গিয়ে একটু ডেটল ফেটল লাগিয়ে দেবেন, মাল ঠিক ফিট হয়ে যাবে।

রিকশায় তুলতে ছোকরাগুলো একটু হাত লাগাল।

পকেট থেকে দশটা টাকা বেরিয়ে গেল ফালতু। কোমরটা টাটাচ্ছে। ফোটনের আলিসান শরীরের চাপে কণ্ঠহরির শুঁটকো চেহারাটা ফোঁক ফোঁক করছে, হাঁসফাঁস করছে। দিশি মদের গন্ধে গুলিয়ে উঠছে গা। রিকশাটা হপ্তা বাজারের ভাঙা রাস্তায় ঝকাং ঝকাং করে যত লাফায় তত প্রাণবায়ু বেরোতে থাকে কণ্ঠহরির। উপায় থাকলে ফোটনকে এখন জুতোপেটা করত কণ্ঠহরি। কিন্তু ভগবান কি আর সেই দিন দেবেন?

গোটা পাঁচ-সাত রাম ঝাঁকুনির পর আচমকাই কণ্ঠহরির গায়ে হড়াক করে দিশি মদ আর খানিক কিমাকারি গরম বমি ফেলল ফোটন। তারপরই সটান বসে বলল, কোন শালা বে হুটোপাটা করতে লেগেছিস? কোন শুওরের--

কণ্ঠহরি চিঁচিঁ করে বলে ওঠে, আমি রে আমি।

লাল টকটকে দুখানা চোখে ফোটন তাকে ভালো করে দেখবার চেষ্টা করে, শালা বাবা নাকি বে?

চুপ করে বোস তো, গাটা একটু এলিয়ে দে।

শুয়োরের বাচ্চারা সব গেল কোথায় বলো তো! অ্যাঁ! একটা একটা করে ধরে জমি নেওয়াবো শালাদের, সবকটার মাগকে বিধবা করে ছাড়ব। খানকির ...

চুপ করে বোস বাবা। ধরে থাক শক্ত করে।

সব বিলা করে দেবো, বুঝলে! জ্বালিয়ে দেবো শালা!

হবে হবে। এখন একটু--

ফোটনের কনুইয়ের একটা রামগুঁতোয় কণ্ঠহরি বেঁকে যায়। বাপ, জোর লেগেছে।

বলাই শালার গলা যদি না নামাই তবে আমি বাপের ছেলে নই, বুঝলে?

কণ্ঠহরির বুঝবার মতো অবস্থা নয়। ফোটন বড্ড হাত পা চালাচ্ছে। কণ্ঠহরি মুখখানা হাতচাপা দিয়ে নিজেকে বাঁচাতে বাঁচাতে বলে, হবে হবে সব হবে। এখন একটু চুপ করে বোস তো।

লাইনের ওধার ওর, ঠিক আছে। এধারে আমি তোলা নেই তাতে ওর বাবার কী, তুমিই বলো!

তা বটে।

তবে শালা আমাকে টেনে নিয়ে গেল কেন?

ভালো লোক কি আর আছে রে ফোটন? তুই চুপ করে বোস।

জানো তুমি? লাইনের এধার থেকে বাইশটা ছেলে আমাকে ওধারে টেনে নিয়ে গেল। আর শালা বলাই গলায় নল ঠেকিয়ে বলে কিনা, এ এলাকায় পা দিয়েছিস কেন? কত বড়ো মিথ্যে কথা?

দুনিয়াটাই পাপে ভরে গেছে। তুই একটু চুপ করে বোস তো বাবা, এত ছটফট করিসনি!

বলাইয়ের সঙ্গে হচ্ছিল তো হচ্ছিল। কথা নেই বার্তা নেই, দুটো হুমদো মতো লোক কোত্থেকে এসে বলল, এটাকে ধরেছিস খুব ভালো করেছিস। শালা সিনেমার টিকিট ব্ল্যাক করে, সেদিন আমার বউদি একটু দরাদরি করায় বলেছিল ফোট মাগি, এত বড়ো সাহস।

বলেই দুমদাম লাগাতে শুরু করল। পাবলিকও জুটে গেল সেই সঙ্গে। বলো, এই কি বিচার?

কন্ঠহরি ফোটনের বড়ো শরীরটাকে রিকশার মধ্যে ঠিক আঁটিয়ে রাখতে পারছে না। বলল, ধর্ম কি আর আছে রে বাপ? কনুইটা ফের লাগবে, দেখিস?

ওঃ, শালারা খুব রগড়েছে। আমিও দেখব শালা বলাইকে, লাইনের ওদিকে টেনে নিয়ে গিয়ে মস্তানি! বাপের ব্যাটা হলে লাগতি এদিকে এসে, জল ভরে দিতাম। ন্যায্য কথা শুনে কন্ঠহরি সায় দিল, বটেই তো।

আমিও বাগে পাবো একদিন। তিনটে লাশ ফেলে দিয়েছি আমাকে তো চেনে না এখনও।

চিনবে রে চিনবে। সবই রয়ে সয়ে হয়।

ফোটন একটু কমজোরি হয়ে পড়েছে। ঝুম হয়ে কিছুক্ষণ চোখ বুজে বসে রইল। ফাটা ঠোঁট দিয়ে ফের রক্ত বেরোচ্ছে বগবগ করে। ফোঁটা ফোঁটা বেয়ে পড়ছে কালো বুকে। হপ্তা বাজারের খোয়া ওঠা রাস্তায় টাল্লা খেয়ে নেচে নেচে রিকশা এগোচ্ছে। রিকশা, ঠেলা, পাঁউরুটির গাড়ি, ভ্যান, সাইকেল আর মানুষে ঠাসে ঠাস ভিড় ঠেলে ফোঁকর করে করে এগোনো ভারি শক্ত।

আস্তে চালাস বাপ, কন্ঠহরি বলে।

রিকশাওয়ালা তেজে জবাব দিল, আস্তেই চলছে।

বিড়বিড় করে কী যেন বলছে ফোটন। মাথাটা বুকের ওপর ঝুলে পড়েছে। চোখ বোজা। শরীরটা দুলছে এদিক সেদিক। কন্ঠহরি কানটা একটু এগিয়ে দেয়, কী বলছিস ও ফোটন?

বলাইকে সাফ করলে গোটা এলাকাটা একদিন আমার হয়ে যাবে, বুঝলে বাবা? সবাই বলবে ফোটন মালিক। ব্ল্যাকাররা তোলা দেবে, সবজিওয়ালা, চালওয়ালা, সাট্টাওয়ালা সব শালা দেবে। চারটে লরি করব, দুটো মিনিবাস, একটা কালীমন্দির দেবো। বুঝলে বাবা?

দিস? খুব ভালো হবে।

মারল তো শালা, জানে খতম করতে পারল? মরদ হলে পারত। আমি যেদিন ধরব বুঝলে বাবা, জানে খতম করে দেবো। লেজ মাড়িয়ে ছেড়ে দেবো না। ঠিক হবে না বাবা?

কন্ঠহরি খুব ভালোমানুষের মতো মুখ করে বলে, তাই তো রে। ঠিক কথা।

ফোটন একটু হেলান দেয় কন্ঠহরির শরীরে। মাজাটা কোঁক করে ওঠে কন্ঠহরির। মদের ঝাঁঝালো গন্ধ আসে নাকে। বমিটা জামায় শুঁকোচ্ছে। তবু কন্ঠহরি ছেলের বিশাল শরীরের ঠেস সহ্য করতে করতে মনশ্চক্ষে দেখতে পায়, ফোটন লাইনের দুধারে দুটো স্তম্ভের মতো বিশাল পায়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাতে বলাইয়ের কাটা মুন্ডু। সেই বিশাল ঠ্যাঙের তলা দিয়ে নতমস্তকে যাতায়াত করছে বেয়াদব পাবলিক আর ঠনাঠন পয়সা প্রণামী ফেলে যাচ্ছে।

কন্ঠহরি ফোটনের মাথাটা কাঁধে চেপে ধরে আদরের গলায় বলে, হবে রে হবে, সব হবে। সবার কি আর চিরকাল দুর্দিন থাকে?

রহস্য

নতুন রাজার অভিষেক উপলক্ষ্যে রাজ্যে যে উৎসবের বন্যা বয়ে গেল তারই কিছু প্রসাদ লাভ করল কারাগারের বন্দিরা। বহুদিন যাবৎ যারা কারাবাস করছে এমন কতিপয় বন্দির কাছে কারাধ্যক্ষ স্বয়ং রাজার পরোয়ানা পৌঁছে দিতে এলেন।

বন্দিরা আনন্দে কোলাহল করে উঠল, মুক্তি? মুক্তির চেয়ে সুস্বাদু আর এই মানবজীবনে কীই বা থাকতে পারে? মুক্তি এক স্বচ্ছ ফল, মুক্তি এক প্রারম্ভিক আনন্দ, মুক্তি এক অফুরান গতি।

শুধু একজন বন্দিই নিরুত্তাপ, নিরাবেগ, প্রতিক্রিয়াহীন। কারাধ্যক্ষের হাত থেকে পরোয়ানাটি অবহেলায় গ্রহণ করলেন। পড়লেন। তারপর পরোয়ানাটি দুমড়ে মুচড়ে নিক্ষেপ করলেন কারাকক্ষের কোণে। বন্দি বৃদ্ধ, দীর্ঘ শ্মশ্রু ও গুম্ফ তাঁর মুখমণ্ডল আচ্ছন্ন করে আছে। মেদহীন দীর্ঘ চেহারায় বার্ধক্যের ছাপ পড়লেও তা শক্তিহীন নয়। দুই চক্ষুর দৃষ্টি এখনও ঈগলের মতো তীক্ষ্ণ। দীর্ঘ ত্রিশ বছর তিনি একাদিক্রমে কারাগারে রয়েছেন। সহবন্দিরা তাঁকে ভয় পায়, কারারক্ষীরা তাঁকে সমীহ করে, কারাধ্যক্ষ তাঁকে সহজে ঘাঁটান না।

মুক্তির আদেশ পেয়েও এই বয়োজ্যেষ্ঠ বন্দিকে অনুত্তেজিত দেখে বিস্মিত কারাধ্যক্ষ প্রশ্ন করলেন, আপনি কি আনন্দিত নন?

বন্দি কারাধ্যক্ষের দিকে এক নির্বিকার দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, এখন বন্দিত্ব আর মুক্তি দুই-ই আমার কাছে সমান। তোমার রাজাকে বলো, আমার মুক্তি বহুকাল আগে আমি নিজেই অর্জন করেছি। আমি বন্দি নই। তাই মুক্তির আদেশ বাহুল্যমাত্র।

কারাধ্যক্ষ আর প্রশ্ন করলেন না। ফিরে গেলেন।

কিন্তু নবীন রাজার কানে যথাসময়ে পল্লবিত হয়ে ঘটনাটি নিবেদিত হল।

অভিষেকের উদ্যোগে রাজাকে ব্যতিব্যস্ত থাকতে হচ্ছে। তাঁর হাজার কাজ, হাজার ঝামেলা, হাজারো সমস্যা। তবু এই ঘটনাটির কথা মনে রাখলেন। কোনো কোনো সামান্য ঘটনা কীভাবে যেন মনকে বিদ্ধ করে রাখে।

বৃদ্ধরাজা দেহরক্ষা করেছেন। তিনি কাঠোর হস্তেই রাজ্য পরিচালনা করতেন। নিজে ছিলেন অতি সংযত ও কঠোর চরিত্রের মানুষ। নবীন রাজা তাঁর মতো অত কঠিন-কঠোর নন। তাঁর হৃদয় কোমল, কল্পনাপ্রবণ, রহস্যপ্রিয়। সম্ভবত তাই এই সামান্য ঘটনাটি তিনি ভুলতে পারলেন না।

অভিষেকের আগে রাজ্যে চলেছে সাজো-সাজো রব। রাজপ্রাসাদে শতেক পণ্ডিত যাগযজ্ঞ পূজাপাঠে অহোরাত্র ব্যাপৃত রয়েছেন। দেশ-বিদেশ থেকে অতিথি সমাগম শুরু হয়েছে, তাঁদের অভ্যর্থনা ও আপ্যায়নের ব্যবস্থাও ব্যাপক ও জাঁকজমকপূর্ণ। আসছেন গায়ক-গায়িকা, নর্তক-নর্তকী, নানা বিদ্যায় পারদর্শী নানা গুণী ও জ্ঞানী। রাজার তিলার্ধ সময় নেই।

অভিষেকের দুই রাত্রি আগে নবীন রাজা পরিশ্রান্ত ও চিন্তিতভাবে শয্যায় আরোহণ করে উপাধানে মাথা রেখে নিদ্রাকর্ষণের চেষ্টা করলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় শরীর অত্যধিক শ্রান্ত থাকা সত্ত্বেও নিদ্রাবেশ হল না।

রাজা উঠে বসলেন এবং বাইরের জ্যোৎস্নালোকিত চরাচরের দিকে বাতায়ন-পথে চেয়ে রইলেন। অকস্মাৎ আকাশের বিশাল প্রসার ও রাত্রির ব্যাপ্তি দেখে তাঁর মুক্তির কথা মনে পড়ল। কে এমন যে, এই বিশাল পৃথিবীতে মুক্তি চায় না?

রাজা একজন দূতকে পাঠালেন কারাধ্যক্ষকে ডেকে আনতে।

কারাধ্যক্ষ ছুটে এলেন, আজ্ঞা করুন মহারাজ।

যে প্রবীণ বন্দি মুক্তির পরোয়ানাকে অবজ্ঞা করেছে তার অপরাধ কী তা বলতে পারেন?

কারাধ্যক্ষ নত মস্তকে বললেন, তিনি রাজাদেশ অমান্য করেছিলেন।

নবীন রাজা ধীরস্বরে বললেন, রাজাদেশ অমান্য করা ঘোর অপরাধ, কিন্তু তিনি রাজার কোন আদেশ অমান্য করেছিলেন?

মস্তক কন্ডূয়ন করে কারাধ্যক্ষ বললেন, মহারাজ, বয়োজ্যেষ্ঠ এই বন্দির বিচার করেছিলেন আপনার পিতা স্বর্গত মহারাজ, গুপ্তকক্ষে বিচার হয়েছিল। বন্দির অপরাধের কোনো বিবরণ কোথাও নথিভুক্ত নেই। তবে অপরাধ বিশেষ গুরুতর হওয়ারই সম্ভাবনা।

নবীন মহারাজ বললেন, বন্দি নিজে কিছু স্বীকার করেননি?

কারাধ্যক্ষ মাথা নেড়ে বললেন, না, তিনি বাক্যালাপ কমই করেন। তাঁর কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করা সম্ভব নয়।

তিনি কি দাম্ভিক এবং দ্রোহভাবসম্পন্ন?

তাঁর মুখশ্রী গম্ভীর এবং বিষাদযুক্ত বটে, কিন্তু তাঁর মনোভাব অনুমান করা কঠিন। প্রস্তরবৎ একধরনের ভাব আছে মাত্র।

নবীন রাজা ভ্রূকুঞ্চিত করে কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, আমাকে এই বন্দির সকাশে নিয়ে চলুন।

নবীন রাজা যখন কারাকক্ষে উপনীত হলেন তখন প্রবীণ বন্দি প্রস্তরময় প্রাচীরগাত্রে দেহভার কিছুটা অর্পণ করে উপবিষ্ট অবস্থাতেই নিদ্রা যাচ্ছিলেন।

রাজা সপ্রশ্ন নয়নে কারাধ্যক্ষের দিকে তাকালেন।

কারাধ্যক্ষ নিম্নস্বরে বললেন, উনি কখনো শয্যায় শয়ন করেন না।

এই সামান্য কথাটুকুর শব্দেই বন্দি জেগে উঠে রাজার দিকে তাকালেন, গভীর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, চোখে যেন সপ্তসূর্যের জ্যোতি বহ্নিমান। সেই চোখের সামনে নবীন রাজা কিছু অপ্রস্তুত বোধ করলেন, তারপর কারাধ্যক্ষকে ইঙ্গিতে বিদায় করে বয়স্ক মানুষের প্রাপ্য অভিবাদন জ্ঞাপন করে রাজা বললেন, আমি আপনার দর্শনার্থী।

বন্দি সরলকান্ড বৃক্ষের মতো ঋজু হয়ে বসলেন, তারপর ধীর স্বরে বললেন, আমাকে দেখার কিছুই নেই। আমি মৃত, মুক্ত, কলুষহীন।

নবীন রাজা মাথা নেড়ে বললেন, অবশ্যই কোথাও কোনো ভুল হয়ে থাকবে। আপনাকে অপরাধী বলে মনে হয় না। ভদ্র, দীর্ঘ কারাবাসে আপনি অনেক ক্লেশ সহ্য করেছেন। আমি আপনাকে বলতে এসেছি, আপনি সম্পূর্ণ মুক্ত ও স্বাধীন, আপনি যদৃচ্ছা যেতে পারেন। কিন্তু একটি প্রশ্ন, আপনি নিজেকে মৃত বলছেন কেন?

বন্দি তাঁর তীক্ষ্ণ ও আক্রমণকারী দৃষ্টিতে রাজার দিকে চেয়ে রইলেন অনেকক্ষণ, তারপর বললেন, মৃত্যু কত রকম হয় তা কি আপনি জানেন, নব্যযুবা? আপনার দেহে রাজপুরুষের লক্ষণ প্রকট, সম্ভবত আপনি এ রাজ্যের ভাবী রাজা। এই নবীন বয়েসে আপনি মৃত্যুর রহস্য কতটুকুই বা উপলব্ধি করতে সক্ষম?

জ্যেষ্ঠ, আপনার কাছ থেকে এ বিষয়ে কিছু শ্রবণ করতে চাই। আপনি মৃত্যু বিষয়ে বলুন।

প্রবীণ ধীর স্বরে বললেন, আপনার পিতা আমাকে মৃত্যুদণ্ড দেননি, কারণ তাতে আমার প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হত। তিনি আমাকে দেন দীর্ঘ কারাবাস, যাতে আমার যন্ত্রণা বহুগুণ হয়। এই বেঁচে থাকা যে মৃত্যুর চেয়ে কতদূর দুঃসহ তা শুধু ভুক্তভোগী জানে। নব্যযুবা, বহুদিন ধরে তিল তিল পরিমাণ বিষভক্ষণ করে গেলে যে ধীর-মৃত্যু মানুষকে আচ্ছন্ন করতে থাকে আমার দণ্ড তার চেয়েও বেশি।

কিন্তু আপনার অপরাধ?

প্রবীণ মাথা নাড়লেন, আমার অপরাধ কোথাও নথিভুক্ত নেই। আমি তা বলতে অক্ষম।

ভদ্র, আমি কোনো স্বীকারোক্তি দাবি করছি না, সামান্য কৌতূহল নিবারণের আগ্রহ ছিল মাত্র। আপনার বলতে ক্লেশ হলে বলবেন না। আপনি এখন মুক্ত।

আমি চিরকালই মুক্ত। কারাগারেও মুক্ত, কারাগারের বাইরেও মুক্ত।

একথার অর্থ কী ভদ্র?

প্রবীণ মৃদু একটু হাস্য করলেন। বললেন, যে দহন এতকাল আমাকে দগ্ধ করেছে তাই ক্রমে অমলিন করেছে আমার আত্মাকে। যন্ত্রণার ভিতর দিয়েই কলুষ উদবায়ী হয়েছে।

আজ এক প্রসন্নতায় আমার অন্তর্লোক উদ্ভাসিত। আমার দেহটি কোথায়, কী অবস্থায় রয়েছে তা আর বড়ো কথা নয়।

নবীন রাজা উদার এক মহিমা বিকিরণ করে বললেন, জ্যেষ্ঠ, কারাগারের বাইরে আপনার স্বজনেরাও নিশ্চয়ই অপেক্ষমান। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা?

প্রবীণ ভ্রূকুঞ্চন করলেন। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে রাজাকে অবলোকন করে বললেন, তারা কেউ কখনো আমার উদ্দেশ করেনি। তারা কেউ আছে কি নেই তাও আমি জানি না। অন্তর থেকে তাদের স্মৃতিও আমি অবলুপ্ত করেছি। আমি এখন একা এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ।

নবীন রাজা প্রশ্ন করলেন, আপনার গৃহ?

আমার গৃহ বলে এখন আর কিছু নেই। এই কারাগারই আমার গৃহ ছিল, এবার হয়তো গৃহ হবে বৃক্ষতল।

রাজা বিনীতভাবে বললেন, জ্যেষ্ঠ, যদি স্পর্ধা মনে না করেন তাহলে আপনি রাজঅতিথিদের বিশ্রামগৃহে আতিথ্য গ্রহণ করতে পারেন। আপনাকে বিচক্ষণ ও প্রজ্ঞাবান মানুষ বলে মনে হচ্ছে। আপনি বৈরাগ্যেও উপনীত হয়েছেন। আপনি ইচ্ছে করলে রাজকর্মেও নিযুক্ত হতে পারেন।

প্রবীণ সন্দেহাকুল নয়নে রাজাকে নিরীক্ষণ করে বললেন, আমার প্রতি আপনার এই দাক্ষিণ্যের কারণ কি নব্য রাজা? দাক্ষিণ্য প্রদর্শনের জন্য তো অনেক প্রার্থী রয়েছে আপনার চারপাশে।

নবীন রাজা তাঁর সরল দুখানি উজ্জ্বল চক্ষুতে চেয়ে বললেন, জ্যেষ্ঠ, আপনার চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং বৈরাগ্য আমাকে আকর্ষণ করছে।

প্রবীণ কঠোর কর্কশ কণ্ঠে ঈষৎ উচ্চগ্রামে বলে উঠলেন, আপনার পিতা দুরদর্শী এবং বহুদর্শী ছিলেন। আপনি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনাশূন্য। আমার অপরাধ কী তাও আপনি ভালো করে জানেন না।

নবীন রাজা এতক্ষণ শান্ত ও স্থির ছিলেন। এখন কিঞ্চিৎ উজ্জ্বলতা প্রকাশ করে বললেন, জানবার প্রয়োজন নেই।

প্রবীণ বন্দি অট্টহাস্য করে উঠলেন হঠাৎ, বললেন, জানলে আপনি ভ্রমক্রমেও আমাকে রাজকার্যে নিয়োগের প্রস্তাব করতেন না। বরং আমাকে নির্বাসনে দিতেন।

নবীন রাজা বললেন, সেটাও অনুমানসাপেক্ষ।

প্রবীণ হঠাৎ রাজা এবং রাজার দিকে চকিতে দৃষ্টিক্ষেপ করে বললেন, স্বর্গত রাজার কোনো পুত্রসন্তানাদি ছিল না। আপনি তাঁর বৃদ্ধ বয়সের সন্তান। নবীন রাজা, আপনি কি জানেন, কোন রহস্যে আবৃত আপনার জন্মবৃত্তান্ত?

নবীন রাজা কোষবদ্ধ তরবারিতে হাত রাখলেন। তাঁর চোখে সপ্তসূর্যের জ্যোতি প্রতিভাত হল। তিনি প্রবীণ বন্দির দিকে চেয়ে অস্খলিত কণ্ঠে বললেন, মূর্খ সে রহস্যের আভাস যদি অনুমানই না করত তাহলে এই দীন বন্দিনিবাসে নিশুতি রত্রিতে আমার আগমন ঘটবে কেন?

প্রবীণ রাজার এই ভাবান্তরে এবং কথায় স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে রইলেন। বাক্য স্ফুরিত হল না মুখে। তবে তাঁর চোখ দুখানি ধীরে ধীরে কোমলতায় আচ্ছন্ন হল। বাষ্পাকুল হয়ে গেল। নবীন রাজার দিকে মুগ্ধদৃষ্টিতে তিনি কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে অস্ফুট কণ্ঠে বললেন, তেজ আছে বটে। না হবে কেন? পুত্রেরা পিতার মতোই হয়ে থাকে।

তিন টুকরো গল্প

১. ঘুষ

গোবিন্দর পিছনে যে গোয়েন্দা লেগেছে তা বুঝতে তার কয়েকদিন সময় লাগল। আসলে লোকটাকে বাড়ির আশেপাশে ঘুরঘুর করতে দেখে প্রথমে তাকে গোয়েন্দা বলে সন্দেহই হয়নি। লোকটির চেহারা বেশ শক্তপোক্ত, রুক্ষ, রাগী-রাগী, চোখে তীক্ষ্নদৃষ্টি। মাথায় ঝাঁকড়া চুল, দাড়ি প্রায়ই কামানো থাকে না, পরনে সাধারণ জামা আর প্যান্ট। সে আড়ে আড়ে বাড়ির ওপর নজর রাখে, চোখাচোখি হলে চোখ সরিয়ে নেয়, তবে পালায় না।

প্রথমে গোবিন্দর সন্দেহ হল, লোকটা তার বউয়ের গুপ্ত প্রণয়ী বা জার। তাই সে একদিন খুব সাহস সঞ্চয় করে বউ শাশ্বতীকে ডেকে বলল, লোকটা কে?

শাশ্বতী মেদ কমানোর জন্য ব্যায়াম করছে, নাচ শিখছে। সুফলও ফলেছে। আজকাল তাকে বেশ ছুকরি-ছুকরি লাগে। প্লাক করা ভ্রূ ওপরে তুলে চরম বিস্ময়ের সঙ্গে বলল, কোন লোকটা গো?

ওই যে, ফটকের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। প্রায়ই ওকে আনাচে কানাচে দেখি ও তোমার ইয়ে টিয়ে নয় তো!

শাশ্বতী জানালায় ঝাঁপিয়ে পড়ে ফটকের পাশে দাঁড়ানো লোকটাকে দেখে তার স্টেপ কাট করা চুল ঝামরে বলল, কখনো নয়। ও মা, এসব আবার কী কথা তোমার মুখে! লোকটাকে তো আমি চিনিই না।

এই নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া শুরু হল। সেই ঝগড়া চলল তিন দিন। তারপর মান অভিমান, কান্নাকাটি। শাশ্বতী অবশেষে বলল সে একমাত্র তার ব্যায়ামশিক্ষক জগুদা ছাড়া আর কোনো লোককেই তার যোগ্য প্রণয়ী বলে মনে করে না।

এ কথা শুনে গোবিন্দ একটু নিশ্চিন্ত হল বটে, কিন্তু সন্দেহ গিয়ে পড়ল বড়ো মেয়ে পিয়ালীর ওপর। লোকটা পিয়ালীর প্রেমিক নয় তো!

কথাটা একদিন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তুলতেই পিয়ালী গম্ভীর মুখে করে বলল, হাবুলদা ছাড়া আমার জীবনে আর কোনো--

গোবিন্দ খানিকটা স্বস্তি বোধ করল বটে, কিন্তু লোকটা তাহলে কে, এই প্রশ্নটা কেরোসিনের গন্ধের মতো চারপাশের বাতাসে লেগেই রইল।

তবে কি গোয়েন্দা? বলতে কি গোবিন্দের ওপর গোয়েন্দাদের নজর পড়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। গোবিন্দ যে ইদানীং শাঁসালো হয়ে উঠছে তা বহু চেষ্টা করেও গোপন রাখা যাচ্ছে না।

গোবিন্দ শুরু করেছিল একেবারে শুরু থেকে অর্থাৎ 'কিছু না' থেকে। তারপর ধীরে ধীরে তার উন্নতি ঘটেছে এবং এখনও ঘটেই চলেছে। একবার উন্নতি শুরু হলে তাকে ঠেকায় কার সাধ্য! কিন্তু গোবিন্দ বোকা নয়। সে তার উন্নতিকে যথেষ্ট সাবধানে এবং বিস্তর চেষ্টায় গোপন রাখে। সে তার নতুন জামায় তালি লাগিয়ে নেয়। ছেঁড়া জুতো পরে, পুরোনো ছাতা ব্যবহার করে, দুদিন পর পর দাড়ি কামায় ইত্যাদি। সে তার বাড়িটাকে ইচ্ছে করেই সম্পূর্ণ করেনি, একটু শ্রীছাঁদহীন করে রেখেছে। বিভিন্ন ব্যাঙ্কে তার আট দশটা লকার আছে, বাড়িতে মাটির নীচে আছে গুপ্ত কুঠুরি। কিন্তু সেগুলিতে সামান্যই সোনাদানা আছে তার। তার যত টাকা সবই নানা কারবারে উৎপাদনে, ঋণপত্রে লগ্নী করা। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই, গোবিন্দ যখন খুব গরিব ছিল তখন সে দেখেছে যে দারিদ্র্য জিনিসটাকে কিছুতেই ঢাকাচাপা দিয়ে রাখা যায় না। নানা ফাঁক-ফোকর দিয়ে দারিদ্র্য প্রকাশ হয়ে পড়েই এবং পাঁচজনকে জানান দেয় যে, এই লোকটা আসলে গরিব। মাছ দিয়ে শাক ঢাকছে। আবার সম্পদ জিনিসটাও ঠিক তাই, যতই চাপা দেওয়ার চেষ্টা করা যাক না কেন, নানা ফাঁক-ফোকর দিয়ে সম্পদ উঁকি মারবেই এবং পাঁচজনকে জানান দেবে যে, এই লোকটা আসলে শাঁসালো। শাক দিয়ে মাছ ঢাকছে।

গোবিন্দর বউ লোক-দেখানো গয়না পরেন বটে, কিন্তু তাঁর বাঁ হাতের অনামিকায় যে হিরের আংটিটা আছে তার দাম ত্রিশ হাজার টাকা। আর ব্যায়ামের শিক্ষক আর নাচের গুরু মাসে পাঁচশো টাকা করে নেয়। বিউটি পার্লারেও নিশ্চয়ই মোটা টাকা খরচ হয়,. তার রেট গোবিন্দও অবশ্য জানে না। সে নিজে তালি দেওয়া জামা আর তালি দেওয়া জুতো পরলেও তার ছেলেমেয়ে বাজারের সেরা জামা জুতো পরে, সেরা স্কুলে পড়তে যায় এবং প্রত্যেকের আবার প্রতিটি বিষয়ের জন্য আলাদা আলাদা গৃহশিক্ষক বা শিক্ষিকা আছেন, যাঁরা কেউ পাঁচশো টাকার কম নেন না। ষাট সত্তর টাকা থেকে দেড়শো টাকা কিলোগ্রামের মাছ তারা ফেলে ছড়িয়ে প্রতিদিন খায়। এসব কি আর গোপন থাকে?

সম্পদ হল নতুন-প্রেমে-পড়া কিশোরীর মতো, সারাক্ষণ ফাঁক -ফোকর দিয়ে উঁকিঝুঁকি দেয়। আর তখন ওই গোয়েন্দাটার সঙ্গে কি আর চোখাচোখি হয় না তার?

লোকটা যে গোবিন্দের ওপর নজর রাখছে তা সে গোপনও করছে না তেমন। এবং লোকটি তার সম্বন্ধে কী ভাবছে তা আন্দাজ করতেই গোবিন্দর ভীষণ লজ্জা হয়। ভয় তো আছেই।

গোবিন্দ যতই গরিব সেজে থাকুক তার হাতঘড়িটার দাম চার হাজার টাকা। সেদিন বেরোবার সময় গোবিন্দ লক্ষ করল, লোকটা ফটকের পাশে দাঁড়িয়ে আড়াচোখে তার ঘড়িটাকে নজর করছে। গোবিন্দর বুকটা কেঁপে উঠল। সে তাড়াতাড়ি ঘড়িটা কানের কাছে তুলে একটু ঝাঁকিয়ে শোনার ভান করে স্বগতোক্তি করল, এ বন্ধ হয়ে গেছে। হবে না। আশি টাকার সস্তা ঘড়ি আর কদ্দিন চলবে।

শাশ্বতী যথেষ্টই সুন্দরী। ইদানীং ব্যায়াম করে আর নেচে আরও সুন্দরী হয়েছে। খঞ্জনা পাখির মতো শরীর। রাস্তায় বেরোলে পাঁচজনে তাকায় এবং তারিয়ে তারিয়ে দেখে। কিন্তু নির্লজ্জ গোয়েন্দাটা শাশ্বতীকে না দেখে বাঁ হাতের একরত্তি হিরের আংটিটার দিকে ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে থাকে।

বাজারে গিয়ে মাছ বা অসময়ের দামী ফুলকপি কিনতে গিয়ে গোবিন্দ প্রায়ই টের পায়, গোয়েন্দা তার ঘাড়ে শ্বাসফেলার মতো দুরত্বে দাঁড়িয়ে আছে।

লোকটা সি বি আই না ইনকাম ট্যাক্স না অ্যান্টিকরাপশান না আর কিছু তা বুঝতে পারছে না গোবিন্দ। কিন্তু অবস্থাটা যে চলতে দেওয়া যায় না তা সে বেশ বুঝতে পারছে। এর একটা বিহিত হওয়া দরকার।

গোবিন্দ তক্কে তক্কে রইল। আর একদিন শীতের রাতে গলির মধ্যে লোকটাকে একা পেয়ে গেল। লোকটা একটু আনমনা ছিল সেদিন। আকাশের চাঁদ দেখছিল।

গোবিন্দ খুব কাছে এগিয়ে গিয়ে বিগলিত গলায় ডাকল, স্যার?

অ্যাঁ?

আপনি কী ঘুষ খান?

লোকটা একেবারে আঁতকে উঠে গোবিন্দর দিকে বাক্যহারা হয়ে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল!

কী বললেন?

গোবিন্দ হাসিটাকে বিগলিত করে হাত কচলাতে কচলাতে বলল, আজ্ঞে জিজ্ঞেস করছিলুম, আপনি কি ঘুষ খান?

লোকটা কথা শুনে নববধূর মতো মাথা নত করে ফেলল লজ্জায়। তারপর অতিশয় লাজুক হাসি হাসতে হাসতে ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে প্রায় ফুলশয্যার রাতের নববধূর মতোই ফিসফিস করে বলল, খাই।

আজ্ঞে এখন কি খাবেন?

লোকটা লজ্জায় চোখ তুলতে পারল না। তবে খুবই অনুরাগে ভরা গলায় বলল, পেলেই খাই। কেউ তো দেয় না স্যার।.

গোবিন্দ তৈরিই ছিল। পকেটে হাত ভরে দশ টাকার একখানা নোট বের করে লোকটাকে লাজুক হাতে ধরিয়ে একেবারে আদর করে মুঠি পাকিয়ে দিল। .

লোকটা নববধূর মতোই প্রথম পুরুষস্পর্শের লজ্জাতেই যেন চট করে হাতটা টেনে নিয়ে প্যান্টের পকেটে পুরল। তারপর গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, এর অবশ্য তেমন দরকার ছিল না স্যার।

গোবিন্দ গাঢ় স্বরে বলল, দুনিয়াটা টিকে আছে তো এই পরস্পরকে দেখার মধ্যেই। আপনি আমাকে দেখবেন, আমি আপনাকে।

বড়ো ভালো কথা স্যার, বাড়ি গিয়ে খাতায় টুকে রাখব। মহাপুরুষদের বাণী নোট করে রাখা আমার হবি স্যার।

ঠাট্টা করছেন স্যার? মহাপুরুষ আর হতে পারলুম কই? আমি তো কাপুরুষ। রেটটা বোধ হয় একটু কম হয়ে গেল স্যার। গরিব মানুষ আমি, নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। তার ওপর আপনিই তো শুধু নন, আপনার ওপরওলা সাহেবরা আছেন, তার ওপর কর্তারা আছেন, তারওপর খোদ কর্তারা আছেন, তাঁদেরও খুশি করতে হবে। তা কটা বাজে বলতে পারেন স্যার? ঘড়িটা কখন থেকে বন্ধ হয়ে আছে।

আজ্ঞে এই দশটা। আপনার সব কথাই আমি খাতায় টুকে রাখব স্যার। একসঙ্গে এত ভালো ভালো কথা বহুকাল শুনিনি।

আর ঠান্ডা লাগাবেন না। রাতও হয়েছে। শীতের রাতে খাবার বড়ো তাড়তাড়ি জুড়োয়।

লোকটা বিরহের দৃষ্টিতে একবার গোবিন্দর দিকে চেয়ে চলে গেল।

দুদিন পর ফের দেখা। রাতের গলিতে। এবার লোকটাই ডাকল, স্যার।

গোবিন্দ একটু থমকে বিগলিত হাস্যে মুখ ভরিয়ে ফেলে বলল, ভালো আছেন তো স্যার?

আপনার আশীর্বাদে চলে যাচ্ছে। বলছিলুম কি, আমি কিন্তু ঘুষ খাই স্যার। এখন পেলেও খাই--

গোবিন্দ খুব বিজ্ঞের মতো হাসল। প্রথম দিন থেকে সে রেটটা কম রেখে দূরদর্শিতারই পরিচয় দিয়েছে, মাঝে মাঝে দশটা টাকা দিতে এমন কিছু গায়ে লাগে না। একশ টাকা হলে লাগত। ফের দশটা টাকা লোকটার লাজুক মুঠির মধ্যে ভরে দিয়ে সে বলল, আরে তাতে কি, খাওয়াই তো দুনিয়ায় সব। এই যে বাড়ি ফিরে গিয়ে মোটা চালের ঠান্ডা ভাত

আর জলের মতো একটু ডাল, কালো মতো একটা ছেঁচকি কয়েক ফোঁটা চোখের জল মিশিয়ে গিলব স্যার, তার মধ্যেও একটা সূক্ষ্ম আনন্দ আছে।

এ কথাটাই যা বলেছেন, আর কোনো শালার মহাপুরুষ বলতে পারেননি। ডট পেনটার রিফিল ফুরিয়ে না গেলে আজই গিয়ে লিখে ফেলতাম।

লোকটাকে নিজের পকেটের দামি ডট পেনটা উদারভাবে দিয়ে গোবিন্দ একটু হাসল, বলল, কি সব ছাতামাথা বলি, তবু যদি লিখে রাখবার ইচ্ছে হয় স্যার তো লিখবেন। তবে রিপোর্টটা একটু গরিবের দিকে টেনে লিখবেন স্যার। আপনার ডট পেনের রিফিল আমি কখনো ফুরোতে দেব না।

লোকটা চলে গেল, দু-চার দিন পর আবার এল।

স্যার।

স্যার।

কী যে নেশা ধরিয়ে দিয়েছেন স্যার, আর ছাড়তে পারছি না।

কিসের নেশা স্যার?

আজ্ঞে ঘুষের, ঘুষ না খেলে কেমন যেন শরীরটা ঘুষঘুষ করে। আইঢাই করে, হাই ওঠে, ঘুম পায়, দুঃস্বপ্ন দেখা দেয়, কী নেই কী নেই মনে হয়। ওফ, জবর নেশা বটে। তিন দিন হল ঘুষ খাইনি স্যার, দেখুন কেমন দড়ি পাকিয়ে গেছি।

আহা! আগে বলতে হয়। এই যে-- বলে ফের দশটা টাকা তার কুণ্ঠিত মুঠিতে ভরে দেয় গোবিন্দ। তারপর বলে, আচ্ছা আপনি কি সি বি আই?

আজ্ঞে না।

তবে কি ইনকাম ট্যাক্স?

আজ্ঞে না।

অ্যান্টিকরাপশানই তাহলে?

আজ্ঞে না।

তাহলে আপনি কোন ডিপার্টমেন্টের?

তোফাজ্জেলের কারখানায় বিড়ি বাঁধার কাজ করি স্যার। বড়ো ছেলেটা লায়েক হয়েছে। তার একটা চাকরির জন্যই ঘোরাঘুরি করছিলুম স্যার আপনার কাছেপিঠে। কিন্তু ওফ, ছেলের চাকরির চেয়েও বড়ো জিনিস আপনি দিয়েছেন স্যার আমাকে। কী নেশা, কী নেশা! একদিন ঘুষ না খেলেই হাত নিশপিশ করে, নাক সুড়সুড় করে, মাথা ভোঁভোঁ করে। ঘুষের মতো জিনিস হয় না।

অ্যাঁ । বলে গোবিন্দ হাঁ করে চেয়ে রইল। তারপর রাগ করে বলল, আরে মশাই, আপনি তো মহা ইয়ে দেখছি, এঃ, আমি আপনাকে ইয়ে মনে করে এতগুলো টাকা গচ্চা দিলুম।

লোকটা সবেগে মাথা নেড়ে বলল, গচ্চা নয় স্যার, লোকশিক্ষা। ঘুষ কাকে বলে কখনও জানতুম না স্যার, আপনার দয়ায় জানলুম। এও জানলুম, ঘুষ ছাড়া মানুষের জীবনটাই আলুনি বিস্বাদ। কী করে যে এত কাল ঘুষ না খেয়ে বেঁচে ছিলুম তাই ভাবি আর অবাক হই। ঘুষটা বন্ধ করবেন না স্যার, মরে যাবো।

গোবিন্দ রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলল, তা বলে--রাগ করবেন না স্যার। আপনার ভুল হয়নি। ঘুষ জিনিসটায় আমাদের সকলেরই জন্মগত অধিকার।

কিন্তু পায় কয়জন? আপনার দয়ায় এই আমি পেয়েছি।

তা বলে তোমাকে ঘুষ দিতে যাবো কেন হ্যা!

লোকটা চোখ নামিয়ে নববধূর মতো লাজুক গলায় বলল, সব খবরই নিয়েছি স্যার। হিরের আংটি, চার হাজার টাকা দামের ঘড়ি, পাঁচশো টাকার মাস্টার --

গোবিন্দ লোকটার কাঁধে হাত রেখে হাসল। বলল, ঠাট্টা করছিলুম, কিছু মনে করবেন না। মাঝে মাঝে আসবেন। পরস্পরকে আমরা না দেখলে কে আর দেখবে!

আজই খাতায় টুকে ফেলব স্যার।

২. ক্ষুধা ও জাতীয় সংহতি

ক্ষুধা কথাটার মানে ব্যাকরণ বইতে আছে 'খাইবার ইচ্ছা'। চারুবাক মানেটা জানে। আর এও জানে এত বড়ো ভুল মানে আর হয় না! অন্তত তার ক্ষেত্রে তো বটেই। চারুবাকের খিদে পায়, গনগনে খিদে পায়, কিন্তু কখনো ওই 'খাইবার ইচ্ছা' হয় না। পৃথিবীতে এত রকমের খাবার, তার কোনোটাই তার কখনো মুখে তুলতে হচ্ছে করে না। খাওয়ার কথা ভাবলেই সে ভয়ে শিউরে ওঠে। খাওয়ার সময় ঘনিয়ে এলেই তার মন খারাপ হয়ে যেতে থাকে। খাবার মুখে তোলা, চিবোনো এবং তা গিলে ফেলা পৃথিবীতে তার কাছে সবচেয়ে অনভিপ্রেত এবং শ্রমসাধ্য কাজ। পেটে খিদে নিয়েই দিব্যি দিন কাটিয়ে দিতে পারে সে। দিনের পর দিন।

শিশুকালে তাকে বাঁচিয়ে রাখতে তার মাকে হিমশিম খেতে হয়েছে। বুকের দুধ বা ফিডিং বটলের চুষি মুখে নিত না বলে তাকে থাপ্পড় মেরে বা চিমটি কেটে কাঁদিয়ে নিয়ে ঝিনুক দিয়ে গেলানো হত। প্রায়ই সেই দুধ উগরে দিত সে।

বড়ো হয়ে চারুবাক যে বেঁচে আছে এটাই অনেকের কাছে বিস্ময়। তার বউ শীলার কাছেও। শীলা চারুবাকের এই অরুচি দেখে দেখে পাগল হওয়ার উপক্রম। তাকে খাওয়াবেই, এই জেদবশে সে হাজার রকমের রান্না শিখেছে, রেঁধেছে, কিন্তু চারুবাক এমনভাবে নাক কুঁচকে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছে যে অনেকবার আত্মঘাতী হওয়ার ইচ্ছে হয়েছে শীলার।

কেন খাবে না, কেন খাও না তুমি। কীভাবে বেঁচে থাকবে তবে?

শীলার এই আর্ত প্রশ্নের সামনে খুবই সংকুচিত হয়ে চারুবাক বলে, বেঁচে তো আছি। রোগা হলেও দিব্যি চলেফিরে বেড়াচ্ছি তো।

কিন্তু আমি যে এত যত্ন করে রাঁধি, এত আদর করে বেড়ে দিই?

তা বটে, কিন্তু পৃথিবীর কোনো খাবারই আমার রোচে না।

শীলা রাগে, ক্ষোভে, হতাশায় অসহায়ের মতো কাঁদতে থাকে। চারুবাক নির্বাক হয়ে বিষণ্ণ বদনে বসে থাকে। চারুবাক ফ্রিজ পছন্দ করে না। বাড়ির মধ্যে দুটি ঘরে সে পারতপক্ষে ঢোকে না, রান্নাঘর আর খাওয়ার ঘর। সে সবজি বা মাছের বাজারে যেতে খুবই অনিচ্ছা প্রকাশ করে। সে মিষ্টির দোকান, রেস্টুরেন্ট দেখলে চোখ ফিরিয়ে নেয়।

একদিন দুদিন পর নিতান্তই বেঁচে থাকার জন্য কিছু না কিছু খেতেই হয় চারুবাককে। সেই সময়টা তার মুখে ফুটে ওঠে ভয়, ক্রোধ, অসহায়তা। ডাক্তাররা তবে এই অরুচির কারণ খুঁজতে গিয়ে হার মেনেছেন। স্বাস্থ্যকর জায়গায় যাওয়া বা হাওয়া বদল গেছে বৃথা! চারুবাকের খিদে পায় শুধু 'খাইবার ইচ্ছা' কখনোই হয় না।

একটা সেমিনারে দিল্লি যাচ্ছিল চারুবাক। ট্রেনে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ। গিন্নি, ছেলে, মেয়ে শালাশালীর বাহিনী নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন। বেশ ধমক চমক করে কথা বলেন, আত্মবিশ্বাস প্রবল। লব্ধপ্রতিষ্ঠিত অধ্যাপক চারুবাককে পেটে আঙুলের খোঁচা মেরে তিনি অম্লানবদনে বললেন, আমি এদের নিয়ে বেরিয়েছি জাতীয় সংহতি জিনিসটা বোঝানোর জন্য। ঘুরবে, ফিরবে, মিশবে, দেখবে, শিখবে, তবে না সংহতির বোধটা আসবে।

চারুবাক বলল, তা বটে।

চারুবাকের পেটে দ্বিতীয় খোঁচাটা মেরে ভদ্রলোক বললেন, জাতীয় সংহতি জিনিসটা আর অত সহজ নয় মশাই। এই যে খালিস্তান নিয়ে লড়ালড়ি, গোর্খাল্যান্ড নিয়ে ধানাইপানাই কেন জানেন?

আজ্ঞে না।

খুব সোজা মশাই, খুব সোজা, ভারতীয় হিসাবে তারা নিজেদের আইডেন্টিফাই করতে পারছে না যে। এত বড়ো একটা দেশ, এতগুলো ভাষা, এত ধর্ম, আইডেন্টিফাই করা কি সোজা? মানুষ দিশেহারা হয়ে যায় না? এই যে আমরা এক পরিবারের এতগুলো লোক একসঙ্গে চলেছি, এই আমরাই মাঝে মাঝে আইডেনটিটি হারিয়ে ফেলি। তাই আমি--

এই সময়ে ভদ্রলোকের স্ত্রী একটা কাঁসার রেকাবিতে এক গোছা লুচি আর আলুর ছেঁচকি ভদ্রলোককে এগিয়ে দেওয়াতে কথায় বাধা পড়ল। খাবার দেখে চারুবাকও তাড়াতাড়ি চোখ বুজে ঘুমের ভান করতে লাগল।

তবে লোকটা খাওয়া সেরে আরও কিছুক্ষণ জাতীয় সংহতির কথা বলে আপার বাংকে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। সকালবেলায় বাংক থেকে নেমে লুঙ্গির কষি আঁটতে আঁটতে চারুবাকের দিকে চেয়ে বলল, হ্যাঁ, যে কথাটা হচ্ছিল। ভারতীয় হিসেবে আমাদের আইডেনটিটি কী মশাই? অ্যাঁ ! আইডেনটিটিটা কী? আমি যে ইন্ডিয়ান, ইন্ডিয়ানরা যে এক পরিবারের লোক, তা আমি ফিল করব কীভাবে?

চারুবাকের ট্রেনে ভালো ঘুম হয় না। মেজাজ শরীর দুই-ই বিগড়ে আছে, কোনোরকমে দেঁতো হাসি হেসে বলল, প্রবলেম, দারুণ প্রবলেম।

সম্মোহিতের মতো উঠে দাঁড়াল চারুবাক। নিজের নয়, যেন অন্য কারোর ইচ্ছাশক্তিতে চালিত হচ্ছে সে। কী হচ্ছে তা সে বুঝতে পারছে না। তার গা ঘিনঘিন করছে, পেটের মধ্যে উথালপাতাল, গলায় আটকে রয়েছে বমি।

টলতে টলতে চারুবাক বেসিনের কাছে এল। আয়নায় ওটা তো তারই মুখ! হ্যাঁ, তারই। তবু মুখটা যেন প্রাত্যহিক নয়। অন্যরকম।

লাল ব্রাশটা সমেত হাত উঠে এল মুখের কাছে। চারুবাক সভয়ে চোখ বন্ধ করল।

তারপর অবধারিত টের পেল, দাঁতের সঙ্গে ব্রাশের সংঘর্ষের সেই চিরপরিচিত শব্দ। কুড়কুড় কুড়কুড় ঘুসঘুস, ঘ্যাসঘ্যাস...

মুখ ধুয়ে ফিরে এল চারুবাক। আশ্চর্য, তার ঘেন্নাপিত্তি গেল কোথায়? কেননা যেন ফুরফুরে লাগছে নিজেকে! জ্বর সেরে গেলে যেমনটা হয় তেমনই যেন! লাল ব্রাশটা সহর্ষে ওপরের দিকে তুলে ধরলেন ভদ্রলোক। তারপর চেঁচিয়ে বললেন, আর কারো লাগবে দাদা! দয়া করে বলবেন। বি ওয়ান অফ আওয়ার ফ্যামিলি, বি এ গুড সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া, লজ্জা করবেন না...

একটার পর একটা কুণ্ঠিত হাত এগিয়ে আসতে লাগল একে একে।

একটা স্টেশন এসে গেছে। প্ল্যাটফর্মে পুরি তরকারি, শিঙাড়া কচুরি বিক্রি হচ্ছে।

চারুবাক হাঘরের মতো খাবার কিনে গোগ্রাসে খেতে লাগল। তার অরুচি সেরে গেছে।

৩. বাজী ও কুকুর

বাজির শব্দে কুকুরটা ভয় পেয়ে খাটের তলায় ঢুকেছে। আর সেখান থেকেই পরিত্রাহি আর্তনাদ করে যাচ্ছে। একটানা একঘেয়ে, স্নায়ুবিদারক। ডিউক খুবই ভালো জাতের অ্যালসেশিয়ান কুকুর। কখনো কাঁদে না বা ডাক ছেড়ে চেঁচায় না। ধমক শোনে, আদর সোহাগ বোঝে। কিন্তু কালীপুজোর দিন তার সব শিক্ষাদীক্ষা জলাঞ্জলি দিয়ে সে রাস্তার কুকুরের মতোই চেঁচায়।

রণেন অনেকবার চেষ্টা করেছেন ডিউককে ঠান্ডা করতে, অন্তত চুপ করিয়ে রাখতে। পারেননি। এখন কুকুরের চিৎকারে তাঁর স্নায়ু বিকল হওয়ার জোগাড়।

ডিউকের সঙ্গে রণেনের তেমন মাখামাখি নেই। গৃহপালিত পশুপাখি তাঁর পছন্দ নয়। ছেলেবেলায় আদরের কুকুর, বেড়াল ও পাখির মৃত্যু কয়েকবার দেখেছেন, পোষা খরগোশ তাঁর কোলেই মরে গিয়েছিল। সেই থেকে তিনি আর পশুপাখি পোষেননি।

ডিউককে কোনো এক কুকুর-ব্যবসায়ীর কাছ থেকে কিনে এনেছিল তাঁর ছেলে লুকু। এনেছিল তাঁর জন্যই। বছর দেড়েক আগে রণেনের স্ত্রী রত্নাবতী আকস্মিকভাবে মারা যান। রণেন যে খুব ভেঙে পড়েছিলেন তা নয়। তবে একটু চুপচাপ হয়ে গিয়েছিলেন। লুকু ধরে নিয়েছিল, তিনি পত্নীশোকে ভেঙে পড়েছেন। নানাভাবে রত্নাবতীর শূন্যস্থান পূরণের একটা অক্ষম চেষ্টা লুকু করেছে। কাজটা সে ছেলে বলেই করেছে। কিন্তু ফলটা ভালো হয়নি। রত্নাবতী মারা যাওয়ার পর তাঁকে পুরী এবং ভুবনেশ্বর ঘুরিয়ে এনেছিল লুকু এবং তার জন্য নিজের বউ সুমিতার কাছে যথেষ্ট কটু কথা শুনেছে। আদিখ্যেতা আজকালকার মেয়েরা পছন্দ করে না। তার ওপর এই কুকুর। লুকুর ধারণা, কুকুরটা সঙ্গী হিসেবে থাকলে রণেনের মনটা একটু ভালো থাকবে, বিদেহী পত্নীপ্রেম হয়তো-বা কুকুরকে কেন্দ্র করে একটা আশ্রয় পেয়ে যাবে। পায়নি, বলাই বাহুল্য, কারণ রণেনের পত্নীপ্রেম ছিল না।

সারমেয়প্রেমও তাঁর দরকার নেই। তবু লুকু পাছে দুঃখ পায়, সেই ভেবে তিনি প্রথম প্রথম জোর করে কুকুরটাকে একটু একটু লাই দিতেন। তারপর সম্পূর্ণ নিরাসক্ত হয়ে পড়েন। আসলে বুড়ো বয়সে একটাই অভাব থাকে। কথা বলার লোক থাকে না। আর বুকে এক গাদা কথা জমে থাকে কাউকে বলবার জন্য। যেমন ছিল তাঁর নাতি জয়। কিছু বুঝত না, কিন্তু শুনত। বলতও অজস্র। ঠিক যেমন বন্ধুরা হয় আর কি।

একদিন লুকুকে তিনি বলে ফেলেছিলেন, জয়টা যদি কাছে থাকত তবে বেশ হত।

লুকু অবাক হয়ে বলল, সেটা কী করে সম্ভব?

রণেন জানেন, সম্ভব নয়। তাঁর একমাত্র নাতি জয়কে বছর খানেক হল নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলে ভরতি করা হয়েছে। ওরকম নামি স্কুলে যে ভরতি করা গেছে সেইটাই লোকে সৌভাগ্য বলে মানবে। সুতরাং তাকে আর কাছে পাওয়ার আশা করা বৃথা। তবে স্কুল বন্ধ থাকলে আসে। এখন যেমন এসেছে। কিন্তু সেই আগের জয় আর নেই। এক বছরের মধ্যেই কেমন একটু সাবালক এবং ভারিক্কি হয়েছে। দাদু-দাদু এখনও করে বটে, কিন্তু কেমন যেন একটু কেজো মানুষ হয়ে গেছে, সেই নেই-আঁকড়ে আবদারে ভাবটা আর নেই।

ঘাড়ে দীর্ঘদিনের স্পন্ডেলাইটিসের ব্যথা। তবু নীচু হয়ে চৌকির তলায় কুকুরটাকে দেখবার চেষ্টা করছিলেন রণেন। গলা তুলে কেঁ-উ কেঁ-উ করে ডাকছে। সন্ধে থেকে ডাকছে বলে গলাটা কি একটু ভাঙা ভাঙা?

বাড়িতে রণেন আর রান্নাবান্নার লোকটি ছাড়া কেউ নেই। শমিতাদের বাড়ি বাগবাজারে বিরাট করে কালীপুজো হয়। অনেক টাকার বাজি পোড়ে, গোটা কয়েক পাঁঠা বলি হয়। ওরা আজ ওখানেই থাকবে। তবে লুকু ফিরে আসতে পারে। সেরকমই বলে গেছে।

শিবু। শিবু। আবার ডাকলেন রণেন। এ পর্যন্ত বহুবার ডেকেছেন। শিবু ফ্ল্যাটে বা আশেপাশে নেই। রান্নাঘর খোলা পড়ে আছে, বাতি জ্বলছে! পনেরো ষোলো বছরের ছেলেকে আজকের রাতের অন্যমনস্কতার জন্য দোষ দেওয়া যায় না। দশতলার ছাদে বাজি পোড়ানো হচ্ছে, একতলায় পুজো। তারই কোথাও গিয়ে সেঁটে আছে। ডাল ভাত

তরকারি ঝোল সব ওবেলাই রেঁধে ফ্রিজে ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে। রাতে শুধু গরম করে দেবে। রণেন রাত দশটা সাড়ে দশটার আগে খান না। সুতরাং শিবু নিশ্চিন্ত।

রণেনের ফ্ল্যাটটা বেশ বড়োই। দেড়হাজার স্কোয়ার ফুট। সস্তাগণ্ডার সময়েও সোয়া লাখ দাম পড়েছিল। এখন হেসেখেলে ছ-সাত লাখ টাকা। রত্নাবতীর নামেই করেছিলেন। এখনও তাঁর নামেই আছে। এই ফ্ল্যাটে রণেনের নিজস্ব একখানা ঘর আছে। সবচেয়ে ছোটো ঘরখানাই তিনি বেছে নিয়েছেন। সেই ঘরে জিনিসপত্র বলতে গেলে কিছুই নেই। খরচ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনকেও সংকুচিত করে ফেলেছেন তিনি। জামাকাপড়ের ওয়ার্ডরোব একসময়ে উপচে পড়ত। আজকাল একজোড়া হাওয়াই আর একজোড়া বেরোনোর চপ্পল। বারোটা লাইটার ছিল। সিগারেট ছেড়েছেন তিন বছর আগে। এখন একটাও লাইটার নেই। বক্স খাটটা ছেলেকে দিয়ে একখানা সাধারণ চৌকি পেতে নিয়েছেন ঘরে। আর একখানা ইজিচেয়ার। ছোট্ট একটা টেবিল। রণেনের বিষয়সম্পত্তি বলতে এইটুকুই। তবে বইপত্র কিছু আছে, কিছু সাময়িক পত্রিকা। এগুলোই অবসরের সঙ্গী।

কাচের শার্শি সবই বন্ধ। তবু বীভৎস লাগাতার বাজির শব্দ ঠেকানো যাচ্ছে না। এরকম ছেদহীনভাবে বাজি পোড়াতে হলে কত টাকা খরচ হতে পারে তা রণেন ভেবে পান না। তার ওপর এই শব্দ সহ্য করার জন্য শক্ত নার্ভও চাই। বাজির শব্দের সঙ্গে ডিউকের চিৎকার রণেনকে যেন খান খান করে ভেঙে ফেলছে।

অন্যসব দরজা বন্ধ এবং চাবি দেওয়া। কেন কে জানে, ওরা কোথাও বেরোলে ঘরগুলো সব বন্ধ করে রেখে যায়। শুধু বসার ঘর আর রান্না ঘর খোলা থাকে। রণেনের অন্য কোনো ঘরে গিয়ে আত্মরক্ষা করার উপায় নেই, বসার ঘর ছাড়া। কিন্তু বসার ঘরটা গিয়ে শেষ হয়েছে গ্রিল দেওয়া বারান্দায়। সেখানে কোনো কাচের শার্শি নেই। এই সাংঘাতিক, প্রাণঘাতী বাজির শব্দ সেখানে আটকানো যাবে না। আর তিনি গেলে ডিউকও তাঁকে অনুসরণ করবেই।

অসহায়ভাবে রণেন ইজিচেয়ারে বসে একটা ম্যাগাজিন খুলে অন্যমনস্ক হওয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ভিতরটা এমন কাঁপছে, এত অস্থির লাগছে যে উঠে পড়তে হল।

ঘাড়ের ব্যথা নিয়েই আবার নীচু হলেন, ডিউক! ডিউক!

ডিউক ফিরে তাকাল এবং বলল, কী বলছ?

রণেন ছিটকে পড়লেন মেঝেয়। মাথাটা ঝিমঝিম করল। আজকাল বুড়ো বয়সে কি ভীমরতি ধরল! না কি স্বপ্ন দেখছেন?

বাঁ কনুইতে একটু চোট পেলেন। তবে তেমন কিছু নয়। ফের উঠলেন রণেন। সভয়ে নীচু হয়ে ডিউকের দিকে চাইলেন। ডিউক দু-থাবার মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে কেঁউ কেঁউ করে কাঁদছে।

ডিউক!

তখন থেকে কেন যে ডাকছ। আমি বেরোব না। যাও।

বুকটা ধক করে উঠেই যেন কয়েক সেকেন্ডের জন্য থেমে গেল। তবে ফের চলল। ধড়াস ধড়াস করে। একটু শ্বাসকষ্টও হতে লাগল রণেনের।

সাবধানে আবার ডাকলেন, ডিউক!

তখন থেকে কেন যে ফ্যাচ ফ্যাচ করছ! কী চাও বলো তো।

অবিশ্বাস্য। সম্পূর্ণ ভৌতিক! অলৌকিক! তবু রণেন এবার নিজেকে শক্ত রাখলেন। কাঁপা গলায় বললেন, তুই কি কথা বলতে পারিস?

পারি। তবে এখন কাঁদছি। কঁদতে দাও।

কাঁদছিস কেন?

আমার পূর্বজন্মের কথা মনে পড়ছে।

পূর্বজন্ম? ওরকম কিছু সত্যিই আছে নাকি?

আছে। না থাকলে মনে পড়বে কেন?

পূর্বজন্মে তুই কী ছিলি? কুকুরই তো!

না। তবে কুকুরের অধম। বারোটা ছেলেপুলে ছিল। না খেয়ে খেয়ে, রোগে ভুগে চোখের সামনে মরেছে। দুটোকে চোর বলে পিটিয়ে মারে। একজন জেল খাটছিল। সে বেঁচে আছে কি না জানি না। রাস্তার কুকুরের মতো এঁটোকাঁটা খুঁটে খেতুম। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতুম, কুকুরের মতোই যদি বেঁচে আছি তবে কুকুরই করলে না কেন? সেই প্রার্থনা ভগবান বোধহয় শুনেছেন। বাজির শব্দে মাথাটা কেমন টলমল করছিল, হঠাৎ সব মনে পড়ল।

এ জন্মে তোর কেমন লাগছে?

সুখে আছি, বেশ সুখে। আগের জন্মের চেয়ে ঢের ভালো মাংসের সুরুয়া খাই, গমের খিচুড়ি, সাত তলায় বাস, সুখের বাকি কী? শুনলুম তোমার ছেলে আমাকে সাতশো টাকায় কিনেছে! শুনে ভারি আনন্দ হল। আমার এত দাম হবে ভাবিনি কখনো।

চুপ, চুপ। অত টাকায় তোকে কেনা হয়েছে তা খবরদার বলিসনি। তাহলে লুকুকে তার বউ বকবে।

জানি। লুকু কমিয়ে বলেছে। সত্তর টাকা। তাইতেও বাপান্ত হচ্ছে। কিন্তু যার জন্য কেনা হল সে পাত্তা দিচ্ছে না।

রাগ করিস না ডিউক। আমি কী জানতুম যে--

তোমার বউয়ের অভাব আমি মাদি কুকুর হয়েও পূরণ করতে পারব না বাপু, তা ঠিক।

তুই মাদি নাকি?

তাও জানো না! আচ্ছা লোক বাপু!

তোর নাম যে ডিউক।

সে যদি তোমরা নাম দাও তাতে আমার কী করার আছে?

আগের জন্মে মদ্দা ছিলি?

না, মাদিই। বললুম না, রাস্তার কুকুরের মতো জীবন ছিল। বারোটা বাচ্চা হল বারোটা পুরুষের দোষে। তারা কেউ আমার স্বামী ছিল না। আমি তো বেওয়ারিশ, বেশ্যার অধম।

খুব কষ্ট ছিল তোর!

এখনও আছে। বড়ো কষ্ট। এখন যাও ইজিচেয়ারে বসে থাকো গে। আমি একটু কাঁদি।

কাঁদ ডিউক।

রণেন ইজিচেয়ারে এসে বসলেন। একাই একটু হাসলেন তিনি। খুশিই লাগছে মনটা। কথা বলার মতো একজনকে পাওয়া গেল এতদিনে। সময়টা কেটে যাবে।

মাধুর জন্য

মাধু যখন ছোটো ছিল, তিন কি চার বছর যখন তার বয়স, তখন কলকাতার প্রকৃতিহীন ফ্ল্যাটে বাক্সবন্দি জীবনযাপন থেকে মাঝে মাঝে তাকে মুক্ত করতে আমি, অর্থাৎ তার বাবা তাকে রবিবার রবিবার প্রকৃতি দেখাতে নিয়ে গেছি ময়দান, সোনারপুর, উলুবেড়ে বা ওরকম সব জায়গায়। স্ত্রী নারাজ ছিল বলে আমাদের এই একটির বেশি দুটি হয়নি। মাধু আমাদের একমাত্র। আমাদের সব আদর ভালোবাসার প্রচণ্ড ও একমুখী লক্ষ্যস্থল। সেই প্রবল আদরের ধাক্কা সামলে আজ সে--

আজকের কথা পরে। কথা হল, মাধুকে আমি আমার মতো মানুষ করতে চেয়েছি, আমার স্ত্রী চেয়েছে তার মতো করে। মাধু কাউকেই নিরাশ করেনি। মনে হয় এক মাধু দু-রকমভাবে বেড়ে উঠেছে। এক মাধু দু-রকম মানুষ হয়েছে। হতেই হয়েছে তাকে। না হয়ে উপায় ছিল না। আমি তাকে প্রকৃতি দেখাতে চেয়েছি, শিখিয়েছি ভিখিরিকে ভিক্ষে দিতে। ছবি আঁকা শেখাতে চেয়েছি, ইচ্ছে ছিল বড়ো হয়ে সে ডাক্তার হোক, যা আমি হতে চেয়েও পারিনি। আমি একসময়ে কিছু ব্যায়াম করেছিলাম এবং হাওড়াশ্রী হয়েছি দুবার। ফলে মাধুকে ব্যায়াম শেখানোর প্রতিও আমার আগ্রহ ছিল। আমার স্ত্রী তাকে ইংলিশ মিডিয়ামে চোলাই করে, নৃত্যগীত পারদর্শিনী ও তেজস্বিনী করতে চেয়েছে। সেটাও কিছু খারাপ নয়।

মাধু এই বৈশাখে সতেরো পূর্ণ করল। পার হয়ে গেল আমাদের বিংশতিতম বিবাহ বার্ষিকী। আমি বিস্তর ক্লেশ ও ত্যাগ স্বীকার করে এবং আমার স্ত্রীর অক্লান্ত প্রয়াসে অবশেষে আমরা একটা ওনারশিপ ফ্ল্যাট কিনতে পেরেছি লেক গার্ডেনসে। স্বামী ও স্ত্রী প্রতি মাসেই নিজ নিজ বেতন থেকে ফ্ল্যাটের বকেয়া টাকা শোধ করে যাই। আমার ও আমার স্ত্রী চমকের

মধ্যে বোঝাপড়া বা সমঝোতা চমৎকার। সেই কারণেই আমাদের দাম্পত্যজীবনের প্রেমহীনতা বাইরে থেকে একেবারেই বোঝা যায় না।

প্রেমহীনতা কথাটা বেশ মোলায়েম। ঘৃণা, বিদ্বেষ ইত্যাদি শব্দের চেয়ে প্রেমহীনতা অনেক গভীর ও নরম শব্দ। বাস্তবিকই আমি ও আমার স্ত্রী পরস্পরকে ঘৃণা করি না, পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষও নেই। সাত বছর প্রেম করার পর আমরা বিয়ে করি এবং বিয়ের দু বছরের মধ্যেই বুঝতে পারি যে, বিয়ের আগে সাত সাতটা বছরের পণ্ডশ্রম আসলে একটা 'সোনার হরিণ চাই' গোছেরই কিছু ছিল। ওই সাতটা বছর কেন যে আমরা পরস্পরকে চেয়ে গেছি লাগাতার, সেইটেই একটা প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াল। তা বলে আমরা ঝগড়াঝাঁটি এবং অন্যান্য ফ্যাঁকড়া তুলিনি। তবে পরস্পরের প্রতি নিস্পৃহতা আসতেও সময় লাগেনি।

সৌভাগ্যবশত আমার স্ত্রী দুর্দান্ত বেসরকারি বাণিজ্যিক সংস্থায় চাকরি করে। আমার চাকরি পুলিশে। দুজনের রোজগার যোগ করলে এ বাজারেও মোটামুটি ভদ্রভাবে বেঁচে থাকা যায়। এই অর্থনৈতিক কারণটাই আমাদের বিয়ের পর জুড়ে রাখল।

পুলিশের চাকরিতে উপরি রোজগারের প্রলোভন অঢেল। তাই বলে সব পুলিশই চোর একথা ভাবতে নেই। অন্তত আমি নই। তার কারণ এমন নয় যে, আমি সৎ এবং চরিত্রবান। আসলে ঘুষ খাওয়াটার আমি কোনো মানেই খুঁজে পাই না। আর কেমন যেন ফালতু টাকা হাত পেতে নিতে একটু ভিখিরি-ভিখিরি লাগে নিজেকে। লজ্জা হয়। এটা অবশ্য একটু অভ্যাস করলেই কেটে যেত। কিন্তু আমি প্রথম থেকেই অভ্যাস করিনি। তুলনামূলকভাবে আমার স্ত্রীর রোজগার অনেক ভালো।

বিয়ের পর তিন বছর বাদে আমরা খুব হিসেব-নিকেশ করেই মাধুকে পৃথিবীতে আনি। মাধু আমাদের বিবাহিত জীবনের দ্বিতীয় আঠা। অর্থনীতি ও সন্তান এই দুই না থাকলে দাম্পত্যজীবনটা আমাদের আরো খাপছাড়া হয়ে যেত।

জন্মের কিছু পরেই মাধু আমাদের দুজনকে পেয়ে বসল। মাধু ছাড়া আমরা আর কিছুই যেন চোখে দেখিনি।

সেই মাধু এখন সতেরোয়।

সুন্দরী কি না? সেটা বলা মুশকিল। তবে বোধহয় খারাপ নয়। বেশ লম্বাটে, স্বাস্থ্যবতী, বুদ্ধিমতী মেয়ে। গান, নাচ, কথ্য ইংরেজি, ছবি আঁকা ইত্যাদি সব বিষয়েই চলেবল।

প্রি-মেডিকেলে অ্যাডমিশন নিয়েছে এবং বোধহয় ডাক্তার হয়ে বেরিয়েও আসবে।

আমার একটু মদ্যপানের অভ্যাস আছে। একটু মেয়েমানুষের দোষও। তবে এ দুটোই আমার স্ত্রী চমকের অনুমোদনপ্রাপ্ত। চমকের সঙ্গে তার এক সহকর্মী দীপ্তসুন্দরের একটু ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। আমি সেটা অনুমোদন করেছি কারণ আমরা দুজনেই এক বাক্সঘরে বসবাস করে বুঝেছিলাম পরস্পরকে পাওয়ার পর আর পরস্পরকে দেওয়ার মতো নতুন কিছু আমার বা চমকের নেই। দীপ্তসুন্দর সেই নতুন কিছু হয়তো-বা দিতে পারে চমককে। তবে তারা ছেলেমানুষ নয়। সংসার ভাঙবে না, সন্তানেরও জন্ম দেবে না, এসব গ্যারান্টি আছে। সমঝোতা আছে। আমিও কোনোদিন মাতাল হয়ে ফিরব না বা খারাপ পাড়ায় পুরো রাত কাটাব না। দুজনেরই এইসব ক্ষমার যোগ্য দোষ থাকায় পরস্পরকে মুখ দেখাতে আমাদের তেমন লজ্জা হয় না। আমাদের লুকোনোরও বেশি কিছু নেই পরস্পরের কাছে। লুকিয়ে কী হবে? দীপ্তসুন্দর চমকের বস। অফিসের বিভিন্ন টেকনিক্যাল কাজের ভিতর দিয়ে ওদের মধ্যে চমৎকার একটা পেশাদারি আত্মীয়তা গড়ে উঠেছে। দীপ্তসুন্দর চমকের জন্য জানকবুল করে অফিসে লড়ে যায়। লিফট, স্পেশাল ইনক্রিমেন্ট ইত্যাদি পেতে চমকের কোনো অসুবিধে হয় না। পরস্পরকে ওদের প্রয়োজন হয় অনেক বেশি। সে ব্যাপারে আমার নাক গলানোটা নিতান্তই সিঁদ-কাটা! আমার চেয়ে বরং দীপ্তসুন্দরই চমককে বোঝে এবং জানে বেশি। তুলনায় আমি অবশ্য ততটা ভাগ্যবান নই। চমকের একজন খাঁটি প্রেমিক আছে। আমার নেই। আমার মেয়েমানুষেরা ভাড়াটে, হৃদয়হীন, শরীরসর্বস্ব। তাহোক। হৃদয়ের জন্য আমার আঁকুপাকুঁ নেই। পুলিশের লোক বলে আমার কাছ থেকে তারা পয়সা নিতে চায় না। তবু পাছে শরীর নেওয়াটাও ঘুষের পর্যায়ে পড়ে যায় সেইজন্য আমি দু-পাঁচ টাকা তাদের দিই। তারা খুশি হয় এবং আমার সঙ্গে প্রেমের অভিনয় পর্যন্ত করে।

লোকে এসব শুনে হয়তো বলবে, নোংরামি। তা একরকমের বিচারে হয়তো তাই। বিচারবোধ এবং বিচারের মাপকাঠি নানা ধরনের। কারটা ঠিক, কারটা বেঠিক তা বলা শক্ত। কিন্তু আমরা অকপটভাবে আমাদের মতোই। কিন্তু এসব অভ্যাস আমরা বাড়ির বাইরেই রেখেছি। মাধু তার কুফল কখনো ভোগ করেনি। আমাদের বাক্সঘর মোটামুটি শান্ত, শুভ্র, নিষ্কলঙ্ক। মাধুর প্রতি আমাদের ভালোবাসা খাদহীন। আমি ও চমক মাধুর জন্য একটি স্বর্গ রচনা করার চেষ্টা করেছি। তার ভবিষ্যৎ কুসুমাস্তীর্ণ করে দেওয়ার জন্য আমরা প্রাণ পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত। মাধুকে নিয়ে আমরা বছরে একবার বা দুবার কাছে বা দূরে বেড়াতে যাই। মাধুর জন্য প্রতি বছর বেশ কয়েকবার নানা উপলক্ষ্যে দারুণ সব মড পোশাক ও গয়না কেনা হয়। মাধুর প্রিয় মাছ ও মুরগি, মাধুর প্রিয় রাবড়ি বা আইসক্রিম রোজই বাড়িতে আসে। মাধুর অপ্রিয় রং, মাধুর অপ্রিয় কোনো সেন্ট এ বাড়িতে ঢোকে না। মাধুকে খুশি রাখার জন্য আমি ও চমক চমৎকার, ঝগড়াহীন একটা দাম্পত্য আবহাওয়া বজায় রেখে চলি।

ঘটনাটা ঘটল এইভাবে। থানার একটা মার্ডার কেস জমা পড়লে আমাকে প্রাথমিক তদন্তের ভার দেওয়া হয়। স্পটে গিয়ে দেখি, একজন কুড়ি-বাইশ বছরের ছোকরা উপুড় হয়ে নালার ধারে পড়ে আছে। পরনে ফুলপ্যান্ট আর একটা ব্যানলনের গেঞ্জি। বেশ ভালো চেহারা। বুকে আর মাথায় দু-দুটো ৩৮ বোরের রিভলবারের ফুটো। ফটোগ্রাফাররা কাজ সেরে চলে যাওয়ার পরে ডেডবডি সরানোর আগে আমি ছোকরাটাকে সার্চ করতে গিয়ে তার বুক পকেটে মাধুকে লেখা আমার ফ্ল্যাটের ঠিকানা-সমেত একটা চিঠি পেয়ে যাই। নিয়মমতো চিঠিটা অন্যান্য প্রাপ্ত জিনিসের সঙ্গেগ থানায় জমা দেওয়ার কথা। বলা বাহুল্য আমি তা করিনি।

খুনের কেস-এ প্রাথমিক তদন্ত যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি ক্লান্তিকর। আইডেনটিফিকেশন হয়ে যাওয়ার পর মৃতের আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের কাছে হাঁটাহাঁটি, খোঁজখবর ইত্যাদি খুবই একঘেয়ে এবং রুটিনমাফিক ব্যাপার। রহস্য বা রোমাঞ্চ তেমন কিছু থাকেও না। এইসব করতে দিন তিনেক যথেষ্ট হিমশিম খেতে হল। জানা গেল, ছোকরা বেহালার সুকল্যাণ দত্ত, মেডিকেল ছাত্র, ফোর্থ ইয়ার।

এই তিন দিন আমি মাধুকেও এ ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করিনি, করা উচিতও হত না। তবে খবরের কাগজে খুনের খবর ছিল। আমি জানি, মাধু ওটা পড়েছে। যদি নাও পড়ে থাকে তবে কলেজে অন্তত আলোচনা শুনেছে। না শুনে বা না জেনে তার উপায় নেই। কিন্তু তার মুখে বা চোখে সেরকম কোনো বিভ্রান্তি, শোক বা বিস্ময়ের ছাপ দেখা গেল না।

মজা হল, আমিও চিঠিটা খুলে পড়িনি। সুকল্যাণ দত্তের চিঠিটা আমি আমার নিজের টেবিলের লকারে চাবি বন্ধ করে রেখে দিয়েছি।

আমাদের দেশের অধিকাংশ খুনই কাঁচা হাতের কাজ। তা বলে খুনী যে সবসময়েই ধরা পড়বে তার কোনো মানে নেই। এক কথা, সাক্ষীসাবুদ পাওয়া শশু, দ্বিতীয় কথা, রাজনৈতিক খুন হলে কিছু করার থাকে না। তিন নম্বর কথা হল, খুনীদের মোটিভ সবসময় বোঝা মুশকিল। এ ছাড়াও হাজারো অসুবিধে আছে। সব বলা সম্ভব নয়। তবু সুকল্যাণ দত্তের ব্যাপারে আমি পুলিশ বলে নয়, একজন শঙ্কিত হৃদয় বাবা হিসেবেও একটু বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লাম। মাধু মাত্রই ডাক্তারি পড়তে শুরু করেছে, সুতরাং ফোর্থ ইয়ারের কোনো ছাত্রের সঙ্গে ওর তেমন গাঢ় প্রেম হওয়ার কথাই নয়। ওর নিরুদবেগ ভাবও তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। তবু সুকল্যাণের পকেটে পাওয়া চিঠিটা আমাকে অস্বস্তি দিচ্ছিল।

চমক মেয়েমানুষ হলেও খুব আধুনিক মেয়েমানুষ। শক্ত ধাঁচের। তাকে কথাটা বলা যায়। একা আমি সমস্যাটা নিয়ে হিমশিম খাচ্ছিলাম। সুকল্যাণ দত্তের শোকগ্রস্ত বাবা-মা ভাই-বোন ও বন্ধুদের আমি জেরায় জেরায় জর্জরিত করে দিয়েছি। খুনের ক্লুও পাওয়া গেছে। কিন্তু মোটিভ বোঝা যাচ্ছে না, খুন করেছে কয়েকজন পেশাদার গুণ্ডা। আমি তাদের ভালোই চিনি। তারাও আমাকে চেনে। গা ঢাকা দিয়ে আছে। তবে একজনকে আমি কলাবাগানের বস্তি থেকে ধরে আনলাম। সে কবুল করল, কালো একজনের কাছে টাকা খেয়ে খুনটা অ্যারেনজ করেছে, কিন্তু পার্টিকে সে চেনে না। কালো হরিদ্বার পালিয়েছে।

সুতরাং অপেক্ষা করতেই হবে। কিন্তু অপেক্ষা করাটা যে দারুণ শক্ত ব্যাপার তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছিলাম। উত্তরপ্রদেশের পুলিশকে ব্যাপারটা জানানো হয়েছে। তারা এখনো

কালোর হদিশ দিতে পারেনি। আর কালো যে হরিদ্বারেই আছে এমন নয়। ওদের আমি খুব ভালো চিনি। মার্ডার করলে এবং গ্রেপ্তার এড়াতে হাজারো সাবধানতা নেয়।

কেস আদালতে উঠলে সুকল্যাণের প্রসঙ্গে মাধুর নামও এসে পড়ে কি না তাই নিয়ে আমার দুশ্চিন্তা। যে পার্টি সুকল্যাণকে খুন করিয়েছে সে আবার মাধুর প্রেমিক নয়তো! এ কি প্রেমের ত্রিভুজ?

একদিন মাঝরাতে শোয়ার ঘরের কবাট শক্ত করে এঁটে কথাটা চমককে বললাম।

কঠোর মুখ করে সবটা শুনে চমক বলল, চিঠিটা দেখি।

চিঠি রেডি ছিল। বের করে দিলাম।

চমক অবাক হয়ে বলল, এখনো খোলোনি?

সাহস পাচ্ছিলাম না। তুমি খোল।

চমক খুলল এবং পড়তে লাগল। বেশ বড়ো চিঠি। একটা ফুলস্ক্যাপ কাগজের দু-পৃষ্ঠা। অনেক সময় নিয়ে চমক পড়ল।

কী লিখেছে?

তুমি পড়ে দেখো। বলে চিঠিটা ফের আমার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে চমক ড্রেসিং টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে মুখে ক্লিনজিং ক্রিম মাখতে লাগল।

চিঠিটা খুলে আমি একটু থমকে যাই। আগাগোড়া ইংরেজি এবং অত্যন্ত জড়ানো অক্ষরে লেখা। ডাক্তারের হাতের লেখা সাধারণত খারাপ হয় জানি কিন্তু হবু ডাক্তারের লেখাও যে এত বিদঘুটে হতে পারে তা জানা ছিল না।

আমি কিছুক্ষণ চেষ্টা করে 'সুইট মাধবী ডারলিং...' পড়তে পারলাম। একটু হতভম্ব হয়ে চমকের দিকে চেয়ে বললাম, আমি তো পড়তেই পারছি না। তুমি কিছু বুঝলে?

চমক মুখটা আমার দিকে ফিরিয়ে বলল, রোজ আমাকে হরেকরকম হাতের লেখা দেখতে হয়।

তার মানে তুমি বুঝতে পেরেছ?

হ্যাঁ। তোমার বুঝে কাজ নেই।

তার মানে?

ওতে যা লেখা আছে তা জানলে তোমার রাতে ঘুম হবে না।

আমি একটু রেগে গিয়ে বলি, ওসব কী বলছ? আমি পুলিশ, রহস্যটা আমাকে সমাধান করতেই হবে। চিঠিতে কোনো ক্লু থাকলে সেটা আমার জানা দরকার।

চমক মৃদু স্বরে বলল, চেঁচিও না, তবে প্রথমেই বলি, চিঠিটার সঙ্গে খুনের এমনিতে কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু চিঠিটা সরিয়ে ফেলে তুমি বুদ্ধিমানের কাজ করেছ। ভয়ংকর অশ্লীল চিঠি।

কতটা?

যতটা হতে পারে।

ওরা কি সেক্সসুয়ালি...?

বহুবার। চিঠিতে তার একটা বিবরণ আছে।

আর কিছু?

হ্যাঁ। তোমার মেয়ের এটা প্রথম ঘটনা নয়।

বল কী? এসব মাধু শিখল কোত্থেকে?

কী করে বলব?

আরও ছেলের সঙ্গে?

দুজনের তো নাম পাচ্ছি। দেবাশিস আর সমুদ্র।

দুজনকে অ্যারেস্ট করা যায়?

নিশ্চয়ই যায়। কিন্তু মাধুরীর নাম গোপন রেখে নিশ্চয়ই নয়।

চিঠিটার দিকে আমি ভ্রূ কুঁচকে চেয়ে থাকি। একটা আশঙ্কা আমার ছিল যে, চিঠিটা খুব নিরাপদ নয়। কিন্তু এটা যে এরকম পত্রবোমা তাও আমি আশা করিনি। আমার শরীরের

ভিতরটা এমন অস্থির হতে লাগল যে ভয় হল আমার এক্ষুনি একটা স্ট্রোক হবে।

চমক ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে ক্রিম মাখতে মাখতে খুব নির্বিকার গলায় বলল, মেনে নাও।

কী মেনে নেব?

ব্যাপারটা।

কোন ব্যাপারটা?

তোমার মেয়ের ব্যাপারটা। তুমি খুব শকড হয়েছ বুঝতে পারছি।

আমার মাথাটা কেমন করছে। টলমল টলমল। চমক কী বলছে আমি তা সঠিক বুঝতে পারছি না। শুধু ওর প্রতিধবনি করে যাচ্ছি। আমার কোনো প্রশ্ন নেই। একটা ধাঁধাঁ আছে। আমি আবার ওর প্রতিধবনি করে বলি, শকড?

চমক আস্তে আস্তে কাছে এসে দাঁড়াল। পাতলা নাইনলের অতিস্বচ্ছ নাইটি পরা সুগন্ধী, সুদৃশ্য অভিজাত ও যৌন আবেদনে সমৃদ্ধ মহিলা। খুবই কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল। তারপর আমার মাথাটা নরম বুকের মাঝখানটায় চেপে ধরে বলল, ওরকম করছ কেন? একটু স্থির হও।

আমি কি অস্থির?

তোমাকে ভীষণ অ্যাজিটেটেড দেখাচ্ছে। চল্লিশ পার হয়েছ, এখন খুব মাথা ঠান্ডা রাখবে। অত ঘাবড়ে যাওয়ার কী আছে?

কী বলছ বুঝতে পারছি না।

চলো শোবে চলো। একটা ট্র্যাংকুলাইজার খেয়ে নাও।

আমি মাথা নাড়লাম, না। মাথার ভিতরটা গোলমাল লাগছে, আমাকে একটু ভাবতে দাও।

আমিও তো ওর মা। দেখো, আমি খুব ঘাবড়ে গেছি?

না। তবে আমার সব ওলটপালট হয়ে গেছে।

কীরকম ওলটপালট?

আমি যে মাধুকে ভীষণ ভালোবাসি। ভীষণ।

ও মা! বাসবে না কেন? তুমি তো ওর বাবা।

কথাটা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ চমক। আমি যে ওর বাবা সেটা আজ ভালো করে ভাবতে দাও। আমি একুট ছাদে যাব।

ছাদে! সর্বনাশ! কক্ষনো নয়! এসো আমার সঙ্গে শোও। আমি তোমার কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি, মাথায় বিলি কেটে দিচ্ছি।

চমকের দিকে চেয়ে আমার কেমন একটা ঘেন্নায় গা গুলিয়ে উঠল। ওই শরীর দেখানো নাইটি এবং তার স্বচ্ছতার ভিতর দিয়ে ফুটে ওঠা কাম্য শরীর আমার অস্পৃশ্য মনে হচ্ছিল। আমি একটা 'ওয়াক' তুলতে গিয়ে সামলে নিই। মাথা নেড়ে বলি, না, ছাদে যাব। খোলা হাওয়ায়।

চমক অবশ্য যেতে দিল না। তার হয়তো ভয় হল, মানসিক ভারসাম্যের অভাবে এই পরিস্থিতিতে আমি আটতলার ছাদ থেকে নীচে লাফিয়েও পড়তে পারি। তার বদলে নিরাপদ ছিল গ্রিল দেওয়া দক্ষিণমুখো বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসা অনেক ভালো বলে সে আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করল।

আমি তাই বসলাম। ভিতরের ঘরে মাধু অঘোরে ঘুমোচ্ছে। চমক হাই তুলে ঘুম তাড়ানোর চেষ্টা করতে করতে কর্তব্য হিসেবে আমার পাশে আর একটা বেতের চেয়ার টেনে বসে রইল। তার এই নৈকট্য আমার কাছে খুব অভিপ্রেত নয়, কিন্তু আমি কিছু বললাম না।

চমক ছেলে-ভুলোনোর কায়দায় বলল, এ যুগটা তো অন্যরকম। ঠিক আমাদের মতো নয়। এসব মেনে নিতে হবে।

আমার মাথা ঠান্ডা হয়নি। আমি চমকের তত্ত্ব বুঝতেও পারছি না। শুধু বললাম, তাই নাকি?

একটু চুপ করে থেকে চমক আচমকা বলল, আমরাও তো ভালো নই।

কথাটা স্বীকারোক্তি হিসেবে খুবই চমৎকার হত যদি তার সঙ্গে গভীর অনুশোচনা মিশে থাকত। কিন্তু তা তো নয়। চমকের এই বিবৃতি নিতান্তই একটি স্টেটমেন্ট অফ ফ্যাকট। অর্থাৎ আমরা খারাপ তাই আমাদের মেয়ে ওরকম হয়েছে। আমরা খারাপই থেকে যাব। সুতরাং মেয়ের ব্যাপারটাও মেনে নাও।

আমি খারপ না ভালো তার বিচার করার মতো যুক্তিবোধ আমার ভিতরে কাজ করছিল না। মাধু ফুলের মতো পবিত্র মাধু--যে হাঁ করলে এখনও তার মুখ থেকে আমি শৈশবের গন্ধ পাই--সে...।

চিঠিটার কথা তোমাকে বলে বোধহয় ভুল করলাম। হাতের লেখা পড়তে পারছিলে না সেটাই ভালো ছিল।

তাতে আমার কাছে ব্যাপারটা অজানা থাকতো মাত্র। কিন্তু সত্য তো আর পালটাত না।

চমক একটু ঝুঁকে আমার দিকে নিবিড়ভাবে চেয়ে বলল, তার মানে কি তুমি এখন সত্যটাকে উলটে দিতে চাও।

চাইলে? আমি প্রশ্ন তুলি।

সর্বনাশ! ও কাজ করতে যেও না। যদি শাসন করতে যাও মেয়ে একদম বিগড়ে যাবে।

বিগড়ে যাবে?

এখন তবু তোমার সঙ্গে এক ছাদের তলায় বাস করছে। কিছু বললে সটান বেরিয়ে গিয়ে কোনো ছেলেবন্ধুর রুমমেট হয়ে থাকবে। দরকার কী? আমরা না-জানার ভান করলেই হয়।

তুমি ওটা সমর্থন করছো?

ঠিক করছি না। আমার মতে একজন বা দুজন লাভার থাকা খারাপ কিছু নয়। ও একটু বাড়াবাড়িই করে ফেলেছে।

একটু নয় সাংঘাতিক।

ঠিক আছে। তুমি কিছু বলতে যেও না। আমি বুঝিয়ে বলবখন।

বুঝিয়ে বলবে! বুঝিয়ে বলবে! আমি বিড়বিড় করতে থাকি।

লক্ষ্মীটি, নিজে কিছু করতে যেও না। তুমি মাধুকে একটুও বোঝ না। যদি বুঝতে--

আমি হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠি, কিন্তু আমি বুঝতে চাই--

চমকের সুগন্ধি নরম হাত আমার মুখ চেপে ধরল।

কী জানি কেন চমকের দেহ আজ গরম, রক্ত টগবগ করছে, হাত সরিয়ে সে তার ঈষৎ ভেজা ঠোঁট চেপে ধরল আমার ঠোঁটে। আমার মনে হল একটা বিকট জোঁক আমাকে শুষে নিচ্ছে।

আমি উঠে পড়লাম। আবার বসলাম। বললাম, তুমি শুতে যাও।

চমক আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, আজ তুমি আমাকে নাও।

না।

না, কেন?

আমি রাগের স্বরে বললাম, তোমার এই পরিস্থিতিতে সেক্স জাগছে কী করে? আশ্চর্য।

জাগে। তুমি বুঝবে না। চলো।

না। তুমি যাও।

চমক একটা তীব্র শ্বাস ফেলল। তারপর উঠে গেল।

আমি একা। চুপচাপ নিজের মাথাটা চেপে ধরে বসে আছি। আমি কী করব? চওড়া চামড়ার বেল্ট দিয়ে আমি মাধুকে আগাপাশতলা পেটাতে পারি। গলা টিপে মেরে ফেলতে

পারি। সব পারি, কিন্তু সে যেন নিজেকেই নিজের নিষ্পেষণ। আমার মাধু--আমার ফুলের মতো মাধু--তার ভিতরে এই কীট এল কোথা থেকে? এল কেন?

অনেকক্ষণ বাদে যখন নিশ্চিত বুঝলাম চমক ঘুমিয়েছে তখন আমি নিঃশব্দে মাধুর ঘরে গিয়ে ঢুকি।

ঘরে একটা নীল আলো জ্বলে রোজ। আজ সেটা নেভানো। আমি ঘরে ঢুকে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকি কিছুক্ষণ। অন্ধকার? না, খুব-একটা অন্ধকার নয়, বাইরের আলো আসছে আবছা।

ডাকতে হল না। মাধু খুব নীচু স্বরে বলল, বাবা!

আমি শব্দ করলাম না।

মাধু বাতাসের মতো মৃদু শব্দে বলল, আমি কাঁদছি বাবা।

কেন কাঁদছ?

তোমার জন্য।

আমার জন্য?

শুধু তোমার জন্য। তুমি যে কত দূরে! কত দূরে। মনে হয় যেন বৈতরণীর ওপাশে।

তার মানে কী মাধু?

আমার মনে হয় তুমি বা মা--তোমরা যদি মরে যাও তাহলে আমার কান্না পাবে না। ভাবলে ভারি অস্বস্তি হয়।

আমি শিউরে উঠি।

আমার ভিতরটা বড়ো ঠান্ডা। ভীষণ কোল্ড ব্লাডেড। সুকল্যাণের জন্য আমার একটুও কষ্ট হয়নি। কারো জন্যই হয় না।

মাধু, তুমি জেনারেশন গ্যাপের কথা বলছ?

না, না আমি বলতে চাই, নতুন এক প্রজন্মের কথা। তুমি বুঝবে না!

বুঝব না?

না, কিছুতেই না। আমরা মঙ্গলগ্রহ থেকে আসা মানুষের মতো। রোবটের মতো।

তুমি কে মাধু?

আমি কারো মেয়ে নই, কারো বউ নই, আমি কারো মা হবো না। আমি মাধু, শুধু মাধু। তুমি যাও। আমি সহজে কাঁদি না, কত কষ্টে আজ চোখে একটু জল এনেছি, মুডটা নষ্ট করে দিও না। যাও।

আমি ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসি। আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে বা লিফটে করে নামব না।

ট্রিলজি

১. তোমার চোখ

I am Lazarous

come from the dead.

Come to tell you all,

I shall tell you all.

তোমার চোখের মধ্যে কবে ডুবে মরলাম, ঠিক বলতে পারি না।

কিন্তু মরার পর রোজ আমি নাড়ি দেখি। চলছে না। শ্বাস দেখি। বন্ধ। বুকে হাত রাখি। ধুকধুকুনি নেই। রোজ এই কাণ্ড।

চোখের রহস্য কোনোদিন ভেদ হওয়ার নয়।

তোমার নামটি কী ছিল বলো তো। জানি না। জিজ্ঞেস করা হয়নি। আলাপও তো হল না এ জীবনে। একবার দেখা হয়েছিল মাত্র। আর নয়।

তবু আমি তোমার একটা নাম দিয়ে রেখেছি সেই কবে থেকে। মনোরমা। সেই সময়ে, যখন তোমার সঙ্গে দেখা, আমার হাতে ছিল বঙ্কিমের মৃণালিনী। পড়েছো? পড়ে দেখো, মনোরমা ঠিক মর্তের মানবী নয়, দেবীও নয়। ওই একরকম। যাকে চেনা যায়, আবার যায়ও না।

তখন আমার কৈশোরকাল, তুমিও কিশোরী। আমিনগাঁও ফেরিঘাট থেকে স্টিমার ছেড়ে গেছে, আমরা কিছু বিলম্বিত যাত্রী একটা নৌকোয় ব্রহ্মপুত্রের বিক্ষুব্ধ স্রোত পাড়ি

দিচ্ছিলাম, মনে পড়ে? পড়বে না জানি। কত বছর কেটে গেছে। আরও কতবার কত খেয়া পেরিয়েছ তুমি। আমিও। সব পারাপার মনে কি থাকে? শুধু সেই নৌকোয় তুমি ছিলে বলে আমার আজও চোখ বুজলেই সেই স্রোত মনে পড়ে। আমিনগাঁও আর পান্ডু--দুই দিকেই পাহাড় ও পাথুরে তীরভূমি, গৌহাটির কাছে মোড় ফিরে ব্রহ্মপুত্র সেই সংকীর্ণ খাতে আর একটা মোচড় দিয়েছে শরীরে। তাই বাঁকা স্রোত সেইখানে আবর্ত ও ফেনায় ভয়ংকর।

আকাশ ছিল মাথার ওপর। বর্ষণ শেষ মেঘমুক্ত ধোয়াকাচা নীলবর্ণ। ছিল সুস্পষ্ট কালচে সবুজ রঙের পাহাড়ের শ্রেণি। দুদিকেই। যাত্রীর ভারে মন্থর নৌকো একটু উজানে গিয়ে কোনাকুনি গা ছেড়ে দেবে শুধুমাত্র হালের জোরে ভাঁটিয়ে গিয়ে ঠেকবে পাণ্ডুর ঘাটে। এই ছিল নিয়ম। বাঁদিকে আমিনগাঁওয়ের সেই টিলাটা দেখে ছিলে তুমি? তার ওপর দুটো মস্ত মস্ত খোড়ো বাংলোবাড়ি। মনে নেই? ওর একটাতে থাকতাম আমরা।

তোমাকে দেখলাম ঊর্ধ্বমুখ। ভারি অবাক চাউনি চোখে, মুখখানা অল্প একটু ফাঁক হয়ে আছে। টুলটুল করছে মুখখানা। তুমি সুন্দর ছিলে কি না তা ওই বয়সেই অনভিজ্ঞ চোখে তো বুঝতে পারিনি। আজও সেই ধন্দ রয়ে গেছে। সুন্দর ছিলে কি? আমি তোমার সবটুকু তো দেখিওনি ভালো করে। দুখানা অবাক চোখ।

ওই উঁচু টিলার ওপরকার আকাশ দেখতে দেখতে চোখ দুখানা নামল ধীরে ধীরে। তখনও আবিলতা আসেনি আমাদের কারো চোখেই। নৌকোর দুই ধারে বসেছিলাম আমরা দুজন। কানার ওপর। বাঁশের ঠেকনো ছিল পিছনে। দুজনের মাঝখানে ঠাসাঠাসি গাদাগাদি মানুষও ছিল অনেক। তাদের আমি লক্ষই করিনি। তোমার দুখানা চোখ নেমে এসে খঞ্জনার মতো চারদিকে নেচে নেচে সব কিছু দেখছিল।

চঞ্চল সেই খঞ্জনা স্থির হল আমার চোখের ওপর এসে।

অনন্ত মূহূর্ত কাকে বলে সেইদিন, সেইক্ষণে জেনেছিলাম। বুক ব্যথিয়ে উঠল কয়েক শতাব্দীর পূঞ্জীভূত বিরহ বেদনার শেষে। এক গুহামানুষের জন্মে শুরু হয়েছিল যে অন্বেষণ, তা হাজার হাজার বছরের জন্ম ও মৃত্যু, সভ্যতার অনেক উত্থান ও পতন, অনেক শ্রম ও অধ্যবসায়ের পর শেষ হল বুঝি! কিশোর বয়সের বোধ তো তেমন গভীর নয়। মনে কেবল

অস্পষ্ট সব শব্দের আনাগোনা, তবু আমি ঠিকই শুনতে পেলাম এক দূরাগত দামামার ধ্বনি। কোথায় যেন যুদ্ধ চলছে। পতন হচ্ছে রাজ্যের। এক বিজয়ী ঘোড়সওয়ার শত্রুর রক্তে রাঙা বল্লম উঁচিয়ে ধুলো উড়িয়ে ছুটে চলেছে দিগ্বিজয়ে।

মনোরমা, তুমি চোখ ফেরাওনি। আজ আবদ্ধ এক চোখে সেই ধূসর অতীতের দিকে চেয়ে আছি। তুমি চোখ ফেরাওনি বলে ধন্যবাদ। অজস্র ধন্যবাদ তোমাকে। এক কাঙাল কিশোরকে অপমান করনি, আহত করনি তার অভিমান। তোমাকে ধন্যবাদ।

মানুষ কিছুতেই দেখতে পায় না নিজের মুখ। আমি সারাজীবন ধরে চেষ্টা করেছি সেই কয়েক মুহূর্তে আমার মুখশ্রীর অপার্থিবতা লক্ষ করতে। বয়ঃসন্ধির সেটা বড়ো দুঃসময় জীবনে। হঠাৎ লম্বা হয়ে ওঠা শরীরে তেমন মাংস লাগেনি, হনুর হাড় আর কণ্ঠা দেখা যায়। বড়োরা সন্দেহের চোখে তাকায়, ছোটোরাও দলে নিতে চায় না। নিজেকে কেমন যেন ঘেন্না হয়। সেই সময়টাতেই মানুষের সবচেয়ে বেশি আদর ভালোবাসার প্রয়োজন। কিন্তু হায়, বয়ঃসন্ধিই তার সবচেয়ে খরার সময়।

কিন্তু ওই কয়েক মূহুর্তে আমার খরার আকাশ তুমি ভরে দিয়েছিলে বাদল মেঘে। কী বৃষ্টি! কী বৃষ্টি! আমার কোষে কোষে সঞ্চারিত হয়ে গেল প্রাণবান জল। মনে হল, আমার মুখ এক অলৌকিক দীপ্তি বিকীরণ করছে।

সেই আমার মরে যাওয়ার আগে শেষ জ্বলে ওঠা।

পাণ্ডুর ঘাটে নৌকো কখন ভিড়ল তা জানি না। কখন এক ভিড় লোক যে যার গন্তব্যে চলে গেল টেরও পাইনি। শুধু ঢালু জমি বেয়ে চলে যেতে দেখেছিলাম তোমাকে। একদম সমভূমির সীমানায় উঠে তুমি আর একবার ফিরে দেখেছিলে আমাকে।

কী দেখেছিলে জানি। ব্রহ্মপুত্রের রুপোলি জলে শূন্য এক নৌকোর খোলে পড়ে আছে প্রাণহীন কিশোরের দেহ।

অন্ধকার ঘরে আমার স্ত্রী হারিকেন জ্বেলে দিয়ে গেল। চারদিকে মশার ডাক। আমি এখন রুটি আর তরকারি খাব একটু। তারপর আমার ছেলেমেয়েদের পড়তে বসাব। সকাল

হবে। রাত হবে। কাজে যাওয়া। কাজ থেকে ফেরা। এইমতো দিন যায়। একদিন সময়ের চাকা তার খাঁজকাটা দাঁতে তুলে নিয়ে যাবে আমাকে।

ভেবো না, দুঃখ করছি। তা তো নয়। আমি তো এই মানুষটা নই। সেই যে তোমার চোখ ক্ষণকালের জন্য আমাকে বাঁচিয়ে তুলে মেরে ফেলে গেল, সেই থেকে বন্য এক প্রাগৈতিহাসিক গুহামানব বেরিয়ে পড়েছে তার মেয়েমানুষকে খুঁজতে। জন্ম জন্ম পার হবে সে, নগর ধবংস করবে, তছনছ করে দেবে ইতিহাস।

এখন হারিকেনের আলোয় যে রুটি-তরকারি খায় রোজ সন্ধ্যাবেলা, সে মরে গেছে কবে।

২. ভুতের গল্প

মল্লিকা সেন! মল্লিকা সেন!

অনেকক্ষণ ডাকাডাকির পর মজা খালের পাশে অত্যন্ত ঘন কাঁটাঝোপের ভিতর অবস্থিত শ্যাওড়া গাছটি সামান্য দুলে উঠল। একটা বিদঘুটে হাওয়া দিল উত্তর দিক থেকে। সন্ধ্যার আবহাওয়া আরো গাঢ় হল। কুয়াশা জমাট বাঁধতে লাগল চারপাশে। আমি একা!

হাওয়ার শব্দের ভিতর থেকে একটা ফিসফিস শুনতে পাই, আপনি আমাকে ডাকছিলেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আমার গল্প কি সবাই শুনতে চাইছে?

চাইছে।

আমাকে খুন করেছিল আমার স্বামী। এ খবর তো সব কাগজে বেরিয়েছে। আপনি নতুন কী জানতে চাইছেন?

আজকাল স্বামীরা প্রায়ই স্ত্রীদের খুন করে থাকেন মল্লিকা সেন। গল্পটা বড্ড পুরোনো হয়ে গেছে। আমি একটু নতুন অ্যাঙ্গেল চাইছি।

এ গল্পের নতুন অ্যাঙ্গেল কিছু নেই। পুরুষশাসিত সমাজে এরকমই বারবার ঘটবে। আপনাদের কাগজে আমার খবরটার হেডিং কী ছিল বলুন তো!

মল্লিকা ঝরে গেল।

বাঃ। বেশ হেডিং। এরকম কত জুঁই, মল্লিকা, বেলি ঝরে যাবে তার কি হিসেব আছে!

অর্জুন সেন লোকটা সম্পর্কে আমরা খোঁজ নিয়ে জেনেছি, তেমন খারাপ লোক নয়। কোনো ক্রিমিনাল রেকর্ড নেই। আজ অ্যান ইয়ংম্যান লোকটা ছিল দারুণ ব্রাইট, অত্যন্ত বন্ধুবৎসল এবং আড্ডাবাজ। লোকের উপকার-টুপকারও করত! এসব কী সত্যি?

বাজে কথা। ও ছিল হৃদয়হীন নিষ্ঠুর, কর্তব্য-উদাসীন।

পাড়া প্রতিবেশীরা অনেকেই বলেছে, আপনাদের সংসারে শান্তি ছিল না ঠিকই, কিন্তু সেইজন্য দায়ী অর্জুন সেন নন।

আপনারা কি পাড়া প্রতিবেশীদের বিশ্বাস করছেন?

কাকে বিশ্বাস করব তা বুঝতে পারছি না।

আমি যখন ভিকটিম তখন আমার চেয়ে সত্যি কথা আপনাকে কে বলবে?

তা অবশ্য ঠিক। তবে সেনবাবু যে বিবৃতি দিয়েছে তাতে সে বলেছে, আমি বিয়ের পর থেকেই সব স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলতে থাকি। প্রথমে আমার স্ত্রী বন্ধুদের কাছ থেকে আমাকে বিচ্ছিন্ন করেন, আড্ডা বন্ধ করে দেন, বাইরে বেরোনোর ওপর নানারকম বিধিনিষেধ আরোপ করতে থাকেন। শেষপর্যন্ত আমাকে আমার যৌথ পরিবার থেকেও নানা প্ররোচনা দিয়ে উনি বের করে আনেন। যোধপুর পার্কের পৈতৃক বাড়ি থেকে আমি চলে যাই টালিগঞ্জের ভাড়াটে বাসায়। আমার একটি মেয়ে হয়। আমি তাকে আকণ্ঠ ভালোবেসে ফেলি। আমর সেই দুর্বলতা লক্ষ করে আমার স্ত্রী তার সব দায় দায়িত্ব আমার ঘাড়ে গছাতে শুরু করেন অত্যন্ত সুকৌশলে। এমনকী রাত্রিবেলা আমার বাচ্চা বিছানায় পেচ্ছাপ করলেও কাঁথা বদলানোর জন্য উনি উঠতেন না। মেয়ে কাঁদত। সুতরাং আমাকেই

সে কাজের ভার নিতে হয়। ক্রমে আমি মেয়েকে ঝিনুকবাটিতে দুধ খাওয়ানো পর্যন্ত শিখে যাই।

বাপেরা কি কিছুই করবে না ছেলেমেয়ের জন্য? শুধু মেয়েরাই করবে? বাচ্চা কি তার একার?

তা অবশ্য নয়।

শুনুন, আমি সদ্য খুন হয়েছি। আমাকে খুন করেছে ওই বদমাশ, লম্পট, হৃদয়হীন লোকটা। বাংলার নারীসমাজ ওর ওপর ভীষণ ক্ষেপে আছে। আমার ভাবমূর্তি এখন খুবই উজ্জ্বল। এসময়ে ওই লোকটার উলটো-পালটা বিবৃতিকে বেশি কভারেজ দিয়ে আপনারা আমার ভাবমূর্তিটা দয়া করে নষ্ট করবেন না।

ঠিক আছে। কিন্তু আমাকে নতুন একটা অ্যাঙ্গেল দিন।

বললাম তো, নতুন অ্যাঙ্গেল বলে কিছু নেই। তবে আমি স্বীকার করছি, অর্জুন সেন নামক ওই খুনি লোকটা তার মেয়েকে খুবই ভালোবাসত।

এবং মেয়েটিও তাকে?

হ্যাঁ। আমার মেয়েও বাপের খুব ন্যাওটা ছিল। কিন্তু সে আমাকেও ভালোবাসত।

আপনাদের ছোটো পরিবারে একটা লাভ ট্রাঙ্গল ছিল, একথা কি বলা যায়?

নাঃ নাঃ। তা ঠিক নয়। আমি হিংসে করতাম না।

কিন্তু অর্জুন সেন বলছে, মেয়ে একটু বড়ো হওয়ার পর আপনি নানা সময়ে তার কাছে স্বামী সম্পর্কে এমন সব কথা বলতেন যাতে ওই শিশুর মন তার বাপের ওপর বিষিয়ে যায়।

মিথ্যে কথা! এসব খবরদার লিখবেন না। আমি মেয়েকে যা বলতাম তা একটুও বানিয়ে বলতাম না। ওর বাপ সম্পর্কে ওর একটা ভুল ধরনের উঁচু ধারণা তৈরি হচ্ছিল। সত্যের খাতিরে আমি সেই ভুলটা ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করতাম মাত্র।

আপনি কি সে কাজে সফল হয়েছিলেন?

খানিকটা।

আমি একটু গলা খাঁকারি দিয়ে সংকোচের সঙ্গে বললাম, আপনাদের সেক্স লাইফ সম্পর্কে কিছু বলবেন?

মল্লিকা সেনের প্রেতাত্মা খিলখিল করে হেসে ওঠে, সেক্স বলে ওর কিছু ছিল নাকি?

ছিল না?

নপুংসক বলা যায়। সেইটেই আমাদের অশান্তির আর একটা কারণ।

এ ব্যাপারটার জন্যও আপনি অর্জুন সেনকেই দায়ী করছেন তো?

পুরোপুরি।

আপনার কোনোরকম শীতলতা ছিল না তো!

মোটেই নয়।

অর্জুন সেন বলেছে, সেক্সের সঙ্গে সাইকোলজির সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। কোনো পুরুষের পক্ষেই স্ত্রীর কাছে অপমানিত হওয়ার পর তাঁর সঙ্গে উপগমন সম্ভব নয়। আপনি কি ওকে প্রায়ই অপমান করতেন?

মোটেই নয়। অক্ষমরাই ওসব অজুহাত দেয়।

কিন্তু পাড়া প্রতিবেশীরা বলছে, রোজ রাতে আপনাদের তুমুল ঝগড়া হত।

তাতে ওদের কী?

না, বলছিলাম ঝগড়ার ফলে অর্জুন সেন অপমানিত বোধ করত এবং তার ফিজিক্যাল আর্জ নষ্ট হয়ে যেত, এটা পাঠকরা কেমন খাবে?

প্লিজ ওসব পয়েন্ট তুলবেন না। অশ্লীল।

অশ্লীলতার একটু আঁশটে গন্ধ থাকলে অ্যাঙ্গেলটা পালটে যাবে।

যাবে। কিন্তু তাতে আমার ভাবমূর্তি নষ্ট হবে, প্লিজ।

খুনটা তাহলে অর্জুন সেনই করে?

তবে আর কে?

না, মানে ও ব্যাপারটা অর্জুন করেনি। সে বলেছে, আপনি নিজের গায়ে নিজেই আগুন লাগিয়েছিলেন।

তাতে কি? ও তো ছুটে এসে আগুন নেভাতে পারত!

বাথরুমের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল। অর্জুন সেন দরজাটা ভাঙার চেষ্টা করে প্রথমটায় পারেনি। যখন ভাঙে তখন আপনি পুড়ে গেছেন।

সে না হয় হল, কিন্তু প্ররোচনা? নিষ্ঠুরতা? খুন কি শুধু নিজের হাতেই করতে হয়? মনস্তাত্ত্বিক চাপ নেই?

অর্জুন সেনও অনেকটা এইরকমই একটা কথা বলছে।

কী কথা?

বলছে, ফিজিক্যাল ডেথটা তেমন কিছু নয়। আপনি নিজের মরার অনেক আগেই নাকি অর্জুন সেনকে ওই যে কী বললেন, মনস্তাত্ত্বিক চাপে মেরে ফেলেছিলেন।

বলেছে?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আপনিও তাই লিখবেন?

ভাবছি। অ্যাঙ্গেলটা বেশ নতুন।

মোটেই তা নয়। ওর কথা বিশ্বাস করবেন না। আগুনটা ও নিজের হাতে লাগায়নি ঠিকই, কিন্তু সারাজীবন আমি ওর জন্যই জ্বলে পুড়ে মরেছি। বিশ্বাস করুন। আমাকে ওই খুন করেছে। আমি চাই ওর ফাঁসি হোক।

হলে?

ওকে আমি কাছে পেতে চাই।

কেন?

মল্লিকা লাজুক গলায় বললেন, আহা, বোঝেন না যেন।

৩. আমি ও সে

আমি আর সে পাশাপাশি হাঁটছিলাম, ডানদিকে কালো সমুদ্র। মেঘে ঢাকা আকাশ। প্রলয়ের আগের মতো থমথমে চারধার। উত্তাল ঢেউ এসে বেলাভূমিতে আমাদের পায়ের পাতা ভিজিয়ে দিয়ে সরে যাচ্ছে।

সে জিজ্ঞেস করে, জীবনে তোমার সুখের মুহূর্ত কোনটি?

আমি বললাম, কত! কোনটার কথা বলব?

একটার কথা বলো। একটা মুহূর্তের কথা।

সে কেমন সুখ?

সে সুখের সঙ্গে কামনা নেই, লোভ নেই, অকারণ যে আনন্দ। আমি শিশুবেলায় একটা পিঁপড়েকে চাপা দিয়ে মেরে ফেলি। আমার বাবা ছিলেন দয়ালু মানুষ। দুঃখ পেয়ে বলেছিলেন, ছোটো ছোটো প্রাণীরা নিজেদের রক্ষা করতে জানে না। ওদের মারতে নেই। তখন সেই মরা পিঁপড়ের জন্য আমি কাঁদতে লাগলাম। বাবা সেই পিঁপড়েটার গায়ে মুখের ভাপ দিলেন। পিঁপড়েটা-- আশ্চর্য--বেঁচে উঠল। সেই আনন্দটার কথা আমার খুব মনে পড়ে।

না। ওটা সেই আনন্দ নয়। কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা ও তা থেকে মুক্তি--এ তো স্বচ্ছ কারণ। এরকম সুখের কথা বলিনি।

প্রথম চুম্বনের কথা বলি? একটি যুবতীর চোখ কেমন মায়াবী হয়ে গেল? ঠোঁটে ঠোঁট--সে এক আশ্চর্য স্বাদ। আমাদের ঘিরে বেজে যাচ্ছিল স্বর্গের বাজনা। এক অলৌকিক লিফট মর্ত্যের ধুলো থেকে আমাদের তুলে নিয়ে যাচ্ছিল মেঘের রাজ্যে।

স্বাভাবিক, নারী ও পুরুষ তো এর জন্যই সৃষ্টি। এ নয়।

শোনো। এক সুখের গল্প বলি তবে। আমার সবচেয়ে প্রিয় মানুষ ছিল আমার মা। তার সাংঘাতিক অসুখ হয়। ডাক্তাররা জবাব দিয়ে গেল। সে সময় হঠাৎ কোথা থেকে খবর পেয়ে এল এক হোমিওপ্যাথ। একডোজ ওষুধ। পরদিন মা যখন চোখ মেলে তাকাল

আমার মনে হয়েছিল, পৃথিবীতে আমি আর কিছু চাই না। সে আনন্দের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে এমন কিছু আর ঘটেনি আমার জীবনে।

বুঝলাম। রোগ এবং রোগমুক্তি, প্রিয়জন বিরহ না ঘটা, এসব কারণ থাকলে চলবে না। শুদ্ধ সুখের কথা বলো।

আমার কিছু মনে পড়ছে না।

সমুদ্রের দিকে তাকাও। আদিগন্ত নিজেকে প্রসারিত করো। ভাবো, নিজেকে ভাবো। মনে পড়বে।

স্খলিত কণ্ঠে আমি বললাম, আদিগন্ত প্রসারিত করতে পারি তত বড়ো নয় আমার ক্ষুদ্র অস্তিত্ব।

তবু ভাবো সমুদ্রের ঢেউ ধুয়ে নিয়ে যাচ্ছে তোমার পা। আকাশকে দেখো। কী বিশাল ব্যাপ্তি দিয়ে ঢেকে আছে তোমাকে। কিছু মনে পড়ছে না তোমার!

পড়ছে।

কী?

সে অনেকদিন আগেকার কথা। আমি একবার হারিয়ে গিয়েছিলাম। আসলে ঠিক হারিয়ে যাওয়া নয়। আমার বাবা এক জঙ্গলে আমাকে বেড়াতে নিয়ে যান। বাবা তালতলায় বসে ছবি আঁকছিলেন। আমি এক পা দু পা করে চলতে চলতে হঠাৎ একসময়ে টের পেলাম চারদিকে এক দুর্ভেদ্য অরণ্য ঘিরে ধরেছে আমাকে। বাবার কাছে ফিরে যাওয়ার পথ আমি কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছিলাম না। সেই বয়সে হারিয়ে যাওয়ার মতো মর্মান্তিক আর কিছু নেই। চেনা পৃথিবীর গণ্ডি ছেড়ে সে যেন অকুল দরিয়ায় পড়ে যাওয়া। সেখানে আছে ভূতপ্রেত, ছেলেধরা, দত্যি, দানো, ডাইনি বুড়ি, সাপ, বাঘ কত কী। আমি আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে 'বাবা' 'বাবা' বলে ডাকতে ডাকতে অন্ধের মতো ছুটতে লাগলাম। কতবার পড়লাম, উঠলাম, কেটেছড়ে গেল হাত-পা, সেই সময় আচমকা পাখি ডাকল। ঠিক উলুধবনির মতো শব্দ। আমি কান্না ভুলে শুনতে লাগলাম। পাখি ডাকছে। গাছপালায়

বাতাসের একটা অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে। চারদিকে নেচে বেড়াচ্ছে রঙিন প্রজাপতি। কত ফুল ফুটে আছে চারদিকে। আকাশ কী গভীর নীল! মনে হয়েছিল কই হারাইনি তো!

আজ ব্যথা নেই, বৃষ্টি নেই, বিষণ্নতা নেই

আমি বেশ ভালো আছি। পায়ের দিককার জানালা খুলে দেওয়া হয়েছে সকালে। আধশোয়া হয়ে আমি বাইরেটা খুব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। পায়ের কাছে খাটের রেলিং, তার ওপাশে জানালা, জানালার ওপাশে বৃষ্টিতে ধোয়া বাগানের গাছপালা। কাল রাতে খুব বৃষ্টি হয়ে গেছে। আজ রোদ উঠেছে শান দেওয়া ইস্পাতের মতো ঝকঝকে, আকাশে উপচে পড়ছে নীল। বাগানের রঙে লেগেছে বন্য সবুজের গভীর সমাহার। এদিকটা পশ্চিম রোদ আমার মুখে পড়েনি। ভারি ভালো লাগছে, আজ গরম না শীত তা আমি বলতে পারব না। শরীরের ওইসব বোধ আমার হারিয়ে গেছে কবে। যখন-তখন পেটের মধ্যে গুমরে ওঠে ব্যথা যখন মনে পড়ে দুরারোগ্য এবং দ্রুত ছড়িয়ে যাওয়া এক দুষ্ট ক্ষতে নষ্ট হয়ে গেছে আমার অন্ত্র ও যকৃত, পচে যাচ্ছে পাকস্থলী ও মূত্রাশয় তখন আমার আর শীত-গ্রীষ্মের কথা মনে পড়ে না, এমনকী অনেক সুখ-দুঃখের কথাও ভুলে যাই।

আজ আমি ভালো আছি। বাইরের বৃষ্টিতে ধোয়া বাগানটি দেখে মনে হয়, আমি বেশ আছি।

আমার বউ রুমকিকে আপনারা অনেকেই চিনবেন। সে আকাশবাণী থেকে রবীন্দ্র-সংগীত গায়। একসময়ে সে চমৎকার কথ্থক নাচত, সংস্কৃতিসচেতন যে-কোনো লোকই রুমকিকে চেনে। প্রথম যৌবনে তার বহু পাণিপ্রার্থী ছিল। আর সেইসব প্রার্থীর প্রায় প্রত্যেকেই প্রথম শ্রেণির যোগ্যতাসম্পন্ন যুবক। লাখপতি, কোটিপতির ছেলে বা প্রথম শ্রেণির ইঞ্জিনিয়ার ও ডাক্তার, বিশিষ্ট অফিসার, খেলোয়াড়, কে নয়? সুন্দরী এই নায়িকাটির জন্য ছিল মাথায় মাথায় তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বীতা, শেষ অবধি রুমকিকে আমিই পেয়ে যাই।

জীবনে এরকম জয় আমার অনেক। সায়ন মতে আমার রাশি বৃশ্চিক, এই রাশির জাতকেরা জয় করার জন্যই জন্মায়, তারা হারতে ভালোবাসে না। নিজের জীবনটিকে আমি নানারকম ছোটোবড়ো জয়লাভের যোগফল হিসেবে দেখি। ছোটোখাটো পরাজয় যে ঘটেনি তা নয়, কিন্তু জয়ের সংখ্যাধিক্যে পরাজয় হার মেনেছে।

গত তিনদিন আমার কেটেছে এক ঘোরতর আচ্ছন্নতায়। তিনদিন আগে সন্ধ্যাবেলায় যখন ব্যথাটা শুরু হল তখন আমি পাগলের মতো মাথার চুল ছিঁড়েছি, চিৎকার করেছি। ডাক্তার এসে আমাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখে। সেই আচ্ছন্নতার মধ্যে আমি তেমন কিছু টের পেতাম না দিন ও রাত্রি, বাহির ও ঘর। তিনদিন পর আজ বৃষ্টিভেজা সকালে এই জাগ্রত অবস্থাটা আমি খুব উপভোগ করছি।

সকালে রুমকিকে আমি একবার দেখেছি। সে ঘরে এসে গম্ভীরমুখে আমাকে দেখে কুশল প্রশ্ন করে গেল। তার চোখে গভীর বিষাদ ও ঘুমহীনতার ক্লান্তি। শরীর ধীরে ধীরে লাবণ্যহীন হয়ে যাচ্ছে নিরন্তর দুশ্চিন্তায়, বেশ রোগা হয়ে গেছে। তার ওপর সে আজকাল নানা অনুষ্ঠানের প্রোগ্রাম নিতে পারছে না। তার গানের স্কুল প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম।

রুমকি আজ বলল, এখন তো বেশ ভালো লাগছে? তোমার?

খুব ভালো, অনেকদিন এমন ভালো লাগেনি।

তাহলে আজ আমি গিয়ে গোটা কয়েক ক্লাস নিয়ে আসি। ছাত্রছাত্রীরা প্রত্যেকদিন ফিরে যাচ্ছে।

যাও।

নয়না রইল, দেখবে।

নয়না কে?

ওমা। নয়না নতুন নাম। কাল থেকে... তাইতো, কাল তোমার জ্ঞান ছিল না। 'জ্ঞান ছিল না' কথাটা আমার কানে ঘট করে লাগল। একটা অসুখের কাছে আমি হেরে যাচ্ছি ঠিকই। কিন্তু তা বলে সেটা ভাবতে আমার ভালো লাগেনি।

বললাম, ভেবো না। আমি ভালো থাকব। কিছুক্ষণ নিশ্চয়ই ভালো থাকব।

রুমকি আমার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে চলে গেল।

আগের নার্সদের আমি চিনতাম। বলতে নেই রুমকির চেয়ে তারাই তখন আমার বেশি আপন। পেটের বাঁদিকে লাগানো একটি প্লাস্টিকের ব্যাগে আমার যাবতীয় মল জমা হয়, তাছাড়া ক্যাথেডার লাগানো হয়েছে তলপেটে পেচ্ছাবের জন্য। চমকপ্রদ ব্যক্তিত্বের অধিকারী, চটপট, দ্রুত উন্নতিশীল, সুদর্শন সেই যুবকটি আজ নানা নল ও থলির জালে জড়িয়ে পড়েছে। রুমকি তো এই লোকটিকে ভালো চেনে না। নার্সরা চেনে। তারা আমার সব নোংরা পরিষ্কার করে আমাকে স্নান করায়, খাওয়ায়, ওষুধ দেয়, কখনো কখনো সান্ত্বনাও দেয়। সেইসব নার্সদের মধ্যে একজন সুরমা। গর্ভবতী মেয়েটি ছেলে বিয়োতে ছুটি চেয়েছিল। বোধহয় আমার আচ্ছন্ন সময়ে সে বেচারি গেছে সন্তান প্রসব করতে। বদলে নতুন একজন বহাল হয়েছে। সুরমার জন্য আমার একটু শূন্যতাবোধ কাজ করছিল। ভারি ভালো ছিল মেয়েটি। কিন্তু এ আমার অকারণ, যুক্তিহীন প্রবণতা। আমি জীবনের যে পর্যায়ে পৌঁছেছি তাতে এ ধরনের প্রবণতা হাস্যকর।

আজ আমার ব্যথাটা নেই। এর চেয়ে বেশি আনন্দের খবর আমার কাছে আর কিছু নয়। আমার দুটি ছেলে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলে পড়ে। দুজনেই সাংঘাতিক ব্রিলিয়ান্ট। দুই ছেলের চিন্তা একসময়ে আমাকে আনন্দ দিত। আজকাল তারাও গৌণ হয়ে গেছে। গৌণ হয়ে গেছে আমার যৌবনকালের অন্যান্য সফলতার আনন্দ। রূপ, রং, রেখা কিছুই আমাকে টানে না, আমার সবচেয়ে বড়ো প্রতিদন্দ্বী এক দুঃশীল অসহনীয় ব্যথা। আমি তার কাছে হেরে যাচ্ছি ক্রমে ক্রমে। দম-বন্ধ-করা এক রিং-এর মধ্যে আমাদের মরণ-পণ লড়াই চলছে।

ইঞ্জেকশন হাতে যে মেয়েটি ঘরে ঢুকল তার চোখ-মুখ কেজো মানুষের মতো নয়। আমার যৌবনকাল ভরে আছে নারী-কুসুমের বিচিত্র বর্ণ ও গন্ধে। এই ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা গভীর ও ব্যাপক, তাই স্বপ্নাতুর চোখের এই মেয়েটিকে দেখেই আমার মনে হল, যে-কোনো সময়েই এ আমাকে ভুল ইঞ্জেকশন দিতে পারে, খাইয়ে দিতে পারে

উলটোপালটা ওষুধ। সময়মতো পথ্য দিতে বোধহয় ভুল করছে কখনো কখনো। কিন্তু একটু উৎসাহ দিলে ও আমাকে এমন সব রোমান্টিক কথা বলবে যা গুরুতর রুগির মনকেও হালকা করে দিতে পারে।

আমি তাকিয়ে আছি দেখে মেয়েটা চমৎকার সাদা দাঁতে হাসল। বলল, ভয় পাচ্ছেন? একটুও লাগবে না।

আমি ম্লান একটু হাসলাম, ইঞ্জেকশন--তা যন্ত্রণাদায়ক হোক আমি আর ব্যথা বলে কিছু টেরই পাই না। আমার ভিতরকার সেই ব্যথার কথা মেয়েটা জানে না। সেই ব্যথার চেয়ে নিরন্তর ইঞ্জেকশনের ছুঁচ শরীরে ফুটে থাকলেও ভালো।

আমি বললাম, ইঞ্জেকশন আমি ভীষণ ভয় পাই যে।

আমিও পাই। কিন্তু দেখবেন, আমি এমন নরম হাতে দেব, টেরই পাবেন না।

আমি শরীরটাকে বালিশের ওপর আরও একটু ছেড়ে দিয়ে বললাম, তোমার হাত বুঝি খুব নরম! দেখি!

আমি হাতটা বাড়াতেই মেয়েটা অপ্রস্তুত হল একটু। রুগি হলেও আমার যৌবনকাল তো এখনো যায়নি। এই যুবতী কী করে হাতে হাত দেবে?

তবে সুখের কথা ও নার্স। তাই অস্বস্তিটা কয়েক সেকেন্ড কাটিয়ে আমায় সাদা রঙের হাসি হেসে বলল, হাত নরমের কথা বলিনি, বলছিলাম, আমি ইঞ্জেকশন খুব নরম করে দিতে পারি।

আমি সামান্য একটু দাপটের গলায় বললাম, হাতটা দাও। আমি দেখব।

ও হাতটা ভয়ে ভয়ে বাড়িয়ে বলল, কী দেখবেন?

দেখব, তোমার নখের নীচে ময়লা আছে কি না। তুমি ভালো করে হাত ধুয়েছো কি না। তোমার ভবিষ্যৎ কতটা উজ্জ্বল। এবং তোমার বিয়ে কবে হবে।

মেয়েটা খুব হাসল, তারপর হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে আমার বিছানার পাশে একটা টুলে ঝুপ করে বসে পড়ে বলল, কোন হাত?

ডানটাই দাও।

সিরিঞ্জটা হাতবদল করে সে ডান হাতটা আমার হাতে দেয়। খুব চাপা গলায় বলে, উঃ, আপনি যা মজার লোক না।

সুরমা বা অন্যান্য নার্সদের সঙ্গে আমি কখনোই এরকম লঘু ব্যবহার করিনি। গাড়ি, বাড়ি এবং শক্ত রোগওলা সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত মানুষের মতোই যথোচিত ব্যবহার করেছি। কিন্তু আজকের এই রোদের বানে ভেসে যাওয়া সকাল বেলাটায় কোথা থেকে এই স্বপ্নাতুর মেয়েটা এল! ভারি হালকা হালকা লাগছে মন। আমার ভিতরটা আজ যন্ত্রণায় নয় ইয়ার্কিতে ভরে আছে।

হাতটা নিবিষ্ট হাতে ধরে আমি ওর কররেখার দিকে চেয়ে থাকি। হেডলাইন ধনুকের মতো বেঁকে সোজা ঢুকে গেছে চন্দ্রের এলাকায়। তা ছাড়াও আছে সুস্পষ্ট কল্পনাপ্রবণতার রেখা। এ মেয়েকে স্বপ্ন ও পল্লবগ্রাহী কল্পনার হাত থেকে কে বাঁচাবে? আমি কেইরো ঘেঁটেছি অনেক। হস্তরেখা তেমন না মানলেও খানিকটা জেনে রেখেছিলাম। মেয়ে পটানোর সহজ পন্থা হল হাত দেখা, এ পৃথিবীর যে-কোনো মেয়েবাজই জানে।

তোমার নাম নয়না।

বেশি ইয়ার্কি করবেন না। কারো নাম তার হাতে লেখা থাকে না। বউদি আপনাকে বলে গেছেন।

আমি তো বলিনি হাত দেখে তোমার নামটা ধরেছি।

আচ্ছা, আর কী বলবেন বলুন।

তোমার নখে ময়লা আছে।

মোটেই না মশাই।

আছে। তোমার প্রেমিকটি খুব গোঁয়ার লোক।

যাঃ! কী যে বলেন, না!

তোমার ইঞ্জেকশন দেওয়ার হাত মোটেই নরম নয়। যাকে দাও সে আঁতকে ওঠে।

এটাও কি হাতে আছে?

হ্যাঁ। তোমার হাতটা রিজিড। কেন কারো হাতে হাত একেবারে সঁপে দিতে পার না! জীবনে অনেক দুঃখ পাবে এর জন্য।

সত্যি? ওমা, কী হবে তাহলে?

হাত সমর্পণ করতে হয়। সেটা শেখো।

কীভাবে দেওয়া যাবে?

বললাম তো, হাতটা শক্ত রেখো না।

আপনি কিন্তু ভীষণ অসভ্য!

মজার লোক বলছিলে না?

মজার লোকও।

মজার লোকেরা একটু অসভ্যই হয়।

এবার দেখুন। ইঞ্জেকশনটা দিয়ে দিই।

আরে দাঁড়াও, দাঁড়াও। আগে দেখি তোমার হাতে ইঞ্জেকশনটা নেওয়াটা নিরাপদ হবে কি না।

ওমা, আমার কী হবে গো। আমি যে পাশ করা নার্স।

না, তোমার হাত বলছে তুমি নার্সিং পাশ করোনি।

সে কি? আমার সার্টিফিকেট আছে।

নকল সার্টিফিকেট, তুমি নার্সিং কিছুই জানো না।

কী করলে প্রমাণ হবে যে জানি?

চুপ করে বসে থাকো। আমার চোখে চোখ রাখো। আমি তোমাকে হিপনোটাইজ করে জেনে নেবো।

ও বাবা! সে আমি পারব না। ভয় করে।

আমার কী অসুখ হয়েছে জানো?

নয়নাকে একটু বিবর্ণ দেখাল হঠাৎ। মাথাটা ওপর-নীচে ঝাঁকিয়ে বলল, জানব না কেন?

কী বলো তো!

গ্যাসট্রিক আলসার!

নার্স বা ডাক্তাররা রুগির কাছে খুব মিথ্যে কথা বলে। কিন্তু যখন বলে তখন রুগির কাছে সেটা বিশ্বাসযোগ্য হয়। কিন্তু তোমার মুখচোখ এই সামান্য মিথ্যে কথাটা বলতে গিয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

মিথ্যে হবে কেন। আমি জানি।

তাহলে বলব, তুমি সত্যিই নার্সিং জানো না। মিথ্যে কথা তো ভালোভাবে বলতে পারোই না। তার ওপর আবার চিকিৎসার ধরন, ওষুধ রিপোর্টটা দেখে রোগ-নির্ণয় করার যোগ্যতাও তোমার নেই।

আচ্ছা ঘাট হয়েছে। এবার ইঞ্জেকশনটা দিতে দিন।

বলছি তো, আমি আনাড়ির হাতে ইঞ্জেকশন নিই না।

বিশ্বাস করুন, আমি আনাড়ি নই।

ভীষণ আনাড়ি। শোনো নয়না, আজ সকালে আমি খুব ভালো আছি। একটুও ব্যথা নেই। আমাকে ইঞ্জেকশন দিও না। বসে থাকো, চুপ করে বসে থাকো শুধু।

ডাক্তার মিত্র যখন শুনবেন ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়নি, তখন?

সাধে কি আনাড়ি বলি তোমাকে? ইঞ্জেকশনের ওষুধটা বেসিনে ফেলে দিয়ে এসো। আমি কিছু বলব না ডাক্তারকে। কেউ জানবে না, যাও।

সত্যি বলছেন?

সত্যি, আজ সকালটায় আমার নিজেকে রুগি ভাবতে ইচ্ছে করছে না।

দেখবেন কথাটা ফাঁস হয়ে গেলে কিন্তু আমার ভীষণ বিপদ হবে।

আঃ, যাও যা বলছি করো।

নয়না উঠে গেল। ভয়ে ভয়ে। আমি এত লঘু স্বভাবের মানুষ নই। নয়নার চোখে আমি বয়স, মর্যাদা, শ্রেণি সবদিক দিয়েই অনেকটা দূরের মানুষ। কিন্তু তবু এই স্বপ্নাক্রান্ত কম বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন এবং ছেলেমানুষ স্বভাবের মেয়েটির কাছে আজ আমার প্রগলভ হতে ইচ্ছে করছে।

না, মেয়েটি একাই কোনো কারণ নয়। এই উজ্জ্বল সকাল, কয়েকদিন বৃষ্টির পর এই রোদ, তিনদিন আচ্ছন্নতার পর আমার এই আমূল জেগে ওঠা--এই সব কিছুর মধ্যে ওই মেয়েটিকে মানিয়ে গেছে। সুরমা হলে মানত না।

নয়না ওষুধ ফেলে, সিরিঞ্জ ধুয়ে হাসিমুখে ফিরে এল। কৃতকর্মের জন্য কোনো দুঃখের ভাব নেই মুখে। হাসছে। হাত তুলে খোঁপা ঠিক করছে। এই ভঙ্গিটা লঘু স্বভাবের মেয়েদের ভারি প্রিয়। খোঁপা ঠিক করার ছলে দুহাত ওপরে তুলে তারা তাদের বক্ষপট দেখাতে ভালোবাসে। মেয়েদের আমি গভীরভাবে জানি। এই বুক দেখানোর ভিতর দিয়ে তারা পুরুষদের সপ্রশংস যৌনকাতর মুগ্ধ দৃষ্টিকে কামনা করে। কিন্তু হায়, নয়না জেনেও জানে না, ওর বুকের চেয়ে অনেক বেশি জরুরি আমার কাছে ওর দুটি চোখ। দুশ্চিন্তাহীন, উদ্বেগশূন্য, নির্লিপ্ত ও মজার ওই দুই চোখের দৃষ্টি সকালটার সঙ্গে মিলে যায়! ব্যথা নেই, বৃষ্টি নেই, বিষণ্নতা নেই।

নয়না একটু ফস্টিনস্টি ভালোবাসে। ফের ঝুপ করে কাছ ঘেঁষে বসে পড়ে বলল, দেখুন না ভালো করে হাতটা। আর কী আছে।

আমি নিবিষ্ট চোখে ওকে একটুক্ষণ দেখে অনুচ্চ কর্তৃত্বের স্বরে বললাম, যাও, চা করে আনো।

চা! বলে বিস্ময়ে সে তাকায়। এ রুগির চা খাওয়ার হুকুম আছে কি না তা বোধ হয় সে ভালো করে জানে না। তাকিয়ে থাকতে থাকতেই হঠাৎ আমার গম্ভীর মুখ ও কঠিন চোখ দেখে ভয় খাওয়া একটু হাসি হেসে উঠে পড়ল। বলল, যাচ্ছি যাচ্ছি। অত রাগ করবেন না।

চায়ের স্বাদ আমি বহুকাল ভুলে গেছি। পচন শুরু হওয়ার পর আমার সিগারেটের আসক্তি চলে গেল। চা বা অন্য কোনো নেশারও আকর্ষণ রইল না আর। কিন্তু নয়নার করে আনা চাটুকু আমি আজ উপভোগ করছিলাম। বহুকাল আগে হারিয়ে যাওয়া চায়ের গন্ধ এবং স্বাদের একটু রেশ পাওয়া যাচ্ছিল।

নয়না আমার দিকে মিটমিটে আলো-জ্বলা চোখে চেয়ে ছিল। বলল, আমি কি ভালো চা করেছি?

ভালো। বহুকাল চা খাইনি।

চা দেওয়া বোধহয় খারাপ হল।

না, আমাকে যদি একটু এগিয়েই দিয়ে থাক তাহলেও ক্ষতি নেই নয়না। এখন আমার সামনের পথটুকু গড়ানো, ঢালু, বিকল একটা গাড়ি গড়িয়ে যাচ্ছে, তার থামার উপায় নেই। একটা সিগারেট এনে দিতে পার?

ও বাবা, কী বলে রে লোকটা!

যাও নয়না, এনে দাও।

নয়না অনিচ্ছার সঙ্গে গেল এবং জোগাড় করে আনলও।

নয়না।

উঃ।

হাতটা দাও।

আবার কী দেখবেন?

তুমি যথার্থ নার্সিং জানো কি না।

জানি না তো। বলেই দিয়েছেন একবার।

আমি আজ নার্স বা ডাক্তার চাই না নয়না! আমার জন্য উদ্বেগ বোধ করে এমন কাউকেই আজ আমার ঘরে আসতে দিও না। আমার প্রিয়জনদের মুখ আমি দেখব না।

কী যে বলেন!

হাতটা দাও।

এই তো দিয়েছি।

বসে থাকো, চুপ করে বসে থাকো। আজ আমার ব্যথা নেই, আজ বৃষ্টি নেই, আজ বিষণ্নতা নেই।

ও আবার কেমনধারা কথা? কিছু বুঝছি না যে।

তোমাকে বুঝতে কে বলেছে?

ও বাবা, বুঝতেও দেবেন না?

কথা বোলো না নয়না। মেয়েরা বেশি কথা বললেই বড্ড বোকার মতো কথা বলে ফেলে। আজকের সকালটা নষ্ট কোরো না।

নয়না খুব হাসল। তারপর বলল, আপনি ভারি কিম্ভূত।

সেটা আমি জানি।

হাতটা শুধু ধরে থাকবেন?

তাতে কিছু মনে করবে নাকি?

না! আপনি ধরলে কিছু মনে করার নেই।

কেন, আমি পুরুষ নই? প্রায়-যুবক নই?

নয়নার ছলবলে ভাবটা হঠাৎ কেটে গেল। একটু চুপ করে থেকে বলল, কে বলল নন?

যে কেউ বলুক, তুমি না বললেই হল।

নয়না আমার দিকে মুগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে বলল, আপনার মতো পুরুষ খুব বেশি দেখা যায় না।

বটে?

ঠাট্টা করবেন না কিন্তু। একটা কথা বলব?

বলো নয়না, কিন্তু বোকার মতো কিছু নয় তো!

না বোধহয়, বলছিলাম সেই কী যেন হাত সমর্পণের কথা বলছিলেন না!

বলছিলাম!

আমার মনে হয় আপনার মতো কাউকে পেলে হাত সমর্পণ করতে মেয়েদের হয় না। হাত এগিয়ে যায় আপনা থেকেই।

এ কথার পর একটু উজ্জ্বলতর হল আজকের সকাল, আমার অভ্যন্তরে ব্যথা ছিল না, শুধু ব্যথার স্মৃতি ছিল, কিন্তু সেটাও মুছে গেলো হঠাৎ। বিষণ্নতার রেশটুকুও কেটে গেল। নয়নার হাতটা ধরে আমি সময়টা খুব উপভোগ করতে থাকি।

দরজা খোলা। রুমকি এসে পড়তে পারে। বা অন্য কেউ। কিন্তু আমার ভয় করল না, এরকম সুন্দর ক্ষণ তো সকলের জীবনে আসে না। বড়ো ক্ষণস্থায়ী। তা হোক। ক্ষণস্থায়ী কী বা নয়।

আমি আর নয়না বসে রইলাম। আজ ব্যথা নেই, বৃষ্টি নেই, বিষণ্নতা নেই।

বিকল্প

এমন একটা ঝা-চকচকে অফিসে একটা গেঁয়ো চেহারার অপ্রতিভ মেয়ে যে কী করে আলটপকা ঢুকে পড়ল সেটাই ভেবে পেলো না ঋষি। তার এখন পিক আওয়ার। অবরল ফোন আসছে। একটু বাদেই একজিকিউটিভ মিটিং। টপ বস-এর সঙ্গে। সমস্ত মন মগজ রিফ্লেক্স তৈরি রাখতে হচ্ছে, দেখে নিতে হচ্ছে মিটিং-এর কাগজপত্র।

ঠিক এই সময়ে দরজা ঠেলে মেয়েটা ঘরে ঢুকল। তারপর দাঁড়িয়ে গেল দরজার কাছেই। আর এগোতে সাহস পেল না।

ঋষি অবাক। মেয়েটার পরনে একখানা তাঁতের সাদা খোলের শাড়ি। সাদা ব্লাউজ। মুখে ঘাম। চোখে ভয়।

কাকে চাই?

মেয়েটা অতিশয় ঘাবড়ে গেছে। কথাই বলতে পারছে না। গলাও বোধ হয় শুকনো।

কয়েকবার ব্যর্থ চেষ্টা করার পর ক্ষীণ স্বরে বলল, ঋষি রায়।

আমিই। কিন্তু আপনি এখানে এলেন কী করে? কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট তো ছিল না! ঋষি সাংঘাতিক বিরক্ত। দরজায় একটি বেয়ারা থাকে। বোধ হয় সে আড্ডা মারতে উঠে গেছে। রিসেপশনও যে কেন আটকায়নি একে!

কী ব্যাপার বলুন তো!

মেয়েটিকে ফের বোবায় ধরেছে। কথা বলতে পারছে না। বগলে একটা সস্তা ভ্যানিটি ব্যাগ ধরা। হাতের মুঠোয় দলা পাকানো রুমাল। যেখানে ব্রেক কষেছে, সেখান থেকে এক পা-ও নড়তে পারেনি।

ঋষি অপরিসীম বিরক্তির গলায় বলল, দেখুন, আমি এখন ভীষণ ব্যস্ত। একটু পরেই জরুরি একটা মিটিং। কোনো দরকার থাকলে আপনি পরে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আসবেন। এখন আমার কথা বলার সময় নেই।

মেয়েটির বোধ হয় এতক্ষণ চোখের পলকও পড়েনি। বিশাল দুই চোখ মেলে ঋষিকে দেখছিল। খুবই ভীত চোখ। খুবই অপ্রস্তুত হাবভাব।

তবু ঋষির কথাটা তার মগজে বোধহয় ঢুকল। সে মাথা নেড়ে বলল, আচ্ছা।

বলে পিছন ফিরে দরজাটা খোলার চেষ্টা করতে লাগল। পারছিল না।

বিরক্ত ঋষি টপ করে লাফিয়ে উঠল। চটপটে পায়ে গিয়ে নব ঘুরিয়ে দরজাটা টেনে খুলে ফেলে বলল, আসুন।

মেয়েটা এবার খুব কাছাকাছি। নতমুখ তুলে বিশাল চোখে আর একবার ঋষির দিকে তাকিয়ে ধীরে পায়ে বেরিয়ে গেল। একটা বন্য গন্ধ পেল ঋষি। রোদের গন্ধ। ঘামের গন্ধ। দরজাটা আপনা থেকেই লক হয়ে গেল। ঋষি এসে ফোন তুলে রিসেপশনকে ধমকাল, এইমাত্র একটা আনকলড ফর মেয়ে এসে কী করে ঢুকে পড়ল আমার চেম্বারে?

রিসেপশন সদুত্তর দিতে পারল না।

ঋষি ফোন রেখে দিল রাগের হাতে। তারপর জরুরি কাজে ডুবে গেল। মেয়েটার কথা তার মনে রইল না।

মনে পড়ল রাতে। ক্লাবে বিকেলে কিছুক্ষণ সুইমিং পুলে সাঁতার কেটে, কিছুক্ষণ বিলিয়ার্ড খেলার ব্যর্থ চেষ্টা করে, কিছু লঘু আড্ডা মেরে যখন গাড়ি চালিয়ে নিজের কোয়ার্টারে ফিরছিল।

দুর্গাপুরের রাস্তাঘাট এ সময়ে নির্জন এবং ফাঁকা। ঋষি ফিরে আসছে তার ফাঁকা বাংলোয়। এখানে তার কেউ থাকে না। শুধু একজন রান্নার লোক। মা-বাবা-ভাই-বোন কলকাতায়। তার সঙ্গে ঝুমরির বিয়ে হবে সামনের বছর। ঝুমরি যাদবপুরে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে। শেষ বছর।

গাড়ি চালাতে চালাতে হঠাৎ কি কোনো বন্য গন্ধ পেল ঋষি? কে জানে কী। হঠাৎ মেয়েটার কথা মনে পড়ল। কী চেয়েছিলো মেয়েটি।

গাড়ি গ্যারেজে ঢুকিয়ে আলোকোজ্জ্বল ঘরে ঢুকে ঋষি পোশাক পালটালো। বাথরুমে গিয়ে স্নান করল। সারাদিন অসহনীয় গরম গেছে। এয়ার কন্ডিশনিং থেকে বেরোলে গরমটা বেশিই লাগে।

তার কাজের লোক পটেশ্বর বুড়ো মানুষ।

খাবার সাজিয়ে দিতে দিতে বলল, আজ আপনি অফিসে বেবিয়ে যাওয়ার পর একটি মেয়ে এসেছিল।

কে মেয়ে?

নাম-টাম বলেনি।

কোথা থেকে এসেছিল?

অত কথা হয়নি। খোঁজ করেছিল, আমি বললুম, অফিসে গেছেন।

সাদা শাড়ি পড়া?

হ্যাঁ।

ঋষি বিরক্ত হয়ে বলল, সে অফিসেও হানা দিয়েছিল। কী চায় কে জানে! চাকরি-বাকরিই চায় বোধ হয়। গরিব।

চাকরি কি হাতের মোয়া?

এইটুকু কথা হল। ঋষি খেয়ে উঠে যথারীতি পেপারব্যাক নিয়ে শুতে গেল। রাত বারোটায় আলো নিবিয়ে চোখ বুজল। এই সময়ে--অর্থাৎ রোজ ঘুমের আগে কয়েক

মিনিট--সে ঝুমরির কথা চিন্তা করে। ঝুমরি শান্তশিষ্ট ভালো মেয়ে। ব্রিলিয়ান্ট। তবে ঝুমরি খুব কিছু সুন্দরী নয়। একটু আবেগহীন। বেশি ঠান্ডা। ঝুমরির সঙ্গে তার কোনো প্রেম-ট্রেম হয়নি। ঋষি পড়াশুনো কেরিয়ার নিয়ে এত ব্যস্ত যে তার সেই সময়ও ছিল না। ঝুমরিকে তার ভাবী স্ত্রী হিসাবে বেছে রেখেছিল তার বোন রেখা। ঝুমরি রেখার বান্ধবী।

বাড়িতে ডেকে এনে দাদার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। মা-বাবারও অপছন্দ নয়। ঝুমরি বেশ বড়োলোকের মেয়ে। অপছন্দের কিছু ছিল না।

মুশকিল হল, ঝুমরিকে ঘুমের আগে ঋষি রোজ ভাবে। ভেবে ভেবে তাকে বিছানায় তার পাশে কল্পিত স্ত্রীর মূর্তিতে নিয়ে আসার চেষ্টা করে। কিন্তু মূর্তিটা আসবার আগেই তার ঘুম এসে যায়।

ঋষি খুব বাস্তববোধসম্পন্ন যুবা। কল্পনা নিয়ে তার কোনো কারবার নেই। ফলে অল্প বয়সেই সে যথেষ্ট উন্নতি করেছে। ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে যেমন ভালো, তেমনি ভালো অফিস ম্যানেজমেন্টে। চোখা, চালাক, বলতে কইতে ওস্তাদ।

আজ ঝুমরিকে ভাবতে গিয়ে বিপত্তি হল।

ঝুমরি এল না। সাদা খোলের শাড়ি-পরা সেই করুণ মুখের মেয়েটির কথা মনে পড়ে গেল। কী চেয়েছিল মেয়েটি? চাকরি তো তাকে দিতে পারবে না ঋষি? আর পারলেই বা একটা উটকো মেয়েকে দিতে যাবেই বা কেন?

শেষ অবধি আজ ঝুমরির বদলে উটকো একটা মেয়ের কথা ভাবতে ভাবতেই ঘুমোল সে। মেয়েটা বাড়িতে এসেছিল, তারপর অফিসে গিয়েছিল। এখান থেকে অফিসের দুরত্ব অনেক। মেয়েটা কি অতটা পথ হেঁটে গিয়েছিল? তাই হবে। বড্ড ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। যাকগে।

অফিসের কাজে সাতদিনের জন্য জার্মানি যেতে হল ঋষিকে। যেতে হল দিল্লি। কলকাতাতে ঢুঁ মারল কয়েকবার। মাস তিনেকের মধ্যে এতসব।

একদিন খুব ভোরবেলা অভ্যাসমতো উঠে ঋষি তার প্রাত্যহিক ব্যায়াম সেরে নিচ্ছিল। পরনে শর্টস, খালি গা।

পটেশ্বর এসে বলল, সেই মেয়েটি।

কে মেয়ে?

সেই যে একদিন এসেছিল।

এত সকালে। কী চায় জিজ্ঞেস করো তো!

বসতে বলেছি বাইরের ঘরে।

বসতে বলেছ! কেন? বসানোর কী আছে?

বিদেয় করে দেব?

জেনে নাও কী চায়। চাকরি চাইলে বলে দাও, কিছু হবে না।

আচ্ছা।

চলে যেতে যেতে পটেশ্বর ফিরে এসে বলল, মনে হয় অনেক দূর থেকে এসেছে। বড্ড কাহিল দেখাচ্ছিল বলে বসিয়েছি।

বুলওয়ার্কারটা রেখে তোয়ালে দিয়ে গায়ের ঘাম মুছতে মুছতে ঋষি বলল, তোমার দয়ার শরীর।

পটেশ্বর কী বুঝল কে জানে। চলে গেল।

ঋষি স্নান করে একেবারে অফিসের পোশাক পরে নিল। তারপর বাইরের ঘরে এসে দেখল, সেই মেয়েটি বসে আছে। মুখখানায় অপরিসীম ক্লান্তি। আজও সাদা খোলের শাড়ি। মুখে ঘামতেল।

ঋষিকে দেখতে পায়নি। দরজার দিকে মুখ। আনমনা। ঋষি আড়াল থেকে দেখল। ভোরের আলোয় মেয়েটিকে ভারি ভালো দেখাচ্ছে। সাজগোজ নেই, ক্লান্ত, তবু ভারি কমনীয় একটা শ্রী নজরে পড়ে যায়।

ঋষি ঘরে ঢুকে একটু শব্দ করল গলায়। মেয়েটি চমকে উঠে দাঁড়াল।

কী চাই বলুন তো!

মেয়েটিকে আবার বোবায় ধরল। বড়ো বড়ো নিষ্পলক ভীতু চোখে চেয়ে রইল অভিভূতের মতো।

আমার হাতে কিন্তু বেশি সময় নেই।

মেয়েটি কয়েকবারের চেষ্টায় ক্ষীণ স্বরে বলল, আমি একটা দরকারে এসেছিলাম।

কীসের দরকার বলুন। চাকরি-টাকরি চাইলে কিন্তু কিছু করা সম্ভব নয়।

মেয়েটি হতাশ দৃষ্টিতে একটু চেয়ে থেকে মাথা নত করে ফেলল। তারপর ক্ষীণতর কণ্ঠে বলল, চাকরি নয়।

তাহলে?

মেয়েটি আর একবার তাকাল। ভীতু চোখে কিছু একটা পড়ে নিল ঋষির মুখে। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, আজ থাক। আপনার তো সময় নেই।

তেমন জরুরি দরকার থাকলে কয়েক মিনিট--

মেয়েটি জবাব দিল না। কাঁপা হাতে চেয়ার থেকে তার ব্যাগটি কুড়িয়ে নিয়ে বলল, আসি।

কিন্তু এসেছিলেন কেন সেটাই তো বললেন না।

মেয়েটি অস্ফুট স্বরে শুধু বলল, আজ থাক।

ঋষি বিরক্ত হল। মেয়েটি ধীর পায়ে বেরিয়ে গেল।

সারাদিন ব্যস্ততার ভিতর দিয়ে কেটে গেল ঋষির। মেয়েটির কথা মনেও পড়ল না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, রাতে শোওয়ার সময় ঠিক মনে পড়ল। ঝুমরি নয়, মেয়েটি। ঋষির শ্বাস গাঢ় হল। কেমন গরম লাগল শরীরে। ভালো ঘুম হল না।

সকালে ব্রেকফাস্টে বসে পটেশ্বরকে জিজ্ঞেস করল, মেয়েটার নাম জেনে নিয়েছিলে?

কী একটা বলেছিল যেন। রাণু বোধ হয়।

কী চায় বলল না তো!

সে যাকগে।

যাকগে কেন?

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম। ওরা পাঁচ মাইল দূরে এক গাঁয়ে থাকে। ওর বাবা একসময়ে কলকাতার কোন স্কুলে পড়াত, সে সময়ে আপনি তাঁর ছাত্র ছিলেন। তিনি এখন

মৃত্যুশয্যায়, আপনাকে একবার দেখবেন বলে খবর পাঠিয়েছিলেন।

কী নাম তাঁর?

জিজ্ঞেস করিনি। করে লাভ কী? আপনার সময় কোথায় যে যাবেন। বরং নামটা শুনলে হয়তো মনে মনে ছটফট করবেন। দরকার কী!

কথাটা যুক্তিযুক্ত। সে কলকাতায় তিনটে স্কুলে পড়েছে। প্রথমবার একটা বাজে স্কুলে, পরে ভালো এবং তারপর আরও ভালো স্কুলে। অনেক মাস্টার তাকে পড়িয়েছে। ওসব মনে রেখে লাভ কী?

পটেশ্বর ফের বলল, শুধু দেখতে চাইছেন, তা নাও হতে পারে। সাহায্যও চাইতে পারেন, চাকরিও চাইতে পারেন মেয়ের জন্য।

বছরখানেক বাদে ঋষি মেয়েটিকে আবার দেখল। চমকে উঠল আপাদমস্তক।

তার সমান ব্যাংকের একজন অফিসারের বিয়ের রিসেপশনে গিয়ে ঘটনাটা ঘটল। কনে সেই মেয়েটি। কী দারুণ দেখাচ্ছে ঝলমলে সাজে! চোখে চোখ পড়তেই স্থবির হয়ে গেল ঋষি।

ঝুমরি তাকে সচেতন করে দিল কনুইয়ের ঠেলা দিয়ে, বলল, ওরকম রিজিড হয়ে গেলে কেন? ঋষি কিছু বলতে পারল না।

তারপর দেখা হতে লাগল ক্লাবে, পার্টিতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে। দেখা তো হবেই।

শুনুন, আপনি...আপনি কে বলুন তো! কেন যে এসেছিলেন আমার কাছে...

রাণু মিষ্টি করে হেসে বলে, শুনে আর লাভ কী বলুন। যা হয়ে গেছে, গেছে।

আপনার বাবার নাম?

জেনে লাভ নেই। আপনার মনে পড়বে না।

ভিতরে ভিতরে ভারি ছটফট করে ঋষি। ভারি চঞ্চল হয়।

রাত্রিবেলাই হয় বিপদ। পাশে ঝুমরি। অথচ তার রাণুকে মনে পড়ে। কেন যে!

সবচেয়ে বেশি অপমান লাগে, তাদের এই উচ্চশ্রেণির, ব্যস্ত ঝা-চকচকে সমাজে রাণু-- গেঁয়ো ভীতু মেয়েটা কোন ফাঁকে ঢুকে পড়ল বলে। রাণুর চোখে সব ফাঁকি ধরা পড়ে যাচ্ছে।

ঋষি দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তারপর সারা গায়ে এক ধরনের জ্বালা নিয়ে ঝুমরিকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে। ঝুমরি সেটাকে ভালোবাসার অত্যাচার মনে করে ককিয়ে ওঠে, ছাড়ো, ছাড়ো, দম বন্ধ হয়ে আসছে-- ।

ওয়ারিস

ঝক করে টর্চের ফোকাসটা মেরেই বলল, আরিববাস! এ যে লহরী খেলছে। নেলো একটু পেছনে। এক হাতে গোরুর দড়ি, অন্য হাতে ভরা থলি। গোরুটা একটু পিছনে দাঁড়ানো। নেলো বলল, কাপড়খানা খুলে গামছাখানা পড়ে নেন। এ হল ভাসি গাঁয়ের জলা। তলায় তলায় ইচ্ছামতীর সঙ্গে যোগ আছে। বর্ষায় ইছামতীর জল বাড়লে এই জলা একেবারে তল।

ঘুরপথ নেই?

তা থাকবে না কেন? পিছনবাগ চার মাইল গিয়ে দক্ষিণের রাস্তা ধরে গেলে পাক্কা পাঁচ ক্রোশ। তা সে রাস্তাও আপনার মনের মতো হবে না। হরেদরে কশ্যপ গোত্র। এই রাস্তায় বরং সুবিধে আছে।

নিরাপদ খ্যাঁক করে উঠল, সুবিধে! সুবিধেটা কী দেখছ? জলার ভিতর দিয়ে ছাড়া কি আর পথ ছিল না?

জলা তো উই উত্তর দিকে। পোটাক পথ হবে। যে পথে যাচ্ছেন এটা ভাসি গাঁয়ের রাস্তা। জলার জল উঠে পড়েছে এসে। তা ভয় নেই। কোমরের বেশি জল হয় না। সুবিধের কথাটা কানে তুললেন না। ভাসি গাঁ পেরোলে বোনাই গাঁ, তারপরই মহেশতলা। মহেশতলায় আমার শ্বশুরবাড়ি।

বলো কী?

রাত বেশি হয়নি। সাতটা সাড়ে সাতটা হবে। পা চালিয়ে গেলে নটা দশটায় পৌঁছে যাব। রাতটা আজ ওখানেই থাকা যাবে। শ্বশুড়বাড়ি বলতে আবার তেমন কিছু ধরবেন না। মাথাটা গোঁজা যায়। তা এই বাদলায় আর তার বেশি কী চাই?

তা বটে। কিন্তু কাপড়খানা যে ছাড়ব শুকনো জায়গা কি দেখতে পাচ্ছ? চারদিকে তো জল আর কাদা ছাড়া কিছু নেই।

সেইজন্যই তো তখন বলেছিলুম, ধুতি পরার আগে তলায় সেঁটে গামছা পরে নিন। কথাটা কানে তুললেন না। তা এখন আর লজ্জাই বা কিসের? চারদিকে জনমনিষ্যি নেই। টর্চখানা নিবিয়ে ধুতিখানা আলগার ওপর খুলে মাথায় চাপিয়ে নিন।

এ জলে কি জোঁক আছে?

জোঁকের ওপর দিয়ে গেলে তো ভাগ্য ভালো। ছোটখাটো কামাট কুমিরও ঢুকে পড়ে। তা সেসব কথা ভাবলে আজ রাতটা এখানে বসেই কাটাতে হবে।

বিপদেই ফেললে হে।

আজ্ঞে, আমি ফেললুম কোথায়? বিপদ তো আপনিই ঘাড়ে সেধে নিলেন।

নিরাপদ আর কথা বলল না। টর্চখানা নিবিয়ে ঝোলা ব্যাগ থেকে গামছাখানা বের করে কাঁধে রাখল। ছাতাখানা বগলে চেপে ধুতি খুলে গুছিয়ে তোলা বড়ো সহজ কাজ নয়।

তোমার শ্বশুরবাড়িতে শুকনো কাপড়চোপড় কিছু পাওয়া যাবে তো?

চলুন তো। ওখানে পৌঁছে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

নিরাপদ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। আকাশে নতুন করে মেঘ জমছে। ঝিলিক দিচ্ছে খুব। নামবে। বিকেলের দিকে জোর হয়ে গেল একচোট। দুধপুকুরে ঘন্টাদুয়েক একটা চালাঘরে মাথা গুঁজে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে। এখন আর চালাঘর পাওয়ার আশা নেই। সামনে জোঁক, কামট, কুমির, গলা জল। বৈদ্যপুর আজ আর পৌঁছোনোর আশা নেই। তা না থাক, কোথাও একটু লোকালয়ে পৌঁছোতে পারলেই হল। সে কি পৌঁছোনো যাবে?

ধুতিখানা ভিজে সপসপে। কাদাও লেগেছে মেলা। তবু শুকোলে পরা যাবে। ঝোলা ব্যাগে ধুতি, জামা, লুঙ্গি, সবই আছে। সব ভিজে ঢোল!

গামছাখানা পরলেন?

কোনোরকমে জড়িয়ে নিয়েছি।

তা হবে না। মাঝখানে একটা স্রোত আছে। কোমরটা কষে না বাঁধলে গামছা ভেসে যাবে। গিঁট মারুন।

তাই মারল নিরাপদ।

আমি এবার আগে যাই। আপনি পিছনে আসুন।

তোমার পিছনে যে গোরু।

গোরুর আগে থাকুন। দড়িটা ধরে রাখবেন।

খুব ধীরে ঠাহর করে নেলো জলে নামল। ব্যাগটা মাথায়। এক হাতে গোরুর দড়ি ধরা। তার পিছনে নিরাপদ। তার পিছনে মস্ত গোরুটা। গাঁয়ের লোকেরা শহরে গঞ্জে গেলে সাতরকম কাজ সেরে আসতে ভালোবাসে। নেলো গতকালই গোরুটা কিনেছে। আজ আরও পাঁচটা কাজে দিনমান কাটিয়েছে। রওনাই তো হল পড়ন্ত বেলায়।

জল হাঁটু পর্যন্ত উঠল। কিছুক্ষণ আর তার ওপরে উঠল না। টর্চ জ্বেলে কিছু দেখার উপায় নেই। শুধু ঘোলা জল। তবে কুমির কামট থাকলে দেখা যাবে।

রাস্তায় বড়ো গর্তটর্ত নেই তো হে!

গাঁয়ের রাস্তায় গর্ত থাকবে না তা কি হয়? মেলাই আছে। তবে বড়োসড়ো নয়। ডান দিকটায় চেপে থাকুন।

গোরুটা এই জলে তেমন জুৎ পাচ্ছে না। হাঁসফাঁস করছে। একটু টেনেই নিতে হচ্ছে তাকে। অবোলা জীব, নিজের ইচ্ছেয় তো কিছু করতে পারে না।

কতখানি পথ, ও নেলো?

বেশি নয়। ঘাবড়াবেন না। বর্ষাকালে আমাদের নিত্যি যাতায়াত। একটা হাউড় বাতাস দিল। তারপরই চড়বড় করে বৃষ্টি।

এই রে!

ছাতা খুলে লাভ নেই। তাতে আরও অসুবিধে। টর্চটা বাঁচাতে সেটা ঝোলা ব্যাগে পুরে ফেলল নিরাপদ। তাতে বাঁচবে কি না সন্দেহ। যা জল।

ঠিক যাচ্ছো তো।

আজ্ঞে। রাস্তা মুখস্ত। এই সামনে জল বাড়বে। সাবধান।

স্রোত?

আর একটু এগিয়ে।

নিরাপদ নিজের মাথায় বৃষ্টির ডুগডুগি শুনতে পাচ্ছে। ঝোড়ো বাতাসের ঝাপটায় আর কথা কওয়া যাচ্ছে না। গোরুটা দাঁড়িয়ে পড়তে চাইছে। টেনে হিচড়ে নিতে হচ্ছে তাকে।

জলটা বাড়ল ধপ করে। নেলোর অভ্যাস আছে বলে সামলে গেল, কিন্তু নিরাপদ পারল না। জলের নীচে পিছল পথ, হড়াস করে পা নেমে গেল নীচে, সে চিৎ হয়ে পড়ল জলে। দু ঢোঁক পেটেও গেল নাকি কে জানে বাবা! গোরুটা দড়িতে টান খেয়ে লাফঝাঁপ মারছে।

চুবুনি খেয়ে যখন নিরাপদ উঠে দাঁড়াল তখন জল তার কোমর ছাপিয়ে উঠেছে।

পারা যাবে না। ফিরে চল।

লাভ কি? যতটা এসেছেন সামনেও ততটাই পথ। হরেদরে কাশ্যপ গোত্র। এগোনোই ভালো।

পিসি আর মরার সময় পেল না? এই বর্ষাকালে?

কথা পরে। আগে জলটা পেরোই। গোরুটা ভয় খাচ্ছে।

এমন জনমনিষ্যিহীন অন্ধকার আর এমন দুর্যোগে আর কখনও পড়েনি নিরাপদ। সে গাঁয়ের ছেলে বটে, কিন্তু এরকম বেচাল জায়গা দেখেনি কখনও। তাও এখানেই শেষ নয়, এর পর স্রোতের জায়গা আছে।

তার নিঃসন্তান বিধবা পিসি মারা গেছে দিন পনেরো আগে। গাঁয়ের লোকেই দাহ করেছে। খবর পেয়ে একটা শ্রাদ্ধশান্তি নিজেদের গাঁয়েই করেছে নিরাপদ। কিন্তু কথা হল, পিসির সম্পত্তি। পাকা বাড়ি, চল্লিশটা নারকেল গাছ, দুধেল গাই, ধানী জমি মিলিয়ে কম হবে না। পিসেমশাইয়ের দিকের কোনো ভাগীদার এসে হাজির হওয়ার আগেই নিজের ঝান্ডাটি গিয়ে পুঁতে ফেলা দরকার। আইনের নানা প্যাঁচ আছে। কে কোথা থেকে উদয়

হয়ে দাবিদার সেজে বসবে তার ঠিক কী? পিসের দিকটা একদম ঝাপসা। পিসি বিধবা হয়েছিল সতেরো বছর বয়সে। সতেরো থেকে আশি অবধি একা একা সব সামাল দিয়েছে। বিষয়সম্পত্তির নেশাই বাঁচিয়ে রেখেছিল পিসিকে। এই এত বছর পিসেমশাইয়ের দিককার কেউ খোঁজখবর বড়ো একটা করেনি। এক ভাইপো নাকি ক্বচিৎ আসত। সেও আগেকার কথা। নিরাপদর তখনও জন্ম হয়নি। সেই ভাইপোরও গত ত্রিশ বছর কোনো খোঁজখবর নেই। মরেটরেই গেছে। যদি না বেঁচে থাকে তবে সে এখন বুড়োটুড়ো। এই অজ পাড়াগাঁ থেকে মৃত্যুসংবাদ গিয়ে পৌঁছোবে কখনও, এমন কথা নেই। সুতরাং পিসির সম্পত্তি তাকেই অর্শাচ্ছে।

তা পিসি যে তারও খুব আপনজন ছিল, দেখাসাক্ষাৎ হত তা নয়। নিরাপদর বাবা যতদিন বেঁচে ছিল ততদিন একটা ক্ষীণ যাতায়াত ছিল বটে। এক-আধবার সেই শিশুবয়সে এসেছেও পিসির কাছে। পিসি পেল্লায় রাগী মানুষ ছিল। নিরাপদর বাবা ছিল বয়সে পিসির বছর দুয়েকের ছোটো। সেই সুবাদে পিসি হল তার বাবার দিদি। কিন্তু নিরাপদর খুব মনে আছে, বাবা সামনে গেলেই পিসি হাত-পা ছুঁড়ে বাবাকে খুব বকাঝকা, গালমন্দ করত। বলত, এই বিধবা হয়ে ইস্তক এক কোণে পড়ে আছি, একটা খোঁজ নিস কখনও তোরা? একটা ভালোমন্দে ডাক দিস? তাও তো তোদেরটা খেয়ে-পরে বাঁচতে হচ্ছে না। আসিস কেন তা কি জানি না? কবে আমি মরব, কবে এসে সব গাপ করবি সেই মতলব তো? সব জানি।

তা পিসি কিছু মিথ্যেও বলত না। নিরাপদর বাবা গজপতি অভাবী মানুষ ছিল। নেশা-ভাঙের ঝোঁক ছিল, শুয়ে-বসে তাসটাস খেলে আর গাঁয়ে কূটকচালি করে সময়টা কাটিয়ে দিত। টানাটানির সংসার। মাঝে মাঝে পিসির বাড়িতে হানা দিত কিছু ধারকর্জ্জ বা দাক্ষিণ্যের জন্যই। কিন্তু পিসি কঠিন মানুষ। সহজে হাত উপুড় করত না। তবে গজপতির দুই মেয়ের বিয়ের সময়ে দু হাজার করে টাকা দিয়েছিল কর্জ হিসেবে। টাকাটা বাবা শোধ করেনি। তার জন্য বিয়েবাড়িতেই পিসি সকলের সামনে খুব ঝেড়েছিল বাবাকে। মুখ তো নয়, যেন লাউড স্পিকার। যেমন, গলার জোর, তেমনি কথার ঝাঁঝ। প্রথম বোনটার বিয়ের কর্জটা শোধ দেয়নি, দ্বিতীয় বোনের বিয়ের বাবদ আর একদফা ধার--পিসির দোষ কী?

তারপর থেকে বাবা আর পিসির গাঁ-মুখো হত না। সম্পর্ক আর ছিলই না বলতে গেলে। বাবা যখন মারা গেল তখন খবর পেয়ে পিসি এসে কিছু কান্নাকাটি করে যায়। শ্রাদ্ধের খরচ বাবদ কিছু দিয়েছিল মায়ের হাতে। সেও আজ বছর পাঁচেকের কথা। এখন সেই পিসির জোত জমি বাড়ির দখল নিতেই চলেছে নিরাপদ। নেলো পিসির গাঁয়ের লোক। পিসির জমি-বাগান দেখাশুনো করে এসেছে বরাবর। ধর্মভীরু ভালো লোক। সেই এসে গতকাল বলল, আরে করছেনটা কী? দখল না নিলে সব সম্পত্তি যে বাঁটোয়ারা হয়ে যাবে।

নিরাপদও যাবে-যাবে করছিল। বর্ষাকাল বলেই যা একটু বাধা। পিসির গাঁয়ের রাস্তার খুব বদনাম। বর্ষাকালে নাকি নরক। ওদিকে নিরাপদর অবস্থাও ভালো নয়। কোনো দিকেই কিছু সুবিধে হচ্ছে না। গাঁয়ে করারই বা আছে কী? হাতে পয়সা থাকলে একটা ব্যাবসার চেষ্টা করা যেত। বিদ্যে বলতে গাঁয়ের স্কুল থেকে মাধ্যমিকটা ঠেলে গুঁতিয়ে পাশ করেছিল। তারপর আর এগোয়নি। বাড়িতে বিধবা মা, দুটো ভাই। কোনোরকমে মাথা গোঁজার মতো একখানা বাড়ি ছাড়া তাদের আর বিশেষ কিছু নেই। মা ঘুঁটে বিক্রি করে, বাগানের কিছু তরিতরকারি ব্যাপারীরা নিয়ে যায় পসয়া দিয়ে। নিরাপদ টিউশনি করে, তবে তাতে আয় সামান্যই। জমি থেকে বছরের ধানটা টেনেমেনে উঠে আসে। বাপের স্বভাব নিরাপদও কিছু পেয়েছে। সেও একটু তাসটাস খেলে, আড্ডা দিয়ে বেড়াতে ভালোবাসে, নেশাভাঙও যে মাঝে মাঝে করে না, তা নয়। পিসির সম্পত্তিটা মুঠোয় পেলে তার একটা হিল্লে হয়।

স্রোতটা কোনদিক থেকে কোনদিকে তা বুঝে ওঠার আগেই ধাক্কাটা লাগল। নেলো বলে উঠল, সামলে! সামলে!

কে কাকে সামলায়! স্রোতের এত জোর ভাবতে পারেনি নিরাপদ। তুমুল বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে গাঁক গাঁক করে জলের তোড় বয়ে যাচ্ছে বাঁ থেকে ডাইনে। তাতেই নিরাপদ এক ঝটকায় ভেসে গেল কম করেও হাত দশেক। তার সঙ্গে গোরুটাও। দড়ি ধরে ছিল বলে বেশি দূর যায়নি। তবে হাত থেকে দড়ি অনেকটাই বেরিয়ে যাওয়ায় সে আর নেলোর গোরু একেবারে জড়াজড়ি হয়ে গেল। ছাতাটাও যাচ্ছিল।

নেলো পাকাপোক্ত লোক। স্রোতের মধ্যেও ঠিক খুঁটোর মতো দাঁড়িয়ে থেকে দড়ি ধরে রইল কষে। গলা তুলে বলল, ডুবজল নয় কর্তা, ভয় পাবেন না। পা ঠেকালে জমি পাবেন। দড়ি চেপে ধরে চলে আসুন।

ছাতাটা সামলে, থলি সামলে কাজটা সহজ নয়। থলিটা পৈতের মতো আড়া কাঁধে নেওয়া বলে ভাসেনি। নিরাপদ আঁকুপাঁকু করে জমিতে পা রেখে জল ঠেলে এগোলও। গোরুটাও এল। তারও অস্তিত্বের সংকট। নিরাপদর বাহ্যচৈতন্য অন্ধকারে লোপ পাচ্ছিল। শুধু গতিটা বজায় রাখা।

ধীরে ধীরে জল কমে তারা ফের হাঁটুজলে উঠে এল।

নেলো বলল, আর স্রোত নেই।

নিরাপদ হ্যাঁদানো গলায় বলল, আর কত দূর ?

উই তো ডাঙা জমি।

ভবেশ মল্লিক তাকে বুঝিয়েছে আইনে আছে দখলদারেরই দাবি পয়লা। দাবি যতই উঠুক, আদালত দেখবে কার দখলে সম্পত্তিটা আছে। তাহলেই কেল্লা অর্ধেক ফতে। নিরাপদ সেইটেই ভরসা করে আছে। আগে তো দখল, পরে অন্য কথা। তবে দখলও বড়ো সহজ নয়। গাঁয়ের মোড়ল মাতববররা নানা ফ্যাঁকড়া তুলবে। নানা প্রশ্ন উঠবে। তাদেরও স্বার্থ আছে। অতগুলো নারকোল গাছ, বাগান, জমি, ধানের গোলা, গাইগোরু, পাকা বাড়ি, ঘরে সোনাদানা, বাসনপত্র, টাকা-পয়সা কম থাকার কথা নয়। একটা রাজ্যপাটই বলতে গেলে। মাতববররা লুটেপুটে খাওয়ার এমন সুযোগ ছাড়ে কখনও? গড়িমসি করে সে একটু দেরিই করে ফেলল নাকি? খবর তো পেল পিসির শ্রাদ্ধের মাত্র দুদিন আগে। গাঁয়ের মোড়ল নাকি একখানা পোস্টকার্ডে খবর পাঠিয়েছিল। তা সে খবর পৌঁছোয়নি। পরে এক হাটুরে এসে খবরটা দিয়ে যায়।

হাঁটুর জল গোড়ালিতে নামল। তারপর ধীরে ধীরে একটা ঢালু বেয়ে ডাঙায় উঠল তারা।

ফাঁড়া কেটেছে, ও নেলো?

টর্চবাতিটা কী জ্বলবে?

টর্চে তেইশ অনেক আগেই বেজে গেছে। বলে টর্চবাতিটা বের করে সুইচ টিপল নিরাপদ। জ্বলল না।

নেলো একটা শ্বাস ছেড়ে বলল, কী আর করা যাবে। গোরুর গা থেকে জোঁকগুলো আর ছাড়ানো হল না তবে।

জোঁক?

আজ্ঞে। ও জিনিসের অভাব নেই। পায়ে-টায়ে একটু হাত বুলিয়ে দেখে নিন। বারো চৌদ্দটা লেগে গেছে এতক্ষণে।

নিরাপদর গা একটু শিরশির করল, তাহলে?

চলুন দেখি। ভামি গাঁয়ে চেনা বাড়ি আছে।

পরাণ মণ্ডলের অবস্থা ভালোই। টিনের ঘর, পাকা মেঝে, মস্ত উঠোন। বৃষ্টির মধ্যে তারা দাওয়ায় উঠতে যেতেই দুটো কুকুর তেড়ে এল। পরাণ মণ্ডল আর তার দুই ছেলেও বেরিয়ে এল দা হাতে। একজনের হাতে মস্ত টর্চ।

নেলো বলল, ওরে বাপরে, মারবে নাকি? বিপদে পড়েই আসা। বাতিটা একটু দেখাও বাপু।

পরাণ মণ্ডল অপ্রস্তুত হয়ে বলল, কিছু মনে কোরো না, কালও বিধু সাহার বাড়িতে ডাকাতি হয়ে গেল। তা এত রাতে কোত্থেকে? সঙ্গে ওটি কে?

নেলো এত কথার জবাব না দিয়ে বসে গেল পায়ের জোঁক ছাড়াতে। বলল, আলোটা ভালো করে ফেল তো। মেলা লেগেছে দেখছি।

নিজের পায়ের দিকে চেয়ে নিরাপদর মূর্ছা যাওয়ার উপক্রম। অন্তত বিশ-পঁচিশটা জোঁক ঊরু থেকে পায়ের পাতা, এমনকি আঙুলের ফাঁকেও লেগে গেছে। ঘিনপিত ঝেড়ে সে পটাপট জোঁকগুলোকে শরীর থেকে ছিঁড়ে উঠোনে ছুঁড়ে ফেলতে লাগল। নেলো নিজের জোঁক সাফ করে গোরুটাকে নিয়ে পড়ল।

পরাণ মণ্ডল বারান্দায় রাখা বেঞ্চিখানায় বসে কাণ্ডটা দেখতে দেখতে বলল, জলা পেরিয়ে এলে বুঝি?

হ্যাঁ।

গোরুটা কত নিল?

পাঁচ হাজার।

সস্তায় পেয়েছ। আমার জার্সি গাইটা পড়েছিল সাত।

দু-চারটে কথাবার্তার পর উঠে পড়ল নেলো, আসি হে পরাণ।

এসো গিয়ে।

রওনা দেওয়ার পর নিরাপদ বলল, ও নেলো, রাতটা তো এ বাড়িতেই থাকা যেত।

পাগল নাকি? পরাণ মণ্ডল হাড়কেপ্পন লোক। এক-গাল মুড়িও বের করত না নিজে থেকে। দরকার কী? এই তো পাশেই মহেশতলা। ভো করে চলে যাব।

কত দূর?

মেরেকেটে মাইলটাক।

বৃষ্টিটা জোর হচ্ছে। ব্যাঙ ডাকছে, খুব। ভামি গাঁ থেকে রাস্তাটা খারাপ নয়। পাথরকুঁচির রাস্তা। কাদা খুব-একটা নয়। মহেশতলার সীমানায় ঢুকতেই বৃষ্টির তোড়টা কমে গেল। বাতাসটা রইল।

নেলোর শ্বশুরবাড়ি যা বলেছিল তাই। মোট চারখানা খোড়ো ঘর। একখানা বড়ো উঠোন।

নেলো হাঁকাহাঁকি করায় লোকজন মেলা বেরোল। শ্বশুর, শাশুড়ি, তিন শালা, তাদের তিনটে বউ, দুই শালি, আর গোটা সাতেক বাচ্চাকাচ্চা।

নেলো বলল, আজ এইখানেই দেহ রাখতে হচ্ছে ঠাকরুন। সঙ্গে অতিথি আছে। তারও আগে মা লক্ষ্মীর জাবনার ব্যবস্থা করতে হবে। পেট পড়ে আছে।

হাঁকেডাকে কাজ হতে লাগল। লম্ফ আর লণ্ঠন হাতে এঘর ওঘর ছোটাছুটি। বৃষ্টির মধ্যেই। গরুর জাবনা জুটল, তাদের দুজনেরও ওই জাবনার মতোই জুটে গেল খানিকটা খিচুড়ি। শুকনো একখানা কাপড়ও ছিল বরাতে। নিরাপদর মনে হল স্বর্গসুখ বোধহয় একেই বলে।

সকালবেলায় বাদলা ছেড়ে সূয্যিঠাকুর উদয় হলেন। তারাও গুটিগুটি রওনা হয়ে পড়ল।

পিসির গাঁয়ের নাম ভাঙন। সম্পন্ন গাঁ। পাঁচশো ঘর আছে। হপ্তায় দুদিন হাটও বসে। একটা মুদিখানা আর একটা ভুসিমালের দোকান আছে। ইস্কুল আছে। আর চাই কী? নিরাপদর মনটা খুব নাচানাচি করছে তখন থেকে। এই গাঁয়েই যদি পাকাপাকি থাকা যায়, তবে তার হিল্লেই হয়ে গেল।

এই সকালবেলাটায় জলকাদা ভেঙে পথ হাঁটতে তার বড্ড ভালোই লাগছে। সামনেই যেন মুশকিল আসান। সামনেই যেন রাজ্যপাট। হাতের নাগালেই যেন গুপ্তধন।

ও নেলো!

বলুন।

গাঁয়ের মাতব্বররা কি মানবে?

মানবে না কেন? ঠিকমতো বুঝিয়ে বললে খুব মানবে।

পিসি একটা উইল-টুইল করে গেলে ভালো হত।

কী যে বলেন তার ঠিক নেই।

কেন বলো তো?

উইল-টুইলের কথা আমরা কানে শুনেছি বটে, কখনো চোখেও দেখিনি। আর বিন্দু পিসির কি মরার ইচ্ছে ছিল নাকি? মরার কথা ভাবলে তো উইলের কথা ভাববে। উনি ভাবতেন চিরটাকাল বিষয়-আশয় নিয়ে জড়িয়ে মড়িয়ে বেঁচে থাকবেন।

মনে হচ্ছে বেশ ঝামেলায় পড়তে হবে।

তা হবে একটু। আপনার পিসি আপনাদের তেমন পছন্দও করতেন না।

তা বটে। মাতববররা কীরকম চাইবে-টাইবে বলে মনে হয়?

ভালোই চাইবে। নতুন লোক আপনি, গাঁয়ে ঢুকতে যাচ্ছেন, বিষয়-সম্পত্তি দখল করবেন, তা তার দক্ষিণাও আছে। দিয়ে-থুয়ে যা থাকবে তাতেও পর্বত। বুঝলেন তো!

বুঝেছে নিরাপদ। আবার বুঝেও খানিকটা বুঝের বাইরে থেকে যাচ্ছে। মনটা খচ খচ করছে বড়ো। ওয়ারিশান যদি বেরোয় তাহলে কি সে ধোপে টিকবে? পিসি মানে হল গোত্রান্তর, পিসির ভাইপো হল পরস্য পর। পিসেমশাইয়ের দিককার কেউ যদি এখন লাফ দিয়ে আসরে নামে তাহলেই সে কুপোকাৎ। ভবেশ মল্লিক এ কথাটাও তাকে বলে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে। মল্লিকের পো জানে মেলা। অনেক মামলায় সাক্ষী দিয়েছে কি না। হরবখৎ হাসনাবাদ যাচ্ছে আসছে। কলকাতাতেও যায়।

নেলো বলল, এই হরিপুর ছাড়ালুম। সামনেই ভাঙন।

ভাঙন দূর থেকেই দেখা গেল। বিখ্যাত শিবমন্দিরের মাথায় ধবজা উড়ছে। বুকটা কাঁপছিল তার। দখলটা নিতে পারলে আর কথা নেই।

পিসির বাড়িতে আছে কে বলো তো নেলো?

বাঘিনীই আছে একটা। মোক্ষদা দাসী। তাকে যমেও ভয় খায়।

মোক্ষদার কথা ভালো মনে নেই। তবে শুনেছে। পিসির কাছেই বলতে গেলে মানুষ। এখন বয়স হয়েছে। সেই সব সামলায়।

নেলো বলল, মোক্ষদা দিদি না থাকলে এতদিনে সব লুটপাট হয়ে যেত। কিন্তু তাকে ভয় খায় না এমন বুকের পাটাওলা মানুষ এ গাঁয়ে নেই।

ভাঙন গাঁ দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। শিবমন্দিরের গায়ে বাঁধানো পুকুর, তাতে টলটল করছে জল। বেশ কয়েকখানা পাকা বাড়ি আছে। তার মধ্যে দুটো দোতলাও। পথে লোকজন চলাফেরা করছে। বটগাছের তলায় বাঁধানো চাতাল। সেই চাতাল থেকে একজন হেঁকে বলল, ও নেলো, গরুটা কি কিনলি নাকি?

আজ্ঞে।

এ যে জার্সি গোরু রে। দিব্যি হয়েছে। কত নিলো?

পাঁচটি হাজার।

আজকাল আর টাকার দামই বা কি? দু-বছরেই পয়সা উসুল হয়ে যাবে। দুধেল নাকি?

না। তবে পাল খাওয়ানো আছে। সদ্য গাভীন।

লটারি মেরেছিস। সঙ্গে কে রে?

কুটুম।

বাঃ বেশ। নতুন গাই, কুটুম, দিব্যি আছিস।

নিরাপদ চাপা গলায় বলল, লোকটা কে?

নেলো উদাস কণ্ঠে বলল, যদি এ গাঁয়ে থাকেন তাহলে টের পাবেন। ওটি হচ্ছেন দুর্গা বৈরাগী। লোকের পেছনে কাঠি দিতে ওঁর জুড়ি নেই। এই যে গোরুটি দেখলেন, কালকেই এসে দুধের আগাম বন্দোবস্ত করে যাবেন। কিন্তু পয়সাটি আদায় করতে যান, দম বেরিয়ে যাবে।

পিসির বাড়ি দেখে নিরাপদর যেন জন্মান্তর হল। আহা, কী বাড়িখানাই না বানিয়েছিলেন পিসেমশাই। সামানে দু বিঘে জমি হবে হেসেখেলে। তাতে ফলন্ত ঢ্যাঁড়স, উচ্ছে, লঙ্কা। নেলো বলল, এসব বন্দোবস্ত করা আছে। নন্দ দাস দু হাজার টাকায় নিয়ে রেখেছে। লাঙ্গল তার, ফসলও তার।

বুঝেছি।

পিছনের দিকে নারকোল গাছের চালচিত্তির, সামনে একতলা বাড়িখানা। পেটাই ছাদ, সামনে চওড়া বারান্দা। হোক পুরোনো, বাড়ি খুব মজবুত।

বারান্দায় একখানা কাঠের চেয়ারে কে একজন বসেছিল। তাদের দেখে উঠে দাঁড়াল।

নেলো বলল, যান চলে ভিতরে। আপনারই বাড়িঘর।

তুমি আসবে না?

তার জো কী? গোরু নিয়ে এসেছি, এখন বরণ-টরণ হবে। তারপর মা লক্ষ্মী ফলমূল খাবেন। অনেক হ্যাপা। আমাকে দরকারই বা কী? মোক্ষদা আছে। আপনি যে আসবেন সে জানে।

তবু একটু কেমন কেমন লাগছে। বারান্দায় ও লোকটা কে?

নেলো ফটকের বাইরে থেকেই ঠাহর করে দেখে বলল, তাই তো! এ তো চেনা মানুষ বলে ঠেকছে না!

নিরাপদর বুকটা একটু কেঁপে গেল। লক্ষণ ভালো নয়। সে বলল, ওদিককার কেউ নয় তো?

নেলো মাথা চুলকে বলল, তা তো বুঝতে পারছি না। গিয়ে দেখুন না একবার। কথা-টথা কইলেই বুঝবেন।

যদি তাড়া করে?

করলেই হল? আপনিও তো ন্যায্য ভাইপো। ফ্যালনা তো নয়।

নিরাপদ একবার নিজের পোশাকের দিকে তাকাল। রাতের ওই ভেজা জামাকাপড় এখনও শুকোয়নি ভালো করে। কাদার বিস্তর দাগ। কাঁধে ভেজা ঝোলা-ব্যাগ। চেহারাটা ভদ্রস্থ নয়। পিসির ভাইপো বলে পরিচয় দিলেও কি বিশ্বাস করবে? সাক্ষীসাবুদ কই?

লোকটা একটু কড়া গলায় হাঁক মারল, কে? কাকে চাই?

নিরাপদ কাঁপা গলায় বলল, ও নেলো, তুমি বরং একটু দাঁড়িয়েই নাও। লোকটা মনে হয় অন্য তরফই হবে। তাহলে তো হয়েই গেল।

নেলো বলল, অন্য তরফ হলেই বা কী? আগে সাব্যস্ত হোক, তবে না দাবিদাওয়া। থাবা মারলেই তো হল না। যান না বুক চিতিয়ে। ভয়টা কিসের?

ভয় যে কিসের তা নিরাপদ বলতে পারবে না। তার মতো মানুষের ভয়ের অভাবটাই বা কী? মেলা ভয়, মেলা অনিশ্চয়তা।

নেলো একরকম ঠেলেই ফটকের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলো তাকে। বলল, ঢুকে পড়ুন। ঢুকে পড়াটাই আসল কথা।

নিরাপদর আর পিছোনোর উপায় নেই। দুটো পা যেন অবশ-অবশ লাগে। বুকের মধ্যে ধপাস ধপাস। এত কষ্ট করে আসা, সব বৃথাই গেল বুঝি।

লোকটা বারান্দার সামনে এসে দাঁড়িয়ে আছে। বুকটা বেশ চিতোনোই। গায়ে ফর্সা গেঞ্জি, পরনে ময়ুরকণ্ঠী রঙের লুঙ্গি। মাথায় টাক। সবচেয়ে বড়ো কথা, চেহারাটা ভদ্রগোছের।

কাকে চাই? ফের সেই কড়া গলা।

নিরাপদ গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, স্যান্ডালের বিল থেকে আসছি।

সেটা কোথায়?

ওই দিকে। বলে ডানধারটার গোটা পৃথিবীর দিকেই হাত তুলে দেখাল নিরাপদ।

অ। তা কী কাজ?

আজ্ঞে, এই এলাম একটু। ইনি আমার পিসি হতেন কি না।

লোকটা চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে থেকে বলল, পিসি? বললেই হল?

সত্যি কথাই বলছি। পাঁচজনে জানে।

মতলবটা কী?

মতলব? না, তা কিছু নেই। এলাম আর কি। শ্রাদ্ধ-টাদ্ধ করেছি কিনা।

শ্রাদ্ধ! লোকটা খাপ্পা হয়ে বলল, কিসের শ্রাদ্ধ? শ্রাদ্ধ করার তুমি কে হে? শ্রাদ্ধ তো করব আমরা। সে আমরা করেছিও। এক গোত্র নও, এক পরিবার নও শ্রাদ্ধ করলেই হল?

নিরাপদ প্রমাদ গুনল। বাস্তবিক, পিসির শ্রাদ্ধ বোধ হয় তার করার কথাও নয়। সে মিনমিন করে বলল, করেই যখন ফেলেছি তখন আর কী করা? না হয় সেটা ধরবেন না।

ধরব নাতো ঠিকই। তোমার শ্রাদ্ধের জল কাকিমা পায়ও না। তা বলে শ্রাদ্ধ দেখিয়ে কিছু সুবিধে পাবে তা ভেবো না।

কাকিমা! তাহলে আর কথা কী? এ হল ওই তরফ। শুধু ও তরফই নয়। দখলও আগে এসে নিয়ে ফেলেছে। নিরাপদ কাহিল মুখে দাঁড়িয়ে পড়ল। চারদিক থেকে বাড়িঘর, বাগান, নারকোল গাছ, ঢ্যাঁড়স ক্ষেত সব অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। বড্ড বোকা লাগছে নিজেকে।

ঘন ঘন বার কয়েক গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, আমার নিজের পিসি।

নিজের পিসি তো কী হয়েছে?

আজ্ঞে কিছু হয়নি। কোলেপিঠে করে মানুষ করেছিলেন তো, তাই--

লোকটা ফ্যাঁচ করে হেসে বলল, বটে। বটে। তাই পিসি মরতে না মরতেই এসে গন্ধে গন্ধে হাজির হয়েছ! বলি মতলবটা কী? অ্যাঁ! কী উদ্দেশ্যে আসা?

নিরাপদ চারদিকে টালুমালু করে চেয়ে বলল, এই এমনিই।

লোকটা হঠাৎ গলাটা একটু নামিয়ে বলল, আমি বলি বাপু, কেটে পড়ো। এসব আমরা দখল পেয়ে গেছি। এখন সব দেখাশোনা আমরাই করব। এটা এখন আমাদের বাড়ি। বুঝলে!

নিরাপদ ঘাড় হেলিয়ে বলল, বুঝেছি। তা এই বেলাটা--

শশব্যস্ত লোকটা বলল, না না, ওসব হবে না। অন্য জায়গায় দেখ। আমার পরিবার-টরিবার সব আজ সকালেই এসে পড়ছে। মেলা লোক বাপু। ঘরদুয়োর সাফসুতরো করা, গোছানো, মেলা কাজ আমাদের। আজ অতিথিসেবা। পেরে উঠব না। এখন এস গিয়ে।

অগতির গতি নেলো আছে। তার বাড়ি গিয়ে পড়লে ফেলবে না। সকালে তার শ্বশুরবাড়িতে মুড়ি খেয়েছিল বাতাসা দিয়ে। তা তল হয়ে গেছে। এখন তার পেটে বাঘের খিদে। নেলোর বাড়িতে চাট্টি জুটলে খেয়েদেয়ে ফেরতযাত্রায় রওনা হয়ে পড়া যাবে।

কাহিল শুকনো মুখে ফিরেই যাচ্ছিল, এমন সময় বেঁটেখাটো কালো চেহারার এক মহিলা ফটক ঠেলে ঢুকল এসে। তাকে দেখে বলল, কে গা বাছা তুমি? কী মতলব?

নিরাপদ ব্যাজার মুখে বলল, কে আর হব? উটকো লোক বলেই ধরে নিন। এরকম কুকুর-তাড়া জীবনে খাইনি।

মেয়েছেলেটার হাতে গোটা দুই ঠোঙায় বোধ হয় মুদির দোকানের জিনিস। একটু নরম গলায় বলল, আসছো কোত্থেকে? স্যান্ডেলের বিল নাকি? নেলো বলছিল বটে মাসিমার ভাইপো আসবে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিরাপদ বলল, আমিই। তা ধুলো পায়েই চলে যেতে হচ্ছে। উনি মোটেই ঢুকতে দিলেন না। আপনি কি মোক্ষদা দিদি?

ঢুকতে দেয়নি? বলে মোক্ষদা চোখ পাকিয়ে বলল, ঢুকতে দেয়নি কেন? মৌরসীপাট্টা নাকি?

তা উনিই জানেন।

রোসো বাছা। তোমাকে চিনি। এতটুকুন দেখেছি। ওরাও যে তুমিও সে। কে কাকে ঢুকতে না দিয়ে পারে?

নিরাপদ দাঁড়াল।

মোক্ষদা সটান গিয়ে লোকটার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, ভেবেছটা কী? অ্যাঁ। বলি এ বাড়ি কি তোমার বাবার? মাসির সম্পত্তি এখনও মাসিরই আছে। তুমি তার ভাইপোকে তাড়াও কোন সুবাদে?

লোকটা একটু ভড়কে গিয়ে বলল, দ্যাখ মোক্ষদা, মুখ সামলে।

মোক্ষদাকে চোখ রাঙাচ্ছ? আমার একটা ডাকে শতেক লোক জড়ো হবে জান? এ বাড়িঘর কার তার বিচার এখনও হয়নি। তুমি মাসির ভাসুরপো আছো তো থাক, আমি তো বারণ করিনি। আবার ও ছেলেটাও মাসির ভাইপো। ও-ও থাকবে। তুমি তাড়ানোর কে?

তুই আইন জানিস?

আইন জানার দরকার নেই। এটা জানি যে তোমাদের করোই এখনও হক জন্মায়নি। বেশি তড়পাবে না।

নিরাপদর কানে মোক্ষদার কথাগুলো যেন মধু ঝরাচ্ছিল।

লোকটা দু-একবার হুংকার ছাড়ার চেষ্টা করে সুবিধে করতে পারল না। অবশেষে বলল, জায়গা কোথা? আমার বাড়ির সব আসছে।

মোক্ষদা বলল, তার আমি কী জানি? জায়গা না হলে হাটখোলায় নিয়ে তোলো গে। এ ছেলে ওই পুবের ঘরে থাকবে। ব্যবস্থা আমি করেই রেখেছি।

কাজটা ঠিক হচ্ছে না। এ দাবি তুলবার মতলবে আসেনি তো আবার?

এলে এসেছে। গাঁয়ের পাঁচজনে বসে সব ঠিক করবে। তোমার অত সর্দারির দরকার কী? এসো তো ছেলে, ঘরে এসো।

নিরাপদ মাথাটা নীচু করেই বাড়িতে ঢুকে পড়ল। এই ঢুকে পড়াটা দুদিন আগে হলে সুবিধে হত।

২

পুবের ঘরের বাহারখানা বসে বসে দেখছিলো নিরাপদ। পাকা বাড়ির রকমই আলাদা। একেবারে নিরেট জিনিস। একবার বানিয়ে ফেললে আর লয়ক্ষয় নেই। পুবের ঘর বলে আলো-হাওয়া আছে। দু-খানা জানলা পুবে আর দক্ষিণে। ঘরে একখানা চৌকি, তাতে পাতলা তোশকের বিছানাও পাতা। আর কিছু নেই অবশ্য। চৌকির তলায় গোটা আষ্টেক কুমড়ো আর মুখবাঁধা বস্তায় বোধ হয় নারকেলই হবে। সব দেখে নিয়েছে নিরাপদ। সে কুয়োর জলে স্নান করেছে, ধুতি জামা ধুয়ে দিয়েছে। এখন আধভেজা লুঙ্গি পরে বসে আছে। মোক্ষদা একবার জিজ্ঞেস করেছিল সে চা খায় কি না। খায় জেনে চলে গেছে, আর আসেনি। এক পেয়ালা চা আর একটু মুড়ি-টুড়ি জুটে গেলে পেটের তাড়সটা কমে।

পুবের ঘর মানে বাড়ির সামনের দিকে বাঁ-হাতি ঘর। সামনেই বাগানখানা। ডান ধারে বারান্দা। বারান্দার লোকটা এখন আর নেই। একটু আগে ভিতরবাগে কোথায় যেন গেল। লোকটাকে ভয় খাচ্ছে নিরাপদ। ও তরফের দাবি বেশি। দখল আগে নিয়েই ক্ষান্ত থাকেনি,

পরিবারও এসে যাচ্ছে। লোকটা কেমন তা বুঝতে পারছে না সে। তবে তার যে আশা নেই এটা বেশ বুঝে গেছে। লোকটা খেঁকি ধরনের। কখন তেড়ে আসবে কে জানে?

একটু ঢুলুনি এসেছিল। মোক্ষদা এসে ডাকল, ও নিরাপদদাদা, ঘুমোলে নাকি?

না, এই একটু--

নেলো সব বলে গেছে এসে। আহা, খুব ঝঞ্ঝাট গেছে তো পথে। এই নাও চা। মুড়িতে তেল মাখানো আছে। সঙ্গে এই শশা। মাসির নিজের হাতে লাগানো গাছের শশা খাও।

নিরাপদর ইচ্ছে হল মোক্ষদার পায়ের ধুলো নেয়। সেটা পারল না বটে, কিন্তু এমন বিগলিত ভাব করল যে এমন জামাই-আদর তাকে কেউ কখনও করেনি।

মোক্ষদা শক্তপোক্ত মেয়েছেলে। চোখ-মুখ পুরষালী ধাঁচের, বলল, উনি তো পরশু এসে জুটলেন। এসেই হাঁকডাক, হুকুম যেন সাতপুরুষের জমিদারিতে এসেছেন। জন্মে দেখিনি, বলছে ভাসুর-পো।

আশায় আশায় নিরাপদ বলে উঠল, দু নম্বরী না কি?

কে কত নম্বরী তা কি আমার জানার কথা। তবে বাপের নাম সাধন দাস ঠিকঠাকই বলছে। সাধনবাবু আসতেনও আগে। মাসির কাছে নামও শুনেছি। কিন্তু এতকাল সম্পর্ক নেই, মরার পর যে কোন পাখির মুখে খবর পেয়ে ইনি উড়ে এলেন কে জানে বাবা! গোরু মরলে শকুন যেমন টের পায় তেমনি ব্যাপার। লোক মোটেই ভালো নয়।

মুড়ি আর শশা বড়ো চমৎকার লাগছিল নিরাপদর। শিশুর মতো বিস্ময়ে বলল, বটে।

এসে অবধি আমার হাড়মাস জ্বালিয়ে খাচ্ছে।

সেটা কেমন?

এটা সেটা রাঁধতে বলে। খুব নোলা। তার ওপর জিনিসপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করার স্বভাব আছে। ঘরদোর, আলমারি, বাক্স, সব খোলার জন্য চাপাচাপি। আমি সাফ বলে দিয়েছি, ওসব হবে না। আমি জিম্মাদার। আমার হাতে যতক্ষণ ক্ষমতা আছে, যতক্ষণ না মালিকানা সাব্যস্ত হয়, ততক্ষণ কোনো জিনিসে হাত দিতে পারবে না। তাইতে বাবুর কী রাগ! তা

থোড়াই ওর রাগকে আমি পরোয়া করি। ঝগড়া করতে চেষ্টা করেছিল, দিয়েছি পাঁচকথা শুনিয়ে। উনি আমাকে ঝি খাটাতে চেয়েছিলেন। প্রথম প্রথম ফাইফরমাশ খেটেও দিচ্ছিলাম। কাল থেকে বন্ধ করেছি। খাও এখন নিজে রেঁধে।

নিরাপদ চায়ে একটা চুমুক মেরে বলল, একটা কথা দিদি, পিসির তো তুমি মেয়ের মতো ছিলে।

মেয়ের বেশি।

তা পিসি তোমার বন্দোবস্ত কী করে গেল?

মোক্ষদার মুখখানা একটু কেমনধারা হয়ে গেল। পুরুষালী মুখখানায় যেন একটা কান্নার মেঘ ঘনিয়ে উঠল। কিন্তু কাঁদল না মোক্ষদা। কাঁদার মতো মানুষ নয়। একটু যেন অন্যরকম গলায় বলল, বন্দোবস্ত আর কিসের? যে বিষয়-সম্পত্তি পাবে তার দয়া।

কেন যেন কষ্ট হচ্ছিল নিরাপদর। মোক্ষদা যে পিসির জন্য জান বেটে দিত এটা সে জানে। মাথা নেড়ে বলল, এটা পিসির উচিত কাজ হয়নি, এ যা লোক, তোমাকে দেখবে বলে মনে হয় না।

মোক্ষদা একটা শ্বাস ফেলে বলল, না দেখুক। গতরে খাটতে পারি, অভাব কিসের? গদাই দাসের পা চাটব নাকি?

এ লোকটার না কি গদাই?

হ্যাঁ গো, গদাধর দাস। নামের বাহার আছে খুব। কাল দুপুরে ঠেসে বোয়াল মাছ খেয়ে আজ পেটে নেবেছে। ঘন ঘন পায়খানায় দৌড়োচ্ছে দেখো গে যাও। আমি সাফ বলে দিয়েছি, ওয়ারিশ ঠিক হয়ে গেলেই আমি বিদেয় হব।

নিরাপদ কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর বলল, একটা কথা বলব দিদি?

বলো।

পিসির যা আছে সবই তো তোমার হাতে এখন। তা যা তোমার ন্যায্য পাওনা তা নগদানগদি নিয়ে নাও না কেন?

বলো কি? ও-সব কাজ মোক্ষদার দ্বারা হওয়ার নয়। দিয়ে যখন যায়নি, তখন আমি নিজের হাতে নিতে যাব কোন দুঃখে!

দেওয়ার ইচ্ছে হয়তো ছিল, সময় পায়নি।

তা বড়ো মন্দ বলোনি। মাসির ইচ্ছে তো ছিলই। কী বলত জান? শুনলে হাসবে, বলত আমি মরলে সব তুই পাবি।

বলত?

সে অবশ্য কথার কথা। দেশে আইন-আদালত আছে, দিলেই তো আর হল না। আর আমারই বা দরকারটা কীসের? একটা তো মোটে পেট। চলে যাবে।

তোমার আর কেউ নেই?

কে থাকবে? নোনাইয়ে বাড়ি ছিল। মাসির কাছে এসেছিলাম তো এটুকুন বয়সে। বাবা খেতে দিতে পারত না, তাই মাসিকে গচ্ছিত করে গেল। তা বাবা নেই। মা গেল বছর গত হয়েছে। একটা ভাই আছে, পরের জমি চাষ করে পেট চালায়।

তাহলে তুমি যাবে কোথায় দিদি?

কোনো চুলোয় যাব।

মোক্ষদা আর দাঁড়াল না। চা আর মুড়ি শেষ করে নিরাপদ উঠল। কুয়োর ধারে গিয়ে জল তুলে কাপ আর বাটি ভালো করে মাটি দিয়ে মেজে ধুয়ে রান্নাঘরের চৌকাঠের পাশে রেখে দিয়ে এল।

ফিরে আসার সময়ে গদাইয়ের সঙ্গে মুখোমুখি।

তিরিক্ষে লোকটা তাকে দেখেই যেন তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে বলল, ঘরটা যে বড়ো দখল করলে, আমার ইয়েরা এসে থাকবে কোথায় বলতে পার? মোক্ষদা মাগি তো দু-খানার বেশি ঘর খুলবে না। তারও একটা তুমি গাপ করলে। আমার সাতজন, আমাকে নিয়ে।

নিরাপদও যেন সমস্যাটা বুঝল, মাথা নেড়ে বলল, ঠিকই তো।

তুমি কি রাত কাটাতে চাও না না কি?

জায়গা না হলে চলেও যেতে পারি।

সে তোমার বিবেচনা, কাকিমা কবে থেকে চিঠি লিখছে, বেঁচে থাকতে থাকতে আয় বাবা, সব বেহাত হওয়ার আগেই তোর হাতে সঁপে দিয়ে যাই। তা সংসারী মানুষ, খেটে খেতে হয়, হুট বলেই তো আসা যায় না। যাবো-যাচ্ছি করে করে এই আসা। তা এসে তো খুব শিক্ষা হল। এটা আছে তো ওটা নেই, ঘরে ঘরে তালা, আর ওই মাগির যেন আঁতে আগুন লেগেছে। এত ঝঞ্ঝাট জানলে কে আসত বাবা। আঁটপুরে আমার কীসের অভাব? দোতলা বাড়ি, জমিজিরেত, গাই গোরু, ফলাও সংসার। কাকিমার স্মৃতি জড়িয়ে আছে বলে আসা। তাঁর শেষ ইচ্ছে। নইলে দশ ভূতে লুটেপুটে খাবে।

আঁটপুরে বাড়ি বুঝি আপনার?

তিন পুরুষের বাস। পরগণার সবাই এক ডাকে চেনে।

আপনি ভাববেন না। রাতে আমি বরং বারান্দাতেই কিছু একটা পেতে শুতে পারব'খন। বাঁধানো জায়গা, অসুবিধে হবে না।

লোকটা যেন একথায় খুশি হল না। অথচ হওয়ার কথা। কেমন একটা মনমরা মুখ করে বলল, কষ্ট করবে কেন ভায়া? বাড়ির ছেলে বাড়িতে ফিরে গেলেই তো হয়। দূরে নাকি?

আজ্ঞে না। তেমন দূর নয়। তবে বর্ষাকালে গ্রামাঞ্চল তো জানেন, সব যেন দুরে দূরে সরে যায়।

আমাদের আঁটপুর তেমন নয়। পাকা রাস্তা, জলকাদার অত্যাচার নেই। এই অখদ্যে জায়গায় আমাদের কি পোষায়? এসব বেচেবুচেই দিতে হবে বোধ হয়। দাম অবশ্য উঠবে না।

কমও হবে না। এটা এ অঞ্চলের বর্ধিষ্ণু গাঁ।

তা বটে। দেখি। তাহলে তুমি কি করছ?

কাল সকালেই বিদেয় হব।

তার আর কি করা! বারান্দা কিছু খারাপ জায়গা নয়। বেশ থাকতে পারবে।

লোকটার সঙ্গে আর কথা হল না। রান্নার জোগাড় দেখি গে যাই, বলে লোকটা ভিতরবাড়ির দিকে গেল।

পাকা দালানে মোট 'চারখানা ঘর, দুটো বারান্দা, উঠোনের ওপাশে রান্নাঘর। আরও পিছনে স্যানিটরি পায়খানা। বাঁধানো কুয়োতলা। সব বেশ তকতকে। পিসির শুচিবায়ু ছিল। বাঁ ধারের দুখানা ঘর বন্ধ, চাবি মোক্ষদার আঁচলে। একখানা ঘরে মোক্ষদা রাতে শোয়। বাইরের লোককে চৌকা ডিঙোতে দেয় না। নগদে আর সোনাদানায় পিসির যা ছিল সব ওই দুটো ঘরে লোহার আলমারিতে।

নিরাপদ ঘুরে ঘুরে একটু দেখল। লোভটা মরে গেছে। ও বাড়িঘর তার নয়। গদাই দাসের। এটা জানার পর মনটা খারাপ হলেও হালকা লাগছে। তার যখন নয় তখন আর ভেবে কী হবে?

বেলা বিশেষ হয়নি এখনও। এগারোটা হবে, সে গাঁ-খানা ঘুরে দেখতে বেরোল। বেরিয়ে একটা বিপদ। সবাই তাকায়। দু-একজন বেশ কূট চোখেও তাকাচ্ছে। শীতলা মন্দিরের কাছে একজন ভারিক্কি চালের মানুষ ফস করে জিজ্ঞেস করল, কোত্থেকে আগমন হচ্ছে?

আজ্ঞে, স্যান্ডালের বিল।

সে তো ওই দক্ষিণে?

যে আজ্ঞে।

তা এখানে কার বাড়িতে?

পিসি। মারা গেলেন।

অ। সম্পত্তির ব্যাপার?

একটু রাগ হল শুনে, বললাম, না আমি ওয়ারিশ নই। এমনিই আসা।

খালধারটা বেশ ভালো। চওড়া খাল। ইছামতীর সঙ্গে যোগ। ভরা বর্ষায় ফুলে-ফেঁপে স্রোত বয়ে যাচ্ছে। পারঘট আছে। হাসনাবাদ থেকে এদিক দিয়ে নৌকো বা ভটভটিতে

আসা যায়। আসছেও লোক, যাচ্ছেও। অশথ গাছের তলায় একাবোকা বসে নিরাপদ এই যাতায়াত দেখল কিছুক্ষণ।

দেখতে দেখতে হঠাৎ একটু টান হয়ে বসল। একটা ভটভটি এসে থেমেছে। পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে এক মেয়েমানুষ নামল। তার পরনে ময়লা ডুরে শাড়ি। সঙ্গে গোটা পাঁচেক ছেলেমেয়ে। খুব কলকল করে কথা কইছে তারা। ঘাটে উঠে একটা বছর দশেকের ছেলে জিজ্ঞেস করল, ও মা, এবার কোনদিকে যাব?

দাঁড়া, জিজ্ঞেস করতে হবে। ও ছেলে, বিন্দুবাসিনী দাসীর বাড়ি কোন দিকে জানো?

তাকেই জিজ্ঞেস করছে। এই কি তবে গদাইয়ের পরিবার? তাই হবে মনে হচ্ছে। নিরাপদ বলল, গদাধরবাবুর কেউ হন আপনারা?

আমরা তারই বাড়ির লোক। এ সব তার ছেলেপুলে।

সোজা চলে যান। বটতলা থেকে বাঁ দিকে মোড় নেবেন। ডানহাতি পাকা বাড়ি। সবাই চেনে।

পাঁচজন ছেলেমেয়ে। বড়োটার বোধ হয় ষোলো-সতেরো বছর বয়স হবে। ছোটোটার মেরে কেটে তিন কি চার। তারা আগু হয়ে যাওয়ার পরে নিরাপদ উঠল। বেলা হয়েছে। তবে সটান এল না। একটু ঘুরে ফিরে সময়টা খানিক কাটাল।

বটতলার কাছে নেলো ধরল, কি কান্ড বলুন তো!

কী হল?

গদাই বলে লোকটা যে গুষ্টিসুদ্ধু এলে ফেলল।

তাই দেখছি।

আপনার তাহলে আশা নেই?

নিরাপদ হেসে বলল, না গো। আইনের মেলা প্যাঁচ।

তাহলে কি ফিরেই যাবেন?

তাই ভাবছি। কাল সকালে ভটভটি ধরে হাসনাবাদ হয়ে যাব।

নেলো মাথা-টাথা চুলকে বলল, মোক্ষদাদিদি তো রেগে একেবারে কাঁইবিচি হয়ে আছে। গদাই নাকি তাকে বড়োই খাটায়। আমি বলি কী, একবার সুধীরবাবুর সঙ্গে দেখা করে যান।

তিনি কে?

পলাশডাঙ্গা স্কুলের মাস্টার। পাকা মাথা। সবাই বিপদে পড়লে তাঁর পরামর্শ নেয়।

আমার আবার বিপদ কীসের?

বিপদ নয়? আপনি বড্ড ছেলেমানুষ।

নিরাপদ একটা শ্বাস ফেলে বলে, বুঝলে নেলো, আমার তেমন দুঃখ হচ্ছে না। বরং হালকাই লাগছে। তবে সম্পত্তি যদি পেতাম তবে মোক্ষদাদিদির জন্য একটা পাকা বরাদ্দ করে দিতাম। মানুষটা কিছু পেলো না।

সে কথাও খাঁটি, তবে ও নিয়ে ভাববেন না। দিদির কাজ বাঁধা। লক্ষ্মণ মণ্ডলের আড়তে তার কাজ ঠিক হয়ে আছে। তবে সে পলাশডাঙ্গায়।

কাজের কথা বলছ? চিরকাল কাজ করেই খেতে পারে না কি মানুষ? বয়স হচ্ছে না?

ও নিয়ে ভাববেন না। বিন্দুপিসির চেয়ে খারাপ রাখবে না লক্ষ্মণ মণ্ডল। তার বিরাট অবস্থা।

সুধীরবাবুরও পাকা বাড়ি। তবে ছাদ নয়, টিনের চাল। যেতেই সুধীরবাবু বেরিয়ে এলেন। ফর্সা চেহারা। লম্বা আর রোগা। বয়স ষাটের গোড়ায়।

নেলো বলল, ইনিই বিন্দুপিসির ভাইপো।

সুধীরবাবুর চোখ দুখানা বিচক্ষণ। একবার মেপে নিয়েই বললেন, তা বাবা, কাজটা শক্ত হবে।

নিরাপদ বলল, কিসের কাজ?

এই স্বত্ব-স্বামীত্ব দাখিল করা। সাকসেশন বের করাও শক্ত কাজ।

দরখাস্ত করে বসে থাকলেই হবে না, ছোটাছুটি, টাকা খাওয়ানো। ততদিনে--

সেসব আর দরকার নেই। আমার দাবি উঠছে না।

তবে কার দাবি?

নেলো বলল, পিসির ভাসুরপো এসেছে। গদাধর দাস।

তাই নাকি? তবে মুশকিল আছে।

নেলো বলল, ইনি খয়রাতি করে দিতে চাইছেন, সম্পত্তি নেবেন না।

না না, হতাশ হওয়ার কিছু নেই। ভাসুরপোরও হ্যাপা আছে। ব্যাপার সহজ নয়।

এসব কথা আর ভালো লাগছে না নিরাপদর। ভ্যাজরং ভ্যাজরং করে লাভটা কী হচ্ছে? সে বলল, উনিই নিন। ঝগড়া-ঝঞ্ঝাট আমার পোষাবে না।

সুধীরবাবু আর নেলোতে একটু তাকাতাকি হল। সুধীরবাবু বললেন, তা লোভ-টোভ না থাকা ভালো। তবে কিনা হুট করে কিছু ঠিক করতে নেই। একটু রয়ে সয়ে ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এখন চেপে বসে থাকো কদিন।

আমি যে কালই ফিরে যাব।

পাগল নাকি! এসে যখন পড়েছো খেলটা দেখেই যাও।

উনি যে থাকতে দিচ্ছেন না। ঘরেরও টানাটানি। ওঁর পাঁচ ছেলেমেয়ে আর বউও এই এসে পড়ল। থাকব কোথায়? আজ রাতটা বারান্দায় কাটিয়ে কোনোমতে কাল সকালেই ভটভটি ধরছি।

এঃ তুমি যে একেবারে আহাম্মক দেখছি। অত বৈরাগী হয়ে সংসারে থাকা চলে না হে। শক্তপোক্ত হও। নির্লোভ হও। নির্লোভ হওয়া ভালো, তা বলে আহাম্মক হবে কেন? ফেরার মতলব ছাড়ো, তোমাকে এখন থাকতে হচ্ছে বাপু।

কেন থাকতে হচ্ছে তা আর সুধীরবাবু ভেঙে বললেন না। কিন্তু এমনভাবে বললেন যে নিরাপদ আর গাঁইগুঁই করল না। বিদায় নিয়ে যখন চলে আসছে তখন নেলোও সঙ্গে। বলল, এ গাঁয়ে নানা প্যাঁচের লোক থাকে। কেউ জিলিপির প্যাঁচ, কেউ অমৃতির প্যাঁচ, কেউ ঘুড়ির প্যাঁচ তো কেউ লাট্টুর প্যাঁচ। বুঝতে সময় লাগবে। ভামির জলা পার করিয়ে এত কষ্টে আপনাকে নিয়ে এলুম, সে কি এমনি? প্যাঁচ আছে।

কিন্তু আমি যে ভয় খাচ্ছি।

ভয়টা কিসের?

লোকটা বড়ো তিরিক্ষি মেজাজের।

উলটে আপনিও মেজাজ দেখান না। দেখবেন ঠান্ডা হয়ে যাবে।

বেশ দুরুদুরু বুকেই বাড়ি ফিরল নিরাপদ। গদাই দাস বাড়ি দখল করে আছে। শোওয়া-বসারও সুবিধে হবে না। তার ওপর অতগুলো ছেলেপুলের উৎপাত।

ফটক থেকেই সে মোক্ষদার গলা শুনতে পেল। বেশ উঁচু গলা। বলছিল, পুবের ঘর নেবে মানে? মগের মুলুক নাকি? ছোঁড়াটা কোথায় থাকবে তাহলে শুনি?

গদাই চেঁচাল না, কী যেন আস্তে করে বলল।

কিন্তু মোক্ষদার গলা সপ্তমে উঠল, বারান্দায় থাকবে? এই বর্ষা-বাদলায় বারান্দায় থাকবে ছোঁড়াটা? আর তুমি দিব্যি বউ-বাচ্চা নিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে শোবে? তোমার গায়ে মানুষের চামড়া না কি? অ্যাঁ! পাষণ্ড বললে তোমাকেই বলতে হয়। ছোঁড়াটা বোকাসোকা ভিতু বলে তাকে অত্যাচার করবে? মোক্ষদা থাকতে তা হবে না, থাকতে চাও তো ওই একখানা ঘরেই থাকবে। বউ-বাচ্চা আনতে তোমাকে কে বলেছিল?

নিরাপদ প্রমাদ গুনল। ঝগড়াঝাটি তার সয় না, ভয়ও খায়।

ঘরে না উঠে সে একটা জবা গাছের আড়ালে একটু দাঁড়িয়ে রইল, ওদের ঝগড়া থামলে যাবে।

ঝগড়াটা অবশ্য বেশিক্ষণ চলল না, গদাই দাসের বউ বোধ হয় তেমন ঝগড়াটে নয়। তার গলা শোনা গেল না। একটু বাদে দেখতে পেল গদাই দাস বারান্দায় বেরিয়ে এসে একটা বিড়ি ধরাল। মুখখানা থমথমে। ছোটো বাচ্চাটা বোধ হয় বাপের কাছে বায়না করতে এসেছিল, তাকে দু ঘা বসিয়ে দিতেই সেটা চেঁচাতে চেঁচাতে ভিতর বাগে গেল। গতিক সুবিধের ঠেকল না তার কাছে।

একটা দাঁড়াস সাপকে ঢ্যাঁড়স ক্ষেতে ঢুকতে দেখে আর দাঁড়াতে ইচ্ছে হল না নিরাপদর। আড়াল ছেড়ে প্রকাশ হল। আর হতেই বিপত্তি। গদাই দাস তাকে দেখেই বিড়িটা ফেলে দিয়ে বলল, এই যে বাপু, খুব তো ভালোমানুষি দেখিয়ে সরে পড়লে। এদিকে তলায় তলায় অন্য ব্যবস্থা, অ্যাঁ? তখন থেকে বলছি, বাপু, এসব আমার বাড়িঘর, এতে তোমার কোনো অংশ নেই, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও। তবু কোন মতলবে গেড়ে বসতে চাইছ বলো তো! মোক্ষদার সঙ্গে সাঁট আছে না কি?

নিরাপদ হাফসানো গলায় বলল, আজ্ঞে না।

শোনো বাপু, আঁটপুর ছেড়ে এতদুর এসেছি তোমাদের বেয়াদবি সহ্য করতে নয়। এখানে তোমার সুবিধে হবে না। দয়া করে কেটে পড়ো।

নিরাপদ বলল, তাই তো চাইছিলাম। কিন্তু--

কিন্তু? কিন্তু আবার কীসের? বলছি তো, তোমার এখানে আসাটাই ভুল হয়েছে। বুঝতে চাইছ না কেন?

কথা আর গড়ানোর আগেই ডুরে শাড়ি-পরা বউ মানুষটি বেরিয়ে এল। মাথায় ঘোমটা। গদাইয়ের কাছাকাছি গিয়ে কী যেন চাপা গলায় বলল।

গদাই তাতে খুশি হল না। বলল, হবে বললেই হয় কখনো? ও ঘরে সাতটি মানুষ গাদাগাদি হবে না?

বউটি বলল, কিছু অসুবিধে নেই। ঘর বড়ো আছে।

আরে না। বড়ো বললেই বড়ো। তাছাড়া আর একখানা ঘর যখন আছেই তখন মিছিমিছি কষ্ট করতে যাব কেন? আমারই তো সব।

বউটি বলল, আহা, থাক না। বারান্দায় এই বর্ষাকালে থাকলে ঠান্ডা লাগবে। সাপখোপ উঠে আসে। ওরকম কোরো না।

গদাই গম্ভীর হল। খুশি হল না। বলল, এভাবে দখল হয় না, বুঝলে! শক্ত থাকতে হয়।

নিরাপদ প্রায় চোরের মতো বারান্দায় উঠে তাঁর ঘরে গিয়ে ঢুকে পড়ল। ঢুকেই এক গাল মাছি। দুটো দশ, বারো বছরের ছেলে আর মেয়ে মেঝেতে বসে খেলনাবাটি নিয়ে খেলছে। তাকে দেখে একটু অবাক হয়ে তাকাল। ইতিমধ্যে মেঝের ওপর মাটি মেখে নোংরা করেছে। বিছানাতে ময়লা হাতের ছাপ।

নিরাপদ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, পারা যাবে না।

নেলো, মোক্ষদাদিদি, সুধীরবাবু যতই ভরসা দিক নিরাপদ কিছুতেই গদাই দাসের সঙ্গে পেরে উঠবে না। কারণ, এটা গণতন্ত্রের যুগ। সেদিক দিয়ে গদাইয়েরই জয়জয়কার। বিছানার একটা কোণে চুপ করে বসে বাচ্চা দুটোর খেলার দিকে একটু চেয়ে রইল নিরাপদ। ধুলোবালি, গাছের পাতা, পাথরকুচি আর জল দিয়ে কী খেলছে কে জানে!

হঠাৎ গদাইয়ের বউ ঘরে এসে ঢুকতেই তটস্থ হল নিরাপদ।

তার দিকে চেয়ে বউটি বলল, তুমি ভাই এ ঘরেই থেকো। আমাদের ও ঘরে হয়ে যাবে।

আজ্ঞে।

তোমার বাড়ি কোথায়?

সেই স্যান্ডেলের বিল। চিনবেন না। লাট অঞ্চল।

না ভাই, আমরা এ জায়গা চিনি না। বাড়িতে কে কে আছে?

মা আছে, দুটো ভাই।

কী করো?

করব আর কী? কাজ কোথায়? বাচ্চাকাচ্চা পড়াই।

তাইতেই হয়?

মাথা নাড়ল নিরাপদ, না, হয় না।

বউটা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, উনি তো আঁটপুরের বাস উঠিয়ে চলেই এলেন। এখন কী হয় কে জানে!

কেন, ভালোই হবে। পিসির সম্পত্তি কিছু কম নয়। দেখেশুনে রাখতে পারলে অভাব হবে না কিছু।

কি জানি ভাই, কীসব গণ্ডগোল শুনি।

তা আছে। আইন নাকি খুব প্যাঁচালো। তবে রয়ে-সয়ে হয়ে যাবে।

কি জানি ভাই, চলে তো এলুম। এসব জায়গা কেমন তা জানি না।

সাপখোপ পাবেন, জোঁক আছে।

তা সে আঁটপুরেও আছে। গাঁয়ে থাকি সে ভয় নেই। এখানকার লোকজন কেমন তা কে জানে!

সেও ওই আঁটপুরের মতোই হবে। ও নিয়ে ভাববেন না।

হ্যাঁ ভাই, বিন্দু কাকিমা কি তোমার আপন পিসি?

হ্যাঁ।

মোক্ষদাদিদি বুঝি তাঁর কাজের লোক?

তাও বলা যায়। সম্পর্কটা ওরকম ছিল না। পিসির মেয়ের মতো।

তাই অত তেজ। আসি ভাই, রান্নাবান্না চাপাতে হবে। যা রাস্তায় হয়রানি। বউটা চলে গেল।

দুপুরে রান্নাটা হল দু তরফে। পাকা রান্নাঘর মোক্ষদার দখলে । সেখানে রান্না চাপাল মোক্ষদা, নেলো আর নিরাপদর জন্য। গদাইয়ের বউ ভিতরের বারান্দায় তোলা উনুনে ও

তরফের রান্না করতে বসল। খাওয়াটাও হল আলাদা, রান্নাঘরে আর বারান্দায়।

খেতে দিয়ে মোক্ষদা চাপা গলায় বলল, রাবণের গুষ্ঠি খাচ্ছে দেখো! এ যা খোরাক দেখছি, দু-দিনে সংসার ছারেখারে যাবে।

কথাটা গদাইয়ের পরিবারকে উদ্দেশ করে বলা। নিরাপদ নীরব রইল।

নেলো বলল, খাচ্ছে খাক, কদিন আর?

মোক্ষদা শ্বাস ফেলে বলল, পাত্তরটি সোজা নয়।

অত ভেবো না দিদি। ব্যবস্থা হচ্ছে।

নিরাপদ এসব কথার মধ্যে নেই। বাইরের লোক সে। তার কী দরকার এসব গুহ্য কথার মধ্যে যাওয়ার।

খেয়ে ঘরে এসে সবে বসেছে, কোত্থেকে একটা ডবকা ছুঁড়ি এসে মিহিন সুরে জিজ্ঞেস করল, আপনি পান খাবেন? মা জিজ্ঞেস করতে পাঠাল।

না তো। আমি পান খাই না।

আচ্ছা, বলে মেয়েটা চলে গেল।

৩

একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল নিরাপদ। সেই সময়ে মেঘ করে তুমুল বৃষ্টি। ঘন ঘন বাজ পড়ছিল কাছেপিঠে । নিরাপদর ঘুম সহজে ভাঙার নয়। কিন্তু একটা বাজ একেবারে যেন পাশ ঘেঁষেই পড়ল, আর গদাই দাসের ছেলেপুলেরা এমন চেঁচামেচি শুরু করে দিল যে নিরাপদ উঠে বসল। দেখল তার চৌকির ধারের দুটো জানালা বন্ধ। পায়ের দিককার জানলাটাও বন্ধ করছে গদাই দাসের বউ। সে উঠে বসায় লজ্জা পেয়ে বলল, ছাঁট আসছিল বলে বন্ধ করছি।

ও খুব ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

হ্যাঁ, নাকও ডাকছিল একটু একটু।

লজ্জা পেয়ে নিরাপদ বলল, আমার নাক ডাকে বুঝি?

জানলা বন্ধ করায় ঘরটা বড্ড আবছা হয়ে গেল। বউটি বলল, আচ্ছা, এখানে গোরুর দুধ পাওয়া যায়?

কেন যাবে না? পিসিরই তো দুটো দুধেল গাই।

ও বাবা! মোক্ষদাকে দুধের কথা বলায় এমন মুখ করল। সব দুধের না কি গাহেক আছে। এক ফোঁটাও বাড়তি নেই। কী যে করি। আমার ছোটোটির তো দুধই ভরসা। এখানে কিনতে পাওয়া যায় না?

তা নিশ্চয়ই যায়। নেলোকে একবার জিজ্ঞেস করবেন।

তার তো পাশের গাঁয়ে বাড়ি। একবেলা কাজ করে খেয়ে চলে যায়। বিকেলে তো আসে না শুনলাম। এই বৃষ্টিতে অবশ্য দুধের আশাও নেই। কিন্তু আজ বলে রাখলে কাল সকালটায় অন্তত পাওয়া যেত।

গদাইবাবুকে বলুন না। উনি তো কদিন ধরে এখানে আছেন। জানেন বোধ হয়।

বলেছি। উনিও কেমন যেন উগ্রচণ্ডী হয়ে আছেন। কিছু বলতে ভরসা হয় না।

কেন, উগ্রচণ্ডী হয়ে আছেন কেন?

অনেক আশা নিয়ে এসেছেন তো। এখন শুনছেন অনেক গোলমাল। গাঁয়ের মোড়ল-মাতব্বরদের নাকি টাকাপয়সা খাওয়াতে হবে। আমাদের অবস্থা তো ভালো নয়।

তাই নাকি? কিন্তু গদাইবাবু যেন বলছিলেন, আঁটপুরে ওদের অনেক জায়গাজমি আর সম্পত্তি।

উনি ওইরকমই বলেন। ঘোরের রাজ্যে বাস করেন তো। না ভাই, আমরা খুব--কী বলব--গরিবই বলতে পার। বিষ্ণুবাবুর ভরসাতেই আসা। এখন কী হয় কে জানে!

বিষ্ণুবাবুটা কে?

এই গাঁয়ের মস্ত মানুষ। গাঁয়ের মাথা। সবাই মানে।

তাহলে চিন্তা কিসের? বিষ্ণুবাবু ভরসা দিয়ে থাকলে তো হয়েই গেল।

না ভাই। অনেক নাকি ফ্যাঁকড়া আছে। আমি মূখ্যু মেয়েমানুষ, অত তো বলতে পারব না। তবে আছে।

দখন নিয়ে বসে থাকুন, সব ঠিক হয়ে যাবে।

দখল! তাও কি সোজা? মোক্ষদা তো ঝেঁটিয়ে তাড়াতে পারলে বাঁচে। ওকে বড্ড ভয় পাচ্ছি।

না না, মোক্ষদাদিদি ভালো মানুষ।

তা হয়তো হবে। আমাদের ওপর ভীষণ চটা। আমাদের উনিও তো ঠান্ডা মাথায় মানুষ নন। তাই বনিবনা হচ্ছে না। এ তো আমাদের কাছে বিদেশ-বিভুঁই, তার ওপর যদি শত্রু তৈরি হয় তাহলে কি যে অশান্তি!

নিরাপদ কথা খুঁজে পাচ্ছিল না বটে, কিন্তু গদাইদাসের বউটিকে তার খারাপ লাগছিল না। বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ হবে। রোগাভোগা মানুষ। চোহারায় তেমন শ্রী না থাক, মনটি বোধহয় ভালো। বউটা বলল, তুমি কি চা খাও ভাই?

তা খাই।

আমার খুব চায়ের নেশা। একটু চা করে আনি?

আপনি আমার জন্য চা করবেন? গদাইবাবু রেগে যাবেন হয়তো।

বউটি হাসল, ওঁর রাগকে ভয় পেলে কি আমার চলে? আসলে কি জানো, উনি ভীষণ ভীতু মানুষ, অল্পেই ভয় খান তো, তাই রেগেও ওঠেন। তবে উনি এখন বাড়ি নেই। বৃষ্টির আগেই কোথায় যেন বেরোলেন।

মোক্ষদাদিদিও চা করবেন। তবু আপনিও করুন। যা বৃষ্টি, চা খারাপ লাগবে না।

বউটা যেন খুশি হয়েই চলে গেল। একটু বাদে চা নিয়ে এল সেই মেয়েটি, মেয়েদের একটু লজ্জা পায় নিরাপদ। হাত বাড়িয়ে কাপটা নিল, কিছু বলল না। মেয়েটা বলল, বিস্কুট দেব?

না। তার দরকার নেই।

আমাদের কাছে আছে কিন্তু।

লাগবে না।

চালভাজা?

না থাক, আমার খিদেও নেই।

মেয়েটা চলে গেল। পনেরো ষোলো বছর বয়স হবে। সকালে ফ্রক পরে ছিল, তত বড়ো বড়ো দেখায়নি। এ বেলায় শাড়ি পরায় বড়ো বড়ো দেখাচ্ছে। ডাগর বাড়ন্ত চেহারা, ভালো করে না তাকালেও বোঝা যায়।

চা-টা বেশ যত্ন করে করা। জিবে ভালো লাগছিল নিরাপদর। চা শেষ করার পর মেয়েটা এসে এঁটো কাপ নিয়ে যাচ্ছিল। নিরাপদ বলল, আমি ধুয়ে দিচ্ছি।

না না। আমরা ধুয়ে নিতে পারব।

এই যত্ন-আত্তি আর খাতিরটুকু ভালোই, যদি না পিছনে অন্য মতলব থাকে। কর্তা খার হয়ে আছেন, গিন্নি গদগদ। এর মধ্যে একটা প্যাঁচ থাকতে পারে। খুব প্যাঁচেই পড়েছে বটে নিরাপদ।

বৃষ্টিটা ভালোই নেমেছে। ঘরবাড়ি যেন ভেঙে ফেলছে বৃষ্টির তোড়। পাকা বাড়ি বলে তেমন বোঝা যাচ্ছে না, টিনের চাল হলে শব্দে মালুম দিত। তবে পাশের বাড়ির চালেই টিন। সেখানে একেবারে খোল-করতালের শব্দ উঠছে। চারদিক ঝাপসা। ঢ্যাঁড়সের খেতে দেখ-না দেখ জল দাঁড়িয়ে গেল।

বউটা একটা বাটির মতো কিছু আঁচলে আড়াল করে এদিকেই আসবে বলে ঘর থেকে বেরিয়েছিল। হঠাৎ ওদিককার ঘরের দরজা খুলে মোক্ষদা উদয় হল। হাতে চা। বউটা পিছিয়ে ঘরে ঢুকে গেল।

মোক্ষদা এসে বলল, এই বৃষ্টি এখন নাগাড়ে চলবে। রাতে খিচুড়ি খেও।

চা-টা নিয়ে নিরাপদ বলল, আমার একটা হলেই হয়।

টাকাপয়সা সঙ্গে আছে কিছু?

আছে সামান্য।

এখানে তো আর তোমাকে খরচ করে খেতে হবে না, সে ভয় নেই। তবে কয়েকদিন থাকতে হবে তো, হাত খরচের ব্যাপার আছে।

ও নিয়ে ভেবো না মোক্ষদাদিদি। আমার বিড়ির নেশা নেই। অন্য যা আছে তা শখের ব্যাপার, না হলেও ক্ষতি নেই।

মোক্ষদা তলিয়ে বুঝল না। বলল, গদাইবাবু তো হাতখানা পেতেই আছেন। কাল রাতেও বায়না ধরেছিলেন, পঞ্চাশটা নারকোল বেচে দিয়ে আসবেন কোন ব্যাপারীকে। আমি সাফ বলে দিয়েছি, ওয়ারিশ ঠিক না হলে কুটো গাছটিতে হাত দেওয়া চলবে না। কিছুক্ষণ তড়পাল, তারপর চুপ মারল।

হয়তো অভাবী লোক।

অভাবী এক, হা-ঘরে আর এক। এ হল হা-ঘরে।

বউটা বোধ হয় খারাপ নয়।

তা কে দেখতে গেছে। এক ঝাড়েরই বাঁশ।

মুখরা নয় তো!

কি করে বলি! মুখনাড়া তো খাইনি এখনও। ছেলেপুলেগুলো তো রাক্ষস। দুপুরে সব কটা পেট ঢাঁই ঢাঁই করে খেয়ে উঠেছে, তারপর দেখি দু-তিনটে গিয়ে খেত থেকে কাঁচা ঢ্যাঁড়স তুলে তাই খাচ্ছে। পেট তো নয়, যেন দামোদর।

নাঃ তুমি বড্ড চটে আছো ওদের ওপর।

তুলনামূলক বিচার করে নিরাপদ বুঝল, মোক্ষদার চেয়ে গদাই দাসের বউ চা ভালো করে। সেটা অবশ্য প্রকাশ করল না সে। শুধু বলল, গদাইয়ের বউ চা করে খাইয়েছে কিন্তু, মোক্ষদাদিদি।

মোক্ষদার গালে হাত, বল কী? সবেবানেশে কথা। আর দিলে খেও না।

নিরাপদ আবাক হয়ে বলে, কেন গো মোক্ষদাদিদি?

তুমি হলে শত্রুপক্ষ। ওদেরটা খেতে আছে? বিষ মিশিয়ে দেবে।

যাঃ।

যাঃ, নয় বাপু। গদাইয়ের মাথায় খুন চেপেছে তোমাকে দেখে। কেমন লাফালাফি করছে দেখছ না। ওর আঁতে এখন বিছুটির জ্বালা। মুখের গ্রাসের ভাগীদার জুটেছে তো!

আমি আবার কিসের ভাগীদার? বলেই তো দিয়েছি, আমার দাবি নেই।

সে তুমি বললেই তো হল না। আইনে কী বলেছে দেখতে হবে।

আচ্ছা মোক্ষদাদিদি, বিষ্ণুবাবু লোকটা কে?

সে আছে। মস্ত মাতববর। মাসিমার তিন বিঘা ধানজমির তো সেই দু'বছর আগে গাপ করল। খুব ধড়িবাজ লোক। তার কথা কেন?

সে-ই নাকি গদাইয়ের মুরুবিব।

সবাই তাই জানে। বিষ্ণুর শ্বশুরবাড়িও আঁটপুরে কিনা! তলে তলে যত মকরধবজ। তুমি এঁটে বসে থাকো।

বিষ্ণুবাবু যদি মাতববর হয়ে থাকে, তবে আমার আর আশা কী বলো!

যা বলছি তাই করবে। তোমার অত নিকেশের দরকার কী? বাবারও বাবা আছে। দেখো না মজা।

মজা মোটেই দেখছে না নিরাপদ। বড্ড নড়বড়ে অবস্থা। কোথাকার জল কোথায় গড়ায় কে জানে। মোটের ওপর তার বড়ো অস্বস্তি হচ্ছে।

মোক্ষদা চলে গেল। বৃষ্টির বিরাম নেই। নাগাড়ে হয়েই চলেছে। বিকেলেই যেন অন্ধকার চাপ বেঁধে উঠল।

মোক্ষদা একখানা হ্যারিকেন জ্বেলে একটা বাচ্চা মেয়ের হাত দিয়ে পাঠাল। তা ফাইফরমাশ খাটার লোকই হবে মেয়েটা।

নিরাপদ ফ্রক-পরা সাত-আট বছর বয়সী মেয়েটাকে থুতনিতে নাড়া দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কে গো?

পটলি।

কোথায় বাড়ি?

এই গাঁয়ে। রাখাল মণ্ডলের মেয়ে।

বেশ বেশ।

হ্যারিকেন না হলেও চলত। অন্ধকার ঘরেই বসে থাকতে পারত। হাতে তো কাজ নেই।

বউটা আবার এল। আঁচলের তলা থেকে একটা পেতলের বাটি বের করে বলল, আমার নিজের হাতের চালভাজা। ফুটকড়াই মেশানো। তেল মেখে দিয়েছি। লঙ্কা আছে খাও।

এসবের আবার কী দরকার ছিল?

এমনি। আঁটপুরে তো এইসব করে করে বিক্রি করতাম। মোয়া, নাড়ু, ডালের বড়ি। গঞ্জের ব্যাপারীরা নিয়ে যেত। কিছু এনেছি, যাতে এখানে এসেই অভাবে না পড়ি।

চাল-ডালও কি এনেছেন?

না গো, আজ অবধি মোক্ষদাই দিয়েছে। তবে মুখ ব্যাজার। ফুলিকে নাকি বলেছে, এত লোকের জোগাতে পারবে না। শুধু দু-জনের মতো দেবে।

তাহলে চলবে কী করে?

চলছে নাকি? কালই চাল-টাল আনাতে হবে। সংসার তো হাঁ করে আছে। সব গিলে খেতে চায়।

তাহলে তো আপনাদের বিপদই হল।

হ্যাঁ, এখানকার ব্যবস্থা ভালো দেখছি না। আঁটপুরে কত গল্প করে এলাম, এখন যদি ফিরে যেতে হয় তো কী লজ্জা বল! ফিরবেন কেন? থাকুন। সব ঠিক হয়ে যাবে।

তুমিও কি থাকবে এখন?

কয়েকটা দিন আছি। তবে পাকাপাকি থাকার তো উপায় নেই। এ হল পিসির সম্পত্তি, আমার তো আর হক নেই তার ওপর। আপনারাও এসেই গেছেন।

ওমা! সে কী কথা? তোমার হক নেই কেন? আপন পিসি না?

তা বটে। পিসি আপন বলে সম্পত্তি তো আর আপন নয়। সম্পত্তি আপনাদের আপন।

আমি অত বুঝি না ভাই। তুমি আছো বলে বেশ লাগছে। শত্রুপুরীতে তোমাকেই একমাত্র বন্ধু বলে মনে হচ্ছে। এখানে তোমার একটা হিল্লে হয় না?

আর হবে কি করে?

এখানে না একটা ইস্কুল আছে, চাকরি চাও না।

চাকরি কি ছেলের হাতের মোয়া? মাধ্যমিক পর্যন্ত বিদ্যে। তাতে ইস্কুলের চাকরি হয় না।

আমার ফুলিরও আসছে বছর মাধ্যমিক দেওয়ার কথা। সে কি আর পারবে? ঠাঁই-নাড়া হয়ে সব ভেস্তে গেল।

ফুলিটা কে?

আমার বড়ো মেয়ে, ওই যে চা দিয়ে গেল তোমাকে।

ওই বড়ো বুঝি।

হ্যাঁ, ষোলো পেরিয়ে সতেরোয় পা। লেখাপড়ায় ওরই যা একটু মাথা। অন্যগুলোর নয়। এখানে ইস্কুলে ভর্তি করে দেওয়ার কথা, উনি কী করবেন উনিই জানেন।

আপনি পান খান নাকি?

খাই।

আমি একটা খাব।

ওমা। নিশ্চয়ই। নিয়ে আসছি। জর্দা দোক্তা খাও ভাই?

না। এমনই সাদা পান হলেই হবে।

দিয়ে যাচ্ছি।

বউটা গেল, পান নিয়ে ফিরেও এল। বলল, বিষ্ণুবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গেল ফুলির বাবা। কী হবে, কী শুনে আসবে কে জানে। বুকটা বড়ো কাঁপছে।

দূর-দূর ভাবছেন কেন? এসব আপনাদেরই ।

সে কথা তো শুধু তুমিই বলছ আর তো কেউ বলছে না। আমার তো এত চাই না। অনেক কম হলেও চলে। আঁটপুরে অনেক ধারকর্জ হয়ে গেছে, সংসারও অচল হয়ে আসছিল। তাই বাস উঠিয়ে আনা।

গদাইবাবু কী করেন?

কী যে করেন তা উনিই জানেন। আগে আদালতে কীসব স্ট্যাম্প কাগজ-টাগজ বেচতেন। তাতে কী পোষায়? জমিজমা যা ছিল তাও বিক্রি-টিক্রি করতে হয়েছে।

পিসির এক ভাসুরপো আগে আসতেন-টাসতেন বলে শুনেছি । সে আমার জন্মের আগেকার কথা। নাম-টামও জানি না। তিনি কি বেঁচে আছেন?

বউটার মুখখানা কেমনধারা হয়ে গেল। মাথা নেড়ে বলল, না, বেঁচে নেই।

তিনি বোধ হয় আপনার ভাসুর, তাই না?

হুঁ।

কিন্তু প্রসঙ্গটা যেন পছন্দ করছে না বউটা। হঠাৎ বলল, তুমি আমাকে বউদি বলে ডেকো কেমন?

বলে বউটি চলে গেল। ও ঘরে দুটো বাচ্চা খুব চেঁচিয়ে কাঁদছে।

বৃষ্টির জোর বাড়ছে বই কমছে না। একেবারে বল্লমের মতো এসে গেঁথে যাচ্ছে মাটিতে। হ্যারিকেন হাওয়ায় লাফাচ্ছে। দরজাটা বন্ধ করতে হল। ঘরে হাত পা গুটিয়ে এই বসে থাকাটার কোনো মানে হচ্ছে না। স্যান্ডেলের বিলে যা হোক করে সময়টা কেটে যায় ঠিকই। চালভাজা জিনিসটা যে এত ভালো জানা ছিল না নিরাপদর। ছোলা ভাজা, মুগ ভাজা, মশলার গুঁড়ো এত সুন্দর মিলমিশ হয়েছে যে বলার নয়। আর মুড়মুড়েও খুব। বাদলার দিনে বেশ লাগছে খেতে।

দরজায় একটা ধাক্কা পড়তে উঠে গিয়ে কপাট খুলে দেখে, ফুলি।

মা জিজ্ঞেস করল আর দুটি চালভাজা দেবে কি না।

লজ্জা পেয়ে নিরাপদ বলে, না না, আর লাগবে না। বেশ হয়েছে খেতে, তোমার মাকে বোলো। বাটিটা আমি ধুয়ে দিয়ে আসব'খন।

আপনি ধোবেন কেন? আমি ধুয়ে নেব।

সাঁই সাঁই বাতাসে বৃষ্টির ঝাপটায় বারান্দা ভিজে যাচ্ছে। সে বলল, ভিজছো কেন? ঘরে যাও।

হ্যাঁ বাবার জন্য ভাবছি, কখন গেছে।

এসে যাবেন। বাদলায় আটকে পড়েছেন কোথাও, গাঁ-গঞ্জ জায়গা, চিন্তার কিছু নেই।

মেয়েটা চলে গেল, ফের দোর দিল নিরাপদ। ঘন্টাটাক বসে বসে আকাশ-পাতাল ভাবল। টের পেল, বৃষ্টির মধ্যে গদাই দাস ফিরেছে। ফিরেই একটু হাঁকডাক করছে। উঠে গিয়ে দরজায় কান পাতাল নিরাপদ। শুনল, গদাই দাস বলছে, কালকেই সব সাব্যস্ত হয়ে যাবে।

রাত্রে দু তরফেই খিচুড়ি। মোক্ষদা এসে বলল, আজ আর রান্নাঘরে যাওয়ার জো নেই। জানলার একটা পাল্লা ভাঙা বলে জলে ভাসিয়ে নিয়েছে। তাই আজ মাসিমার ঘরেই রান্না করেছি স্টোভ জ্বেলে। খাবে এসো।

পিসির ঘরে এই প্রথম ঢুকল নিরাপদ এ যাত্রায়। পর পর দু-খানা মস্ত ঘর। গাঁয়ের ঘর যেমন হয় তেমনই। তবে খুব যত্ন-আত্তির ছাপ রয়েছে। পরিষ্কারও খুব। দু-ঘরেই গোটাকতক কাঠের আলমারি, একখানা সিন্দুক। মস্ত খাট। ঠাকুরের আসনও আছে।

মোক্ষদাদিদি, পিসি আর তুমি দুজনে থাকতে, ডাকাতির ভয় ছিল না?

ছিল না আবার! খুব ছিল। তবে এ গাঁয়ে কিছু লেঠেল থাকে। উত্তরের পাড়ায় চাপ বেঁধে তাদের ঘর। তাঁতের কাজ করে। তাই আশেপাশে ডাকাতি হলেও ভাঙনে বড়ো-একটা হয় না। বাইরের ডাকাতের আর দরকারই বা কি, দেখছ না ভিতরেই ডাকাত হয়ে পড়ছে।

সে কিরকম?

এই যে গদাই দাস গুষ্ঠিসুদ্ধ এসে ঘাড়ে চাপল, এও তো ডাকাতি বই নয়।

উনি তো ওয়ারিশ।

হুঃ। পেটে যা খিদে দেখছি, মাসির গোলা দুদিনেই ফাঁকা হয়ে যাবে।

রাতে নিরাপদর ভালো ঘুম হল না। দুপুরে খুব ঘুমিয়েছে। হাঁটাচলাও নেই তেমন। মাঝরাতে বৃষ্টি বন্ধ হওয়ার পর সে একটু বারান্দায় এসে দাঁড়াল। চারদিকটা ভেজা, স্যাঁতানো। বাতাসটা খুব ঠান্ডা। ব্যাঙ ডাকছে খুব।

দাঁড়াতেই কথা কানে এল। গদাই দাস আর তার বউই হবে। দরজায় গিয়ে কানটা একটু পাতল নিরাপদ।

গদাই বলল, হয়েই যাচ্ছে ধরে নাও।

সে তো তুমি বরাবরই বল। কেবল বল-ভরসার কথা। কাজ তো কিছু এগোয় না।

এবারটা দেখই না। ছোঁড়াটা কী বলছে-টলছে?

ছেলেটা খুব ভালো।

ভালো? খুব লোক চিনেছো তাহলে। উড়ে এসে জুড়ে বসার লক্ষণ দেখছ না? কথা ছিল আজই চলে যাবে। গেল? ও হচ্ছে মোক্ষদার লোক। ওই মোক্ষদাকে আমি ঝেঁটিয়ে তাড়াব। বড্ড আস্পদ্দা মাগির।

ছেলেপুলেগুলোকে ইস্কুলে ভর্তি করতে হবে, মনে রেখো। ইস্কুলে গিয়ে কথাটথা কয়েছো?

সে হবে'খন। মোক্ষদা-মাগি দলিল-দস্তাবেজগুলোই এখনও দেখাতে চাইছে না। কীরকম সব আছে-টাছে তার একটা আন্দাজ পেলে হত। ভালোই হবে কি বল?

তার আমি কী জানি?

নগদে গয়নায় কত আছে তারও হিসেব নেই। ও মাগি সব না সরিয়ে ফেলে। চাবিটাবি সব ওর কাছে। এমন কাণ্ড জন্মে দেখিনি বাবা। বাড়ির ঝিয়ের কাছে সব গচ্ছিত। সবেবানেশে ব্যাপার।

কত আর সরাবে!

হুঃ। কত আর সরাবে! এ না হলে মেয়েমানুষের বুদ্ধি! সব সরাবে। এই বলে রাখলুম, ওই আলমারিটারি খুলে কুটো গাছটিও পাবে না।

মাথা গরম না করে এখন ঘুমোও।

মাথাটা বড্ডই গরম। এই ছোঁড়াটা এসে পড়ায় অগ্নিতে যেন ঘৃতাহুতি পড়েছে।

ছেলেটা তো দাবিদাওয়াই তুলছে না।

মিটমিটে ডান। মানুষ চরিয়ে খাই, বুঝলে? সব মাল চিনি।

নিরাপদ ঘরে এসে দরজাটা খুব আস্তে বন্ধ করে শুয়ে পড়ল। মাথাটা তারও গরম। এখানে তার ভালো লাগছে না।

সকালে তিনটি লোক এল। বিষ্ণুবাবু, নবীনবাবু আর সুধীরবাবু। বেশ জবরদস্ত তিনজন। বিষ্ণুবাবুর বয়স ষাটের কোঠায়, মাথায় কাঁচাপাকা চুল, মুখচোখে বেশ বুদ্ধির ছাপ। নবীনবাবু বয়সেও নবীন, বয়স ত্রিশের কোঠায়। পঞ্চায়েতে জিতেছেন, সুধীরবাবুকে অবশ্য চেনে নিরাপদ। সঙ্গে নেলো।

নেলো তাড়াতাড়ি তিনখানা কাঠের চেয়ার বের করে বারান্দায় পেতে দিল। গদাই দাস খুব হেঁ হেঁ করতে লাগল সামনে দাঁড়িয়ে।

বিষ্ণুবাবু বললেন, ও সুধীর জিজ্ঞাসাবাদ যা করার তুমি করো।

সুধীরবাবু বললেন, জিজ্ঞেস করার কিছু নেই। আপনি চিনলেই হবে।

ও নবীন, তুমি?

আজ্ঞে, আমারও ওই কথা।

বিষ্ণুবাবুর মুখখানা বড্ড ঢলঢল করছিল। চারদিকে একবার চেয়ে নিয়ে বললেন, তা হলে তো আর সমস্যা কিছু হচ্ছে না। গদাধরই দেখা যাচ্ছে একমাত্র ওয়ারিশ। তা হলে আপাতত--

সুধীরবাবু মন দিয়ে একটা দলিল-দস্তাবেজ গোছের কিছু দেখছিলেন নীচু হয়ে। হঠাৎ মুখ তুলে গদাইয়ের দিকে চেয়ে বললেন, আপনি কি পূর্ণচন্দ্র দাসের ছেলে?

গদাই হেঁ হেঁ করে বলল, ইয়ে হ্যাঁ।

আমাদের যা জানা আছে, কৃষ্ণচন্দ্র আর পূর্ণচন্দ্র দুই ভাই। তাঁদের বাবার নাম অঘোরচন্দ্র দাস। ঠিক তো!

যে আজ্ঞে।

কৃষ্ণচন্দ্র বাস করতেন ভাঙনে। পূর্ণচন্দ্র থাকতেন আঁটপুরের কাছে জেলেপাড়ায়।

যে আজ্ঞে।

পূর্ণচন্দ্রের কয় ছেলে?

দাদা ছিলেন মাধব দাস। নিঃসন্তান, মারা গেছেন।

তাঁর বিধবা?

মুখটা একটু শুকোলো গদাইয়ের। বলল, তাঁর কোনো খবর নেই। বোধহয় মারা-টারা গেছেন।

তা হলে তো কথাই নেই। কিন্তু বেঁচে থাকলে তাঁরও ভাগ আছে।

বিষ্ণুবাবু গলায় একটা ঘরঘর শব্দ করে বললেন, ফ্যাঁকড়া তুলে লাভ কী? ও ছেড়ে দাও।

আমরা ছাড়লে ছাড়তেই পারি। আদালতে মামলা উঠলে কথাটাও উঠবে।

ফুলি প্লেটে করে তিনজনের জন্য নাড়ু আর মোয়া নিয়ে এল। পিছনে দুটো ভাইয়ের হাতে তিন গেলাস জল।

নবীনবাবু আর বিষ্ণুবাবু প্লেট নিলেন। সুধীরবাবু নিলেন না। হাতের কাগজেই অখণ্ড মনোযোগ। খানিক বাদে মুখ তুলে বললেন, তা হলে আপনিই এক নম্বর ওয়ারিশ।

হেঁ হেঁ, আপনাদের দয়া।

দয়া। দয়া কীসের! নিজের ন্যায্য পাওনাগণ্ডা বুঝে নেবেন। দয়ার কথাই আসে না।

আজ্ঞে, তবু এখানে তো আপনাদের আশ্রয়েই থাকা।

সুধীরবাবু নেলোর দিকে চেয়ে বললেন, একটু মোক্ষদাকে ডাকো তো।

মোক্ষদা এল। মুখখানা তোম্বা। চোখে বেশ কঠিন চাউনি।

সুধীরবাবু মাথাটা নীচু রেখেই বললেন, বিন্দুবাসিনীর এক ভাসুরপো আসত না আগে?

হ্যাঁ।

কী নাম?

মাধব।

তাকে মনে আছে?

গায়ের রং কালো ছিল খুব। জোয়ান ছিলেন। আবছা আবছা মনে আছে।

তার বাপের নাম জান?

অঘোর দাস। ঘরে তার ছবি আছে।

ছবি আছে? আর কার ছবি আছে?

সবারই আছে।

কার কার?

মাধব দাস, কৃষ্ণ দাস, পূর্ণ দাস।

গদাইবাবুর ছবি নেই?

না। থাকার কথাও নয়।

কথা নয়?

না, মাসিমার কাছে শুনেছি, পূর্ণ দাসের একটাই ছেলে। মাধব দাস।

ভুল শুনেছ হয়তো।

না, ভুল শুনব কেন?

সুধীরবাবু ফের কাগজের দিকে মন দিলেন। বিষ্ণুবাবু একটা নাড়ু মুখে দিয়ে বললেন, শোনা কথা তো! ওরকম হয়।

মোক্ষদা বলল, আমি অত জানি না বাপু। যা জানি বললাম।

সুধীরবাবু মুখ তুলে যেন খুব আনমনে বললেন, বিষ্ণুবাবু, কথাটা যখন উঠেছে তখন খোঁজখবর একটু করতেই হচ্ছে।

গদাই কেমন যেন কাঁপছিল। কেমন যেন ফ্যাকাশে মেরে, সিঁটিয়ে কেমনধারা মুখ হয়ে যাচ্ছিল। একটু ক্যাবলা হাসির সঙ্গে ভয় আর কান্না মেশালে যেমনটা হয়। একটু কাঁপা গলায় বলল, আজ্ঞে, আমিই সেই লোক--বিশ্বাস করুন।

সুধীরবাবু হাতের কাগজের দিকে চেয়ে থেকেই বললেন, বিষ্ণুবাবু যখন বলছেন তখন আর কথা কিসের? কিন্তু পরে কোনো কথা যাতে না ওঠে তার জন্যই সাবধান হওয়া ভালো। নইলে বিষ্ণুবাবুকেই বেইজ্জত হতে হবে। কী বলেন বিষ্ণুবাবু?

বিষ্ণুবাবু উদাস মুখে নাড়ু চিবোচ্ছিলেন। মুখ রসস্থ, কথা এল না। আর একখানা নাড়ু তুলে নাচাতে নাচাতে বললেন, সেরকমই তো বলছিল যেন। আঁটপুরের লোক বলেই চিনি। তা দেখো তোমরা। বল তো আমিই আবার আঁটপুরে গিয়ে ঘুরে আসি।

নবীন একটু চুপ করে ছিল এতক্ষণ। এবার বলল, গণ্ডগোলটা কোথায় তা ধরতে পারছি না। ও মশাই, আপনি কার, কে হন স্পষ্ট করে বলুন তো?

গদাই বোধহয় মূর্ছাই যেত। এমন ঘাবড়ে গিয়েছিল এ কথায় যে বলার নয়। কিন্তু ঠিক এই সময়ে তার বউ বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

আমি বলছি। আমার কথায় কি হবে? আমি ওঁর পরিবার।

নবীন ঘাড় হেলিয়ে বলল, হবে।

উনি ভাসুরপো নন।

তাহলে?

উনি আমার ভাসুর মাধববাবুর আপন মামাতো ভাই।

বিষ্ণুবাবু আর একটা নাড়ু মুখে ফেলে বললেন, এই তো, শুনলে তো!

মাধবের মামাতো ভাই, তা তাতেও অর্শায়।

সুধীরবাবু মাথাটি মৃদু একটু নাড়া দিয়ে বললেন, না। অর্শায় না।

কেন, ওদিকে তো আর কোনো দাবি ওঠেনি।

দাবি উঠলেও কিছু নয়। আইনে টেকে না।

কেন হে, টিকবে না কেন? মাধব বেঁচে থাকলে সম্পত্তির মালিক হত, মাধবের অবর্তমানে পায় তো--

সুধীরবাবু ঘন ঘন মাথা নাড়া দিয়ে বললেন, বিষ্ণুবাবু, এই ভাঙন গাঁয়ের আইন বলুন, আদালত বলুন সে আপনিই। আপনার ওপর কথা কিসের? তবে কিনা আইনে যা বলে তাতে গদধর দাস এই সম্পত্তির ওয়ারিশ নয়। কৃষ্ণচন্দ্রের দিককার আর কোনো দাবিদার থাকছে না।

তাহলে?

বিন্দুবাসিনীর দিকে থাকছে।

তাই নাকি? আইন তাই বলছে?

সেরকমই ব্যাপার। তবে আপনি যদি বলেন তা হলে সবই হতে পারে। কিন্তু তাতে বদনামের ভয় আছে।

গদাই দাস মাথায় হাত দিয়ে উবু হয়ে বসে পড়ল। কোঁকানির মতো একটা শব্দও বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে। কাহিল গলায় বলল, আমার মাথাটা বড্ড ঘুরছে।

৪

ও তরফে আর্জ অরন্ধন। গদাই সেই যে শয্যা নিয়েছে, আর ওঠেনি। বউটা কেঁদেকেটে এখন ঘরে বসে আছে। আজ বাচ্চাগুলো পর্যন্ত তেমনই হইচই করছে না। ছোটো তিনটে ঘুরঘুর করছে বাগানে। জল-কাদা মাখছে, কেউ গ্রাহ্য করছে না।

রান্নাঘরে নেলো আর নিরাপদ পাশাপাশি খেতে বসেছে। নেলো উবু হয়ে, নিরাপদ আসনপিঁড়িতে। মোক্ষদা খেতে দিতে দিতে বলল, হল তো ছেলে! এখন এঁটে বসে থাকো।

নিরাপদ বুঝতে পারছে, গদাই দাস হেরে গেছে। সে জিতে গেছে। তবু মনটা কি ভালো লাগছে তার? আনন্দ হচ্ছে কি? হচ্ছে না, সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, কী যে হল কিছুই বুঝতে পারলাম না।

নেলো হুঁ-হুঁ করে একটা শব্দ করল। মোক্ষদা বলল, সে অনেক কথা। মাসিমা বেঁচে থাকতেই বিষ্ণুবাবু নানারকম ফিকির শুরু করেছিল। ও মানুষকে তো চেনো না। বহুকাল ধরে জ্বলাচ্ছে। বিধবা অনাথা দেখে মাসিমাকে নানাভাবে নাকাল করেছে। তিন বিঘে জমি বেমালুম গাপ করে দিল। তাতে কি নোলা কমেছে? আরও খাবে। তাই আঁটপুরে গিয়ে মাধব দাসের ভাইকে জপিয়ে রেখেছিল। তা গদাই দাসও অভাবী লোক, লোভী। গদাইকে গদিতে বসিয়ে সম্পত্তিটা বিষ্ণু আর গদাইয়ে বাঁটোয়ারা করে নেওয়ার মতলব ছিল।

তোমরা টের পেলে কী করে?

ও তরফ যে সাফ হয়ে গেছে তা মাসিমার কাছেই শুনেছি। যখন বিষ্ণুপদ ফন্দি আঁটতে লেগেছিল তখনই মাসিমা আমাকে বলেছিল, ও মোক্ষদা বিষ্ণুর মতলব ভালো নয়। ও আমার সব গ্রাস করবে। আমার একজন মুরুব্বি দরকার। তখনই ওই সুধীরবাবু মাসিমাকে ভরসা দেন। আঁটপুরে গিয়ে খোঁজখবর করে পালটা ফন্দি বের করে রাখে। মাসিমার খুব ইচ্ছা ছিল তোমাদেরই সব দিয়ে যায়। দুঃখ করে বলত, আমার ভাইটা বড় কষ্ট করে গেছে, আমার যা খুঁদকুঁড়ো আছে ওদেরই দিয়ে যাব। সে বাবদে একটা কাগজও আছে সুধীরবাবুর কাছে। মাসিমার নিজের হাতে লেখা।

তা হলে এত কিছু হতে গেল কেন?

বিষ্ণুপদর মতলবটা বুঝতে হবে না? ভাঙন গাঁ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাচ্ছে তো ওই একটা লোক। পাজির পা-ঝাড়া। কেউ কিছু বলতে সাহসও পায় না। পয়সার জোর আছে, জনবল আছে। আগে থেকে জানাজানি হলে ও লোক ঠিক আর একটা ফন্দি এঁটে ফেলত। তা বলে ভেবো না তোমাকেও নিষ্কন্টক থাকতে দেবে। যখন এখানে বাস করবে তখনই বুঝবে। এ সম্পত্তির ওপর ওই শকুন বহুকাল নজর দিয়ে রেখেছে। মাসিমা মরার পরদিনই এসে আমার কাছে চাবি চেয়েছিল। বলল, এসব বাড়িঘর এখন গাঁয়ের মাতব্বরদের জিম্মায় থাকবে। আমি রুখে উঠে দুকথা শুনিয়ে দিলুম। তখন পালাল। সোজা পাত্তর ভেবো না।

নিরাপদ ক্রমে ক্রমে কেমন যেন নিবে যাচ্ছে। ও তরফ আজ বড়ো, ভেঙে পড়েছে। গদাইয়ের এমন অবস্থা হয়েছিল যে নিরাপদর একসময়ে ভয় হয়েছিল, লোকটা না স্টোক হয়ে যায়।

নেলো ভাতের পাহাড় এক চোপাটে উড়িয়ে দিয়ে ফের ভাত আর ডাল নিল। সঙ্গে লঙ্কা। লঙ্কাটার অর্ধেক কামড়ে চিবোতে চিবোতে বলল, মামার বাগানে বিয়োলো গাই, সে সম্পর্কে মামাতে ভাই। মামাতো ভাই এসেছেন খাবলা মারতে। বিষ্ণুখুড়োর বিষয়বুদ্ধি বটে। তা পারল সুধীরবাবুর সঙ্গে? কেমন ঝামা ঘষে দিল।

নিরাপদ বুঝল, এরাও দু তরফ। এক তরফ সুধীরবাবুর, অন্য তরফ বিষ্ণুবাবুর। সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ফাটা বাঁশের মাঝখানে সে।

খেয়ে উঠে অনেকটা চোরের মতোই নিজের ঘরে এসে বসল নিরাপদ। বাইরে মেঘ চেপে আসছে। উথালপাথাল হাওয়া ছেড়েছে। জম্পেশ করে নামবে এবার। জানলার আলগা দুটো পাল্লা ফটাস ফটাস করে বন্ধ হয়ে খুলে যাচ্ছে। জানলাগুলো এঁটে দিল সে। ঘর অন্ধকার। মনটাও তাই। কেন যে মনটা এমন ডাউন মেরে আছে তা বুঝতে পারছে না। শুয়ে শুয়ে খানিক ভাবল। ভেবে কোনো লাভ হল না।

বউদি এল বৃষ্টি নামার পর।

ঘুমোচ্ছো ভাই?

না না। বলে তাড়াতাড়ি উঠে বসে নিরাপদ।

বউদি কাঠের চেয়ারখানায় বসে পড়ল। বলল, আজ আর যাওয়া হবে না। যা দুর্যোগ। তবে গোছগাছ করেই রেখেছি।

কোথায় যাবেন?

বউদি একটু ম্লান হাসি হেসে বলল, কোথায় আর! সেই আঁটপুর। উনি লোভে পড়ে ফাঁদে পা দিয়েছিলেন। কী আর বলব তোমাকে, লজ্জার কথা।

আপনারা আজ রান্না করলেন না?

না ভাই, আজ আর ইচ্ছে হল না। গলা দিয়ে নামবেও না। বাচ্চাগুলোকে চালভাজা, মোয়া, নাড়ু, খাইয়ে রেখেছি। উনি তো শয্যাই নিয়েছেন। বড্ড লোভী মানুষ। অভাবীও তো। বিষ্ণুবাবু খুব ভরসা দিয়ে এনেছিলেন। তিনি তালেবর লোক। বলেছিলেন, ভাঙনে আমার কথাই হল আইন। সেই ভরসায় উনি নেচে উঠেছিলেন।

বন্দোবস্ত কীরকম ছিল?

সেটা কী ভাই?

মানে বিষ্ণুবাবুকেও তো কিছু দিতে হত।

তা আমি জানি না। সেসব কী আর আমাকে বলবেন ওরা?

আমার বড্ড খারাপ লাগছে।

সে তো আমাদেরও লাগছে। কিন্তু ভাই, কাজটা তো ধর্ম হত না। ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করি। অধর্ম যদি না সয়? যা হল ভালোই হল।

আঁটপুরে আপনাদের কী করে চলবে?

যেমন চলছিল। বাড়িখানা তো আছে। আর আমি তো বসে থাকি না। চালভাজা, মুড়ি, খই, নাড়ু, মোয়া, চন্দ্রপুলি তৈরি করি। সেসব কেনার খদ্দের আছে। কোনোরকমে চলে যায়। উনিও কিছু আনেন। টানাটানি তো আছেই।

তবু খারাপ লাগছে।

তুমি বড্ড ভালো ছেলে তো, তাই তোমার খারাপ লাগছে। উনি তোমার ওপর খাপ্পা হয়ে আছেন বটে, কিন্তু ওঁর স্বভাবই ওরকম। মানুষটা বিচক্ষণ নয় মোটেই। লক্ষ্মীছাড়া মানুষ। বড্ড ভীতু। ভীতু বলেই ওরকম ধারা করছিল তোমার সঙ্গে।

খুব ভেঙে পড়েছেন বুঝি?

হ্যাঁ। তবে আমি বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শান্ত করেছি। বলেছি, যার ন্যায্য পাওনা তাকে বঞ্চিত না করে ভালোই হয়েছে। এখন তো ভাই সবই তোমার। আমাদের আজ রাতটা থাকতে দেবে তো?

আমাকে আর লজ্জা দেবেন না। এসেছিলাম বটে লোভে পড়ে। কিন্তু আমার আর কেমন যেন লোভটোভ হচ্ছে না।

আমি ফুলিকে কী বলেছি জানো? বলেছি, নিরাপদকে দেখলে ভারি ভক্তি হয়। ওর লোভটোভ নেই।

আবার লজ্জা দিচ্ছেন।

হ্যাঁ ভাই, এই গরিব বউদির বাড়ি একবার যাবে? খুব যত্ন করব, দেখো। তোমাকে আমার ভীষণ ভীষণ ভালো লেগেছে।

আপনিও খুব ভালো।

বললে! মনে থাকে যেন। ভালো যখন বলেছো তখন আমার কাছে যেতেই হবে।

যাবো বউদি।

যেও ভাই। আঁটপুর বেশ জায়গা। পুরানো বড়ো গ্রাম। অনেক লোকের বাস। বললে বিশ্বাস যাবে না, দশখানা দুর্গাপুজো হয়। আঁটপুর ছেড়ে আসতে মন চাইছিল না। হ্যাঁ ভাই, তুমি কী এখানে একা থাকবে?

নিরাপদ ব্যাজার মুখ করে বলল, থাকার তো ইচ্ছে ছিল না। এ খুব প্যাঁচের জায়গা। শত্রুতাও আছে। তবে মোক্ষদাদি আর নেলো তো ছাড়বে না। থাকতেই হবে বোধহয়।

কেন ভাই, বিয়ে-টিয়ে করে সংসার পেতে বসো না? কত বয়স হল তোমার? পঁচিশ-ছাবিবশ না?

ছাবিবশ।

বিয়েরই তো বয়স।

ওসব কথা কে ভাবছে! নিজেরই পেট চলে না।

বউদি ফিক করে হেসে ফেলল, এই কথা? কাকিমার সম্পত্তির হিসেব জানো না বুঝি? তিন বিঘে তো শুধু নারকোল গাছ। ধানী-জমি কুড়ি বিঘের ওপর। একখানা পুকুর আছে। আরও কত কী বেরোবে!

যা গণ্ডগোল। আগে তো পাই।

পাবে গো পাবে। আমি কিন্তু বড্ড খুশি হয়েছি। তোমার মুখখানা দেখে এমন মায়া হয়েছিল। ওই উনি ডাকছেন। যাই।

বউদি চলে গেল। মনটা যেন আরও দরকচা মেরে গেল নিরাপদর। কী যেন একটা হচ্ছে মনের মধ্যে। একটা আকুলি-ব্যাকুলি। তার ইচ্ছে করছে এই ভালোমানুষ বউদিটার জন্য কিছু করতে। কিন্তু কী করবে সে?

বৃষ্টিটা এল একেবারে টগবগ করতে করতে। চারদিক এমন অন্ধকার করে ফেলল যে, বাতি না জ্বাললে ঘরের ভিতরে কিছুই দেখার জো রইল না। নিরাপদ দোর দিয়ে চুপচাপ শুয়ে রইল ঘরে। কিন্তু ঘুম এল না। মাথাটা একটু গরম। আকাশের তবিলে আর কত বৃষ্টি জমা আছে কে জানে বাবা! এত ঢেলে ঢেলেও শেষ হচ্ছে না।

ওই বৃষ্টির মধ্যেই শেষ দুপুরে দরজায় টোকা পড়ল। দরজা খুলতেই বাতাসের ঝাপটায় দড়াম করে দুটো পাল্লা খুলে গেল। সামনে দাঁড়িয়ে ফুলি। হাতে ঢাকা দেওয়া চায়ের কাপ আর একটা পেতলের বাটি আঁচলের তলায়। ভিজছে বৃষ্টির প্রবল হ্যাঁচলায়।

ঘরে সোমত্ত মেয়ে, দরজাটা বন্ধ করা উচিত হচ্ছে না হয়ত। কিন্তু যা হ্যাঁচলা, বন্ধ না করলেও উপায় নেই বলে বন্ধ করতে হল তাকে। ঠেলেই লাগাতে হল পাল্লা, এমন বাতাস।

উত্তরে বাতাস নেই। জানলাটা খুলে দিল।

এঃ, ভিজেই গেছ একেবারে!

ফুলি চায়ের কাপ আর চালভাজার বাটি চেয়ারটার ওপর রেখে ভারি সুন্দর করে হাসল। বলল, ও কিছু নয়। আপনি খেয়ে নিন।

কেন কষ্ট করলে? মোক্ষদাদিদি তো চা দেবেই।

আমরা তো আর দেবো না।

কথাটা এমনভাবে বলল যে বুকটার মধ্যে একটা মোচড় দিল নিরাপদর।

দেখুন, বোধ হয় ঠান্ডা হয়ে গেছে। যা বাতাস।

নিরাপদ চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, না ঠান্ডা হয়নি। বেশ চা। তুমি চা করতে পার তোমার মায়ের মতো?

পারব না কেন? এটা তো আমিই করেছি।

নিরাপদ লজ্জা পেয়ে বলল, বেশ হয়েছে তো!

ফুলি আবার একটু হাসল।

নিরাপদর মনে হচ্ছিল, একটা লাগসই কথা তার বলার দরকার। কিন্তু কী কথা তা তার পেটে আসছিল, মুখে আসছিল না। চায়ে ফের একটা চুমুক দিয়ে বলল, আঁটপুরে ফিরে যেতে তোমাদের খুব খারাপ লাগবে না?

ফুলি অবাক হয়ে বলল, না তো! আঁটপুরে থাকতেই তো আমরা খুব ভালোবাসি।

ও! বলে নিরাপদ খুব কষে ভাবছিল। কী বলতে চায় সে? না, মনে আসছে না। পেটের মধ্যে গুড়গুড় করছে।

আপনি খান, আমি পরে এসে এঁটো কাপ নিয়ে যাব।

হ্যাঁ। আমিও ধুয়ে দিতে পারি।

না। আপনি ধোবেন কেন?

খিল খুলতে ফুলি যখন হাত বাড়িয়েছে তখন নিরাপদ বলল, ইয়ে, বুঝলে--

ফুলি ফিরে চাইল, কী বলছেন?

এ জায়গা তোমার ভালো লাগে না, না?

না, বিচ্ছিরি জায়গা।

ও! তা ইয়ে--

কী?

না, ধরো যদি এখানেই থাকা সাব্যস্ত হয়?

না তো। আমরা কাল চলে যাচ্ছি।

হ্যাঁ, তা জানি। ধরো, যদি ইয়ে--

বলুন না, কী?

যদি থাকতে হয় তো পারবে?

কেমন করে থাকব? আমরা তো চলেই যাচ্ছি।

তা জানি। ধরো, তোমাকেই যদি থাকতে হয়?

আমি?

হ্যাঁ। মানে ব্যবস্থা যদি একটা হয় তাহলে পারবে?

ফুলি একটু হাঁ করে চেয়ে রইল। তারপর হঠাৎ রাঙা হয়ে বলল, এঃ মাঃ!

ফুলি খিলটা খুলে ফেলতেই হাউড় বাতাসে দুটো পাল্লা দড়াম করে খুলে গেল।

তার মধ্যে গলা তুলে নিরাপদ জিজ্ঞেস করল, পারবে না?

ফুলির মুখের জবাব লুটেরা বাতাস কেড়ে নিয়ে গেল বটে, কিন্তু তার মধ্যেও নিরাপদ শুনতে পেল, পারব।

দোলা

গাড়ি বদল করতে হয় মধুডিহি জংশনে।

আর যে-গাড়ি নিয়ে যাবে আপনাকে লামডিঙে তা আগাগোড়া ছবি-আঁকা। কী নরম আর চকচকে গদির আসন গাড়ির ভিতরে। আর কী মিঠে ইনঞ্জিনের ভেঁপু। কু-ঝিক-ঝিক ট্রেন মধুডিহি ছাড়িয়েই বাঁক নেবে মায়াবী জগতে। সবুজ অরণ্যের ডালপালা এসে হাত বুলোবে রেলগাড়ির গায়ে। একটু দুলে দুলে চলবে মন্থর গাড়ি। খেয়াল করে শুনবেন গাড়ির চাকা ঠিক যেন পালকির গান গাইছে। কোথাও কোথাও গাড়ি থামে, জল নেয়, ছোট্ট ছোট্ট পুতুলবাড়ির রঙিন স্টেশন। রাঙা মোরমে ছাওয়া প্ল্যাটফর্ম নিবিড় গাছের ছায়ায় ঝিম মেরে আছে। অনেক পাখির শিস শোনা যায় আর নেপথ্যে কুলকুলু কোনো প্রবাহিত ছোটো নদীর শব্দ। গাড়ি রেলপোল পার হবে মলের শব্দ তুলে। মাঝে মাঝে ছোটো উপত্যকায় দেখা যাবে শান্ত গাভীর দল চরছে। দেখা যাবে মাটির ওপর নেমে এসেছে রাঙা গোধুলির মেঘ।

জ্যোৎস্নারাত্রি। আকাশভরা সোনালি চাঁদ। চারদিকে মম করা ফুলের গন্ধ। নাতিশীতোষ্ণ এক বাতাস বয়ে যাচ্ছে। সন্ধের একটু পরেই যখন লামডিঙের ছোট্ট স্টেশনে গাড়িটি থামবে, তখন চারদিকে চেয়ে আপনি অবাক হয়ে বলে উঠবেন, আরে! ঠিক এরকম একটা জায়গাই তো আমি খুঁজছিলুম।

সবাই খোঁজে, ভাগ্যবানেরা পৌঁছে যায়।

এরকমই এক জ্যোৎস্নাময় রাতে লামডিঙের একমাত্র দুঃখী মানুষ জীবনলাল পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তার দুঃখের তেমন কোনো কারণ অবশ্য নেই। কিন্তু কিছু লোক দুঃখী থাকতে ভালবাসে। জীবনলাল চাঁদ উঠলে দুঃখ পায়, পাখি ডাকলে দুঃখ পায়, ভালো

খাবার খেলে দুঃখ পায়, ভালো স্বপ্ন দেখলে দুঃখ পায়। কেবল বলে, চারদিকে এত দুঃখ! এত দুঃখ।

একদিন বুড়ো সূর্যকান্ত জীবনলালকে রাস্তায় পাকড়াও করলেন, হ্যাঁ হে জীবনলাল, তোমার দুঃখটা ঠিক কিসের তা বুঝিয়ে বলতে পার?

জীবনলাল দুঃখের সঙ্গে মাথা নেড়ে বলল, আমার দুঃখের কি শেষ আছে? চারদিকে যেন দুঃখেরা ওত পেতে বসে আছে। আকাশে দুঃখ, বাতাসে দুঃখ, জলে-স্থলে দুঃখ।

কিন্তু কই আমরা তো কিছু টের পাই না?

এ কথায় জীবনলাল আরও দুঃখ পেয়ে বলল, তাহলে কি আমি ভুল বলছি?

সূর্যকান্ত তাঁর লম্বা পাকা দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন, লামডিঙে থাকতে থাকতে দুঃখের ব্যাপারটা আমার স্মরণ হয় না। খাওয়া-পরার দুঃখ নেই, ঝগড়া-কাজিয়া নেই, শোকতাপও নেই, তবে দুঃখটা যে কিসের সেটা বুঝতে পারছি না।

জীবনলাল একটা বুক কাঁপানো দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, লামডিঙ তো দুঃখেরই দেশ। গাছে গাছে যে ফুল ফোটে, ফল ফলে তাও আসলে দুঃখেরই প্রকাশ। আকাশে দুঃখের নীল। দুঃখের জ্যোৎস্নায় চারদিকে বান ডেকে যায়। বড়ো দুঃখ! বড়ো দুঃখ!

জীবনলাল চলে গেলে সূর্যকান্ত তাঁর পাকা দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে গম্ভীর মুখে আপনমনেই 'হুঁ' দিলেন। ব্যাপারটা তাঁর সত্যিই বোধগম্য হচ্ছে না। লামডিঙে দুঃখ!

হাতের লাঠিটা বাগিয়ে ধরে তিনি হনহন করে হাঁটতে লাগলেন। সামনে দুঃখ, ওপরে দুঃখ, নীচে দুঃখ। জীবনলাল যেদিকে চায় সেদিকেই দুঃখ দেখতে পায়। সব সময় তার বুক হু-হু করে। চোখ ছলছল করে মাথার ভিতরটা ধূসরবর্ণ হয়ে থাকে।

কে যেন বলে উঠল, এই যে জীবনভায়া, খবর-টবর কী?

জীবন দেখল, বেঁটে মতো একটা লোক বগলে দাবার ছক নিয়ে তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে খুব হাসছে। এ হল বটেশ্বর, ভারি ঝগড়ুটে লোক। প্রায় সকলের সঙ্গেই তার ঝগড়া।

জীবন শুষ্কমুখে বলল, খবর আর ভালো কী? দুঃখের জীবন যেমন কাটবার তেমনি কাটছে।

দুঃখী জীবনলালের দুঃখের কথা সবাই জানে। বটেশ্বর তাই মাথা নেড়ে বলল, তা তো বটেই। তা আজ কী কাণ্ডটা হল তা কি জান? সাধুচরণকে দিলুম হারিয়ে। ব্যাটার সঙ্গে অনেকদিন ধরেই একটা ঝগড়া পাকানোর তালে ছিলুম। আজ লেগেও গেল। একবোরে গো-হারান যাকে বলে তাই হারালুম। দুটো গজ, একটা ঘোড়া, দুটো নৌকা আর মন্ত্রী সমেত হেরে গেল।

লামডিঙের নিয়ম হল, ঝগড়াঝাঁটি চলবে না। তবে নিতান্তই কারও সঙ্গে কারও ঝগড়া লেগে গেলে দু পক্ষই দাবা খেলতে বসবে। যে জিতবে সে-ই ঝগড়ায় জিতেছে বলে ধরা হবে। দাবা খেলাই হচ্ছে লামডিঙের ঝগড়া।

জীবনলাল গম্ভীর মুখে বলল, তাহলে তো আপনার খুব সুখের দিন আজ।

বটেশ্বর খুশিতে ডগমগ হয়ে বলল, তা তো বটেই। ভারি আনন্দ হচ্ছে।

আমার হচ্ছে না। এই বলে বিরস মুখে জীবনলাল ফের হনহন করে হাঁটতে লাগল।

উলটোদিকে বটেশ্বরও হাঁটতে লাগল, তবে হনহন করে নয়। সাধুচরণকে যে সে আজ হারিয়েছে, এই সাংঘাতিক খবরটা জনে জনে দিতে হবে তো। হেঁকে হেঁকে সে চারদিকে শুনিয়ে বলতে লাগল, দিয়েছি হারিয়ে সিংহের বাচ্চাটাকে। খুব বাড় বেড়েছিল। আজ একেবারে লেজে-গোবরে করে ছেড়েছি বাঘের বাচ্চাটাকে।

আসলে বটেশ্বর সাধুচরণকে শুয়োরের বাচ্চা বা কুকুরের বাচ্চাই বলতে চাইছে। তবে ওগুলো গালাগাল বলে চিহ্নিত থাকায় লামডিঙের মাতব্বরেরা একদিন পাঁচমাথা এক হয়ে ঠিক করলেন, শুয়োর-কুকুরও জন্তু, বাঘ-সিংহও জন্তু। আর বাঘ-সিংহ কুকুর বা শেয়ালের চেয়ে কিন্তু উঁচু দরের জন্তুও নয়। তবু কুকুরের বাচ্চা বা শুয়োরের বাচ্চা বললে মানুষ রেগে যায়, কিন্তু বাঘের বাচ্চা বা সিংহের বাচ্চা বললে ভারি গৌরব বোধ করে। তাই ঠিক করা হল, কেউ কাউকে শুয়োরের বাচ্চা বলতে চাইলে সিংহের বাচ্চা আর কুকুরের বাচ্চা বলতে চাইলে বাঘের বাচ্চা বলবে। সেই নিয়মই চালু রয়েছে।

অনেকটা হেঁটে ক্লান্ত জীবনলাল একটি বনস্থলীতে ঢুকে পড়ল। লামডিঙে এরকম বড়ো বড়ো কুঞ্জবন মেলা রয়েছে। এসব বনভূমির সৌন্দর্য দেখার মতো।

চারদিকে বড়ো বড়ো গাছের অবরোধ পেরিয়ে ভিতরে ঢুকলে ফুলের বন্যা। মাঝখানে দীর্ঘ সরোবর। তাতেও নানা জলজ ফুল ফুটে আছে। নানা আকারের ছোটো-বড়ো বর্ণময় নৌকো বাঁধা রয়েছে ঘাটে। যে-খুশি নৌকোবিহারে বেরিয়ে পড়তে পারে। কুঞ্জবনে অনেক পাখি ডাকছে, প্রজাপতি ও মধুকরেরা উড়ে বেড়াচ্ছে।

জীবনলাল কুঞ্জবনের নরম ঘাসের ওপর বসে জীবনের নানা দুঃখের কথা ভেবে ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগল। সূর্য অস্তাচলে চলে যাচ্ছে, পাখিরা নীড়ে ফিরছে, দিন শেষ হয়ে আসছে, এসবও জীবনলালের দুঃখের কারণ।

লামডিঙের ভূতেদের খ্যাতি ও অখ্যাতি দুই-ই আছে। তারা ভালোও করে, মন্দও করে। লামডিঙের মজারু ভূত ঘেন্টু একটা কদম গাছের ডালে বসে চারদিককার শোভা দেখছিল। শোভা দেখতে সে ভারি ভালোবাসে। শোভা দেখতে দেখতে সে হঠাৎ দেখতে পেল, জলের মধ্যে একটা ছোট্ট নীল ডোঙায় একটি ভারি সুন্দরী মেয়ে মুখখানা গোমরা করে বসে আছে। এরকমটা হওয়ার কথা নয়। লামডিঙে একমাত্র জীবনলাল ছাড়া আর গোমরামুখো মানুষ কেউ নেই।

তবে ঘেন্টু ভালো করে নিরীক্ষণ করার পর বুঝল মেয়েটি হল টগর। টগরের একটা দুঃখ আছে ঠিকই। তার বিয়ের বয়স হয়েছে, কিন্তু কোনো ছেলেকেই তার পছন্দ হচ্ছে না। তার কারণ ছেলেগুলো কেমন যেন ছ্যাবলা, মোটা, অতিরিক্ত আহ্লাদি, কোনো কাজের নয়।

সেইজন্য ইদানীং টগরের ভারি মন খারাপ যাচ্ছে। ডোঙায় বসে তাই সে নানা কথা ভাবছে।

ঘেন্টু ঘাসবনের মধ্যে দুঃখী জীবনলালকেও দেখতে পাচ্ছিল। বিরস মুখে বসে জীবনলাল ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলছে।

ঘেন্টুর মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। সে গাছের ডালে বসে ঠ্যাং দোলাতে দোলাতে হাতে হাত ঘষে একটা মন্ত্রপুত ফুঁ দিল। সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে একটা ঝড়ের বাতাস উঠল।

জলে বড়ো বড়ো ঢেউ দিতে লাগল। ডোঙাটা মাঝদীঘিতে ভীষণ দুলতে লাগল। টগর তার বাঁশির মতো গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'বাঁচাও! বাঁচাও'!

দুঃখী জীবনলাল চারদিকে দুঃখের ঝড় উঠতে দেখে আরও মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল। সে চোখ বুজে ভাবছিল, এত দুঃখ নিয়ে, দুঃখের ওপর দুঃখ নিয়ে কী করে বেঁচে থাকা যায়?

ঠিক এই করুণ মুহূর্তে তার দুঃখিত হৃদয়কে আরও রক্তাক্ত করে দিতে টগরের আর্তস্বর কানে এসে পৌঁছোলো। সে উঠল এবং জলের ধারে গিয়ে অনেক দূরে মাঝদরিয়ায় বিপন্ন ডোঙাটি দেখতে পেল। এই দুঃখময় লামডিঙে বেঁচে থাকার যদিও কোনো মানেই হয় না, তবু জীবনলালের মনে হল, এই মেয়েটি হয়তো বাঁচতে চায়। এখানকার বোকা সুখী লোকেরা তো বাঁচতেই চাইবে।

জীবনলাল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বোকা-সুখী মেয়েটিকে বাঁচাতে হবে। বড়ো বড়ো ঢেউ কেটে এগিয়ে গিয়ে জীবনলাল ডোঙাটি ধরল এবং ডাঙায় টেনে আনল। সঙ্গে সঙ্গে ঝড় থেমে গিয়ে দিনশেষের সোনালি আলোয় চারদিকটা স্বপ্নপুরীর মতো হয়ে গেল। আর সেই আলোয় জীবনলালের মুখের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেল টগর, এরকম দুঃখী সুন্দর মুখশ্রী তো সে এর আগে আর কারও দেখেনি!

জীবনলালও মেয়েটির মুখে একটা বিমর্ষতা লক্ষ করছিল, যা লামডিঙের কোনো মেয়ের মুখে সে কখনো দেখেনি।

ঘেন্টু কদমগাছের ডালে বসে বড়ো বড়ো দাঁত বের করে খুব হি-হি করে হাসছিল। মাঝে মাঝে রগড় না করলে তার পেটে বড়ো বায়ু হয়।

তা সোনালি আলোটা আজ রইলও অনেকক্ষণ। টগর আর জীবনলালের ব্যাপারটার একটা হেস্তনেস্ত না দেখে সুর্যদেবও পাটে বসতে পারছিলেন না। কোনো কাজ আধখ্যাঁচড়া হয়ে থেকে গেলে তাঁরও ভারি বায়ুর উৎপাত হয়। তাই তিনি সাত ঘোড়ার লাগামটা চেপে রইলেন। ওদিকে চাঁদমামা উঠে পড়েছেন আকাশে, কিন্তু সূর্যদেব বিদেয় না হলে তাঁরও বিশেষ খাতির হচ্ছে না। তাই তিনি রীতিমত চটে উঠে বললেন, ওরে বাপু, এসব হৃদয়ের কারবারে তোমাকে কে আবার কবে ডেকেছে বলো তো! ওসব আমার কেস। চাঁদ না হলে

কি হৃদয় এক হয় রে ভাই! এখন বাড়ি যাও তো, আমার কাজ আমাকেই করতে দাও। তা চাঁদটাও উঠল আজ বড়ো জোর। যেন একেবারে পিচকিরি দিয়ে জ্যোৎস্না ছিটোনো হতে লাগল চারধারে। সোনার গুঁড়ো দিয়ে বৃষ্টি ঝরালে যা হয়, অবিকল তাই।

তা টগর আর জীবনলাল বাক্যহারা হয়ে পরস্পরের দিকে চেয়ে রইল।

এরপর ঘন্টাখানেকের ঘটনা আমরা চেপে যাই বরং। তবে ঘন্টাখানেক বাদে টগর ধরা-ধরা গলায় জিজ্ঞেস করল, তোমার দুঃখ কি ঘুচেছে?

জীবনলাল ঘাড় কাৎ করে বলল, এক্কেবারে নেই। তবে কী জানো, দুঃখ যে চলে গেল সেটাও একটা দুঃখ। আমার যেন দুঃখ হচ্ছে। শুধু জীবনলাল আর টগরকে নিয়ে থাকলেই তো আর চাঁদমামার চলে না, তাঁর আরও পাঁচটা যজমান আছে, খদ্দের আছে, ফ্যান আছে। সবাইকেই দেখতে হয়। আজ চাঁদমামার হাতটাও বেশ দরাজ। ধামা ধামা সোনার গুঁড়ো ঢালছেন ইচ্ছেমতো।

সূর্যকান্তের পাকা দাড়িতে সোনার গুঁড়ো মেলাই জমে গেল। তিনি একটা চিরুনি দিয়ে দাড়ি আঁচড়াতে আঁচড়াতে সোনার গুঁড়ো ঝেড়ে ফেলে দিতে লাগলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে ভাবতে লাগলেন, আচ্ছা জীবনলালের দুঃখটা কিসের? দুঃখ জিনিসটাই বা কীরকম? এত বয়স হয়ে গেল, একটু দুঃখি চেখে দেখলে হত। দুঃখের স্বাদই যে বুঝলুম না। ভাবতে ভাবতে তিনি বাগানে বেড়াতে লাগলেন।

লামডিঙের বিখ্যাত ভূত হল ঘড়িরাম। সে কাছাকাছি থাকলেই টিকটিক শব্দ পাওয়া যায়। টিকটিক শব্দটা শুনেই সূর্যকান্ত গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, ইয়ে, ওহে ঘড়িরাম, একটা কথা।

ঘড়িরাম অদৃশ্য থেকে দৃশ্যমান হয়ে সামনে দাঁড়াল, তার রীতিমতো জোয়ান চেহারা। মাথাটা কামানো। মুখখানা খুব গম্ভীর। ঘড়িরামের বউ মেরীও তার পাশে দাঁড়ানো। ভারি সুন্দর ফুটফুটে মেমসাহেব।

ঘড়িরাম গম্ভীর গলায় বলল, কী কথা?

ইয়ে দুঃখ জিনিসটা কীরকম বলতে পারো?

ঘড়িরাম খুব গম্ভীর হয়ে বলল, দুঃখ কাকে বলে তা জানতাম বটে, কিন্তু অনেককাল হয়ে গেল, এখন আর ঠিক মনে নেই। তবে জিনিসটা খুব খারাপ।

সূর্যকান্ত মাথা নেড়ে বললেন, তাই হবে। কিন্তু জিনিসটা একটু চেখে না দেখলে ঠিক জুৎ হচ্ছে না।

ঘড়িরাম দুঃখিতভাবে মাথা নেড়ে বলল, আজ্ঞে আমার কিছু করার নেই। দুঃখ জিনিসটা কেমন তা আমিই কবে ভুলে মেরে দিয়েছি।

ঘড়িরাম আর মেরী চলে যাওয়ার পর সূর্যকান্ত একা একা জ্যোৎস্নায় পায়চারী করতে লাগলেন। দুঃখ জিনিসটা ঠিক কীরকম? দুঃখ হলে কীরকম লাগবে?

ঠিক এই সময় জ্যোৎস্না ফুঁড়ে নাট্যকার বিপুলবিহারী দশাসই চেহারা নিয়ে এসে হাজির। বিপুলবিহারীর হাতে একখানা টেস্ট টিউব। তাতে খানিকটা জ্যোৎস্না ভরে নিয়ে একটু নেড়ে ছিপিটা বন্ধ করে দিয়ে বললেন, এই যে সূর্যদা, কী খবর টবর?

আচ্ছা বিপুলবিহারী, দুঃখ জিনিসটা কেমন বলতে পার? বিপুলবিহারী প্রবলভাবে অট্টহাস্য করে বললেন, আমি তার কী জানি বলো? সারাদিন নানা মহড়া করে চলেছি আপনমনে। সুখ-দুঃখ কিছুই টের পাই না। এই জ্যোৎস্নার সঙ্গে খানিকটা গ্লিসারিন মিশিয়ে তবে নায়িকার চোখের জল বানাতে হবে। দেশের এমন দুর্দশা যে নায়িকা কাঁদতে পর্যন্ত শেখেনি। আর শেখাবেই বা কে বলো? এদেশে একটা লোকও কি কাঁদতে জানে? ধরেছিলুম দুঃখী জীবনলালকে, তা সে বলল, আমার বড়ো দুঃখ, ওসব নাটুকে কান্না শেখানোর মতো মন আমার নেই।

সূর্যকান্ত বললেন, তাই তো হে, এ তো ভারি বিপদের কথা !

বিপুলবিহারী চলে গেল। সূর্যকান্ত একা জ্যোৎস্নায় একটা পাথরের ওপর বসে রইলেন। দুঃখ জিনিসটা না চাখলে মুখটাই যে মাটি হবে তাঁর। দুঃখ জিনিসটা কেমন তা না বুঝলে সুখটাকেই বা চেনা যাবে কী করে? বটেশ্বর আজ রাতে আর এক পাট্টি দাবা না খেলে পারবে না। সাধুচরণটা বড্ড অল্পেই হেরে গেল। কিন্তু বটেশ্বর আর খেলুড়ি খুঁজে পাচ্ছে না। এমনকি ঘেন্টুটা অবধি পিছিয়ে গেল দাবার নাম শুনে।

তবে ভয় নেই। লামডিঙের দক্ষিণের বনের ধারে রোজ রাতেই অন্য গ্রহের জীবেরা ঘাসপাতা খেতে তাদের মহাকাশযানে করে চলে আসে। বটেশ্বর দাবার ছক বগলে চেপে, হাতে ঘুঁটির পুঁটিলি নিয়ে সেই দিকেই রওনা হল। ঠিক বটে, আজও গোটা দুই বিটকেল মহাকাশযান নেমেছে। লিকলিকে চেহারার কয়েকটা জীব ঘাসপাতা খাচ্ছে আর ইতিউতি তাকাচ্ছে। ভারি ভীতু জীব।

বটেশ্বর হাঁক দিল, ওহে, ভয় নেই, এসো একটু দাবা খেলা যাক।

প্রথমটায় কেউ ভয়ে কাছে এল না। বেশ কিছুক্ষণ ডাকাডাকির পর একটা জীব এগিয়ে এল।

বটেশ্বর মহাখুশি। দাবার ছক সাজিয়ে ফেলল ঘাসের ওপর বসে। জীবটা ব্যাপারটা বুঝতে পারছে না বলে চালগুলো শিখিয়েও দিল।

কিন্তু খেলা শুরু হতে না হতেই বটেশ্বর বুঝতে পারল, জীবটা ভারি বুদ্ধিমান। দারুণ খেলছে। বটেশ্বরের চার-চারটি জোরালো বল মেরে দিল দশ চালের মধ্যে। বাইশ চালে মাৎ হয়ে গেল বটেশ্বর। জীবটার গলা জড়িয়ে ধরে বটেশ্বর গদ গদ স্বরে বলল, আহা, কী খেলাটাই খেললে হে, দেখার মতো।

পিছন থেকে ঘড়িরামের গম্ভীর গলা বলে উঠল, আপনার লজ্জা করছে না বটেশ্বরবাবু? অন্য গ্রহের জীবদের কাছে হেরে গেলেন! যাই বলুন, আমি ব্যাটাকে ঢিট করছি।

ঘড়িরাম একটু চাঁছাছোলা লোক। বটেশ্বর তাকে ভয়ও খায়। সে তাড়াতাড়ি সরে বসল। ঘড়িরাম বসে পড়ল খেলতে।

জ্যোৎস্নাটা বড্ড জোর নেমেছে আজ। ভাসিয়ে দিচ্ছে চারধার।

মৃত্যুপুরীর চারজন মুশকো পেয়াদা রোজই ডিউটি দিতে লামডিঙের আনাচে কানাচে ঘুরঘুর করে। খুব যে সুবিধে করতে পারে এমন নয়। লামডিঙের লোকদের আয়ু বেজায় লম্বা। আর তাদের কাছে পরোয়ানাও বড়ো একটা থাকে না যে কাউকে নিয়ে যাবে। তবু লামডিঙে রোজই তারা এসে ঘুরঘুর করে। এখানকার বিখ্যাত জ্যোৎস্নায় বসে একটু গা জুড়োয়। কথিত আছে, লামডিঙের জ্যোৎস্নায় গেঁটে বাত, সর্দিকাশি আর বায়ু রোগের খুব

উপকার হয়। লামডিঙের বাতাসে হাঁফানি, পিত্তের দোষ আর ধাতু দৌর্বল্য সেরে যায়। লামডিঙের জলের তো তুলনাই নেই, পেটের সব গণ্ডগোল সাফ করে দেয়। লোকে বলে, লামডিঙের লোকদের ইচ্ছামৃত্যু। কিন্তু সেই ইচ্ছাটাও বড়ো একটা কারো হয় না।

তা পেয়াদাদের লামডিঙের লোকেরা ভালোই চেনে। তবে বিশেষ পাত্তা দেয় না। দেখা হলেই মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চলে যায়।

আজ রাতে পেয়াদারা হরগোবিন্দবাবুর দুশো বাইশ বছর বয়সী ঠাকুমার ঘরের কাছে ঘুরঘুর করল খানিক। যথেষ্ট বয়স হয়েছে। এ বয়সে মাঝে মাঝে মানুষ শখ করেও তো এক-আধবার বলে, আর কেন, এবার মরলেই হয়।

কারো মুখ থেকে একবার এরকম একটু ইচ্ছের কথা বেরোলেই পেয়াদারা অমনি সাপুটে ধরে আত্মাটাকে এক ঝাঁকুনিতে বের করে দেবে। পেয়াদারা হরগোবিন্দর ঠাকুমার ঘরের খোলা জানলায় ঘাপটি মেরে কান পেতে রইল। কিন্তু বুড়ি মহা ট্যাটন। আপনমনে নানা কথা বকবক করে যাচ্ছে বটে, মরবার কথাটি মুখে আনছে না।

সূর্যকান্ত বাগানে বেড়াতে বেড়াতে ভারি চিন্তিত হাত দাড়িতে বোলাচ্ছিলেন। এমন সময় পাশেই হরগোবিন্দর বাড়ির জানলায় চারটে মুশকোমতো লোককে দেখে হেঁকে বললেন, কে ওখানে?

পেয়াদারা ভারি জড়োসড়ো হয়ে কাঁচুমাচু মুখে বলল, এই আজ্ঞে, আমরা।

সূর্যকান্ত পেয়াদাদের ভালোই চেনেন।

ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছেন। বললেন, তা সুবিধেটুবিধে কিছু করতে পারলে হে বাপু?

হেড পেয়াদা দুঃখের সঙ্গে মাথা নেড়ে বলল, আজ্ঞে না, একেবারেই সুবিধে হচ্ছে না। কাজকারবার লাটে উঠবার জোগাড়।

কেউ মরছে না বুঝি?

মোটেই মরছেন না। সেই বছর দশেক আগে বটেশ্বরবাবুকে জুৎমতো পেয়ে গিয়েছিলুম। তারপর থেকে একেবারে জালে মাছিটি পড়ছে না।

বটেশ্বর! কোন বটেশ্বর বলো তো

বেঁটে বটেশ্বর নাকি?

আজ্ঞে তিনিই।

যে দাবা খেলে বেড়ায়?

আজ্ঞে দাবাড়ু বটেশ্বরই বটেন।

সুর্যকান্ত ভারি চটে উঠে বললেন, মরেছে যে খবরটা তো হতভাগা একবারও মুখ ফুটে আমাকে বলেনি। অথচ রোজ দেখা হচ্ছে। এই একটু আগেও তো দেখলুম তাকে।

বোধহয় চেপে যেতে চাইছেন।

সূর্যকান্ত দাড়ি নেড়ে উত্তেজিত গলায় বললেন, চেপে গেলেই হল! জন্মমৃত্যুর একটা রেজিস্টার আছে তো। তাছাড়া বাঁচা লোক আর মরা লোকে কিছু তফাতও আছে। তফাতটা না থাকলে চলবে কী করে?

হেড পেয়াদা মাথা চুলকে বলল, বটেশ্বরবাবু যে মরেছেন তা তিনি স্বীকার করতেই চান না যে!

মরতে তাকে বলেছিলই বা কে?

নিজেই বলেছিলেন। সেবার বাঘা দাবাড়ু কালীকেষ্টকে হারিয়ে ভারি খুশি হয়ে বলে ফেলেছিলেন, আহা এরকম এক চাল খেলতে পারলে মরে গেলেও দুঃখ নেই। যেই বলা অমনি আমরা ঘপাৎ করে--

বুঝেছি। তা মরাটা খুব কঠিন ব্যাপার না কি?

আজ্ঞে মোটেই না। ব্যথাটেথা নেই, ধড়ফড়ানি নেই, একেবারে জামা ছাড়ার মতো সহজ ব্যাপার।

সূর্যকান্ত চোখ ছোটো করে বললেন, আর সুবিধেটুবিধে কী দিচ্ছ? মানে, একটা লোক কিছু না পেলে খামোখা মরতেই বা যাবে কেন?

হেড পেয়াদা একটু আশার আলো দেখতে পেয়ে ভারি উৎসাহের সঙ্গে বলতে লাগল, আজ্ঞে সুবিধে মেলা। বেঁচেবর্তে যেমন আছেন প্রায় তেমনই থাকবেন। সুবিধে হল, ইচ্ছেমতো অন্তর্ধান করা যায়। ইচ্ছে হলে গ্রহনক্ষত্রে ঘুরে আসা যায়। স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল কোথাও যাওয়া আটকায় না। তারপর ধরুন কাজকর্মও কিছু নেই, সারাদিন ফুর্তি করে বেড়ালেই হয়। হোঁচট খেয়ে যদি পড়ে যান, দরজায় যদি আঙুল চিপে যায়, ছাদ থেকে যদি পড়ে যান তাহলেও ব্যথা লাগবে না। তারপর ধরুন, রোগবালাই নেই, খিদেতেষ্টা নেই, খরচাপাতি নেই। একেবারে ঝাড়া হাত পা হয়ে গেলেন আর কী।

সূর্যকান্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মাথা নেড়ে বললেন, দূর! ও আর এমনকী? সুখে সুখে জীবনটা একঘেয়ে হয়ে গেল, মরার পরও যদি কেবল সুখ ছাড়া আর কিছু না থাকে তাহলে ফের একঘেয়ে লাগবে। না হে বাপু, মরা টরা আমার পোষাবে না।

হেড পেয়াদা হতাশ হয়ে করুণ গলায় বলল, একবার একটু মরে দেখতে পারতেন কিন্তু। খারাপ লাগত না। শুনতে যতটা খারাপ আসলে মরা ব্যাপারটা ততটা খারাপ নয়।

সূর্যকান্ত মাথা নেড়ে বললেন, উহুঁ, অন্য জায়গায় দেখো গে বাপু। আমার কাছে সুবিধে হবে না।

দুঃখী জীবনলাল আর টগর জ্যোৎস্নায় পাশাপাশি হাঁটছিল। সোনার গুঁড়োয় দুজন একদম মাখামাখি। দুজনে খুব ঘেঁষাঘেঁষি। জীবনলাল ফের তার দুঃখের কথাই বলছিল, দুঃখ ঘুচে যাওয়ার দুঃখ।

টগর শুনছিল। শুনতে তার ভারি ভালো লাগছিল।

পেয়াদারা কিছুক্ষণ তাদেরও পিছু নিল। দুঃখের কথা বলতে বলতে যদি জীবনলালের একবারটি অন্তত মরার ইচ্ছে জাগে। তাহলে ঘপাৎ করে--

তা এইসব নিয়েই হল লামডিঙ। রোজ সেখানে জ্যোৎস্না ফোটে। রোজ সেখানে অন্য গ্রহের জীব আসে। রোজ ভুতুড়ে আর অদ্ভুতুড়ে নানা ঘটনার স্রোত বয়ে যায়। কিন্তু

লামডিঙের গল্প কখনো শেষ হয় না।

গণ্ডগোল

রামী কেমন মেয়ে তাও কুমুদ জানে না। অথচ রামী একরকম তার বিয়ে করা বউ। খবর যা পাচ্ছে কুমুদ তা মোটেই ভালো নয়। রামীর নাকি বিয়ে! গণ্ডগোল মানেই হল কুমুদ। তার গোটা জীবনটাই নানা গণ্ডগোল, গুবলেট আর কেলোর একটা যোগফল। বাপের দুটো বউ আর তেরোটা ছেলেমেয়ে। তার ওপর বাপটা রগচটা, দুই মায়ের উস্তম কুস্তম ঝগড়া। সব মিলিয়ে নরক গুলজার। তেরোটা ছেলেমেয়ে যে যার মতো ষণ্ডাগুন্ডা বাঁদর গোরু তৈরি হচ্ছে। কুমুদ ছিল তার মধ্যে আরও সরেস। মাস্টাররা মারত, ঘাপ পেটাত, মা ঠ্যাঙাত, দাদা দিদিরাও উত্তম মধ্যম দিতে কসুর করত না। যাত্রা দলে নাম লেখাতে গিয়েছিল বলে অবশেষে ঠিক চৌদ্দ বছর বয়সে কুমুদকে তার বাপ জুতোপেটা করে বাড়ির বার করল।

ভেবে দেখল কাজটা ঠিকই হয়েছিল। বাপের তেমন দোষ দেওয়া যায় না। চৌদ্দ বছর বয়সে আরও অনেক গুণ দেখা দিয়েছিল তার। বিড়ি খাওয়া, গাঁজা টানা, হাঁড়িয়া পচাইও বেশ চলে যেত। নষ্ট হওয়ার পথে চৌদ্দ বছর বয়সটা খুবই কাঁচা ছিল। তাছাড়া ভেবে দেখলে তেরটা ছেলেমেয়ের মধ্যে এক-আধটা কমে গেলে বাপের তেমন ক্ষতিও ছিল না, কে কার কড়ি ধারে।

কুমুদ জুতোপেটা হয়ে যখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল তখন চারিদিকে উদোম উধাও পৃথিবী। যেদিকে খুশি যাও, যা খুশি করো, কিছু বলার নেই কারো।

চৌদ্দ বছর বয়সে সে এক ভারি মজার ব্যাপার। প্রথম রাতটা জল খেয়ে গাছতলায় কাটিয়ে দিল কুমুদ। বেশ লাগল। একটু খিদে পায়, এই যা মুশকিল। কুমুদ চার পাঁচ গাঁ তফাতে গিয়ে এক বাড়িতে চাকরের কাজ নিল। ঠিক তিন দিন বাদে ফাঁক বুঝে গিন্নিমার সোনার বালাটা হাতিয়ে কেটে পড়ল।

মতি স্যাকরা খুব ঠকিয়েছিল। মাত্র দেড়শ টাকা, তাও মেলা ঝোলাঝুলির পর দিয়েছিল। ধড়িবাজ লোক, বালাটা হাতে নিয়ে তার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে বলল, এতো চুরির মাল বাপু, ধরা পড়লে তোমারও হেনস্থা আমারও হেনস্থা।

দেড়শো টাকায় কয়েকটা দিন একেবারে রাজার হালে কেটে গেল কুমুদের। তারপর সে আরও তফাত হতে লাগল। দশ বিশ গাঁ আর দুটো গঞ্জ ছেড়ে ফুলপুরে বাসা গাড়ল! তুচ্ছ কাজ, একটা পুরোনো কালীমন্দির, ঝাঁট-পাট দেওয়া আর ধোয়া-মোছার কাজ। মাইনে পাঁচ টাকা আর দুবেলা খাওয়া।

এ কাজটা কুমুদের বেশ ভালোই লাগত। খবরদারি করার লোক নেই, ছড়িদার নেই, খাটুনিও কিছু নয়। একদিন কালীমন্দিরে দুপুর বেলা এক ঝুববুস বাবাজি এসে হাজির। জটাজুট, দাড়ি আর ময়লা রক্তাম্বর। আর গায়ে যে বোঁটকা গন্ধ! বাবাজি নানারকম হু-হুঙ্কার ছেড়ে আর অং বং চিৎকার করে আসর জমাতে চেষ্টা করল। সুবিধে হল না। তারপর কুমুদকে ধরে পড়ল, 'দুটো টাকা দে সাপ ধরা শিখিয়ে দেব।

দুটো টাকার তখন মেলা দাম। কুমুদ রাজি হল না। হতাশ হয়ে বাবাজি তখন নাট মণ্ডপে শুয়ে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোতে লাগল।

এমনই কপাল, ঠিক সেই সময়েই একটা গোখরো সাপ বেরোলো মন্দিরের দক্ষিণ কোণে।

সাপ! সাপ!

বাবাজি চেঁচামেচিতে উঠে পড়ল। তারপর এলেম দেখাল বটে।

সাপটা সবে নাট মন্দিরে নীচের ধাপে কিলবিল করে ঘাস জঙ্গলে পালাবার ফিকির খুঁজছিল, বাবাজি গিয়ে খপ করে লেজে ধরে সেটাকে তুলে ফেলল। অন্তত আড়াই হাতের পাকা গোখরো।

বাবাজি সাপটাকে হাতে ঝুলিয়ে পাকা চোখে সর্বাঙ্গ দেখে নিয়ে বলল, গাভীন আছে। পেট ভরা ডিম।

চিমটে দিয়ে দুটো বিষদাঁত উপড়ে সাপটাকে ফের ঘাস জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে কুমুদের দিকে চেয়ে বলল, সবকটা ডিম ফুটে যখন বাচ্চা বেরোবে তখন গরমের সময় ঘাসে পা দিতে পারবি না, ঠুকে দেবে।

সাপের ভয় কুমুদের তেমন নেই। জন্মাবধি সাপখোপ নিয়েই বসবাস। তবে বাবাজি বেশ খপ করে সাপটাকে ধরে ফেলল তাতে সে বুঝল, বাবাজি এলেমদার লোক।

দুটো টাকা কবুল করে সে বাবাজির কাছে সাপ ধরা শিখল দুদিন ধরে। অবশ্য দু'টাকায় হল না। গাঁজার পয়সা, ভাতের ভাগও দিতে হল।

অভাবে পড়লে কুমুদ সাপ ধরে বেচে দিয়ে আসত গঞ্জে। বিষ আর চামড়া দুইয়েই কিছু দাম আছে। তবে তেমন কিছু নয়।

বুড়ো পুরুতের মেয়ে পুতুলকে কু-প্রস্তাব দিয়েছিল বলে যে কী ঠ্যাঙানটাই না ঠ্যাঙাল গাঁয়ের মোড়ল মাতব্বররা। হেনস্তার আর শেষ ছিল না। ভেবে দেখলে কুমুদ কাজটা খারাপই করেছিল। পুতুল বড়ো ভালো মেয়ে।

ঠ্যাঙানিটা খেয়েছিল বিকেল বেলায়। মেরে গাঁয়ের বাইরে একটা গাছতলায় টেনে ফেলে দিয়েছিল তাকে। জ্ঞান যখন ফিরল তখন অনেক রাত। গায়ে গতরে সাংঘাতিক ব্যথা। চোখেও ভালো দেখছে না। কিছুক্ষণ জিরিয়ে কুমুদ ফের গাঁয়ে ঢুকল। সোজা কালীমন্দিরে গিয়ে কালীর নথ আর দু'চারটে বাসন নিয়ে চম্পট দিল। নথটা সোনার, জানা ছিল কুমুদের।

এর পরের ঠেকটা বেশ ভালোই জুটে গেল কুমুদের। মানুষের মেলায় একটা চপের দোকানে সে তখন জোগানির কাজ করে। সেদ্ধ আলু মাখে, নেড়ো বিস্কুট গুঁড়ো করে উনুনে হাওয়া দেয়, খদ্দেরকে চপ কাটলেট পরিবেশন করে, পাতা ফেলে। মেলায় মেলায় ঘুরতে হয়। দোকানের মালিক লোক তেমন সুবিধের নয়, একটু খেঁকি গোছের। নানুরের মেলায় এক খদ্দেরের নতুন শালে চা চলকে পড়ায় মালিক উঠে এসে দুতিনটে থাপ্পড় কষালে। কিন্তু শালওয়ালা লোক ভালো। প্রথমে গালাগাল করলেও মারধর দেখে সেই এসে মেটাল। কুমুদের খুব দুঃখ হয়েছিল সেদিনি। মালিক চড় থাপ্পড় দিয়েও ক্ষান্ত থাকেনি, জবাবও

দিয়েছিল। মালিকের সন্দেহ ফাঁক পেলেই কুমুদ পয়সা সরায়। কদিন ধরেই তাড়াব তাড়াব করছিল। তা মালিকের দোষ নেই। পয়সা কুমুদ সরাত বটে।

দোকান থেকে বেরিয়ে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল কুমুদ। হঠাৎ সেই শালওয়ালার সঙ্গে দেখা।

এই যে খোকা--তোমাকে কি লোকটা তাড়িয়েই দিল?

হ্যাঁ। আপনার জন্যেই তো, চায়ের দাগ দুধ দিলেই উঠে যায়। ঝুটমুট আমার চাকরিটা খেলেন। শালওয়ালা ভারি অপ্রস্তুত। বলল, তা বটে, তাহলে আর কী করা। চলো আমার সঙ্গে, মানুষকে নিরাশ্রয় দেখলে আমার ভারি কষ্ট হয়।

তা সেই শালওয়ালার বাড়িতে কয়েকদিন তোফা কাটল কুমুদের। আসলে শালওয়ালার তিনকুলে কেউ নেই। হরিগঞ্জ গাঁয়ে বেশ বড়ো বাড়ি। অবস্থাও ভালো। লোকটা ইস্কুলে মাস্টারি করে। আর নানা বায়ু আর বাতিকে ভোগে। ঘন ঘন হোমিওপ্যাথ ওষুধ খায়। কোথায় পয়সা রাখে তা বেবাক ভুলে যায়। দুটো চাকর আর একজন রান্নার লোক যে কেন লাগে কে জানে!

সে বাড়িতে থেকে বেশ দুপয়সা আয় হতে লাগল কুমুদের। খ্যাঁটের বন্দোবস্তও বেশ ভালো। আর দুটো চাকর, রান্নার লোক আর কুমুদ চারজনই হাত লাগাত। বেশ জমে গিয়েছিল চার জনে।

শালওয়ালার নাম ছিল গিরিনবাবু। তা গিরিনবাবু একদিন তাকে ডেকে চুপিচুপি বলল, 'শোনো কুমুদ, আমি ঠিক করেছি তোমাকে পুষ্যি নেব। উইল করে আমার বিষয় সম্পত্তি সব তোমাকেই দিয়ে যাব। এক জ্যোতিষী বলেছে আমার আয়ু আর বেশিদিন নয়।'

কুমুদের কাছে এ প্রস্তাব স্বপ্নের মতো। সে তক্ষুনি রাজি হয়ে গেল। তবে পুষ্যি নেওয়াটা মুখে মুখেই হল। কাগজপত্র কিছু লেখা থাকল না। গিরিনবাবু মাথাপাগল লোক, তাঁর খেয়ালও কম।

কুমুদকে যে গিরিনবাবু পুষ্যি নিয়েছেন একথাটা কিন্তু তাঁর আর দুই চাকর ভজা আর কানু বিশ্বাস করল না। ঠাকুর নন্দলালও গায়ে মাখল না। অথচ এদের ওপরে খবরদারি

করতে না পারলে তার পুষ্যি হয়েই লাভটা কী? তবে গিরিনবাবুকে সে প্রকাশ্যে বেশ খোলা গলায় 'বাবা' বলে ডাকতে শুরু করে দিল।

গিরিনবাবুর হঠাৎ একদিন খেয়াল হল কুমুদের বিয়ে দেওয়া দরকার। ব্যস সঙ্গে সঙ্গে তিনি পাত্রী খুঁজতে লোক লাগিয়ে দিলেন। গাঁয়েগঞ্জে পাত্রীর অভাব নেই। মেয়ের বাপেরা মুখিয়ে বসে আছে। নবীগঞ্জের পরেশ পালের মেয়ে রামীকে পছন্দ করে এলেন গিরিনবাবু। তারপর বেশ বাজনা টাজনা বাজিয়ে ফস করে বিয়েও হয়ে গেল। রামী তখন নিতান্তই বালিকা। ন দশ বছর বয়স। কথা ছিল, বিয়ের পর বউ বাপের বাড়িতেই দু-চার বছর থাকবে।

কিন্তু গোলমাল বাঁধল অন্য জায়গায়। বিয়ের পর পরেশ পালের জ্ঞানের চোখ খুলল। তার কাছে যে কুমুদ সজাত হলেও গিরিনবাবুর ছেলে নয়। পুষ্যি মাত্র। তার ওপর কুমুদের নানা কীর্তি কাহিনিও ততক্ষণে চাউর হয়ে গেছে। পরেশ পাল এসে একদিন খুব হাত পা নেড়ে গিরিনবাবুকে পাঁচ কথা শুনিয়ে গেল।

গিরিনবাবু সেই অপমানের পর শয্যা নিলেন। এবং তিনদিন বাদে একদিন সকালে দেখা গেল, ঘুমের মধ্যে গিরিনবাবু ইহলোক ছেড়েছেন। তার তিনদিনের মধ্যে কোথা থেকে পিল পিল করে গিরিনবাবুর একগাদা ভাইপো ভাইজির আগমন ঘটল। তারা এসেই বাড়িটাড়ি দখল করে ফেলল, আর ঘাড় ধরে কাজের লোকেদের তাড়াতে লাগল।

কুমুদ বোঝানো চেষ্টা করেছিল যে, সে আজ্ঞে কাজের লোক নয়। হু হু বাবা, সে হল পুষ্যি পুত্তুর।

এ কথায় তারা এমন হেসে উঠল যে, কহতব্য নয়।

কুমুদ তবু গাঁইগুঁই করছিল। তখন গিরিনবাবুর ভাইপোরা ধরে খুব আড়ং ধোলাই দিল তাকে। তারপর জুতোপেটা করে তাড়াল। অবশ্য শুধু হাতে বিদায় নেবার পাত্র কুমুদ নয়। দুশো টাকা আগেই সরিয়েছিল, যাওয়ার সময় দু-চারখানা বাসন, একখানা অ্যালার্ম ঘড়ি, তিনজোড়া জুতো সরিয়ে নিল।

কখনো-কখনো আমও খায় ছোলাও খায়। গিরিনবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে সে নবাবগঞ্জের শ্বশুরবাড়িতেও একবার গিয়েছিল। পরেশ পাল তাকে বারবাড়ি থেকেই কুকুরের মতো খেদিয়ে দেয়। স্পষ্টই বলে দেয় যে মেয়ে তার কুমারীই আছে। আবার বিয়ে দেব। কুমুদকে সে জামাই হিসেবে মানে না। কুমুদ মাথা নেড়ে কথাটা স্বীকার করে নিয়ে বলল, মানা উচিতও নয়।

সুখের পর দুঃখটা বেশ গায়ে লাগে। কুমুদেরও লাগল। গিরিনবাবুর বাড়িতে তোফা কয়েকটা দিন কাটানোর পর ফের খিদের কষ্ট সহ্য হচ্ছিল না।

কিন্তু গিরিনবাবুর মতো আর-একজন মাথাপাগলা লোক না পাওয়া গেলে এসব সমস্যার সুসারও হয় না। কুমুদের ফেরারবাজি করে দিন কাটতে লাগল।

নোনাপুকুরের শ্মশানে একদল সন্ন্যাসী থানা গেড়ে ছিল। তারা সব হিমালয়ে থাকে। গঙ্গাসাগরে এসেছিল, ফিরে যাচ্ছে। তাদের কাছে জরিবুটি কিছু পাওয়া যায় কি না এই আশায় কুমুদ গিয়ে তাদের সঙ্গে ভিড়ল, গাঁজা সেজে দেওয়া, পা দাবানো সবই করল। কিন্তু বুঝল সাধুগুলো কেপ্পন গোছের। কিছু ভাঙতে চায় না।

দুদিন বাদে সাধুগুলো ডেরা গুটাল। আশায় তাদের সঙ্গ নিল কুমুদ। গায়ে ছাইটাই মেখে নিল। জটা হয়নি তবে যথাসাধ্য ধুলোটুলো ঘসে মাথাটারও একটা ব্যবস্থা করে ফেলল। কমণ্ডুল, শূল, আর কৌপীনও ধারণ করে নিল। সাধু সাজলেও এদেশে কিছু রোজগার বাঁধা। সাধুরা তাকে তাড়াল না।

হাঁটতে হাঁটতে দুটো জায়গায় রাত কাটিয়ে পরদিন দুপুর নাগাদ যে গাঁয়ে পৌঁছাল সেটা কপালক্রমে নবীগঞ্জ। কুমুদের শ্বশুরবাড়ি। শ্মশানে সাধুরা ধুনি জ্বালিয়ে চায়ের জল চাপাল, কুমুদের ওপর হুকুম হল দুধ জোগাড় করে আনতে।

মনটা ভালো ছিল না কুমুদের। সাধু হয়ে হিমালয়ে চলে যেতে হচ্ছে, নিজের বাপ তাড়িয়ে দিয়েছে, পাতানো বাপ পটল তুলেছে, শ্বশুর বাপ মুখ দেখতেও নারাজ। ভরসা শুধু সাধুবাবা সকল। তারাও বেশি ভরসা দিচ্ছে না। বুড়ো সাধু বিবেচক, অনেকবার তাকে

বলেছে পাহাড়ের শীতে বাঙালিদের আমাশা হয়। সে আমাশা ওষুধে সারে না। আর সেখানে শীতও সাংঘাতিক, ডাল সেদ্ধ হয় না, কাঠ জোগাড় করতে দম বেরিয়ে যায়।

শুনে ভয় খাচ্ছে কুমুদ। একটা লোটা নিয়ে দুধ জোগাড় করতে বেরিয়ে শ্বশুরবাড়ির গাঁ-খানা ভালো করে শেষবারের মতো দেখে নিচ্ছিল সে।

রামীকে তার ভালো মনে নেই। দেখনা-দেখনা করে বছর চারেক কেটে গেছে শুভদৃষ্টির পর। হ্যাজাকের আলোয় যে কচি মুখখানা দেখেছিল সেটা ভুলেই গেছে। এতদিনে তার ডাগরটি হওয়ার কথা। বিয়েও হয়ে গেছে বোধ হয় এতদিনে।

এধার ওধার ঘুরল সে। চট করে শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে হাজির হতে তেমন সাহস হল না। সাধু দেখে সবাই তাকাচ্ছে, দু-একজন পেন্নামও করে ফেলল। গয়লা বাড়িতে পো টাক দুধ ভিক্ষেও পেয়ে গেল সে। ফেরার আগে শ্বশুরবাড়িটা একটু দেখে যেতে ইচ্ছে করছিল বড্ড। শেষ দেখা।

ল্যাংটার নেই বাটপাড়ের ভয়। লেংটি পরে শ্বশুরবাড়ি যেতে একটু লজ্জা ভাব ছিল তার। হিমালয়ের কথা ভেবে সেটা ঝেড়ে ফেলল। সে যখন সাধুই হয়ে যাচ্ছে আর আমাশাতে মৃত্যু যখন লেখাই আছে কপালে, তখন আর ভয়টা কীসের?

শ্বশুরবাড়ির ঝুমকো লতায় ছাওয়া ফটকের বাইরে দাঁড়িয়ে সে একটানা পেল্লায় হাঁক ছাড়ল, 'জয় শিব শম্ভো।'

কাজ হল। একটা ঝি গোছের বয়স্কা মহিলা বেরিয়ে এসে 'ওম্মা গো' বলে চেঁচিয়ে ভিতর বাড়িতে পালিয়ে গেল।

তারপর বেরিয়ে এল পরেশ পাল নিজে। বুকটা একটু কেঁপে উঠল কুমুদের।

এখানে সুবিধে হবে না বাবাজি, সরে পড়ো। কুমুদ কটমট করে তাকিয়ে বলল, পাপী, পাপী! পরেশ পাল একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে মিইয়ে গেল। বলল, বাড়িতে অসুখ আছে বাবাজী, অসুখ থাকলে ভিক্ষে দিতে নেই।

কুমুদ কিছুদিন যাত্রা করেছিল। রাবণ রাজার হাসিটা এবার হাসল সে। হাঃ হাঃ হাঃ। তারপর বলল, মরবি মরবি ঝাড়ে বংশে মরবি। এই বলে পিছু ফিরতেই পিছনে একটা নারীকণ্ঠের আর্তনাদ শুনতে পেল সে, দাঁড়াও বাবাজী, যেও না।

কুমুদ ফিরে দেখল তার শাশুরি। বেশ টসকালো চেহারা। হাতজোড় করে বলল, বাড়িতে অশান্তি বাবা। আমার পনের বছরের মেয়েটা সদ্য বিধবা হয়ে শয্যা নিয়েছে।

কুমুদ এমন হাঁ হয়ে গেল যে বলার নয়। বিধবা মানে? সে জলজ্যান্ত বেঁচে থাকতে রামী বিধবা হল কোন সুবাদে?

সে হুংকার ছেড়ে বলল, বটে! তা কী করে টের পেলি যে তোর মেয়ে বিধবা?

জামাইয়ের দুই বন্ধু ছিল ভকু আর কালু। তারাই কাল বলে গেল কি না, জামাই নাকি মরেছে।

ডাক দেখি তোর মেয়েকে। এরকম তো হবার কথা নয়?

ডেকে আনাই বাবা। বোসো।

শাশুড়ি গিয়ে রামীকে ধরে ধরে নিয়ে এল। রামীর পরনে ধুতি, মুখখানা নামানো, চোখের কোলে অনেক কান্নার চিহ্ন।

ভারি খুশি হয়ে পড়ল কুমুদ। আনন্দে ঠ্যাং নাচাতে লাগল সে। পরেশ পাল তাকে স্বীকার না করলে কী হবে! তার মরার খবরে মেয়ে তো বিধবা হল? তবে? হেঃ হেঃ তাহলে এখনো তার দাম আছে। সবাই তাকে ঝেড়ে ফেলে দেয়নি।

আর রামীকে দেখেও ভারি খুশি লাগছিল তার। তেমন রূপসি কিছু নয় বটে, তবে বয়সের টানে চেহারাখানা দিব্যি হয়েছে। ছিপছিপে আঁটো গড়ন। মুখখানা ভারি মিষ্টি।

পরেশ পাল অনেকক্ষণ ধরে চুপচাপ দেখছিল, লক্ষ করেনি কুমুদ। হঠাৎ চোখে চোখ পড়তেই চমকে উঠল। বলল, কল্যাণ হোক, আমি চলি।

পরেশ যদি চিনতে পারে তাহলে হয়তো ব্যাপারটা কেঁচে যাবে। এরকমই থাক। সে বরং হিমালয়ে গিয়ে সত্যি মরাই মরবে। এটুকু তো জানা গেল যে, তার অভাবে দুনিয়ায় অন্তত

একজনও বিধবা হয়ে কান্নাকাটি করেছে।

কুমুদ একটু জোরেই হাঁটা দিয়েছিল। কিন্তু মাধবী লতার ফটক পেরিয়ে আমবাগানে পড়তেই পরেশ পাল ধরে ফেলল তাকে।

এই যে বাবাজি।

কুমুদ সভয়ে বলল, কাকে বলছিস?

তোমাকেই হে। চিনতে পেরেছি।

চিনে আর লাভ নেই। আমি সাধু হয়ে হিমালয়ে চলে যাচ্ছি।

পরেশ খপ করে হাতখানা চেপে ধরে বলল, ঘাট হয়েছে বাপু। ফিরে চল।

কুমুদ চোখ পাকিয়ে বলল, কোথায় ফিরে যাব, আমার কি যাওয়ার জায়গা আছে?

পরেশ একটা থতমত খেয়ে বলল, ইয়ে এখন না হয় আমার বাড়িতেই চলো। পরে না হয়--

পরে তো হিমালয়। না গো পরেশবাবু, সুবিধে হবে না--মেয়েকে তোমার বিধবা বলেই ধরে নাও।

পায়ে ধরছি বাপু। আমি তোমার গুরুজন, তবু ধরছি।

ব্যবস্থাটা কী হবে?

ঘরজামাই রাখব।

বটে! শেষে ঘরজামাইকে চাকর মুনিষের অধম করে খাটাবে না তো? গোরু চরানো, গোয়াল পরিষ্কার করা, খড়-কাটা, মাঠের কাজ এসব?

আরে না। ভেবেই রেখেছি, তুমি হবে আমার ধানকলের ম্যানেজার।

চলো।

কুমুদের হঠাৎ ভারি লজ্জা করল। বলল, লেংটি পরে যাব?

পরেশ ধমক দিয়ে বলল, এতক্ষণ তো দিব্যি ছিলে। নাও বরং আমার আলোয়ানখানা একটু ঝুল রেখে জড়িয়ে নাও। লোক পাঠিয়ে ধুতি জামা সব আনাচ্ছি।

খবরের কাগজ

বলা হয় ট্রেন দুর্ঘটনার তদন্ত হবে। হয়, বিমান দুর্ঘটনার তদন্ত হবে। হয়। হয়েও শেষপর্যন্ত অবশ্য তাতে লাভ হয় না। শুধু জানা যায়, হয় যান্ত্রিক গোলযোগে নয়তো কারো অসাবধানতায় দুর্ঘটনা হয়েছিল। তাতে একটা মরা মানুষও বাঁচে না, একটা কাটা ঠ্যাংও জোড়া লাগে না। তবে মৃতের আত্মীয়স্বজনরা কেউ কেউ হয়তো ফাঁকতালে ক্ষতিপূরণ বাবদ কিছু টাকা পেয়ে যায়।

যেমন পেয়েছিল গৌরী।

বন্যা কেন হল? ঝড় কেন এল? ক্যানসারের ওষুধ কবে বেরোবে? মহামারী কেন? আগুন কী করে লাগল? ছাদ কেন ধসে পড়ল? ভূমিকম্প কেন ঘটছে? খুন হল কেন? এইসব ভাবতে ভাবতে প্রত্যেক দিন শ্যামাচরণ একটু একটু বুড়ো হয়ে যাচ্ছে। সকাল থেকে খবরের কাগজ তার বগলে। যখনই ফাঁক পায় তখনই খুলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে।

নদীর ধারে বটতলায় সুশীতল গন্ধবণিক দোকান দিয়েছে। সেখানে গিয়ে বসলে নতুন ছাঁচবেড়ার গন্ধ নাকে আসে। মিষ্টি গন্ধটি। নদীর পাড়ে গায়ে গায়ে বাঁশ পুঁতে মাটি ফেলে কাঁচা বাঁধ দেওয়া হয়েছে। কাঠের পাটাতনের ঘাটে নৌকো এসে লাগে। বড়ো নৌকো, ছোটো নৌকো। মাল্লারা নৌকা ঘাটে বেঁধে উঠে আসে। মানুষজন মাল খালাস করে। আবার বোঝাইও হয়। ছোটো নৌকোয় দূর গ্রামগঞ্জের যাত্রীরা গিয়ে ওঠে। কারো মাথায় খোলা ছাতা। নদীর জলের আঁশটে গন্ধ আসে। হু-হু বাতাসও।

সুশীতলের দোকানে বসে খবরের কাগজটা ভালো করে পড়া যায় না। বাতাসের চোটে বড়ো বড়ো পাতা ওলটপালট খায়। তা ছাড়া আছে কিছু বেহায়া লোক, খবরের কাগজ দেখলেই যারা হাত বাড়িয়ে বলে--কাগজটা একটু দেবেন, দেখব? খবরের কাগজে

শ্যামাচরণ যে কী খোঁজে তা সে নিজেও ভালো করে জানে না। কিন্তু প্রতিদিন আগাপাশতলা কাগজটা সে যখন খুঁটিয়ে পড়ে তখন মনটা যেন কিছু একটা খোঁজে।

গন্ধবণিকের দোকানে সাত গাঁয়ের লোক আসে। তাদের কেউ বা শ্যামাচরণের চেনা, কেউ আধচেনা, কেউ একেবারেই অচেনা। গঞ্জের বাজারে সকলের ট্যাঁকের টিকি বাঁধা। আলু, সুপুরি, ধান, পাট, যার যা আছে সব নৌকো বোঝাই করে নিয়ে আসে। ঘাটে খুব জটলা হয়। তারপর মানুষজন একটু দম নিতে ঘাটের দোকানে গিয়ে বসে, চা খায়, গল্পসল্প করে, কাজকারবারের খবর আদান-প্রদান হয়।

ঘাটের ধারে বসে থাকতে শ্যামাচরণের বেশ লাগে। এই বসে থাকতে থাকতেই কত লোকের সঙ্গে চেনা জানা হয়ে যায়, কত নতুন নতুন খবর শোনে, অচেনা জায়গার বিবরণ পেয়ে যায়, নতুন সব চরিত্রকে জানা হয়। গন্ধবণিকের পো খাতিরও করে খুব। শ্যামাচরণ যে একসময়ে জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ছিল তা বেশ মনে রেখেছে সুশীতল।

তবে সে-সব কথা শ্যামাচরণ নিজেই ভুলে যায়। তার জীবনটা হল বসতি উঠে যাওয়া গাঁয়ের মতো। সেখানে এককালে অনেক লোক গমগম করে বাস করত, এখন সব বাস-বসত তুলে নিয়ে গেছে। ফাঁকা।

গৌরী হল শ্যামাচরণের বড়ো মেয়ে। প্রথম পক্ষের। আরো দুটো ছেলেমেয়ে আছে তার। তারা দ্বিতীয় পক্ষের। রেবন্ত হল তার একমাত্র ছেলে, ফরাসডাঙা কলেজের লেকচারার। ছেলে সেখানে বউ নিয়ে থাকে, কালেভদ্রে আসে, মাসান্তে পঁচাত্তরটা টাকা পাঠিয়ে খালাস। ছোটো মেয়ে পার্বতী তার স্বামীর সঙ্গে নবাবগঞ্জে থাকে। চিঠিটাও লেখে না।

বড়ো মেয়ে গৌরীরই যা একটু টান ছিল বাপের ওপর বরাবর। সে শ্বশুরবাড়ি থেকে যখন তখন চলে আসত বাপকে দেখতে। বরকে লুকিয়ে টাকা পাঠাতো বাবাকে। তিন সন্তানের মধ্যে গৌরীর ওপরে শ্যামাচরণের টান ছিল সবচেয়ে বেশি।

গৌরীর বর সোমনাথ ছিল পুলিশের এ এস আই। ছেলে হিসেবে ভালোই। অতি সুপুরুষ, সাহসী, সৎ। প্রাণে দয়ামায়া ছিল, ভক্তি ছিল। খড়গপুর লাইনে এক রাত্রে গাড়ি

লাইন ছেড়ে মাঠে নেমে গেল। ছখানা বগি উল্টে বিশজন মানুষ দলা পাকিয়ে একশা। সেই দলা পাকানো মানুষের মধ্যে একজন ছিল সোমনাথ।

কিন্তু সোমনাথই কি? শ্যামাচরণের এই সন্দেহটা আজও যায়নি। সে ট্রেনে সোমনাথ ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু তার লাশ শেষপর্যন্ত কেউ শনাক্ত করতে পারেনি। একটা ভাঙাচোরা থ্যাঁতলানো লাশ তাদের হাতে সৎকারের জন্য তুলে দেওয়া হয়েছিল বটে কিন্তু সেই লাশটার নাকের বাঁ পাশে কোনো আঁচিল ছিল না। অথচ সোমনাথ হলে আঁচিলটা থাকার কথা।

গৌরীকে কথাটা ভেঙে কোনোদিনই বলেনি শ্যামাচরণ। বলে দিলে গৌরী হয়তো খুব আশায় আবার বুক বাঁধবে। আসলে সে লাশটা না হোক, সেই দুর্ঘটনায় দলা পাকানো অন্য লাশগুলোর মধ্যে একটা না একটা সোমনাথের হবেই। কারণ, বেঁচে থাকলে সে নিশ্চয়ই ফিরে আসত এতদিনে। মরেই গেছে, তাই তার আঁচিলটার কথা শ্যামাচরণ তোলেনি।

গৌরী কিছু টাকা পেয়ে গেল। থোক কয়েক হাজার টাকা। সেই টাকা পেয়ে সোজা বাপের বাড়িতে উঠল এসে। সেই বছরই শ্যামাচরণের চাকরির একসটেনশন শেষ হয়ে গেল। নদীর ধারে এই বড়ো গঞ্জে চাকরির শেষ পাঁচ-ছ বছর কেটেছে, তাই এখানেই ছোটো মতো একটা বাড়ি সস্তায় পেয়ে কিনে ফেলেছিল সে। শেষ জীবনটা নির্ঝঞ্ঝাটে কাটাবে ইচ্ছে ছিল। কিন্তু ঠিক শ্যামাচরণের অবসরের জীবন শুরুর মুখে পাহাড় প্রমাণ ঝঞ্ঝাট বুকে করে গৌরী এল।

শ্যামাচরণের স্ত্রী গৌরীকে খুব ভালো চোখে দেখে না। দুই ছেলে-মেয়ে নিয়ে গৌরী বাপের ঘাড়ে ভর করেছে দেখে শ্যামাচরণের স্ত্রী ক্ষমা বড়ো মনমরা হয়ে গেল। সেই থেকে সংসারে শান্তি নেই। সৎমাকে ভয় খাওয়ার মেয়ে তো গৌরী নয়। সে পাঁচ কথা শোনাতে জানে। ক্ষমারও গলায় তেজ আছে।

তাই শ্যামাচরণ শোক ভুলে এখন বাড়ির বাইরেই যাকে বেশি। বাড়িতে যেটুকু সময় থাকে নাতি-নাতনি নিয়ে কেটে যায়। আর জীবনের বড়ো সময়টা কাটে কী যেন একটা খুঁজে।

আজকাল অশান্তির ভরা তার পরিপূর্ণ হয়েছে। গৌরীর বয়স বেশি নয়। পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বড়ো জোর। চেহারাটা এখনো ঢলঢলে। এক নজরে তেইশ-চবিবশের বেশি মনে হয় না। একে বয়সটা খুব নিরাপদ নয়, তার ওপরে সৎমায়ের সঙ্গে ঝগড়া। দুইয়ে মিলিয়ে মেয়েটার মধ্যে একটা খারাপ রোগ চেপেছে। রাজ্যের ছেলে-ছোকরাকে টলায়।

তাদের মধ্যে একজন আছে কাদাপাড়ার ভুসি পাইকার বিনয় হালদারের মেজ ছেলে। ডান হাতে ঘড়ি বেঁধে মোটরবাইক হাঁকিয়ে যখন-তখন আসে, গৌরীর সঙ্গে হিহি হোহো আড্ডা মারে, ক্যারিয়ারে চাপিয়ে নিয়ে যায় এধার ওধার। গঞ্জে ঢিঢি।

শ্যামাচরণ আজকাল নিজের সঙ্গেই কথা বলে বেশি, যখন কথা বলার আর লোক পায় না। বুড়ো মানুষের কথা শোনবার জন্য কে-ই-বা কাজকারবার ফেলে বসে থাকবে?

গঞ্জের ঘাটটা সেদিক দিয়ে বড়ো ভালো। নদীতে স্রোত আছে, জীবনটাও এখানে বেশ বয়ে যায়। কিছু গড়ায় না, থেমে থাকে না।

গোবিন্দনগর থেকে বেগুনের চাষি মফিজুল মাল গস্ত করতে এসেছে। চা খেতে খেতে বলল--এবার একদম জল হল না। পোকায় সাড়ে সর্বনাশ।

সাড়ে সর্বনাশ কথাটা মফিজুলের নিজের। সর্বনাশের ওপর আরও কিছু বোঝায়।

সে জলের জন্য নয়। তুমিও যেমন, বাসন্তীর মাস্টারমশাই হরিপদ বলে--এ হল কেমিক্যাল সারের গুণ। যত সার তত পোকার উৎপাত। আবার পোকা মারতে ওষুধ কেনো। এসব হচ্ছে বড়ো ব্যবসাদারদের কৌশল বুঝলে ! সার দিয়ে পোকা জন্মাচ্ছে, আর সেই পোকা মারতে বিষও কেনা করাচ্ছে। দুমুখো লাভ!

মফিজুল শ্যামাচরণের দিকে চেয়ে বলে, হাকিম সাহেব কী বলেন?

শ্যামাচরণ কী আর বলবে? জগৎ-সংসারের খবর এখন আর সে তেমন রাখে না। যে যা বলে তাই হক কথা বলে মনে হয়। এমন কি আজকাল ভূতের গল্প শুনে 'হুঁ' দেয়, মনটা ওই একরকম ধারা হয়ে গেছে। সেই লাশটার মুখে আঁচিল ছিল না-- একথাটা আজকাল বড়ো মনে পড়ে।

শ্যামাচরণ বসে চাষি সঙ্গীদের কথা শোনে, দু চারটে কথা নিজেও বলে। বাদবাকি সময় খবরের কাগজ দেখে। তার বড়ো মনে হয়, কাগজে কী একটা খবর যেন বেরোবার কথা। মনে মনে সে কতকাল ধরে সেই খবরটার জন্য অপেক্ষা করছে। খবরটা বেরোচ্ছে না।

গন্ধিবণিকের দোকান থেকে ভরদুপুরে ফিরছিল শ্যামাচরণ। চৌপথীতে কদমতলায় একপাল কেষ্ট দাঁড়িয়ে ফষ্টিনষ্টি করছে। তারা শ্যামাচরণকে দেখে গলা খাঁকারি দেয়। একটা বদমাশ ছেলে আওয়াজ দিল, গঙ্গারামকে পাত্র পেলে?

বিনয় হালদারের ছেলের নাম গঙ্গাপ্রসাদ। শ্যামাচরণ মাথাটা নামিয়ে জায়গাটা পার হয়ে যায়।

বাজারের মুখে বুড়ো নীলমণি দাসের সঙ্গে দেখা। নীলমণি লোকটা খুব আদর্শবাদী, স্বদেশি করত, একবার এম এল এ-ও হয়েছিল, শ্যামাচরণ হাকিম থাকবার সময় থেকে ভাব।

নীলমণি দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, শ্যামা যে! কোন দিকে?

বাড়িই যাই।

সে যাবে। বাড়ি পালাবে না, কথা আছে।

শ্যামাচরণ কথা শুনতে উৎসাহ পায় না আজকাল। ভালো কথা তো কেউ বলে না। তাই নিরাসক্ত গলায় বলে, কিসের কথা?

নীলমণি গলা নামিয়ে বলে, আজও ওদের দেখলাম। ভটভটিয়ায় জোড়া বেঁধে কুঠিঘাটের দিকে যাচ্ছে। এই একটু আগে। ওদের যে কারো পরোয়া নেই দেখায়।

ওরা বলতে কারা তা শ্যামাচরণ জানে। তাই উদাসভাবে নীল আকাশের দিকে চেয়ে বলে, তা তো দেখছোই। আমার আর কী করার আছে বল? চাও তো বল, গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়ি একদিন।

আরে রাম রাম। তুমি ঝুলবে কেন? কিন্তু বিহিতের কথা ভেবেছ কিছু?

আমার মাথায় আজকাল কিছু আসে না।

আমি বিয়ের কথাও ভেবে দেখছি বুঝলে? কিন্তু তোমার মেয়ে তো বয়সেও ছোঁড়াটার চেয়ে বড়ো। তাছাড়া হালদারমশাই তো খেপে আগুন হয়ে আছেই।

শ্যামাচরণ শ্বাস ফেলে বলে, সবই অদৃষ্ট। অকালে জামাইটা যে কেন--

বলেই শ্যামাচরণ ফের চমকে ওঠে। মনে পড়ে, লাশের মুখে সেই আঁচিলটা ছিল না। কথাটা আজও বলা হয়নি গৌরীকে। না বলাটা ঠিক হচ্ছে না।

কবে মরে-টরে যাবে শ্যামাচরণ, একটা সত্য কথা তার সঙ্গেই হাপিস হয়ে যাবে তাহলে।

নীলমনি কথা বলতে বলতে খানিক এগিয়ে দিল। সাবধানে রেল লাইন পার হয়ে শ্যামাচরণ বাড়িমুখো হাঁটতে থাকে। বগলে ভাঁজ-করা খবরের কাগজটা, বেশ কী একটা বলি বলি করে। কিন্তু কোনোদিনই বলে না, দুপুরে খাওয়ার পর আজ আবার খবরের কাগজটা তন্নতন্ন করে খুঁজবে শ্যামাচরণ। খবরটা থাকার কথা।

বাড়ি ফিরে স্নান খাওয়া সারতে বেলা চলে গেল। মেয়েটা এখনও বাড়ি ফেরেনি। নাতি-নাতনি দুটো স্কুল থেকে আসবে এখন। বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করে শ্যামাচরণ। বউ ক্ষমা এঁটোকাঁটা সেরে এসে বিছানার একপাশে বসে বলে, আর তো মুখ দেখানো যাচ্ছে না।

ক্ষমার বয়স হয়েছে, সাধ-আহ্লাদ বড়ো একটা করেনি জীবনে। সংসারে জান বেটে দিচ্ছে বিয়ের পর থেকে। আজকাল শ্যামাচরণের বড়ো মায়া হয়।

ঘড়ি দেখে শ্যামাচরণ উঠে বসে বলে, হরিদ্বারে যাবে?

যা হোক কোথাও চলো চলে যাই। তোমার আদরের মেয়ে সুখে থাক।

কে দেখবে ওকে?

আহা! দেখার ভাবনা! কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা আছে ওর। জামাই মরে গিয়েও তো কত টাকা হাতে এসেছে।

তা বটে! বলেই ফের সেই লাশের ভাঙাচোরা বিকৃত মুখ মনে পড়ে। আঁচিলটা ছিল না সেই মুখে। তবে কি--?

অনেক রাতে গৌরী পাশ ফিরতে গিয়ে জেগে ওঠে। কে যেন চাপাস্বরে ডাকল।

কে?

শ্যামাচরণ জানালার বাইরে জ্যোৎস্নায় দাঁড়িয়ে। চাপা গলায় বলল, আমি তোর বাবা। শোন।

বাবা! অবাক হয়ে বিছানা ছেড়ে গৌরী উঠে আসে, ওমা, তুমি বাইরে কেন? কী হয়েছে?

শ্যামাচরণের মুখচোখ জ্যোৎস্নায় অন্যরকম দেখায়। চোখের বসা কোল বাটির মতো, তাতে টুপটুপে ভরা অন্ধকার। চোখের তারা থেকে জ্যোৎস্নার প্রতিবিম্ব ঝিকমিক করে। শ্যামাচরণ বলে, তার মুখে সেই আঁচিলটা ছিল না।

কে? কার কথা বলছ?

শ্যামাচরণ বলে, বহুকাল ধরে চেপে রাখা গোপন কথাটা বুক থেকে বেরিয়ে যায়। গৌরী জানালার শিকটা চেপে ধরে। তারপর আস্তে আস্তে পাথর হয়ে যায়।

পরদিন শ্যামাচরণ আবার গন্ধবণিকের দোকানে গিয়ে বসে। বিশাল নদীর ওপর ফুরফুর করে নীল আকাশ। নৌকো আসে, নৌকো যায়। ব্যাপারীদের হট্টরোল ওঠে চারধারে। শ্যামাচরণ খবরের কাগজ খুলে তন্নতন্ন করে খবরটা খোঁজে। পায় না। ব্যাপারীরা এসে গল্প রাঙিয়ে তোলে। হাওয়া দেয়। চায়ের গন্ধের সঙ্গে নদীর আঁশটে গন্ধ গুলিয়ে ওঠে।

আজ সারাদিন গৌরী বেরোয়নি। কারো সঙ্গে দেখা করেনি। কথা বলেনি। সারাদিন শুধু ঘরে শুয়ে কেঁদেছে।

দুপুরে বাড়ি ফিরে শ্যামাচরণ একই খবর পেল। গৌরী নিজের ঘরে শুয়ে কাঁদছে। শ্যামাচরণ কাউকে কিছু বলল না। ক্ষমা প্রশ্ন করে করে হাঁপিয়ে যায়। খেয়ে উঠে

শ্যামাচরণ খবরের কাগজটা গৌরীর ঘরের জানলা গলিয়ে ভিতরে ফেলে দিয়ে চাপা গলায় বলে--সব খবরতো কাগজেই থাকে। রোজ দেখিস তো।

গৌরী প্রথমে কথা বলে না। কিন্তু অনেকক্ষণ বাদে উঠে চোখ মুছে খবরের কাগজটা পড়তে থাকে। কেন পড়ে তা বুঝতে পারে না। জগৎটা সম্পর্কে আবার তার ভীষণ আগ্রহ জেগেছে।

শ্যামাচরণ বিকেলে ঘুম থেকে উঠে ক্ষমাকে বলে, কাল থেকে একটা ইংরিজি খবরের কাগজও দিতে বোলো তো কাগজের ছেলেটাকে। কত খবর থাকে। একটা কাগজে সব পাওয়া যায় না।

মুখ

খবরের কাগজের ওপর দিয়ে একটা ভারি ক্ষুদে ছাইরঙা পোকা গুড়গুড় করে হেঁটে যাচ্ছে। চাপা অক্ষরের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে মাঝে মাঝে, দেখা যাচ্ছে না। ফের দেখা যাচ্ছে--ওই যে চলেছে, কোনাকুনি। কোথায় যাচ্ছে তা কি নিজেই জানে? তবু যাচ্ছে। এত ক্ষুদে যে, খুব ঠাহর করে দেখতে হয়। শচীন দেখছিল। খুব মন দিয়েই দেখছিল। ওটার এই হাঁটারও যেমন মানে হয় না, বেঁচে থাকারও তেমনি মানে হয় না। কোন ফল হবে ওটাকে দিয়ে? পোকা বলে কথা, মা-বাপ-ভাই-বোন নেই, ফ্যামিলি লাইফ নেই, শুধু কটা দিন উড়ে উড়ে ঘুরে ঘুরে, খামোখা বেঁচে থেকে, হয় অপঘাতে নয়তো এমনিতেই মরে যাবে।

অধিকারী বলছে, চৈতলপাড়া হল গে তাঁবার টাট। এই চোত-বোশেখে সেখানে তপ্ত বালির ওপর একখানা আলু ফেলে রাখো, বিকেলে দেখবে দিব্যি পোড়া-পোড়া ভাব হয়েছে। তেল নুন মেখে দিব্যি খেয়ে নিতে পারবে। চৈতলপাড়া নামটাও তো মনে হয় ওই চোত মাস থেকেই হল। পুকুর-টুকুর সব শুকিয়ে ঝামা। মাঠ দেখগে যাও, ফেটে একেবারে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। এক বালতি জল ফেললে চোঁ শব্দ করে টেনে নেয়।

শচীন অনেকক্ষণ ধরে চৈতলপুরের বৃত্তান্ত শুনছে। এবার বলল, ওটা কী পোকা বলো তো অধিকারীদাদা?

কোন পোকাটা?

ওই যে, ঢক্কানিনাদের ঢক্কার ওপর বসে আছে।

অধিকারী ঝুঁকে একটু দেখার চেষ্টা করে বলল, তা ভগবানের রাজ্যে কতরকম আছে। সব কি আর চিনি রে ভাই! তা হবে কোনো পোকা। তোর কাণ্ডই আলাদা। বলছি চৈতলপাড়ার কথা, আর তুই পোকা নিয়ে পড়ে আছিস।

ভাবছি কি জানো, এ পোকাটা বেঁচে আছে কী জন্য বলো তো!

বললুম তো, ভগবানের রাজ্যে কত জীবই তো বেঁচে আছে।

আচ্ছা ওর তো কোনো নামও নেই। ধরো যদু, মধু, শচীন বা অধিকারী এসব বলে তো ডাকেও না কেউ ওকে।

পোকার আবার নাম!

সেইটেই তো বলছি। নাম নেই, ঠিকানা নেই, বাপ-মায়ের ঠিক নেই, কোথায় যাচ্ছে কী করছে তাও বুঝবার মতো মগজ নেই, বেঁচে যে আছে তাও তো বুঝি সবসময়ে টের পায় না। ঠিক তো! তবে বেঁচে আছেই বা কেন?

রোদ আসছে রে, ওধারটায় একটু চেপে বোস। চোতের রোদে বড্ড ঝাঁঝ। তা কাগজে লিখেছে কী রে বাপ, একটু বলবি?

এ তো বাসী খবরের কাগজ অধিকারীদা। বোচনের বাপ রোজ নিয়ে আসে কলকাতা থেকে। আমি সকালে চেয়ে আনি। লিখেছে মেলা কথা, সব তুমি বুঝবে না।

অধিকারী বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে বলল, বুঝে কাজও নেই। দুনিয়ায় কত কী হয়ে যাচ্ছে রোজ। সেদিন শুনলুম, কোথায় একটা হাতি ক্ষেপে গিয়ে সাতটা লোককে মেরেছে। তা এরকম কত কী হয়ে যাচ্ছে। আমাদের পৈলেনের দিকটায় হাতিটাতি নেই।

কথাটার কোনো মানে হয় না। পৈলেনে হাতি নেই, এটা কি কোনো খবর হল। অধিকারীর তোম্বা মুখটার দিকে চেয়ে শচীন হেসে ফেলল। বলল, তার চেয়ে চৈতলপাড়ার কথা যা হচ্ছিল সেটাই চালিয়ে যাও অধিকারীদা।

সেটাই তো বলছিলুম রে। কথার মধ্যে পোকা পড়ল। বলছিলুম যে এই পৈলেনের মতো সরেস জায়গা নয়। পৈলেনেও শুখো বছর যায় বটে, কিন্তু চৈতলপাড়ার দিকটা হল একেবারে পাঁপড়ভাজা। গাছের পাতাটা অবধি শুকিয়ে মুচমুচ করছে।

লোকে সেখানেও তো বাস করছে।

ধুঁকতে ধুঁকতে। বছর চারকে আগে শুখোর সময়ে বিন্দির শ্বশুরবাড়ি গিয়ে সে কি দুর্গতি হল বলার নয়। জলশৌচ অবধি করতে পারি না। তিন দিন চান না করে গায়ে পোকা পড়ার জোগাড়।

তবু তো লোকে বাস করছে।

তা কী করবে বলো। বাপ-পিতেমোর ভিটে ছেড়ে যাবে কোথা?

তুমি তাহলে গঙ্গারামপুর ছাড়লে কেন বলো। সেই তো তোমার বাপ-পিতেমোর জায়গা।

সে অন্য বৃত্তান্ত। আমি কি আর ছাড়লুম! আমাকে ছাড়ানো হল। সবাই সেকথা জানে। জ্ঞাতিরা যা উস্তম-কুস্তম করলে আমাকে। তা বাপু আমার কোনো গিঁট নেই। বাপ-পিতমোর জায়গা বলে গঙ্গারামপুরের জন্য হেঁদিয়ে মরব আমি তেমন ঘরপোষা গেরস্ত নই। এই যে কাঁধে গামছাখানা দেখছিস এখানে সেখানে পেতে শুয়ে পড়ি, আর জায়গাই আমার গঙ্গারামপুর। এই গোটা দুনিয়াটাই।

বুঝলুম গো অধিকারীদাদা।

আমি হলুম গে তোর ওই পোকাটার মতো। লোক না পোক।

বড্ড চটেছো গো অধিকারীদা।

কথাটা শেষ করতে দিবি, নাকি! আসলে কথাটাই তো বলতে দিলি না।

বলো। শুনছি।

তা সেই চৈতলপাড়ায় সেই চোত মাসেই এক সাধু এসে পাঁচ পাঁচটা ধুনি চারদিকে জ্বেলে তপস্যায় বসে গেল। চৈতলপাড়ার ওই সাঙঘাতিক মোষ-ক্ষ্যাপা গরমে। আমাদের মতো লোক হলে শুকিয়ে চামচিকে হয়ে টেঁসে যেত। সাধু বলে কথা। সাত দিনে গা ঝলসে কালো হয়ে গেল। শরীর শুকিয়ে হত্তুকি। তবু গা-ঝাড়া দিয়ে উঠল। সে কী যজ্ঞি বাবা জানি না, তবে যজ্ঞির পর নাকি বামুন খাওয়ানোর নিয়ম। তা সাধু গিয়ে বামুন পাড়ায় হাতজোড় করে জনে জনে নেমন্তন্ন করল। বামুনরাও ট্যাটন। তারা পষ্টাপষ্টি বলে দিল, সাধুর জাতধর্ম

নেই, আমরা সাধুর নেমন্তন্নে যাব না। তখন সাধু রেগেমেগে করলে কী জানিস। গাছে গাছে যত হনুমান ছিল সবাইকে নেমন্তন্ন করে এল। আর তারপর সে কী কাণ্ড। পরদিন সাধু নিজের হাতে রান্না করছে আর দলে দলে হনুমান মেয়েমদ্দা ছানাপোনা সব হাজির। একেবারে পঙক্তি ভোজনের কায়দায় বসে গেল সব সারসার। তৃপ্তি করে খেল। ভোজনদক্ষিণাও নিল। চৈতলপাড়ার লোক কাণ্ড দেখে হাঁ। সেই থেকে চোতমাসে সেখানে হনুমান-মেলা হয়। কালো সাধুর মেলাও বলে লোকে। টানা একশো বছর ধরে হয়ে আসছে।

পোকাটা কাগজের একেবারে কানায় গিয়ে ঝুঁকে তলাটা নিরিখ করল। তারপর আবার উল্টোবাগে ফিরে আসছে। কী করবে, কোথায় যাবে কিছু বুঝতে পারছে না আহম্মকটা। আচ্ছা, পোকারা কী খায় বলো তো অধিকারীদা।

তোর মাথা থেকে পোকাটা যাচ্ছে না দেখছি।

ভাবছি, এইটুকুন তো পোকা, এর পেটটাই বা কতটুকু! খায় কী।

ওসব ভগবানের লীলা রে ভাই। দুনিয়াতে হাতির যেমন বন্দোবস্ত আছে, তেমনি পোকার জন্যও আছে।

সে না হয় বুঝলুম। কিন্তু ভগবানের লীলারও তো মানে হবে নাকি! তুমিই বলো এই পোকাটাকে দিয়ে ভগবানের কোন কাজটা হচ্ছে। সব কাজেরই একটা মানে থাকবে তো। নইলে বলতে হয়, তোমার ভগবানের মাথায় বেশ একটু ছিট আছে বাপু।

তা মন্দ বলিসনি। আমারও মাঝে মাঝে মনে হয় লোকটা একটু ছিটিয়ালই বটে। নইলে দেখিস না কোথাও গন্ধমাদন, কোথাও কেঁচোর ঢিবি। মদন তফাদারকে দেখ, টাকার পাহাড়ে চড়ে দিব্যি ফুরফুরে হাওয়া খাচ্ছে, আর আমাদের দেখ অবস্থা কেরাসিন।

তুমি বড্ড মোটা দাগের লোক অধিকারীদা। কোথায় একটা গুরুতর কথা বললুম, তাই নিয়ে পাঁচটা মিনিট ঝিম ধরে বসে ভাববে। তা নয়, কোথায় কার টাকা আছে, কার নেই তাই নিয়ে পড়লে।

ও বাবা, তোর পোকামাকড় নিয়ে বসে ভাবতে হবে না কি? আমার কি আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই! পোকামাকড় নিয়ে তুই ভাব গে যা। হুঃ মোটা দাগের লোক!

শচীন হেসে ফেলল, তোমার চৈতলপাড়ার বৃত্তান্ত শেষ হয়েছে?

বৃত্তান্ত আবার কী। কথাটা উঠল তাই বললুম। লোকে তো পাঁচটা জিনিস নিয়ে কথা বলবে, না কি! চুপ করে থেকে কী শেষে দম বন্ধ হয়ে মরতে হবে? আর চৈতলপাড়ার কথাটা এমন খারাপ বা কী বললুম।

তুমি কেনে দাগের লোক তা জান? গুহ্য কথাটা বুঝতে পার না বলে। এই যে পোকাটা খামোখা বেঁচে আছে, খামোখা খবরের কাগজের ওপর হেঁটে হেঁটে সময় নষ্ট করছে, আমরাও ওর চেয়ে বেশি কিছু করছি না।

কথাটা তো আমিই আগে বললুম রে। লোক না পোক। তুই নতুন কথাটা আর কী বললি? এখন কাজের কথায় আয় দিকি বাপ। চৈতলপাড়া যাচ্ছিস কোন মতলবে?

মতলব একখানা আছে শচীনের। কিন্তু সেকথা ভাঙে কী করে? অধিকারী হল হাটের খোলা হাঁড়ি। তার পেটের কথা মুখে ভুরভুরি না কাটলে পেট ফাঁপে, বায়ু হয়। কথাটা চেপে শচীন বলল, মাঝে মাঝে জায়গা বদলানো ভালো। তোমার সরেস পৈলেনে আমার তো তেমন সুবিধে হল না।

লটারির কারবারটা তুলে দিয়েই তো ভুলটা করলি। দু-পাঁচ টাকা তো আসছিল।

কচু। কত টিকিট বেচলুম। একটা লোকও পাঁচটা টাকা অবধি প্রাইজ পেল না। আজকাল লোকে ওসব ধরে ফেলেছে। গাঁটের পয়সা খরচ করে টিকিট কেটে আকাশের দিকে হাঁ করে চেয়ে বসে থাকা--এটা কথা হল? খরচের কথাটাও ভাবো।

শুনেছি লটারিওয়ালারা মাঝে মাঝে নিজেরাই না-বিকোনো টিকিটের প্রাইজ পেয়ে যায়।

সে সব কপাল আলাদা, আমাদের কপাল একেবারে শীলমোহর আঁটা। আর লটারিতে কে না ঢুকছে বলো। সনাতন, হারু, পতিতপাবন, রাখোহরি, শুধু পৈলেনেরই দশ-পনেরোজন হবে। তার মধ্যে সনাতনের মাইকওয়ালা গাড়ি আছে, হারুর গাড়ি নেই কিন্তু

মাইকওয়ালা রিকশা দাবড়ায়। গদাই মন্ডল ধারবাকিতে টিকিট দিতে চাইছিলও না ইদানীং। কিন্তু এই পৈলেন হল সোনার দেশ, এই তোকে বলে রাখলুম। এমন সরেস জায়গাটা ছেড়ে যাবি, কী আছে তোমার পৈলেনে? একটু ভেবে দেখে।

অত কথা কী, ওই পুলিনের শশার মাচানটাই দেখ চেয়ে। অত বড়ো নধর শশা ফলে কোথাও? ঘাসটা দেখ, পাতাটা দেখ, কেমন তেজালো সব ফলন। এ মাটির নীচে মা লক্ষ্মী আছেন রে। দুঃখকষ্ট যা হচ্ছে হতে দে, দেখবি চেপে বসে থাকলে বরাত একদিন ফিরবেই।

তোমার যতসব তাজ্জব কথা। তুমি পৈলেনে মাথা মুড়িয়েছো বলে কি আমাকেও মোড়াতে হবে না কি? তুমি মাটি কামড়ে পড়ে থাকো এখানে।

অধিকারী এ কথার টপ করে জবাব দিল না। কিন্তু মিটিমিটি চেয়ে তার স্যাঙাতটিকে জরিপ করার চেষ্টা করল অনেকক্ষণ। তারপর গলার স্বরটা থেকে আবেগ বাদ দিয়ে একটু আহ্লাদ খেলিয়ে বলল, গুহ্য কথাটি ফাঁস করবি না তো বাপ! জানি। চৈতলপাড়ায় একখানা দাঁও তুই মেরেছিস তাহলে!

অধিকারী নানারকম গলা করতে পারে। পৈলেন-কুমড়োহাটি সরস্বতী অপেরার সে বাঁধা অ্যাকটর। বড়ো বড়ো পার্টও করে। তার দুঃখের কথা গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না। পৈলেন-কুমড়োহাটির কর্ণার্জন বা কংকাবতী বা সিরাজদৌল্লা এখন আর বায়না পায় না। গাঁয়ের লোক কলকাতার অপেরা ধরে ধরে এনে যাত্রা দেখছে। টিকিট নিয়ে মারপিট। অধিকারী কলকাতার দলে ঢুকতেও চেষ্টা করেছিল, যেমন সবাই করে। সুবিধে করতে পারেনি। সরস্বতী অপেরার এখন যা-দশা।

শচীন পোকাটাকে ফের দেখছে। আচ্ছা ও শালাও কি দেখছে শচীনকে? ব্যাটা এখন কাগজের মাঝ বরাবর। শচীন কাগজটাকে একটু ভাঁজ করে নৌকোর মতো ধরে রেখে পোকাটাকে দেখছে। ইঃ বাবা, কতটুকু রে তুই। হ্যাঁ! কতটুকু!

কথাটা শুনেছো অধিকারীদা, এই যে পোকাটা দেখছো এর চেয়েও হাজার ভাগ ছোটো সব পোকা নাকি আছে। তারাই শরীরে ঢুকে নানা রোগ বাধায়।

অধিকারী একটা শ্বাস ফেলে বলল, জানি। আজকাল সবাই বৃত্তান্ত জানে কিনা। চাঁদে মানুষ যায়, অ্যাটম বোমা হয়, কত কী হচ্ছে দুনিয়ায়। হচ্ছে হোক, তোর আমার কী? তা বটে। মানুষ চাঁদেই যাক আর অ্যাটম বোমাই ফাটাক, তোমার পৈলেনে শশার ফলনটা ভালো হলেই হল। কী বলো!

তাই বললুম বুঝি! কপালটাই খারাপ রে ভাই, আমার কথা সবাই আজকাল উলটো করে ধরে। বেলা হল, উঠি। তা কবে যাচ্ছিস?

যাব একদিন, টেরও পাবে না।

টের পাব না মানে?

শচীন মিটিমিটি হেসে বলে, টেরটা পাবে কী করে বলো। সামন্তমশাই কাশী গেলেন, সঙ্গে এক গোরুর গাড়ি বোঝাই জিনিসপত্র, হাঁড়ি-কুড়ি-বালতি অবধি। আমার তো আর তৈজসপত্র নেই।

একখানা টিনের বাক্স বগলে করে বেরিয়ে পড়ব, পিছনে থাকবে এই ভাঙা ঘরখানা শুধু। সাপখোপের আস্তানা হয়ে থাকবে। কেউ টের পাবে না গো অধিকারীদা।

অধিকারী উঠে পড়ল। পৈলেনের একটা লোক কমে যাচ্ছে, এটা তার কাছে যত গুরুতর সংবাদ, অন্য কারও কাছে ততটা নয়। তবু খবরটা পাঁচ কান না করলে তার পেটটা বড়ো ফেঁপে উঠবে। বড়ো আইটাই হবে। তাকে সবাই পেটপাতলা লোক ভাবে বটে, কিন্তু তার অসুবিধের কথাটা কেউ ভাবে না।

শচীন বাইরের রোদটার দিকে খানিক চেয়ে রইল। বড্ড ফর্সা রোদ, সাবানে কাচা, ধপধপে, মুচমুচে। টিনের চালে শালিখ লাফাচ্ছে। কুচকুচ শব্দ। শুকনো গলায় একটা কাক তখন থেকে নিমগাছে বসে নাগাড়ে ডাকছে। পাঁশুটে আকাশে এক ফোঁটা মেঘ নেই। খয়েরপুরের বাস ওই ধুলো উড়িয়ে চলে গেল। কিছু দেখা আর কিছু শোনা নিয়েই তো দুনিয়াখানা নাকি? অন্তত শচীন তো তাই জানে বরাবর। কিছু দেখো, কিছ শোনো। এর বাইরে আর কী আছে? আছে আর একখানা জিনিস। সে হল ভাবনা। তা সেও ওই শোনা

আর দেখার মধ্যেই পড়ে। ঠেসে ভাবলে কত পুরোনো দিনের কথার শব্দ পাওয়া যায়, কত হারিয়ে যাওয়া দৃশ্য দেখাও যায়।

এই যেমন এখন ভাবতে গিয়ে দা হাতে তার মরা বাপকে স্পষ্ট দেখতে পেল শচীন। উত্তরধারে ঘরের কানাচে দাঁড়িয়ে ভাঙা বেড়া বাঁধছে। গায়ে ঘাম, মুখে নিবে-যাওয়া বিড়ি, গলায় মৃদুমন্দ যাত্রার কোনো গান। যেখানটায় রান্নাঘর ছিল সেখানে এখন আগাছা বুক সমান। তবু শচীনের চোখের সামনে রান্নাঘরখানা ভেসে উঠল। মায়ের শাড়ির সবজে আঁচলখানা অবধি দেখা যাচ্ছে আর নিমপাতা ভাজার মিঠে বাস আসছে খুব। চোতমাসে নিম-বেগুন ছিল বাঁধা। তা শুধু ওই নিম-বেগুনই। তাই দিয়েই ভাতের ঢিবি তুলে ফেলত বাপে ব্যাটায়। কাঁচা লঙ্কা থাকত। আর কী চাই? গরিব বাপ গরিবই রেখে গেল তাকে। মাও গত হল। তারপর থেকেই যেন ঠেকনোর অভাবে বাড়িটা হেলে পড়তে লাগল। মাটির দাওয়ায় ইঁদুরের গর্তে সাপখোপও কি নেই! কাঠা তিনেক জমি নিয়ে এই বাড়িখানা কি কাঁদবে শচীনের জন্য? বাড়ি কি কাঁদে?

খবরের কাগজের ভাঁজে পোকাটা ঝিম মেরে আছে এখনও। এ ব্যাটার কি কোনো বাড়িঘর আছে! তা ধরা যায় এই খবরের কাগজের ভাঁজখানাই ওর বাড়ি। এর বেশি আহাম্মকটা আর জানেও না কিছু। টুসকি মেরে ফেলে দিলে যেখানে পড়বে সেটাই ফের ওর বাড়ি। শচীনেরও তাই। পৈলেন যতদিন ছিল ততদিন পৈলেন, নইলে চৈতলপাড়া। দুটোতেই ঐকার আছে। ভারি অদ্ভুত। ঐ-কার বড়ো একটা থাকে না যেখানে সেখানে।

পৈলেনে এখন জমির দাম কত কাঠা যাচ্ছে কে জানে। তবে বেশি নয়, আর কেনার লোকও চট করে পাওয়া যাবে না। পেলেও দামে কষবে। তার চেয়ে থাক পড়ে। মাঝে মাঝে তো ভাবতে পারবে, আমার একখানা বাড়ি আছে ওই হোথায়, পৈলেনে!

লটারির ব্যবসাটা কোনো কাজের ছিল না। গুচ্ছের বাতিল টিকিট এখনও জমে আছে ঘরে। ফেলতে মায়া হয়েছিল বড়ো।

কথাটা ভাঙেনি অধিকারীর কাছে। সে চৈতলপাড়া আজই রওনা হচ্ছে আর এ-বেলাই বেলা দেড়টায় একখানা বাস যায় ওদিকে। রোদ খেতে খেতে একেবারে তপ্ত চাটুটি হয়ে

এসে পৌঁছোয় খয়েরপুর থেকে। পুঁটিমারি, হাশিমের চর, বাগদাখাল, জিনপুর হয়ে নবীনগর। সেখান থেকে বাস বদলে নতুন রাস্তা ধরে আরও চার ঘন্টার পথ।

কপালের ওপর বিশ্বাস নেই শচীনের। কপালে ভর দিয়ে অনেক কাল কাটল। লাভ হল লবডঙ্কা। তবে খবর পাকা হলে, কোনো রসের নাগর রসিকতা না করে থাকলে, তার একজন মাসির খবর পাওয়া গেছে। শচীনের তিন কুলে কেউ আছে বলে সে জানত না। হঠাৎ ক-দিন আগে একখানা তোবড়ানো পোস্টকার্ড এসে হাজির। হাতের লেখা এমন জড়ানো যে সেটা হাবশি ভাষাও হতে পারে। রায়বাড়ির পরমেশ তার আতসকাচ দিয়ে অতিকষ্টে পাঠোদ্ধার করেছিল। খুদে খুদে অক্ষরে চৈতলপাড়ার পুঁটুমাসি জানিয়েছে যে, সে শচীনের এক মাসিই বটে। শচীনের সঙ্গে তার ভারি একটা দরকার। চিঠিতে কথাটা লেখা যায় না। শচীন যেন কাজ-কারবার ফেলে এখনই পত্রপাঠ চৈতলপাড়া চলে আসে। মাইমগঞ্জের মোড়ে নেমে নারান হালদারের নাম বললেই যে-কেউ বাড়ি দেখিয়ে দেবে।

মোদ্দা কথাটা হল এই। তা এ চিঠির ওপর কতটা ভরসা করা যায় কে জানে! পরমেশ বলল, চিঠির ভাবখানা যা বুজেছি মাসি তোকে সম্পত্তি দিতে চায়। বোধহয় সন্তান-টন্তান নেই। যা দুর্গা বলে ঝুলে পড়।

কথা তা নয়। পুঁটুমাসি তার আপনার মাসি হলে এক-আধবার কি মায়ের মুখে নামটা শুনত না শচীন? চিঠির ভাবখানা যে, একেবারে মায়ের সাক্ষাৎ সহোদরা। ধন্ধটা এখানেই লাগছে শচীনের।

রোদটা আরও তেজালো হলে শচীন ঘরে এসে তার মাচানটায় শুয়ে একটু ঠ্যাং নাচাল। ভাবগতিক কেমন যেন ঠেকছে তার! ভালো, না মন্দ? পোস্টকার্ডখানা টিনের তোরঙ্গে ছিল। উঠে সেটা বের করে ফের আলোয় ধরে পড়ল শচীন। '...তুমি আমাকে চিনিবে না। আমি তোমার মাসি হই। সম্পর্ক খুবই নিকট।'

ঘরের বেড়ায় অনেক ভোগলা। সারাবার সাধ্য শচীনের নেই। শেয়াল কুকুর ইচ্ছে করলেই ঢুকে পড়তে পারে। ঢোকেও। প্রায়ই বাইরে ঘুরতে হয় শচীনকে। এসে মাঝে মাঝেই দেখে দু-তিনটে নেড়ি কুত্তা দিব্যি জমিয়ে বসে গেচে। বাচ্চাও দেয়। পাখি বাসা

করে বসবাস করছে বহুকাল ধরে। বর্ষাকালে টিনের অজস্র ফুটো দিয়ে জল পড়ে, শীতকালে উত্তুরে হাওয়া বিনা বাধায় হা-হা করে বয়ে যায়। গতবারও ঝড়ে চালের টিন উড়ে গিয়েছিল। শচীন কুড়িয়ে এনে ফের লাগায়। তো এই হল শচীনের ঘর। এর জন্য মায়া করে লাভ কী?

তার বাক্স গোছানো হয়ে গেছে। থালা, গেলাস, আর ঘটি চটের ব্যাগে ঢুকেছে। বিছানা বলতে একখানা শতরঞ্চি, ছেঁড়া বেডকভার আর তেলচিটে শক্ত বালিশখানা। তা সেটা এখনও দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়নি। হয়ে যাবে।

ও শচীন, আছিস নাকি?

শচীন ব্যাজার মুখে উঠল। এ হল নরেনকাকা। ধারে লটারির টিকিট নিত একসময়ে। এখনও চোদ্দ টাকা শচীন পায়। নরেনকাকা। লোকটা সুবিধের নয় মোটেই। ধান্দাবাজ এক নম্বরের।

মনে যাই থাক, মুখে আদিখ্যেতা দেখাতেই হয়। শচীন উঠল। মুখে একটু হাসি খেলিয়ে বলল, আসুন কাকা, খবর সব ভালো?

নরেন সাঁপুই ঢুকে চারদিকটা চেয়ে বলল, অধিকারী তাহলে মিথ্যে বলেনি! তুই তাহলে চৈতলপাড়ায় যাচ্ছিস। কেন বাপ, এ দিকটায় কি সুবিধে হচ্ছিল না? আমরা পাঁচজন তো ছিলুম পেছনে।

শচীন খুব লজ্জার ভাব দেখিয়ে জিব কেটে বলে, আপনারাও রইলেন, আমিও রইলুম। চৈতলপাড়া তো মোটে এক বেলার পথ। ঘুরেও আসা হবে একটু।

মাসির সম্পত্তি পাচ্ছিস যে শুনেছি। তা কিরকম সম্পত্তি? বেশ একটা দাগে মারলি নাকি কিস্তিটা!

গিয়ে দেখতে হবে ব্যাপারখানা কী।

চিঠিতে কী লিখেছে? একটু ইশারা তো থাকবে।

শেষ দিকটায় লেখা বড্ড জড়ানো, পড়াই যায়নি। তবে সম্পত্তির কথা কী যেন আছে একটু।

বাঃ, এ তো তোফা হল রে। বাকি জীবনটা পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে বসে খাবি। অধিকারীও বলছিল বটে, দোতলা পাকা বাড়ি, বত্রিশ বিঘে ধানজমি, চালের কল, আমবাগান, তেজারতি কারবার, নগদ পঞ্চাশ হাজার আর সত্তর ভরি সোনা।

ওই যাঃ হাতিশালে হাতি আর ময়ূর সিংহাসনটার কথা ভুলেই মেরে দিয়েছে তাহলে! আর হাওয়াগাড়ি!

নরেনকাকা মুখখানা তোম্বা করে বলে, তা ওর কথা কি ধরি নাকি? গর্ভস্রাব আর কাকে বলে! বরাবর অধিকারীর কথার ন' আনা বাদ দিয়ে সাত আনা ধরি। আজই রওনা হচ্ছিস বুঝি! দুর্গা দুর্গা। তাহলে বাড়ির বিলিব্যবস্থা কী হচ্ছে?

হচ্ছে না কাকা। বাড়ি পড়ে থাকবে।

লাভ কী? পিছন দিকটায় তোর দু বিঘে জমি ছিল না?

সে কবে বেচে খেয়েছি। পশুপতি ওদিকে গোয়ালঘর তুললো যে!

অ। তা বাড়িখানার তো ভারী দুর্দশা করে রেখেছিস বাপ।

অনেকদিন ধরেই দুর্দশা চলছে কাকা।

টিন কখানা আর খুঁটিগুলো যা কিছু কাজে লাগতে পারে। এমনিতেও খুলে নেবে লোকে।

দশটা টাকা দেবো খন--

বেচবো না কাকা। চৈতলপাড়ায় কী হয় না হয় কে জানে। ঘর আমার যেমন আছে থাক।

থাক। তবে বন্দোবস্তটা আমার সঙ্গেই করিস, বলে রাখলুম। যদি এদিকটায় তোর সুবিধে হয়েই যায়, চৈতলপাড়াতেই যদি চেপে বসিস তাহলে একটু জানাস বাপ।

সে পরে ভেবে দেখা যাবে।

তাল আর নারকোল গাছগুলোর কীরকম বন্দোবস্ত করলি?

যেমন আছে থাকবে। যার খুশি পেড়ে খাবে। এমনিতেই খায়, আমি তো আর বাড়িতে থাকি না, এধার সেধার ঘুরে বেড়াই পেটের ধান্দায়।

নরেন সাঁপুই যেন কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। গাঁ থেকে একটা লোক চলে যাচ্ছে, সুতরাং কিছু ধান্দা করা যায় কি না দেখতে এসেছিল। কিন্তু কোন দিকটায় সে সুবিধে হবে তা বুঝতে পারছে না। লোকটা সুবিধের নয় ঠিকই, তবে বোকা। বুদ্ধি না থাকলে খুব একটা ফেরেববাজও হওয়া যায় না।

নরেন সাঁপুই কয়েকবার ঢোঁক গিলে বলল, গোটা পাঁচেক টাকা হবে বাপ?

কাকা, আপনার কাছে আমি এখনও কিছু পাই।

সে কি আর মনে নেই রে। বড্ড ঠেকায় পড়ে গেলুম আজ। সামনে সংক্রান্তি।

সংক্রান্তিতে নরেনকাকার কোন মোচ্ছব কে জানে। একটা অজুহাত খাড়া করতে হয় বলে করা। বোকা লোক। নরেন সাঁপুইয়ের জন্য আজ হঠাৎ মায়া হল শচীনের। পুরো পাঁচটা টাকাই বের করে হাতে দিয়ে বলল, এ আর শোধ দিতে হবে না।

নরেন একটু হাঁ হয়ে গেল। সে চাউন্তি লোক। মানুষ দেখলেই চায়। তা বলে সবাই কি আর দেয়! দশজনের কাছে চাইলে একজন হয়তো দেয়। তাও পুরোটা নয়। নরেন সাঁপুইয়ের চাওয়ারও কোনো ঠিক নেই। কার কাছে কী চাইবে তাও আগে ঠিক করা থাকে না। কোনটা চাইবে তারও কিছু ঠিক নেই। নিশিকান্তর কাছে হয়তো পাঁচটা আলু চাইল, নীলমণির কাছ থেকে চাইল নারকেলের দড়ি, পটলের কাছ থেকে দোয়াতের খানিকটা কালি। খুব একটা কাজের জিনিস নয়, লাগেও না তার কাজে। তবু চাওয়ার অভ্যাসটা রাখে। অধিকাংশ সময়েই পায় না কিছু। আজ ঝড়াক করে পাঁচটা টাকা পেয়ে গিয়ে ভারি থতমত খেলো সে। টাকাটা ট্যাঁকে গুঁজে ফেললো চোখের পলকে। তার একটা মেয়ে আছে। বিন্দু। বাপকে খুব উস্তম-কুস্তম করে বকে এই স্বভাবের জন্য। তা বকুক। এভাবেও তো ঘরে কিছু আসে। যা আসে তা লক্ষ্মী। এই যে পাঁচটা টাকা চলে এলই--এ কি চাট্টিখানি কথা! কেমন হেসে হেসে চলে এল। গায়ে ঘামটুকু হল না।

নরেন সাঁপুই একটু দেঁতো হাসি হেসে বিদেয় হওয়ার পর বেলাটা একটু ঠাহর করে দেখল শচীন। একটু আগে ঠেসে পান্তা খেয়েছে। এবেলা আর খাওয়ার বায়নাক্কা নেই। চৈতলপাড়া পৌঁছোতে রাত হবে। তা হোক, তার আবার দিনই বা কি, রাতই বা কি? নারান হালদারের বাড়ি পৌঁছোতে পারলেই হল।

একটু ভয় ভয় করছে অবশ্য। ঠিক যেন বুঝে উঠতে পারছে না। এরকমটা হচ্ছে কেন? হঠাৎ একখানা পোস্ট কার্ড আসবার দরকারটাই বা কী ছিল?

খবরের কাগজখানা বোচনের বাপকে ফিরিয়ে দিতে হবে। বোচনের মা আবার ঠোঙা বানিয়ে বেচে। কাগজের খুব হিসেব। হাড়কেপ্পন লোক।

বিছানাটা ধীরেসুস্থে গুটিয়ে নারকোলের দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলল শচীন। একরত্তি একখানা জিনিস হল। দুনিয়ায় তার তৈজসপত্রের পরিমাণ কোথায় এসে ঠেকেছে দেখে শচীন আপনমনেই হাসল। অবস্থাটা খুবই খারাপ যাচ্ছে ইদানীং।

বাক্স-বিছানা নিয়ে হেলেদুলে বেরিয়ে পড়ল শচীন। তার কোনো দুঃখ হচ্ছে না, কষ্ট হচ্ছে না, মন কেমন করছে না। লোকের নানা রকম শেকড়বাকড় থাকে, আঁকুসি থাকে, বাড়ি ছেড়ে যেতে কষ্ট হয়, গাঁ ছেড়ে যেতে কষ্ট হয়। শচীনের সেরকমধারা কিছু হচ্ছেই না মোটে। তার কাছে পৈলেনও যা, চৈতলপাড়াও তাই।

শীতলাবাড়িতে একটা পেন্নাম অবশ্য ঠুকল শচীন, দেখো মা, যেন বেঘোরে না পড়ি। একটা আধুলি প্রণামীও ঠুকে দিল। কম হল কি? কিন্তু আর দিতে সাহস হল না। পকেটে মোটে এগারো টাকা চার আনা আছে বাসভাড়া বাদে। টাকাটা রাখা দরকার।

শীতলাবাড়ির পিছনে শ্রীপতির পুকুর ঘুরে গেলে উত্তরে বোচনদের বাড়ি। বেশ বাড়ি। পাকা দালান। সামনে একটা বাড়ি, মাঝখানে উঠোন ছেড়ে পিছনে আর একখানা। একটা মাঠকোঠাও আছে।

শচীনকে দেখে বোচনের মা কুলোঝাড়া থামিয়ে অবাক হয়ে বলল, এ কী রে, বাক্স টাক্স নিয়ে কোথায় চললি?

শচীন একটু লজ্জা পেল। মা মরে ইস্তক আর কারও কাছে না হোক বোচনের মায়ের কাছে তার একটু কদর ছিল। অনেক উপোসের দিনে এই মাসি তাকে হেঁকে ভাত দিয়েছে। পালে পার্বণে নেমন্তন্ন ছিল বাঁধা, বদলে শচীন মাঝে মাঝে গতরে খেটে দিয়ে ঋণ শোধ করে বটে, কিন্তু সবটা তো শোধ হয় না। মায়ার একটা দেনা আছে।

শচীন বলল, এই যাচ্ছি একটু চৈতলপাড়া। এক মাসি খোঁজ করেছে।

তা যাবি। কিন্তু বাক্স প্যাঁটরা নিয়ে কেন? আর মাসিই বা হঠাৎ উদয় হল কোত্থেকে?

তোর মায়ের তো নাড়ীনক্ষত্র জানি। আমার বাড়িতে ঢেঁকি কুট ধান ভানত খই মুড়ি ভাজত, আর মনের প্রাণের কত কথা বলত। তোর মাসি এল কোত্থেকে বল তো!

সেটা তো আমিও জানি না মাসি। একটা চিঠি এসেছে।

কী লিখেছে চিঠিতে?

বিষয়সম্পত্তির কথা কিছু আছে। ভালো বোঝা যাচ্ছে না। সে কী রে? বোঝা যাচ্ছে না মানেটা আবার কী?

মনে হচ্ছে চিঠিতে ভাঙতে চাইছে না।

বোস ওখানে। একটু কথা বলি। ও বোচন, দে তো শচীনকে এক ঘটি জল। দুটি মোয়া দিস।

শচীন বারণ করল না। অনেক দূরের পথ। ততক্ষণে পেটের পান্তা জল হয়ে যাবে। যা বোঝাই করে নেয়া যায় তাই কাজে লাগবে। গরিবের পেটও বটে, মেলা জায়গা, কত যে আঁটে তার ঠিক নেই বাবা।

বোচন এসে ছোটো ধামায় কয়েকটা মোয়া আর কুয়োর ঠান্ডা জল রেখে গেল।

মাসি খানিকক্ষণ কুলো আপসে সব সরিয়ে রেখে মোড়া পেতে সামনে এসে বসল। ফর্সা মুখে ঘাম জমেছে টসটসে। মোটা মানুষের গ্রীষ্মকালে ভারি কষ্ট।

মাসির বিষয়সম্পত্তি পাবি নাকি?

সেরকমই মনে হচ্ছে। তবে ঠিক বুঝতে পারছি না।

মাসি আঁচল দিয়ে ঘাম মুছে হাতপাখা নাড়তে নাড়তে বলে, চিরকালের মতো যাচ্ছিস নাকি?

না। একটু বুঝে আসি গিয়ে।

গাঁ ছেড়ে যাবি, তা অমন হুট করে যেতে আছে? মাতব্বর মুরুব্বিদের সঙ্গে শলাপরামর্শ করতে হয়, পাঁচজনকে জানাতে হয়, তবে না! ও কীরকম অলুক্ষুণে যাওয়া তোর!

শচীন মোয়া খেতে খেতে বলল, মাতব্বরেরা তো খোঁজখবরও নেয় না। পৈলেনে আর আমার আছেটা কে! এই আপনিই যা একটু ডাকখোঁজ করেন।

তা আমাকেও তো বলতে পারতিস একবার। তোকে নিয়ে যে কত কী ভেবে রেখেছিলুম!

শচীন একটু অবাক হল, আমাকে নিয়ে আবার ভাবনার কী মাসি? আমি নিজেই তো ভাবি না কিছু।

সে আছে রে। তোর মেসোকেও তো ক'দিন ধরে জ্বালিয়ে মারছি, ওগো, আমাদের শচীনের জন্য একটু ভাবো। তা তার মাথায় নানা ফিকির। তার কি আর সময় আছে আমার কথা কানে তোলার?

শচীন লজ্জায় অধোবদন হল। তার জন্য যে কেউ ভাবে, এটা তার কাছে বড়ো নতুন কথা।

ঘাড়গলার ঘাম মুছে মাসি বলল, কথা আরও আছে।

কী কথা মাসি?

তোকে সেকথা বলি কী করে? তোর মা হলে কথাটা পাড়তে সুবিধে হত। তা সে আবাগীর বেটি কোন সকালে ভবনদী পেরিয়ে গেল। এখন ছাই বলিই বা কাকে! এদিকে তুই নিজেও আবার বিবাগী হচ্ছিস।

কথাটা আমার জানতে নেই বুঝি?

জেনে তো বড্ড লায়েক হবি বাছা। তবে অনেকদিন ধরে কথাটা ভেবে রেখেছিলুম। বোচন ডাগরটি হওয়ার পর থেকেই। কিন্তু আমার ভাবায় হবেটা কী? সংসারে পেষাই হচ্ছি

দিনরাত, আমার ভাবাভাবি সব ভেতরে ফেঁপে ওঠে। বোচনের বাপ কোন কথাটা কানে তুলছে আমার বল তো!

না, মাসি ততটা ভেঙে বলেননি। তবু শচীন একেবারে পা থেকে মাথা অবধি শিউরে উঠল।

বাপ রে! ঠিক শুনছে তো সে! কথার ভিতরকার মানে ধরতে পারছে তো! বোচন ডাগর হওয়ার পর থেকে মাসির মতলবখানা কোন দিকে যাচ্ছে?

মোয়া এমন জিনিস যে, হুড়োহুড়ি করে খাওয়া যায় না। অথচ ধামায় এখনো চার চারটে পড়ে আছে। হাতছিপ্পু করে মোয়া কটা তুলে পকেটে পুরে নিল শচীন। মাসি খুদকুঁড়ো জড়ো করছে নীচু হয়ে। এই সুযোগ। ভেতরটা বড্ড শুকিয়ে উঠল হঠাৎ। শচীন জলের ঘটিটা গলায় প্রায় উপুড় করে ধরে সবটা ঢকঢক করে খেয়ে নিল।

উঠলুম মাসি।

উঠবি মানে?

দেড়টার বাসটা ধরতে হবে।

চৈতলপাড়া বললি তো!

হ্যাঁ।

কত দূর এখান থেকে?

ঘন্টা ছয়েকের পথ।

ও বাবা! তাহলে তো বেশ দূর!

তা আছে।

কবে আসবি আবার?

তা এখনই বলা যাচ্ছে না।

মাসি কেমন যেন কাহিল হতাশ মুখে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল। শচীন একটা পেন্নাম ঠুকে উঠে পড়ল।

আজ যা রোদ উঠেছে, একেবারে চাষাড়ে রোদ। আকাশে একটা পিঙলে ভাব। চারদিকটা যেন ঝিমঝিম করছে তেতে। চৈতলপাড়া নাকি এর চেয়েও শুখো। তা অধিকারীদাদা আগডুম বাগডুম অনেক কথা বলে। তার কথার কিছু ঠিক নেই।

শচীন গুটি গুটি বাস রাস্তার কদমতলার ছায়ায় এসে দাঁড়াল। ছায়ায় দাঁড়িয়ে লাভ হল না কিছু। সান্ত্বনা হল। বাক্সটা পেতে বসল শচীন। দেড়টার বাস আসতে এখনও ঢের দেরি। এই গরমের দুপুরে আর কোনো প্যাসেঞ্জার নেই। শচীন বসে বসে ভাবতে লাগল।

বোচন! কোনোদিন বোচনের কথা তেমন করে ভাবেনি শচীন, মুখটাও দেখেনি মন দিয়ে। কেমন মেয়েটা? শচীন চোখ বুজে ভাববার চেষ্টা করল। ভালো করে মনে পড়ল না। অথচ একটু আগে বোচন তাকে মোয়া আর জলের ঘটি দিয়ে গেছে। তবে মনে পড়ছে না কেন?

না। ভালো করে ভাবতে হবে।

মুশকিল হল, যতই ভাবতে যায় ততই পিছলে যায় ব্যাপারটা। জ্বালাতন আর কাকে বলে!

ওপাশে খয়েরপুরের বাস ধরতে একটা পরিবার এসে জড়ো হয়েছে। স্বামী-স্ত্রী আর গোটাকয় বাচ্চা। চাষিবাসি লোক। গাছতলায় চেপে বসে আছে। লোকটা বিড়ি ধরিয়েছে, বউটা লোকের বাচ্চাকে ওরই মধ্যে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছে। দৃশ্যটা আজ তেমন খারাপ লাগল না শচীনের। হাঁ করে দেখল। কয়েকটা মানুষ মিলে মোয়া বেঁধেছে যেন। চিটটা সে কীসের সেটাই বাইরে থেকে বোঝা যায় না।

হ্যাঁ, বোচনের কথা। কী যেন বলছিল মাসি! ঠিক শুনেছে তো! মানেটা ঠিক ঠিক ধরতে পারছে তো! এই গাঁয়ের ও এই একটিমাত্র মানুষ--অর্থাৎ বোচনের মা তার যা হোক একটু খোঁজখবর যে করত, তারও তো একটা মানে আছে। এমনি এমনি তো করত না! শচীন ফের ছোখ বুঝলো। বোচনের মুখখানা কেমন? নাক, চোখ, ছোঁট, চুল--কিছু একটা তো

মনে পড়বে! রোজ দেখছে, তবু মাথাটা একদম ফর্সা শচীনের। কিছুই মনে আসছে না। বোধহয় এই গরমে আর রোদেই এমনধারা হচ্ছে।

অনেকক্ষণ বাদে একটা কথা শচীনের মনে পড়ল। বোচন বছরটাক হল ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরেছে। আর নিমতলায় আজকাল আর তাকে এক্কাদোক্কা খেলতে দেখা যায় না। খয়েরপুরের দিক থেকে একটা বিকট হর্নের শব্দ এল। বাস আসছে। বিশাল ধুলো উড়ছে বাসের পিছনে। একেবারে গন্ধমাদন।

শচীন উঠল। বড্ড গরম। শেষবারের মতো বোচনের মুখটা মনে করার খুব চেষ্টা করল সে। এত চেষ্টা করল যে, বাসটা সামনে এসে দাঁড়ানোর পর একমুঠো ধুলো মুখে নিয়ে সে চেতন হল। দাঁত কিচমিচ করছে ধুলোয়।

কন্ডাক্টর চেঁচাচ্ছে, পুঁটিমারি, হাশিমের চর, বাগদাখাল, জিনপুর, নবীননগর...

শচীন তিনপা পিছিয়ে এল। আর প্যাসেঞ্জার নেই বলে কন্ডাক্টর আর দিকেই চেয়ে চেঁচাচ্ছে।

শচীনেরও ওঠাই উচিত। তার কারণ এ বাস ছাড়লে আজ আর পৌঁছানোর আশা নেই। তবে কিছুতেই সে হাত বাড়িয়ে হ্যান্ডেলটা ধরে পা-দানিতে পা দিয়ে উঠে পড়ার মতো সহজ কাজটাও করে উঠতে পারল না।

উঠবে তো, না কি! কন্ডাক্টর এবার বলেই ফেলল।

শচীন কাঁচুমাচু হয়ে গেল। বলল, যেতুম তো ভাই, কিন্তু একটা জিনিস ফেলে এসেছি। অ, তাই বলো! বলে কন্ডাক্টর ঘন্টি মেরে দিল।

নাঃ, ভারি লজ্জা করছে শচীনের। ওপাশ থেকে চাষি আর চাষি-বউও তাকে দেখছে। শচীন আর দেরি করল না। জিনিসপত্র নিয়ে উঠে পড়ল। লোকে ঠিক বুঝবে না তার সমস্যাটা কোথায়। ওই যে বোচনকে কিছুতেই মনে করতে পারল না, এ লক্ষণটা শচীনের ভালো ঠেকছে না। এই গুরুতর স্মৃতিভ্রংশ অবস্থায় সে যায়ই বা কী করে?

আর কান্ডখানাই বা কী? মেয়েটার মুখটা মনে করতে পারল নাই বা কেন সে?

গুটি গুটি ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল শচীন। একটা কুকুর ঢুকে পড়েছিল, তাকে দেখে বেরিয়ে গেল লজ্জা পেয়ে। জিনিসগুলো যেমন ছিল তেমনি আবার রাখল শচীন। বিছানাটাও পাতল। তারপর শুয়ে শুয়ে ঠ্যাং নাচাতে নাচাতে ভাবল, আজ বিকেলে জলের ঘাটে গিয়ে মেয়েটাকে ভালো করে দেখতে হবে।

আজ আর যাওয়া হল না শচীনের। কালও হবে কি না কে জানে।

পাত্রী

কে ও? শিবাই নাকি রে?

যে আজ্ঞে। শিবাই-ই বটি।

তা পাত্রী পছন্দ হল?

না জামাইদা, এটাও লাগসই নয়। দাঁত উঁচু।

দাঁত উঁচু? তা কত উঁচু? মুখ বন্ধ হয় না?

তা হয়।

আজকাল তো শুনি উঁচু দাঁতের বেশ কদর হয়েছে। নাকি?

ফিলম আর সিরিয়ালে নাকি উঁচু দাঁতের বেশ কদর।

আপনি তো ওসব দেখেন টেখেন না, তবে জানলেন কীভাবে?

দেখার সময় কোথায় যে দেখব? তবে ভচ্চার্য ঠাকুরমশাই বলছিলেন বটে, অঘোর হে, আজকাল উঁচু দাঁতের ছড়াছড়ি।

ঠাকুরমশাই? নিমুবাবুর বাড়িতে ঠাকুরমশাইকে দেখেছি বটে বারকয়েক, টিভির সামনে বসে ঘাড় কাত করে রোজ সন্ধেবেলা তোফা ঘুম দেন।

ফাঁকে ফাঁকে দেখেন আর কী। তা ঘরদোর কেমন দেখলি?

আজ্ঞে ওসব ভালো। পাকা একতলা। বাড়িতে টিউবওয়েল। গুনে দেখলাম, বাড়ির হাতায় অন্তত শ' দেড়েক সুপুরি গাছ। দুটো পুকুর। আম বাগান। জমি-জিরেত।

লাগিয়ে দিলে পারতি।

দাঁতে আটকায় যে! না হলে লাগিয়েই দিতাম।

মেয়ের যেমন দাঁত উঁচু, তেমনি তোর আবার নাক উঁচু। বলি দামড়া, বয়সটা খেয়াল আছে? ছত্রিশ পেরোলি কিন্তু!

আমার আর বিয়ে হওয়ার নয়। বিয়ে না হয় না হোক, যেমন তেমন একটা ধরে আনলে আমার হবে না।

ভাবিয়ে তুললি। আয়, বারান্দার চৌকিতে বসে একটু ভাবি। জ্যোৎস্নাটা খুব ফিনকি দিয়েছে আজ। তোর সঙ্গে গিয়েছিল কে?

গদাই, পবন আর মেশোমশাই।

তারা কী বলে?

মেসোমশাইয়ের কথা আর কবেন না। যাকে দেখে তাকেই পছন্দ। পবন আর গদাই বলল, চলবে না।

তাহলে এগারো নম্বরেরটাও আউট

যে আজ্ঞে।

দশ নম্বরটার যেন কী দোষ ছিল?

সেটা তো আপনিই বাতিল করলেন, মনে নাই?

নাকি? ওঃ হ্যাঁ, মনে পড়েছে। পাত্রীর ভৌম দোষ ছিল। বড়ো মুশকিলেই পড়া গেল রে? তোর মা, বাপ, দিদি সবাই যে তোর বিয়ের জন্য বড়ো পাগল হয়ে পড়েছে। জুৎসই পাত্রীই পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ রাস্তায় ঘাটে কত সুন্দরী মেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কী ব্যাপার বল তো

দেখেন জামাইদাদা, আমার মেয়েছেলে দেখার চোখও নাই, রোখও নাই। আমি কাজ-কারবার নিয়ে ঝঞ্ঝাটে জড়িয়ে আছি। আপনারা সবাই ধরে পাকড়ে পড়লেন বলে ঘাড় কাত করতে হয়েছে। বলি কী, এবার আমাকে রেহাই দেন।

কোস কিরে ডাকাত তোর বিয়ে দিতে না পারলে যে আমার অন্নজল বন্ধ হবে।

ললাটের লিখন বলেও তো একটা কথা আছে আমি ভেবে দেখলাম এইভাবে মেয়ে দেখে বেড়ানোটাও ঠিক হচ্ছে না। মেয়েগুলোরও তো একরকম অপমানই হচ্ছে এটাও ঠিক না। আর এই বিয়ে-বিয়ে হুল্লোড়ে আমার কাজ-কারবারেও লোকসান হচ্ছে। বিষাণগড়ের ইটঁ ভাঁটিতে গণ্ডগোল, ন্যাজাতের কারখানার ওভারহল করা দরকার, বৈদ্যপুরের বিস্তর পাওনা উসুল করা পড়ে আছে।

তা বললে কি হয় রে পাগল? তোর বুড়ো বাপ-মা যে তোর ভরসাতেই বেঁচে আছে। কাজ-কারবারের জন্য ভয় নেই। ও দুদিনেই সামলে নিতে পারবি। আর ক'টা দিন থেকে যা। শনিবারে বিষ্ণুপুরের মেয়েটাকে দেখে নিলেই হয়।

ও আপনারা দেখেন।

শুনেছি এ মেয়েটা বড়োই ভালো। দেখতে শুনতে সুন্দর, লেখাপড়া জানে, তার ওপর নাকি ভারি বুদ্ধিমতী। বুদ্ধিমতী মেয়ে পাওয়া ভাগ্যের কথা।

আমাকে ছেড়ে দেন। কাজ-কারবার লাটে উঠবে এরকম চলতে থাকলে।

একটা কথা কবি?

কী কথা?

চণ্ডীপুরের মেয়েটাকে তোর পছন্দ হল না কেন?

সে তো বলেই দিয়েছি।

তেমন ভেঙে বলিসনি। আরও একটা কথা।

বলেন।

তোর মেসোমশাই দিন কয়েক আগে আমাকে বলেন, শিবাই মেয়ে পছন্দ করবে কী, ও তো কোনো মেয়ের দিকে তাকিয়েই দেখে না। হয় মাথা নীচু করে বসে থাকে, নইলে জানালার বাইরে তাকিয়ে মাটঘাট, গাছপালা আর গোরু-ছাগল দেখে। তাই নাকি?

কথটা একেবারে মিথ্যেও নয়।

বলিস কী? পাত্রী ফেলে গোরু দেখিস, এ তোর কেমন স্বভাব?

মায়া-মতিভ্রমকে যে বড়ো ভয় পাই দাদা।

বুঝিয়ে বল।

খিজিরগঞ্জের লালকমলকে মনে পড়ে? ওই যার কবিরাজি ওষুধের কারবার

তা মনে থাকবে না কেন? লালকমলের বাতের মালিশের খুব নাম।

সে-ই। লালকমল হরিশ্চন্দ্রপুরে নিজের জন্য পাত্রী দেখতে গিয়ে প্রথম দর্শনেই কাত হয়ে পড়ল। তেমন মেয়ে নাকি ভূ-ভারতে নেই। বিয়ের পর রংটং উঠে যাওয়ার পর বউয়ের চেহারা যা বেরলো তা কহতব্য নয়। সে নয় চেহারা ভগবানের দান বলে সে কথা বাদ দিচ্ছি। কিন্তু মেয়েটার চোখে নাকি মায়াদয়া ঝরে পড়ছিল, ঠোঁটে করুণার হাসি। বিয়ের পর আর সেসব খুঁজে পাওয়া গেল না। বজ্জাত মেয়েছেলেটা এখন লালকমলের ঘাড়ে মুষলের মতো চেপে বসে তার প্রাণ ছিবড়ে করে ছাড়ছে। দেখা হলেই লালু বড়ো কান্নাকাটি করে। ওইটেই বড়ো ভয় পাই। কার দিকে তাকিয়ে মতিভ্রম হয় বলা তো যায় না। তাই তাকানোর বখেরায় আর নেই।

এ তো বড়ো গণ্ডগোলের কথা রে শিবাই না তাকিয়ে বুঝবি কী করে কার দাঁত উঁচু, কে ট্যারা, কে কালো বা কুচ্ছিৎ

তাকানোর দরকার কী? আর সবাই তো ড্যাব ড্যাব করে দেখছে। তাই তো বলছি, আমার দেখা না-দেখা সমান। আপনারা ধরেবেঁধে জুতে দিলে কিছু করার থাকবে না। কিন্তু বউ যদি বাড়িতে অশান্তি করে তবে আপনাদের দায়িত্ব।

হুঁ। বড়ো ভাবনায় ফেললি দেখছি মনে হচ্ছে তোর বিয়ের মতলব নেই।

সে কথা তো কেউ কানেই তুলছে না। আমি তো বলেই আসছি যে, সংসারধর্ম আমার জন্য না।

তাই বললে কি হয় রে পাগলা তোর বাবা-মা, দিদিরা যে আমাকে উস্তম-কুস্তম করে ছাড়ছে বয়সের ছেলে, বিয়ে না দিলে যে বুড়ো বয়সে আধপাগলা হয়ে ঘুরে বেড়াবে। তা বিয়েতেই বা তোর এত আপত্তি হচ্ছে কেন? ফকির-বৈরাগী-কাঙাল কে না বিয়ে বসেছে বল

তো। বয়োধর্ম বলেও তো কথা আছে তার ওপর রোজগারপাতি ঠাকুরের ইচ্ছায় তো মন্দ করছিস না। কয়েক লাখ টাকার কারবার। তা এ সবেরই বা কী বিলিব্যবস্থা হবে বল তো তোরটা খাবে কে?

দশ ভূতে লুটে খাবে। তাই বা মন্দ কী? আমার কাজটুকু আমি করে যাচ্ছি, ভবিষ্যতে কী হবে তা নিয়ে মাথা ঘামানোর কী আছে

আমার সঙ্গে যখন তোর দিদির বিয়ে হয় তখন তুই কতটুকুন ছিলি, মনে আছে? মাত্র পাঁচ বছর বয়স তখন তোর। সেই থেকে তোকে এত বড়োটি হতে দেখলাম। কিন্তু তোর মতিগতি যে ভালো বুঝতে পারি, তা নয়। সব কথা খোলসা করে বলিসও না। স্বভাবচাপা হলে অন্য সকলের মুশকিল হয়।

আমার মতিগতি কিন্তু জটিল-কুটিল না। আসলে আমি বিয়ে ব্যাপারটায় তেমন আগ্রহ বোধ করি না। কাজ-কারবার নিয়ে মেতে থাকতে ভালোবাসি।

দাঁড়া। একটা কথা মনে পড়ল হঠাৎ।

কী কথা?

শীতলকুচিতে তোর একটা ঠেক ছিল না?

ছিল। পানের বরজ করে বড়োলোক হওয়ার বাই চেপেছিল মাথায়।

হ্যাঁ। বছর দুই চেষ্টাও করলি।

ওসব পুরনো কথা তুলে কী হবে?

তখন কানাঘুষো শুনেছিলাম, মহীতোষ রায় নামে এক ভদ্রলোকের মেয়ের সঙ্গে তোর নাকি একটা খটামটি লেগেছিলো

ঠিকই শুনেছিলেন।

ব্যাপারটা কী খুলে বলবি?

হঠাৎ সেই বৃত্তান্ত শুনতে চান কেন?

সেই মেয়েটার সঙ্গে তোর ঝগড়াটা কীসের?

ও বাদ দেন। মেয়েমানুষদের সঙ্গে ঝগড়ায় গেলে মুশকিল। আমি তেমন রোখাচোখা মানুষও তো না।

ঝগড়াটা কী নিয়ে?

সে তো চুকেবুকে গেছে।

মনে করে দেখ তো, মেয়েটার নাম কি মাধবী রায়?

হ্যাঁ। কিন্তু আপনাকে কে বলল? মাধবীর নাম তো আপনার জানার কথাই নয়।

শীতলকুচির লক্ষ্মী ভাণ্ডার তো আমার কাছ থেকেই মাল নেয়।

তাই নাকি?

আমাকে মাসে একবার-দুবার যেতেই হয়। গোরাচাঁদ সিংহ রায় শীতলকুচির মস্ত মহাজন। লক্ষ্মী ভাণ্ডারের মালিক।

চিনি। আমি যার কাছ থেকে পানের বরজ কিনেছিলাম সেই মহেশ রায়ের ভায়রাভাই হল গোরাচাঁদ। লক্ষ্মী ভাণ্ডারের তখন এমন ফলাও অবস্থা ছিল না।

তা কথায় কথায় গোরাচাঁদকে বলেছিলাম তোর কথা। তখন গোরাই বলল তুই মাধবীর সঙ্গে কী একটা গণ্ডগোলে শীতলকুচি ছেড়ে চলে এসেছিলি। গণ্ডগোলটা কীসের তা অবশ্য সে বলতে পারল না।

বলার মতো কিছু নয়। তখন খুব বোকা ছিলাম তো, অভিজ্ঞতাও হয়নি। তাই অপমানটা হজম করে চলে আসতে হয়। তবে ওসব আমি তো আর মনে রাখিনি। যা হয়ে গেছে তা নিয়ে ভেবে কী হবে বলুন

ঝগড়াটা কী নিয়ে?

শুনলে হাসবেন।

বলেই দেখ না।

বলতে বাধো বাধো ঠেকে। শত হলেও আপনি গুরুজন। ওসব কথা বলতে গেলে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরোবে।

তোকে আমি সাঁতার কাটতে শিখিয়েছি, সাইকেলে চড়তে শিখিয়েছি, আমার কাঁধেও চড়েছিস অনেক। আমার কাছে তোর লজ্জা কীসের? বয়সকালে যদি কিছু করেও ফেলে থাকিস সেটা বয়সের ধর্ম। সকলেরই একটু-আধটু বেপরোয়া ঘটনা ঘটে।

শীতলকুচিতে আমি একটু কুসঙ্গে পড়ে যাই। সন্ন্যাসীচরণ প্রতিহারের বাড়িতে একখানা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকি। প্রথম চোটেই পানের বরজ থেকে বেশ কয়েক হাজার টাকা নাফা হয়েছিল। বয়স কম, হাতে খোলামকুচির মতো টাকা, বুঝতেই পারেন।

তা পারি।

কয়েকজন মোসাহেব বন্ধু জুটে গেল। তারা আমাকে মদটদ খাওয়াত। আমারও ফিকে মতো নেশার রং ধরে গেল। রোজই সন্ধের পর আমার ঘরে পাঁচ-সাতজন জুটে যেত। তাদের মধ্যে একজন ছিল অবনী ঘোষ। অবনীর চেহারা ভালো ছিল, পেটে বিদ্যেও ছিল, আবার উড়নচণ্ডীও ছিল। তবে সে একটু আলাদা রকমের ছিল, অন্যদের মতো আমার মোসাহেবি করত না। কিন্তু আমার পয়সায় নিয়মিত মদ খেত, কারণ তার বিশেষ পয়সা ছিল না। গণ্ডগোলটা এই অবনীকে নিয়েই।

তাই নাকি?

মাধবীর সঙ্গে নাকি অবনীর বিয়ের সব ঠিকঠাক। সেসব আমার জানার কথাও তো নয়। কিন্তু একদিন সকালবেলায় বরজে রওনা হচ্ছি, হঠাৎ ফরসা, চোখে চশমাওলা একটা মেয়ে হাজির। সঙ্গে গাঁয়ের কয়েকজন মাতব্বর।

তাদের মধ্যে কি গোরাচাঁদও ছিল?

না। তবে তার বাবা প্রতাপচাঁদ ছিল। তারা এসেই আমাকে মাতাল, বদমাশ, দুশ্চরিত্র, আরও অনেক কথা বলে প্রচণ্ড চেঁচামেচি বাঁধিয়ে দিল।

মাধবীও কি গালাগাল করছিল?

তা তো বটেই। কী রাগ মেয়েটার। বলল আমি নাকি গাঁয়ের ছেলেদের নেশাভাঙ ধরাচ্ছি, ছেলেদের মরালিটি নষ্ট করে দিচ্ছি। আরও কত কী ভগবান জানেন, আমার মাতাল বন্ধুরা সবাই অভ্যস্ত মাতাল, আর তারাই আমাকে মদটদ খেতে শিখিয়ে নিয়ে তার পর আমার ঘাড় ভেঙে মদ খেত। কিন্তু আমার কথা কে আর কানে তোলে বলুন ফটিক দাস নামে একটা গুণ্ডা গোছের লোক তো আমাকে কয়েকটা চড়চাপড়ও মেরেছিল। ভয়ে আমি তখন জবুথবু।

তারপর কী হল?

কী আর হবে চারদিকে ভিড় জমে গেল। সবাই ছিছিক্কার করছে। একমাত্র সন্ন্যাসী প্রতিহারই আমার পক্ষ নিয়ে দু-চার কথা বলেছিল। সে মাধবীকেই বলল, অবনীকে শিববাবু মদ ধরিয়েছে এ কথা গাঁয়ের গাছও বিশ্বাস করবে না। অবনী তো চোদ্দো বছর বয়স থেকে মদ খায়, সবাই জানে। কিন্তু তার কথা কেউ কানেই তুলল না। আমার ওপর হুকুম জারি হল, গাঁ ছেড়ে চলে যেতে হবে।

তুই কবুল করলি?

না করে উপায়? আমি বাইরের লোক, উড়ে গিয়ে জুড়ে বসেছি, সহায় সম্বল তো কিছু নেই। তবে ঘটনায় একটা উপকার কিন্তু হল জামাইদা। সেদিন থেকে আজ অবধি আর মদ ছুঁইনি।

সব ঘটনারই ভালো-মন্দ দুটো দিক থাকে। বরজটা কি বিক্রি করলি নাকি?

না, ওখানেই তো আসল প্যাঁচ।

তার মানে?

খেটেখুটে ব্যাবসাটা দাঁড় করানোয় সকলেরই চোখ টাটাচ্ছিল। বরজটার দিকে তখন অনেকের নজর। ঘটনার পর মাসখানেক থেকে চেষ্টা করেছিলাম বিক্রির। কেউ কিনল না। বরং মাসখানেকের মাথায় আমাকে একরকম প্রাণের ভয় দেখিয়েই তাড়ানো হল। বরজটা, শুনেছি, মহীতোষ রায় দখল করেছিল। আমি তারপর আর ওসব নিয়ে মাথা ঘামাইনি।

শেষ অবধি অবনী ঘোষের সঙ্গে মাধবী রায়ের বিয়ে হয়েছিল কি না খবর নিসনি?

সে খবরে আর আমার দরকার কী বলুন? অবনী ঘোষ আমার জীবন থেকে মুছে গেছে। শীতলকুচিও। ঘেন্নায় আর ওমুখো কখনো হইনি।

মাধবীর তখন বয়স কত?

ষোলো-সতেরো হবে বোধহয়। মেয়েদের বয়সের কোনো আন্দাজ আমার নেই। সাত-আট বছর আগেকার কথা।

তোর কি মনে হয় ওই গণ্ডগোলটা আসলে ষড়যন্ত্র?

তা তো বটেই। যে একমাস ছিলাম তার পরেও, তখন আর অবনী ঘোষ বা অন্য মোসাহেবরা আমার ছায়াও মাড়ায়নি।

গোরাচাঁদ অবশ্য আমাকে এত ভেঙে কিছু বলেনি। তবে যে, শীতলকুচিতে মহীতোষ রায়ের প্রবল প্রতাপ। বিষয়-সম্পত্তিও মেলা।

হ্যাঁ। আমার কিছু করার ছিল না দাদা লাখ দুই-তিন টাকা জলে গেল, এই যা।

তোর কাছে দলিলপত্র আছে?

বরজের দলিল? তা আছে? তবে দলিল দিয়ে কিছু হওয়ার নয়। মামলা করলে সেই মামলা গড়াতে থাকবে, টাকা খরচ হবে জলের মতো, কাজের কাজ কিছুই হবে না। তাই আমি মামলা মোকদ্দমায় যাইনি। লোকসানটা সয়ে নিয়ে নতুন রোখ নিয়ে আবার ব্যাবসা করেছি।

তোর ব্যাবসার মাথা আছে সবাই জানে। কিন্তু তবু বরজটা এত সহজে বেহাত হতে না দিলেও পারতিস। ও বরজের এখন অনেক দাম।

কী করতে পারতাম বলুন? লাঠিবাজি করে তো সুবিধে হত না। বরং তাতে নিজেই হয়তো খুন হয়ে যেতাম।

তা বটে। তবে নবকেষ্ট অন্য কথা বলে।

কে নবকেষ্ট?

সন্ন্যাসী প্রতিহারের ছেলে।

আপনি তাকে পেলেন কোথায়?

কেন, সে তো এখন শীতলকুচির লক্ষ্মী ভাণ্ডারের ম্যানেজার। তাকে চিনব না কেন?

সে আপনাকে কী বলেছে?

তেমন গুহ্য কথা কিছু নয়। এই কথা বলছিল যে, মাধবীর সঙ্গে অবনী ঘোষের একটা বিয়ের কথা হয়েছিল বটে, তবে পাকা কোনো কথা নয়। অবনী ঘোষ যে খুব ভালো ছেলে নয়, এটা সবাই জানে। তবে তার বাবা কেতন ঘোষের কাছে মহীতোষের একটু দায় ছিল। কেতন ঘোষ এক সময়ে মহীতোষের দুঃসময়ে তাকে খুব সাহায্য করেছিল। একরকম তার দয়াতেই মহীতোষ ফের নিজের পায়ে দাঁড়ায়। সেই কৃতজ্ঞতা থেকেই এই বিয়ের কথা হয়। ধরেবেঁধে মেয়েটাকে হয়তো অবনীর সঙ্গেই বিয়ে দিতে হত। মেয়েটা কিন্তু রাজি ছিল না।

সে সব তো আমার জানার কথা নয়। তবে অবনী ঘোষ কিন্তু লোক খারাপ ছিল না। মদটদ খেত বটে কিন্তু আর তেমন কোনো দোষ দেখিনি। কুঁড়ে আর ভীতু ছিল, তা সে তো আমাদের অনেকেই।

শেষ অবধি মাধবী কিন্তু অবনীকে বিয়ে করেনি। অবনীর বিয়ে হয়েছে বৈকুণ্ঠপুরের সাধন দাসের মেয়ে বৈষ্ণবীর সঙ্গে।

ও বাবা, আপনি অনেক খবর রাখেন দেখছি

উড়ো কথা কানে এলে কী করব বল তবে তুই যে দেখছি অবনী ঘোষের বড়ো সাউকার হয়েছিস তোর বিপদের সময় তো অবনী ঘোষ তোর পাশে এসে দাঁড়ায়নি। তবে তাকে ভালো লোক বলে মনে করছিস কেন?

ওই তো বললাম, লোকটা ভীতু, কিন্তু খারাপ বললে অন্যায় হবে।

কেতন ঘোষ ছিল দাপুটে লোক। কিন্তু চরিত্র ভালো ছিল না। ছেলেরও সেরকমই হওয়ার কথা। কেতন নিজের বিষয়-সম্পত্তি ফুর্তি করে প্রায় উড়িয়েই দিয়েছিল। যা খুদকুঁড়ো ছিল

তা ফুঁকে দিয়েছে অবনী। তবে পেটে বিদ্যে ছিল বলে বরাতজোরে একটা চাকরি পেয়ে গেছে। সরকারি কেরানি।

আপনি অনেক খবর রাখেন। আমিই এত সব জানতাম না।

জানবার চেষ্টা করিসনি বলে জানিস না।

কিন্তু আপনিই বা এত সব খতেন নিয়েছেন কেন? শীতলকুচির বৃত্তান্ত তো তামাদি হয়ে গেছে।

তাই নাকি? কিন্তু আমার তো তা মনে হচ্ছে না রে শিবাই।

তবে আপনার মনে হচ্ছেটা কী?

এই যে তোর বিয়ের অনিচ্ছে, পাত্রী দেখতে গিয়ে জানালা দিয়ে গোরু-ছাগল দেখা, নানা রকম খুঁতখুঁতনি তুলে সম্বন্ধ নাকচ করে দেওয়া, এইসব দেখেই মনে একটু ধন্ধ এসেছিল। কিছু মনে করিস না বাপু, শীতলকুচিতে গিয়ে একটু খোঁড়াখুঁড়ি করতেই কিছু ঘটনা বেরিয়ে পড়ল। এত সব কোনোদিন ভেঙে তো বলিসনি। আমার মনে টিকটিক হচ্ছিলই।

দুর কী যে বলেন

ঠিকই বলি রে শিবাই। যতই ঢাকাচাপা দিস না কেন, আসল কথা বুঝতে আমার বাকি নেই।

রাত হতে চলল জামাইদা, এবার উঠি।

তাড়া কীসের? ভটভটিয়া আছে, তিন মাইল রাস্তা লহমায় পেরিয়ে যাবি। সবে ঝাঁপি খুলছি, সাপ বেরোক, তার আগেই পালালে কি চলে?

ঠিক আছে, বলেন।

তুই ভাবিস না যে, শুধু উড়ো খবরের ভরসায় তোকে এত কথা বলছি। কারো সঙ্গে কথা কইতে বাকি রাখিনি।

সর্বনাশ কার কার সঙ্গে কথা কইলেন?

অবনী ঘোষ, মহীতোষ, এমনকী মাধবীকেও বাদ রাখিনি।

আমাকে ডোবালেন যে।

অন্ধকার বলে বুঝতে পারছি না যে, তোর মুখখানা রাঙা হয়ে উঠল কি না।

এসব না করলেই ভালো করতেন। যা উড়েপুড়ে গেছে তাকে আর কুড়িয়ে এনে কী হবে?

উড়েপুড়েই যদি গিয়ে থাকে তাহলে গাঁয়ের একটা সুন্দরী মেয়ে তেইশ বছর বয়স অবধি বিয়ে না করে বসে আছে কেন বলবি?

বিয়ে করেনি সে তার ইচ্ছে। কাজটা ভালো করেনি সে। অবনী ঘোষের বাগদত্তা ছিল, তার উচিত ছিল তাকেই বিয়ে করা।

মনের সায় না থাকলেও? আর বাগদত্তাই বা কোন হিসেবে? মাধবীর তো মতামতই নেয়নি ওর বাপ। দুজনের ভাবসাবও ছিল না।

না থাকলে অবনী ঘোষের হয়ে ঝগড়া করতে এসেছিল কেন?

মোটেই অবনীর হয়ে ঝগড়া করেনি। সে চেয়েছিল যাতে তুই হুড়ো খেয়ে মদ ছাড়িস। তার মনের কথা তুই টের পাসনি, এত বোকা তুই নোস। ঝগড়া করতে এসেছিল তোর ভালোর জন্যই। তবে সিচুয়েশনটা যে ওরকম বিচ্ছিরি দাঁড়াবে তা বুঝতে পারেনি। সেইজন্য পরে কান্নাকাটি করেছিল খুব। এখনও কাঁদে।

তাতে আমার আর কিছু যায় আসে না দাদা।

যায় আসে বলেই না আজ অবধি তোর আর কোনো মেয়ে পছন্দ হল না। সত্যি কথ্য বল তো, মাধবী তোর সঙ্গে ঝগড়া করার আগে কতবার ভাব করতে চেয়েছিলো তুই তাকে পাত্তাই দিলি না।

পাত্তা দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে কেন? সে তো আমার চোখে পরস্ত্রী।

তোর মাথা। কোনো হিসেবেই মাধবী পরস্ত্রী ছিল না। আজও নয়।

মাধবীর কথা তুলছেন কেন জামাইদা? আপনার মতলবখানা কী?

গত রোববার তোর দিদিকে নিয়ে আমি শীতলকুচিতে গিয়েছিলাম।

সর্বনাশ

সর্বনাশের জন্যই এইবার তৈরি হ। তোর দিদির মাধবীকে ভারি পছন্দ হয়েছে। তার ওপর যখন শুনল এত বয়স অবধি মেয়েটা বিয়ে না করে একজনের জন্য অপেক্ষা করে আছে, তখন তো কেঁদেই ফেলল। মহীতোষ এখন পারলে আমাদের হাতে-পায়ে ধরে। বলছিল, মেয়েটা বিয়ে করবে না বলে ধনুক ভাঙা পণ করে বসে আছে, আমি মরেও শান্তি পাব না।

কাজটা ভালো করেননি জামাইদা। আমাকে বড়ো লজ্জায় ফেললেন।

দামড়া কোথাকার। শুধু একটা ভুল ধারণার ওপর একটা মেয়েকে এত কষ্ট দিতে হয়? অবনী ঘোষ তো কবেই বিয়ে করে সংসার পেতে বসে গেছে। তোর অঙ্ক তো মেলেনি

সব অঙ্ক কি মেলে দাদা?

এই অঙ্কটা মিলিয়ে দে ভাই। আর পাত্রী দেখার নামে আমাদের মিছে হয়রান করে মারিস না।

আজ উঠি জামাইদা।

না। উঠলে হবে না। মুচলেকা দিয়ে যা। কোনোদিন তো আমার সঙ্গে অবাধ্যতা করিসনি। আজ কি করবি?

জ্বালালেন। দিদি যখন আসরে নেমে পড়েছে তখন আমার জীবন অতিষ্ঠ করে মারবে।

মত দিলি তো

না দিয়ে উপায় কী বলুন।

দেখা

রাজধানী এক্সপ্রেস ছেড়ে যাওয়ার পর হঠাৎ হাওড়া স্টেশনের নয় নম্বর প্ল্যাটফর্মটা আজ বড্ড ফাঁকা আর নির্জন ঠেকছিল নবেন্দ্রর কাছে। নবেন্দ্র চেয়েছিল দূরে বিলীয়মান ট্রেনটার পশ্চাদ্দেশের দিকে। অতি দ্রুত চোখের আড়ালে চলে যাচ্ছে। তারপর মাঠঘাট ভেঙে হা-হয়রান হয়ে দৌড়বে দিল্লির দিকে। পৃথা ওই ট্রেনে দিল্লি গেল। দিল্লিতে দিদি-জামাইবাবুর বাড়িতে দিন তিনেক থেকে লণ্ডনের ফ্লাইট ধরবে। আপাতত এক বছরের পরে সময়টা বাড়তে পারে।

ফাঁকা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকার মানে হয় না। কিন্তু একটা মানসিক বৈক্লব্যে স্থান-কাল-পরিস্থিতি ভুলে সে বেশ কয়েক মিনিট দাঁড়িয়েই থাকে। ফেরার কথা মনেই হয় না। তার কারণ পৃথার এই দূর-গমনটি বড়ো আকস্মিক। নবেন একটা অনিশ্চয়তার অশুভ গন্ধ পাচ্ছে।

তাদের বিয়ে হয়েছে তিন বছর। এই তিন বছরই পৃথা ব্যস্ত থেকেছে তার বিপুল পড়শুনো নিয়ে। প্রথম শ্রেণির মেধাবী ছাত্রী সে নয়। কিন্তু অগাধ পরিশ্রমী। অসম্ভব ধৈর্যশীল ও উদ্যোগী। নবেনের জ্ঞাতসারেই পৃথা অন্তত শতখানেক চিঠি লিখেছে বিদেশে। দিল্লিতে গিয়ে বিভিন্ন মন্ত্রকে যোগাযোগ করেছে, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের সঙ্গে পরিচয় করেছে। নিজেকে উপস্থাপিত করার একটা নিজস্ব ক্ষমতা আছে ওর। আর এই সব করতে গিয়ে নবেনের সঙ্গে দাম্পত্য সম্পর্কটা সে প্রায় ভুলে গিয়েছিল। সংসারে ঠিকমতো সেটাই হল না। তাদের মধ্যে ভাব-ভালোবাসার কথা শুরু হয়েই কেমন করে যেন নানা স্কলারশিপ, গ্র্যান্ট, ফেলোশিপের প্রসঙ্গে চলে যেত।

নবেনের উচ্চকাঙ্খা নেই তা বলে পৃথার থাকবে না কেন? সেটা দোষেরও নয়। এবং শেষপর্যন্ত এই যে কী একটা সায়েন্স স্কলারশিপ পেয়ে সে বিদেশে গেল এটাও তার নিজেরই কৃতিত্ব। প্রায়ই বলত, সে আর পাঁচটা বাঙালি মেয়ের মতো বিয়ের পর থমকে যেতে চায় না।

বলতে নেই, বিয়েটাও পৃথার অনিচ্ছের অঘটন। বাবার দু-দুটো স্ট্রোক হয়ে যাওয়ায় উদবিগ্ন বাপ মেয়েকে প্রায় হাতে পায়ে ধরে বিয়েতে রাজি করান। তখন পৃথা ফিজিক্সে এম এসসি করছে। সেই সুবাদে ফুলশয্যা সেরেই কয়েকদিনের মধ্যে বাপের বাড়ি চলে যায়। যায় তো যায়ই। তিন মাস পাত্তা নেই। পরীক্ষার পর পরই কোন মন্ত্রীর সেক্রেটারির সঙ্গে সমঝোতা করতে দিল্লি গেল। গেল তো গেলই। বিয়ের প্রায় ছ মাস বাদে শ্বশুরবাড়িতে এল। একমুখ হাসি, একটুও বিরক্তি নেই। যেন সে বাড়ির পুরোনো বউ। কিছুদিন দিব্যি শ্বশুর শাশুড়ি, বর আর অবিবাহিত ভাসুরের সঙ্গে মানিয়ে নিল। মিষ্টি কথা, মিষ্টি ব্যবহার, মনোমালিন্যের নামগন্ধ নেই, বরকে নিয়ে আলাদা থাকার ধান্ধা নেই। ম্যানিপুলেশন শব্দটার অর্থ পৃথার কাছেই প্রথম শেখে নবেন। শব্দের অর্থ জানলেই হয় না, প্রয়োগ না জানলে সব শব্দই কাগুজে থাকে মাত্র।

হয়তো বা নিজের ক্যারিয়ারের জন্য লাগাতার তদবির করতে গিয়েই ম্যানিপুলেশনের প্রয়োগ-কৌশল অর্জন করেছিল পৃথা। একটু আহ্লাদি গোলগাল মুখ এবং সামান্য মেদসম্পন্ন চেহারার ডালপুতুলের মতো দেখতে পৃথাকে নিয়ে নবেন প্রায়ই ধন্ধে পড়ে যেত। সে প্রায় শৈশব থেকেই স্ত্রৈণ অর্থাৎ যখন তার স্ত্রী বলে কিছুর ছায়ামাত্র জীবনে ছিল না, তখন থেকেই সে তার ভাবী স্ত্রীর অধীন হওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিল। বিয়ের পরই যে সে তার বউয়ের অনুগামী হবে এটা তার ভবিতব্যই ছিল। ওই মনোভাব নিয়েই সে বড়ো হয়েছে। তার নিজস্ব ধারণা হল, বিয়েটা একটা টার্মিনাস। জীবনের উদ্যোগপর্বের ওইখানেই সমাপ্তি। তারপর বউয়ের ছায়ায় নিশ্চিন্তে জীবনটা কাটিয়ে দাও।

আর একটা আকাঙ্ক্ষা ছিল। বউ যেন সুন্দরী হয়। তা ভাগ্যক্রমে পৃথা বেশ ফরসা, গঠন দুর্গা প্রতিমার মতো। খুব সুন্দরী না হলেও কেউ হ্যাক-ছিঃ তো করবে না। কিন্তু পৃথার স্ত্রৈণ

স্বামী হওয়ার জন্য যে আকাশটা দরকার সেটা কোথায়? স্ত্রী-বৃক্ষের ছায়া চেয়েছিল সে, কিন্তু বৃক্ষ যদি চঞ্চল ও চংক্রমণশীল হয় তা হলে ছায়া জুটবে কী করে?

সে আশা করেছিল, পৃথা তাকে আলাদা ফ্ল্যাটে সংসার পাতার কথা বলবে। কিন্তু পৃথা সেই ধার দিয়েও গেল না। বরং কথা ওঠায় বলেছিল, ও মা! তা কেন? এইখানেই তো বেশ আছি। আমি ট্যুরে বা বিদেশে গেলে তোমাকে দেখার লোক চাই তো! বাচ্চাকাচ্চার প্রসঙ্গ উঠলে একটুও আঁতকে উঠত না, আপত্তিও করত না। শুধু বলত, হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার তো দু-তিনটে বাচ্চার মা হওয়ার শখ। প্রিপারেশনের জন্য একটু সময় দাও।

এস এসসির পর অতি দ্রুত পিএইচ ডির গবেষণার সুযোগ পেয়ে গিয়েছিল সে। ফার্স্ট ক্লাস না পেয়েও এই সুযোগ পেয়ে যাওয়া যার তার কর্ম নয়। তবে সে খাটত, লাইব্রেরি, ল্যাব, প্রফেসরদের বাড়ি গিয়ে হানা, কম্পিউটার ঘাঁটা, চরকিবাজি আর কাকে বলে। আর তার ওই সাংঘাতিক ব্যস্ততার মধ্যে দাম্পত্য ঢুকবার মতো ফাঁকই থাকত না।

সুতরাং স্ত্রৈণ হওয়ার স্বপ্নটা পূরণ হল না নবেনের। তবে সে পৃথার ব্যাপারটা খুব আন্তরিকতার সঙ্গে হৃদয়ঙ্গম করেছে। সমবেদনা এবং সমর্থনও জানিয়েছে। এমনকি মা ঘরের বউয়ের উড়নচণ্ডীপনা নিয়ে মৃদু আপত্তি তোলায় মাকে বকাঝকাও করেছে। এসব উচ্চশিক্ষিতা মেয়ের লাইফ তোমরা বুঝবে কী করে? বলার সময় অবশ্য ভুলে গিয়েছিল যে তার মা সুচেতা দেবীও পলিটিক্যাল সায়েন্সের এম এ। কিছুদিন অধ্যাপনাও করেছিলেন। দ্বিতীয় সন্তান হওয়ার পর চাকরি ছেড়ে দেন।

সব ঠিক আছে। তবু আজ পৃথা বিদেশে চলে যাওয়ার পর ফাঁকা প্ল্যাটফর্মে বড্ড কাহিল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল নবেন। মনের ভিতর কী একটা যেন গুড় গুড় করছে! নরমাল লাগছে না। বড্ড অনেক দূরে চলে যাওয়া হল না কি পৃথার? দূরত্বটা কি বাড়বে?

না এটা যে বিরহ নয় অন্য ব্যাপার, সেটা বুঝতে পারছে নবেন। বিরহের মধ্যে হতাশা থাকে না, মিলনাকাঙ্ক্ষা থাকে, আশা থাকে, একটা সুদুর উজ্জ্বলতার আভাস থাকে। এটা তা নয়। ইংরেজিতে একে বোধ হয় বলে ডিজেকশন। ভোম্বল ভাবটা কাটাতে সময় লাগলেও নবেন সংবিৎ ফিরে পেয়ে ভারি অন্যমনস্কভাবেই ঠিক বাস ধরে বাড়ি ফিরে এল।

রাতে খাওয়ার টেবিলে মা বলল, বিয়ের পর ছেলেপুলে না হলে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক পাকা হয় না। দাদা নবেনের চেয়ে বছর চারেকের বড়ো। মাথা নেড়ে বলল, ঠিক নয় মা। ছেলেপুলে হওয়ার পরও বিস্তর ডির্ভোস হচ্ছে। কিন্তু কথাটা হঠাৎ উঠছে কেন? পৃথা বিলেত গেল বলে ভয় পাচ্ছ না কি?

মা একটু অস্বস্তির সঙ্গে বলল, বিলেত-আমেরিকা আজকাল যা হয়ে উঠেছে, ভাবলে ভয় করে।

শিবেন হাসল, বিলেত আমেরিকার চেয়ে এ দেশ কিছু পিছিয়ে নেই। পরিবারপ্রথা টিকিয়ে রাখতে পারবে না মা। তবে পৃথা ভালো মেয়ে, লেখাপড়া ছাড়া কিছু নিয়ে ভাবে না। আমার বিশ্বাস, নবেনের একটা ব্যবস্থা করে ঠিক নিয়ে যাবে ওকে।

নবেনের কাছে এসব প্রসঙ্গ স্বস্তিকর নয়। তবে পৃথা তাকে কিন্তু কখনো বলেনি যে, বিদেশে গিয়ে সে তার জন্যও ব্যবস্থা করার চেষ্টা করবে। নবেন একটু কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, বউয়ের আঁচল ধরে বিদেশে যাওয়ার ইচ্ছে আমার নেই।

শিবেন বলে, সুযোগ এলে ছাড়বি কেন? পৃথা তো আর পর নয়। স্বামীর জন্য এটা তো সে করতেই পারে। বেচারা তো নিজের চেষ্টায় চান্স পেয়ে বিদেশে গেছে। তাতে তোর ইগো প্রবলেম হওয়ার কথা নয়।

নবেন বিরক্ত হয়ে বলে, আমার বিদেশে যাওয়ার ইচ্ছে থাকলে চেষ্টা নিজেই করতাম। আমার কোয়ালিফিকেশনে যাওয়াই যায়। কিন্তু আমার ইচ্ছে নেই।

বাবা পরিতোষ এতক্ষণ কথা বলেননি, এবার বললেন, তা হলে বউমা যদি বিলেতেই ভালো চান্স পেয়ে থাকে যায়, তা হলে কী করবি? আমাকে একবার বলেওছে ওর বিলেত বা আমেরিকায় থাকা খুব পছন্দ।

নবেন গম্ভীর হয়ে বলে, ভেবে দেখতে হবে, এখনই এসব আলোচনার সময় হয়নি।

মা বলল, বিলেত যাওয়া তোর অপছন্দ হলে তুইতো ওকে বরণও করতে পারতিস। করলি না কেন?

ওর বিলেত যাওয়া আমার অপছন্দ হবে কেন? ইচ্ছে করলে যেতেই পারে। অপছন্দটা তো আমার নিজের ক্ষেত্রে।

আবহাওয়া উত্তপ্ত হচ্ছে দেখে বুদ্ধিমান পরিতোষ আলোচনা অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিলেন। নবেন ভালো করে খেল না, ফেলে ছড়িয়ে উঠে পড়ল।

পরদিন দিল্লি পৌঁছে পৃথা ফোনে পৌঁছ-সংবাদ দিল। খুব ব্যস্ত বলে বেশি কথা বলতে পারল না। দিন পাঁচেক পর ই-মেল চেক করতে গিয়ে অফিসে নবেন পৃথার লন্ডনে পৌঁছোনোর খবরও পেয়ে গেল। লন্ডনে পৌঁছে পৃথার খুব রোমাঞ্চ হচ্ছে। ভীষণ সুন্দর, ভীষণ ভালো শহর। অ্যাকোমোডেশনের ব্যবস্থা এখনও হয়নি। অস্থায়ী বন্দোবস্ত আছে। জবাবে নবেন তাকে শুভেচ্ছা জানাল, ভালোবাসা এবং চুম্বনও। তবে আবেগটা তেমন কাজ করছিল না। একটা অসম্পূর্ণ সম্পর্ক কেমন যেন স্মৃতির চেহারা নিচ্ছে। পৃথা তার বিধিসম্মত বউ বটে, কিন্তু যেন আপনজন নয়, পর মহিলা।

এরপর প্রায় দিন কুড়ির ফাঁক, ফের ই-মেল এল। পৃথা একটি চমৎকার দক্ষিণ ভারতীয় পরিবারে পেয়িং গেস্ট হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। কাজের জায়গা খুবই কাছে। পার্ট টাইম জব পেয়ে গেছে, ভালো আছে, খুব ভালো আছে।

পৃথা যে সব বাধা জয় করবেই এই আস্থা নবেনের আছে। নাছোড়বান্দা, ধৈর্যশীল, সর্বদা আশাবাদী এবং অমিত পরিশ্রমী ম্যানিপুলেটররা কখনো ব্যর্থ হয় না। কিন্তু দুটো ই-মেলের কোথাও কোনো আবেগ, ভালোবাসা বা চুম্বনের কথা নেই। নবেন পৃথার স্বামী, নিজস্ব মানুষ, কিন্তু সেই ভাবটা কোথাও প্রকাশ পাচ্ছে না। বিয়ের পর সে আর পৃথা দেহগতভাবে মিলিত হলেও নবেন বুঝতে পারত, পৃথা ব্যাপারটা উপভোগ করছে না। তাড়াতাড়ি দায়সারাভাবে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলত এবং ঘুমোত। সারাদিন দেদার দৌড়ঝাঁপের ফলেই বোধ হয় ওর ঘুম ছিল খুবই গভীর। সারারাত জেগে প্রেমালাপ করেনি কখনো।

নবেনের ধন্দ কাটছে না।

তিন মাস বাদে পৃথা একটা ফোন করল।

শোনো, আমি একটা খুব ভালো স্কলারশিপ পেয়ে গেছি।

বাঃ, খুব ভালো কথা।

বোধ হয় আমি এখন পার্মানেন্টলি এখানে থেকে যেতে পারব।

পার্মানেন্টলি?

হ্যাঁ, ইস আমার যে কী থ্রিলিং লাগছে! এর মধ্যে একটা মিনি ট্যুরে ইউরোপ ঘুরে এসেছি। এখানে কাজের যে কত সুযোগ!

ভালো, খুব ভালো। দেশে কবে আসবে?

এখন তো যাওয়ার প্রশ্নই নেই। কাজের ভীষণ চাপ, ওসব পরে ভাবা যাবে, তোমরা সবাই ভালো তো!

হ্যাঁ, এ দেশে যতটা ভালো থাকা যায়।

একটা অ্যাপার্টমেন্টও নিয়েছি। নিজের জায়গা না হলে কাজকর্মের খুব অসুবিধে।

কিনলে নাকি?

হ্যাঁ, ক্রেডিটে ছোট অ্যাপার্টমেন্ট, তবে কোজি। সবাইকে জানিয়ে দিও। কেমন? ভালো থেকো।

নবেন বুঝতে পারল না, এটা বিরহকাতরা স্ত্রী ও স্বামীর সংলাপ হওয়া উচিত কি না।

সাধারণত নবেনের তেমন কোনো কেনাকাটা করার থাকে না। ডিসেম্বরের এক সন্ধেবেলায় সে অফিস থেকে বেরিয়ে এক কলিগের পাল্লায় পড়ে সল্ট লেকের শপিং মলে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ঘ্যাম জায়গা, বিস্তর জিনিস। নবেনের জিনিসপত্র বেশি লাগে না। তার কলিগ শুভ্র সংসারী মানুষ, ইংরেজি নববর্ষে কার্ড আর গিফট কিনতে ব্যস্ত। নবেন এ পাশে ও পাশে ঘুরছে।

হঠাৎ একটি নারীকণ্ঠ বলে উঠল, আপনি রণজিৎ, না? নবেন একটা দোকানের শো কেসে বিচিত্র সব মোবাইল ফোন দেখছিল। তার এ যন্ত্র নেই। অপ্রয়োজনবিধায় কেনার কথা মনে হয়নি। তবু দেখতে দোষ কী? সে সোজা হয়ে মহিলার দিকে তাকাল।

ছোটোখাটো চেহারা, শ্যামলা, মুখের তুলনায় বেঢপ বড়ো একটা চশমা চোখে, সাদামাটা একটা হলুদরঙা শাড়ি আর গায়ে কমলা রঙের শাল জড়ানো একটা মেয়ে। বয়স ছাব্বিশ-সাতাশ। মুখের ডৌলটা ভারি মিষ্টি।

নবেন মাথা নেড়ে বলল, না, আমি রণজিৎ নই।

মেয়েটা বেশ অবাক। অবিশ্বাসের গলায় বলল, নন?

না। আমি নবেন বোস।

মেয়েটা একটু যেন হতাশার গলায় বলল, ক্ষমা করবেন। ভুল করে ফেলেছি। আপনি ঠিক রণজিতের মতোই দেখতে। তবে বারো-তেরো বছর আগেকার দেখা তো। কিছু মনে করবেন না।

আরে না। এরকম ভুল তো লোকে আখছার করে।

মেয়েটার ডান হাতে একটা দড়ি দিয়ে বোনা সুন্দর ব্যাগ। তাতে কেনাকাটা জিনিসপত্র। বাঁ কাঁধে ঝুলছে কালো ভ্যানিটি ব্যাগও, চোখের বিস্ময়টা এখনও কাটেনি, বলল, আমি একটু আনমনা মানুষ, মাঝে মাঝে এরকম ভুল করে ফেলি।

বলে হাসল। আর এই হাসিটা যেন মেয়েটার বয়স বছর দশেক পিছিয়ে দিল হঠাৎ। একেবারে সহজ সরল শিশুর মতো হাসি। দুপাটি সুচারু সাদা দাঁত।

নবেনের বেশ লাগল মেয়েটাকে। বলল, কলকাতা শহরে আনমনা মানুষের কিন্তু বিপদ।

বিপদে পড়ি না না কি? প্রায়ই রাস্তা পেরোতে গিয়ে গণ্ডগোলে পড়ে যাই। বার দুই ট্রাফিক পুলিশের বকুনি খেতে হয়েছে। আমার নাম সঞ্চিতা মিত্র। সেক্টর ফাইভে থাকি। আপনি কি সল্ট লেকে থাকেন?

না। কাঁকুড়গাছি। রণজিৎ কে? কোনো আত্মীয় নাকি?

মেয়েটি বোধ হয় আলাপী মানুষ। মাথা নেড়ে বলল, না, রণজিৎ শিলিগুড়ির ছেলে। আমাদের পাড়ায় থাকত। ভালো ফুটবল প্লেয়ার। একটা খুনসুটির সম্পর্ক ছিল আমাদের।

খুনসুটি?

হ্যাঁ, খুব খ্যাপাত আমাকে, দাদার বন্ধু।

এনি সফট কর্ণার?

খুব হাসল মেয়েটি। শিশুর মতো। বলল, ও বয়সে কি আর খারাপ লাগে?

বারো-তেরো বছরের মধ্যে দেখা হয়নি বুঝি?

কী করে হবে? রণজিৎ কলকাতায় এল খেলতে। তারপর আর কোনো খবর নেই। শুনেছিলাম খেলার সুবাদে রেলে চাকরি পেয়েছে। কোথায় আছে কে জানে!

তাকে মিস করেন বুঝি?

না, না। ওসব ব্যাপার নয়। চেনা ছিল। ওই পর্যন্তই। হুবহু আপনার মতো দেখতে। লম্বা, ছিপছিপে, একই রকম লম্বাটে পুরুষালি মুখ। এমনকি গোঁফটা পর্যন্ত।

মানুষে মানুষে চেহারার মিল তো থাকতেই পারে। আপনি শিলিগুড়ির মেয়ে বললেন, সেক্টর ফাইভে কি আপনার শ্বশুরবাড়ি না কি?

না না, আমার এখনও বিয়ে হয়নি। রিটায়ার করার পর বাবা কলকাতায় সেটল করলেন। আমি একটা স্কুলে পড়াই। আপনি?

ব্যাঙ্কে।

শুভ্র তার কেনাকাটা সেরে বেরিয়ে এসে ডাকল, হাই নবেন।

এই যে! সব কেনাকাটা হয়ে গেল?

হ্যাঁ। লেটস হ্যাভ সাম কফি। ওঃ, সরি, ইউ আর বিজি।

আরে না, এঁর সঙ্গে এখানেই আলাপ হল। আমাকে ওঁর এক চেনা লোক বলে ভুল করেছিলেন। আচ্ছা ম্যাডাম, আসি। নমস্কার।

নমস্কার। আসুন।

শুভ্র খুব স্পোর্টিংলি বলল, ম্যাডাম, আপনিও আসুন না, একসঙ্গে একটু কফি খাই। আজ জববর ঠান্ডাও পড়েছে।

থ্যাংক ইউ। কিন্তু আজ আমার একটু তাড়া আছে। কিছু মনে করবেন না।

পথেঘাটে এরকম ঘটনা যতই ঘটে, মানুষ ভুলেও যায়।

প্রায় আট মাস বাদে পৃথা ফোন করল। ফোন করার ব্যাপারে পৃথার হয়তো কিছু হিসেবনিকেশ আছে। কিন্তু ই-মেল দশ পনেরো দিন বাদে বাদেই করে এবং তাতে নিজের খবরই দেয়। সবই সাকসেস স্টোরি। তাতে নবেন সম্পর্কে কোনো জিজ্ঞাসা থাকে না।

টেলিফোনে পৃথা স্কটল্যান্ড ভ্রমণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিল। জেফারসন নামে এক অধ্যাপকের প্রশংসা করল এবং বলল সে একটা মিনি অস্টিন গাড়ি কিনেছে। লাল টুকটুকে, ছোট্ট আর ভারি কিউট।

নবেন যথাসাধ্য আনন্দ প্রকাশ করল এবং পৃথাকে জীবনে আরও এগিয়ে যেতে বলল। এবং একেবারে শেষে জিজ্ঞাসা করল, কবে আসবে?

আসব কেন? এখন তো আসার প্রশ্নই নেই। কত কাজ!

তোমাকে যে ভুলতে বসেছি!

আহা, ও আবার কী কথা! ভুলবে কেন?

তুমি আর আমি যদি দু দেশেই থেকে যাই তা হলে তো সম্পর্কটাই উঠে যাবে।

তা যাবে কেন? সম্পর্ক ঠিকই থাকবে। কিন্তু দেখো, কেরিয়ারটার একটা দাম আছে। হয়তো এখানকার কাজ শেষ হলে আমি ইউ এস এ চলে যাব। সেখানেও কথাবার্তা চলছে। খুব শিগগির দেশে ফেরার তো চান্স নেই। কাজেই ওসব ভেবে মন খারাপ কোরো না, আমার স্বপ্ন, আগে স্বপ্ন সফল হোক।

ডিসেম্বরের পর জুলাই, এক ঘোর বর্ষার দিনে তার বন্ধু সুবীরের বিবাহবার্ষিকীতে যেতে হয়েছিল তাকে। উপহার কেনা ছিল না বলে সিটি সেন্টার নামে এক শপিং মলে নিজের নতুন মারুতি গাড়িটা পার্ক করে কিছু কিনতে নামল নবেন। কিন্তু কেনাকাটায় সে বিশেষ অপটু। কী উপহার দেবে, কত টাকা বাজেট এসব কিছুই ঠিক করতে পারছিল না। একবার

সোনাদানা, একবার বই, একজোড়া মোবাইল ফোন, এবং শাড়ি আর ধুতি পাঞ্জাবির কথাও মাথায় এল। কিন্তু কিছুই স্থির করতে পারছিল না।

সিটি সেন্টারের অতিশয় চাকচিক্যময় দোকানগুলোর বাইরে থেকে ঘুরে ঘুরে সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা করছিল সে এবং তখনই আচমকা মেয়েটাকে দেখতে পেল। হাতে সেই দড়ির ব্যাগ, চোখে চশমা, সবুজ শাড়ি আর ব্লাউজ।

আপনি সঞ্চিতা না?

আপনি নবেন। বলেই সেই শিশুর মতো হাসি। মুগ্ধ হয়ে গেল নবেন। এত ভালো হাসি কারও দেখেনি সে। বলল, আপনি এখানেই কেনাকাটা করেন বুঝি?

এটা কাছে হয়। তা ছাড়া কেনাকাটা আমার এক বাতিক। জিনিস কিনি বলে মা খুব বকে। কিন্তু কী করব, শপিং আমার একটা নেশা। আপনি এখানে যে?

আমি আবার আপনার উলটো, কেনাকাটা একদম পারি না। আমার বন্ধুর ম্যারেজ অ্যানিভার্সারিতে উপহার কিনব বলে নেমেছি কিন্তু কী কিনব, সেটাই ঠিক করে উঠতে পারিনি এখনও।

বাজেট কত?

সেটাও ঠিক করিনি। ব্যাঙ্কের ক্রেডিট কার্ড আছে, সুতরাং যা খুশি কিনে ফেলব। কী দেওয়া যায় বলুন তো?

ম্যারেজ অ্যানিভার্সারিতে দামি জিনিস দেবেন কোন দুঃখে? সস্তায় দেখনসই জিনিস দিলেই তো হয়। কেনাকাটার সমস্যা থাকলে স্ত্রীকে নিয়ে এলেই তো হয়।

সেটা সম্ভব নয়। আমার স্ত্রী একজন আছেন বটে, তবে তিনি এখন বিলেতে, নিজের কেরিয়ার তৈরি করছেন।

বাঃ, দারুণ ব্যাপার তো?

হ্যাঁ, দারুণ, নিদারুণও বলতে পারেন। তিনি এদেশে আদৌ ফেরার কথা ভাবছেন না।

তাতে কী? আপনিও চলে যান না?

দেখুন ম্যাডাম, আমি বিদেশ-প্রেমিক নই। সাহেবরা খেটেখুটে তাদের দেশটাকে ঝাঁ চকচকে রেখেছে, আর আমি গিয়ে সেখানে হামলে পড়ে লুটেপুটে খাব। এই আইডিয়াটা আমার পছন্দ নয়।

ও বাবাঃ, আপনি তো বেশ ইগোইস্ট দেখছি। না কি বউ বিলেতে গেছে বলে প্রেস্টিজে লাগছে?

না, সে ব্যাপার নয়, যে গেছে যাক, আমি যেতে রাজি নই।

পুরুষদের অনেক কমপ্লেক্স।

তা হবে হয়তো।

আচ্ছা, লেটস ড্রপ দ্য সাবজেক্ট। এখন চলুন তো?

এরপর সঞ্চিতা তাকে সঙ্গে নিয়ে একটা বুটিক থেকে চমৎকার একটা ঘর সাজানোর জিনিস কিনে দিল, মাত্র বারোশো টাকার মধ্যে। তারপর বলল, চলুন, আপনাকে কফি খাওয়াই।

কফি খেতে খেতে নবেন বলল, ভাগ্যিস আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল, নইলে উপহার নিয়ে অকুলপাথারে পড়ে গিয়েছিলাম। ধন্যবাদ।

ধন্যবাদ কিসের? কেনাকাটা করতে তো আমার ভালোই লাগে। বউয়ের চিঠি পেয়েছেন?

আজকাল চিঠি আবার কেউ লেখে নাকি? ই-মেল করে। পনেরো কুড়ি দিন পর পর ই-মেল আদানাপ্রদান হয়। তিন মাস পর ফোন।

ওমা, সে কী?

তার মানে?

কতদিন বিয়ে হয়েছে আপনাদের?

এই তো সাড়ে চার বছর।

বউ বিলেতে আছে কতদিন?

দেড় বছর হল।

তা হলে ই-মেল আর ফোন এত কম হচ্ছে কেন?

পৃথা আর কোনো নম্বর দেয়নি। আমাকে ফোন করতে বারণ করে। বলে ভীষণ ব্যস্ত। বাড়িত থাকে না। ই-মেল অবশ্য আমি প্রায়ই করি, কিন্তু ও পনেরো দিন পরপর চেক করে।

রাগ করে যায়নি তো?

না, পৃথা কাজের মেয়ে, রাগ অভিমান নেই।

আপনার স্ত্রীর ভেনচারের কথা জেনে ভীষণ ভালো লাগছে। আমাদের দেশের মেয়েরা তো আকাশের দিকে তাকাতে ভয় পায়।

প্লিজ! প্রসঙ্গটা থাক না। কফিটা বরং এনজয় করি?

ঠিক আছে। সাতটা বাজে, নেমন্তন্নে যেতে হবে তো!

ও হ্যাঁ, সময়টা খেয়াল ছিল না।

যাবেন কী করে? বাইরে তো এখনও প্রচণ্ড বৃষ্টি।

হ্যাঁ, তবে গাড়ি আছে। চলুন, আপনাকে ড্রপ করে দিয়ে যাই।

তার দরকার নেই। আমারও একখানা গাড়ি আছে।

ফের কেনাকাটার দরকার হলে আপনাকে পাব কোথায়? মোবাইল নম্বরটা দিন।

ফোন নম্বর দেওয়া-নেওয়ার ভিতর দিয়ে দুজনের আজকের পালা শেষ হল। যাওয়ার সময় সঞ্চিতা বলল, শুনুন, আপনার সঙ্গে যে আমার বন্ধুত্ব হয়েছে, সেটা আপনার স্ত্রীকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিন।

কেন?

দিন না। শুনে রাখুন, ই-মেল নয় কিন্তু। বেশ ভালো প্যাডের কাগজে লিখবেন, আর খামে করে পাঠাবেন।

কারণটা কী?

যা বলছি তা করেই দেখুন না। ভালো হবে।

যাঃ, কীসের ভালো হবে? কিছুই বুঝতে পারছি না।

মেয়েদের পরামর্শ উপেক্ষা করতে নেই।

উপেক্ষা করল না নবেন। দিন সাতেক ভেবে তারপর একদিন সত্যিই লম্বা একটা চিঠি লিখে ফেলল পৃথাকে। সঞ্চিতাকে যে তার বেশ ভালো লাগছে সেটাও সবিস্তারে লিখল। লিখল সঞ্চিতার আনমনা উদাসীন স্বভাবের কথা। আর চমৎকার হাসির কথাটাও।

চিঠি ডাকে দেওয়ার পাঁচদিনের মাথায় রাত বারোটায় পৃথার উত্তেজিত ফোন এল।

হ্যালো, কী ব্যাপার বলো তো? সঞ্চিতাটা কে?

সেটা তো চিঠিতে লিখেছি। পড়োনি?

এই প্রথম পৃথার গলায় অদ্ভুত উত্তেজনা লক্ষ করল নবেন। প্রায় চেঁচিয়ে সে বলল, কতদিন পরিচয় হয়েছে?

মাস পাঁচ-ছয় হবে।

ওর সঙ্গে আর মিশবে না।

মেশামেশির ব্যাপার নয়। সবে তো দুদিন দেখা হয়েছে।

সেটা কি আর দু-দিনেই থেমে থাকবে?

তুমি এরকম অ্যাজিটেটেড হচ্ছ কেন? জাস্ট একটা--পট করে ফোন কেটে দিল পৃথা।

তারপর মাসখানেকের মধ্যে আর সঞ্চিতার সঙ্গে দেখা হয়নি বটে, কিন্তু ফোনে কথা হয়েছে বার কয়েক। আন্তরিক কথাবার্তা, সমবেদনামূলক ভাববিনিময়।

মাস দেড়েক বাদে হঠাৎ রাতে পৃথার থমথমে গলা পাওয়া গেল ফোনে, তোমার পাসপোর্ট কোথায়?

পাসপোর্ট? আমার তো পাসপোর্ট নেই! তুমি তো তা জানো।

কেন নেই?

পাসপোর্টের কোনো প্রয়োজন তো দেখা দেয়নি!

আমি এসব শুনতে চাই না। তুমি কালই পাসপোর্টের ফর্ম নিয়ে এসো। পরশুর মধ্যে জমা দাও। তৎকাল লিখে অ্যাপ্লাই করলে তাড়াতাড়ি পাওয়া যাবে।

হঠাৎ পাসপোর্টের দরখাস্ত করতে যাব কেন? কোনো প্রয়োজন তো দেখা দেয়নি। কোনো স্কলারশিপ বা ফেলোশিপ বা ইনভিটেশন তো পাইনি।

প্রয়োজনটা তোমার নয়, আমার। সামনের সপ্তাহে আমি তোমাকে টিকিট পাঠিয়ে দিচ্ছি।

কিসের টিকিট? কী ব্যাপার বুঝিয়ে বলো।

তুমি চলে এসো।

তার মানে? হঠাৎ আমি বিলেতে দৌড়ব কেন? আমার বিদেশে যাওয়ার কোনো ইচ্ছেই নেই।

আমার খুব তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করছে।

ইচ্ছেটা এত দেরি করে হল?

তুমি আসবে কি না!

এই প্রথম পৃথার গলায় রাগের উত্তাপ পেল নবেন। সে ধরে নিয়েছিল গ্রেট ম্যানিপুলেটাররা কখনো রাগ করে না।

যাওয়া সোজা নয় পৃথা, গিয়ে হবেই বা কী? তুমি ব্যস্ত মানুষ, আমাকে সময় দিতে পারবে না।

তোমার জন্য আমি ছুটি নেব।

তাতে তোমার কাজের ক্ষতি হবে না?

হলে আমি সেটা ঠিক ম্যানেজ করে নেব।

ঠিক আছে, আমি একটু ভেবে দেখি।

তার মানে, তোমার আসার ইচ্ছে নেই?

দেখি, তোমার অভিনব প্রস্তাবে ইচ্ছেটা জাগে কি না।

আমি জানি, ওখানে একটা কিছু হচ্ছে।

কী হচ্ছে?

সেটা তুমিই জান!

বলে খুব রাগ করেই যেন ফোনটা কেটে দিল। আশ্চর্যের বিষয় পৃথার এই নতুন চরিত্র দেখে একটুও অখুশি হল না নবেন। তার যেন ভালোই লাগল ব্যাপারটা।

পরদিন অফিস থেকে ফোনে সঞ্চিতাকে ব্যাপারটা বলল নবেন। সঞ্চিতা মৃদুস্বরে বলল, আপনি আপনার স্ত্রীকে এতদিন ঠিক বুঝতে পারেননি।

তাই হবে হয়তো, কিন্তু এখন কী করি?

আপনার যাওয়া উচিত।

আমার ইচ্ছে হচ্ছে না। আপনি নারীবাদী বলেই আমার স্ত্রীর পক্ষ নিচ্ছেন।

আপনি কি ভেবেছিলেন আমি আপনার পক্ষ নেব?

নিরপেক্ষ থাকতে পারেন তো!

আমি তো নিরপেক্ষই। আপনি অন্য দিকে ঝুঁকে আছেন বলেই পক্ষপাত দেখছেন।

কোন দিকে ঝুঁকে আছি?

আপনার স্ত্রীর উলটোদিকে। ওঁর দোষ কী বলুন তো! নিজের কেরিয়ার তৈরি করছেন, এই তো? আর কোনো দোষ আছে কী?

না, অন্তত আমার জানা নেই।

তা হলে শি ইজ গুড, নাথিং রং?

ওর আবেগ কম, ভালোবাসা কম।

ওসব আপনার আরোপিত ব্যাপার। ভালোবাসার কথা না বলাটাই অপরাধ নয়। বরং যারা ভালোবাসার কথা বেশি বলে তাদের দুধে জল আছে।

আপনি তো পৃথাকে চেনেন না। তা হলে বলছেন কী করে?

আমি ওঁর বয়সি একটা মেয়ে। মেয়েরা মেয়েদের অনেক বেশি বোঝে।

খুব অনিচ্ছের সঙ্গে পাসপোর্টের দরখাস্ত জমা দিল নবেন। তৎকাল স্কিমেই। এবং পাসপোর্ট অফিসের প্রথাসিদ্ধ হয়রানির পর পেয়েও গেল।

তিনদিনের মধ্যে পৃথার ফোন।

পাসপোর্ট পেয়েছ?

পেয়েছি।

এখানে খুব শীত। তবে তোমাকে বেশি গরম জামা আনতে হবে না। এখানে অনেক বেশি ভালো জিনিস পাওয়া যায়। টিকিট আর দুশো পাউন্ডের চেক পাঠিয়ে দিয়েছি। পেয়ে যাবে।

কেন এসব করছ?

আমার ইচ্ছে।

আমি কিন্তু দু সপ্তাহের বেশি ছুটি পাব না।

আগে এসো তো, যাওয়ার কথা পরে।

তার বিলেত যাওয়ার কথা শুনে দাদা শিবেন ও বাবা পরিতোষ খুব খুশি। মা খুব খুশি নন। তবে তেমন কোনো মন্তব্য না করে শুধু বললেন, দ্যাখ, ভাব কতক্ষণ থাকে।

অফিস থেকে অনায়াসেই এক মাসের ছুটি মঞ্জুর হল। কলিগরা দারুণ আনন্দ প্রকাশ করল। বেশ একটা উৎসবের মেজাজ। যাওয়ার আগের দিন সঞ্চিতা তাকে ডাকল কফিশপে।

অক্টোবরের এক বিকেলে। মৃদু হেসে বলল, বিরহ শেষ হয়েছে তা হলে?

যার শুরুই ছিল না, তা শেষ হওয়ার প্রশ্ন ওঠে না।

এখনও স্ত্রীর ওপর রাগ পুষে রেখেছেন! আশ্চর্য!

রাগ। আ ফিলিং অফ ডিজেকশন। ওকে যখন রাজধানী এক্সপ্রেসে তুলে দিলাম তখনও ওর তেমন কোনো মন খারাপ দেখিনি। বরং নিজের ব্যাপার নিয়ে ভারি ব্যস্ত।

পুরুষরা যে মেয়েদের কাছে কী চায়! একটা মেয়ে ভালো চান্স পেয়ে নিজের চেষ্টায় বিদেশ যাচ্ছে, তার তো থ্রিলই হবে। আপনি থ্রিলটা উপভোগ করলে পারতেন।

যাকগে বাদ দিন। আমি কিন্তু কিছুতেই যেতাম না। শুধু আপনার কথায় যাচ্ছি।

কথাটার প্রতিবাদ করল না সঞ্চিতা। বড়ো বড়ো চশমার ভিতর দিয়ে নিবিড় চোখে তার দিকে চেয়ে একটু সিক্ত গলায় বলল, এখন থেকে আমার কথা শুনে চলবেন।

কিন্তু কেন যে আপনি আমাকে পরামর্শটা দিলেন সেটা বুঝতে পারলাম না। স্বামী-স্ত্রীর মধুর মিলন ঘটানোর জন্য, নাকি আমার স্ত্রীকে আমার উপর টেক্কা দেওয়ার সুযোগ করে দিতে?

কোনোটাই নয়।

তা হলে?

ভালোবাসা কথাটার অর্থ জানেন?

কেন জানব না? সবাই জানে।

আমি যে ভালোবাসার কথা বলছি তার অর্থ আপনার জানা নেই।

আপনার নতুন অর্থটা বলুন, শুনি।

নতুন নয়। আসল অর্থটা মানুষ ভুলে গেছে। ভালোবাসার মানে হল, যাকে ভালোবাসি তার ভালো-তে বাস করা।

বুঝলাম না। আমার আর পৃথার মধ্যে এখনও ভালোবাসা জন্মায়নি।

আমি আপনাদের কথা বলছি না। আমার কথা বলছি।

তার মানে?

যে দিন রণজিৎ বলে আপনাকে ভুল করেছিলাম, সে দিন থেকেই আমি আমার বশে ছিলাম না। সিটি সেন্টার রোজ যেতাম শুধু আপনার জন্যে। কতদিন পরে এলেন আর সেদিনই জানলাম আপনি পৃথার। বুকে জ্বালাপোড়া হল, তিন দিন ঘুমোতেও পারিনি।

স্তম্ভিত নবেন অনেকক্ষণ বাকরুদ্ধ থেকে বলল, বলেননি কেন?

কী বলব বলুন তো? প্রথমদিন যখন দেখা হল তখন বুকে অদ্ভুত আনন্দের রিমঝিম, মাথার মধ্যে যেন অনেক রঙিন বেলুন উড়ছে। ঠিকানা, ফোন নম্বর কিছুই জানতে চাইনি লজ্জায়। কিন্তু জানতাম একদিন ঠিক দেখা হবে। হবেই। হল। কিন্তু যেই শুনলাম আপনার বউ আছে, অমনি এক অদেখা, অচেনা মেয়ের ওপর এমন বিদ্বেষ আর ঘৃণা এল যে আমি অবাক হয়ে ভাবলাম, একজন লোককে ভালোবাসলে কি তার বউটাকে অকারণে ঘেন্না করতেই হবে? যে ভালোবাসার সঙ্গে বিদ্বেষ আর ঘেন্নাও জন্মায় সে কেমন ভালোবাসা? এইসব ভেবে দুটো দিন জ্বলে পুড়ে মরেছি, তারপর কী করে যেন মনে এল, ওকে যদি ভালোই বাসি তবে ওর যাতে ভালো হয় তাই করা যাক। কেড়ে নিলে জিনিসটা সব সময়ে পাওয়া হয় না।

কিন্তু আমি যে--

জানি, আপনিও দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। আর একটু সুতো ছাড়া হলেই আপনিও পৃথাকে ঘেন্না করতে শুরু করতেন। আপনি ছোটো হয়ে যেতেন, আমিও। দখলদারিই তো ভালোবাসা নয়।

আপনাকে বোঝা কঠিন।

না মোটেই কঠিন নয়। তবে বুঝবার আর চেষ্টা না করে সব সময়ে আমার কথা শুনে চলবেন। কী, চলবেন তো?

নবেন মুখ নীচু করে মাথা নেড়ে বলল, হুঁ।

বুকুর মাস্টারমশাই

বুকু কালো লোক পছন্দ করে না, গোঁফ দেখলে ভয় পায়, নস্যি কাছে আনলে পালায়। দাদু নস্যি নেয় বলে সে দাদুর কাছে যেতেই চায় না। আরও যখন বাচ্চা ছিল তখন কোনো কালো আয়া রাখাই যেত না তার জন্য। বুকুর সেজমামা বিস্তর খেলনা আর চকোলেট ঘুষ দিয়েও বুকুকে কোলে নিতে পারেনি, গোঁফের জন্য। সেজোমামার বেশ চোমরানো গোঁফ আছে।

কিন্তু বুকুকে অঙ্ক শেখানোর জন্য যে মাস্টারমশাইকে সুজিত একদিন ধরে নিয়ে এল তার বেশ ভুঁড়ো গোঁফ আছে, গায়ের রং বেশ কালো এবং লোকটা বেশ ঘনঘন নস্যি নেয়।

আড়াল থেকে পর্দার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে মাস্টারমশাইটিকে জরিপ করছিল পৃথা।

সুজিতকে শোওয়ার ঘরে টেনে এনে বলল, এ কাকে ধরে এনেছ তুমি? বুকু তো ওকে দেখলেই পালাবে!

সুজিত ভারি কাচুমাচু হয়ে বলল, সে তো জানি। কিন্তু ইনি নাকি অঙ্কের জাদুকর। বিজুর ছেলেকে তো পড়ায়। বিজু বলছিল, ছেলেটা নাকি অঙ্ক গুলে খেয়েছে।

আহা, ক্লাস ওয়ানের মেয়েকে পড়াতে আবার বড়ো পণ্ডিতের দরকার হয় না কি? ভালো তো ভালো, কিন্তু দর্শনধারীও তো হওয়া চাই।

সুজিত ভাবিত হয়ে বলল, বুকুন অঙ্কে কাঁচা বলেই একজন ভালো টিউটরের খোঁজ করেছিলাম। এই বয়স থেকে যদি বেসটা ভালো করে তৈরি করে দেওয়া যায় তাহলে বড়ো হলে আর অসুবিধা হবে না।

বুকু তো ওর কাছে যেতেই চাইবে না।

সুজিত মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ, প্রবলেম। বুঝিয়ে সুঝিয়ে দেখো, যদি রাজি হয়। সুবিধে হল, এ যদি পড়ায় তাহলে স্কুলের শেষ ক্লাস পর্যন্ত বা তার পরে হায়ার সেকেন্ডারিও পড়াতে পারবে। অঙ্কে উইজার্ড বলে শুনেছি। বেতনও বেশ বেশি। মাসে পাঁচশো টাকা, সপ্তাহে তিন দিন।

খাঁই তো কম নয় বাপু।

বেসটা তৈরি করার জন্যই রাজি হয়েছি।

তুমি কি বুকুকে চেনো না?

চিনি তো, কিন্তু মাঝে মাঝে আপসরফা না করে উপায় থাকে না।

রাজি না হলে কী করবে?

কী আর করব? বিজুকে বলেই রেখেছি, মেয়ে আমার ভীষণ মুডি। সে রাজি না হলে কিছু করার নেই।

বুকু শোওয়ার ঘরের মেঝেয় বসে ড্রয়িং খাতায় ছবি আঁকছিল। সে দেখতে ডলপুতুলের মতো সুন্দর। মায়ের মতোই ফর্সা রং, টানা টানা চোখ, মুখখানা যেন পটে আঁকা। তাকে যে সবাই সুন্দর বলে, তা সে জানে।

বুকু, তোমার অঙ্কের মাস্টারমশাই এসেছে, একবার দেখা করে যাও।

বুকু মুখ তুলে বলল, অঙ্কের মশাই?

হ্যাঁ।

বুকু মাস্টারমশাইদের বরাবর মশাই বলে। তার একজন ইংরিজির মশাই আছে, অন্য বিষয় পড়ায় একজন দিদিমণি।

বুকু টপ করে উঠে পড়ল। বলল, ভালো মশাই, মা?

হ্যাঁ। ইনি খুব ভালো।

কিন্তু ভালো বলে কোনো লাভ নেই। বুকুর নিজস্ব পছন্দের মাপকাঠিতে যদি না আসে তবে হয়ে গেল।

বুকু ঘরে ঢোকার আগে পর্দার ফাঁক দিয়ে আগে তার নতুন মশাই দেখে নিল, তারপর মায়ের দিকে চেয়ে বলল, এই নতুন মশাই?

--হ্যাঁ। বুকু। কাছে যাও।

বুকু আর একবার দেখল। তারপর মায়ের দিকে সপ্রশ্ন তাকাল।

সুজিত মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে কথা বলছিল। কী নিয়ে কথা হচ্ছিল তা শোনা যাচ্ছিল না। কথা অবশ্য সুজিত একাই বলছে। মাস্টারমশাইটি চুপ করে বসে আছে শুধু। কালো এবং বেশ চওড়া চেহারা। প্রবল গোঁফ। গায়ে একটা নীল রঙের হাওয়াই শার্ট, পরনে কালচে রঙের প্যান্ট, বয়স বোধহয় সাতাশ-আঠাশ। ত্রিশও হতে পারে। গোলাকার মুখখানা গম্ভীরপানা, একটু ভাবুক ভাব।

বুকু ভয় পাবে এবং কাছেই যেতে চাইবে না ভেবেছিল পৃথা। সেক্ষেত্রে সে জোর করতও না। সে জানে বাচ্চাদের মানসিক চাপ দেওয়াটা ক্ষতিকর।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, বুকু এগিয়ে গেল এবং বাবার সোফাতেই কাছ ঘেঁষে বসল। এবং মাস্টারমশাইয়ের দিকে চেয়ে রইল।

একটু অবাক হল পৃথা। এরকম হওয়ার কথা নয়। বুকুর এই ব্যবহারে খুশি হবে কি না তাও বুঝতে পারল না সে। পৃথা চায়ের ব্যবস্থা করতে রান্নাঘরে আসতেই তাদের কাজের মেয়ে যমুনা বলল, অ বউদি, বুকুর মাস্টারবাবু তো কালো!

তাই তো! কিন্তু কাছে গিয়ে বসেছে দেখছি। মতিগতি হয়তো পালটে যাচ্ছে।

ও মা! তাই বুঝি?

পড়বে কি না জানি না। তবে পালিয়ে আসেনি।

একটু বাদে যমুনার হাতে চা-বিস্কুটের ট্রে সাজিয়ে দিয়ে পৃথা গিয়ে তার পিছ পিছু বাইরের ঘরে গিয়ে বসল।

পৃথা, এই হল বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য। বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য অতিশয় অন্যমনস্ক লোক। পৃথার দিকে একবার তাকাল বটে, আবার তাকালও না। চোখের দৃষ্টিতে কোনো নিশানা নেই, আছে একটা ঘোর। একটা দায়সারা নমস্কার করেই যেন তার উদ্যম ফুরিয়ে গেল। মুখে কথা নেই।

পৃথা বলল, ছাত্রীকে কেমন দেখছেন?

বিষ্ণুপদ সামান্য হাসল। দাঁত ঝকঝকে সাদা এবং সেটিং চমৎকার। কালো কুচ্ছিতদেরও তো দু'-একটা প্লাস পয়েন্ট থাকতে পারে। বিষ্ণুপদ হেসে বলল, সুন্দর মেয়ে।

বিষ্ণুপদ বিস্কুট খেল চায়ে ভিজিয়ে। চা অর্ধেকটা খেল, অর্ধেক রয়ে গেল কাপে। বেশিক্ষণ বসল না। হঠাৎ 'আজ আসি', বলে চলে গেল।

মশাই চলে যেতেই বুকু তার বাবার কোলে উঠে গলা জড়িয়ে ধরল। বড্ড আদুরে মেয়ে।

সুজিত মেয়ের গালে গাল ঘষে বলল, বিষ্ণুপদর কাছে পড়বি?

পড়ব।

বলিস কী? তোর পছন্দ হয়েছে?

হ্যাঁ-অ্যাঁ।

পৃথা বলল, হ্যাঁ রে, এই মশাইটাকে তোর ভালো লাগল?

হ্যাঁ।

কেন রে?

সুজিত হাত তুলে বলল, আর নেগেটিভ পয়েন্টগুলো খুঁচিয়ে তুলো না। পছন্দ যে হয়েছে সেটাই আমার চৌদ্দপুরুষের ভাগ্য।

তোমার মেয়ের টেস্ট বদলে যাচ্ছে।

যাওয়াটাই ভালো। পার্টিজান হওয়া কাজের কথা নয়।

মাঝখানে একদিন বাদ দিয়ে সন্ধেবেলা পড়াতে এল বিষ্ণুপদ। বুকুর পড়ার ঘরটি আলাদা এবং একটেরে। ফ্ল্যাটে তিনটে শোওয়ার ঘরের একটা হল বুকুর স্টাডি। ঘরটা খেলনা টেলনা দিয়ে বেশ সাজিয়েছে সুজিত। চার রঙের চারটে দেওয়াল, তাতে কমার্শিয়াল আর্টিস্ট দিয়ে ছবি আঁকিয়ে নিয়েছে সে। যদিও বুকু এখনও মা আর বাবার সঙ্গেই শোয়, তবু ভবিষ্যতের কথা ভেবে এ ঘরের একখানা চমৎকার দামি খাট ও বিছানাও রয়েছে টানা পর্দার আড়ালে। সুজিত একজন উচ্চমানের কনসালট্যান্ট চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। মেয়ের জন্য এসব করতেই পারে।

দরজা খুলে মাস্টারমশাইকে নির্দিষ্ট ঘরে বসিয়ে পৃথা এসে দেখল, বুকু রোজকার মতোই ছবি আঁকছে। ছবি আঁকতে বড্ড ভালোবাসে।

তোমার মশাই এসেছে বুকু। যাও।

বুকু অবাক হয়ে মায়ের দিকে চেয়ে বলল, কোন মশাই? অঙ্ক মশাই?

হ্যাঁ। বসে আছেন।

বুকু উঠে পড়ল।

বুকুর অঙ্ক নিয়ে পৃথা আর সুজিত দুজনেই একটু চিন্তিত। একটা ভালো ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ে বুকু। সব বিষয়েই তার ফল ভালো হয়। কিন্তু অঙ্কের নম্বর খুব খারাপ। সাপ্তাহিক পরীক্ষায় শতকরা চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বা পঞ্চাশের বেশি পায় না। কয়েকজন মাস্টারমশাইকে ট্রাই করা হয়েছে, কিন্তু খুব একটা লাভ হয়নি।

সুজিত প্রায়ই বলে, অঙ্ক জিনিসটাকে ভালো না লাগলে হবে না।

রান্নাঘরে গিয়ে যমুনাকে দিয়ে চা পাঠিয়ে একটু অপেক্ষা করল পৃথা। আগে এই কালো মাস্টারের সঙ্গে ভাব হোক।

আধঘন্টা বাদে চুপি চুপি গিয়ে পর্দার ফাঁকে চোখ রেখে পৃথা দেখল, বিষ্ণুপদ খুব ভালোমানুষি মুখ করে বসে আছে চুপচাপ, আর বুকু কী যেন বোঝাচ্ছে তাকে । মনে হল

স্কুলের গল্প করছে। অঙ্ক কষছে না দেখে একটু বিরক্ত হল পৃথা। কিন্তু প্রথম দিন বলে ব্যাপারটা গায়ে মাখল না।

ঘন্টা খানেক বাদে চলে গেল বিষ্ণুপদ।

পৃথা গিয়ে বলল, কী অঙ্ক করাল দেখি।

আজ অঙ্ক করিনি তো!

তাহলে?

আজ গল্প হল যে!

গল্প! কীসের গল্প?

আমি আজ মশাইকে স্কুলের গল্প শোনাচ্ছিলাম।

আর হোম টাস্ক?

কাল তো শনিবার, ছুটি।

কিন্তু রোববারে তো উনি আসবেন না। সোমবার টাস্ক জমা দিতে হবে না?

বিরক্ত পৃথা নিজেই মেয়েকে নিয়ে বসল অঙ্ক করাতে।

পাঁচশো টাকায় একটা মাত্র সাবজেক্ট, তাও ক্লাস ওয়ানের সিলেবাসের জন্য! বড্ড বাড়াবাড়ি বলে মনে হচ্ছিল পৃথার। টাকাটা তাদের কাছে বড়ো কথা নয়। সে নিজেও একটা কোম্পানিতে কম্পিউটার ডিভিশনে চাকরি করে। সুজিতেরই ক্লায়েন্ট একটা ফার্ম বলে চাকরিতে বেশি সময় দিতে হয় না তাকে। দিনে তিন-চার ঘন্টার বেশি নয়। ভালো টাকা পায়। কাজেই মেয়ের জন্য মোটা টাকা খরচ করতে তাদের আপত্তি নেই। কিন্তু টাকার বিনিময়ে সার্ভিস তো পেতে হবে।

রাতে সব শুনে সুজিত বলল, একদিন দেখেই কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক নয়। বিজু তো আর বাজে কথা বলবে না। সে বলেছে, বিষ্ণুপদ একজন জিনিয়াস।

জিনিয়াস! কী জানি বাপু! আমার তো মনে হয় বড্ড অন্যমনস্ক।

কয়েকটা দিন দেখো।

এরপরে একটি ভয়াবহ ঘটনা ঘটল। এর পর যেদিন এল বিষ্ণুপদ, সেদিনও আড়াল থেকে লক্ষ করল পৃথা। দেখল বিষ্ণুপদর পাশে বসে বুকু খাতায় অঙ্ক কষছে। ঘন্টাখানেক বাদে বিষ্ণু চলে যাওয়ার পর পৃথা ঘরে ঢুকতেই বুকু খুব খুশির গলায় বলে উঠল, জানো মা, আমার সব অঙ্ক আজ রাইট হয়েছে।

কথাটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। ওদের ক্লাসে খুব সহজ যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগই করানো হয়। তাও বুকু ভুল করে ফেলে। পৃথা খাতা খুলে যা দেখল তাতে অবাক। বুকু অন্তত সাত-আটটা অঙ্ক ভুল করেছে, কিন্তু সব কটাতেই টিক দিয়ে রাইট দিয়ে গেছে বিষ্ণুপদ। আবার নম্বরও দিয়েছে পাশে। একশোতে একশো। খাতার পাতায় নস্যির দাগ।

পৃথা মাথায় হাত দিয়ে বসল। এ কী লোক রে বাবা? ভুল অঙ্ক রাইট দিয়ে গেল কোন আক্কেলে? ভুলগুলো ধরিয়ে দেবে না?

বজ্রাহতের মতো বসে ইতিকর্তব্য ভাবতে লাগল পৃথা। বিষ্ণুকে এক্ষুনি ছাড়িয়ে দেওয়া দরকার। নইলে বুকুর বারোটা বাজবে।

রাতে সে সুজিতের কাছে খুব রাগারাগি করল, এ তুমি কাকে ধরে আনলে? বিজুবাবুর কথায় নাচলেই হবে! এ তো বুকুর বারোটা বাজিয়ে ছেড়ে দেবে। ভুল অঙ্কগুলো রাইট দিয়ে গেছে, এ কী টিউটর?

দাঁড়াও কাল সকালেই বিজুকে ফোন করছি। বিজু তো বাজে কথা বলার লোক নয়।

সকালে সুজিত বিজুকে ফোন করে সব বলল।

বিজু কোনো বাধা না দিয়ে শোনবার পর একটু গম্ভীর হয়ে বলল, তোদের পছন্দ না হলে আমি ওকে বারণ করে দিতেই পারি। অ্যান্ড হি উইল নট মাইন্ড। কিন্তু তোকে একটা কথা জিজ্ঞস করব?

কী কথা?

তুই কী তোর মেয়ের সাইকোলজি সবটা বুঝিস?

হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?

যা জিজ্ঞেস করছি জবাব দে। বুঝিস?

সবটা বুঝি না নিশ্চয়ই।

কিন্তু বিষ্ণুপদ বোঝে। তোর বউ মেয়ের অঙ্কের খাতা চেক করতে গিয়েছিল কেন?

বাঃ রে, চেক তো করতেই পারে।

তা হলে বিষ্ণুপদকে ছেড়ে অন্য টিচার খুঁজে নে।

তুই রাগ করছিস কেন? ব্যাপারটা বুঝিয়ে বল।

আমি যখন তোকে বলেছি বিষ্ণুপদর হাতে মেয়েটাকে ছেড়ে দিতে তখন হান্ড্রেড পারসেন্ট শিওর হয়েই বলেছি। যদি চোখ বুজে নির্ভর করতে পারিস, তবেই ওকে রাখ। নইলে প্রফেশনাল টিচার অনেক পাবি। ভাত ছড়ালে কাকের অভাব কী?

বিজু একটা বড়ো কোম্পানির দু-নম্বর কর্তা। বছরে বিয়াল্লিশ লক্ষ টাকা বেতন পায়। হিল্লি দিল্লি লণ্ডন নিউইর্য়ক করে বেড়ায়। ঘ্যামা লোক। তার কথার দাম আছে।

সুজিত বলল, আচ্ছা বাবা, লেট আস সি।

আমিও তো তাই বলছি। ওয়েট অ্যান্ড সি।

কিন্তু পৃথা একেবারেই সন্তুষ্ট হল না। গজ গজ করতেই লাগল। তবে হ্যাঁ, বিজুবাবু হালকা পলকা লোক নন। ব্যক্তিত্ববান, বিবেচক, বুদ্ধিমান মানুষ। কিন্তু তাঁরও তো ভুল হতে পারে!

পরের সপ্তাহে বিষ্ণুপদ এল এবং ঘন্টাখানেক অঙ্ক কষিয়ে চলেও গেল। পৃথা গিয়ে যখন মেয়ের অঙ্কের খাতার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল তখন বুকু বলল, খাতা দেখো না মা, মশাই, বারণ করে গেছে।

প্রচণ্ড বিরক্ত হয়ে পৃথা বলল, কী!

বুকু গম্ভীর মুখে বলল, মশাই বলে গেছে খাতা কাউকে না দেখাতে।

কেন?

তা বলেনি।

এক ঝটকায় খাতাটা কেড়ে নিয়ে পৃথা দাঁতে ঠোঁট টিপে বলল, এত বড়ো সাহস! আমি মেয়ের মা, আর আমার খাতা দেখা বারণ! কী মাথামুণ্ডু করিয়ে গেছে দেখি! পাণ্ডিত্য ধরা পড়ে যাবে বলেই বোধহয় এত ভয়।

খাতা খুলে পৃথা দেখল, পৃষ্ঠার মাথায় গোটা গোটা বাংলা হরফে লেখা একটা মেসেজ, দয়া করে খাতা দেখবেন না। কোনো ভুল শোধরাবেন না। সঙ্গে সেই নিঘিন্নে নস্যির দাগ। ওয়াক পেল পৃথার।

রাগে পৃথার গা রি রি করতে থাকে। এ কি একটা পাগল একটা সাইকিক কেস? হনুমানটা যে কেন তার বুকুর কপালে এসে জুটল!

রাতে ফের সুজিতের সঙ্গে কথা হল। সুজিত শান্তভাবে সব শুনে বলল, ব্যাপারটা অদ্ভুত। তবু বলি, মেনে নাও।

মেনে নেব! তুমি বলছ কী? এবার সপ্তাহের পরীক্ষায় বুকু কত পেয়েছে জানো? থার্টি এইট পার্সেন্ট।

ব্যাপারটা নিয়ে আমিও ভাবছি। বরং আর একজন টিউটর গোপনে রাখব না কি? আরও মাসখানেক দেখে বিষ্ণুকে ছাড়িয়ে দিলেই হবে।

যা ভালো বোঝ করো। চিন্তায় আমার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু অনেক ভেবেচিন্তে দ্বিতীয় মাস্টার রাখার পরিকল্পনা তারা স্থগিত রাখল। জানাজানি হলে ব্যাপারটা বিসদৃশ হবে। বুকুর বাচ্চা মেয়ে। কখন বলে ফেলবে কাকে।

দু মাস যাওয়ার পরও বুকুর অঙ্কবোধ যেখানে ছিল সেখানেই রয়ে গেল। পৃথা রাগের চোটে আর মেয়ের খাতাই দেখে না। বিষ্ণুপদ এলে নিজের ঘর থেকে বেরোয় না। যমুনাই চা-টা দেয়।

অদ্ভুত ঘটনাটা ঘটল তিন মাস বাদে। ক্লাস পরীক্ষার ফল নিয়ে বুকু ফিরেই চিৎকার করে বলল, মা, আমি ফার্স্ট!

পৃথা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, মানে?

খাতা দ্যাখো না।

বুকুর মুখভরা হাসি।

খাতা দেখে পৃথা স্তম্ভিত হয়ে রইল। বুকু প্রতিটি অঙ্কই ঠিক কষেছে। পঞ্চাশে পঞ্চাশ। ক্লাস টিচার নোট দিয়েছে, শি হ্যাজ ইমপ্রুভড আ লড।

এ কি ম্যাজিক নাকি? যে মেয়ে গত মাসেও পঞ্চাশে উনিশ পেয়েছে সে এবার পঞ্চাশ পেল কী করে?

রাতে সুজিত শুনে খুশি হয়ে বলল, তাহলেই দ্যাখো, বিজু কিছু ভুল তো বলেনি!

দাঁড়াও বাপু, সামনেই অ্যানুয়াল পরীক্ষা। দেখি তাতে কী করে।

অ্যানুয়েলে বুকু ক্লাসে থার্ড হল, যা সে এতকাল অঙ্কে কম নম্বরের জন্য হতে পারেনি। অঙ্কে পেল একশোতে একশো।

গম্ভীর, নিরুত্তাপ, কালো, গোঁফওয়ালা এবং নস্যিতে আসক্ত বিষ্ণু রেজাল্টটা দেখে হেলাভরে সরিয়ে দিয়ে বুকুকে বলল, তুমি তো ছবি আঁকো, তাই না?

হ্যাঁ তো। ছবি আঁকতে আমার ভীষণ ভালো লাগে।

তা হলে তোমার জ্যামিতিও ভালো লাগবে।

কিন্তু মশাই, আমাদের তো জ্যামিতি নেই।

তাতে কী? জ্যামিতি জানলে ভালো ছবি আঁকতে পারবে।

বুকু খুশি হয়ে বলল, তা হলে শিখিয়ে দাও মশাই।

এবং পৃথা আড়াল থেকে লক্ষ করতে লাগল, বুকু জ্যামিতি শিখছে। কয়েকদিন পরে বীজগণিতও শিখতে লাগল।

এসব কী হচ্ছে মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছে না পৃথা। এত বেশি শেখানোর কি কোনো দরকার আছে? ওই একরত্তি মেয়ের মাথায় এমনিতেই কত পড়ার চাপ! তার ওপর সিলেবাসের বাইরের ব্যাপার চাপিয়ে দেওয়াটা কোনদিশি পাগলামি?

ক্লাসের পরীক্ষায় অঙ্কে আর এক নম্বরও কাটা যায় না বুকুর। কাজেই পৃথা আপত্তি করতে পারে না। বিষ্ণুপদ মেয়েটাকে নারী-রামানুজ বানাতে চায় নাকি কে জানে! বুকু ক্লাস টুতেই রীতিমতো জ্যামিতি আর অ্যালজেবরা করে যাচ্ছে খাতার পর খাতায়। সুজিত সোৎসাহে বই এনে দিচ্ছে কিনে।

পৃথা বলল, এটা একটা পাগলামি।

একজ্যাক্টলি। এসব পাগলেরই নাম নিউটন, গ্যালেলিও, আইনস্টাইন, আর্কিমিডিস, বুঝলে! দেশে দেশে এরকম পাগলের চাষ করা উচিত।

রাগ করতে গিয়েও হেসে ফেলল পৃথা।

বিষ্ণুপদকে কি এখনও তাড়াতে চাও পৃথা?

বিষ্ণুপদকে নয়, ওর মাথা থেকে ভূত তাড়াতে চাই।

ও কাজও কোরো না। ওই ভূতটার নামই প্রতিভা। ওই ভূতটা আমাদের মাথায় নেই বলেই আমাদের কাছে টাকা ছাড়া আর কোনো আনন্দ নেই। বুঝলে?

গার্জিয়ানস মিটিঙে সাধারণত ড্রইং টিচারের সঙ্গে কথা হয় না। কিন্তু মার্চের মিটিঙে ড্রইং টিচার বন্দনা সিংহ নিজেই যেচে এসে পৃথাকে বলল, আপনি কি মেয়েকে কোনো আর্টিস্টের কাছে শেখাচ্ছেন?

না তো!

ওর আঁকা তো ভীষণ ভালো হচ্ছে! ভীষণ ম্যাচিওরড হাত।

একদিন বুকু বলল, জানো মা, আমি আজকাল মশাইকে মাঝে মাঝে অঙ্ক শেখাই।

অ্যাঁ, তুই শেখাস কি রে?

হ্যাঁ তো। মশাই মাঝে মাঝে আমার ছাত্র হয়ে যায়। তখন আমি মশাইকে অঙ্ক বোঝাই, পরীক্ষাও নিই।

ও বাবা! তা মশাই পারে? ভুল করে না?

হ্যাঁ ভুলও করে। তবে আমি টের পাই, মশাই ইচ্ছে করে ভুল করে। ভুলটা আমি ধরতে পারি কি না সেটা দেখার জন্য।

অন্য দিন অন্য দুজন টিচার আসে এবং চলে যায়। তাতে পৃথার কোনো প্রতিক্রিয়া হয় না। মঙ্গল, বৃহস্পতি আর শনিবার আসে বিষ্ণুপদ। আর ওই তিনটে দিন যেন পৃথার যমদূত। সকালে উঠেই বুক ধক করে ওঠে। এই রে! আজ মঙ্গলবার! বিষ্ণুপদ আসার দিন। আর সারাদিন ঘরে, অফিসেও পৃথার ভেতরে একটা অস্পষ্ট টেনশন, একটা মৃদু ভয়, একটা উৎকন্ঠা যেন সুড়ঙ্গ খুঁড়তে থাকে।

সন্ধে সাড়ে ছটা বা সাতটা নাগাদ ডোরবেল বাজবে বলে আগে থেকেই তার বুক জিভ গলা শুকিয়ে যেতে থাকে। ডোরবেলটা বাজলেই বুকের ভিতরটা ধক করে ওঠে। তারপর ভীষণ ধকধক করতে থাকে। সে কখনো দরজা খুলতে যায় না, যায় যমুনা । সে আজকাল পর্দার ফাঁক দিয়ে উঁকিও দেয় না। নিজের ঘরে চুপচাপ বসে থাকে। আর ভিতরে বুকের শব্দ শোনে। এবং নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করে, এসব কী হচ্ছে? কেন হচ্ছে?

এক পার্টিতে হঠাৎ বিজুবাবুর সঙ্গে দেখা।

এই যে মিসেস চ্যাটার্জি, আরও সুন্দরী হয়েছেন দেখছি।

মোটেই না। মোটা হয়েছি বলুন।

মোটা! কোথায় মোটা! মোটা হচ্ছে তো আমার বউ। আর হবে নাই বা কেন, ওয়াইন খাচ্ছে দেদার। ওই দেখুন না কেন ভারমুথ খাচ্ছে ঢক ঢক করে।

যাঃ, উনি মোটেই মোটা হননি। নিজের বউকে খারাপ বলা পুরুষদের ভারি খারাপ স্বভাব।

বাই দি বাই, সেই বিষ্ণুপদর খবর কি? তাড়িয়ে দেননি তো?

পৃথা লজ্জা পেয়ে বলল, না। আসলে আমরা প্রথমে ওঁকে ঠিক বুঝতে পারিনি। উনি আমার মেয়ের ভুল অঙ্কও রাইট দিচ্ছিলেন তো তাই।

খুব হাসল বিভু। বলল, কনফিডেন্স লেভেল আপ করার জন্য ওরকম করতে হয়। মানুষের মাঝে মাঝে ব্রেনওয়াশের প্রয়োজন হয়, তা জানেন? যখন তার কনফিডেন্স লেভেল নেমে আসে তখন তার হার্ড ডিস্ক থেকে নিজের সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণাগুলো ডিলিট করা না গেলে সে তলিয়ে যায়। বিষ্ণু আপনার মেয়ের ভুল অঙ্কগুলো রাইট দিত আর ওভাবেই বুকুর নিজের সম্পর্কে নেগেটিভ ধারণাগুলো মুছে যেত।

ওঁর জন্যই আমার মেয়ে এখন ক্লাসে ফার্স্ট হয়।

ভেরি গুড। আমি তো সুজিতকে বলেই ছিলাম যে ও একটা জিনিয়াস।

বিষ্ণুপদর প্রসঙ্গ উঠলেই যে কেন পৃথার ভিতরে একটা লাগাতার অস্বস্তি, একটা মৃদু ধুকপুকুনি, একটা ভয়-ভয় ভাব শুরু হয়, আর তেষ্টা পায়, আর কান গরম হয়ে ওঠে তা বুঝতে পারে না সে। জীবনে মদে ঠোঁট ছোঁয়ায়নি পৃথা। কিন্তু আজ সে দু পাত্র পোর্ট দিব্যি অনায়াসে খেয়ে ফেলল। বাড়ি ফিরে রাতে নিজস্ব পুরুষটির সঙ্গে মিলিত হওয়ার সময় তার মন কাজ করল না। শুধু দেহটা নিবেদন করে দিল সে। সমস্ত প্রক্রিয়াটার ভিতরে এক ঘোর অন্যমনস্কতায় ডুবে রইল সে । ভাবল, বোধহয় মদের জন্যই এরকম হচ্ছে।

সন্ধেবেলা ধ্যানী বুদ্ধের মতো নিজের চেয়ারটিতে বসে আছে বিষ্ণুপদ। সামনে খোলা একটা খাতা। তার হাতে একটা ডট পেন। উলটোদিকে বসে এক মনে অঙ্ক করছে বুকু। দৃশ্যটা অনেকদিন বাদে আজ দেখল পৃথা। পর্দার ফাঁক দিয়ে চুপি চুপি। বুকের ভিতরে সেই আশ্চর্য ধুপপুক। গলা, জিব শুকিয়ে যাচ্ছে। কিছুতেই কি সে লোকটার মুখোমুখি হতে পারবে না?

অথচ আজ বুকুর জন্মদিন। সেলিব্রেশন হবে আগামী রবিবার। সেদিন বুকুর বান্ধবীরা আসছে। সাপ্তাহিক দিনে নেমন্তন্ন করলে অনেকে আসতে পারে না, ফলে এই ব্যবস্থা। কিন্তু আজ জন্মদিনে বুকু তার মশাইকে আগে থেকেই নেমন্তন্ন করে রেখেছে। বিষ্ণুপদ আজ রাতের খাওয়া খেয়ে যাবে। আর গোল বেঁধেছে সেখানেই। অন্যদিন যমুনা চা বিস্কুট দেয়

বটে, কিন্তু আজ তো হবে না। আজ জন্মদিনের নেমন্তন্ন সে সামনে না থাকলে খারাপ দেখাবে। তাই আজ সকাল থেকেই পৃথার ভীষণ নার্ভাস লাগছে। অফিসে না গিয়ে সে আজ নানারকম রান্না করেছে নিজের হাতে। রেশমি বিরিয়ানি, তন্দুরি মুরগি, চিংড়ির মালাইকারি, চাটনি। ভালো দোকানের রাবড়ি আনানো হয়েছে। আয়োজন সম্পূর্ণ। কিন্তু সমস্যা হল নিজের হাতে সার্ভ করা এবং সামনে বসে লোকটাকে খাওয়ানো। কিন্তু সমস্যটা কেন হচ্ছে সেটাই বুঝতে পারছে না পৃথা। আর বুঝতে পারছে না বলে রেগে যাচ্ছে নিজের ওপর। আর নিজের ওপর রাগ হচ্ছে বলে সে সব কিছুর ওপর রেগে যাচ্ছে।

বাথরুমে গিয়ে ভালো করে মুখ ধুল, মাথায় জল থাবড়াল। ঘরে এসে আয়নার সামনে দাঁড়াল সে। না, সে মোটেই মোটা হয়নি। বরং গত কয়েক সপ্তাহে সে বেশ রোগা হয়ে গেছে। আজ সকালেই ওয়েট নিয়ে দেখেছে, তিন কেজি কম।

আলমারি খুলে একটা ভালো শাড়ি বের করল সে। ম্যাচিং ব্লাউজ। তারপর ধীর হাতে মুখে সামান্য প্রসাধন করল, চুল বাঁধল। বুক কাঁপছে। বুক কেঁপেই যাচ্ছে অবাধ্যের মতো। দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে শাসন করল পৃথা। নিজেকেই ধমক দিল, এসব কী হচ্ছে? তুমি না মেয়ের মা?

যোধপুর পার্কে চারতলার ওপর দক্ষিণখোলা দারুণ ফ্ল্যাট। চমৎকার বিবেচক, বুদ্ধিমান, রোজগেরে স্বামী। ফুটফুটে মেয়ে। তার নিজের একটা ভারমুক্ত চাকরি। সৌন্দর্যের খ্যাতি, উজ্জ্বল একটা জীবন। কোথাও কোনো দুঃখ বা অভাবের ছায়ামাত্র নেই। সুখে-আহ্লাদে তার ডগোমগো থাকার কথা। তবে কেন এই অচেনা বুক ঢিপঢিপ! কেন মুখশোষ! কেন ভয়-ভয়! কেন! কেন!

পাথরের মতো আয়নার মুখোমুখি বসে রইল সে। না, প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে নয়। তার চোখ কিছুই দেখছে না। বিবশ হয়ে তাকিয়ে আছে শুধু।

ও বউদি, ভাজা কি এখন বসাব? না কি দেরি আছে? দরজায় দাঁড়িয়ে যমুনা জিজ্ঞেস করল এসে।

পৃথা অবাক হয়ে যমুনার দিকে চেয়ে যেন কিছুক্ষণ তাকে চিনতেই পারল না। তারপর বলল, কটা বাজে রে?

আটটা তো অনেকক্ষণ বেজে গেছে।

ওরা কী করছে?

এখনও পড়ছে গো! আর কত পড়বে বাবা!

ভাজাটা কম আঁচে বসিয়ে দে। আস্তে আস্তে হোক।

পৃথার নিজের কবজিতেই ঘড়ি বাঁধা রয়েছে। তবু কেন সে যমুনাকে সময় জিজ্ঞেস করল কে জানে! ঘড়িতে এখন সাড়ে আটটা বাজছে। বুকুর কাছেই পৃথা শুনেছে, বিষ্ণুপদ সারাক্ষণ বসে বুকুর স্পেয়ার খাতায় অঙ্ক করে। সেই অঙ্কগুলো পৃথাও দেখেছে। মাথামুণ্ডু কিছুই কিছুই বুঝতে পারেনি। সুজিতকেও একদিন দেখিয়েছিল। সুজিত ভ্রূ কুঁচকে বলেছিল, এসব হায়ার ম্যাথেমেটিক্স। শুনেছি ওর সঙ্গে নাসার যোগাযোগ আছে। বোধহয় স্পেসঘটিত ম্যাথেমেটিক্সই হবে।

যমুনাকে দিয়ে বুকুকে ডেকে পাঠাল পৃথা।

বুকু এল। হাতে একখানা বিশাল মোটা বই।

দ্যাখো মা, মশাই আমাকে জন্মদিনে এই বইটা দিয়েছে! কত রঙিন ছবি আছে বইটাতে!

পৃথা বইটা হাতে নিয়ে দেখল, বাচ্চাদের একটা ইংরিজি এনসাইক্লোপিডিয়া। পৃষ্ঠা ওলটাতেই চোখে পড়ল, গোটা গোটা বাংলা হরফে লেখা--স্নেহের বুকুকে, তার জন্মদিনে, মশাই। লেখাটুকুর দিকে চেয়েই পৃথার বুকটা ফের ঢিপঢিপ করে উঠল। এরকম চললে তার হার্টের দোষ দেখা দেবে।

আনমনে পৃষ্ঠা উলটে যেতে গিয়ে বইটার দাম দেখে চোখ স্থির হয়ে গেল পৃথার। পঞ্চাশ ডলার! মাই গড! পঞ্চাশ ডলার! এত দামি বই দেওয়ার দরকার কী ছিল? মোটে তো পাঁচশো টাকা বেতন দেওয়া হয় লোকটাকে! কোনো মানে হয় এত দামি বই উপহার দেওয়ার? লোকটা পাগল, কাণ্ডজ্ঞানহীন।

তোমার মশাইকে নিয়ে খেতে এসো বুকু।

আসছি। বলে বুকু এক ছুটে চলে গেল।

তারপর হাত ধরে টানতে টানতে মশাইকে নিয়ে এল বুকু। বাথরুমের বাতি জ্বেলে দিয়ে বলল, যাও, ওয়াশ করে নাও।

এই তো বুকু ওর কাছে কত সহজ! কত জড়তাহীন! তাহলে পৃথার এই জড়তা কেন? সে কো-এডুকেশনে পড়েছে। প্রেম করে বিয়ে করেছে, অফিসে পুরুষ সহকর্মীদের সঙ্গে সে তো কত সহজ! তবে দুনিয়ার এই একটিমাত্র লোককে নিয়ে তার প্রবলেম হচ্ছে কেন?

বিষ্ণু হাত মুখ ধুয়ে এসে সসংকোচে খেতে বসল। মুখে কথা নেই।

খই ফুটছে বুকুর মুখে। নাগাড়ে বকবক করে যাচ্ছে সে। বিষ্ণু স্মিত মুখ করে বসে শুনছে। অল্প অল্প হুঁ হাঁ করছে বা মাথা নাড়ছে। পৃথার কানে কোনো শব্দ যাচ্ছে না।

চুপচাপ গম্ভীর মুখে খেয়ে যাচ্ছিল বিষ্ণু। রান্না কেমন হয়েছে তা একবারও বলল না। পৃথা কিন্তু জিজ্ঞেস করতে পারছে না ওকে। তার ভয় হচ্ছে, গলা কেঁপে যাবে। স্বরই ফুটবে না হয়তো! কথা না বলাটা নিশ্চয়ই খুব খারাপ দেখাচ্ছে! কিন্তু পৃথাই বা কী করবে? একটু দূরে একটা চেয়ারে জড়োসড়ো হয়ে বসে সে শুধু তাকিয়ে রইল।

শুধু একবার শেষ দিকটায় অস্ফুট স্বরে বলল, একটু বিরিয়ানি দেব?

বিষ্ণু বলল, না।

একটাই সিলেবল। না। বাড়তি আর কিছুই নয়। খাওয়া খুব পরিষ্কার । কিছুই ফেলল না। পৃথার বাবা বলেন, রান্না কেমন হয়েছে তা খাওয়া দেখেই বোঝা যায়। সেটা সত্যি হলে পৃথার রান্না বিষ্ণুর ভালোই লেগেছে বোধহয়। কিন্তু লোকটা এমনই অভদ্র যে, একটু কমপ্লিমেন্টও দিল না। খেয়ে উঠল। আঁচাল। তারপর বুকুর মাথায় একবার আলতো হাত রেখে 'চলি' বলেই চলে গেল।

হঠাৎ ভীষণ শ্রান্তি আর ক্লান্তিতে পৃথার শরীর ভেঙে এল। কেন যে এত খারাপ লাগছে কে জানে! পেটে বুকে একটা চাপ-ধরা ভাব। অম্বল। সে শোওয়ার ঘরে গিয়ে বাতি নিভিয়ে

চুপ করে শুয়ে রইল চোখ বুজে। নিজেকে এত অচেনা লাগছে কেন আজ? কেন পৃথা আজ পৃথাকে ঠিক বুঝতে পারছে না?

রাতে খাওয়ার টেবিলে বসে সুজিত কথায় কথায় বলল, বিষ্ণুকে ভালো করে খাইয়ে দিয়েছ তো?

হ্যাঁ।

ভালো করেছ। হি ইজ বিডিং গুডবাই টু আস।

মানে?

নাসায় রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্টের চাকরি পেয়েছে। সামনের মাসেই চলে যাচ্ছে আমেরিকায়। সাধারণত এরকম অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়া শক্ত। কিন্তু জিনিয়াসদের জন্য কোনো আইন নেই, বুঝলে?

না, পৃথা বুঝল না। পৃথা কিছুই বুঝল না। শুধু হঠাৎ তার বুকের মধ্যে একটা তেপান্তরের মাঠ জেগে উঠল। হু হু করে হাওয়া বয়ে যাচ্ছে শুধু। কী ফাঁকা! কী শূন্য!

বুকু ঘুমোল, সুজিত ঘুমোল, বাড়ি নিঝুম হল। পৃথা উঠে এল বারান্দায়। দক্ষিণের এই বারান্দায় কী সুন্দর হাওয়া! চুপ করে চেয়ে রইল পৃথা। কখন তার চেয়ে-থাকা চোখ ভরে উঠল জলে। টপ টপ করে চোখের জল ঝরে পড়তে লাগল নাইটির ওপর। গ্রিলে ক্লান্ত মাথাটি রেখে সে অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে ফিস ফিস করে বলল, ও ভগবান! আমি অ্যাডাল্টারাস...আই অ্যাম হেল্পলেসলি অ্যাডাল্টারাস...ওঃ ভগবান!